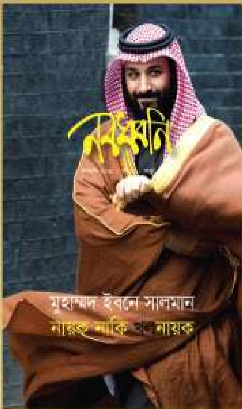
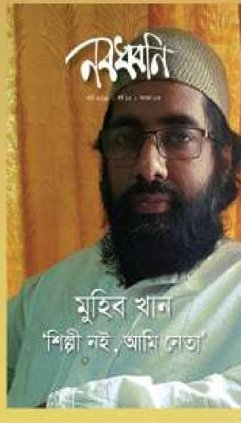
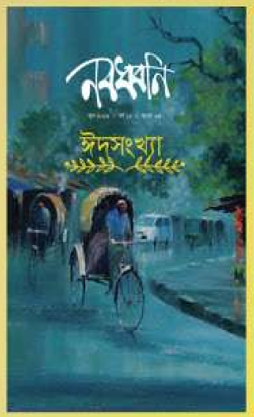
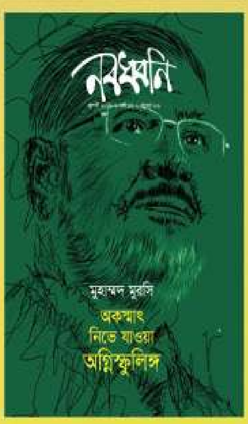






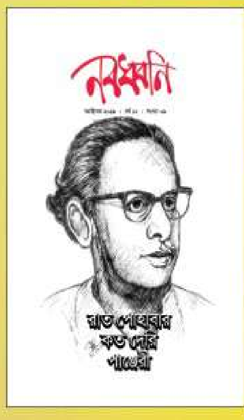




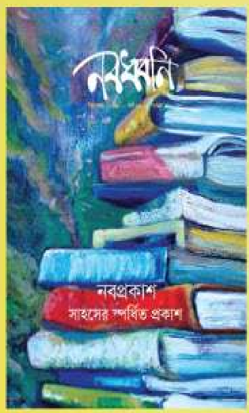






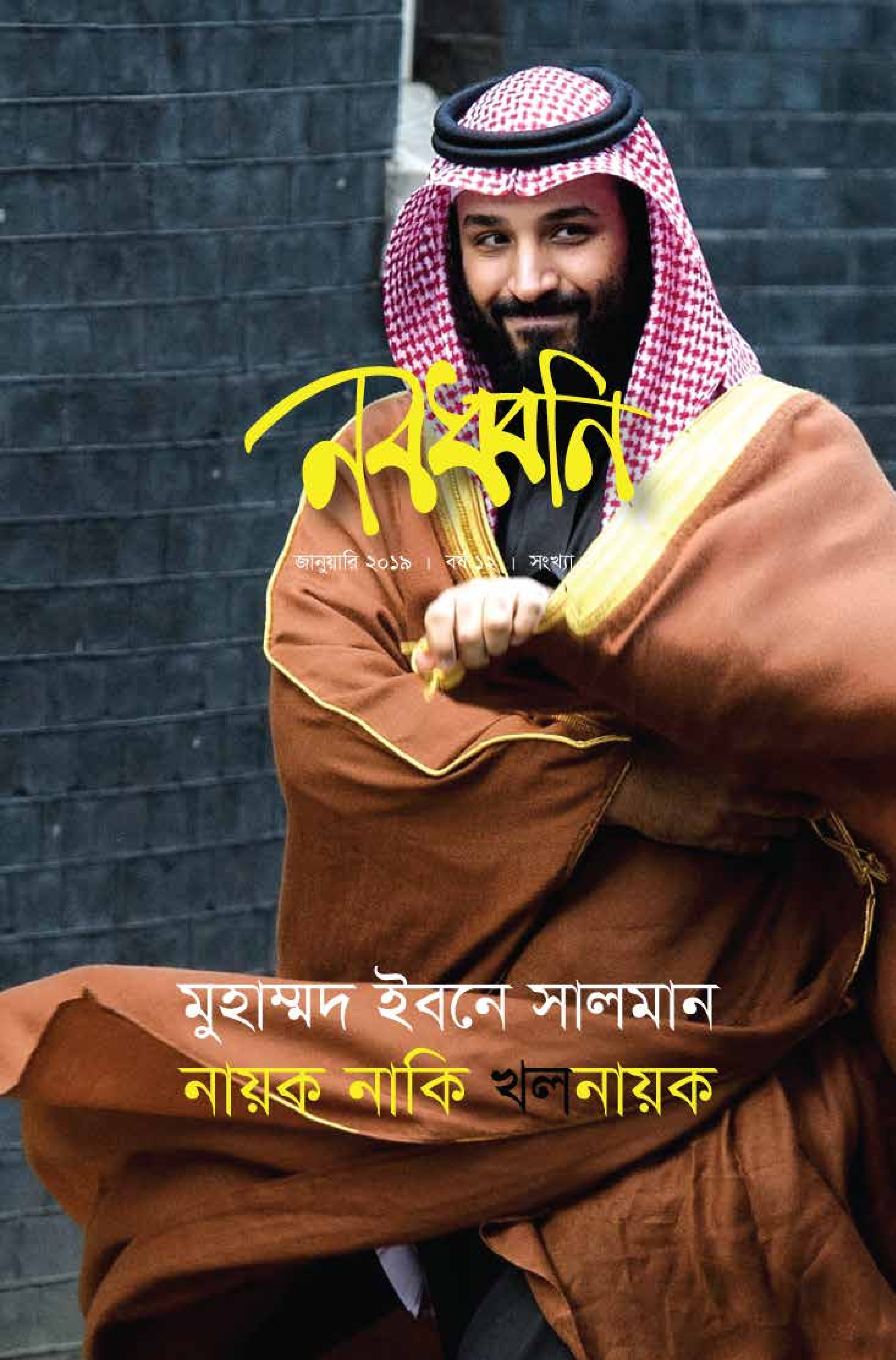






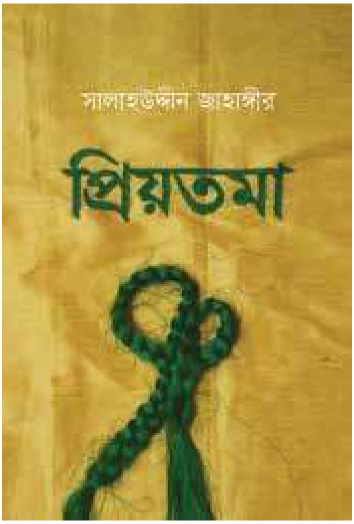
বছরজুড়ে পাঠকের পাশে

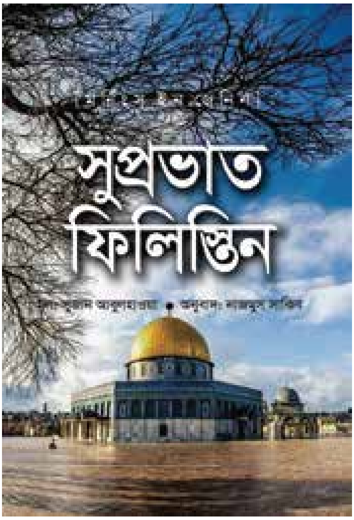
নবধ্বনি

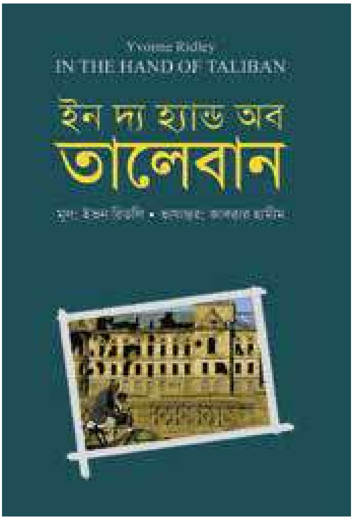

নবধ্বনি
জানুয়ারি ২০১৯ । বর্ষ । সংখ্যা
মুহাম্মদ ইবনে সালমান
নায়ক নাকি খলনায়ক

নবপ্রকাশের চারটি বেস্টসেলার বই









ঘরে বসে বই কিনতে কল করুন
০১৯৭৪ ৮৮৮৪৪১, ০১৯১৩ ৫০৮৭৪৩

www.noboprokash.com facebook.com/noboprokash
ইসলামী টাওয়ার [দোকান নং ২০] ১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

নবপ্রকাশ

জানুয়ারি ২০১৯ । বর্ষ ১২ । সংখ্যা ০১

সম্পাদক
তামীম রায়হান

নির্বাহী সম্পাদক
সালাহউদ্দীন জাহাঙ্গীর

সহকারী সম্পাদক
হামমাদ রাগিব
নাজমুস সাকিব

প্রকাশনা ব্যবস্থাপক
আসাদুল্লাহ খান

সার্কুলেশন ব্যবস্থাপক
মুহাম্মদ ইসহাক খান

মূল্য ৫ টাকা মাত্র

নবধ্বনি । দোকান নং ২৭ । ২য় তলা । ইসলামী টাওয়ার
১১/১ বাংলাবাজার । ঢাকা । ০১৭৪৫ ১৩৯২১৫

Email: nobodhoni@gmail.com web: noboprokash.com/nobodhoni

স্বাগত কলাম

আজকে কথা হচ্ছিল এক তরুণের সঙ্গে। তরুণ রাজধানীর এক মাদরাসায় মিশকাত জামাতে পড়েন। নিয়মিত মাসিক নবধ্বনি পড়ার চেষ্টা করেন। সেই সূত্রে ফোনালাপ। আজ নবধ্বনির কার্যালয়ে এসেছিলেন সৌজন্য সাক্ষাত করতে।

আলাপে জানতে পারলাম, তিনি ইতোমধ্যে একটি বই সংকলন করেছেন। উপমহাদেশের প্রথিতযশা দায়ি ও লেখক আলি মিয়া নদভি রহ.-এর বিভিন্ন বই থেকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু অংশ নিয়ে ছোটদের জন্য সংকলন করেছেন কিছু জরুরি বাতচিত। সে বই মাস তিনেক আগে বাংলাবাজারের এক প্রকাশনী থেকে প্রকাশ হয়ে ইতোমধ্যে বাজারে চলছে।

আমি তরুণকে শুধালাম, 'তাতে কী লাভ হলো?' আমার কথা শুনে তরুণটি প্রথমে হকচকিয়ে গেলেন। কী বলবেন বুঝতে পারছিলেন না। পরে আমি তাকে আরও বিস্তারিত ভয় নিয়ে বললাম, 'আলি মিয়া নদভির বই বাংলাভাষায় অপ্রতুল নয়, বাজারে দেদার চলছে। আপনাকে নতুন করে তার বই থেকে সংকলনের কোনো প্রয়োজন ছিল না। আপনি সংকলন না করলেও এ বইয়ের উদ্দিষ্ট পাঠকদের তেমন কিছু যেতো আসতো না। আপনি লেখক হওয়ার জন্য আলি মিয়া নদভিকে অবলম্বন করেছেন। তাতে বাংলাভাষী পাঠকদের যেমন কোনো ফায়দা নেই, তেমনি লেখক হিসেবে আপনার ফায়দাও প্রায় শূন্যের কোঠায়। এই দেশে অনুবাদ বা সংকলন করার মানুষের অভাব নেই।'

তরুণ কিছুটা আহত হলেন। তাকে অভয় দিতে আরও খানিক ওয়াজ দিলাম, 'আপনি এমন একটা কাজ করুন যে কাজটা এর আগে কেউ করেনি। এক বছর লাগুক, দুই কিংবা তিন বছর লাগুক–কিন্তু একটা অসাধারণ বই লিখুন। আপনি দেশবিখ্যাত লেখক হবেন। মানুষ আপনার নাম মনে রাখবে। আপনাকে দেখে আরও হাজারও তরুণ উদ্বুদ্ধ হবে। সবচেয়ে বড়কথা, আপনার লেখকসত্ত্বা পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হবে। একজন লেখক হওয়ার যে তৃপ্তি, সেটা আপনি অনুধাবন করতে পারবেন। অন্যের বই অনুবাদ করে কিংবা সংকলন করে আপনি কখনোই বড় লেখক হওয়ার স্বপ্ন দেখতে পারবেন না। আপনাকে আপনার নিজস্বতা বিকাশ করতে হবে। তবেই আপনি ইতিহাসের বুকে নামখোদাই করা লেখক হবেন। নয়তো এমন অনুবাদ-সংকলনের লেখক বাংলাদেশে অভাব নেই। তাদের মাঝে আপনার নামটা অনুল্লেখ্যই থেকে যাবে আর দশজনের মতো। কখনোই আপনি আলি মিয়া নদভি হতে পারবেন না।'

সেই তরুণকে বলা কথাগুলো আপনাদেরও বললাম, যারা কিছু লিখতে চান এবং লিখেই বিরাট বড় লেখক হওয়ার স্বপ্নে বিভোর হয়ে যান। মনে রাখবেন, লেখক হওয়ার শর্টকাট কোনো রাস্তা নেই। অনেক সাধনা, অধ্যয়ন, ত্যাগ আর মানুষের হতাশার দুয়োধ্বনি সাধন করে লেখক হতে হয়। এটাই শেষকথা। এটা স্বতসিদ্ধ কথা।



সৌদি যুবরাজ ও তাঁর অপরাধ-চিত্র

মুহাম্মদ বিন সালমান বিন আবদুল আজিজ আল সৌদ। গণমাধ্যমের ভাষায় সংক্ষেপে যাঁকে 'এমবিএস' বলে ডাকা হয়। সৌদি আরবের ভবিষ্যৎ-বাদশাহ–ক্রাউন প্রিন্স হবার পাশাপাশি একই সঙ্গে তিনি দেশটির প্রতিরক্ষামন্ত্রী ও উপপ্রধানমন্ত্রী। এ তো কেবল তাঁর অফিসিয়াল পরিচয়–এর বাইরে বলতে গেলে সৌদি আরবের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী তিনিই। অথচ বছর কয়েক আগেও বহির্বিশ্বের মানুষজনের খুব একটা জানাশোনা ছিল না তাঁর ব্যাপারে। তখন অবশ্যি এতটা ক্ষমতার অধিকারীও ছিলেন না তিনি।

২০১৫ সালের আগে তাঁর বাবা সালমান বিন আবদুল আজিজ ছিলেন সৌদি আরবের ক্রাউন প্রিন্স। ২০১৫ সালের জানুয়ারিতে তখনকার বাদশাহ–আবদুল আজিজের আরেক ছেলে–আবদুল্লাহ বিন আবদুল আজিজ মৃত্যুবরণ করলে সৌদির সিংহাসনে বসেন বাদশাহ সালমান বিন আবদুল আজিজ। বাদশাহ সালমান ক্ষমতাগ্রহণের পর থেকেই মুহাম্মদ বিন সালমান খুব দ্রুত ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসেন।

মুহাম্মদ বিন সালমানের জন্ম ১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দের ৩১ আগস্ট। বর্তমান বাদশাহ সালমান বিন আবদুল আজিজের তৃতীয় স্ত্রীর প্রথম সন্তান তিনি। সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদে অবস্থিত কিং সৌদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করার পর রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত হন। ২০০৯ সালে বাবা সালমান বিন আবদুল আজিজের বিশেষ উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ পান। সালমান তখন রিয়াদের গভর্নর হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। ২০১৩ সালে বাগিয়ে নেন দেশটির মন্ত্রী পদমর্যাদার গুরুত্বপূর্ণ একটি দায়িত্ব। বাবার বিশেষ উপদেষ্টা পদে নিয়োগপ্রাপ্তির পর বাবাকে তিনি খুব দ্রুত নিজের কর্মকাণ্ডের ওপর বিশ্বস্ত ও আস্থাশীল করে তোলেন। ফলশ্রুতিতে ২০১৫ সালে যখন ৭৯ বছর বয়সি বৃদ্ধ সালমান সিংহাসনে বসেন, তৎক্ষণাত তিনি বাবার কাছ থেকে রাষ্ট্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব প্রতিরক্ষা মন্ত্রিত্বের পদ বাগিয়ে নিতে সক্ষম হন। এর মাস কয়েক পর ২০১৫-এর এপ্রিলে সালমান তাঁকে ডেপুটি ক্রাউন প্রিন্সের মর্যাদায় ভূষিত করেন। ক্রাউন প্রিন্স ছিলেন তখন সালমানের ভাতিজা মুহাম্মদ বিন নায়েফ।

অল্প কিছুদিনের ভেতর বাদশাহ সালমান বিশ্বস্ত পুত্রকে আরও দায়িত্ব দেন। মুহাম্মদ বিন সালমান একই সঙ্গে দেশটির উপপ্রধানমন্ত্রী ও কাউন্সিল অব ইকোনমিক অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অ্যাফেয়ার্সের প্রধান পদমর্যাদা লাভ করেন। এসব দায়িত্বের কল্যাণে পুরো রাষ্ট্রব্যবস্থাকে খুব দ্রুত নিজের আয়ত্বাধীন করে ফেলেন বিন সালমান। ২০১৭-এর জুনে এসে ভোজবাজির মতো ঘটে গেল তাঁর সর্বোচ্চ পদোন্নতি। বাদশাহ সালমান বিন আবদুল আজিজের বিশেষ আদেশে ক্রাউন প্রিন্স মুহাম্মদ বিন নায়েফকে হটিয়ে নিজের ভবিষ্যৎ-বাদশাহি নিশ্চিত করে নেন তিনি।

মুহাম্মদ বিন সালমান ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে আসার পর থেকে ধর্মীয় ঐতিহ্য মণ্ডিত সৌদি সমাজে নানা ধরনের বিকৃতি ঘটানোর উদ্যোগ নিয়েছেন। ইতিমধ্যে অনেকগুলো বাস্তবায়নও করেছেন। দেশের অভ্যন্তরে যারাই তাঁর এ কাজের বিরোধিতা করেছে, তাদের ওপর নেমে এসেছে নির্যাতনের খড়্গ। পাশাপাশি ভ্রাতৃপ্রতিম রাষ্ট্রের সঙ্গে অবরোধ আরোপের মাধ্যমে বিরোধ বাঁধিয়েছেন। এবং ইসলাম ও মুসলিম স্বার্থের বিরোধী দেশগুলোর সঙ্গে বাড়িয়েছেন সৌদি আরবের ঘনিষ্টতা। তাঁর নানাবিধ এসব কর্মকাণ্ডের সামান্য ফিরিস্তি নিম্নে তুলে ধরা হলো।

ধর্মীয় মূল্যবোধ বিবর্জিত কর্মকাণ্ডের বিস্তার এবং বিরোধিতাকারীদের গ্রেপ্তার

সৌদি আরব হারামাইন শরিফাইনের দেশ। মুসলিম বিশ্বের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার দুই নগরী এ দেশেই অবস্থিত। এখানকার আচার-সংস্কৃতি তাই অনেকটাই ইসলাম-বান্ধব। ইসলাম-বান্ধব এ সমাজটাকে ধর্মীয় রক্ষণশীলতার তকমা দিয়ে এখানকার সুন্দর অনাবিল পরিবেশটাকে দূষণীয় করার উদ্যোগ নেন মুহাম্মদ বিন সালমান। দেশটিতে প্রকাশ্যে সিনেমা দেখার কোনো ব্যবস্থা ছিল না, সালমান সিনেমা হল তৈরির মাধ্যমে পাপ কাজের এ পথকে সুগম করে দিয়েছেন। নারী-স্বাধীনতার নাম করে পর্দাপ্রথাকে করেছেন শিথিল। এবং আরও নানা রকম শরিয়াহ-বিরোধী কর্মকাণ্ডের বিস্তার ঘটিয়েছেন, যা সৌদি সমাজ কল্পনাও করেনি কখনও।

তাঁর এসব কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে সামান্যতম প্রতিবাদ করারও সুযোগটুকু নেই। ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব যারাই প্রতিবাদ করতে গেছেন, তাদেরকেই বরণ করতে হয়েছে বন্দিত্ব।

কাবা শরিফের অন্যতম ইমাম শায়খ সালেহ আল তালিবের কথাই ধরা যাক। মুহাম্মদ বিন সালমানের শরিয়াহ-বিরোধী এসব কর্মকাণ্ডের বিরোধিতা করে গত বছরের আগস্টে একটি বক্তব্য দিয়েছিলেন তিনি। ব্যস, আর যায় কোথায়! সঙ্গে সঙ্গেই গ্রেপ্তার। সৌদি কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে কীভাবে কাটছে তাঁর জীবন, কেউ জানে না। আলেমদের ওপর এ নিপীড়ন অবশ্যি নতুন নয়। অতীতে আরও অনেক অমিততেজা আলেম সৌদি রাজপরিবারের শরিয়াহ-বিরোধী বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদ করতে গিয়ে এভাবে বন্দি হয়েছেন। বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড নিয়ে তাঁদের জীবন কাটছে কারাগারের ভেতর।

ইয়েমেনে ধ্বংসযজ্ঞ

২০১৫ সালে প্রতিবেশি ইয়েমেনের গৃহযুদ্ধে মুহাম্মদ বিন সালমানের নেতৃত্বে হস্তক্ষেপ করে সৌদি আরব। দেশটির হুথি বিদ্রোহীদের নিয়ন্ত্রণে থাকা অঞ্চলগুলো মুক্ত করার প্রত্যয়ে বিমান হামলা শুরু করে। লক্ষ্য অর্জনের চেষ্টায় মার্কিন সহায়তায় সৌদি-আরব আমিরাত জোট



এখন পর্যন্ত ইয়েমেনে ১৬ হাজারের বেশি বার বিমান হামলা চালিয়েছে।

ইয়েমেনে সৌদি নেতৃত্বাধীন সামরিক জোটের বিরুদ্ধে বেসামরিক নাগরিক, হাসপাতাল, স্কুল ও অন্যান্য অবকাঠামো লক্ষ্য করে নির্বিচারে বোমা হামলা চালানোর অভিযোগ এনেছে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন।

দীর্ঘদিনের এই বিমান হামলার পাশাপাশি ইয়েমেনের কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ হোদেইদাহ বন্দর অবরোধ করে সৌদি আরব এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত। মধ্যপ্রাচ্যে সৌদি আরবের অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী ইরান সমর্থিত হুথি বিদ্রোহীদের অস্ত্রের মূল জোগান এই বন্দর হয়ে ইয়েমেনে প্রবেশ করত। কিন্তু সৌদি জোট হোদেইদাহ বন্দর অবরোধ করায় দেশটিতে জরুরি মানবিক ত্রাণ সহায়তাও পৌঁছানো কঠিন হয়ে পড়ে। ২০১৫ সাল থেকে ইয়েমেনের গৃহযুদ্ধে এখন পর্যন্ত প্রাণ হারিয়েছেন ১০

হাজারের বেশি মানুষ। এদের মধ্যে অনেকের প্রাণ গেছে যুদ্ধের কারণে সৃষ্ট দুর্ভিক্ষে। লাখ লাখ মানুষ হয়েছেন বাস্তুচ্যুত।

লেবাননের প্রধানমন্ত্রীকে পদত্যাগে বাধ্য

নিয়মিত সফরের অংশ হিসেবে সৌদি আরবে গিয়ে চাঞ্চল্যকর বন্দীদশার মুখোমুখি হয়েছিলেন ইয়েমেনের প্রধানমন্ত্রী সাদ হারিরি। ২০১৭ সালের নভেম্বরে সৌদি আরবে পৌঁছানোর পর তাঁর ফোন জব্দ করা হয়। পরদিন সৌদি আরবের সরকারি একটি টেলিভিশনে তিনি ইয়েমেনের প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে নিজেকে সরিয়ে নেয়ার ঘোষণা দেন। সেই সময় ব্রিটিশ বার্তাসংস্থা রয়টার্সের খবরে বলা হয়, সৌদিতে পৌঁছানোর পরদিন বাদশাহ সালমান ও যুবরাজের সঙ্গে দেখা করার জন্য হারিরিকে তলব করা হয়। দেখা করার পর তিনি টেলিভিশনে আকস্মিকভাবে পদত্যাগপত্র পাঠ করেন।

সার্বভৌম একটি দেশের প্রধানমন্ত্রীর এই ঘোষণার পর লেবাননে ব্যাপক ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। সৌদি আরবের বিরুদ্ধে সার্বভৌমত্ব ছিনতাইয়ের অভিযোগ আনে লেবানন। প্রধানমন্ত্রী হারিরির পদত্যাগ প্রত্যাখ্যান করে তাঁকে মুক্তি দিতে সৌদি আরবের প্রতি আহ্বান জানান লেবাননের প্রেসিডেন্ট মাইকেল আওন। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে উভয় দেশের সম্পর্কে টানাপড়েন শুরু হয়। লেবাননকে অস্থিতিশীল করে তোলার জন্য ইরান সমর্থিত হেজবুল্লাহকে দায়ী করে প্রায় দুই সপ্তাহ সৌদি আরবে অবস্থান করেন হারিরি। ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোর মধ্যস্থতায় বৈরুতে ফিরে ৪৭ বছর বয়সী এই প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগের ঘোষণা প্রত্যাহার করে নেন।

হারিরিকে জোরপূর্বক পদত্যাগ ও আটকে রাখার অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করলেও সৌদি যুবরাজ মুহাম্মদ বিন সালমানকে দৃষ্টিকটু এই নাটকের মূলহোতা হিসেবে দেখা হয়।

রিটজ-কার্ল্টন শুদ্ধি অভিযান

যুবরাজ ক্ষমতায় আসার পর তাঁর রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীরা হয়েছেন চরম নিগ্রহের শিকার। ২০১৭ সালে দেশটির কয়েকশ’ ধনী ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে নিরাপত্তাবাহিনী। সৌদির দুর্নীতিগ্রস্ত উচ্চপদস্থ আমলাদের বিরুদ্ধে শুদ্ধি অভিযান চালানোর নাম করে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তারকৃতদের কয়েক সপ্তাহ ধরে রিয়াদের বিলাসবহুল রিটজ-কার্ল্টন হোটেলে তালাবদ্ধ করে রাখা হয়। এ সময় এদের অনেকের ওপর শারীরিক নির্যাতন চালানোর অভিযোগ ওঠে। মার্কিন প্রভাবশালী দৈনিক নিউইয়র্ক টাইমস এক প্রতিবেদনে বলেছে, বিলাসবহুল এই হোটেলে শারীরিক নির্যাতনের শিকার অন্তত ১৭ জনকে পরে হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হয়। পরবর্তী সময়ে একজন বন্দী অবস্থায় মারা যান।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, যুবরাজ তাঁর জন্য সম্ভাব্য রাজনৈতিক হুমকি হিসেবে চিহ্নিতদের সরিয়ে দিতেই ক্ষমতার অপব্যবহার করে এই শুদ্ধি অভিযান চালিয়েছেন।

উপসাগরীয় সঙ্কটের নেপথ্য নায়ক

২০১৭ সালের ৫ জুন প্রতিবেশি কাতারের সঙ্গে সৌদি নেতৃত্বাধীন চারটি দেশ কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন এবং উপসাগরীয় এই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক অবরোধ আরোপ করে। কাতারের সঙ্গে স্থলসীমান্ত বন্ধ করে দেয় সৌদি আরব। শুধুমাত্র আকাশ ও সমুদ্র পথ অবরোধের বাইরে রাখা হয়।

কাতারের সঙ্গে সৃষ্ট কূটনৈতিক সঙ্কটের নেপথ্য নায়ক হিসেবে কাজ করেন সৌদি যুবরাজ মুহাম্মদ বিন সালমান (এমবিএস) ও আরব আমিরাতের যুবরাজ মুহাম্মদ বিন জায়েদ আল-নাহিয়ান (এমবিজেড)। কাতারকে একঘরে করে রেখে উপসাগরীয় সহযোগিতা পরিষদকে বিভক্ত করা ছাড়া তেমন কোনো অর্জন নেই তাঁদের ঝুলিতে। মার্কিন সংবাদমাধ্যম দ্য ইন্টারসেপ্টের প্রতিবেদন অনুযায়ী, অবরোধ আরোপের উদ্দেশ্য ছিল কাতারে সৌদি এবং আমিরাতের সামরিক অভিযান পরিচালনা করা। আরব আমিরাতের সেনাবাহিনীর সহায়তায় সৌদি সামরিক বাহিনীর নেতৃত্বে স্থলসীমান্ত পাড়ি

দিয়ে কাতারে ঢুকে ১০০ কিলোমিটার দূরের রাজধানী দোহার নিয়ন্ত্রণ নেওয়া সৌদি জোটের মূল উদ্দেশ্য।

অবরোধ আরোপের পর এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কাছাকাছি পৌঁছেছিলেন সৌদি ও আমিরাতের দুই যুবরাজ। মার্কিন গোয়েন্দাবাহিনী ও পররাষ্ট্র দফতরের সাবেক দুই কর্মকর্তার বরাত দিয়ে এ তথ্য জানিয়েছিল ইন্টারসেপ্ট। কিন্তু তৎকালীন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী রেক্স টিলারসনের চাপে সেই সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসেন এমবিএস। সেই সময় কাতারে আক্রমণ চালানো হলে তা সৌদি-মার্কিন সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে বলে উদ্বেগে ছিলেন টিলারসন।

বেড়েছে শিরশ্ছেদ

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সৌদি আরবে শিরশ্ছেদের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে বলে দাবি করেছে ব্রিটিশ মানবাধিকার সংস্থা অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল ও রিপ্রাইভ নামের একটি সংস্থা।

রিপ্রাইভ বলছে, মুহাম্মদ বিন সালমান যুবরাজ হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার প্রথম আট মাসে ১৩৩ জনের শিরশ্ছেদ করা হয় সৌদিতে। তিনি ক্ষমতায় আসার পর প্রত্যেক মাসে গড়ে ১৬ জনের শিরশ্ছেদ করা হয়। এই ধারা যদি অব্যাহত থাকে তাহলে চলতি বছরে শিরশ্ছেদের অতীত সব রেকর্ড ছাড়িয়ে যাবে সৌদি আরব।

জামাল খাশোগজির অন্তর্ধান

এমবিএসের সাবেক স্ত্রীকে তালাকের একটি নথি সংগ্রহের জন্য গত ২ অক্টোবর সৌদি সাংবাদিক জামাল খাশোগজি ইস্তাম্বুলের সৌদি কনস্যুলেটে প্রবেশ করেন। তার পর থেকে আর তাঁকে দেখা যায়নি। সৌদি আরবের রাষ্ট্রীয় হিট স্কোয়াডের সদস্যরা এই সাংবাদিককে কনস্যুলেট ভবনে হত্যা করেছে বলে ধারণা তুরস্কের। প্রথমে অস্বীকার, তারপর নানা নাটকীয়তার পর সৌদি আরব হত্যাকাণ্ডের কথা স্বীকার করে বলে, বিশেষ জিজ্ঞাসাবাদের সময় দুর্ঘটনাক্রমে খাশোগজি নিহত হয়েছেন। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা দাবি করেছেন, এ হত্যাকাণ্ডের পেছনে মূল কারিগর হিসেবে কাজ করেছেন মুহাম্মদ বিন সালমান।

একসময় সৌদি রাজপরিবারের উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করেছিলেন খাশোগজি। কিন্তু যুবরাজ মুহাম্মদ বিন সালমানের সংস্কার কর্মসূচির সমালোচনা করায় দেশ ছাড়তে বাধ্য হন তিনি। গত বছরের মার্চে আল-জাজিরাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে খাশোগজি বলেছিলেন, 'আমরা আজ কথা বলতে পারলেও সৌদি সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবীরা কারাবন্দী অবস্থায় রয়েছেন।'

ইন্টারনেট অবলম্বনে লিখেছেন হামমাদ রাগিব



গৃহশিক্ষকের বর্ণনায় মুহাম্মদ বিন সালমানের শৈশব

সৌদি আরবের বিতর্কিত যুবরাজ মুহাম্মদ বিন সালমানকে কিছুদিন আগ পর্যন্তও খুব কম লোকই চিনতেন। কিন্তু ভবিষ্যৎ সৌদি রাজা হিসেবে তাঁর অভিষেক, ধর্মপ্রাণ সৌদি সমাজকে সংস্কারের নামে দেশটিতে নানা অনৈতিক কর্মকাণ্ডের অনুমোদন ও বিস্তার, ইয়েমেনে গৃহযুদ্ধ এবং সবশেষ জামাল খাসোগজি হত্যাকাণ্ড–এগুলোর সঙ্গে তাঁর নাম জড়িয়ে যাওয়ার কারণে সারা বিশ্বের নজর এখন তাঁর দিকে।

কিন্তু কীভাবে বেড়ে উঠেছিলেন এই প্রিন্স সালমান? তাঁর শৈশব সম্পর্কে লোকে কতটুকু জানে?

এর ওপরই খানিকটা আলোকপাত করেছেন বিবিসি আরবি বিভাগের সাংবাদিক রাশিদ সেক্কাই–যিনি শিশু প্রিন্স মুহাম্মদ বিন

সালমানের গৃহশিক্ষক ছিলেন, তাঁকে তিনি ইংরেজি শেখাতেন। তিনি জানিয়েছেন, মুহাম্মদ বিন সালমান ছোটবেলা থেকেই ছিলেন উদ্ধত এবং বেপরোয়া। যার কারণে অল্প দিন পড়িয়ে রাশেদ সেক্কাই এ চাকরি ছেড়ে দিতে বাধ্য হন।

রাশেদ সেক্কাই সম্প্রতি বর্ণনা করেছেন তাঁর সেই সময়কার স্মৃতি। তাঁর ভাষায়, 'তখন ১৯৯৬ সাল। আমি জেদ্দার নামকরা স্কুল আল-আনজালে পড়াই। তখন রিয়াদের গভর্নর ছিলেন তখনকার প্রিন্স, বর্তমান বাদশাহ সালমান বিন আবদুল আজিজ আল সৌদ, যিনি যুবরাজ মুহাম্মদ বিন সালমানের পিতা।

'প্রিন্স সালমান বিন আবদুল আজিজ আল সৌদ তখন সাময়িকভাবে তাঁর পরিবার নিয়ে জেদ্দায় এসেছেন, এবং তার দরকার হয়েছিল তাঁর সন্তানদের জন্য একজন ইংরেজির শিক্ষক।

'তিনি যোগাযোগ করলেন আমি যে স্কুলে পড়াতাম সেই স্কুলের সঙ্গে। তখন আমাকে নিয়ে যাওয়া হলো রাজকীয় প্রাসাদে। আমার ছাত্র হলেন তাঁর প্রথম বিয়ে থেকে জন্মানো কয়েকজন রাজপুত্র। প্রিন্স তুরকি, প্রিন্স নায়েফ, প্রিন্স খালিদ এবং প্রিন্স মুহাম্মদ।

'আমি তখন জেদ্দার একটা উঠতি এলাকায় একটা ফ্ল্যাটে থাকি। প্রতিদিন সকাল বেলা–সাতটার সময় একজন শোফার (ড্রাইভার) এসে আমাকে আল-আনজাল স্কুলে নিয়ে যেত। বিকেলের দিকে স্কুল শেষ হলে এই ড্রাইভারই আবার এসে নিয়ে যেত রাজপ্রাসাদে।

'প্রাসাদের গেটের কড়া পাহারা পার হয়ে যাবার পর গাড়িটি চোখ-ধাঁধানো অনেকগুলো বাগানওয়ালা ভিলা অতিক্রম করে রাজকীয় প্রাসাদের সামনে পৌঁছাত। সামনের নিখুঁতভাবে সাজানো বাগানের পরিচর্যা করে সাদা পোশাকপরা মালীরা।

'সেখানে একটি কার পার্কিং ছিল। তাতে বিলাসবহুল অনেকগুলো গাড়ি দেখতাম পার্ক করা। একটা গাড়ি ছিল গোলাপি রঙের, ক্যাডিলাক গাড়ি। ওইখানেই প্রথম আমি নিজের চোখে ক্যাডিলাক দেখি।

'প্রথমদিন রাজকীয় দুর্গে ঢোকার পর আমাকে স্বাগত জানান প্রাসাদের পরিচালক মানসুর আল-শাহরি। মধ্যবয়স্ক এই ব্যক্তি প্রিন্স মুহাম্মদের খুবই প্রিয় ছিলেন।

'প্রিন্স মুহাম্মদকে মনে হলো আমার কাছে পড়ার চাইতে প্রাসাদের রক্ষীদের সঙ্গে সময় কাটানোর ব্যাপারেই বেশি আগ্রহী। ভাইদের মধ্যে সে-ই বয়েস সবচেয়ে বড় হওয়ায় যা খুশি তাই করত। আমার প্রতি কোনো পরোয়াই ছিল না তার।

'বয়সে ছোট যে প্রিন্সরা, আমি তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারতাম। কিন্তু মুহাম্মদ সেখানে হাজির হলেই পরিস্থিতি হয়ে যেত অন্য রকম।

'আমার মনে আছে, আমার পাঠদানের সময় মুহাম্মদ একটা ওয়াকি-টকি ব্যবহার করত–যা সে রক্ষীদের কেউ একজনের কাছ থেকে ধার করেছিল। সে এটাকে ব্যবহার করতো আমাকে নিয়ে নানা রকম ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্য করার জন্য এবং তার ভাই ও প্রাসাদরক্ষী-দেরকে এর দ্বারা জোক শোনানোর জন্য।

'একদিন মুহাম্মদ বলল, তার মা তাকে বলেছেন যে, আমাকে দেখে নাকি 'একজন সত্যিকারের ভদ্রলোক' বলে মনে হয়। আমি এটা শুনে একটু থতমত খেয়ে গেলাম। কারণ, আমার মনে পড়ে না, কখনো আমি তাঁকে দেখেছি, যেহেতু সৌদি রাজপরিবারের মেয়েরা অপরিচিতদের সামনে আসে না। প্রাসাদে একমাত্র নারী, যাকে আমি দেখেছি-লাম, সে একজন ফিলিপিনো আয়া।

'আমাকে যে কেউ দেখছে, ব্যাপারটা এতদিন আমি বুঝতে পারিনি। সৌদি সিংহাসনের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী তখন আমাকে দেয়ালে লাগানো কয়েকটি সিসিটিভি ক্যামেরা দেখাল। তার পর থেকে পড়ানোর সময় আমি আত্মসচেতন হয়ে গিয়েছিলাম।

'কিছুদিনের মধ্যেই মুহাম্মদ ছাড়া তার ভাইদের আমার বেশ পছন্দ হয়ে গেল। তারা ছিল রাজপুত্র, এবং তাদের জগত ছিল অর্থ-বিত্ত-বিলাসে ভরা। কিন্তু তাদের সঙ্গে আমার স্কুলের ছাত্রদের বিশেষ কোনো তফাৎ ছিল না। তাদের জানার আগ্রহ ছিল কিন্তু খেলাধুলা করতেই বেশি ভালোবাসত।



‘একদিন প্রাসাদের পরিচালক মানসুর আল-শাহরি আমাকে বললেন ‘ভবিষ্যৎ রাজা’র সঙ্গে দেখা করতে। কারণ তিনি তার সন্তানদের শিক্ষায় কতটা অগ্রগতি হলো, তা জানতে চান। ভাবলাম, প্রিন্স মুহাম্মদের দুষ্টামির ব্যাপারে কিছু করার এটা একটা সুযোগ। সুযোগটা কাজে লাগানো দরকার।

‘আমি প্রিন্স সালমানের অফিসের সামনে অপেক্ষা করছিলাম। আমার পাশে দাঁড়ানো ছিলেন যুবরাজদের অন্যান্য শিক্ষকরা। মনে হলো, প্রাসাদের আদব-কায়দা সম্পর্কে আমার চাইতে তাঁরা বেশি ওয়াকিবহাল।

‘প্রিন্স সালমান আসার সঙ্গে সঙ্গে তারা উঠে দাঁড়ালেন, এবং আমি দেখতে লাগলাম কিভাবে তারা রিয়াদের গভর্নরের সামনে মাথা নত করলেন, তাঁর হাতে চুমু খেলেন, দ্রুতগতিতে প্রিন্সদের নিয়ে কিছু কথা বললেন এবং সামনে এগিয়ে গেলেন।

‘যখন আমার পালা এলো, আমি তাঁদের মতো মাথা নত করতে পারলাম না। আমি কখনো এটা করিনি। আমি আমার হাত বাড়িয়ে দিলাম এবং ভবিষ্যৎ রাজার সঙ্গে করমর্দন করলাম।

‘আমার মনে আছে প্রিন্স সালমানের মুখে ফুটে ওঠা বিস্ময়সূচক মৃদু হাসির কথা। কিন্তু তিনি ব্যাপারটা উপেক্ষা করেছিলেন।

‘আমি তাঁর সঙ্গে কথা বলার সময় প্রিন্স মুহাম্মদের কথা তুলিনি। কারণ ততক্ষণে আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি যে, আমি এ কাজ ছেড়ে দেব এবং যুক্তরাজ্যে ফিরে যাব।

‘পরে মি. আল-শাহরি আমাকে রাজকীয় আদবকায়দা পালন করতে ব্যর্থ হবার জন্য অনেক বকাঝকা করেছিলেন।

‘আমার ছাত্রদের মধ্যে প্রিন্স মুহাম্মদ ছাড়া প্রিন্স খালিদ যুক্তরাষ্ট্রে সৌদি রাষ্ট্রদূত হয়েছেন। তবে অন্য প্রিন্সরা জনসমক্ষে ততটা পরিচিত নন।

‘সৌদি রাজপুত্রদের শিক্ষাদানের এই সময়টা ছিল আমার জীবনের একটা অনন্য পর্ব।’

প্রতিবেদন-কৃতজ্ঞতা : বিবিসি



খাসোগজি হত্যা : রক্তের দাগ কি মুছবে কখনো?

নাজমুস সাকিব

গত বছর একটি টিভি চ্যানেলকে দেয়া সাক্ষাৎকারে মুহাম্মদ বিন সালমান বলেছিলেন, মৃত্যুই একমাত্র তাঁকে থামাতে পারে। এই বক্তব্য নিঃসন্দেহে তাঁর সাহস ও উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে প্রকাশ করে। বাদশাহ সালমান ক্ষমতায় আসার পর এবং বিশেষ করে যুবরাজ হবার পর থেকে খুব দ্রুত গতিতেই চলছিলেন মুহাম্মদ বিন সালমান। এই নবীন যুবরাজের সঙ্গে ট্রাম্প-সহ বিশ্ব নেতাদের সখ্যতাও ছিল অবাক করার মতো। এবার মৃত্যু বোধহয় তাঁকে কিছুটা থামিয়েই দিল। তবে নিজের মৃত্যু নয়, জামাল খাসোগজির।
গত বছরের অক্টোবরের শুরুর দিকে তুরস্কের সৌদি দূতাবাসের ভেতর ঘটে যাওয়া জামাল খাসোগজির হত্যাকাণ্ডের প্রায় তিনমাস হতে চলেছে। এতদিনে খাসোগজির এই হত্যাকাণ্ডের আর কোনো রহস্য উদ্ধারের বাকি নেই। গত ১৯শে ডিসেম্বর তুরস্কের পুলিশ আরও বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করে। বিভিন্ন জায়গায় থাকা প্রায় ১৪৭টি ক্যামেরা থেকে প্রায় ৩৬০০ ঘন্টার ভিডিও দেখে এই রিপোর্ট তৈরি করা হয়।
এই রিপোর্টে হত্যাকারী দলের সদস্যরা কে কখন কোথায় ছিল তা সময়সহ বলা আছে। তুরস্কের পুলিশ ও গোয়েন্দা বিভাগ তাদের তদন্ত অব্যাহত রেখেছে। তারা জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সৌদি নাগরিকদের তুরস্কের কাছে হস্তান্তরের আহ্বানও জানিয়েছে। তবে চতুর সৌদি পররাষ্ট্রমন্ত্রী তা নাকচ করে দিয়েছেন।
খাসোগজির হত্যাকাণ্ডে উদ্বেগ জানিয়েছেন বিশ্বনেতারা। এই হত্যাকাণ্ড যাতে ধামাচাপা না পড়ে যায়, সেজন্য শুরু থেকে অনেকেই দাবি জানিয়ে আসছেন। মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাও তাদের রিপোর্টে মুহাম্মদ বিন সালমানকে এই হত্যাকাণ্ডের আদেশদাতা বলে অভিহিত করেছে।

এতকিছুর পরও সৌদি আরবের প্রভাবের কারণে এই হত্যাকাণ্ডের বিচার আদৌ হবে কিনা তা এখনো প্রশ্নবিদ্ধ। কারণ মুহাম্মদ বিন সালমান ট্রাম্প শিবিরের অন্যতম সদস্য। ট্রাম্প তাঁর বন্ধুত্বের মর্যাদা রেখেছেন। সিআই-এর রিপোর্টে তিনি সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। বিশ্বনেতাদের প্রতিক্রিয়ায়ও বিব্রত তিনি।

খাসোগজির মৃত্যুতে নতুন করে জেগে উঠেছে সারা বিশ্ব। যুবরাজ মুহাম্মদ বিন সালমানের নানা কর্মকান্ডে এতদিন সরাসরি কেউ কিছু না বললেও খাসোগজিকে হত্যার পর চুপ থাকেনি আর কেউ। পরিস্থিতি এত ভয়াবহ রূপ ধারণ করবে জানলে হয়ত খাসোগজির জন্য তারা অন্য পন্থা বেছে নিত। নিজেদের শক্তির বিষয়ে তারা এতটাই আস্থাবান ছিল যে এমন সিদ্ধান্ত নিতে তাদের কোনো দ্বিধা হয়নি।

খাসোগজির হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে নিশ্চিতভাবে সৌদি আরবের ঔদ্ধত্যের প্রকাশ ঘটেছে। নিজের দেশের নাগরিকদের সঙ্গে দেশের অভ্যন্তরে বা কারাগারে আটক ব্যাক্তিদের সঙ্গে সৌদি আরব কেমন আচরণ করছে তা নিয়ে কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছেন। এখানে উল্লেখ্য, মুহাম্মদ বিন সালমান যুবরাজ হওয়ার পর থেকে সৌদি আরবের অনেক দায়ি, গবেষক আলেম, সাংবাদিক ও মানবাধিকার কর্মীকে কারাগারে আটক করে রাখা হয়েছে। এই আটক থেকে রেহাই পাননি মক্কার মসজিদুল হারামের কয়েকজন সম্মানিত ইমামও।

স্বয়ং সৌদি আরবেই আতংকে আছেন যুবরাজ–এমন মন্তব্য করেছেন একজন ফরাসি সাংবাদিক। সবার থেকে আড়ালে থাকার জন্য তিনি লোহিত সাগরে নির্মিত প্রাসাদে বসবাস করছেন। রাজপরিবারের সদস্যরাও তাঁর বিরোধী হয়ে উঠছেন বলে জানা যায়। সম্প্রতি একটি ভিডিওতে যুবরাজকে দ্রুত গাড়িতে ওঠে একটি অনুষ্ঠান ত্যাগ করতে দেখা গেছে। এসব ঘটনা স্বাভাবিকভাবেই অনেক প্রশ্ন সৃষ্টি করেছে। সংস্কারধর্মী নানা কাজের মাধ্যমে পশ্চিমা বিশ্বে অনেকের কাছে প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন মুহাম্মদ বিন সালমান। তবে সেসব নেতারা এখন তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। সর্বশেষ জি-২০ সম্মেলনে কয়েকজন রাষ্ট্রপ্রধান তাঁর দিকে ফিরেও তাকাননি। এরদোগানের আচরণে যথেষ্ট বিব্রত হয়েছেন যুবরাজ। থেরেসা মে সরাসরি তাকে খাসোগজির হত্যাকাণ্ড ও ইয়েমেন যুদ্ধ নিয়ে বিরূপ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। জি-২০-তে সৌদি যুবরাজের বিব্রত মুখভঙ্গি ছিল দেখার মতো। সাংবাদিকরা খুব দক্ষতার সঙ্গে এই দৃশ্য ধারণ করেছেন।

খাসোগজি হত্যাকে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করে আরও বিপদে পড়েছে সৌদি আরব। প্রথমে তারা খাসোগজির পোশাক পরিয়ে হত্যাকারী দলের এক সদস্যকে দূতাবাস থেকে বের করে দেখানোর চেষ্টা করে এরপর ক্রমাগত অস্বীকারের পর তারা জানায়, জিজ্ঞাসাবাদের সময়ে দুর্ঘটনাক্রমে নিহত হন খাসোগজি। প্রায় ২০ দিন পর সৌদি সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে এই ঘটনা স্বীকার করে।

এই ঘটনার অন্যতম সাক্ষী ছিল খাসোগজির স্মার্ট ওয়াচ। এই ওয়াচে সবকিছুর রেকর্ড আছে। এই রেকর্ডের ওপর ভিত্তি করে সিআইএ মুহাম্মদ বিন সালমানকে অভিযুক্ত করে এবং অপরাধীদের তালিকা প্রকাশ করে। এই ধরনের হত্যাকাণ্ডের ঘটনা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেই হয়ে থাকে। সেগুলো একদিন হারিয়ে যায়
সময়ের আবর্তনে। খাসোগজির ভাগ্যও এমন হবে কিনা তা এখনই বলা যাচ্ছে না। সম্প্রতি এরদোগান জানিয়েছেন, এই মামলা তাঁরা জাতিসংঘে উত্থাপন করবেন। সেই পর্যন্ত অপেক্ষা ছাড়া আর কিছু করার নেই কারও। কেঁচো খুড়তে গিয়ে সাপ বেরিয়ে আসে। সৌদি আরবের অভ্যন্তরে যা ঘটছে সে তুলনায় খাসোগজির হত্যাকাণ্ড একটা কেঁচোর মতো। এই কেঁচো খুড়তে গেলেও সাপ বেরিয়ে আসবে নিশ্চিত। তবে কেঁচো কে খুড়বে, সেটাই এখন বড় প্রশ্ন।

নাজমুস সাকিব : নবধ্বনির সহকারী সম্পাদক



কে এই খাসোগজি?

আজিজ মুনতাসির

১৯৫৮ সালের ১৩ অক্টোবর মদীনায় জন্ম খাসোগজির। তুর্কি বংশোদ্ভুত এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম তাঁর। আগে থেকেই সৌদি রাজ পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল এই পরিবারের। ১৯৮৩ সালে আমেরিকার ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতা বিষয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেন খাসোগজি। এরপর সৌদি আরবের বিভিন্ন পত্রিকায় কাজ করেন। ১৯৮৭ সাল থেকে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত সৌদি গ্যাজেট, শারকুল আওসাতসহ বেশ কয়েকটি দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকায় কাজ করেছেন জামাল খাসোগজি।

সোভিয়েত-আফগান যুদ্ধের সময় আফগানিস্তানে গিয়ে সংবাদ সংগ্রহ করার সময় সবার কাছে পরিচিত মুখ হয়ে ওঠেন তিনি। আল-কায়েদা-প্রধান ওসামা বিন লাদেনের সঙ্গে আফগানিস্তান ও সুদানে একাধিকবার তাঁর সাক্ষাতও হয়েছে। এ ছাড়া তিনি দ্বিতীয় উপসাগরীয় যুদ্ধের সময়ও কূটনৈতিক ভূমিকা পালন করেন।

১৯৯৯ সালে আরব নিউজের সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন। এরপর ২০০৩ সালে সৌদি আরবের সবচেয়ে জনপ্রিয় ও বহুল প্রচলিত পত্রিকা আল-ওয়াতানের সম্পাদক নিযুক্ত হন। তবে এই পদে তাঁকে বেশিদিন রাখা হয়নি। মাত্র দু'মাসের মধ্যে অপসারণ করা হয়। কিন্তু এই পদচ্যুতি তাঁর জন্য এমন কিছু সৌভাগ্য বয়ে আনে যা দেখে তাঁর অন্য সহকর্মীরা ঈর্ষান্বিত হন। আল-ওয়াতান থেকে অপসারিত হওয়ার পর আমির তুর্কি আল-ফয়সাল খাসোগজিকে নিজের সংবাদ বিষয়ক উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ দেন। তুর্কি লন্ডন ও ওয়াশিংটনে সৌদি রাষ্ট্রদূত থাকাকালে খাসোগজি এ দায়িত্ব পালন করেন।

এই সময় বিশ্বের শীর্ষ নেতাদের কাছে খাসোগজি সৌদি আরবের রাজনৈতিক ভূমিকা তুলে ধরার সুযোগ পান। সঙ্গে সঙ্গে সৌদি রাজপরিবার ও রাজনীতির সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। তুর্কি আল-ফয়সাল আগে সৌদি গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান ছিলেন। তাঁর সঙ্গে থেকে খাসোগজি অনেক তথ্য জানার সুযোগ পান। তাছাড়া বিশ্বে সৌদি আরবের রাজনৈতিক অবস্থান সৃষ্টিতে তিনি বিশেষ ভূমিকা পালন করেন।

২০০৭ সাল পর্যন্ত এই দায়িত্ব পালনের পর আরও বড় পরিসরে সাংবাদিকতার পেশায় ফিরে আসেন খাসোগজি। আবারও ওয়াতান পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হন। ২০০৮ সালে বাদশাহ আব্দুল্লাহর সঙ্গে লন্ডন সফরের সুযোগ পান। সেসময় ব্রিটেনের রানীর কাছে আব্দুল্লাহ খাসোগজিকে গুরুত্বপূর্ণ সৌদি সাংবাদিক বলে অভিহিত করেন। ওয়াতান পত্রিকায় মুক্তচিন্তার পক্ষে লেখালেখির কারণে তাঁকে তোপের মুখে পড়তে

হয়। ২০১০ সালে
ওয়াতান পত্রিকা থেকে তাকে আবারও অপসারণ করা হয়।
আল-হায়াত পত্রিকায় খাসোগজি মুহাম্মদ বিন সালমানের ভিশন ২০৩০ নিয়ে লেখালেখি করতে শুরু
করেন। সেসময় সৌদি আরবের পক্ষে বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে তাঁকে বিতর্কে অংশগ্রহণ করতে দেখা যায়। ইয়েমেন যুদ্ধসহ সৌদি আরবের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডকে তিনি তাঁর পেশাগত দক্ষতার মাধ্যমে সবার কাছে ইতিবাচকভাবে তুলে ধরেন।
পত্রিকায় লেখালেখির মাধ্যমে খাসোগজি নানা বিষয়ে তাঁর মতামত ব্যক্ত করতে শুরু করেন। কিছু লেখায়
ইখওয়ানুল মুসলিমিনের পক্ষে তাঁর সমর্থন পাওয়া যায়। অবশ্য ইখওয়ানের রাজনৈতিক মতাদর্শের তিনি বিরোধিতা করতেন।
২০১৭ সালের জুলাই মাসে ট্রাম্প আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর থেকে খাসোগজি সৌদি আরবের সঙ্গে ট্রাম্পের সম্পর্কের সমালোচনা করে লিখতে শুরু করেন। সেসময় সৌদি সরকার এ কথা ঘোষণা দিতে বাধ্য হয় যে, খাসোগজির সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই।
এভাবে সরকারের রোষানলে পড়তে শুরু করেন খাসোগজি। নয় মাস পর্যন্ত তাঁর লেখা প্রকাশ নিষিদ্ধ করে রাখা হয়। নয় মাস পর আবার তিনি ইখওয়ানের পক্ষে লিখেন। এই লেখা প্রকাশিত হওয়ার পর হায়াত পত্রিকার সম্পাদক খাসোগজির লেখা ছাপানো বন্ধ কর দিতে বাধ্য হন।
এরপর খাসোগজি কিছুদিন চুপ থাকেন। এরমধ্যে সৌদি সরকার আলেম, মানবাধিকার কর্মী ও সাংবাদিকদের গ্রেফতার শুরু করলে তিনি আমেরিকা চলে যান। সৌদি ত্যাগ করার বিষয়ে খাসোগজি বলেছিলেন, 'আমি আমার বাড়িঘর ও আমার পরিবারকে ছেড়ে এসেছি। এখন আমি উঁচু গলায় কথা বলতে পারব। চুপ থাকা মানে অপমান ছাড়া আর কিছু নয়। আমি এখন এমন জায়গায় এসেছি যেখান থেকে আমি কথা বলতে পারব। অনেকের পক্ষে তো তাও সম্ভব না।'
খাসোগজি তখন থেকে আমেরিকার পত্রিকায় লিখতে শুরু করেন। ২০১৭ সালের মার্চ মাসে দি গার্ডিয়ান পত্রিকায় প্রকাশিত রবার্ট লাইসির সঙ্গে যৌথভাবে লেখা একটি প্রবন্ধে
খাসোগজি মুহাম্মদ বিন সালমানের সংস্কারমূলক কাজের প্রশংসা করার সঙ্গে সঙ্গে এ কথা বলেন যে, যুবরাজের এতটুকু সাহস নেই যে তিনি তাঁর সংস্কারমূলক কাজের পদ্ধতি নিয়ে সৌদি আরবে কারও সঙ্গে আলোচনা করবেন। একই বছর নভেম্বর মাসে একটি লেখায় যুবরাজকে তিনি পুতিনের সঙ্গে তুলনা করেন। লেবাননের প্রধানমন্ত্রী সাদ আল-হারিরিকে রিয়াদে অবরুদ্ধ করে রাখার বিষয়েও সমালোচনা করেন। এভাবে খাসোগজি সৌদি সরকারের চক্ষুশূল এবং বহির্বিশ্বে জনপ্রিয় ব্যক্তিত্বে পরিণত হন। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তার অনুসারীর সংখ্যা প্রায় ১.৭ মিলিয়ন।
ইয়েমেন যুদ্ধে সৌদি আরবকে জোর সমর্থন দিয়েছিলেন খাসোগজি। সৌদি আরবের ভিশন ২০৩০-ও তুলে ধরেছেন পশ্চিমা বিশ্বের কাছে। একজন সমালোচক হলেও ভারসাম্যতা ছিল তাঁর অনন্য গুণ। সৌদি আরবের পক্ষে এমন অবস্থানও তাঁকে নিরাপত্তা দিতে পারেনি। যুবরাজের সমালোচনা করায় তাঁকে হুমকি দেয়া হয়। বাগে থেকেই বারবার তাঁকে দেশে ফেরার জন্য তাগিদ দেওয়া হতে থাকে। খাসোগজি জানান, আমাকে
আটক করা হবে না—এমন নিশ্চয়তা পেলেই আমি ফিরতে পারি।
গত ২ অক্টোবর খাসোগজি কিছু দরকারি কাগজপত্র সংগ্রহের জন্য তুরস্কে অবস্থিত সৌদি দূতাবাসের ভেতরে যান। এরপর সেখান থেকে তাঁকে আর বের হতে দেওয়া হয়নি। এখন পর্যন্ত খোঁজ মেলেনি তাঁর মরদেহেরও।

সূত্র : আন্তর্জাতিক বিভিন্ন গণমাধ্যম
আজিজ মুনতাসির : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র



ট্রাভেলগ : এ জার্নি টু কাতার

নাবিলা আফরোজ জান্নাত

এক

ঘড়িতে সময় দেখাচ্ছে রাত ৩:১৪। অথচ এখানে এখন বাজে ১২:১৪। আসার পর বারবার লোকেশন আপডেট দেওয়ার পরও সময়টা পরিবর্তন হচ্ছে না। থাক, প্রতিবার সময় দেখে যদি তিনঘণ্টা বিয়োগ করতেই না পারি, তাহলে কীসের ম্যাথে পড়ি আমি?

ঢাকা থেকে ফ্লাইট ছিল সকাল ৮:২৫-এ। এখানে পৌঁছেছি কাতার সময় ১১:৪০-এ, সেখান থেকে ভাইয়ার বাসায় আসতে আসতে বেলা প্রায় একটা। 'ভাইয়ার রুম' বলে অভ্যস্ত আমি। 'ভাইয়ার বাসা' টার্মটা এই প্রথম ব্যবহার করছি, এখানে এটা আসলেও ভাইয়ার বাসাই, সময় কী দ্রুত দৌড়াচ্ছে!

জার্নিটা ভালো ছিল, ফুড বাদে, খাওন-দাওনে টেস্ট পাইনি আমি। পারস্য উপসাগরের সবুজ পানি, মাছ ধরার সারি সারি নৌকা দেখতে দেখতে আর ভাইয়া-বাবার গল্প শুনতে শুনতে এয়ারপোর্ট থেকে আসার পথে অল্পস্বল্প শহর দেখা হলো। ট্যুরের পেছনের কারিগর ভাইয়া।

ফ্রেশ হয়ে খেতে বসলাম। দেখি, ভাইয়া-ভাবী আমার পছন্দের অ্যাপল জুস এনে রেখেছে। কোন ব্র্যান্ডের জুসটা পছন্দ করতাম, সেটা আমার মনে না থাকলেও ভাইয়ার মনে আছে! অজান্তেই প্রকাশ পেয়ে যাওয়া এইসব স্নেহে আমি আর্দ্র হই বারবার, বারবার...। তবে সেই ব্র্যান্ডের জুস কেনা যায়নি, কারণ অবরোধের জন্য

সৌদি থেকে ওটা আর আসে না কাতারে।
এরপর আরও কিছুক্ষণ সময় গেল, বেরুলাম সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটায়। হু, সন্ধ্যা-ই, পৌনে পাঁচটায় মাগরিবের আজান দিল।
ছন্নছাড়া এলোমেলো হাঁটার অভ্যাস আমার বেশ প্রিয়, বাংলাদেশে থাকলে সেটা রাতের বেলা সম্ভব হয় না। এখানে বেরুলামই সন্ধ্যায়। বাসা থেকে বের হয়ে ডানদিক থেকে শুরু করলাম, ঐ একবারই আমার দিক নির্দিষ্ট করা; তারপর কোথায় হাঁটি, কোথায় যাই–কিছু জানি না।
আসার আগে নিকাব পরার স্টাইল চেঞ্জ করে এসেছি, এই নিকাবে আরামসে খাওয়া যায়, আইসক্রিম খাই আর হেঁটে বেড়াই।
রাস্তার দুইধারের বিল্ডিংয়ের ডিজাইন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখা আমার পুরনো অভ্যেস, এখানেও রইলো সে। অধিকাংশ বাড়ির আর্কিটেকচার খুব সুন্দর, ফোর্টের মতো।
লাক্সারি ব্যাপারটা আজীবন আমার কাছে মজা নেওয়ার ব্যাপার, আর যা-ই হোক, লাক্সারি আমার সহ্য হয় না, এ আমাকে টানে না, আনন্দও দেয় না, শুধু ফান করার কিছু টপিক উপহার দেয়। বিশ্বের সবচেয়ে ধনী এই দেশের রাজধানীর রাস্তায় রাস্তায় লাক্সারি। আমি দেখি আর মজা নিই।
রাস্তার পাশের দোকানে সাজিয়ে রাখা জামার দাম ছয় হাজার রিয়াল। এর চেয়ে আকাশ দেখতে দেখতে হাঁটা আনন্দের, মনে হলো এই প্রথম যেন চিকন চাঁদ দেখলাম। আচ্ছা, চিকন চাঁদকে কীসের সঙ্গে যেন তুলনা করে? মনে পড়ছে না... কাস্তে?
মাঝে মাঝে তারা দেখা যাচ্ছে, খালি রাস্তার ফুটপাতে সোডিয়াম বাতির আলোর মতো আলোয় হাঁটতে হাঁটতে আমি বিষণ্ন হয়ে যাই, কোনো কারণ ছাড়াই। একে বলে অভিজাত বিষণ্নতা, এই লাক্সারিতে আমার কোনো আপত্তি নেই।
আমার বারবার সৌদি আরবের দিনগুলোর কথা মনে পড়ে যায়। সেই ছোট্টবেলার বিড়ালকাহিনি এখনো ভুলে যাইনি। সৌদির প্রতিবেশী এই আরবের বিড়ালগুলো দেখে আমি এদিক-সেদিক পালাই। এরা দেখতে আমাদের দেশি বিড়ালের মতো না একদম। ওখানেই সহ্য হয় না, আর ইনারা তো আরবের বিড়াল।
দু'টো মার্কেটের এ-মাথা ও-মাথা ঘুরে ফেললাম। লাক্সারি দেখি আর মজা পাই। উইন্ডো শপিং জিনিসটা আমার ধাতে নেই, কাজের জিনিস কিনতেই অন্যদের ঠেলি। তা-ও ভেবেছিলাম, যদি শপিং মলে গেলে অকারণ কেনাকাটা শুরু করি, সেটা নিজের কাছেই বিরক্তিকর হবে! নিজের মধ্যে দুইটা ক্যারেক্টার ঝগড়া শুরু করে দেবে। এর প্রতিকার দেশ থেকেই করে এসেছি। হ্যান্ডব্যাগে একটামাত্র বই ঢুকিয়েছি, বইয়ের নাম, 'রাসুলের চোখে দুনিয়া'।
একটা সিটি এক্সপ্লোর করতে পায়ের জোর লাগে খুব, আমার পায়ে আজ খুব জোর নেই। তা-ও হেঁটেছি, প্ল্যান ছিল ১২টা পর্যন্ত ঘুরব। মক্কার কথা মনে পড়ে, একা একা ঘুরে রাত দুইটায় হোটেলে ফিরেছিলাম, তখন আমি আরও ছোট, ২০১৪-এ। কী নিরাপদ এই শহরগুলো!
আজ পারছি না, পা ব্যথা করছে ভীষণ। আড়াই ঘণ্টায় এনার্জিতে লালবাতি জ্বলে গেল। আগের রাতে দেশে ঘুমিয়েছি তিনটারও পরে, সাড়ে চারটায় ঘুম ভেঙে গেছে। প্লেনে পাখার ওপর সিটে শো শো শব্দে ঘুমাইনি বেশিক্ষণ, দেড়-দুই ঘণ্টা। ভাইয়ার বাসায় এসেও ঘুমাইনি, আড়াই ঘণ্টা হেঁটে এসেছি, রাত ১২টা ক্রস করেছে, আমার ক্ষুধা লাগে না, ঘুমও আসছে না। ক্ষুধা না লাগলেও খাওয়া যায়, কিন্তু ঘুম না এলে কীভাবে ঘুমানো যায়, সেই পন্থা আমার জানা নেই।

দুই

বেলা ১১টার দিকে আজকে বৃষ্টি নামল। এখানে সচরাচর বৃষ্টি হয় না, আজ হলো। অনেক বাতাস, তার সঙ্গে ঝুম। বৃষ্টি আমার ভীষণ পছন্দ, তবুও এই বৃষ্টিতে কী যেন নেই, কী যেন নেই মনে হলো! যেটা বাংলাদেশের বৃষ্টিতে আছে। এই বৃষ্টি মোটেও দেশের বৃষ্টির মতো মনকাড়া না। মনকাড়া শব্দটা ঠিক মানাচ্ছে না, আবার রোমান্টিক শব্দটাও ব্যবহার করতে পারছি

না, রোমান্টিকের বাংলাটা দরকার, অভিধান দেখালো, 'ভাবোদ্রেককারী'। থাক, 'মনকাড়া'ই ভালো।
লাবান খাওয়া হলো আজ। দেশেরগুলো অনেক মিষ্টি আর তেমন ঘনও না। আরবেরগুলো মিস করতাম খুব। আমার পছন্দ।
বিকেলে বের হলাম। একটু দূরে যাওয়া হলো। একটা ছোটোখাটো পার্কমতন জায়গায় নামলাম। ওখানে কিছুক্ষণ ঘুরলাম, বেড়ালাম, দোলনায় দুললাম। বিভিন্ন জায়গায় পানি জমে আছে, বৃষ্টির, ঘাসগুলো ভেজা। একটা বিড়ালের ছবি তুলতে গেলাম, কিটকিট করে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। এরপর রাস্তার অন্য পারে কর্নিশে যাওয়ার পালা। সমুদ্রের পাশে একটু ঘোরাফেরার জায়গা, ওখানটার নামই কর্নিশ। রাস্তা পার হব বলে আন্ডারগ্রাউন্ডে নামছিলাম, নামছি তো নামছিই। মাটির নীচে তিনতলা পর্যন্ত নেমে একটা দরজা পাওয়া গেল। খুলে ঢুকতেই বিশাল কার পার্কিং লট এবং সেখানে কোনো গাড়ি দেখলাম না। মাইনাস তিনতলা, গমগম শব্দ হচ্ছে, বের হওয়ার রাস্তা আর খুঁজে পাই না। কোনো মানুষও নেই যে জিজ্ঞেস করব।
বিন্দাস লাগছিল কেমন যেন, অ্যারো সাইনগুলো ধরে এগুনো শুরু করলাম। লিফট দেখে এগোলাম, লেখা, 'আউট অফ সার্ভিস'। এবারে একটু ভয় ভয় লাগছে। আরও কিছুক্ষণ ঘোরার পর একজন লেবার আরবি-ইংলিশ মিলিয়ে রাস্তা দেখালেন, সেই মতো হেঁটেও খুঁজে পাই না, ঘুরতেই থাকলাম, তার আরও কিছুক্ষণ পর আরেক জনের ডিরেকশন অনুযায়ী রাস্তায় উঠে দেখি, যে পাশ থেকে নেমেছিলাম, সেই পাশেই উঠে এসেছি। বাহ!
এখন এখানের ওয়েদারটা বেশ আরামদায়ক, অল্প ঠাণ্ডা, অথচ ওখান থেকে বের হয়ে আবিষ্কার করলাম আমি ঘেমে গেছি।
এরপর রাস্তা পেরুতে গিয়ে মনে হলো এখনই মাগরিবের আজান দেবে, চলে গেলাম ফানারে। কাতার ইসলামিক কালচারাল সেন্টারকে ফানার বলে। ফানারের বিল্ডিংটা অনেক দূর থেকে দেখা যায়, ডিজাইনটা বেশ ইউনিক। অনেক কিছু আছে এখানে, লাইব্রেরি, মসজিদ, বিদেশিদের জন্য অ্যারাবিক স্পিকিং কোর্স, রিলিজিয়াস পাবলিকেশন্স। আজান দিচ্ছে আর আমি ইতিউতি তাকিয়ে মেয়েদের মসজিদ খুঁজছি দেখে সিকিউরিটি গার্ড ডেকে নিয়ে গেল ভেতরে। নামাজ শেষে বের হয়ে আসার সময় যতটুকু দেখা যায় দেখলাম।ভেতরে সুন্দর সুন্দর কাঠের বক্সে ফ্রি বুকস লেখা, বেশ কিছু ল্যাংগুয়েজের আছে, এর মধ্যে বাংলাও দেখলাম। ছবি তুলে এনেছি। গ্রাউন্ড ফ্লোরের দেয়ালগুলোয় অনেক কিছু লেখা, মাঝখানে কাঁচের বাক্সে কিছু মডেল রাখা, একটা বাক্সে ক্যালিগ্রাফি করার জিনিসপত্র সাজানো; সেগুলোর ছবিও তোলা হলো। ও হ্যাঁ, মসজিদে ছোটো বাচ্চার অ্যাঁ অ্যাঁ হি হি শুনে ভালো লাগল, তুরস্কের মসজিদের লেখাটার কথা মনে করে।
এরপর গেলাম কর্নিশে, হাঁটলাম অনেকক্ষণ, আমার পায়ে শক্তি নাই, তা-ও ২ ঘণ্টা কেটে গেল। ঝিনুকের আদলে বানানো ফোয়ারাটা সুন্দর লাগল আমার, ঠিকঠাকমতো ছবি তুলতে পারলাম না, মানুষজন নানানরকম পোজে ছবি তুলছে নিজেদের। এখানটায় অনেকেই বেড়াতে আসে, বসে থাকে, আমিও থাকলাম। বসে থাকলে একটা শব্দ একটু পর পর শোনা যায়, ইমোর রিংটোন। আকাশে অনেক মেঘ জমে আছে, দেখতে ভালো লাগছে, মাঝে মাঝে তারাদের দেখা যায়, একটা চিকন চাঁদ তো আছেই। আমি হাঁটি আর কী যেন একটা মিস করি, কী মিস করি, তা জানি না, কেন মিস করি, তারও কোনো লজিক খুঁজে পাই না।

তিন

আজকে খুব বেশি কিছু লেখার নেই। প্রতিদিনই অনেক লিখতে হবে এমন কোনো কথাও হয়তো নেই।
খুব বেশি ঘোরাঘুরি হয়নি আজ। সন্ধ্যায় বের হয়ে জারির বুকস্টোরে গেলাম। দু'টো ভাউচার ছিল ওখানকার। স্টোরটা দুইতলা। বাংলাদেশের চর্চা, বাতিঘর, বেঙ্গল বইয়ের

সঙ্গে পার্থক্য হলো, ওসব জায়গায় শুধু বই-ই পাওয়া যায়। আর জারিরের নামের সঙ্গেই লেখা আছে, নট জাস্ট অ্যা বুকস্টোর।
নিচতলা পুরোটা জুড়ে ইলেকট্রনিকস, ফোন, ট্যাব, ল্যাপটপ, নোটবুক, প্রিন্টার, হাবিজাবি, ব্যাগ, ব্যাকপ্যাক, ক্যালিগ্রাফি টুলস, ড্রয়িং টুলস, সিউইং টুলস, ক্রাফটিং টুলস, কী নাই! কিছু বইও ছিল, স্টেশনারি আইটেমও।
এই জিনিসগুলো যাঁর লাগবে, সে খুব সহজেই, অল্প সময়ে কিনে ফেলতে পারে এখান থেকে। অথচ নীলক্ষেতে এইসব কিনতে গেলে কী ঘুরা ঘুরতে হবে আল্লাহ মালুম!
এরপর দোতলায়, দুই ভাগে ভাগ করা, এক পাশে সব আরবি, আরেকপাশে সব ইংলিশ। আর মাঝখানে অন্যান্য জিনিসপত্র, খাতা, পেন্সিল, কলম, রঙ, ব্যাগ, স্টিকার, বাচ্চাদের জিনিসপত্র ইত্যাদি। এগুলো চোখের দেখা দেখে আমি ঢুকে গেলাম বইয়ের রাজ্যে। আহা, বই আর বই আর বই! ক্যাটাগরি করে করে রাখা। সব বই-ই অরিজিনাল কপি, একেকটার দামও একদম অরিজিনাল!
ফিকশন, নন-ফিকশন, ক্ল্যাসিক, অ্যাকাডেমিক, লার্নিং ফরেইন ল্যাংগুয়েজ, পাজলস, সুডোকো, ফটোগ্রাফি, কুকিং, বেস্ট সেলার, সেল্ফ ডেভেলপমেন্ট—সব আছে। থরে থরে সাজানো বই, পরিপাটি।
হাঁটতে হাঁটতে একদম শেষ মাথায় গিয়ে দেখি ইসলামিক বুকস সেকশন, সেলফগুলোর সামনে বসার টেবিল-চেয়ার রাখা, ঠিকমতো দেখাও যাচ্ছে না বইগুলো, একপাশের সেল্ফ খালি, এলোমেলো পলিথিন পড়ে আছে, বইগুলোও ঠিকঠাক নেই, নিচের তাকগুলোয় অযত্নে পড়ে আছে এবং সেই বইগুলোর দাম অন্যসব বইয়ের চেয়ে কম। তার থেকে আরও দূরে কোনো ক্যাটাগরি লেখা ছাড়াই সারি সারি বই মাটিতে রাখা, একটার উপর আরেকটা, সব ইসলামিক বই। কুরআন রাখা সেলফটা একটু গোছানো, তা-ও একদম শেষে। পুরো ব্যাপারটা এতোটাই অযত্নে, অবহেলায় অগোছালো হয়ে আছে যে আমি সেটুকু গুছিয়ে লিখতে পারছি না।
খুঁজে দেখলাম, আর কোনোকিছুই এরকমভাবে পড়ে নেই। কিছু বই নিলাম, ভাউচারের দাম ক্রস করলো। কী বই কিনেছি তা বলবো না, বইয়ের নাম বলার ক্ষেত্রে আমি খুবই কৃপণ।
তারপর আর কী! চলে আসলাম বাসায়।
নাহ, আজকেরটাকে পুরোপুরি ট্রাভেলগ বলা যায় না হয়তো, জারিরের রিভিউ বলা যায়।
ও হ্যাঁ, বিকেলে একটা সুন্দর ব্যাপার চোখে পড়ল। জানালার পাশে দাঁড়িয়ে ছিলাম। একজন মহিলা ড্রাইভ করছিলেন, কিন্তু সম্ভবত তিনি গাড়ি পেছনের দিকে নিয়ে কীভাবে পার্ক করতে হয় তা জানেন না অথবা এই বিষয়ে অদক্ষ। রাস্তার মাঝখানে তিনি দরজা খুলে নেমে গেলেন আর অন্যপাশ থেকে একজন লোক, হয়তো তাঁর স্বামী, বের হয়ে ড্রাইভিং সিটে বসলেন আর গাড়ি পার্ক করলেন। এটুকু সময়ের মধ্যে রাস্তায় বেশ কিছু গাড়ি জমে গেল। কিন্তু কেউই চিৎকার করল না, 'ঐ মিয়া, রাস্তার মাঝখানে গাড়ি থামাইসেন কেন? এ্যাহ, মাইয়া মানুষ হয়ে গাড়ি চালাইতে আইছে, জানে না কিছু!' উলটো আরও পার্ক করার সময় জায়গা করে দিল। এখানকার ট্রাফিক সিস্টেম সবসময়ই ভালো লেগেছে আমার।
আমার শিওর হয়ে বলতে ইচ্ছে করছে, এই লোক কখনোই তাঁর স্ত্রীকে একথা বলবে না, 'এ্যাঁহ, গাড়িটাও তো পার্ক করতে পার না ঠিকমতো', বরং হাতে ধরে তাঁকে শিখিয়ে দেবে, যেমন করে সে প্রয়োজনে রান্নাটা অথবা বাচ্চা সামলানোটা স্ত্রীর কাছ থেকে শিখে নেয়।
এ রকম বাংলাদেশেও হোক, জগতের সমস্ত পুরুষ এইভাবে অর্ধাঙ্গিনী হিসেবে স্ত্রীদের ট্রিট করুক।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)



(ছোটগল্প)

তখন অনন্ত ঘুমের তরে গল্পের রঙ ঝিলমিল

সালমান সাদ

আমি লঞ্চডুবিতে মারা যাব।

খুব মৃত্যুভাবনা হয়। আমি হয়তো আজকাল যেকোনো সময় টুপ করে খুব নীরব কোনো এক দুপুরে মিলিয়ে যাব ভোরের শিশির লাগা মাকড়সার জাল যেমন মিলিয়ে যায় হাওয়ায়। ভয়ের কথা, মৃত্যুর আগেই নাকি মানুষের মনে হতে থাকে যে, সে মারা যাবে মারা যাবে...।

লঞ্চে আমাকে উঠতেই হবে, ফিরতে হলে আমাকে জলের স্মরণ নিতেই যে হবে, আমি সাঁতার না জানা শহুরে, আরও শঙ্কার কথা, আমার অবচেতনে প্রায়ই গুঞ্জরিত হয়, আমি লঞ্চডুবিতে মারা যাব।

দ্বিতীয় তলার ডেক পর্যন্ত পানিতে তলিয়ে যাচ্ছে,আমি কোথায় বের হব কোথায় পালাব এই অফুরন্ত জলের রাজ্যে, পানির প্রকাণ্ড চাপ আমাকে গিলে নিচ্ছে, শ্যাওলাগন্ধী নিবিড় অন্ধকার আমি প্রায়ই স্বপ্নে দেখি।

আমার ভাবনা শুনে মিলু ভাই অট্ট হাসলেন এবং অন্যদের হাসালেন। মিজু ভাই কপট ফিসফাস করে বলে গোপন কথার ভঙ্গিতে, 'নদী কিন্তু সবার কথা কান পেতে শোনে। কোনো কথা যদি হঠাৎ সে কবুল করে ফেলে!'

কুয়াকাটা এসে বন্ধু জুটে গেছে কয়েকজন। মিলুদা এদের মধ্যে রীতিমতো গুরু বনেছেন–আমরা, বাচ্চা বাচ্চা তরুণপালের বড়ভাই বনে যেতে অন্য সবার তুলনায় তার ভার-ভারিক্কি চেহারা, আর গলার স্বরের প্রাপ্তবয়স্কতা, তবুও বড়াই বড়ত্বের সবকিছুই তার ভেতর বহাল তবিয়তে বর্তমান। বললেন, 'এই ভরা শীতের মৌসুমে, নদী যখন ক্ষীরের মতো জমে যাচ্ছে, কমে যাচ্ছে, দুইপাড়ে পানির স্তর বাঁধের দেয়ালের শেষ ইট ছাড়িয়েও ক্রমেই নিচে নামছে নিচে নামছে, লঞ্চ যখন প্রায়ই চরে আটকাচ্ছে জলের অভাবে, এই সময়ে তুই কিনা মরবি জলে ডুবে!'

অন্যেরাও তাল ধরে সায় দেয়, এই মৌসুমে লঞ্চ কি, কোনো কোষা নৌকাও ডুবতে কখনো শোনেনি তারা কেউ।
আকাশ কুসুম বাজে কল্পনা, দুচ্ছাই, বিরক্ত মাহি গিটারে টুংটাং শুরু করতেই অন্য একটা পরিবেশ রঙ চড়িয়ে ফেলল আমাদের আয়েশি মজমায়, কুয়াকাটার সমুদ্রতীরে, এই হেমন্তের মায়াবী সন্ধ্যায়।
এই এখন, কবিতার পেছনে ছোটার তুমুল ব্যস্ততা, নদীর সঙ্গে, পানির নীলাভ সাদা ফুলের সঙ্গে, নির্জন তীরে বাঁধা পুরনো নৌকার সঙ্গে, ধানশালিক-দোয়েলের সাদাকালো হলুদ রঙের সঙ্গে, যখন-তখন বেরিয়ে পড়ার মধ্যে মৃত্যু নিয়ে মনখারাপ অভিমানের ফুরসত কোথায়!
অদ্ভুত এক নির্লিপ্ততা, গরুর চোখের মতো অবুঝ সরল চাহনিতে জীবন চেয়ে আছে আমার দিকে।

দুই

ঘুম যখন ভাঙল, দেখি মাথার ওপর কারুকাজ করা সিলিং, এসি সুড়সুড় করে হাওয়া দিচ্ছে, আমার গায়ে দারুণ ওম ভরা একটি কম্বল, মাথার নিচে বালিশ নয় ওটা, যেন একদলা তুলার মাখন, নীলচে একটা আলো-আঁধারি, জানালা দিয়ে জোসনা ঢুকে ফুলঝুরি সাজিয়েছে মেঝেতে।
কোথায় এলাম আমি! কুয়াকাটায় আমরা ক্যাম্পেইন করেছিলাম, সাদামাটা এক তাঁবু থেকে আমি এ কোথায় এলাম, কীভাবে এলাম, কী আশ্চর্য, স্বপ্ন নাকি ভোজবাজি! দেয়ালে কান পেতে শুনতে পেলাম কেমন একটা গমগম শব্দ হচ্ছে, ততক্ষণে ঘুমের ঘোর কেটে সজাগ হলাম। উঠে বসলাম। দেখি পাশের খাটে মিলুদা জাগ্রত, শুয়ে আছে, ডানের ওপর বাঁ পা-টা তোলা, স্মার্টফোনের ঝাপসা আলোয় মুখ আবছা। জানালা দিয়ে দেখি মরা নদীর পানি ঝিকমিক করছে পূর্ণ চাঁদের আলোয়, এটা কোনো জলযান, জলরাশি কেটে ছুটছে।
মনে পড়ল, ফেরার দিন আমি চেয়েছিলাম ঘুরপথে সড়কপথে ঢাকা ফিরব। হাত কচলে মাথা চুলকে আমতা আমতা বলেছিলাম,
'আমি আজ ঢাকা যাব না ।'
'কেন রে?'
'ভয় করছে।'
প্রস্তাব শুনতেই সবাই হইহই করে উঠল, 'একসঙ্গে এসেছি, ট্যুর করেছি, একসঙ্গেই সবাই আনন্দ করতে করতে ফিরব, মাঝখানে একজন আলাদা হলে উল্লাসের রেশ শেষ হওয়ার আগেই শেষ হয়ে যাবে, তাও নিতান্তই অবান্তর এক ভাবনার কারণে, অসম্ভব!'
এমন সময় যেই ঘটনাটি ঘটল, মাহদি হাসতে হাসতে, আমার ব্যাগপত্র হেঁচকা টানে তুলে নিল ওর কাঁধে, ওদের সঙ্গে লঞ্চযাত্রা নিশ্চিত করতে, আমার কী হলো, দেখি ও মাটিতে বসে কোঁকাচ্ছে, ভূতগ্রস্তের মতো ঠাস করে কখন একটা চড় বসিয়ে দিয়েছি, জানি না। ঘাটে আশপাশে লোকেরা এসে আমাকে ধরল, বন্ধুরা সবাই মাহদির দিকে ছুটে গেল আমার দিকে অবিশ্বাস ভরা দৃষ্টিতে তাকাতে তাকাতে। কী বিব্রতকর পরিস্থিতি। লজ্জায় ঘেমে যাচ্ছি। সবাই কেমন দূরে সরে আছে। আড়চোখে তাকাচ্ছে কি তাকাচ্ছে না। নিজেকে কেমন নিঃস্ব, ভরপুর লোকারণ্যেও কেমন নিঃসঙ্গ লাগছিল।
ভাগ্যিস কি খোদার কুদরত, সুবন্ত ভাই তাঁর দারুণ নেতৃত্বগুণে–আমি চমকে মুগ্ধ হয়েছিলাম সেদিন–পুরো পরিস্থিতি আগের মতো স্বাভাবিক করে ফেলার ক্ষমতা দক্ষতায়।
সেদিনের মতো আমাদের যাত্রা স্থগিত হলো, কুয়াকাটা ভ্রমণে আরেকটি সুন্দর, এমনকি অন্যসব দিনের চেয়েও মনে হয় উপভোগ্য একটি দিন যুক্ত হলো।
'একসঙ্গে কেবিন নিয়েছি, ভাবলাম, তোকে নিয়ে সাঁতরাব নদীতে, কই তোর লঞ্চ তো ডুবলো না, ঢাকা সদরঘাট এসে গেল প্রায়, দেখ বুড়িগঙ্গার দ্বিতীয় সেতু পার হচ্ছি আমরা।'
'আমি এখানে এলাম কীভাবে! কখন কী ঘটল?'
সুবন্ত'দা খাট থেকে নেমে জুতোজোড়া পায়ে দিতে দিতে বললেন, 'আসতি তো না। নিয়ে আসতে হলো। রাতে খোলা সমুদ্রের প্রান্তরেখায় বারবিকিউ পার্টির পর সেই যে

ঘুমোলি, আসলে জানিস কি, আমি তো ফার্মাসিস্ট, কিছু তুকতাক আর শেকড়বাকড়ের রস সবসময় সঙ্গে থাকে আমার প্রাথমিক চিকিৎসা-থলিতে, সবাই সে রাতে ঘুমিয়ে গেলে পর একটু ক্লোরোফর্ম তোর নাকের কাছে ডলে দিলাম, সেই এক ডলায় জাগলি এসে ঢাকায়।'
আমি বজ্রাহতের মত থ হয়ে রইলাম। কেমন রাগ হতে লাগল। কিন্তু সেই রাগ কেন কার ওপর তাও আন্দাজ করতে না পেরে অব্যক্ত একটা জিদে কথা সরে না মুখে, সুবন্ত ভাই চোখ টিপ দিয়ে বললেন, 'আমার গা জ্বলে গেল যেন, নে সব গোজগাছ করে ছাদে আয়, দেখবি কী বাতাস, ভাসিয়ে নেবে যেন, সবাই আছে।'
এই লোকটার কি মানুষের মানসিক পরিস্থিতি-বিচার করে কথা বলার জ্ঞানটুকুও নেই! তবুও, লোহার পেরেকের জং ধরা ধারালো মাথার মতো একটা দুর্ভাবনা মগজে খোঁচা দিচ্ছিল বারবার। হঠাৎ খুব শান্তি শান্তি লাগতে থাকে। কেমন কৃতজ্ঞ বোধ করি মিলুদার প্রতি, ঘুমে ঘুমে সুস্থিরভাবে ফেরাটা হলো, আমার উদ্ভট পাগলামিটা তারা কী ধৈর্যের সঙ্গে বহন করে দারুণ এক মোলায়েম কৌশলে আমার ভয়কে জয় করালেন। কিসের মৃত্যু আর কিসের লঞ্চ ডোবা! কী নির্বোধ প্রশান্ত এক নদী, তিরতির করে বয়ে যাচ্ছে, রৌদ্রের আলোয় ঝিকমিক করে সুবোধ জল, লঞ্চের সঙ্গে খেলতে খেলতে ঢাকার পথে যাচ্ছে মৃদু মৃদু ঢেউ, একটু দূরেই দুইপাশে দেখা যাচ্ছে তীর, শ্যামল গ্রাম, ধানক্ষেত, ইটভাটা, কলকারখানা, শহর। ব্যাগপত্র হাতে-কাঁধে গুছিয়ে লঞ্চের ছাদে উঠে আসতেই সবাই বলে উঠল, 'কী, মরলে না তো!'
আমি দারুণ হেসে উঠলাম। মুখে ঝুলে রইল টুকরো লজ্জা। ছাদে একটি অচেনা মেয়ে ওদের সঙ্গে, আমি আগে দেখিনি, হয়তো লঞ্চেই কোনোভাবে কারও সঙ্গে পরিচয় হয়ে এখানে বা নেহাতই অপরিচিত মেয়ে কোনো, ছাদে হাওয়া নিচ্ছিল, অতি মায়াবতী, মন্তব্য করে লাজুক বাচ্চাটির মতো ঘাড় ফেরালো–এত সুন্দর যার হাসি, এই হাসির মায়ায় তো মালাকুল মওতও ভুলে যাবে তাঁর জান কবজের দায়িত্ব!
আমার সবকিছু ভালো লাগছিল। সবকিছু কত প্রাঞ্জল, জীবনের এত এত সৌন্দর্য! সব না দেখে আমি মরব না, নিশ্চিত।
ঘাটের সঙ্গে লঞ্চের মাথাটা আস্তে একটা গোঁত্তা মেরে থেমে গেল। চূড়ান্তই, শেষ হলো আমাদের কুয়াকাটা ভ্রমণ। এখন যে যার পথে যাবে, সবাই পরস্পর বিদায়ের ভদ্রতা সারছে। এক ফাঁকে দেখলাম মিলুদার মুখটি অন্ধকার। জিজ্ঞেস করাতে চিন্তিত কণ্ঠে জানালেন, হ্যান্ডব্যাগটা তার খুঁজে পাচ্ছেন না। হেথায় খুঁজে হোথায় খুঁজে সারা লঞ্চ, চট করে একজনের মনে পড়ল, ফতুল্লা ঘাটে কিছুক্ষণ লঞ্চ থামালে সবাই নেমেছিল, এক চা-সিগ্রেটের দোকানে ভুলে কি তার হ্যান্ডব্যাগ ফেলে এসেছেন মিলুদা?
সেই ব্যাগে আমারও দুটো স্মার্টফোন, হেডফোন, চার্জার, সেই ফোনে ছ'হাজার টাকা, আর আসছে বইমেলায় প্রকাশিতব্য গল্পগ্রন্থটির চূড়ান্ত পাণ্ডুলিপি। সেইসময় ঘাটে একটা লঞ্চ শেষ ভেঁপু বাজাচ্ছিল, নোঙর তোলার প্রস্তুতি নিচ্ছিল খালাসিরা, টিকিটমাস্টার শেষ সময়ের হাঁকডাকের ফর্মালিটি সারছিলেন, ফতুল্লা ঘাট হয়ে পটুয়াখালী যাবে এই লঞ্চটি।
মিলুদার সঙ্গে আমিও ফতুল্লা যেতে চাইলাম, পাণ্ডুলিপি ও ফোনের ব্যাপার তো রইলই, তাছাড়া আমি লঞ্চভীতি ও সন্দেহের রেশ সদ্য কাটিয়ে ওঠা; সেইসঙ্গে একটা বিশ্বাস, একটা উপভোগ্য নদীযাত্রা হোক।
হাজার হাজার লঞ্চ দৈনিক যাওয়া আসা করে নদীপথে, কালেভদ্র কখনো–ওসব সড়কপথেও হয়–বাদে লঞ্চে যে কিছুই হয় না, এই সাধারণ বোধটা অবচেতনে স্থির করার একটা রোখ চেপেছে, মিলুদা সবাইকে বিদায় দিয়ে পুনর্বার লঞ্চে উঠলে আমিও তার সঙ্গ নিলাম, ফতুল্লা পর্যন্ত আরেকটি নদীযাত্রায় থাকি।
'ধুস!' মিলুদা ঘাড়ে একটা চাটি মারলেন, এতক্ষণ পেছনে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন খসখস করে কী লিখছি খাতায়। কবিতা কীভাবে তৈরি হয়, কেমন দেখায় তখন শুদ্ধতম কবির

মুখ—আমরা দেখতে চাই উনি যখন কবিতা লিখেন, তখন বুঝি দেখতে দেন বড়! লেখাটা এখানে আপাতত বন্ধ রাখি, মিলুদা আমাকে টিকিট কাটার জন্য পাঠাচ্ছে, নির্ধারিত আসন নিশ্চিতও করতে হবে।

তিন

লঞ্চ ছেড়ে দিয়েছে। বলে না, মাটির মানুষ? কথাটার শেকড় কত গভীরে, টের পাওয়া যায়, যখন মাটি থেকে মানুষের দূরত্ব বাড়তে থাকে। মাটি ও মাটির ওপরে গড়া শহর, মানুষ যত দূরে সরতে থাকে, কেমন এক অসহায় বিচ্ছেদবোধ ক্রমেই গ্রাস করে নিতে থাকে। লঞ্চের এখানে ওখানে লোকেরা নিজেরা নিজেরা জটলা করে নিজেদের বলয় বানিয়ে বসে আছে, গল্পস্বল্প করছে, খাচ্ছে, একটি বিছানো তোষকে স্বামী-স্ত্রী মুখোমুখি বসে লুডুস্টার গেমস খেলছে মোবাইলে, কত রঙের জীবন, এদের সবারই জীবনের গল্প কত বৈচিত্র, আমার মনে চায়, সমস্ত মানুষের আলাদা আলাদা জীবনগুলো, তাদের নানান বর্ণের গল্পের জগতগুলোতে নিবিড় করে দীর্ঘ সময় নিয়ে, প্রাণমূলের স্পর্শ ছুঁয়ে ছুঁয়েও বেড়িয়ে আসি।

এসব দেখেটেখে এসে আসনে ফিরে কখন ঘুমিয়ে পড়লাম, ঘুম ভাঙল মৃদু দুলুনির ঝাঁকিতে। প্রচণ্ড ভয়ে থরথর করে কাঁপা বৃদ্ধের দেহের মতো কাঁপছে লঞ্চটি। মামুলি ব্যাপার। এমন ঝাঁকুনি কিছু তো হয়ই। ভয়ের কোনো কারণ নাই। আমি জানি একটুপরই স্বাভাবিক হয়ে যাবে সব। এই তো আর বিশ গজ দূরেই দেখা যাচ্ছে লঞ্চঘাট, মাটি, শহর, শত শত মানুষ দাঁড়িয়ে আছে, লঞ্চ ঘাটে ভিড়লেই উঠে পড়বে সঙ্গেসঙ্গে, দেরি করলে জায়গা পাওয়া যাবে না।

চার

এখানেই, গল্পের এই পর্যায়েই হয়তো গল্পটার শেষ, হয়তোবা শুরু। গল্পের এই পর্বে এসে পাঠকের জ্ঞাতার্থে একটি জরুরি খবর বলছি যে, গল্পের তৃতীয় পরিচ্ছেদেই আপনাদের সবার অগোচরে লেখকের নীরব বদল ঘটে গেছে। গল্পের বাকি শব্দমালা বসছে অন্য কারও কলমে, অন্য কারও খাতায়। লেখকের জবানেই লেখকের একটুও নিজস্বতা ঢালছি না—লেখকের বাকি গল্পটা বলছিলাম আমি জীবনানন্দ দাশ, লেখক যাকে আপনাদের সঙ্গে আগেই পরিচয় করিয়ে দিয়ে গেছেন মিলুদা বলে। গল্পের প্রথম ও দ্বিতীয় পরিচ্ছদটুকুর পর দীর্ঘ একবছর তাতে আর কোনো অক্ষরপাত হয়নি।

আমি এই গল্পের প্রথম দুই অংশ পেয়েছিলাম সালমান সাদের স্পঞ্জের মতো ফুলে ভেসে ওঠা লাশের সঙ্গে, পলিথিনে মোড়া একটা খাতায়, বুকের কাছটি থেকে। এখন ১০ বছর পর গল্পের বাকি অংশ লিখিত হলো, পুরনো ট্রাঙ্ক ঝাড়পোছ করতে গিয়ে পাই জীর্ণ পলিথিনে মোড়া এই খাতাটি, হঠাৎ স্মৃতিকাতর হয়ে পড়ি এবং আশ্চর্য হয়ে লক্ষ করি, আজই লেখকের দশম মৃত্যুবার্ষিকী; গত ১০টি বছর সে আমার মনেই ছিল না।

লিখলাম, একজন গুমনাম গল্পকথকের একটি অন্তত কাজ তাঁর হয়ে অমর থাকুক।

নগরবাসী সেদিনের পত্রিকায় অদ্ভুত যেই সংবাদটি পড়েন, তা পিলে চমকে দেয়। ফতুল্লা ঘাটের মাত্র ২০ গজ দূরে, লঞ্চের গতি যখন থামো থামো, ততোমধ্যে অনেক যাত্রী নৌকা করে নেমেও গেছে, কেউ জানে না কী কারণে হঠাৎই গাঙচিল-৭ লঞ্চটি ডান কাত হয়ে উলটে পড়ে। অদ্ভুত ব্যাপার হলো সেই লঞ্চের একটি যাত্রীও বাঁচতে পারেনি। শুধু একমাত্র আমি বেঁচে ফিরতে পেরেছিলাম, কে জানে, হয়তো গল্পের সমাপ্তিটুকু টানবার জন্যই, অসমাপ্ত গল্পের পাণ্ডুলিপি বহনের জন্যই।

জগতে কত অদ্ভুত কিছুই তো ঘটে। মানুষের আর কতটুক সাধ্যি, প্রকৃতির রহস্য কোন মন্ত্রে সে খুলবে?

সালমান সাদ : ১৫৬, ডাক্তারগলি, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

(নস্টালজিয়া)

শীতের শৈশব

মুনশি মুহাম্মদ উবাইদুল্লাহ

মাঘের প্রথম সপ্তাহ। বাইরে প্রচণ্ড শীত। সঙ্গে হাড়কাঁপানো ঠাণ্ডা। অনেকটা কুয়াশাচ্ছন্ন আশপাশ। আবছা লাগছে কাছের পৃথিবীটাও। চোখের সীমানায় কুয়াশাভরা ধবধবে মঞ্চ। যেনো তুষারে ঢাকা গাঁ। রাতটি ভর শিশিরের টুপটাপ ছন্দ। টিনের চাল বেয়ে নেমে আসছে শিশিরফোঁটা। এ এক অনিমেষ সৌন্দর্যের সৃষ্টি যেনো। রাস্তার ধারে ফুটে থাকা নাম না জানা ফুলের পাপড়ি; তার ভেতর কী এক রূপের ছোঁয়া! আল্পনা এক মুগ্ধতার। যেনো সারারাত ধরে শিশিরের সঙ্গে করেছে মাখামাখি। ক্লান্ত মনে তাই এখন জড়োসড়ো। প্রকৃতিজুড়ে দারুণ এক ছন্দ তুলেছে শীত। যেনো কল্পনার এক ধূয়াশা, স্বপ্নময় কোনো রাতের অভিনব খেলা। যেখানে কোনো ডানায় ভর করে ঘুরে বেড়িয়েছি; সুনীল আকাশে বিজন প্রান্তরে কিংবা গোধূলি বিকেলে, বেপরোয়া বনে, পথে পথে ফিরেছি।

খুব মনে পড়ছে আজ হারিয়ে যাওয়া সেই দিনগুলির কথা। সরিষা ক্ষেতের আল ধরে বহুদূর পথচলা, সূর্যমূখীবনে লুকোচুরি খেলা, রসের-চিতই নিয়ে কাড়াকাড়ি, ভোরের নরম রোদে মাদুর পেতে বই পড়া– আজ কেবল স্মৃতি। এ যেনো আমার জীবনকাব্যের দেয়ালে টাঙানো ছবির মতো মায়াময়, অনাদরে পড়ে থাকা এক সৌন্দর্য। দিবানিশি খুঁজে ফিরি অতীতের সেই নস্টালজিয়া মুহূর্ত, পলক; খুঁজি অন্তরে, অনুভবে– হিম কুয়াশায় শিশিরফোঁটায় কিংবা লজ্জায় আড়ষ্ট হয়ে থাকা শীতফুলের পাপড়িতে। কিন্তু অতীত তো অতীতই। বাস্তবতা থেকে শতো ক্রোশ দূরের কোনো ফ্রেম। ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না। তবে অনুভব করা যায় সেই অধরাকে।

প্রতি বছরই শীত আসে। যায় এসে যায়। শীতের আমেজে তবু মন চায় খুব খুব শৈশবে হারিয়ে যেতে, হাড়কাঁপানো ঠাণ্ডায় মায়ের কোলে মুখ গুঁজে বসে থাকতে কিংবা ঘাসের ডগা থেকে শিশিরফোঁটা তুলে ঠোঁটে মেখে দিতে, বাবার মাংসল হাতে হাত রেখে এলেবেলে পদক্ষেপে বহু পথ চলতে, লাল-হলুদের ফুল-বিথীকায় হারিয়ে যেতে। কিন্তু না, আর আসে না সেই অতীত।

রোজ সূর্য হাসে, জানালায় দাঁড়িয়ে, দিবসের ছুটি ঘোষণা করে। কিন্তু শৈশবের সেই দৌড়ঝাঁপ করা বিকেল আর আসে না। অন্তর সিক্ত করে না আর এই ভোরের শিশির। মুগ্ধ করে না আর এই ফুলের গন্ধ। ভোরের পাখির মধুর কণ্ঠ আজ কেনো যেনো বড়ো বিষাদ লাগে। খানিকটা পরেই হয়তো কুয়াশার চাদর ফেঁড়ে উঁকি দেবে সোনালি আভা। শিশিরের ফোঁটাগুলি কোমল আলোয় চকচক করে এক নৈস্বর্গ সৃষ্টি করবে। কিন্তু আমার হৃদয়-অলিন্দে পড়ে থাকবে কেবল সেই অধরা শৈশব।

মুনশি মুহাম্মদ উবাইদুল্লাহ : শিক্ষক, আল জামিআতুল ইসলামিয়া ইসলামপুর (ভবানিপুর মাদরাসা), গোপালগঞ্জ



(সিরাতগল্প)

পাখির স্বর্গীয় দৃষ্টিপাত

যিয়াদ বিন সাঈদ

এক

আরে, এ পাখিটা তো বড় দুষ্ট! অকস্মাৎ কোত্থেকে উড়ে এল, চোখের পলকে মোজাটি নিয়ে আবার উড়েও গেল। চলে গেলো নাগালের বাইরে। সীমানা পেরিয়ে সেই অনেক দূরে চলে গিয়ে যেন করতে চাইল তুমুল আনন্দ। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিরুপায় ভঙ্গিতে পাখির এ উড়ে আসা আবার মোজাজোড়া নিয়ে হুটহাট চলে যাওয়ার দৃশ্য দেখতে থাকলেন। এ ছাড়া আর কী-ইবা করতে পারবেন এ মহামানুষটি! এমনই এক অনাহূত সময়ে পাখিটির ডানামেলা ছন্দ থেকে একটুখানি আনন্দ আর ইন্দ্রের পরিতোষ খোঁজ করা ছাড়া আর কিছুই হয়তো তাঁর করার নেই।

কিন্তু এরই মধ্যে রাসুলের মনে সৃষ্টি হলো নানাবিধ কৌতূহল। পাখিটা যে এই দিকটা থেকে আর কোথাও চলে যাচ্ছে না! ক্ষুদ্রতম একটি বৃত্তের ভেতর লক্ষ্যহীন ওড়াউড়ি আর অস্বাভাবিক আচরণ রাসুলকে মনযোগী করে তুলল। তার চোখে এমনই এক পরিপ্রেক্ষিত হয়ে উঠল

আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু।

অভিনয়মঞ্চের সম্মুখে সুপ্রসন্ন অডিয়েন্সের ভেতর দিয়ে একপাটি মোজা কামড়ে ধরে পাখিটি একবার এপাশে মেলছে ডানা অন্যবার খুঁজে খুঁজে ফিরে যাচ্ছে অপর পাশে। সমুন্নত আকাশের চৌহদ্দির মধ্যে ডানামেলা সালওয়া হয়ে করে দেখাচ্ছে তার নৃত্যের সব কলাকৌশল। একবারের জন্যেও দৃষ্টির আড়াল হচ্ছে না। আবার হাতের নাগালে চলেও আসছে না। উপরে চলে যাচ্ছে না এতো, যেখানে দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসে। দেখে মনে হচ্ছে মোজার ভেতর থেকে পাখিটি কী যেন ফেলে দিতে চাইছে। ঠোঁটে চাপড়ে ধরে ঝাঁকুনি দিচ্ছে সজোরে। মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাখিটির এরকম কাজে ক্রমশই কৌতূহলী হয়ে উঠলেন। পর্যবেক্ষণ করতে থাকলেন তার পাশে থাকা সহচর হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। নিষ্পলক নেত্রে তিনিও তাকিয়ে আছেন পাখির দিকে। অন্যরকম মোহ আর ভিন্ন এক সম্মোহনে তিনিও জড়িয়ে গেলেন রাসুলের মতো অদ্ভুত মুগ্ধতায়। চোখের পলক যেন পড়ে না। নড়ে ওঠে না তাদের চোখের পাপড়িগুলো।

দুই

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের চিরন্তন আদত ছিল, যখনই তিনি প্রাকৃতিক প্রয়োজনের অনুভব করতেন, লোকালয় ছেড়ে অনেক দূরে চলে যেতেন। পাখির ওড়াউড়ির এ দিনেও এমনই হলো। তিনি চললেন। তার পেছনে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। একান্ত সন্তর্পণে একটি গাছের নিচে মোজাজোড়া খুলে মাটিতে রাখলেন নবিজি। তারপর হাজত সরে যখনই গাছের কাছে আসলেন, নবিজির এবং হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের চোখে গোচরিত হলো এই অবাকদৃশ্য। পাখিটি তো নবিজির একটি মোজা নিয়েই উড়ে গেছে।

কিন্তু এর কিছু সময় পরেই যখন দেখা গেল পাখিটির সজোর ঝাঁকুনির তীব্রতায় মোজাটির ভেতর থেকে কী যেন পড়ল। শব্দ হলো একটু। ভীত পদক্ষেপে সামনে এগিয়ে এলে দেখা গেল হিংস্র ছোবল তুলে ফনা ধরে রেখেছে একটি সাপ। সাপটির চোখে-মুখে অসহ্য আক্রোশ আর রাগের ফোঁসফোঁস চিত্র। আকারে ছোটো হলেও যেন বেশ সতেজ এই সাপটি। এক্ষুণিই তেড়েমেড়ে ছুটে আসবে। খুব রাগের ভঙ্গিমায়।

সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস এবং নবিজি চমকে গিয়ে শুধু দেখতে থাকলেন সাপটিকে ঝেড়ে ফেলে পাখিটির চলে যাওয়া। তাঁরা জানেন না হয়তো, কোত্থেকে এলো এই হলদে ডানার পাখিটি। বনি ইসরাইলের মতোই কি এ ডানামেলা সালওয়া? কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা নিয়ে তাঁরা তাকিয়ে রইলেন কেবল পাখির দিকে। উড়তে উড়তে সে চলে গেল সেই কোথায়– চোখের সীমানা পেরিয়ে অনেক অনেক দূরে।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের দিকে একটু ঘুরে শুধু এতটুকু বললেন, 'এ তো আমার রবের পক্ষ থেকে এক বড় এহসান, হে ইবনে আব্বাস!'

যিয়াদ বিন সাঈদ, মাদরাসাতুল কাউসার ঢাকা'র শিক্ষার্থী



(সালতামামি)

জীবনের কষ্টনীল খসড়া

হাসিব ইমতিয়াজ

টেবিলের ওপর নির্বিকার ঝুলে থাকা ক্যালেন্ডারের রঙিন পাতার বিন্দু বিন্দু ঘরগুলো ঘুরে ঘুরে জীবনের ধূসর পৃষ্ঠা থেকে মুছে গেল একটি বছর যেন-বা মৃত্যুর পথে আরও এক ধাপ এগিয়ে যাওয়া। প্রতীক্ষিত অনন্তকাল, মহাকালের গর্ভে বিলীন হয়ে যাওয়া সময় কত দ্রুত ফুরিয়ে যায়। আনন্দ-বেদনা, হাসি-কান্না, নিভৃতে হারিয়ে যাওয়া স্মৃতির কোলাহল আর মুগ্ধতায় ভরপুর এইসব প্রহর জীবনে আর ফিরবে না।

কোথাকার একটু ঘোমট কান্না কিংবা দুপুরের বাতাসে নিঃশব্দে মিশে যাওয়া দীর্ঘশ্বাস আরও কত কী ছিল এই দিনগুলোতে; তবু সারাটি বছর বুকের ভেতর গুমড়ে কেঁদেছে কেউ না থাকার করুণ হাহাকার। বিস্ময়ে দেখেছি, প্রাপ্তির বদলে অপ্রাপ্তির রেখাই চোখের তারায় দীপ্ত প্রতিক্ষণ। ফিরে ফিরে আসা কষ্ট-বাতাস, ভোরের নির্মল অশ্রুজলের মতো উড়িয়ে নেওয়া সুখ। স্বপ্ন, শূন্যতা বা পূর্ণতার একটি বছর। জীবনের ক্ষুদ্র একটি অংশ কত সহজে মিলিয়ে গেল শূন্যে। এভাবে, এমন করেই কি ফুরিয়ে যায় প্রেম? কেউ না-থাকার শূন্যতা, নিত্যকার ঘটনা-পরিক্রমা, সংঘাত, সংকল্প আর সীমাবদ্ধতার ভেতর দিয়ে নির্লিপ্ত এক দর্শকের মতো দাঁড়িয়ে দেখেছি চারপাশ। অজানা ভয়, শঙ্কা আর বিষাদ-ঘেরা ছিল সময়। প্লাটফর্মের শেষ ট্রেন ছেড়ে যাবার পর আসা যাত্রির মতো বিহব্বল দাঁড়িয়ে থেকে বিপন্ন চোখে দেখি সূর্যাস্ত, রোদহীন বিকেলের মতো বিষণ্ন আকাশ, বিবর্ণ গোধূলি সবই হারিয়ে গেল। সময় পেছনে ফিরে দেখে না কখনো। টিকটিক শব্দের নির্লিপ্ত আলোড়ন তুলে হেঁটে যায় অবিরাম।

বকুলের সৌরভমাখা স্নিগ্ধ ভোর, প্রজাপতি-ওড়া নিঝুম দুপুর, সন্ধা-উত্তীর্ণ রাত্রি; প্রেম-কাতর বিকেল, মাঝরাতে মাথায় কিলবিল করা কবিতার কোমল পঙক্তি আর সার্বক্ষণিক ভালোবাসায় আটকে থাকা তুমি আমাদের দেখা হবে না অনেকদিন। ভালোবাসা নিয়ে ভালো থেকো!

স্বপ্ন, সম্ভাবনা আর অঙ্গীকারে ভরপুর আরও একটি বছর। আশা, হতাশা আর নতুন পরিকল্পনার আগামী। ভালোলাগা, ভালো-থাকা আর ভালো-রাখার মধ্যে দিয়ে কেটে যাক বেঁচে থাকার দিনগুলো। এই-ই, আর কোনো চাওয়া নেই আমার, জীবনের কাছে। ভালো থেকো, জীবন।

হাসিব ইমতিয়াজ : জামিয়া ফরিদাবাদ, ঢাকা'র শিক্ষার্থী



(গল্প)

সালিশ

যুবাইর ইসহাক

উপজেলা সরকারি হাসপাতালের সাত নম্বর সিটে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে হারু। কয়েকটা মাছি অস্থিরভাবে তার মুখের ওপর ভনভন করছে। কখনো নাকে বসছে কখনো মাথায়। হারু ডান হাত দিয়ে তাদের তাড়াতে বারবার ব্যর্থ হচ্ছে। মাছি তাড়াতে গিয়ে হারুর বাম হাতটা হঠাৎ নড়ে যায়। তখনই সে ব্যথায় 'ও আল্লা' বলে চিৎকার করে ওঠে। মাছি তাড়ানোর চেষ্টা বাদ দিয়ে সোজা হয়ে ঘুমানোর চেষ্টা করে হারু। এর ফাঁকে এক পলক তার ডান হাতটাকে দেখে নেয়। কলাগাছের মতো কেমন অসম্ভব বড় হয়ে উঠেছে হাতটা। উপরের সাদা ব্যান্ডেজ যেন ফেটে বের হতে চায়। ভেতরে অসহ্য যন্ত্রণা।

হারু ঘুমাবার আশায় চোখের দুনো পাতা ফেলে দেয়। তার সামনে আবার স্মৃতিটা ভেসে ওঠে। মনে মনে বের করবার চেষ্টা করে, আসলে দোষী কে? সে ঘটনাটা আবার প্রথম থেকে ভাবে।

হারুর ছেলে মানিক বিকেলে গাঁয়ের ছেলেদের সঙ্গে মাঠে খেলতে গেল। গিয়ে মণ্ডলবাড়ির ছেলের সঙ্গে ঝগড়া বাঁধিয়ে দেয়। এখন হারুর মনে হচ্ছে, এরকম ঝগড়া তো হরহামেশা ছেলেরা বাঁধায়। তারা নিজেরাই আবার এসব ঝগড়া মিটিয়ে ফেলে। মা-বাবা পর্যন্ত জানতে পারে না অনেক সময়। তার ছেলেবেলায়ও এরকম ঝগড়া হয়েছে। কিন্তু সমস্যা ঘটল আরও পরে। হারু বাজার থেকে বাড়ি ফিরে দেখে মানিক কাঁদছে। মণ্ডলবাড়ির সব কয়টি ছেলে নাকি তাকে ধরে মেরেছে।

হারু সহ্য করতে পারল না। সন্তান আঘাত নিয়ে বাড়ি ফিরুক—এমনটা হয়তো কোনো বাবাই সহ্য করতে পারেন না। ছেলের হাত ধরে টানতে টানতে মণ্ডলবাড়ির গেটে দাঁড়ায় হারু। চিৎকার করে মণ্ডলদের ডাকাডাকি করে। এ ডাকাডাকিতে গালি মেশানো। এ গালি বড় ঝগড়ার দিকে আহ্বান। বের হয়ে আসে মণ্ডলবাড়ির দুই জোড়া ছেলেপেলে। হাতে দেশীয় অস্ত্র। এসেই কথা না বাড়িয়ে হারুকে শুরু করে আঘাত। হারু মনে মনে ভাবে, যদি তাদের পথের মুখে এরকম ডাকাডাকি না করতাম, হয়তো ঝগড়াটা বাঁধত না। পোলাপান ঝগড়া করছে এইসব তো মিটেই যেত।

হারুর ভাবনায় ছেদ পড়ে তার কেবিনের সামনে কয়েকটা পায়ের শব্দ শুনে।

চোখ খুলে ও দিকে তাকায়। দেখে গ্রামের দুতিনজন মাতব্বর দাঁড়ানো। এরাই গ্রামের বিভিন্ন সমস্যার সালিশ করে। হারু ভদ্রতা করে শুয়া থেকে উঠে বসার চেষ্টা করে। মাতব্বররা তাকে থামিয়ে বলে, 'ঘুমাইয়্যা থাক হারু। উঠতে অইবো না।' হারু বিছানার এক পাশে সরে তাদের বসার জায়গা করে দেয়। বয়স্ক মাতব্বর হারুর পাশে বসে। বাকিগুলো গোল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। মাতব্বর হারুর মাথায় হাত রাখে। জিজ্ঞেস করে, 'হারু, এহন শইল্যের খবর কিতা?' হারু ভাঙা ভাঙা গলায় উত্তর দেয়, 'হাতটা ফাটে ফাটে করছে। গায়েও বাড়ি কটা। এপাশ ওপাশ করতে পারি না। খুব যন্ত্রণা দেয়। এহানে ডাক্তারও ঠিক মতোন আইয়্যা দেহে না।' মাতব্বর সমব্যথিত হতে হতে বলে, 'কী আর করবা হারু, কিছু একটা হয়ে গেল। শয়তান ঘটিয়ে ফেলসে। নে আমরা তোর লাগি কিছু নাস্তা আনছি, ওগুলো খা।' সঙ্গে আনা ব্রেড আর জুস এগিয়ে দেয় মাতব্বর।

'ওসব আইন্যা আর ক্যান টাকা নষ্ট করতে গেলা' হারু খাবারের পলিথিনের দিকে লোভের চোখে তাকায়। মাতব্বর বলে, 'বাদ দে হারু, যা হইবার হইছে। মণ্ডলের পোলাপান ভুল করসে। মণ্ডল চাইতেছে ওসব শেষ হোক। তুই তো চিকিৎসা করাতি। টাকার বিষয়-আশয়। মণ্ডল তোরে ১০ হাজার টাকা দিয়া দিব নে। বাদ দে ওসব।' পাশে দাঁড়ানো বাকি মাতব্বররাও তাকে সায় দিয়ে বলে, 'বাদ দে হারু, বাদ দে।'

হারু গোঙাতে গোঙাতে বলে, 'আগে আমি ভালা অইলই।'

মাতব্বর হারুর পাশে আর বেশিক্ষণ দাঁড়ায় না। হয়তো দাঁড়ানোর প্রয়োজনও পড়ে না। 'হারু, যা কইছি ভাইব্যা দেখিস, এহন যাই' বলে উঠে দাঁড়ায়। বাকি মাতব্বররাও তাকে অনুসরণ করে দরজার দিকে এগিয়ে যায়। মাতব্বররা চলে যাবার পর হারু অস্পষ্ট আওয়াজে তার বউকে ডাকে। কিন্তু আশেপাশে তার বউকে খুঁজে পায় না। হঠাৎ মনে পড়ে, তার বউ সকালে বাড়িতে গেয়েছিল। এখনো আসেনি। সে বিরক্ত হয়ে পাশের সিটের দিকে তাকায়। দেখে, মধ্যবয়স্ক একলোক শুয়ে আছে। আর তার পাশে নিথর হয়ে বসে আছে লোকটির স্ত্রী। পরদিন হারুকে দেখতে আসে সদাগর পাড়ার আরো কিছু মানুষ। এরাও বিচারসালিশে মাতব্বরের ভূমিকায় থাকে। তবে গ্রামের সবাই জানে মণ্ডলদের আর সদাগরদের বিবাধ অনেকদিন ধরে। সদাগররাও তার পাশে বসে। বাজার থেকে কিনে আনা এটা-ওটা তার সামনে ছড়িয়ে দেয়। মমতা মাখিয়ে হারুকে জিজ্ঞেস করে, 'এখন শরীর কেমন?' হারু অস্পষ্ট সুরে উত্তর দেয়, 'ভালো না। হাত-মাথায় ব্যথা বেশি। বড় সদাগর কিছুটা ধমক মিশিয়ে বলে, 'কিতা হারু, হুনছি তুই নাকি সালিশ করতে যাচ্ছিস? সালিশে যাবি না। বেটারে জেলের ভাত খাওয়ায়ে ছাড়বে। থানাত গিয়া মামলা কর, আমি কইলাম, আমি তোর সঙ্গে আছি।' হারু দ্বিধায় ভোগে। হ্যাঁ না কিছুই বলে না। ঘেনঘেন করে কেবল বলে, 'আগে ভালা অই লই চাচা।'

হারু পুরোপুরি সুস্থ হতে পারেনি। তার বউ আর ছেলে তাকে নিয়ে কোর্টে গেল। এর পেছন থেকে ইন্ধন দিয়েছে সদগার গোষ্ঠী। উকিলের সঙ্গে বুঝে দেখল মামলা আসলে অনেক কিছুর ব্যপারস্যপার। তাছাড়া মণ্ডলের টাকার জোর থাকায় তাকে জেলের ভাত খাওয়ানো নাও যেতে পারে। হারু টাকার হিসেবনিকেশ কষে মামলা না করার সিদ্ধান্তে বাড়ি ফেরে।

ধীরে ধীরে সুস্থ হয় হারু। মণ্ডলের সঙ্গে তার ঝগড়টাও সালিশের দিকে এগোয়। একদিন সন্ধ্যায় মাতব্বররা তার উঠানে এসে ডাক দেয়, 'কিরে হারু, বাড়ি আছস নি?' হারু ঘরেই ছিল। বের হয়ে 'আসো আসো' বলে তাদের ঘরে নেয়। এই মাতব্বরদের মধ্যে সদাগর পাড়ার দু'একজনও আছে। গরিব হারু তাদের পান খেতে দেয়। বয়স্ক মাতব্বর হারুর হাতে ১০ হাজার টাকা তুলে দিয়ে বলে, 'হারু, যা হবার হইছে, সবকিছু ভুলে যা। যা দিছি সবুর থাকিস। কাউরে কিছু বলিস না। লোকে হুনলে খারাপ কইবো।' হারু মাস-পনের দিন পর জানতে পারে তার আর মণ্ডলের ঝগড়া নিষ্পত্তির জন্য মাতব্বররা মণ্ডলের কাছ থেকে ২০ হাজার টাকা নিয়েছিল।

যুবাইর ইসহাক : হবিগঞ্জের নবীন লেখক



(স্মৃতিকথা)

শীতের রাতে বৃষ্টির স্মৃতি রোমন্থন

রুমেল আবুল কালাম

প্রচণ্ড শীত পড়েছে। রাত তখন খুব গভীর না হলেও আমাদের গ্রাম জুড়ে নেমে এসেছে নিঝুম নিস্তব্ধতা। পাড়া-গাঁয়ের মানুষ দিনমান পরিশ্রম করে, সন্ধ্যা ফুরোতেই চারটে খেয়ে ঘুমের ঘরে চলে যায়। বিছানায় কম্বলের নিচে শুয়ে এপাশ-ওপাশ করছি। সাত-পাঁচ নানা চিন্তা ঘোরপাক খাচ্ছে মাথায়। ঘুম আসছে না। তুমুল এই শীতে বৃষ্টির দিনের কথা মনে পড়ছে। আর মনে পড়ছে দুরন্ত শৈশবের স্মৃতি।

তখন বর্ষার আকাশ। সকালে বিকালে–যেকোনো সময় হঠাৎ নেমে আসত ঝমঝম বৃষ্টি। দুপুরের খাঁ খাঁ রোদ তাড়িয়ে যখন আকাশ ফুটো করে নামত আষাঢ় শ্রাবণের থৈ থৈ জল-বৃষ্টি। একটানা বর্ষণে আমরা ঘরের মধ্যে ঝিম মেরে বসে থাকতাম। ভাইয়া বিছানার ওপর আম্মার নিজ হাতে বোনা নকশি কাঁথা গায়ে মুড়িয়ে শুয়ে পড়ত। আম্মা রান্না ঘরে পাকশাকে ব্যস্ত থাকতেন। আমাদের দো'চালা টিনের ঘর। এজন্য চালের উপর বৃষ্টি পড়লে 'ঝমঝম' আওয়াজের একটা চমৎকার শব্দ কানে বাজত। উঠানে চোখ মেলে তাকালে দেখতাম, পুরো উঠান বৃষ্টিতে টাপুরটুপুর করছে।

বোশেখ মাসে বৃষ্টি পড়া ছিল তুমুল শিহরণ জাগানিয়া। আকাশ তখন অহর্নিশি গুড়ুম গুড়ুম গর্জন করত। পশ্চিমের বাঁশঝাড়ে পাতায় পাতায় শন শন শব্দ হতো। হঠাৎ বিদ্যুৎ চলে গিয়ে পুরো ঘর হয়ে যেত নিঝুম অন্ধকার। মিনিট খানেক পর পর আকাশ-ফাটা গর্জনের সঙ্গে আমাদের ঘরের বেড়ার ছোট ছোট ছিদ্র দিয়ে বিদ্যুৎ চমকানোর আলো ভেতরে ভয় পাইয়ে দিত। ঠিক তখনই আম্মা-ভাইয়া এসে আমাকে জড়িয়ে ধরতেন,

যাতে আমি ভয় না পাই। আবার কখনো সখনো বৃষ্টি পড়লে আমি দরজার সামনে টুলের মধ্যে বসে থাকতাম। বর্ষাকালে একটা বিষয় খুব খারাপ লাগত। সেটি ছিল বাইরে কোথাও গিয়ে খেলা করা যেত না। তাই বৃষ্টি পড়ার সবটুকু সময় এক ধ্যানে তাকিয়ে থাকতাম আকাশের দিকে। নিবিষ্ট চিত্তে দৃষ্টি উড়াতাম চতুর্দিকে। আকাশের গা তখন দেখা যেত মেঘলা আবরণে ঢাকা। ধবধবে সাদা কুয়াশার মতো মেঘলা চাদর টাঙানো। আকাশ থেকে এই বৃষ্টি পড়া একদিনে থামত না। কখনো বৃষ্টি পড়ত একদিন-দু'দিন, কখনো তিন-চার দিন এমনকি সপ্তাহ পর্যন্তও গড়াত।

এই টানা বর্ষণে সৃষ্টি হতো আরও এক শঙ্কা। আমাদের বাড়ির পুর্বের জলাশয়টা বৃষ্টিতে একেবারে ভরে যেত। এভাবে অনবরত বৃষ্টির প্রকোপে সমস্ত ডোবা, খাল-বিল, পুকুর-নালা আর আমাদের গ্রামের গা স্পর্শ করে নীরবে বয়ে চলা পলক নদীটাও বর্ষার ঝুম বৃষ্টিতে কানায় কানায় ভরে যেত। বিকেলে ভরা নদীর পাশ দিয়ে হাঁটতে গেলে দেখতাম, নদীর দু'ধারে বাহারি রঙয়ের শাপলা ফুল। এ সময় নদীর জলে বিকেলের স্নান সেরে উড়তে দেখতাম ছোট-বড় হরেক রকম পাখি। এসব পাখির মধ্যে গাঙচিল, সাদা আর বকের ডানা ঝাপটানো প্রায়ই নজরে পড়ত। প্রতিদিন রাতে বৃষ্টি পড়লে যেই ঘুমাতাম, সকালে উঠে দেখতাম প্রকৃতির সবুজ-সবুজ বর্ণিল মহড়া। উপরে নীল গগণ। আর আমার সেই প্রভাতকাল থেকে দেখে আসা পথের ধারে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকা কৃষ্ণচূড়ার বৃক্ষটি বর্ষার শীতল বৃষ্টিতে স্নান করে সকালে অদ্ভুতরকম রূপ ছড়াত! এ ছাড়াও কচুগাছ, লতাপাতা আর জলাশয়ের মধ্যে কচুরিপনারা ভিজে একদম ফুরফুরে হয়ে থাকত। আবার প্রচণ্ড বৃষ্টির কারণে দোয়েল, শালিক, ময়না ইত্যাদি পাখির ছানা বাঁশ ঝাড়ের নিচে মুমূর্ষু অবস্থায় পাওয়া যেত।

আমি তখন ছিলাম বড্ড শিকার-বিলাসী। সারাদিন গুলাই সঙ্গে নিয়ে পাখির পিছু পিছু ছুটতাম। পাখিরা কোথাও বসা দেখলেই গুলাই তাক করতাম। কিন্ত শিকার-বিলাসী মনে সারাদিন পাখির পেছনে ঘুরেও কোনো পাখি শিকার করতে পেরেছি বলে মনে পড়ে না।

এক রাতের বৃষ্টির কথা এখনো মনে পড়ে। সেদিন রাতে শুধু বৃষ্টিই হচ্ছিল না, বৃষ্টির সঙ্গে ছিল তুমুল ঝড়ো দুফান। হিম হিম বাতাস। সারা বিকেল জুড়ে আকাশে মেঘের সাঝ ছিল। চারদিক ছেয়ে গিয়েছিল মেঘলা আঁধারে। সন্ধ্যার পর থেকে শুরু হতে থাকে হিম হিম বাতাস আর ঝড়ো তুফান। রাতে এশার পর আমরা খাবার খেতে বসি। তুফানের প্রখরতায় সে রাতে বিদ্যুৎ ছিল না। বাতাসের এক তড়পায় কেরোসিনের ল্যাম্প নিভু নিভু। আম্মা আমাদেরকে তাড়াতাড়ি খেয়ে বিছানায় ঘুমিয়ে পড়তে বললেন। কারণ, ল্যাম্পে কেরোসিন নেই। কখন কেরোসিন শেষ হয়ে ল্যাম্প নিভে যাবে, বলা যায় না! পাকঘরে আমি, আম্মা, ভাইয়া বসে খাচ্ছি। বৃষ্টির বেগ ক্রমে ক্রমে বাড়ছে। বাইরে জোরালো তুফান। ঝড়ো হাওয়ার বড় বড় ধাক্কা এসে ঘরের লাগে। আমার কচি মনে তখন কী যে ভয়! আম্মা আমাদের রীতিমতই সাহস যোগান দিতে থাকেন, 'ভয় পেও না, বৃষ্টি কমে যাবে'।

হঠাৎ ভাতের প্লেট থেকে আমাদের হাত আপসেআপ উঠে যায়। খাবার প্লেট থেকে ভাত মুখে তুলে আর পুরা হয় না। প্রচণ্ড তুফান এসে আমাদের দোচালা ঘরের একটি চাল উড়িয়ে নিয়ে যায়। সারা ঘর জুড়ে ঝমঝম বৃষ্টি পড়তে থাকে। বৃষ্টিতে ভিজে যায় ঘরের সমস্ত আসবাবপত্র। টেবিলের উপর আমার বইয়ের ব্যগ, কলম, খাতা, কুরআন শরিফ, রেহাল আর নিত্য ব্যবহারের শার্ট–প্যান্টগুলো–বৃষ্টিতে একাকার। আম্মা-ভাইয়া তখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন! আর আমি খবারের প্লেট থেকে উঠে গিয়ে আমার বইয়ের ব্যগ গোছাতে গোছাতে চিৎকার করে বলছিলাম, আম্মা, ভাইয়া, বৃষ্টিতে স-ব ভিজে যাচ্ছে...।

রুমেল আবুল কালাম : জামেয়া গহরপুর সিলেটে'র শিক্ষার্থী

গাদ্দাফির হেরেমে বন্দী এক ষোড়শীর আত্মজবানি

শুরুটা হয়েছিল সুরাইয়াকে দিয়ে। একটি মেয়ে–কাজলকালো যার চোখ, রোদেপোড়া চকচকে মুখ কিন্তু আকর্ণবিস্তৃত চওড়া হাসি। সুরাইয়া–বিদ্যুৎচমকের মতো মুহূর্তেই যার মনভোলানো হাসি সশব্দ কান্নায় পরিণত হয়; বিপুল উদ্দীপনা বদলে যায় চরম নৈরাশ্যে; অনুপম অনুরাগ পরিণত হয় ভয়াবহ প্রতিশোধস্পৃহায়। সুরাইয়া–যার আছে একটি অজ্ঞাত অতীত, এক সাগর দুঃখ আর হার না মানা বিক্ষুব্ধ মনন। সুরাইয়া–যার গল্পটা শুরু হয়েছিল মনোরম এক প্রাণবন্ত পরিবেশ থেকে। আর শেষ হয় নরপিশাচ দানবের পাঞ্জায় আবদ্ধ হওয়ার মাধ্যমে।

সুরাইয়ার সেই দানবের নাম মুয়াম্মার গাদ্দাফি। আফ্রিকার লৌহমানব নামে যিনি পরিচিত ছিলেন সারাবিশ্বে। যিনি বরিত হতেন লিবিয়ার নারীমুক্তির প্রবাদপুরুষ হিসেবে। অথচ তারই গোপন হেরেমে রক্ষিতা হিসেবে বন্দী ছিল শত শত নিষ্পাপ মেয়ে।

প্রথমবার এ কথা শুনে হয়তো পাঠকমাত্রই অবিশ্বাসে আঁতকে উঠবেন। কিন্তু হেরেমবন্দী সুরাইয়ার হাত ধরে যখন আপনি প্রবেশ করবেন গাদ্দাফির হেরেমখানায়, এক কোমলপ্রাণ কিশোরীর ধর্ষিত হবার বর্ণনা শুনে আপনার চোখ জলে ভেসে যাবে।

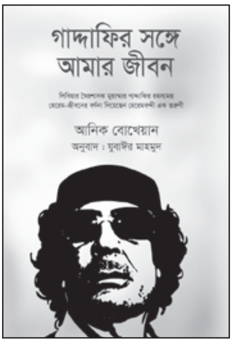
আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে কর্নেল গাদ্দাফিকে একজন মহানায়কের স্থান দেয়া হয়ে আসছে বরাবর। তার দেয়া নাগরিক সুবিধা, দেশকে উন্নয়নের চূড়ায় তোলার প্রচেষ্টা অথবা সাম্রাজ্যবাদী পশ্চিমের বিরুদ্ধাচরণ–এসবই উঠে আসত পত্রিকার পাতায়। কিন্ত প্রকাশিতব্য এই অনুবাদগ্রন্থে এমন কিছু সত্য উঠে আসবে, যা এদেশের মানুষকে গাদ্দাফির ব্যাপারে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করবে।

বাব আল-আজিজিয়া–যা ছিল মুয়াম্মার গাদ্দাফির মায়াকানন; সেখানে তিনি কীভাবে যাপন করতেন নিজের গোপন জীবন–সেই কুৎসিত সত্যের এক জলজ্যান্ত বয়ান এ বই।

গাদ্দাফির যৌনলালসা মেটাতে গোপন সেই হেরেমে বন্দী ছিল যে শত শত মেয়ে, এখানে তাদের কয়েকজনের জবানি উঠে এসেছে। সুরাইয়া তাদেরই একজন–বইয়ের অন্দরে পাঠক যার বেদনাবিধুর আত্মজীবন শুনতে পাবেন।

লিবিয়ার রাষ্ট্রপতি হিসেবে গাদ্দাফির কর্মকাণ্ড মূল্যায়নের দুরূহ কাজটি পাঠকের হাতেই রইল। তেমনি ব্যক্তি গাদ্দাফির চারিত্রিক কর্মকাণ্ডের মূল্যায়নও–মনে হয় পাঠক নিজেই অনুধাবন করতে পারবেন।

আনিক বোখেয়ান
অনুবাদ: যুবাঈর মাহমুদ
সম্পাদনা: হামমাদ রাগিব
প্রকাশক: নবপ্রকাশ
মুদ্রিত মূল্য: ৫০০ টাকা
দূরালাপন:
০১৯৭৪৮৮৮৪৪১



হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ এবং এক অমর সিপাহির বীরত্বগাথা

বলে নেয়া ভালো, লেবাননী ঔপন্যাসিক জুরজি যায়দান রচিত হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ উপন্যাসটি বাংলাভাষায় শেষ সিপাহির রক্ত নামে পরিবেশিত হচ্ছে। তবে মূল নাম বইয়ের প্রচ্ছদ ও দর্শনীয় স্থানে স্বমহিমায় শোভা পাচ্ছে। ঔপন্যাসিক জুরজি যায়দান বাংলাভাষী পাঠকের কাছে অপরিচিত নন। এর আগেও বাংলাভাষায় তার একাধিক গ্রন্থ অনূদিত হয়ে প্রকাশ হয়েছে। ঐতিহাসিক ঘটনাকে উপন্যাসের মোড়কে মলাটবদ্ধ করার অভিনব কায়দা-কানুনে তিনি সিদ্ধহস্ত। এ উপন্যাসেও তার ব্যত্যয় ঘটেনি।

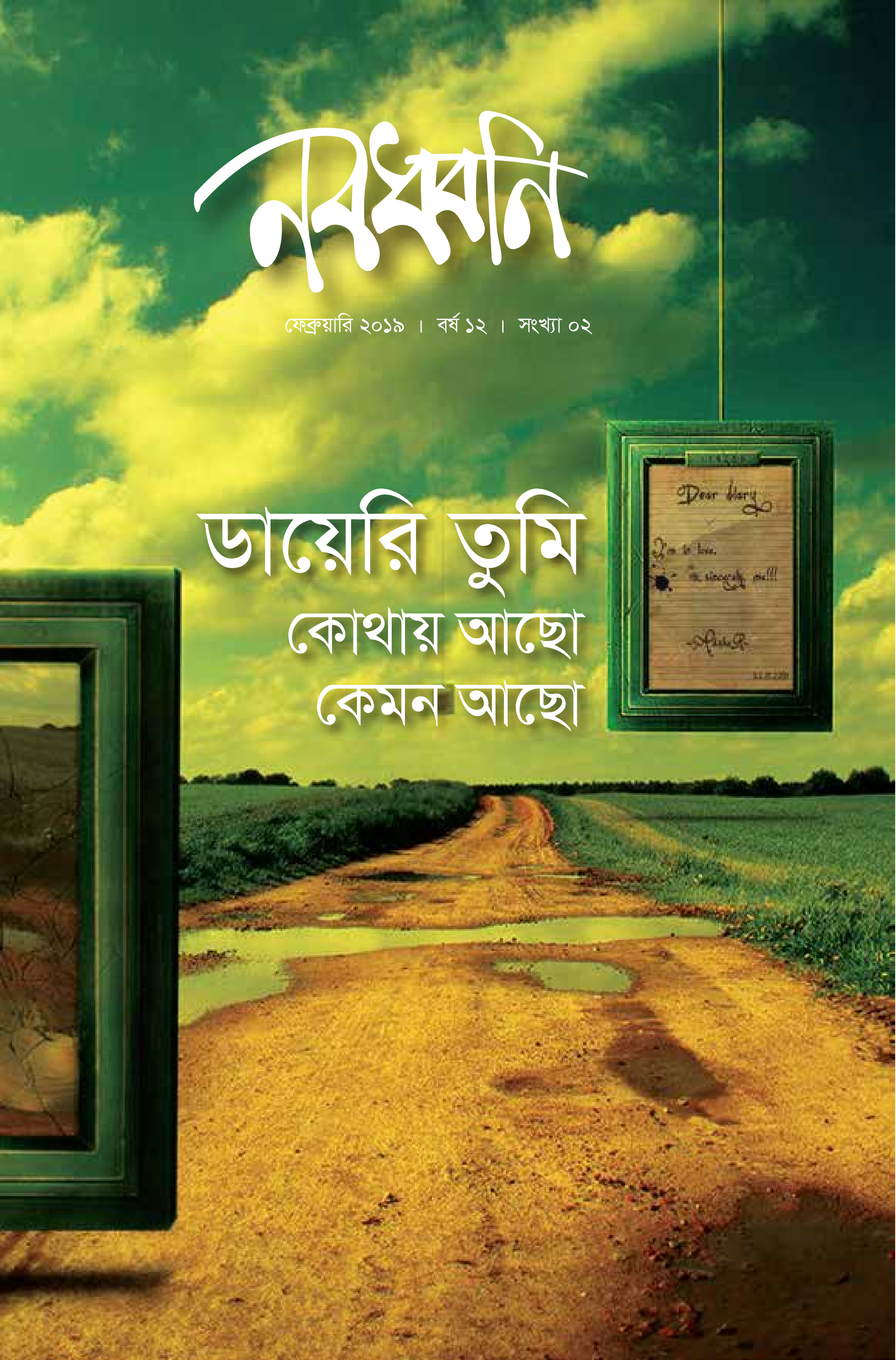
ঐতিহাসিক উপন্যাসের বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ আছে–এখানে ইতিহাস বিকৃত হয়। লেখকরা গল্পের প্রয়োজনে অনেক মিথ্যা গল্প তৈরি করেন। সেগুলোকে ইতিহাসের সাথে মিশিয়ে ভ্রম সৃষ্টি করেন পাঠকের সামনে। কোনটা সত্য আর কোনটা কল্পনা–পাঠক তা ভেবে হয়রান হন। কিন্তু এদিক থেকে জুরজি যায়দানের উপন্যাস হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফকে আলাদা বলতে হবে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সত্য ও ইতিহাসনির্ভর ঘটনাগুলো তিনি বর্ণনা করেছেন নির্মোহভাবে। শুধু ঘটনার স্থান বা কালের পরিবর্তন হয়েছে মাত্র। এর বাইরে যা কিছু বলেছেন তা কল্পনার মোড়কেই আবৃত রেখেছেন। তাই সচেতন পাঠক সহজে বাস্তব ও কল্পনার পার্থক্য বুঝে নিতে পারবেন।

খোলাফায়ে রাশেদিনের শাসনের পর যে সংক্ষুব্ধ সময় ইতিহাসকে রক্তাক্ত করে তুলেছিল, এ উপন্যাস সেই সংক্ষুব্ধ সময়কে পাঠের আলোয় নিয়ে এসেছে। একদিকে খেলাফতে রাশেদার পদছাপকে আঁকড়ে ধরে কাবার দুয়ারে সিনাটান করে দাঁড়িয়েছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে জুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু, অন্যদিকে উমাইয়া সাম্রাজ্যের ক্ষমতালোভী শাসকগণ খেলাফতের কেন্দ্রবিন্দু ধুলিস্যাৎ করতে সর্বোচ্চ শক্তি প্রয়োগে ছিল বদ্ধপরিকর। রক্তের বন্যা বয়ে যেতে লাগল পবিত্র শহরের গলি গলিতে।

সেই সময়ের নিষ্পাপ এক প্রেমকাহিনির হাত ধরে পাঠক প্রবেশ করবেন খেলাফত রক্ষার সাহসী সংগ্রামে। আশা করি ইতিহাস ও উপন্যাস পাঠক–সকলেই উদ্দীপ্ত হবে এই অনবদ্য গ্রন্থপাঠে।

সবার পাঠোদ্দীপনা কামনা করছি।

জুরজি যায়দান
অনুবাদ: নাজমুস সাকিব
প্রকাশক : নবপ্রকাশ
মুদ্রিত মূল্য : ৪০০ টাকা
দূরালাপন :
০১৯৭৪৮৮৮৪৪১


নবধ্বনি
ফেব্রুয়ারি ২০১৯ । বর্ষ ১২ । সংখ্যা ০২
ডায়েরি তুমি
কোথায় আছো
কেমন আছো
Dear Diary

ফেব্রুয়ারি ২০১৯ । বর্ষ ১২ । সংখ্যা ০২

মূল্য ৫ টাকা মাত্র

নবধ্বনি । দোকান নং ২৭ । ২য় তলা । ইসলামী টাওয়ার
১১/১ বাংলাবাজার । ঢাকা । ০১৭৪৫ ১৩৯২১৫

Email: nobodhoni@gmail.com   web: noboprokash.com/nobodhoni

স্বাগত কলাম

ভাষার মাস ফেব্রুয়ারি। এ মাসের বড় একটা উপলক্ষ্য—বাংলা একাডেমি আয়োজিত একুশে বইমেলা। মাসের শুরু থেকে শেষাব্দি চলতে থাকা এ মেলায় বই কেনাবেচার পাশাপাশি লেখকদের সঙ্গে পাঠকদের সাক্ষাত, বন্ধুদের নিয়ে ঘুরতে যাওয়া, হরেক রকম বইয়ের সঙ্গে চিন-পেহচান—দারুণ আমুদে কাটে উৎসবপ্রিয় বাঙালির সময়।

বইপড়া নিয়ে জ্ঞানীব্যক্তিগণ যথেষ্ট নীতিবাক্য বলে গেছেন। নতুন করে সেসব বলে সময় নষ্ট করার মানে নেই। যেহেতু বইমেলা চলমান, সুতরাং কথা হতে পারে বই কেনা নিয়ে।

মুজতবা আলীর 'বই কেনা' প্রবন্ধ যারা পড়েছেন, তারা নিশ্চয় বাঙালির বইপ্রীতির কথা বিলক্ষণ অবগত আছেন। কিন্তু তবু বলি—বই কিনে পড়ার যে অনিমেষ আনন্দ, সে আর অন্য কিছুর সঙ্গে তুলনা চলে না। নিজের ঘরে এক তাক বই, কিংবা এক আলমারিসুদ্ধ বই আর বই, ঘরের যেমন শোভা তেমনি মননেরও শোভা। আর কিছু না হোক, মাসে দু-এক বার দু চারটে বই অন্তত নাড়াচাড়া তো করা হয়। আর যারা নিবিষ্ট পাঠক, তাদের জন্য বই কেনা তো অতিব জরুরি বিষয়। বই না কিনলে জ্ঞানের প্রতি যেমন শ্রদ্ধা নির্মাণ হয় না, তেমনি বিজ্ঞতার মূল্যও সঠিকভাবে নিরুপণ করা যায় না।

অনেকেই আছেন যারা মোবাইল বা কম্পিউটারে বইয়ের পিডিএফ সংস্করণ পড়ে থাকেন। অর্থের দুষ্প্রাপ্যতা কিংবা নগদ অর্থ খরচের ভয়ে অনেকের পিডিএফভক্তি এতটাই প্রবল যে, নতুন কোনো বইয়ের বিজ্ঞাপন দেখলেও সেখানে গিয়ে মন্তব্য করেন—'ভাই, পিডিএফ হবে?'

এ বড় দুর্দশার কথা! যে জাতির জ্ঞানের আঁতুড়ঘর ছিল হেরাগুহা, যাদের ধর্মের প্রথমকথা উচ্চারিত হয়েছিল 'ইকরা' ধ্বনির মাধ্যমে, সেই জাতি জ্ঞানের বাহন বই কিনতে ভয় পায়। আমরা দামি মোবাইল ফোন ব্যবহার করি, বন্ধুদের নিয়ে কক্সবাজার-রাঙামাটি-সিলেট ঘুরতে গিয়ে হাজার হাজার টাকা খরচ করি, রেস্টুরেন্টে খেতে গেলেও পকেট থেকে খসে যায় গোলাপি রঙের হাজারি নোট; সেই আমরা বই কিনতে গেলে কিপ্টেমির রশি ধরে টাইট হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। এ অন্যায়!

ভাষার মাসে মেলায় যান। ব্যাগভর্তি বই কিনুন। নানান রকম বই পছন্দ করুন। টাকার অভাবে এখন কিনতে না পারলে বই পছন্দ করে তালিকা করুন, টাকা হলে পরে কিনে নেবেন। তবু বই কিনুন, বই পড়ুন। বই পড়ার কোনো বিকল্প যেমন নেই, তেমনি বই কেনারও কোনো বিকল্প নেই।



ডায়েরি তুমি
কোথায় আছো কেমন আছো

সালাহউদ্দীন জাহাঙ্গীর

প্রিয় আমীনুল ইসলাম,
তোমার চিঠি আমার হাতে এলো প্রায় সাত মাস পর। তা-ও এলো যখন আমি পল্টন থেকে সান্ধ্যবাসে করে বাড়ির দিকে রওনা হয়েছি, তখন। বন্ধুবর এহসান সিরাজের কাছে তুমি চিঠিটি দিয়েছিলে গত বছর জুলাই মাসের শেষদিকে। সেই চিঠি দীর্ঘদিন এহসানের ঘরবন্দী থেকে অবশেষে পৌঁছলো আমার হাতে। যখন আমি গাবতলীগামী একটা বাসে চড়ে পার হচ্ছিলাম প্রেসক্লাবের পাশঘেঁষা আকাশমণি গাছের সারি। আর আকাশমণি ফুলের গন্ধে আমি বড় করে কয়েকটা নিশ্বাস নিয়ে ভুলতে চাইছিলাম জ্যাম-গন্ধময় ঢাকা শহরের জীর্ণ স্মৃতি।

বাসের ভেতরের আলোগুলো ক্ষয়িষ্ণু। রাস্তার নিয়নবাতি ততক্ষণে জ্বলে উঠেছে। হলদে নিয়ন আলোয় আমি পড়তে শুরু করলাম তোমার চিঠি। বহু বহু দিন বাদে কেউ আমাকে চিঠি লেখে। আমি খুব আগ্রহ নিয়ে সেসব চিঠি পড়ি। ভালো লাগে। আমারও খুব ইচ্ছে হয় প্রেরকের চিঠির উত্তর দিতে। কিন্তু হয়ে ওঠে না। তাই আশ্রয় নেই হয়তো আন্তর্জালিক কোনো মাধ্যমের অথবা কোনো ম্যাগাজিনের পাতার।

প্রিয় আমীনুল,
নবধ্বনি নিয়ে লেখা তোমার ভালোবাসাময় চিঠিটি আমি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি। বিগত দিনকয়েক সে আমার সঙ্গেই ছিল। এ চিঠি আমার সহধর্মিণী পড়েছেন, পড়েছে আমার ভাগ্নে ও ভাগ্নী। তারা বিহ্বল হয়েছে–এখনও মানুষ চিঠি লিখে? আসলেই তো! যে প্রজন্ম বেড়ে উঠছে পাঁচ ইঞ্চি স্ক্রিনের আন্তর্জালিক আলোকিত অভিশাপের দায়ভার মাথায় নিয়ে, যারা সময়ের অভাবে ভুলতে বসেছে বন্ধুর হৃদ্যতা, যাদের হৃদয়ে ভালোবাসার মানে যখন কেবলই শারীরিক মোহ–সেই সময়ের গৃহদাহ পেরিয়ে তুমি কেন লিখতে গেলে এই চিঠি–অবাক হওয়ার মতো ঘটনা!

প্রিয় আমীনুল,
তোমাকে যখন লিখছি তখন ভোর চারটে পঞ্চাশ। আরও প্রায় ঘণ্টাখানেক আগে আমি ঘুম থেকে উঠেছি। সাধারণত আমি রাত দশটা থেকে এগারোটার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ি, ভোরে উঠি চারটা থেকে পাঁচটার মধ্যে। বাড়ি থাকলে এটা আমার মোটামুটি প্রাত্যহিক রুটিন। দিন-রাতে আমি পাঁচ থেকে ছ ঘণ্টা ঘুমাই। দিনে ঘুমানোর অভ্যাস খুব একটা নেই। তাই রাতে শুয়ে পড়লে ঘুমাতে খুব একটা সময় লাগে না। আর একবার ঘুমালে আমার ঘুম হয় পুকুরের জলের মতো নিস্তব্ধ, নিথর।
এ-কথাগুলো তোমাকে কেন বললাম–অনেকেই আমাকে জিজ্ঞেস করে–আপনি কখন লিখেন? কিন্তু সেভাবে বলতে গেলে, আমার আসলে লেখালেখির নির্দিষ্ট কোনো সময় নেই। তবে ভোরের এই সময়টাতেই আমার প্রতিদিনকার লেখালেখির সূচনা হয়। কোনোদিন তাহাজ্জুদের সময় থাকলে নামাজ পড়ে নিজেকে মানুষের কাতারে আনার চেষ্টা করে তারপর লিখতে বসি। আর সময় না থাকলে অমানুষের মতো ঘুম ঘুম চোখেই লিখি। ভোরে উঠে লেখার এ অভ্যাসটা আমার আগে ছিল না। এটা বিগত কিছুদিনের অভ্যাস এবং বেশ চমৎকার অভ্যাস। এ সময়টাতে পৃথিবীর চারপাশ কেমন স্তব্ধ হয়ে থাকে। চারদিকে গুমোট অন্ধকার, পাখিরা পর্যন্ত তখনো জাগে না। থম মেরে থাকা সময়। হঠাৎ একটা শেয়াল হাঁক দেয় বা কোনো বাড়ির বোকা মোরগটা ভোর হয়ে গেছে ভেবে বাগ দিয়ে ওঠে। বিলের মাঝে শব্দ পাওয়া যায় ভট ভট একটা স্যালো ইঞ্জিনের। হয়তো কোনো পুকুর থেকে পানি তুলছে। একটা কানাকুকা কুউ কুউ করে কয়েকবার ডেকে কী বার্তা যেন ছড়িয়ে দিতে চায় পাখিদের লোকালয়ে। সে আসলে কী বলে? ভোর হতে আর দেরি নেই... তোমরা সবাই উঠো... বেরিয়ে পড়ো জগৎজোড়া... এসবই কি বলে কালো আর খয়েরি রঙের পালকপরা পাখিটা? আমি ঘুম থেকে জেগে এসব ভাবি।

প্রিয় আমীনুল,
ভোরের এই সময়টাতে ইদানীং আমি ডায়েরি লিখি। ভোর জিনিসটাই এমন, এই সময়ে কেন যেন ব্যক্তিগত বিষয় আশয় লিখতে ভালো লাগে। একান্ত নিজস্বগত স্মৃতি বা চিন্তা। মানুষের বোধ তখন সম্ভবত আত্মকেন্দ্রিক থাকে। নিজেকে নিয়ে ভাবার একটা মোক্ষম সময়। সারারাত মস্তিষ্কের নিউরনগুলো কিছুটা বিশ্রাম নিয়ে সকাল সকাল আমাদের উপহার দেয় নতুন কিছু চিন্তা, কিছু প্রত্যয়, মোলায়েম একটা মন।
ডায়েরি লেখার অভ্যাস তেমন একটা আমার ছিল না কোনোকালেই। কখনো সখনো কোনো ডায়েরিতে কিছু স্মৃতি লেখা হয়েছে, কোনো ডায়েরিতে লিখেছি গোটা কয়েক কবিতা কিংবা কোনো গল্পের শুরুর অংশ। যে গল্প আর কোনোদিন শেষ হয়নি। কৈশোরে ভালো লাগতো যেসব কিশোরীর মুখ, তাদের নিয়ে বিরহী কোনো বয়েত-নজমও থাকতো

বৈকি। কিন্তু নিয়মিত ডায়েরি লেখা আমার কখনো হয়ে উঠেনি। এখন কেন শুরু করলাম? সেই গল্পটা বলি।
বছরখানেক ধরে আমার সঙ্গে ছোট্ট একটা পকেট ডায়েরি থাকে, আমার ব্যাগে। ডায়েরিটা কিনেছিলাম বড় আপার কথায়। বড় আপা বলেছিলেন, সঙ্গে সবসময় একটা ডায়েরি-কলম রাখবি। যখনই কবিতা বা উপন্যাসের কোনো লাইন বা প্লট মনে আসবে তখনই সেটা চট করে লিখে ফেলবি। কারণ মানুষের চিন্তা এই আছে এই নেই। বাসে বসে তুই মনে করলি, আচ্ছা, চিন্তাটা যখন এসেছে তাহলে সেটাকে আপাতত ডালাপালা ছড়াতে দিই, বাড়িতে বা অফিসে গিয়ে যুতমতো বসে লিখে ফেলা যাবে।
কিন্তু এমনটা হয় না। আমি নিজেই এর বড় ভুক্তভোগী। বহুবার এমন হয়েছে, হঠাৎ চলতিপথে কিছু একটা দেখে বা ভেবে সুন্দর একটা লাইন মনে এসেছে। ভেবেছি, বাড়ি গিয়ে সুস্থির হয়েই লাইনটা লিখে ফেলতে হবে। বাড়ি এসে মগজের এ-কোনা হাতড়াই ও-কোনা হাতড়াই, নাহ, সেই অনিন্দ্য লাইনটা আর ফিরে আসে না। চোখ বন্ধ করে, দম বন্ধ করে কতোভাবে লাইনটা স্মরণ করার চেষ্টা করি–লাইনটা আর আসে না। ভাঙা ভাঙা দু-একটা শব্দের খুচরা অংশ আসে কখনো, ওই ভাবনাটা আর আসে না। কখনো তো পুরো বিষয়টাই ভুলে যাই। বাসে বসে বসে যে এমন একটা চিন্তা মাথায় উদয় হয়েছিল–সেই বিষয়টাই আর মনে আসে না। এভাবেই অকালমৃত্যু ঘটেছে বাংলাদেশের এক অখ্যাত যুবকের নাম না জানা শত সহস্র কবিতা-গল্পের।
তো, আমি একটা ছোট ডায়েরি কিনে নিলাম। ডায়েরি না বলে সেটাকে বরং নোটবই বলাই শ্রেয়। দেখতে আদার বেপারিদের হিসাবের খাতার মতো। দাম নিয়েছিল সম্ভবত ত্রিশ টাকা। এখানে সেখানে গেলে সেই ডায়েরিটা আমার ব্যাগে থাকে। কিছু মনে এলে বা লিখতে ইচ্ছে হলে আমি ওটা খুলে ছোট ছোট অক্ষরে লিখি। ওই ডায়েরিতে চিন্তা বা ভাবনা ছাড়া নিজস্ব কোনো স্মৃতি লেখা নেই। গল্প বা উপন্যাসের জরুরি কোনো চিন্তা বা ঘটনা মনে এলে ওখানে টুকে রাখি। কোনো চরিত্রকে মেরে ফেলি, কোনো চরিত্রকে উপহাসের পাত্র বানাই, আবার কখনো কোনো চরিত্র নিয়ে লিখতে লিখতে সে আমাকেই কান্নায় ভিজিয়ে দেয়। এরকমও হয় মাঝে মাঝে। নিজের লেখা চরিত্র তখন বাস্তব মনে হয়। মনে হয়, উপন্যাসের মধ্যে সে যেমনটা কষ্ট পাচ্ছে, ওর চেয়ে গাঢ় কষ্ট জড়ো হচ্ছে আমার ভেতরে।
এ তো গেলো আমার কাগুজে ডায়েরির কথা। ইদানীং আমি অনলাইনে ডায়েরি লেখা শুরু করেছি, মেইলে। প্রতিদিন আমার যেসব চিন্তা আসে কিংবা লেখালেখির নতুন যে ভাবনা আসে–সেগুলো রোজ রোজ লিখে আমি নির্দিষ্ট কারো মেইলে পাঠিয়ে রাখি। অথবা এমনও হয়, আমি নির্মাণাধীন উপন্যাসের একটা খণ্ডিত অংশ মেইলে লিখে ফেলি। এরপর মেইলগ্রহীতার সঙ্গে ওই অংশটা নিয়ে কখনো সখনো আলাপ করি। কোনোদিন রোজকার ঘটনাগুলোও লিখি। কোথায় কোথায় যাই, গ্রামে কী ঘটছে না

ঘটছে, ওইদিন কী কাজ বাকি পড়ে আছে—এইসব বিষয়ও লিখে ফেলি। এতে হয় কি, প্রতিদিনই কিছু না কিছু লেখা হয়। হাত একদম বসে থাকে না। জং ধরে না লেখালেখির চিন্তায়। একজন লেখকের জন্য লেখার মশকো জারি রাখা খুব জরুরি বিষয়। মেইলে যখন রোজনামচাগুলো লিখি, তখন চেষ্টা করি গদ্যটা সুডৌল রাখতে। যে গদ্যে আমার উপন্যাস নির্মাণ হচ্ছে, সেই গদ্যটা ওখানেও ধরে রাখি। এতে পাণ্ডুলিপির প্রাথমিক হাতসাফাইটা হয়ে যায়।

প্রিয় আমীনুল,
এবার তোমাকে ডায়েরির কিছু ফায়দা-ফজিলত বলি। ডায়েরি লেখার সময় দেখা যায়, একটা লাইন মনে করে লিখতে বসলাম, লিখতে লিখতে হুটহাট করে আরও কিছু লাইন ওটার সঙ্গে ফ্রি হিসেবে চলে আসে। অনেক সময় উপন্যাসের জন্য সামান্য একটা ঘটনার শুরু লিখে রাখতে চেয়েছি, কিন্তু লিখতে গিয়ে দেখি ঘটনার আরও উপাদেয় ডালাপালা বেরিয়ে আসছে। তখন আধ পৃষ্ঠা লেখার জায়গায় কয়েক পৃষ্ঠা অনায়াসে লেখা হয়ে যায়। ওই চিন্তাটা লিখে রাখতে রাখতে কখনো আরও গোটা দুই নতুন চিন্তারও উদ্ভব হয়। আমার অনেক হয়েছে এমন।
ডায়েরি লেখার আরেকটা বড় ফায়দা, ডায়েরিতে অনেক দ্রুত লেখা যায়। অনেকেই হয়তো মোবাইলের নোট বা ফেসবুকের ‘ওনলি মি’ স্ট্যাটাসের আশ্রয় নিয়ে থাকেন। কিন্তু মোবাইলের কিবোর্ডের চেয়ে ডায়েরির হস্তলিপি অনেক দ্রুত হয় এবং সহজেই অনেক কিছু লিখে ফেলা যায়। এ কারণে ডায়েরির বিকল্প মোবাইল বা ইলেক্ট্রিক ডিভাইস ভরসাযোগ্য নয়। সঙ্গে একটা ডায়েরি বা নোটবুক রাখা আশু কর্তব্য।

প্রিয় আমীনুল,
চিঠিতে তুমি জানতে চেয়েছো, নবধ্বনিতে এখন আর কেন কবিতা প্রকাশ করা হয় না। আসলে এটা আমাদের কিছুটা গাফলতি এবং পাঠক-কবিদেরও কিছুটা অমনোযোগিতার ফল। ভালো কবিতা সেভাবে আমাদের কাছে না আসার কারণে কবিতা ছাপা হচ্ছে না বেশ কিছুদিন ধরে। তবে একদমই বন্ধ হয়ে যায়নি। আবারও আমরা কবিতা প্রকাশ করবো।
তোমার পাঠানো কবিতাটাও পেয়েছি। নতুন হিসেবে অনেক ভালো হয়েছে কবিতাটা। আমার ভালো লেগেছে। এ সংখ্যায় স্থান সংকুলানের অভাবে প্রকাশ করা সম্ভব না হলেও আগামী মাসে আশা রাখি প্রকাশ পাবে। সুতরাং লিখতে থাকো, পড়তে থাকো, চিন্তা করতে থাকো এবং সবচে বড় কথা হলো, চিন্তা করতে শিখো। কখনো থেমে যেয়ো না।
একটা যুদ্ধ কোনো দেশ জয় করে না, দেশ কব্জা করে মাত্র। কিন্তু একটা চিন্তা বা একটা আইডিয়া একটা দেশ শুধু নয়, পুরো পৃথিবী বদলে দিতে পারে।

প্রিয় আমীনুল ইসলাম,
বলতে বলতে তোমাকে অনেক কথা বলা হয়ে গেলো। সময় বয়ে যাচ্ছে পৃথিবীর। পৃথিবীর কোথাও যুদ্ধ হচ্ছে, কোথাও দুর্ভিক্ষ, কোথাও বা ধর্মাচারের নামে ছেয়ে যাচ্ছে অধর্মের অনাচার। এ এক অলিখিত নিয়মতান্ত্রিকতা। এমনই হবে। পৃথিবী জন্মের পর থেকে, মানুষ আগমনের পর থেকে চলে আসছে যুদ্ধ, বিদ্বেষ, মানুষে মানুষে জিঘাংসার ইতিহাস। তুমি ইচ্ছে করলেই মুহূর্তে তা পাল্টে দিতে পারবে না। আগে তোমার নিজেকে তৈরি হতে হবে। তুমি যদি কিংবদন্তি হতে পারো তবে তোমার পৃথিবীটাও কিংবদন্তি করতে পারবে। একজন অলস বা একজন আত্মকেন্দ্রিক মানুষ কখনো পৃথিবী বদলের হাতিয়ার হতে পারে না। যে নিজের জ্ঞান, প্রজ্ঞা, সংগ্রামকে মানুষের বিপ্লবের জন্য তৈরি করে, তার হাতেই লেখা হয় পৃথিবীর ইতিহাস। আমি কামনা করি, তুমি জ্ঞানার্জন ও প্রজ্ঞা লাভের মাধ্যমে সেই সংগ্রামী মানুষদের কাতারের ইমাম হও।

ইতি
সালাহউদ্দীন জাহাঙ্গীর
নির্বাহী সম্পাদক, নবধ্বনি



ডায়েরি লেখার সাতকাহন

হামমাদ রাগিব

স্মৃতি দিয়ে শুরু

রাত তখন বেশ গভীর হয়ে গেছে। মাঘ মাসের ঝুম শীতের রাত। ছোটকাকুর ঘরে তাঁর পাশে শুয়ে আছি। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। কেন যেন হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেছে। প্রথম সাময়িকের ছুটিতে বাড়ি এসেছি। ছুটি শেষ হবার আর কয়দিন বাকি আছি, কবে ফিরতে হবে মাদরাসায়–শুয়ে শুয়ে সাত-পাঁচ ভাবছি।

হঠাৎ মনে পড়ল–আরে আজ তো আমার ডায়েরি লেখা হয়নি! কী করি এখন! ডায়েরি তো আম্মুর ঘরে রাখা। রাতও অনেক গভীর হয়ে গেছে। আম্মুরা ঘুমিয়ে পড়েছেন সেই কখন। কিন্তু ডায়েরি লেখা তো মিস করা যাবে না। দু'লাইন হলেও লিখতে হবে। মোটামুটি ভালোরকমের পেরেশানিতে পড়ে গেলাম। এত রাতে ছোটকাকুর পাশ থেকে উঠে যাওয়া বেশ দুরুহ কাজ। ছোটকাকু ঘুমোচ্ছেন ঠিক, আমি উঠতে গিয়ে নড়াচড়া করলে জেগে যাবার সমূহ আশঙ্কা বিদ্যমান। জেগে গেলে ঘাড় ধরে আবার শুইয়ে দেবেন। তকদিরে চড়-থাপ্পড় দু'-একটা লেখা থাকলে সেগুলোও বুঝে নিতে হবে। তাছাড়া এত রাতে আম্মুর ঘুম ভাঙানোও কতটা ঠিক হবে! কিন্তু ডায়েরি আমাকে

লিখতে হবে। মাস তিনেক আগে নিয়মিত ডায়েরি লেখার যে প্রতিজ্ঞা করেছি নিজের কাছে, প্রতিজ্ঞা ভাঙা যাবে না।

ছোটকাকু-সংক্রান্ত যাবতীয় আশঙ্কা ও চড়-থাপ্পড়ের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে সন্তর্পণে বিছানা থেকে নামলাম। না, ছোটকাকু জাগেননি, ঘুমোচ্ছেন। তারপরও ভয় কিন্তু কাটেনি, দরোজা খুলতে শব্দ হলে জেগে যেতে পারেন–এ আশঙ্কা মোটেও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। খুব সতর্কতার সঙ্গে ছিটকিনিতে হাত রাখলাম। দরোজাটা অল্প খানিক ফাঁক করে আলগোছে বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে। ছোটকাকু জাগেননি।

আম্মুর দরোজায় বারকয়েক নক করতে ধড়মড়িয়ে উঠে দরোজা খুলে দিলেন। তাঁর চোখে-মুখে অজানা শঙ্কা–এত রাতে কেন উঠে এলাম? তাঁকে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে একটা কিছু বলে বুঝ দিলাম। কী বলেছিলাম, এখন আর মনে নেই। আসল ব্যাপারটা বললে তিনি ভালো করে বুঝতেন না, বোঝার কথাও না এবং বকা দিতেন।

যাই হোক, আম্মুর ঘর হয়ে ছোটবোনের পড়ার টেবিলে রাখা ডায়েরিটা খুলে ডিমলাইটের অস্পষ্ট আলোতে তিন-চার লাইনের রোজনামচা লিখেছিলাম সেদিন। শুধু ধারাবাহিকতা রক্ষা করা; যেন নিয়মিত ডায়েরি লেখায় কোনো ছেদ না পড়ে এবং নিজের কাছে করা প্রতিজ্ঞার ব্যত্যয় না ঘটে।

এই কাহিনিটা যখন মিজান পড়ি, তখনকার। কোথায় যেন পড়েছিলাম, খুব সম্ভব আদীব হুজুরের 'এসো কলম মেরামত করি'র কোনো এক জায়গায়–লেখক হওয়ার জন্য প্রথম শর্ত হচ্ছে নিয়মিত রোজনামচা লেখা। আদীব হুজুর সম্ভবত এও বলেছিলেন, তিনি নিয়মিত রোজনামচা লিখতেন, একদিনও মিস দিতেন না, আর এ থেকেই তাঁর লেখালেখির প্রাথমিক মশকটা হয়ে গিয়েছিল। এ ধরনের কিছু কথা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে মিজানের বছর আমি প্রতিজ্ঞা করি যে এখন থেকে নিয়মিত রোজনামচা লিখব। চোখে তখন 'লেখক' হওয়ার দুর্দমনীয় স্বপ্ন। ভালো লেখক হওয়ার জন্য যেকোনো ধরনের কসরত করতে সদা প্রস্তুত থাকতাম।

ডায়েরি লেখার উপকারিতা

নিয়মিত ডায়েরি লেখার প্রতিজ্ঞাটা মিজান শেষ করে নাহবেমিরের বছর অবধি অটুট ছিল। একাধারে প্রায় দেড় বছরের মতো লিখেছিলাম রোজনামচা। এর ভেতর একদিনও ব্যত্যয় হয়নি। যেখানেই যেতাম, অনিবার্যভাবে ডায়েরি আমার সঙ্গে থাকত। এমনকি বিভিন্ন ছুটি-ছাটায় আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি বেড়াতে গেলেও। ফলে যেটা হয়েছে, লেখালেখির প্রাথমিক মশকটা বেশ সফলতার সঙ্গেই সেরে ফেলা গেছে। একসময় লিখতে বসলে লেখা বের হতে চাইত না কলম থেকে, এই সমস্যাটার সমাধান করা গেছে নিয়মিত ডায়েরি লেখার মাধ্যমে। এখন লিখতে বসলে হাত থমকে থাকে না, লেখার মান ভালো-মন্দ যেমনই দাঁড়াক, লিখে ফেলা যায়। একজন লেখকের জন্য এই যোগ্যতাটা অনেক বড় কিছু। এই যোগ্যতা অর্জনের অন্যতম মাধ্যম নিয়মিত ডায়েরি লেখা।

তাছাড়া নিজের ফেলে আসা জীবনের বড় একটা স্মৃতি ধরে রাখে ডায়েরি। ধরে রাখে প্রতিটা দিনের যাপিত জীবনের ভাবনাগুলো। কৈশোর-তারুণ্যে ঘটে যাওয়া যেকোনো বড় বড় ইস্যুতে কী ভেবেছিলেন আপনি, নিজের ডায়েরি বের করলে সব জীবন্ত হয়ে ধরা দেবে।

আপনি যদি বিখ্যাত কেউ হতে পারেন পরবর্তী জীবনে, তাহলে কৈশোর-তারুণ্যে লেখা আপনার ডায়েরিগুলো, ডায়েরির ভেতরের ভাবনাগুলো অসংখ্য বোদ্ধা দ্বারা ব্যাপকভাবে চর্চিতও হতে পারে।

অনলাইন-নির্ভরতার ভালো-মন্দ

নাহবেমিরের শেষ দিকে এসে ফেসবুকে নিয়মিত হই। প্রতিদিনের ভাবনাগুলো স্ট্যাটাসে লিখে ফেলতাম। নিয়মিতই লিখতাম ফেসবুকে। বেশ কিছু মানুষ উৎসাহ দিতেন কমেন্টবক্সে এসে। ফলে ডায়েরি লেখা থেকে মনযোগ উঠে যায়। প্রথমে এক-দুই দিন, পরে চার পাঁচ-দিন–এ রকম ছেদ পড়তে পড়তে ডায়েরি লেখার কথা একসময় বেমালুম ভুলেই যাই। মাস পেরিয়ে গেলেও এখন আর ওভাবে ডায়েরি খোলা হয় না।

এখন ডায়েরি খুলি অতীত রোমন্থনের জন্য। এর চেয়ে বেশি কিছু না। অনলাইন-নির্ভরতা ডায়েরি লেখার আবেদনকে ম্লান করে দিয়েছে।

কিন্তু ডায়েরি-কলমে লিখতে যে আরাম, যে অনাবিল ভালোলাগা, কি-বোর্ড-মোবাইল-ল্যাপটপের যান্ত্রিকতায় সে আরাম-ভালোলাগার পরশ পাওয়া যায় কই? ফেসবুকে যেহেতু নিজের লেখা অন্যরা পড়তে পারে, তাই ডায়েরিতে যেভাবে নিজের মনের একান্ত গোপন কথাগুলো নির্ভাবনায় লেখা যেত, ফেসবুকে তা পারা যায় না। হ্যাঁ, অনলি মি করে লেখা যায়, কিন্তু ও-তে ডায়েরিতে লেখার আরাম বা ভালোলাগা পাওয়া যায় না। অনেক সময় অনলি মি প্রাইভেসিতে লিখতে ভালোও লাগে না। যেখানে সবাইকে নিজের ভাবনাগুলো পড়ানোর সুযোগ আছে, সেখানে কেন অনলি মি করে লিখব? ফলে সবাই পড়তে পারে–এমনভাবেই ভাবনাগুলো তৈয়ার করতে হয়, নিজের একান্ত ভাবনাগুলো নিজের মতো করে আর লেখা হয় না। যাপিত জীবন থেকে পাওয়া নিজের একান্ত দুঃখ-সুখের কথা ডায়েরির গোপন পাতায় লিখে নিজেকে নির্ভার করার যে সুখ পাওয়া যেত, ফেসবুক বা অনলাইন সেটা আমাদের দিতে পারছে কই?

আনা ফ্রাঙ্কের ডায়েরি

একটু ভিন্ন প্রসঙ্গ দিয়েই লেখাটা শেষ করি। ডায়েরি বা ডায়েরি সংক্রান্ত বাতচিতে অনিবার্যভাবে একটা ডায়েরির আলাপ আমাদের সামনে চলে আসে, আনা ফ্রাঙ্কের ডায়েরি। আনা ফ্রাঙ্ক ইহুদি মেয়ে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হিটলারের নাৎসি বাহিনীর নির্মম নির্যাতনের শিকার হয়েছিল ইহুদিরা। সেই ধারাবাহিকতায় আনা ও তার পরিবারও ছিল। নাৎসি বাহিনীর নির্যাতন থেকে বাঁচতে বেশ কিছুদিন আনা ও তার পরিবার মাটির নিচে বাংকারে আত্মগোপনে ছিল। আনা ১৩ বছরের কিশোরী। আত্মগোপনে থাকাকালীন তাঁর রোজকার ভাবনাগুলো প্রতিদিন ডায়েরির পাতায় লিখে রাখত। লিখে রাখত ইহুদিদের ওপর চলা নাৎসি বাহিনীর নির্মমতার কথা। তার ও তার পরিবারের ভীত-বিহ্বল জীবনযাপনের কথা।

যুদ্ধ শেষ হবার প্রাক্কালে আনার পুরো পরিবার ধরা পড়ে নাৎসি বাহিনীর হাতে। আনা টাইফয়েডে আক্রান্ত হয় এবং চিকিৎসাহীনতায় একদিন মারাও যায়। তার কিছুদিন পর নাৎসি বাহিনী তার পরিবারকে মেরে ফেলে। কিন্তু আনার বাবা বেঁচে যান। আনার ডায়েরি তাঁর হস্তগত হয়। তিনি পরবর্তী সময়ে সেটা প্রকাশ করেন এবং ইহুদি প্রচারমাধ্যমের কল্যাণে তা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। অনূদিত হয় অসংখ্য ভাষায়। মানুষ তুমুল আগ্রহ নিয়ে পাঠ করে নিষ্পেষিত এক ইহুদিকন্যার অবরুদ্ধ কৈশোরের দিনলিপি। বিবেকবান মানুষের হৃদয় থেকে ঝরে পড়ে তার জন্য নিদারুণ সমবেদনা।

কিন্তু সময়ের কী পরিবর্তন! একসময়কার নিষ্পেষিত সেই আনা ফ্রাঙ্কের ভাই-বেরাদররাই আজ শোষকের ভূমিকায়। ফিলিস্তিনের লাখো মানুষ তাদের নিষ্পেষণের শিকার হয়ে আজ বাস্তুহারা। ফিলিস্তিনিদের ওপর তাদের নৃশংস নির্মমতার মাত্রা এতটাই ছাড়িয়ে গেছে যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তাদের ওপর আপতিত নাৎসি বাহিনীর জুলুম নির্যাতন এর তুলনায় কিছুই না। একাধারে ৭০টি বছর ধরে ফিলিস্তিনিদের তারা সম্পূর্ণ অবৈধভাবে বঞ্চনা ও নির্মমতার আঘাতে নিষ্পেষণ করে আসছে। আনা ফ্রাঙ্ক আজ বেঁচে থাকলে আর স্বজাতির এই নৃশংসতা দেখলে কী করত? নিষ্পেষিত মানুষের পাশে দাঁড়াত? নাকি কট্টর ইহুদি মেয়ে হিসেবে চোখ বুঁজে স্বজাতির পক্ষাবলম্বন করত? নির্যাতিতা হিসেবে আনার প্রতি আমাদের সহমর্মিতা আছে ঠিক, কিন্তু আমাদের ভুলে গেলে চলবে না, আনার মতো লাখো কিশোরী আজ ফিলিস্তিনের উদ্বাস্তু শিবিরগুলোতে ডুকরে কাঁদছে। আনার ভাই-বেরাদরের হাতেই নিষ্পেষিত হচ্ছে অসংখ্য মুসলিম 'আনা'। তাদের কেউ কেউ হয়তো শরণার্থী শিবিরের জীর্ণ কুটিরে বসে আনার মতোই লিখে রাখছে নিজেদের বঞ্চনার দিনলিপি।

হামমাদ রাগিব, নবধ্বনির সহকারী সম্পাদক



বিখ্যাত কিছু ডায়েরির গল্প

সুবহে সাদিক

কিছু কথা কাউকেই বলা যায় না। এমনকি নিজের প্রিয় মানুষদেরও না। মনের গোপন কুঠুরিতে থাকা সেসব কথা মনের ভেতরেই গুমরে মরে। কিন্তু মনের কথা আটকে রাখতে পারে না মানুষ। কাউকে না কাউকে জানাতে হয়। না জানিয়ে শান্তি নেই। কাউকে বলে কোনো লাভ হোক বা না-হোক, বললেই যেন স্বস্তি পাওয়া যায়। কিন্তু যখন চারপাশের সবাইকে অবিশ্বস্ত মনে হয় এবং মনের কথা বলার মতো কাউকেই পাওয়া যায় না তখন একমাত্র কাগজই হয়ে ওঠে মানুষের বিশ্বস্ত বন্ধু।

এভাবেই হয়েছে ডায়েরি লেখার সূচনা। কিন্তু সূচনাটা ঠিক কবে থেকে, তার সঠিক তথ্য জানা সম্ভব না। কারণ ডায়েরি নিতান্ত গোপনীয় বিষয়। তাই প্রথম কবে থেকে ডায়েরি লেখা শুরু হয়–সে কথা কে বলতে পারে। তবে ঠিক ডায়েরি না-হলেও ডায়েরির মতো করে প্রাচীন যুগ থেকে অনেক কিছু লেখা হয়েছে। আগের দিনে রাজা-বাদশাহদের দরবারে পণ্ডিতরা থাকতেন, নানা ঘটনা তাঁরা লিখে রাখতেন। সেসব আজ ইতিহাসের অন্যতম সূত্র। এইসব দিনপঞ্জিতে ডায়েরির মতো তারিখ নিখুঁতভাবে উল্লেখ করা হতো না। তবে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার তারিখ লেখা হতো। এসব দিনপঞ্জিকেও আজকের ডায়েরির প্রাচীন সংস্করণ বলা যায়।

ডায়েরি ও আত্মজীবনী খুব কাছাকাছি। ডায়েরিতে সন-তারিখ দিয়ে দিনের ঘটনা দিনে লেখা হয়। আত্মজীবনীতে লেখা হয় স্মৃতির ডায়েরি থেকে।

সেখানে দিন-তারিখ উল্লেখ থাকে না। তবে দুটোই মানুষের জীবনের সবচেয়ে বাস্তব আখ্যান।
সুলতান মাহমুদ গজনবির দরবারের বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন ফারিশতা। সুলতান মাহমুদের নানা বিজয়ের আখ্যান তিনি লিখে গেছেন ডায়েরির মতো করে। কাজি বাহাউদ্দিন শাদ্দাদ লিখেছিলেন সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবির বিজয়গাথাসমূহ।
অনুমতি ছাড়া কারও ডায়েরি পড়তে নেই–এই শিষ্টাচার ভদ্র কারও অজানা থাকে না। লক করে রাখা যায় এমন ডায়েরিও পাওয়া যায় বাজারে। কেউ গোপনে যেন পড়তে না পারে–সে-কথা ভেবেই এমন ডায়েরি তৈরি করা হয়।

কখন মানুষ ডায়েরি লেখে?

এই প্রশ্নের অনেক উত্তর। তবে সহজ একটা উত্তর হলো যখন তার মধ্যে আবেগ উথলে ওঠে। সে আবেগের কথা কাউকে খুব বলতে ইচ্ছে করে। প্রেমে পড়ার মতো বিষয় হলে সে-কথা কাউকে বলাও যায় না। তখন ডায়েরি হয়ে ওঠে মানুষের বিশ্বস্ত বন্ধু। আবার কখনো বলার মতো কাউকে পাওয়া যায় না। তাই মানুষ ডায়েরির আশ্রয় নেয়।
ডায়েরি যতই গোপন ও ব্যক্তিগত বিষয় হোক না কেন, কখনো কখনো ডায়েরি ব্যক্তির গণ্ডি থেকে বেরিয়ে সমাজ, রাষ্ট্র এমনকি বিশ্ব পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। অতি গোপন ডায়েরি হয়ে ওঠে সাহিত্যিকদের অন্যতম রচনা। পৃথিবীর বহু বিখ্যাত মানুষ এমনকি অনেক অখ্যাত ব্যক্তির বিখ্যাত হয়ে যাওয়া কিছু ডায়েরির কথা তুলে ধরা হলো নবধ্বনির পাঠকদের জন্য।

কারাগারের রোজনামচা

কারাগার নিঃসঙ্গ জায়গা। কথা বলার মতো মানুষ সেখানে নেই। থাকলেও কথা বলার সুযোগ নেই। এই দুঃসময়ে অনেকেই ডায়েরি লিখতে শুরু করেন। কারা-কর্তৃপক্ষ সদয় না হলে কারও সে সৌভাগ্যও হয় না। কেউ লিখতে পারেন কিন্তু সেই লেখা বাজেয়াপ্ত হয়ে যায়। সেদিক থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কারাগারের রোজনামচাকে অলৌকিক বলা যায়।
বঙ্গবন্ধুর যে রোজনামচা আমরা পাই সেগুলো তিনি লিখেছিলেন বঙ্গবন্ধু হওয়ার অনেক আগে। ১৯৪৮ সাল থেকে বিভিন্ন মেয়াদে বারবার তাঁকে জেলে থাকতে হয়েছে। কারাগারের রোজনামচা নামে যে বইটি বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত হয়েছে তা ১৯৬৬-৬৮ সালের দিকে লেখা। ১৯৭১ সালের যুদ্ধ এবং এরপর নানা চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে এই ডায়েরি যেভাবে আমাদের কাছে পৌঁছেছে সেজন্য তাকে অবশ্যই অলৌকিক বলা যায়।
বঙ্গবন্ধু রোজনামচা লিখতেন ডায়েরিতে নয়, খাতায়। জেলে পরিবার সাক্ষাৎ করতে গেলে খাতাগুলো দিয়ে দিতেন। তাঁর বেশিরভাগ খাতা নানা উপায়ে পরিবারের মাধ্যমে সংরক্ষিত হয়েছে। তবে কারাগারের রোজনামচা বইটির লেখা পাকিস্তান সরকার বাজেয়াপ্ত করেছিল। কেউ কোনোদিন আশা করেনি এই লেখা কখনো খুঁজে পাওয়া যাবে। আলোর মুখ দেখবে ছোট রাফখাতায় লেখা এক রাজবন্দীর কথামালা। বঙ্গবন্ধু মৃত্যুবরণ করার প্রায় ৪০ বছর পর, তাঁর স্বপ্নের স্বাধীন দেশে তাঁর কন্যা যখন প্রধানমন্ত্রী, তখন গোয়েন্দা বিভাগের গুদাম ঘেঁটে উদ্ধার করা হয় এই অলৌকিক রোজনামচা। আজ তা বাংলাভাষায় অন্যতম পাঠ্যগ্রহের বিষয়।

আ লং ওয়াক টু ফ্রিডম

এই গল্পটাও বঙ্গবন্ধুর মতো এক অবিসংবাদিত নেতার। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ প্রেসিডেন্ট এবং বর্ণবাদের বিরুদ্ধে লড়াইকারী অকুতোভয় যোদ্ধা নেলসন ম্যান্ডেলা প্রায় ৩০ বছর ছিলেন কারাগারে। ৪৬৬৬৪ নাম্বার কক্ষটি বিখ্যাত হয়েছে তাঁর সৌজন্যে। জেলের দীর্ঘ নিঃসঙ্গতায় তিনিও লিখতে শুরু করেছিলেন তাঁর সংগ্রামমুখর জীবনের গল্প। লেখা তো লিখেছিলেন কিন্তু পুলিশের চোখ ফাঁকি দিয়ে সেই লেখা কীভাবে জেলের বাইরে এলো এবং হয়ে উঠল এক কিংবদন্তির আখ্যান, সে গল্প বেশ রোমাঞ্চকর।
দীর্ঘ বন্দীজীবনের মুক্তির সূর্য উদিত হয় ম্যান্ডেলার জীবন-আকাশে। তবে তিনি

জানতেন না ঠিক কবে তাঁকে মুক্তি দেয়া হবে। একদিন হঠাৎ করে সকালবেলা তাঁকে ডেকে নেয়া হয় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য। জানানো হয়, তাঁর মুক্তি হয়ে গেছে। তাঁকে জেলের বাইরে নেয়া হবে। কারা-কর্তৃপক্ষ জিজ্ঞাসাবাদের কক্ষ থেকেই তাঁকে বাইরে নিতে চেয়েছিল। তারা ভেবেছিল, কারা-প্রকোষ্ঠে তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু নেই যে তা গোছাতে হবে। কিন্তু ম্যান্ডেলা জানেন মহামূল্যবান লেখাগুলো রয়ে গেছে সেখানে। এগুলো সাথে নিতে না-পারলে দীর্ঘ কারাজীবনই তাঁর বৃথা মনে হবে। ম্যান্ডেলা জিজ্ঞাসাবাদের কক্ষ থেকে সরাসরি জেলের বাইরে যেতে অস্বীকৃতি জানান। কারা-কর্তৃপক্ষ সন্দেহ করে বসলে আর উপায় নেই। লেখার অপরাধে আবার মামলা দিয়ে তাঁকে জেলে পুরে রাখা হবে।

ম্যান্ডেলা বললেন, আমার কিছু বইপত্র সেখানে আছে। সেগুলো জেলের লাইব্রেরিতে পৌঁছে দেয়া প্রয়োজন। এই অজুহাতও কারা-কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করতে চায়নি। ম্যান্ডেলা তখন কৌশলের আশ্রয় নেন। তাদের জানান, সহবন্দীদের থেকে নেয়া কিছু বইপত্র তাদের ফিরিয়ে দিতে হবে। এ কথা বলার পর তাঁকে যেতে দেয়া হয়। এভাবে তিনি তাঁর মূল্যবান লেখাগুলো সংরক্ষণ করেন।

বইটি খণ্ড খণ্ড করে কৌশলে জেলের বাইরে পাঠিয়ে দেয়া হতো। একবার ধরাও পড়েছিলেন কারা-কর্তৃপক্ষের কাছে। অবশ্য সে পাণ্ডুলিপির কপি আগেই বাইরে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল। সে-যাত্রায় তাই লেখা হারাতে হয়নি তাঁকে। এভাবে সংরক্ষিত হয়েছিল এই কিংবদন্তির জীবনের গল্প।

যুদ্ধ দিনের কথা : আনা ফ্রাংক ও জাহানারা ইমাম

আনা ফ্রাঙ্ক নামের কিশোরী মেয়েটিকে কে না চেনে? শুধু ডায়েরি লিখে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে তার খ্যাতি। আমস্টারডামে নাৎসি বাহিনীর হাতে অবরুদ্ধ থাকাবস্থায় ডায়েরি লিখেছিল ফ্রাঙ্ক। ১৯৪৫ সালে জার্মান বাহিনীর নির্মমতায় প্রাণ হারাতে হয় তাকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ভাগ্যক্রমে বেঁচে যাওয়া তার বাবা তাদের বাড়ির ধ্বংস্তূপ থেকে আনার ডায়েরিটি বের করে প্রকাশ করেন। যুদ্ধের বিভীষিকাময় সময়ে লেখা আনার এই দিনলিপি বিশ্বে সর্বাধিক অনূদিত ও পঠিত বইয়ের একটি।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ডামাডোল সময়ে দিনলিপি লিখেছিলেন এক মুক্তিযোদ্ধার মা সংগ্রামী নারী জাহানারা ইমাম। মুক্তিযুদ্ধের সময় ঢাকায় কেটেছে তাঁর দিনগুলো। একাত্তরে পাকিস্তানি বাহিনীর বর্বরতার নানা চিত্র ফুটে উঠেছে তাঁর দিনলিপিতে। তাঁর ব্যাক্তিগত দিনলিপি হয়ে উঠেছে মুক্তিযুদ্ধের দলিলের অন্যতম অংশ।

বাংলায় লেখা কিছু বিখ্যাত ডায়েরি

বাংলা সাহিত্যের প্রাণপুরুষ রবীন্দ্রনাথ ‘পশ্চিমের ডায়েরি’ নামে একটি বই লিখেছেন। এটি তাঁর ইউরোপের ভ্রমণকাহিনি। এতে দিন-তারিখ দেওয়া নেই। তবু রবীন্দ্রনাথ এর নাম রেখেছেন ডায়েরি।

এ ছাড়াও বাংলাভাষার অনেক বিখ্যাত লেখকের ডায়েরি প্রকাশিত হয়েছে। আহমদ ছফার ডায়েরি পড়লে তাঁর চিরকুমার জীবনের এলোমেলো ভাব ও বিষণ্নতার ছাপ স্পষ্ট বোঝা যায়। সৈয়দ আলী আহসান নিয়মিত ডায়েরি লিখতেন। ‘১৯৭৫ সাল’ নামে তাঁর দিনলিপির একটি বইও পাওয়া যায়। সরদার ফজলুল করিমও তাঁর দিনলিপি প্রকাশ করেছেন। বাদ যাননি সৈয়দ মুজতবা আলীও। তাঁর দিনলিপিতে আবহাওয়া কেমন ছিল, রাতে মশার কামড় কেমন খেয়েছিলেন–রসময় ভঙ্গিতে সেসবেরও বিস্তারিত উল্লেখ আছে। সবশেষে ডায়েরি নিয়ে বলতে গেলে স্যামুয়েল পেপির ডায়েরির কথা না বললেই নয়। ১৭ শতকের লেখা এই ডায়েরি পৃথিবীর প্রাচীনতম ডায়েরির একটি। পেপি ছিলেন বৃটিশ নৌবাহিনীর একজন অফিসার। তাঁর ডায়েরিতে তিনি সেসময়ের নানা কথা লিখে গেছেন। তাঁর ডায়েরির মাধ্যমে সে সময়ের অনেক অজানা তথ্য জানতে পেরেছে আজকের আধুনিক পৃথিবী।

লেখক : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী



যেখানে লেখা থাকে যাপিতের দীর্ঘশ্বাস

হাসিব ইমতিয়াজ

কখন কোথায় প্রথম ডায়েরি দেখি, মনে পড়ে না। এইটুকু মনে পড়ে, আমাদের হিফজের সময় শিক্ষকের ডেস্কের ওপর কালো প্রচ্ছদের একটা ডায়েরি রাখা, উনার অবর্তমানে আমরা সেটা উল্টেপাল্টে দেখি। চোখে অপার মুগ্ধতা। ভেতরে কিছু সুন্দর দৃশ্য ছিল; ওগুলোই হয়তো আমাদের মূল আগ্রহের কারণ। বড় কোনো মাদরাসার বিদায়ী ছাত্রদের করা কাজ ছিল বোধহয়। আজ আর সেসব স্পষ্ট মনে পড়ে না। দুরন্ত কৈশোর তখন। চোখে মুগ্ধতার আবেশ। চারপাশে যা দেখি ভালো লাগে, নির্মল।

মাদরাসার পাশের লাইব্রেরিতে প্রায়ই যেতাম আমরা। অবসরের সময় অথবা শিক্ষকদের চোখ ফাঁকি দিয়ে নানা অজুহাতে যাওয়া হতো। স্কুলের পাঠ্যবই ছাড়া আর কোনো বই চোখে পড়েনি কখনো, তবে বাহারিরঙের খাতা, কলম, রঙপেন্সিল, ইরেজার আরও কতো কী! একবুক হাহাকার নিয়ে ফিরতাম মাদরাসায়।

সেই লাইব্রেরিতেই একদিন বিকেলে দাঁড়িয়ে আছি একলা। হঠাৎ করেই চোখ পড়ে বেগুনি রঙের একটা বাকশোর ওপর। অনেকক্ষণ পরে বুঝতে পারি এটা ডায়েরি। প্রচ্ছদে লাল-হলুদের ডোরাকাটা, অনেক সুন্দর। দেখে আর চোখ ফেরাতে পারি না। ভাবি, যে করেই হোক এটা নিতে হবে; কিন্তু এত টাকা পাব কোথায়? বাড়ি থেকে তখন একশ' টাকা করে দেয় মাসে। দুরুদুরু বুকে দোকানিকে দাম জিজ্ঞেস করে যা শুনলাম তার জন্য আমাকে আরও চার-পাঁচ মাস অপেক্ষা করতে হবে। এদিক-সেদিক না ভেবেই বলে ফেলি ডায়েরিটা আমার এখন প্রয়োজন; প্রতিমাসে পঞ্চাশ টাকা করে দিয়ে দেবো। দোকানি অনেকক্ষণ চুপ থেকে চেয়ার ছেড়ে উঠে গিয়ে পেপার দিয়ে বেঁধে দেন।

বুকের ভেতর একবুক কৃতজ্ঞতা আর তুমুল উচ্ছ্বাস নিয়ে মাদরাসায় প্রবেশ করি। পাশের সিটের নাঈমকে জাগিয়ে তুলে ঘটনা বললে ও বিস্ময়ে হতবাক হয়ে বলে, 'এটা রাখবি কোথায়?' আমিও ভাবনায় পড়ে যাই, মাদরাসায় আমার ট্রাঙ্ক-সিট কিছুই নেই। শেষে নাঈম ওর ট্রাঙ্কে রাখার কথা বলে। আমিও রাজি হয়ে যাই।

ছাদে গিয়ে প্যাকেট খুলে দেখি–উপরে যেটা ছিলো ওটা ডায়েরির প্রচ্ছদ, মূল ডায়েরি ভেতরে। খয়েরি রঙের প্রচ্ছদ, তার উপরে খোদাই করে লেখা : ২০০৯। ভেতরে তিন রঙের পৃষ্ঠা। পৃষ্ঠার শেষে মনীষীদের বাণী।

বিকেলে দোকান থেকে রঙবেরঙের কলম কিনে আনি, অথচ আমি জানিও না এই ডায়েরিতে আমার কী কাজ! রাতের বেলা পাশের বাড়ির বাগান থেকে গোলাপ এনে পাপড়ি ছিঁড়ে রেখে দিই ডায়েরির ভেতর, সাথে দিবসের সমস্ত উচ্ছ্বাস। কিছুদিন পর ধূসর-মলিন হয়ে মিশে থাকে পৃষ্ঠার সঙ্গে। কড়া সৌরভে ভরপুর প্রতিটা পৃষ্ঠা–এসবের

ভেতর শব্দহীন আমার কৈশোরের উদ্বেল-উদ্বাহু দিন।
শীতের রাতে একা-একা ফিরি মাদরাসায়। বহুদূর থেকে ভেসে আসে সুরেলা আওয়াজ। কিছু শব্দ মাথায় গেঁথে যায়। হাতের লেখা সুন্দর–এমন কাউকে দিয়ে তা লিখিয়ে নিই ডায়েরির পাতায়।
একদিন এক শিক্ষকের কামরা পরিষ্কার করার সময় পাই পুরোনো অনেক পত্রিকা। ঘাঁটাঘাঁটির সময় একটা নামে চোখ আটকে যায়–সাদ্দাম হোসাইন। উপরে তাঁর ছবি। আমাদের শৈশবের নায়ক। কাঁচি দিয়ে সুন্দর করে কেটে আঠা দিয়ে লাগিয়ে দিই ডায়েরির রঙিন পৃষ্ঠায়। ফেলে আসা দিনগুলো কলকলিয়ে ওঠে যেন। ঝটপট আরও কিছু ভালোলাগা ছবি নিয়ে নিই সেখান থেকে। তারপর এই দৃশ্যাবলি সংগ্রহ করার একটা নেশা চেপে যায় মাথায়।
বছরের শেষদিকে একজন ছাত্র এসে ভর্তি হয়, ভালো আঁকতে পারে সে। ফাঁকে ওকে দিয়ে আঁকিয়ে নিই কিছু একটা। মন খারাপ হলে ভাঙা-ভাঙা শব্দে লিখে রাখি বেদনা, সুবহে সাদিকের ক্ষোভ। এভাবে শেষ হয়ে যাচ্ছে বছর, ডায়েরিভর্তি কৈশোরের দুরন্তপনা। শেষের দিকে এসে আজেবাজে আর কিছুই স্থান পায় না, শেষ হয়ে গেলে আবার! এর মধ্যে হঠাৎ একদিন বাড়িতে চলে যাই। ডায়েরি নাঈমের ট্রাঙ্কে। বাড়িতে থাকার সারাটা সময় বুকে উৎকণ্ঠা। ফিরে এসে দেখি নাঈম নেই। সপ্তাহ পেরোলেও ফেরে না। বুকটা চিনচিন করতে থাকে। নাঈমের ট্রাঙ্কে তালাবদ্ধ আমার ডায়েরি, রঙিন দৃশ্যাবলি, গুচ্ছ-গুচ্ছ বেদনা। রাতে ঘুম হয় না। ছটফট করতে করতে কেটে যায় অন্ধকার। বাড়ি থেকে নিয়ে আসা উচ্ছ্বাস বুক-পকেটে মিইয়ে যেতে থাকে। বিকেল হলেই ওর আসার পথে উদাসীন তাকিয়ে থাকি। সন্ধ্যা নামে পৃথিবীতে। চারপাশের কোলাহল থেমে যেতে থাকে ক্রমশ। বুকে দুর্বিষহ যাতনা। একদিন দুপুরের ঘুমের পর মাদরাসায় এসে দেখি নাঈমের ট্রাঙ্ক নেই। শুনি, এখানে আর পড়বে না ও, তাই ওর বাবা এসে নিয়ে গেছে সব। মনে হয়, কোথাও কেউ নেই। আমার অপাপবিদ্ধ কৈশোরের সমস্ত উচ্ছ্বাস নিয়ে চলে গেছে নাঈম।
হিফজ শেষে অনেকদিন ডায়েরির কাছে আসা হয়নি। ভুলেই গিয়েছিলাম–ডায়েরির রঙিন পৃষ্ঠা, শেষের দিকে মন ভালো করে দেওয়া বাণী, সেখানে জমা করে রাখা গুচ্ছ-গুচ্ছ বেদনা, গোলাপের ধূসর পাপড়ি; অপাপবিদ্ধ কৈশোরের সমস্ত উচ্ছ্বাস জমা করে রাখার নিঃশব্দ ডাকবাকশো কিংবা হঠাৎ উড়ে আসা বাতাসের কোলাহল। জীবন তখন বয়ে চলছে ভিন্ন এক দ্যোতনায়।
তারও বহুদিন পর, যখন আমি ভুলে গেছি ফেলে আসা জীবনের অনেক স্মৃতি। সময়ের ধূসরতায় মলিন হয়ে গেছে জীবনের অনেক স্বপ্ন–নাঈমের ট্রাঙ্কে তালাবন্দী আমার সমস্ত দীর্ঘশ্বাস। কারও কাছ থেকে পাওয়া আঘাতের কথা লিখে রাখার জন্য আবার তুলে নিই ডায়েরি। আগের মতোন রঙচটা নয়, জীর্ণ অবয়বে সাদামাটা পৃষ্ঠার। রাত জেগে কাগুজে পৃষ্ঠার বুকে তুলে রাখি বেদনার নির্যাস। সেই থেকে শুরু আবার–জীবনের নিত্যকার টানাপোড়েন, হাহাকার, হাসি-কান্না, কোলাহল অথবা নির্জনতার গল্প লিখে রাখি ডায়েরির বিশ্বস্ত পৃষ্ঠায়। চাইলেই লিখে ফেলা যায় জীবনের না-বলা গল্প। সময়ের ধূসরতায় স্মৃতিতে সেইসব মলিন হলেও ডায়েরির গোপন পৃষ্ঠায় সেগুলো থেকে যায় জীবন্ত।
বাড়িতে এলে মাঝে-মাঝে বিষণ্ন দুপুরে অথবা বৃষ্টিদিনে ড্রয়ার থেকে খুলে নিই এসব। পুরোনো ডায়েরির ধুলিমলিন পৃষ্ঠার বুকে হাত বুলিয়ে দিই পরম মমতায়। পৃষ্ঠা উল্টালে চমকে উঠি কখনো। একসময় কাউকে ঘিরে আমার এমন ভাবনা ছিল? কত মানুষের গল্প পাতায় পাতায়, যাদের সঙ্গে কখনো দেখাই হয়নি কিংবা দেখা হলেও আলাপ হয়নি কোনোদিন; অথচ কী অবলীলায় আমি লিখে রেখেছি তাদের প্রেম, উপেক্ষা, কোলাহল। এমনি প্রতিনিয়ত ডায়েরির পাতায় জমা হয়ে থাকে ব্যক্তিগত জীবনের ব্যর্থতা, বিষাদ, যন্ত্রণা আর গ্লানির গল্প।

হাসিব ইমতিয়াজ : জামিয়া ফরিদাবাদ ঢাকা'র শিক্ষার্থী



শুদ্ধতম হরফের জন্য কৈফিয়ত

যিয়াদ বিন সাঈদ

অক্ষুব্ধ এক স্তব্ধতা নেমে আসা ওই হিফজখানার মখমল বিছানাটিতে শুয়ে আছি আমি। এখানে একটি ডিমবাতি জ্বলে আছে। সবুজ রঙের এ ডিমবাতিটি কী ঐশ্বরিক আলোকে পুরো কামরা জড়িয়ে রেখেছে। মশারির ভেতর ভোর রাতে সবক শোনাবার অধৈর্য অস্থিরতা নিয়ে শুয়ে থাকা এক শূন্যচিন্তক আমি, যার হাতে এখন একটি ‘ডায়েরি’। যাতনার ইতিহাসে ভরা এ ডায়েরিটির রঙিন প্রচ্ছদে ঢেউ খেলানো অক্ষরে লেখা ‘আনা ফ্রাঙ্কের ডায়েরি’। আধো আলো আধো জোছনার ভেতর নির্ঘুম ‘আমি’ খচখচে শব্দের ছন্দে ছুটে যাচ্ছি বিরতিহীন। যেন বক্ররৈখিক এক জীবনের মাঝে বৃত্তের আগমন কিঞ্চিত নির্বিশঙ্ক অভয়।
তখন থেকেই মূলত ডায়েরির প্রতি আমার অভিরতি অনুরতির সৃষ্টি। ইতিহাস সৃষ্টির খেয়ালে কিংবা একান্ত মনের আলাপ বেঁধে রাখবার জিগিরে আমি রোজ রাতেই বসতাম আমার ডায়েরির সান্নিধ্যে। পৃথিবীর কাউকে না-বলতে পারা সব বাতচিত আমি ওর সঙ্গেই করতাম। ভুল বানানে প্রেমের তাশরিহ অথবা অব্যক্ত প্রেমিকার কাছে ওড়াতে থাকা চিঠির শব্দগুলো আমি খুব সন্তর্পণে এখানে গুছিয়ে রাখতাম। নিভু নিভু ডিম বাতির আলোয় লিখতে থাকা আমার মনে হতো একদিন নিশ্চয়ই ছুঁয়ে যাব পৃথিবীর আকাশ; সেদিন কি এ অক্ষরগুলো জ্যোতির মতো জ্বলজ্বলে হয়ে উঠবে না? ভেবে ভেবে নিজের কাছেই লজ্জায় মুখ নুয়ে আসত আমার। ফিক করে হেসে ফেলে বন্ধ করে দিতাম রংচঙে সেই

ডায়েরিটি।

একটি মাত্রই ডায়েরি আমার লেখা হয়েছে যদ্দুর মনে পড়ে। কিন্তু সে ডায়েরিটি কী অবাক বিস্ময়ে আমার শেলফে আজও তাকিয়ে থাকে আমার দিকে। পুরোনো প্রেম অথবা কৈশোরে আমাদের জীবনে নেমে আসা সব সংগ্রামের ইতিহাস, একে একে আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে যায় ফেলে আসা সেই সময়ে। আমাকে নিয়ে যায় টিনের চালা দিয়ে কোনোরকম নির্মিত সেই ছোট্ট দালানটির বিচিত্র আঙিনায়। রাতে বৃষ্টি হলে ফুটো দিয়ে পানি পড়বার শঙ্কা নিয়ে আমরা ঘুমোতে যেতাম। কখনো বৃষ্টি নেমে এলে আমাদের 'আম্মু' হন্যে হয়ে সে রাতেই পানি সেঁচে ফেলার জন্যে তড়িঘড়ি করতেন। কত যাতনাময় সে সময়ের গল্প। আমার ডায়েরির পৃষ্ঠাগুলো ধরে ধরেই কেবল আমি ফিরে যেতে পারি আমার সেই সময়গুলোতে। এ সময়গুলোকে আমি কখনো 'হারানো' সময়ও বলি। নানা দুর্বিষহতার ভেতর দিয়েও নারকেলতলায় আমাদের রিনরিনে সে সুখের গল্প যখন হাজির করে আমার ডায়েরি, তখন আমার সত্যিই মনে হয় 'মা মাদা মাদা, লাইসা লাহুল কাদা'।

'ডায়েরি' আমার মনে অবিচ্ছেদ্য এক অংশকে নিয়ন্ত্রণ করার পেছনে আরও কিছু কারণ ছিল। ওই যে ঘর, নারকেলতলায় টিকে থাকা জুবুথুবু সময়, তখন মাঝে মাঝেই দেখতাম আম্মু কী যেন পড়ছেন লুকিয়ে। আমাদের উপস্থিতি টের পেলেই আম্মুর মুখে সেটা লুকিয়ে ফেলার ব্যস্ততা টের পেতাম। কখনো ওড়নায় মুখ জড়িয়ে আস্তে করে কেটে পড়তেন। মাঝে মাঝে নরম সুরে আমাদের সরে আসতে বলতেন। কিন্তু 'আল-ইনসানু হারিসুন ফি মা মুনিয়া'র পদভারে পিষ্ট আমাদের কৌতূহল কেবলই বাড়তে থাকত। আমাদের ছোট্ট মন বলত, আম্মু এটা পড়ে কাঁদছেন কেন? কী আছে এতে? ওড়নার একটি পাশ আস্তে করে ধরে যখন তিনি মুছতেন তাঁর চোখ দুটি, আমাদের হৃদয়ে হতো প্রবল রক্তক্ষরণ।

ক'দিন পরই আমরা এর রহস্য খুঁজে বের করতে পেরেছিলাম। আব্বুর প্রবাস-জীবনে একা একা এ দেশটিতে পড়ে থাকা আম্মুর সে সময়কালের লেখা একটি ডায়েরি এটি। আব্বুর অনুপস্থিতিতে তীব্র যাতনার ভেতর দিয়ে চলতে থাকা আম্মুর সে সময়ক্রম, যেন এখন সবই ভাবনার ঊর্ধ্বে। বেসামাল সাংসারিক অতৃপ্তি, এখানের মানুষজনের উচ্চাভিলাষ, সত্যিই সদ্য বিশ পেরোনো এক কিশোরীর জন্যে আকাশসম ভার ও দুর্বহ। সবকিছু হরফে হরফে লিখে রাখা একটি ডায়েরি একটি জীবনের জন্যে কী এক অবিস্মরণীয় স্মৃতিকে ধরে রেখেছে, আম্মুর সে ডায়েরি আজও আমাদেরকে বিহ্বল করে তোলে। মনে করিয়ে দেয় জীবনের এ ক্ষণকাল, এক তৃতীয়াংশ অতীত আর দুই তৃতীয়াংশ ভবিষ্যতের যে সময়ক্রম, সবগুলোকে একটি সুতোয় গেঁথে রাখবার জন্যে একটি ডায়েরিই তো যথেষ্ট। কেউ দেখে না-ফেলুক এ রত্ন। আলমারিতে কাপড়ের নিচে অথবা ড্রয়ারের কোণে ডায়েরিটা লুকিয়ে রাখার চেষ্টা আমি সবসময়ই করতাম। ভেতরে টুকে রাখা চুপিচুপি আলাপ কেউ যদি জেনে ফেলে, কী কাণ্ডটাই না হবে! আব্বুর ভয় আর আম্মুর আদুরে শাসনের কাছে আমি পরাস্ত ছিলাম সবটা সময়। লুকোচুরির এ খেলা খেলে যাওয়া সত্ত্বেও একদিন সব একসঙ্গে জেঁকে বসল যেন। বালিশচাপা দিয়ে রাখা ডায়েরি হুজুর দেখে ফেললেন। জমা নিয়ে আব্বুকে দিয়েও দিলেন। চারপাশে এক ডায়েরিকে কেন্দ্র করে রই রই রব উঠলো। ছেলেপেলের মুখে শোনা গেল নানান কিসিমের কথাবার্তা। পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় সাজিয়ে রাখা কল্পিত এক প্রেমিকার চরিত্র ঝুলিয়ে দিল নিন্দার অসম পর্বতের বিশল্যকরণী লতায় লতায়। সেই থেকে আমার মনেও বাজতে থাকল একটি শব্দ–'মাহফুজা, হায় মাহফুজা!'

আসলে একটি ডায়েরি এমনই বিচিত্র সত্ত্বার ধারক। কখনো ঝকমকে ঝুমকো লতার মতো চটকদার, আবার সে-ই তো অব্যাখ্যেয় এক সমঝের অংশীদার। ফলে সব সময়ই জীবন অথবা ঘরের চোখ ধাঁধানো শেলফে সে অবর্ণনীয় আলোকের মাঝে এক নিরপরাধ আঁধার।

যিয়াদ বিন সাঈদ : মাদরাসাতুল কাউসার ঢাকা'র শিক্ষার্থী



ডায়েরির পাতা থেকে

কাউসার মাহমুদ

মথিত কুয়াশার ভেতর একপিঠ হিম অনুভব করেই ভোরটা মাড়ালাম। দু'পা হেঁটে কোনো এক নির্জীব বয়স্ক মানুষের মতোই কোথাও চলে যেতে ইচ্ছে করে। ইচ্ছে করে অমল নিরুদ্বেগ জীবনের কোল ঘেঁষে টই টই অথবা সুস্থির চলে যাব কোথাও। যেখানে ক্লেদ ও সহিংস কোনো চোখ আমাকে দেখবে না। ডাকবে না আনাড়ি গোমড়া কেউ। একটু আলাদা, সামান্য প্রয়োজনীয় বিচ্ছিন্নতা। এই তো। একটি দোয়েল পাখি কিবা সারশের মতো গাছেতে, জলেতে আমি বইবো। অথবা দোল খাব এই শিশিরভেজা কাঁঠাল পাতাটির মতো। যেটি সবে কিছুটা ঘুরে আমার সম্মুখে পদানত হলো। সর্বাঙ্গ ভেজা পাতাটির গায়ে কী অপরূপ শিশিরকণা। মাটিতে একাকার হয়ে গড়িয়ে আছে যেন সুন্দর। আমি উবু হই। পাতাটি বুক-পকেটে ভরে সামনে এগোই। আর কোনোদিনও যদি এই সকাল ও বিমোহিত সুন্দর হয়ে পাতা পড়া আমার চোখে না পড়ে, তবুও আমার দুঃখ নেই। অথচ আমরা কেমন এগোতেই থাকি। এগোতে এগোতে কোথায় যে চলে যাই। কোন পথের বাঁকে! তা কি আর আমাদের জানা রয়! প্রহর থেকে প্রহর। আমরা প্রবাহিত হই সময় ও একটি বহমানতার সাথেই।

এই তো তারপর। বিকেল এলো। দুপুর নাগাদ কত রঙ ধরে এলো আকাশ। রোদ নরেম। কিছুটা হালকা উষ্ণ প্রলেপ। বারোটা নাগাদ মরা মরা। এরপর কিছুটা কড়া। তবে তেজ নয়, মোলায়েম। এই করে দূর গাছটির ওপর জ্বলে ওঠা রোদটি, আমার ঘরের মাঝে জানালার একপাট দিয়ে উড়ে আসা রোদটি, কম্বলে দাগ পড়া রোদটি ধরতে ধরতেই কিনা সময়টা চলে গেল। অথচ ধরা হলো না একখণ্ড রোদ। যেন-বা ঘাসবনে বিপ্রতীপ প্রজাপতিটির পুচ্ছতেই এই রোদ বড় অয়োময়। গোলাপ

ও নাম না জানা ফুলটির হলুদ পাপড়িতে লেগে থাকা এই আলো আরও লাস্যময়। ফুলের বুক যদি নারীদের মতোই দেখা যেত! ছোঁয়া যেত! বলছি, নারীদের মতো আকৃতি যদি হতো ফুলের, তাহলে যে করেই হোক, যেভাবেই হোক আমার সমস্ত রোদ আমি ফুলেদের বুকে ঢালতাম। কিবা রোদ তাড়িয়ে নিয়ে যেতাম রাখালের মতোই। তখনও প্রতিদিন বিকেল নেমে যেত। যে-করে এখন নেমেছে।
রিকশায় বসে শহুরেপনা দেখছি। দূর থেকে রমনা পার্কটি গোচর হতেই মনে পড়ে গেল অতীত। কী এক অদ্ভুত ভাবনায় তাড়িত হয়ে শরতের আকাশ দেখব বলে আমরা এসেছিলাম এইখানে। ঢাকা শহরে তো আর অমন শান্ত, সুস্থির হয়ে কোথাও একদণ্ড বসবার অবকাশ নেই। তাই এই ঘাস ও গাছের তৃণমূলের ভেতর আমি আর আমার বন্ধুটি এসেছিলাম। এখন খুব করে মনে পড়ছে ওকে। এই রমনা। ওই তো আরেকটু ভেতরে। শকুন্তলার নিচেই বসেছিলাম আমি আর আব্দুল্লাহ। কবি মন ছিল ওর। অথচ পড়ে থাকত নভেল-নাটক নিয়ে। সারাক্ষণ কলকাতার উপন্যাসে মুখ গুঁজে বেমালুম ভুলে যেত ইহজগতের কথা। হঠাৎ এক দুপুরের পর ও-ই তো বলেছিল, 'চল, শরতের আকাশ দেখে আসি।' 'কোথায়?' 'রমনায়।' দু-একবার হ্যাঁ-না করে চলে এসেছিলোম। সেই তিন বছর আগে আজকের মতোই কোনো এক শরতের বিকেলে। সেইদিন এত মানুষ চোখে পড়েনি। এত ভিড়, কোলাহল, উৎসবের মতো করে বেড়ানো দেখিনি। আমরা নিশ্চুপ নিষ্পলক খানিক সময় আকাশে তাকিয়ে ছিলাম। রোদগুলো তখন যায় যায়। আড়াল হতে হতে মোটা গাছের ওপাশে চলে গেলে আমাদের ওপরে পড়ে একটি ছায়া। একটি তিরোহিত রোদের কোনো সলীল খোলসটা বুঝি। আমি অত কাব্যি নই। তাই অতটা অনুভব করিনি বোধহয়। কিন্তু আব্দুল্লাহ! আব্দুল্লাহকে দেখেছিলাম যেন করুণ এবং পলকহীন বিমূঢ় বিস্ময়ে রোদের শেষ ছায়াটিও দেখতে চাইছেন।
আব্দুল্লাহ এখন সাভারে। এক মাদরাসার মস্ত হুজুর। তাঁর সাথে আমার কথা হয়। দেখা হয় মাঝেমাঝেই। কখনো সখনো রাতে তার দেখা পাই। আমি যেখানে থাকি। মালিবাগে। এখানে তাঁর বোনের বাসা, ভাইয়ের বাসা। তাই আসা হয় বোধহয়। কিন্তু আমি তা মনে করি না। সজ্জন ও প্রবল বন্ধুভাজন নিঃস্বার্থ আব্দুল্লাহ বোধকরি আমার ও আমাদের সাক্ষাতেই আসে। যদিও আমাদের কথা হয় না। সময়ের অভাবে। কাজের চাপে। তাঁর দ্রুত চলে যাওয়ায়। কিন্তু এই যে আসা, একটিবার চোখে দেখে যাওয়া, তা কি এমনিতেই মুছে যাবে? হারিয়ে যাবে কোনো দমকা হাওয়ায়? তা তো নয়। এ তো মোছবার নয়। এইরম এক নিস্তেজ বিকেলের পারে বসে তাই আব্দুল্লাহকে আমার স্মরণ হচ্ছে ক্রমশ। নিতান্ত অনিচ্ছা নিয়ে আমি স্মৃতিকাতর হচ্ছি বন্ধু। তুমি তো এ শহরেই। সব ঠিকই চলছে। ভালোই আছ, জানি। কিন্তু এই যে বিকেল চলে যায়, শীতের বিকেলগুলো রোদ ঠকে চলে যায় অনন্ত বিলুপ্তির পথে, তোমাকে কি তা অনুরিত করে? আমার মতোই এমন নিঃসীম একাকী করে ভাবায়? এই প্রশ্ন রিকশায় করে যেতে রমনার সদর প্রধান প্রবেশদ্বারটিতে ছুড়ে মেরে গেলাম।
যদি কোনোদিন আবার ফেরা হয়, আবার পেছনে আসা হয় ধীমত্ত কবি অথবা ভবঘুরে বোহেমিয়ান হয়ে, যেখানে কোনো তোয়াজ বা নিয়মের তোয়াক্কা নেই, আমরা বিকেল ও সন্ধ্যার আগমনে রোদ তাড়িয়ে নেব ষষ্ঠীর মতোন। তবে আসিও। এই রমনায়। এই শহরেই ফিরে ফিরে আবার আসবার তাড়া আসুক আমাদের। দলছুট বিচ্ছিন্ন পাখির মতোই কোনো এক মালতির পদচিহ্ন ধরে আমরা ফিরে আসব। এই রোদন ও আকাঙ্ক্ষা আরও ঘন ও তীব্রতর করে আমাদের জাগিয়ে তুলুক আবার। সেইদিন আবার আসা হবে। প্রশ্নটি তুলে সদর প্রবেশদ্বার দিয়ে ভেতরে যাব। কারও মুখ না-চেয়ে সোজা সেই গাছটির তলে। শকুন্তলায় গিয়ে একদণ্ড বসতে পারার অমোঘ স্বাদ নিয়ে হাঁটব। হাঁটব, হাঁটব... এভাবেই সন্ধ্যা নেমে যাবে। আর আমি একা। আপনি একা। সবাই একা।

কাউসার মাহমুদ : তরুণ কবি ও সাহিত্যিক



কুড়িয়ে পাওয়া ডায়েরি এবং কিছু স্মৃতি

অরিশা জান্নাত

‘মিম, এটা কিসের প্যাকেট রে?’
‘খুলেই দেখো না!’
প্যাকেটটা খুললাম এবং আনন্দে ও বিস্ময়ে অভিভূত হলাম। ভেতরে একটা খয়েরি রঙের ডায়েরি, সাদা রঙের পাথরের একজোড়া কানের দুল আর একটা গোলাপি রঙের রুমাল। তাতে আকাশি রঙের সুতোয় নকশা করে আমার হিফজ শেষ করার তারিখটি লেখা। জিনিসগুলো পাঠিয়েছে সাদিয়া। একসময় ওর সঙ্গে আমার সবক নিয়ে প্রতিযোগিতা চলত খুব। তবে ও অসুস্থতার কারণে অধিকাংশ সময় বাড়িতেই থাকত। এজন্য কিছুটা পিছিয়ে পড়েছিলো। আমার হিফজ শেষের খবর শুনে মিমের (তার ফুফাতো বোন) কাছে জিনিসগুলো পাঠিয়ে দিয়েছে।
রাতে ঘুমোনোর আগে ডায়েরিটা নিয়ে বসলাম। প্রথম দিকের কয়েক পৃষ্ঠায় আমাকে উদ্দেশ্য করে কিছু উপদেশবাণী লেখা আছে। ওগুলো পড়লাম। তারপর বেশ কিছুক্ষণ লেখার চেষ্টায় কলম কামড়া-কামড়ি করলাম। কিন্তু নাহ! একটা লাইনও লিখতে পারলাম না। ছোটবেলা থেকেই আমার ডায়েরির খুব শখ ছিলো। মাঝে মাঝে আম্মুকে দেখতাম, শক্ত মলাটে বাঁধা একটা লাইনটানা খাতায় কী যেন লিখতেন। যখন একটু বড় হলাম, জানলাম, ওটাকে ডায়েরি বলে। আমার ইচ্ছে করত আম্মু কী লিখছেন, দেখি। তবে তখনও শুধু দূর থেকেই দেখতাম। ওটা ছোঁয়ার অনুমতি ছিল না কখনও।
তারপর যখন আরও একটু বড় হলাম, একদিন ডায়েরিটা পড়ার অনুমতি পেয়ে

গেলাম। আর অবাক বিস্ময়ে আমার চিরচেনা আম্মুকে আরো নতুন করে আবিষ্কার করলাম। ওটাতে যত্ন করে তুলে রাখা ছিলো আম্মুর না-বলা কষ্ট, আবেগ, ভালোলাগা, মন্দলাগা–সবকিছু। সেই সঙ্গে আমার শৈশবের আলো-ঝলমল দিনগুলোও।

ঠিক তখন থেকেই ইচ্ছে ছিল ওরকম একটা ডায়েরির মালিক হওয়ার। যেটা হবে আমার একান্তই নিজের একটা জগৎ। আমার ভালোলাগা মন্দলাগাগুলো মলাটবদ্ধ হবে সুন্দর একটা খাতায়। এর আগে আমার আর সাদিয়ার আলাদা করে একটা খাতা ছিল। দশ টাকা দামের সাদা একদিস্তা কাগজ সুতো দিয়ে সেলাই করা। ওটাতে আমরা কবিতা সংগ্রহ করতাম। আদর্শ নারী, কিশোর কণ্ঠ–এ ধরনের পত্রিকার যে কবিতাগুলো পছন্দ হতো, টুকে রাখতাম।

ওর দেওয়া ডায়েরিটা হাতে পেয়ে অন্যকিছু লেখার কথা ভাবলাম। কিন্তু অনেক রাত অবধি জেগেও কিছু না-লিখতে পেরে সেদিনের মতো ডায়েরিটা তুলে রেখে ঘুমোতে গেলাম। ঠিক তার পরদিনই নতুন একটা জিনিস পেয়ে খুশিতে আটখানা হয়ে গেলাম। রুম ঝাড়ু দিয়ে ময়লা ফেলতে গিয়েছি মাদরাসার বড় ডাস্টবিনটাতে, হঠাৎ দেখি একপাশে স্তূপ করা কাগজের মধ্য থেকে মোটা একটা জীর্ণ-শীর্ণ খাতা উঁকি দিচ্ছে। হাতে নিয়ে বুঝলাম, ওটা একটা পরিত্যাক্ত ডায়েরি। ততক্ষণাৎ ময়লা সরিয়ে ঝেড়েমুছে ওটাকে বগলদাবা করলাম। কামরায় ফিরে কিছুটা দ্বিধা নিয়ে ডায়েরিটা খুললাম। যদিও তখন জানতাম, কারও ব্যক্তিগত জিনিসে অনুমতি ছাড়া হাত দেয়া একদম উচিত নয়, তারপরও সেদিন কৌতূহলের কাছে হার মেনেছিলাম। ভেবেছিলাম, ফেলেই তো দিয়েছে। এখন এটা দেখলে কী এমন ক্ষতি হবে? পড়া শুরু করলাম। পাতার পর পাতা উল্টাচ্ছি আর চোখদুটো গোলগোল হয়ে যাচ্ছে। আরে, এ সবই তো আমার মনের কথা! শেষের কয়েকটা পৃষ্ঠা পানি পড়ে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তাই আর শেষ পর্যন্ত পড়া হয়নি। ডায়েরিটা ছিল দু'হাজার তিন-চার সালে লেখা। আর আমি পড়েছিলাম দু'হাজার দশে। শুধু পড়িইনি বরং সিমি আপুর অনুকরণে লিখতেও শুরু করেছিলাম। সিমি আপু হলো আমাদের বাড়িওয়ালার মেয়ে। মানে, যে বাসাটা ভাড়া নিয়ে আমাদের মাদরাসা করা হয়েছিল, তার মালিকের মেয়ে। নিচের দু'তলা মাদরাসা আর তিন তলায় সিমি আপুরা থাকত। ওদের সঙ্গে আমাদের খুব একটা দেখা হতো না। হঠাৎ দু-একদিন বাইরের গেটে দেখা হলেও কথা হতো না কখনো।

ডায়েরিটা লেখা সিমি আপু যখন ক্লাস নাইন-টেনে পড়ে তখনকার। আর আমি যখন পড়ি তখন আপু ঢাকায় ভার্সিটিতে পড়ত।

পরে অনেকবার ভেবেছি অনুমতি ছাড়া ডায়েরি পড়ায় সিমি আপুকে স্যরি বলব। কিন্তু তারপর আর কখনো দেখা হয়নি সেভাবে। আর দেখা হলেও বলার সাহস পাইনি। তারপর অনেকগুলো ডায়েরির মালিক হয়েছি আমি। ডায়েরির সাদা বুকে নিয়মিত আঁকিবুকিও করেছি অনেক। কিন্তু কুড়িয়ে পাওয়া সে ডায়েরির কথা কখনও ভুলতে পারিনি। ছাড়তেও পারিনি ওটাকে। যত্ন করে রেখে দিয়েছি বুক শেলফে। মাঝে মাঝে পুরোনো ডায়েরিটা খুলে পড়ি, আর মিটিমিটি হাসি। সিমি আপু হয়তো কখনো জানতেও পারবেন না যে তিনি এক কিশোরীর জীবনে 'আনা ফ্রাঙ্ক' হয়ে এসেছিলেন।

অরিশা জান্নাত : কামারগাড়ি, বগুড়া থেকে



ডায়েরি লেখার দিন

যুবাইর ইসহাক

এই অন্তর্জালের যুগে এখন আর ডায়েরি লেখা হয় না আমাদের। যখন আমাদের খুব বেশি ইচ্ছে করে কিছু বলতে বা লিখতে তখন ফেসবুক খুলে একটা স্ট্যাটাস দিয়ে বসি। সাথে সাথে অনেক মানুষের কাছে চলে যায় মনের গহীনের গোপন অনুভূতি। মুহূর্তের ভেতর মানুষেরা–এমনকি যার সাথে আমার কখনো দেখা হয়নি, সেও আমার হৃদয়ের কথাটা জেনে যায়। অথবা ফেসবুক খুলে অনলি মি করে পোস্ট ঝুলিয়ে রাখি। এটা কেউ দেখে না, কেবল নিজের মতো করে গচ্ছিত থাকে আর বছর পর পর ফেসবুক আমাদের এই ঘটনাটা স্মরণ করিয়ে দেয়।

অন্যভাবে বললে, হয়তো ডায়েরি লিখবার মতো সময় আমাদের হাতে নেই। ডায়েরি লিখতে অপেক্ষা লাগে, সাজানোর ব্যাপার থাকে, থাকে উচ্ছ্বাসের প্রয়োজন। লেখার আগে ভেবে ভেবে বের করতে হয়–এই পুরো দিনে কী করলাম? আজ লিখবার মতো কী আছে! এগুলোর সময় কই!

আমি প্রথম ডায়েরি লিখি ২০১৪ সালে। তখন অবশ্য ডায়েরি বলতাম না, বলতাম রোজনামচা। সে সময়ের রোজনামচাগুলো ভরা থাকত দৈনিকের কথাবার্তায়। সারাদিন কার সাথে মিশলাম, কী অবাক কাহিনি ঘটেছে, বিদায় অনুষ্ঠানে কে কী বক্তৃতা দিলো–এসব এবং খুব অল্পই লিখেছি তখন।

পনেরো সালের মাঝামাঝিতে দরগায় (জামিয়া কাসিমুল উলুম দরগাহে হজরত শাহজালাল রহ. সিলেট) ভর্তি হবার পর নিয়মিত ডায়েরি লিখতে শুরু করলাম। পুরো এক বছর পুরো দমে লিখেছি। আমার ভেতর তখন অন্য মন্ত্র কাজ করেছে। কে যেন বলেছিল–লেখালেখি করতে হলে ডায়েরি লেখার বিকল্প নেই। পরবর্তী সময়েও ডায়েরি লিখেছি, তবে অনিয়মিত। এখনও কিছু খুঁজতে গিয়ে সেই ডায়েরিগুলোতে হাত পড়ে। মাঝে মাঝে বের করে খুলে চোখের সামনে ধরি। তখনই উঁকি দেয়–আলিয়ার মাঠ, ছাত্রাবাস, সাহিত্য আসর, চৌহাট্টা, প্রিয় মানুষগুলোর মায়াভরা মুখ, দরগাহ মাঠে মানুষের ভীড় অথবা গহরপুরের শান বাঁধানো পুকুরঘাট, বড়ভাগা নদী। মাঝে মাঝে কিছু চরিত্রকে স্মরণ হয়–যাদের প্রায় ভুলতে বসেছিলাম। অনেককে আবার চিনতে পারি না। কাউকে চেষ্টা করেও মনে করতে পারি না–লোকটা কে ছিল।

জীবনে দু'একজনকে ডায়েরি লিখতেও বলেছি। তারা সহজ উত্তর দেয়–প্রতিদিনই কী লিখবো? বলেছি, তোমার আজকে এমন কিছু ঘটেছে–যা গতকাল ঘটেনি। মানুষের সকল দিন সমান যায় না। তোমার এই সমান না যাওয়াটাই লিখো। কথাগুলো বলার পর মনে হয়, এগুলো পেলাম কই! আমি তো এত ভেবে ডায়েরি লিখতে বসিনি!

ডায়েরি নাকি উপহারের জন্য খুব উপযোগী। উপহারগ্রহীতা ডায়েরি পেয়ে কী করে? সবার কথা লেখে, নাকি যে দিলো কেবল তার কথাই? একবার এক বিদায়ের দিনে প্রিয় এক বন্ধুকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'বলো তো, তোমার কাছে বিদায়বেলা দেবার মতো উপযুক্ত উপহার কী?' সে সরল ভাষায় বলেছিল, 'ডায়েরি।' আমি পাশের ছোটো বাজারে গিয়ে ডায়েরি খুঁজে বেড়িয়েছি। কিন্তু তাকে একটা ডায়েরি উপহার দিতে পারিনি। বিষয়টা মাঝে মাঝে ভাবায়।

মাদরাসাগুলোতে বছরের শেষে ডায়েরি করার প্রচলন আছে। আমার যে বন্ধুরা সদ্য তাকমিল শেষ করে–তারা স্মৃতিস্বরূপ আমাকে ডায়েরি উপহার দেয়। অনেকে আবার দেবে বলে দেয়া হয় না। আমি ওগুলো তুলে রাখি। কিছু লিখি না। কেন যেন মনে হয়, লিখলেই তো শেষ। একজন মানুষের উপহার এত সহজে শেষ করা যায়! এত সহজে একজন মানুষের স্মৃতি ধূসর করা ঠিক? তারচে বরং রঙিন পাতাগুলো চকচকেই থাকুক।

এই ডায়েরি না লিখবার সময়েও মাঝে মাঝে আমার ডায়েরি লিখতে মন চায়। খুব বেশি আনন্দিত হলে বা খুব করে কষ্ট পেলে অথবা লিখে রাখবার মতো কোনোকিছু ঘটলে এখন যে ডায়েরি নিয়ে বসি, সেটি আমাকে আমার একজন প্রিয় শিক্ষক পুরস্কার হিসেবে দিয়েছিলেন। আমাদের প্রিয় শিক্ষক কবি মুসা আল হাফিজ একদিন ক্লাসে ঢুকে বললেন, 'বনফুলের 'নিমগাছ' গল্প অনুসরণে একটা গল্প লিখো। আমরা যে যার মতো গল্প লিখে জমা দিলাম। আমার গল্পটা দেখে বললেন, 'তুই একটা পুরস্কার পাবি।' তারপর এক বিকেলে হুজুরের রুমে বসে কোনোমতে প্রকাশ করলাম–আমার পুরস্কার বাকি আছে। হুজুর পাশের তাক থেকে একটা ডায়েরিতে অটোগ্রাফ দিয়ে আমার দিকে বাড়িয়ে বললেন, 'নে।'

মাঝে মাঝে খুব করে অতীতে চলে যেতে ইচ্ছে করে। তখন আমি ডায়েরি নিয়ে বসি। দেখি, ডায়েরির পাতাগুলোতে আমার হারানো দিন বাঁধা। প্রতিটি লাইনে গল্প, আড্ডা, স্মৃতি ঝলমল করে। চোখের সামনে ভাসে রঙিন অতীত। ভাসতে ভাসতে কাঁদি, হাসি। তারপর মনে হয়, অতীতটাই ভালো ছিল।

যুবাইর ইসহাক : হবিগঞ্জ থেকে

ডায়েরি নিয়ে যত কথা

মুহাম্মাদ আরিফ রব্বানী

ডায়েরিতে কী লিখব এ নিয়ে প্রায় সপ্তাহখানেক দোদুল্যমান ছিলাম। সহপাঠীদের ডায়েরি কেনা দেখে আমিও একটি কিনেছিলাম। কিন্তু ওদের মতো 'খরচের হিসাব' ডায়েরিতে লেখা আমার পছন্দ ছিল না। তাই লিখতেও পারছিলাম না। তেমন কাউকে পাচ্ছিও না যে, তার কাছ থেকে জানতে পারব মানুষ আসলে ডায়েরিতে কী লিখে? তখন সময়টা ছিল 'হিফজ' পড়ার। সার্বক্ষণিক কুরআন তেলাওয়াতই ছিল প্রধান কাজ। বই পড়া বা লেখার সময় ছিল শুধু আসরের পর। যদিও ওই সময়টা ছিল খেলাধুলার জন্য, কিন্তু আমি বই নিয়েই পড়ে থাকতাম। বলতে গেলে বই পড়াটা তখন থেকেই নেশায় পরিণত হয়েছিল। পড়তাম আর হৃদয়ে স্বপ্নের বীজ বপন করতাম–এমন একটি বই আমিও লিখব, আমিও একদিন বড় লেখক হব। কিন্তু লেখক হতে গেলে নাকি রোজ রোজ লিখতে হয়। যাকে বলে 'রোজনামচা'। এই রোজনামচা লিখব বলেই ডায়েরিটি কেনা হয়েছিল আমার। কিন্তু রোজনামচায় কী লিখতে হয় তা ছিল অজানা। ফলে এ নিয়ে সপ্তাহখানেক দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলাম। প্রত্যহ আসরের পর ডায়েরি সামনে নিয়ে বসে থাকতাম; কী দিয়ে শুরু করব তা ভাবতে ভাবতেই মাগরিব হয়ে যেত। লেখা হতো না কিছুই।

একদিন এই দুশ্চিন্তার অবসান হলো। বিশাল এক বোঝা নিমিষেই মাথা থেকে উবে গেল। প্রতিদিনের মতো সেদিনও আসরের পর বই ও ডায়েরি নিয়ে বসে ছিলাম। কামরা থেকে উস্তাদজি ডাক দিলেন। যেতেই জিজ্ঞেস করলেন, 'সবাই খেলছে তুমি বসে আছ কেন?' উত্তরে বললাম, 'বই পড়ছিলাম।' এ কথা শুনে উস্তাদজি খুব খুশি হলেন। কিছু বইয়ের নামও বলে দিলেন তিনি। এ মুহূর্তটাকে মোক্ষম সময় মনে করে সুপ্ত কথাটি বলেই ফেললাম। যা কয়েকদিন ধরে মনের ভেতর ঘুরঘুর করছিল। 'উস্তাদজি! আসলে আমার লেখক হওয়ার খুব ইচ্ছা আছে। শুনেছি লেখকদের প্রথম সবক নাকি রোজনামচা লেখা। সেজন্য একটি ডয়েরিও কিনেছি। কিন্তু রোজনামচায় কী লিখব তা খুঁজে পাচ্ছি না। যদি একটু বলে দিতেন, উপকৃত হতাম।' দেখলাম উস্তাদজি আগের তুলনায় এবার দ্বিগুণ খুশি। আমার সদিচ্ছার কথা শুনে তিনি দোয়া করে দিলেন। এরপর রোজনামচার ধরন কেমন তা বলে দিলেন। বললেন, 'সকাল থেকে সন্ধ্যা যা যা করো তা-ই লিখবে, সহপাঠীদের সাথে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোও লিখতে পারো কিংবা তোমার অতীতজীবনের স্মরণীয় কিছু থাকলে তাও লিখতে পারো।' 'জি আচ্ছা!' বলে উস্তাদজির শুকরিয়া আদায় করে কামরা থেকে প্রস্থান করলাম।

পরদিন থেকেই লেখা শুরু করলাম। আমার প্রথম ডায়েরির প্রথম পাতায় যে লেখাটি ছিল তাহলো, 'যদি কেউ এই লেখাটি পড়েন তাঁর কাছে অনুরোধ থাকবে যেন আর একটি পৃষ্ঠাও তিনি না খোলেন।' কারণ, ভয় ছিল, মনের কথাগুলো কেউ জেনে নিয়ে পরে যদি উপহাস করে! তাই না পড়াটাই ভালো। লিখতাম, মনে যা আসত তা-ই লিখে রাখতাম। স্মৃতিবিজড়িত অনেক কথাই তখন ডায়েরিতে স্থান পেয়েছিল। দীর্ঘদিন হয়ে গেছে সে ডায়েরিটি আর খোলা হয়নি।

ডায়েরি : স্মৃতির বিশ্বস্ত দর্পণ

মুহা. রফিকুল ইসলাম

ডায়েরি মানে স্মৃতির সাতকাহন। ডায়েরি মানে ঐতিহাসিকের বিশ্বস্ত ভূমিকা। জীবনের ফেলে আসা দিনগুলোর সুখ-দুঃখ কিংবা বেদনার আখ্যান মানেই ডায়েরি। একজন ডায়েরি-লেখক নিজের জীবনবৃত্তান্ত নথিবদ্ধ করতে করতে, দৈনিকের কাহিনিগুচ্ছ লিখতে লিখতে এক সময় মনের অজান্তেই মস্ত লেখক হয়ে ওঠেন। পৃথিবীতে মনে হয় এমন কোনো লেখক পাওয়া যাবে না, যিনি এক সময় ডায়েরি লিখেননি। বিখ্যাত সব লেখকের জীবনকাহিনি পড়তে, তাঁদের লেখা স্মৃতিগদ্য আওড়াতে বড় ভালোই লাগে। এদেশের কওমি ঘরানার বর্ষীয়ান লেখক মাওলানা আবু তাহের মিসবাহ। তাঁর জীবনের প্রথম রোজনামচা পড়েছি। তিনি নিজেই এক জায়গায় লিখেছেন, তিনি মাটির কলসিতে টাকা জমাতেন। একরাতে স্বপ্নে দেখেন, চোর এসে সবক'টা টাকা কলসিসুদ্ধ নিয়ে যাচ্ছে। তিনি চোরকে নিষেধ করলে চোর বেচারা কলসিটা রেখে চলে যায়। এই স্বপ্নটাকে তিনি লিখেছেন, 'চোর আসল, আমার জমানো টাকায় হাত দিল। নিয়ে যেতে লাগল। আমি বললাম নিয়েন না। সে রেখে চলে গেল।'

তখন তো তিনি ভালো লিখতে পারতেন না। নিতান্ত ছোট ছিলেন। কিন্তু কথা কয়টা পরে যখন ডায়েরি খুলে দেখতে পেলেন, কত খুশি লেগেছে তাঁর কাছে!

আমার নিজের কথাই বলি। তখন দু হাজার সাত কি আট সাল। পড়ালেখা সবেমাত্র শুরু করেছি। রাজধানীতে। সাথীসঙ্গী সকলে রোজনামচা লেখে। দৈনিক অভিধান ঘাঁটে, শব্দ শেখে, রাত দশটার পর সমালোচনায় বসে। তাদের সঙ্গে আমিও যোগ দিলাম এসব কর্মযজ্ঞে। সেই সুবাদে ডায়েরি লেখার সূচনা। প্রতিদিন ডায়েরি লিখি। লেখা শেষ হলে মনের ভেতরে একটা আনন্দের উদ্রেক হয়। মনোজগতজুড়ে উল্লাস খেলা করে। কী যেন আবিষ্কার করতে পেরেছি–এমন লাগে। পরম পুলকিত হই। পরের দিনের লেখার অপেক্ষায় থাকি। দৈনন্দিনের ঘটে যাওয়া নানান ঘটনা, কারও সাথে বাদানুবাদ হলে, হুজুর প্রহার করলে–সব ডায়েরিতে তুলে ধরি আর পরম তৃপ্তিবোধ করি। এভাবে চলতে থাকে দীর্ঘদিন। হতে হতে আজকে ১০ বছর অতিক্রান্ত হতে চলেছে। এর মধ্যে চার পাঁচটা ডায়েরি সমাপ্ত হয়ে গেছে।

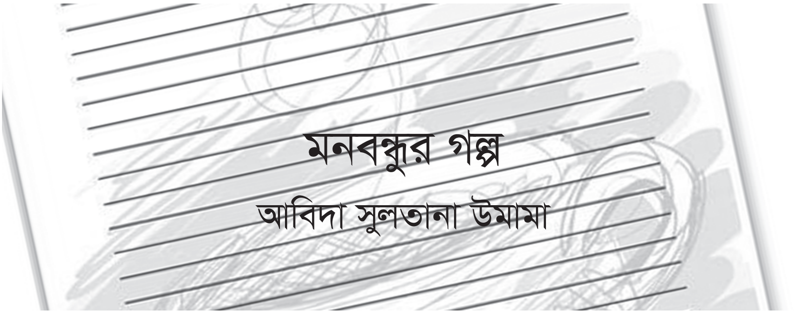
নবধ্বনির ফেসবুক পেজে দেখলাম, ফেব্রুয়ারি সংখ্যার প্রতিপাদ্য বিষয় ডায়েরি। আলমারি থেকে তালাশ করে প্রথম লেখা ডায়েরিটা বের করলাম। এতদিনে ডায়েরিগুলোর কোনোটা দেখলাম উঁইপোকা খেয়ে ফেলেছে, কোনোটার পাতাগুলো জেল কালি দিয়ে লেখার দরুণ কালো হয়ে গেছে, পড়ার জো নেই। প্রত্নতত্ত্ববিদদের দিয়ে গবেষণা করালে হয়তো বোঝা যেতে পারে কী লিখেছিলাম। কমদামি ডায়েরি হওয়ায় কোনোটার দুই পৃষ্ঠা এক সাথে লেগে গেছে। কলমের কালি আর্দ্র হয়ে একাকার হয়ে গেছে।

পুরোনো ডায়েরিগুলো নাড়াচাড়া করতে করতে একটা রোজনামচা চোখে পড়ল। মোটামুটি পড়া যায়। আমার সবচেয়ে আনন্দমাখা দিনলিপি ছিল এটা। হুবহু তুলে দিচ্ছি–

'হিফজখানায় পড়া শেষ। আনুষ্ঠানিক পাগড়ি দেয়া হচ্ছে না। কারণ, মাদরাসার মাহফিল হয় না অনেক বছর। তাই সভাপতির আয়োজনে কমিটিবৃন্দের উপস্থিতিতে পাগড়ি প্রদান করা হচ্ছে। সে দিনের আনন্দ এবং হিফজ সমাপ্তির উচ্ছ্বাস আমার আর ধরছিল না। এর কারণ হলো, হিফজখানা একটা বন্দীখানার নামান্তর। জোর করে পড়ানো, ইচ্ছার বাইরে কিছু করতে না পারা, ভোর রাতে ঘুম ভেঙে ওঠা–এসব আজকে থেকে হবে না। এসব কিছু থেকে রেহাই পাচ্ছি। আমার পাগড়ির আনন্দ কেবল এজন্যই। এর চেয়ে বেশি কিছু পাগড়ির মর্ম তখন আমি বুঝতাম না।'

এটা হলো আমার ডায়েরিতে লেখা সবচেয়ে আনন্দময় রোজনামচা। সেই ডায়েরিটার অনেকাংশ উঁইপোকা খেয়ে ফেলেছে। কয়েক পাতা দেখলাম ছিঁড়েও গেছে। হাতে তুলে প্রিয় ডায়েরিটায় চুমু খেলাম। আহ, কাগজের পাতা এভাবেই বুঝি স্মৃতিকে আটকে রাখে! ঐতিহাসিকতাকে জিইয়ে রাখে!

মুহা. রফিকুল ইসলাম : কটিয়াদী, কিশোরগঞ্জ থেকে



মনবন্ধুর গল্প

আবিদা সুলতানা উমামা

ডায়েরি আমার কাছে কেবল ডায়েরি নয়, বরং আমার সবচেয়ে মনোযোগী শ্রোতা। আমি মনে করি আমার জন্য ডায়েরির চেয়ে মনোযোগী কোনো শ্রোতা খুঁজে পাওয়াই ভার।

মন খারাপ? ডায়েরিটা খুলে বসি। ভীষণ আনন্দ? তখনও ডায়েরিই আমার সঙ্গী। বুকের ভেতর পুষে রাখা শত মান-অভিমানের নিঃশব্দ সাক্ষী হয়ে থাকে এই ডায়েরি। হাজারো অভিযোগেও বাধ সাধে না কোনে-াদিন। স্বপ্নের সফলতায় আমার আনন্দের উদ্বেল আর স্বপ্নভঙ্গের বেদনাময় আর্তন-াদ–সবটাই শোনে আমার ডায়েরি।

ডায়েরির সঙ্গে এই সখ্য শুরুর গল্পটা একটু অন্যরকম। তখন আমি খুব ছোট। সবে ক্লাস থ্রিতে পড়ি। মোটামুটি ধরনের গলার দরুণ একটা শিল্পীগোষ্ঠীর সদস্য হয়েছিলাম। প্রথম যেদিন অডিশনে টিকে যাই, ভাইয়া একটা ডায়েরি কিনে দেন। আমার প্রথম ডায়েরিতে প্রথম লেখা ছিল একটা ইসলামি গান–'বিসমি-ল্লাহ বলো বিসমিল্লাহ'।

সেই শিল্পীগোষ্ঠীতে বেশিদিন সক্রিয় ছিলাম না। মাসখানেক পরে ছেড়ে দিয়েছিলাম ওসব। কিন্তু ততদিনে ডায়েরি আমার বন্ধুত্বের জায়গা দখল করে নিয়েছে। প্রথম প্রথম শুধু ইসলামি গান সংগ্রহ করতাম ডায়েরিতে। একদিন সাহস করে দু'লাইন নিজেই লিখে ফেললাম।

'একটা ছিল পাজি বুড়ি
বয়স কে জানে কয় কুঁড়ি
নবির পথে কাঁটা দিত...'

এতটুকু লিখেই হাঁপিয়ে গেলাম। আর মিলাতে পারছিলাম না। বান্ধবীদের সাথে পরামর্শ করলাম। লাভ হলো না। আমার কবিতা লেখার সাধ মাঠেই মারা গেল।

দমলাম না। বড়মামার প্রেরণায় রোজনামচা লিখতে শুরু করলাম। অল্প ক'শব্দ করে প্রতিদিন লিখতাম। ততদিনে ক্লাস ফাইভে উঠে গেছি এবং আমার ডায়েরির সংখ্যাও বেড়েছে। কিন্তু আমি আলসে হয়ে গেছি। ডায়েরিগুলোয় ধুলো জমতে শুরু করেছে। ক্লাস ফাইভের সমাপনী পরীক্ষার পর দীর্ঘ ছুটি পেলাম। একঘেয়েমি বোধ কাটাতে ফিরে এলাম ডায়েরির কাছে। প্রতিদিনের টুকরো গল্প জমতে থাকে ডায়েরির পাতায়। ছুটি শেষ হয়। ফের ব্যস্ততা জাপটে ধরে আমাকে। দিনগুলো কাটতে থাকে নানান রঙে, নানান ঢঙে। কখনো হর্ষে, কখনো বিষাদে। পৃথিবীটা অন্যরকমভাবে ধরা দেয় আমার কাছে। আমি আবিষ্কার করি আমার চারপাশে কাছের কেউ নেই। পাশে থেকেও যেন সবাই ভীষণ দূরের। ফের কাছে টেনে নিলাম পুরোনো বন্ধুকে। প্রতিটি বিষণ্ন বিকেলের সঙ্গী হয়ে ওঠে ডায়েরি।

আমার জগতে তখন শুধু আমি আর ডায়েরি। হবেই না-বা কেন? ডায়েরির তো আমার সাথে মতবিরোধ হয় না। মনোমালিন্য হয় না। আমার অকারণ বিষণ্নতার কারণ পুছে বিরক্ত করে না। ঠিক যেন মনবন্ধু। মন যা চায় লিখে যাই। ডায়েরির স্তূপ জমে। নতুনগুলোয় লেখা হয় আর পুরোনোগুলোতে ধুলো জমে। মনের কোণে বেজে ওঠে গানের সুর–ধুলো পড়া ডায়েরিটা পড়ে আছে যেমন তেমন...

আবিদা সুলতানা উমামা : বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী থেকে

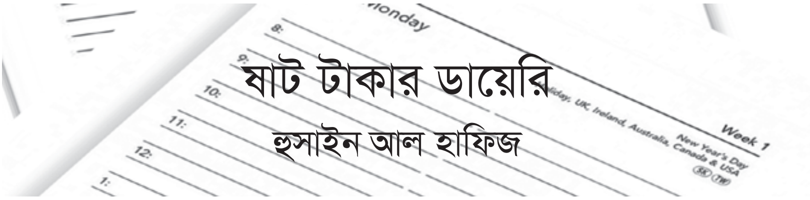
ডায়েরি থেকে পত্রিকা : একটি প্রমোশনাল গল্প

রাকিবুল হাসান



তখনও আমি লিখতে শুরু করিনি। হিফজ শেষ করে মাত্রই ফার্সিখানায় ভর্তি হয়েছি।
মাদানীনগর মাদরাসায় তখন বাংলা লেখালেখির অবাধ স্বাধীনতা। প্রায়দিন ফজরের আগে ঘুম থেকে উঠেই দেখতাম দেয়ালে দেয়ালে নতুন দেয়ালিকা। ব্রাশ করতে করতে পড়তাম দেয়ালজুড়ে স্বপ্ন তৈরি করে রাখা লেখাগুলো। প্রতিটি দেয়ালিকায় একটি বিভাগ নিয়মিত পড়তাম–ডায়েরি। তারিখ দিয়ে লেখা সারাদিনের বৃত্তান্ত।
চারপাশের এইসব লেখালেখি দেখতে দেখতে ইচ্ছে হলো, আমিও লিখব। বলবার মতো গল্প নেই ঠিক, কিন্তু সকালবেলা বোর্ডিংয়ে রান্না হয় যে স্বর্গীয় স্বাদের খিচুরি, তার কথাই আমি লিখব। লিখব মাদরাসার মাঠে আমগাছে বসে থাকা জোড়া শালিকের কথা। কেমন করে একটি শালিক আরেকটি শালিকের উষ্ণ আরামে ডুবে থাকে, তার কথা। ডায়েরিতে নিঃসঙ্গতার গল্প বলব; হাউজের পানিতে টলোমলো চাঁদের সাঁতার কাটার কথা বলব।
একদিন এক বড় ভাইকে বললাম, 'আমি লিখতে চাই। কী করতে পারি?' তিনি মুচকি হেসে বললেন, 'ডায়েরি থেরাপি নিতে পারো।' থেরাপি শব্দটি একটি হাসপাতালীয় শব্দ। শব্দটি শুনলেই চোখে ভেসে ওঠে অনেকগুলো যন্ত্রপাতি। আর কীসব হাবিজাবি। বেডে শুয়ে আছি। নার্স থেরাপি দিচ্ছে। ভয়ে চোখ বন্ধ করে আছি দেখে নার্স বলছে, ভয় পাচ্ছো বাবু? আমি ভারী যন্ত্রের কারণে মাথা নাড়াতে পারছি না। চেহারায় সামান্য হাসির ছোঁয়া দিয়ে বুঝালাম, খারাপ লাগছে না। খারাপ যেহেতু লাগছে না, ভয়ও লাগছে না।
আমি বড় ভাইকে বললাম, 'ডায়েরি থেরাপি কী?'
তিনি বললেন, 'প্রতিদিন ডায়েরি লিখবে। যা পড়ছ, যা ভাবছ, যা দেখছ–লিখে রাখবে। ডায়েরি লিখতে লিখতে লেখায় সাবলীলতা আসবে। ভাষায় মনের অনুভূতি ব্যক্ত করার হাজারও আঙ্গিকের সঙ্গে পরিচিত হবে।'
আমার ডায়েরি লেখার দিন শুরু হলো।
ডায়েরি লেখা মানে সময়টাকে ধরে রাখা। সুখগুলো, দুঃখগুলো, হাসিগুলো, আনন্দগুলো জমিয়ে রাখা যাদুর বাক্সে। একদিন আমরা যখন সময়গুলো ফেলে যাই, তখন আবার সময়গুলো দেখতে ইচ্ছে করে। যাদুর বাকশো খুলে বসি, বাকশের ডালা মেলে দিলেই আকাশ ভরে যায় স্মৃতিতে। দিনশেষে যখন নিঃসঙ্গ হয়ে যাই, এই যাদুর বাকশে জমিয়ে রাখা স্মৃতিগুলোই আমাদের দারুণ সঙ্গ দেয়।
যিনি ডায়েরি লিখতে শিখিয়েছিলেন, তিনি এখন আর আমাকে ডায়েরি লেখার কথা জিজ্ঞেস করেন না। কালেভদ্রে দেখা হলে জিজ্ঞেস করেন, 'কোন পত্রিকায় লিখছ?' আমি লজ্জায় পড়ে যাই। লজ্জায় লাল হয়ে যায় মুখ। গোঁফ ভিজে ওঠে অস্বস্তির ঘামে। দুষ্টুমিতে ধরা পড়ে যাওয়া ছাত্রের মতো মাথা নিচু করে বলি, 'কোনো পত্রিকায় লিখি না।' তিনি ভরসা দেন–'লিখতে পারো।'
আমি আবার ডায়েরি লিখতে শুরু করি। নিজেকে নিজে প্রশ্ন করি, পত্রিকায় লিখতে পারবি? সাহস আছে গল্প বলার? সাহস আছে স্বপ্ন ছড়িয়ে দেবার? আমার সাত বছরের সবগুলো ডায়েরি একসঙ্গে বলে ওঠে, আমরা সাক্ষী, তুই পারবি। আমাদের প্রতিটি পাতায় তুই স্বপ্ন ছড়িয়ে দিয়েছিস। গল্প বলে গিয়েছিস অনর্গল। আমাদের বুকে এত শিহরণ, আনন্দের এত উদযাপন–রাত জেগে তুই দিয়েছিস।
আমার ডায়েরির সঙ্গে আমি কথা বলতে শুরু করি। যাপিত জীবন এবং যৌবনের কথা। যেখানে স্বপ্নের ধোঁয়ায় সবকিছু কেমন ঘোরের মতো লাগে। যা দেখি সবই নতুন লাগে। ডায়েরির সঙ্গে কথা বলা শেষ হলে আমি একটি পত্রিকার জন্য গল্প লিখতে বসবো। ডায়েরি লেখা থেকে প্রমোশন পত্রিকায়। যেন একটি প্রমোশনাল গল্প।

রাকিবুল হাসান : ফরিদাবাদ মাদরাসা ঢাকা'র শিক্ষার্থী



ষাট টাকার ডায়েরি

হুসাইন আল হাফিজ

ছোটবেলার কথা। একদিন এক সহপাঠীর কাছে ফুল অঙ্কিত একটা ডায়েরি দেখলাম। ভীষণ লোভ জাগল। মাথায় ডায়েরির ভূত চাপল। ভাবলাম, ওরকম একটা ডায়েরি কিনব, কিনে তাতে আঁকাআঁকি করব। আমি আবার নাছোড়বান্দা, কোনো জিনিস শুরু করলে যতক্ষণ ওটার শেষ না দেখছি–নিস্তার নিই না। এটা বদঅভ্যাসও বলতে পারেন। শুরু হলো টিফিনের টাকা জমানো। আমি মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে। প্রতিদিন আব্বা নাস্তার জন্য পাঁচ টাকা করে দিতেন। না খেয়ে খেয়ে প্রায় ৮০ টাকার মতো জমালাম। তখন মাত্র পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ি। ক্লাস থ্রি থেকে কান্নাকাটি করে মাঝেমধ্যে আব্বার সাথে বাজারে যাওয়া-আসা করতাম বিধায় খানিকটা একা বাজারে যাবার অভ্যেস হয়ে যায় পঞ্চম শ্রেণিতেই।

একুশে ফেব্রুয়ারির দিন। সনটা ঠিক মনে নেই। বয়স অনুমানিক ১০ বা ১১ তখন। গ্রামের মাদরাসার বার্ষিক জলসা-ও ছিলো সেদিন। প্রতি বছরের মতো জলসায় জমজমাট মেলা চলছে। জলসার দিনকে কেন্দ্র করে আব্বার কাছ থেকে একটা ৫০ টাকার নোট কবজা করলাম। সোজা জলসার মেলায়। হাতের মুঠোয় টাকা নিয়ে মেলায় ঘুরোঘুরি করছি। এটা ওটা দেখছি। কিন্তু কেন জানি টাকাগুলো খরচ করতে মোটেও মন সায় দিচ্ছিল না সেদিন। বিরক্ত হয়ে মেলা থেকে বের হয়ে পড়ি।

মেইন রোডের পাশেই মেলা বসেছে। আমি দাঁড়িয়ে আছি মেইন রোডে। জলসায় বক্তা সাহেব ওয়াজ করছেন। হঠাৎ কানে বাজল আরো একটি মাইকের আওয়াজ। অনুমান করলাম আওয়াজটা আমাদের স্থানীয় বাজার থেকেই আসছে। জলসার মাইকের কারণে বাজারের মাইকের শব্দগুলো স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল না। সাহস করে বাজারের দিকে এগোলাম। আট-দশ মিনিটের পথ। ধীরে ধীরে মাইকের শব্দগুলো পরিস্কার হচ্ছে টের পেলাম। 'বইমেলা... বইমেলা...' বলে কেউ একজন মাইক বাজাচ্ছে। যত সামনে এগুচ্ছি লোভের মাত্রা তত বাড়ছে। পৌঁছলাম মেলায়। জীবনের প্রথম বইমেলা দর্শন। স্টলভর্তি রঙ-বেরঙের বই। যতটুক মনে পড়ে, সেদিন বই দেখে ডায়েরির চিন্তা কিছুক্ষণের জন্য মাথা থেকে উধাও হয়ে যায়। মনে হয়েছিল বই নয়, যেন কেউ আমার সামনে থরে থরে তেঁতুল সাজিয়ে রেখেছে। কোনোকিছু না ভেবেই দোকানিকে জিজ্ঞেস করলাম, 'ভাই, ৫০ ট্যাকায় কয়টা বই পাওয়া যাইবো?' 'কোনটা কোনটা নিতায়, বাছাই করো।' জবাব দিলেন দোকানি। আমি যে ক'টি বই নির্বাচন করলাম তাতে বিল দাঁড়াল পঞ্চাশের উপরে। তা থেকে কমিয়ে দোকানি বেচারা হিসেব করে ৫০ টাকার বই দিলেন। বই কয়টা ছিলো ঠিক মনে নেই, কিন্তু সেখানে পাঁচ টাকা মূল্যের (ক্রয়কৃত মূল্য) 'ঠাকুরমার ঝুলি' এবং 'গোপাল ভাঁড়' নামক দুটি বই ছিল–স্পষ্ট মনে আছে।

বই কেনা হলো। ভাবলাম আরো দু'-একটা স্টল দেখি। হাঁটছি... হাঁটছি... হঠাৎ একটা স্টলে নজর পড়ল। নতুন-পুরান বই, খাতা, কলম, ডায়েরি ইত্যাদিতে ভর্তি স্টল। চোখটা আটকে গেল ডায়েরিতে। পড়লাম মুশকিলে। কোনো দিকে আর না তাকিয়ে, হুট করে কিনে ফেললাম গোলাপফুলের ছবি আঁকা ডায়েরিটা। যে ডায়েরির লেখালেখি, আঁকিবুকিগুলো দেখলে আজ অন্যরকম অনুভূতি জাগায় মনে। ডায়েরির ভেতরের কাগজগুলো কিছুটা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, তবুও এই ডায়েরির প্রতিটা লেখা, প্রতিটা অঙ্কন আমাকে নতুন কিছু উপহার দেয়। যতবার ডায়েরিটা পড়ি, মনে হয় আজই ডায়েরিটার জন্ম। যেন আমার পুরো শৈশবের কীর্তিগাথা এই ডায়েরিতে অঙ্কিত। অথচ মাত্র ষাট টাকা দামের সস্তামানের একটি ডায়েরি সেটা।

হুসাইন আল হাফিজ : জকিগঞ্জ, সিলেট থেকে



একটি ছোট্ট ডায়েরির অভিমান

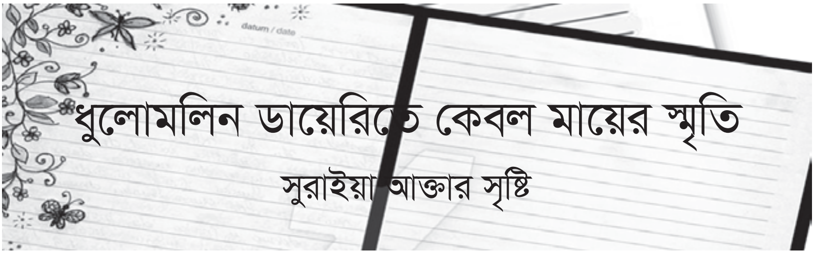
জাকারিয়া মুস্তাফি

হঠাৎ গায়ে কলমের ছোঁয়া পেয়ে ও আঁৎকে উঠল। অভিমানী বালিকার মতো যেন ঠোঁট বাঁকিয়ে বলল, 'কেন এলে আমার কাছে এতো দিন পর! না এলেও তো পারতে! তোমার কত শত ব্যস্ততা! যাই বলো না কেন, তোমার ওসব বাহানা, অলসতা আর ফাঁকিবাজি–আমি কি আর বুঝি না!'

আমি আদুরে গলায় ওকে বললাম, 'বারে! আমি তো তোমাকে এনেছিই তোমার গায়ে কলম দিয়ে শব্দচাষ করে বেড়াব বলে। আর তুমি কি না বলছ...!'

ওর অভিমানী দীর্ঘশ্বাস আমাকে থামিয়ে দেয়। এরপর দিতে থাকে একের পর এক ওর আক্ষেপ আর অভিমানের ফিরিস্তি–'হ্যাঁ, দু'তিন বছর আগে তো সেই একই কথা বলতে আমাকে। মনে আছে তোমার, যে-বার প্রথম তুমি ঢাকা আসবে, আমাকে নিয়ে ছিল তোমার কত স্বপ্ন! কত আশা! কত পরিকল্পনা! সেদিন অন্যান্য জিনিসপত্রের সাথে আমিও জায়গা পেয়েছিলাম তোমার ব্যাগে; খুব যত্নের সাথে। ভেবেছিলাম, এই বুঝি আমার কালো রেখা টানা ধবধবে সাদা পৃষ্ঠাগুলোর অবহেলিত জীবন শেষ হতে যাচ্ছে। কিন্তু কই! যাদুর শহর ঢাকায় এসে আমাকে একেবারেই ভুলে গেলে। সেই অন্ধকার ব্যাগেই আমাকে কাটাতে হয়েছে দীর্ঘকাল। অবহেলায় দিন দিন পোকামাকড়ের খাদ্যে পরিণত হয়েছিলাম আমি। এভাবেই কাটিয়েছি কয়েক বছর।

'কিন্তু লাভ হলো কী! আমাকে অবহেলা করে তুমি হারিয়েছ তোমার স্বপ্ন, আশা, আকাঙ্ক্ষা। মাঝেমাঝে আসতে চেয়েছিলে আমার কাছে, জানি, কিন্তু চাকচিক্যময় শহরের ফাঁদে পড়ে গিয়েছিলে। যাকগে, তবে এসেই যখন পড়েছ, মিনতি করছি, আর যেয়ো না! স্বপ্নের পথ পাড়ি দেবার জন্য তোমার আমাকেই দরকার। প্রতিদিন একটু হলেও সঙ্গ দিয়ো ছোট্ট এই ডায়েরিকে।'



ধুলোমলিন ডায়েরিতে কেবল মায়ের স্মৃতি

সুরাইয়া আক্তার সৃষ্টি

ধুলো জমেছে সেই পুরোনো ডায়েরিটায়। আজ প্রায় পাঁচ বছর পর নবধ্বনিতে লেখা দেওয়ার জন্য ডায়েরিটা খুঁজে বের করলাম।

মা মারা যাওয়ার কিছুদিন আগে আমার জন্মদিনে ডায়েরিটা উপহার দিয়ে বলেছিলেন, 'স্মৃতি একপ্রকার ছায়া, যা মানুষের পিছু ছাড়ে না। আমি চাই তোমার জীবনের ভালো ভালো স্মৃতিগুলোও তোমার পিছু না ছাড়ুক। তাই এ বছর তোমার জীবনের ঘটে যাওয়া ভালো ঘটনাগুলো এই ডায়েরিতে লিখে রাখবে। যেন মন খারাপের দিনগুলোতে এসব দেখে কষ্টগুলো একটু হলেও ভুলে থাকতে পারো।'

আমার রোজনামচা লিখতে কখনোই তেমন ভালো লাগত না। তাই রোজনামচা লিখতাম না। তবে মায়ের সাথে কাটানো কিছু ভালো-মন্দ স্মৃতি আর কবিতা লিখেছিলাম ডায়েরির পাতাজুড়ে।

খুব করে মনে পড়ে মা যখন বেঁচে ছিলেন সেই দিনগুলোর কথা। মা প্রতিদিনই ফজরের নামাজের জন্য আমাকে ডাকতে আসতেন। কিন্তু আমি কখনোই ঘুম থেকে উঠতাম না। তবে মাঝে মাঝে চোখ খুলে তাকালে দেখতাম, মা ডায়েরির লেখাগুলো খুব মনোযোগ দিয়ে পড়ছেন। তাই এই ডায়েরির অজস্র পাতাজুড়ে আছে আমার মায়ের ঘ্রাণ, হাসি, কান্না, রাগ আর কখনো বা নাকের ডগা থেকে পড়া বিন্দু বিন্দু ঘাম।

মায়ের সাথে কাটানো প্রায় সব স্মৃতি মধুর হলেও মারা যাওয়ার কিছুদিন আগে মা যখন হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন–সেই দিনগুলো ছিল খুব কষ্টের। চোখের সামনে মা প্রতিনিয়ত এমনভাবে কষ্ট পাচ্ছিলেন কিন্তু কিছুই করতে পারছিলাম না। সহ্য হতো না। তখন অনেক কিছুই লিখে রেখেছিলাম। যেদিন শেষ ডায়েরি লিখেছিলাম সেইদিনের শেষ লাইনটা এমন ছিল–'মা একঘণ্টা যাবত প্রচুর কষ্ট পেয়েছে। রাত একটার পর নাইট শিফটরত প্রায় সব নার্সই কীভাবে ঘুমিয়ে যায় কে জানে! একঘণ্টা ডাকার পর অবশেষে ঘুম থেকে উঠে এসে অক্সিজেন মাস্ক দিলো! এই নির্মমতার একটা বিহিত করতেই হবে। মাকে নিয়ে যেদিন বাসায় ফিরব সেদিন অভিযোগ বাকশে এ বিষয়ে অবশ্যই অভিযোগ করে যাবো।' (১৩.০৭.২০১৩)

লেখাটা লিখেছিলাম রাত দুইটার দিকে। দুর্ভাগ্য আমার, সেই অভিযোগ আর কখনোই করা হয়নি! জানা হয়নি নার্সদের জন্য সেভাবে রাতের বেলায় আজও কোনো মানুষ কষ্ট পায় কি-না। অথবা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে কোনো পদক্ষেপ নিয়েছে কি-না। জানার আগ্রহও আর ছিল না। কারণ সে-রাতে ঠিক ৩টা ১৭ মিনিটে মা মারা গিয়েছিলেন।

মা মারা যাওয়ার পর অনেকবার ডায়েরি লিখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ডায়েরিটা খোলার পর শেষ লেখাটা পড়লে আবার বন্ধ করে দিতে হয়েছে। আর কখনো লিখতে ইচ্ছে হয়নি। বড় আপু বলেছিলেন, নতুন একটা ডায়েরি নিলেই তো হয়। কিনেও দিয়েছিলেন বেশ কয়েকবার। কিন্তু এই আমি আর কখনোই ডায়েরি লিখতে পারিনি। ধুলোমাখা ডায়েরির এই প্রচ্ছদটা প্রতিদিন নতুন ধুলোয় ধূসরিত হয়। এখনও আমি মাঝেমাঝেই দূর থেকে ডায়েরিটা দেখে ভাবি মায়ের কথা। আজও সবই আছে, নেই শুধু আমার মা। তাই হয়তো আর কেউই আগের মতো ফজরের নামাজের সময় ডায়েরির পাতায় আবদ্ধ আমার কবিতা এবং আমার আর মায়ের স্মৃতিগুলো পড়তে আসে না। আমারও আর লেখা হয় না কিছু।

সুরাইয়া আক্তার সৃষ্টি : শিক্ষার্থী, রামপুরা একরামুন্নেসা ডিগ্রী কলেজ, ঢাকা

ডায়েরি লেখার ধূসর স্মৃতি

আবদুল হান্নান হক

লেখালেখির অভ্যাসটা কবে থেকে–তা ঠিক করে আমারও মনে নেই। কারণ, খুব ছোটবেলা থেকে আমি লিখি। যদ্দুর মনে পড়ে–যখন আমি 'কবিতার ক-ও বুঝি না', তখন থেকে কবিতা লিখি। মাদরাসার আঙিনা মাড়ানোর আগে শৈশবের ক-খ শিখেছি স্কুলের বারান্দায়। সেই সময়ের কবিতা লেখার স্মৃতিও আমার করোটিতে বিদ্যমান। তবে সেগুলো কেবলই ধূসর, মলিন, জীর্ণ-শীর্ণ। দু'বছর আগেও দাঁড়িকমা প্রকাশনীর পাণ্ডুলিপি আহ্বানে জমা দেব ভেবে 'কবিতার পাণ্ডুলিপি' তৈরি করেছিলাম। নাহবেমির জামাতে থাকাকালীন লেখা কবিতাও ছিল তাতে। কাঁচাহাতের লেখা! সেজন্য আর আগ বাড়তে পারিনি।

শরহে বেকায়া পড়লাম ঢাকার ঐতিহ্যবাহী হাকিমুল উম্মত (মারকাযুন নূর) মাদরাসায়। মূলত এখান থেকেই আমার লেখার হাতেখড়ি। কিছু লিখতে শিখেছি দাবি করলে একেই বলা যায়। রোজনামচা লিখতে উদ্বুদ্ধ হলাম আদীব হুজুরের পুষ্প পড়ে। তখন থেকে নিয়মিত ডায়েরি লিখতাম। তবে লেখা শেখার জন্য কারও হাতে কাটাছেঁড়া করা জরুরি–ব্যাপারটা তখন জেনে ফেলেছিলাম, কিন্তু কাটাছেঁড়া করানোর মতো কাউকে পাচ্ছিলাম না। কিছুদিন পর নতুন মাদরাসায় নতুন সহপাঠী নেসারুদ্দীন রুম্মান ভাইয়ের সঙ্গে পরিচয়। তাঁকে নিয়মিত রোজনামচা লিখতে দেখতাম। স্বেচ্ছায় তাঁর পাশ ঘেঁষতাম। লেখাগুলো পড়ার অনুমতি চাইতাম। তিনি আমাকে লেখাগুলো পড়ার সুযোগও দিতেন। আমার লেখা দেখে দিতেন। ভুল শুধরে দিতেন। তাঁর কাছ থেকেই শিখেছি কবিতার মাত্রাজ্ঞান। লেখার ধরন। ভুল এড়ানোর শক্তি। বানানভুল তিনি একদমই পছন্দ করতেন না। পাশে থেকে থেকে এই অভ্যেসটা আমার মধ্যেও জন্ম নিয়েছে। তাঁর কাছে আমি অনেকভাবে ঋণী। মাদরাসার চৌহদ্দির মধ্যে থেকে সাহিত্যচর্চা করাটা ছিল একরকম দুঃসাহসিক কাজ। কারণ, আমাদের মাদরাসার মুরব্বিগণ এটা পছন্দ করতেন না। লুকিয়ে লুকিয়ে লেখালেখি করতাম। ডায়েরি লিখতাম। সাহিত্য ম্যাগাজিন, বই-পুস্তক সংগ্রহ করতাম। তখন ম্যাগাজিন কেনার এবং পড়ার এক ধরনের নেশা তৈরি হয়েছিল। বিকেল ছাড়া তেমন কোনো সময় আমাদের ছিল না। নেসার ভাইকে দেখতাম ডিম লাইটের নিয়ন আলোতে রাত জেগে জেগে রোজনামচা লিখছেন। আমার খুব ভালো লাগত। উৎসাহ পেতাম। আমি বিকেলের অবসরেই লিখতাম বেশি। সে-বছরের ডায়েরিটা এখনও দেখলে, পেছনের লেখাগুলো পড়লে আন্দোলিত হই। আবেগে আপ্লুত হই। শিহরিত হই। কোনো কোনো লেখা আমাকে এতটাই অবাক করে যে, বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়, এটা আমার লেখা! আবার কোনো কোনো লেখা দেখে আশ্চর্য হই, এত বাজে লেখাও লিখতাম একসময়!

ডায়েরি লেখার সময় বানানভুল নিয়ে খুব সচেতন থাকতাম। সন্দেহ হলেই সাথে সাথে অভিধান দেখতাম। কারও সুন্দর লেখা দেখলে, আকর্ষিত লেখা পড়লে ভালোলাগা শব্দগুলোর বানান ও ব্যবহার টুকে রাখতাম। তখন আমাদের জামাতে বেশ কয়েকজন সাহিত্যপ্রেমী ছিলেন। তারমধ্যে শামীম আশরাফ ভাই উল্লেখযোগ্য। বানান নিয়ে তাঁর সঙ্গে কত যে বচসা হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। বাজি ধরতাম আমরা। আমি জিতেও যেতাম বেশিরভাগ সময়। এতে আমাদের উপকার হয়েছে বৈকি!

এখন কর্মজীবনে ব্যস্ততায় জড়িয়ে পড়েছি। ঠিক করে ডায়েরি লেখা হয় না। যা হয় তা হলো, মোবাইলের নোটে লেখা। কোথাও লেখা পাঠানোর ইচ্ছে থাকলে এই নোটেই একটু-আধটু লিখি। ডায়েরির লেখাগুলো আমাকে দেখে উপহাসের হাসি দেয়। আর কী যেন বলতে চায়। আমি আফসোস করি। ভাবি, কেন লেখার সময় হয় না আমার! আমি কেন এখন আর নতুন ডায়েরি কিনি না! ঘ্রাণ শুঁকি না! কলমের আঁচড় কাটি না তার বুকে!

আবদুল হান্নান হক : সালেহানগর, ঢাকা থেকে



(ডায়েরির ছেঁড়া পাতা)

যেখানে সৌন্দর্যের মেলা বসে

আনীস বিন সাইফ

প্রগতির উৎকর্ষের যুগেও গ্রামবাংলার সেই মনভোলানো দৃশ্য একেবারে বিলীন হয়ে যায়নি। যদিও শহরের বাতাসে গ্রাম আজ প্রায় বিলীন, তবুও কিছু গ্রাম এখনও আপন স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছে। এমনই একটি গ্রাম উজিরপুর। বাড়িগুলো পাশাপাশি। লোকালয়ের সাথে লেগে আছে দিগন্তজোড়া ফসলের মাঠ। এখনও ফজরের আজান শুনে ঘুম ভাঙে গ্রামের মানুষের। কেউ তো মসজিদে যায়। অন্যরা মাঠে যাওয়ার প্রস্তুতি নেয়। সূর্য ওঠার আগেই তারা ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে। কখনো হাতে কাস্তে-কোদাল, কখনো কাঁধে লাঙ্গল-জোয়াল।

সবচেয়ে ভালো লাগে শীতকালীন দৃশ্য। কুয়াশার চাদরে মোড়া পুরোটা গ্রাম। সামনে কিছুই দেখা যায় না। সূর্য ওঠার পর ধীরে ধীরে উদ্ভাসিত হয় কুহেলিকাস্নাত ভোরের সকাল। মুক্তাদানার ওপর মিষ্টি রোদ পড়ে চিকচিক করে। বাড়ন্ত ধানগাছ শিক্ত হয় শিশিরের কোমল পরশে। দূর থেকে দেখলে মনে হয় সবুজের ওপর কেউ সাদা চাদর বিছিয়ে রেখেছে। দূর্বাঘাস এ সময় নতুনত্ব লাভ করে। শিশিরভেজা ঘাসের ওপর খালি পা রাখতেই দেহ-মনে অন্য রকম এক শিহরণ বয়ে যায়। শীতের সবচেয়ে আকর্ষণীয় সৌন্দর্য এই শিশির আর কুয়াশাভেজা সকাল। তার সৌন্দর্য বাড়িয়ে তোলে সোনালি রোদ। শুধু সৌন্দর্য উপভোগের জন্য শীতকে উপেক্ষা করে ছুটে যায় প্রকৃতি-প্রেমীরা। আলতো করে হাত বুলায় ধান গাছের পাতায় জমে থাকা বিন্দু বিন্দু শিশিরের গায়ে। কিছু হাতে উঠে আসে আর কিছু পাতার গা বেয়ে নিচে গড়িয়ে পড়ে। ফলে প্রকাশ পায় তার আসল রূপ-লাবণ্য। চাদরের নিচে লুকিয়ে থাকা সবুজ সৌন্দর্য। তনুমনে নাড়া দেয় অপার্থিব এক অনুভূতি। কিছু সাদা কিছু সবুজ। ইট পাথরের বেষ্টনীতে আবদ্ধ থাকা শহরের মানুষ কি এই দৃশ্য কল্পনাও করতে পারবে? আমিও বর্তমানে এই নৈসর্গিক পরিবেশ থেকে অনেক দূরে। কিন্তু সেই সবুজ আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। একটু শীতল পরশ দিতে। কুয়াশাস্নাত শিশিরসিক্ত সকালের।

আনীস বিন সাইফ : সাইনবোর্ড, ডেমরা, ঢাকা থেকে

গাদ্দাফির সঙ্গে আমার জীবন

যেন মৃত্যুপুরীর ধারাবর্ণনা

শুরুটা হয়েছিল সুরাইয়াকে দিয়ে। একটি মেয়ে–কাজলকালো যার চোখ, রোদেপোড়া চকচকে মুখ কিন্তু আকর্ণবিস্তৃত চওড়া হাসি। সুরাইয়া–বিদ্যুৎচমকের মতো মুহূর্তেই যার মনভোলানো হাসি সশব্দ কান্নায় পরিণত হয়; বিপুল উদ্দীপনা বদলে যায় চরম নৈরাশ্যে; অনুপম অনুরাগ পরিণত হয় ভয়াবহ প্রতিশোধস্পৃহায়। সুরাইয়া–যার আছে একটি অজ্ঞাত অতীত, এক সাগর দুঃখ আর হার না মানা বিক্ষুব্ধ মনন। সুরাইয়া–যার গল্পটা শুরু হয়েছিল মনোরম এক প্রাণবন্ত পরিবেশ থেকে। আর শেষ হয় নরপিশাচ দানবের পাঞ্জায় আবদ্ধ হওয়ার মাধ্যমে।

সুরাইয়ার সেই দানবের নাম মুয়াম্মার গাদ্দাফি। আফ্রিকার লৌহমানব নামে যিনি পরিচিত ছিলেন সারাবিশ্বে। যিনি বরিত হতেন লিবিয়ার নারীমুক্তির প্রবাদপুরুষ হিসেবে। অথচ তারই গোপন হেরেমে রক্ষিতা হিসেবে বন্দী ছিল শত শত নিষ্পাপ মেয়ে।

প্রথমবার এ কথা শুনে হয়তো পাঠকমাত্রই অবিশ্বাসে আঁতকে উঠবেন। কিন্তু হেরেমবন্দী সুরাইয়ার হাত ধরে যখন আপনি প্রবেশ করবেন গাদ্দাফির হেরেমখানায়, এক কোমলপ্রাণ কিশোরীর ধর্ষিত হবার বর্ণনা শুনে আপনার চোখ জলে ভেসে যাবে।

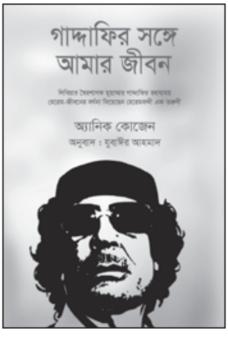
আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে কর্নেল গাদ্দাফিকে একজন মহানায়কের স্থান দেয়া হয়ে আসছে বরাবর। তার দেয়া নাগরিক সুবিধা, দেশকে উন্নয়নের চূড়ায় তোলার প্রচেষ্টা অথবা সাম্রাজ্যবাদী পশ্চিমের বিরুদ্ধাচরণ–এসবই উঠে আসত পত্রিকার পাতায়। কিন্ত প্রকাশিতব্য এই অনুবাদগ্রন্থে এমন কিছু সত্য উঠে আসবে, যা এদেশের মানুষকে গাদ্দাফির ব্যাপারে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করবে।

বাব আল-আজিজিয়া–যা ছিল মুয়াম্মার গাদ্দাফির মায়াকানন; সেখানে তিনি কীভাবে যাপন করতেন নিজের গোপন জীবন–সেই কুৎসিত সত্যের এক জলজ্যান্ত বয়ান এ বই।

গাদ্দাফির যৌনলালসা মেটাতে গোপন সেই হেরেমে বন্দী ছিল যে শত শত মেয়ে, এখানে তাদের কয়েকজনের জবানি উঠে এসেছে। সুরাইয়া তাদেরই একজন–বইয়ের অন্দরে পাঠক যার বেদনাবিধুর আত্মজীবন শুনতে পাবেন।

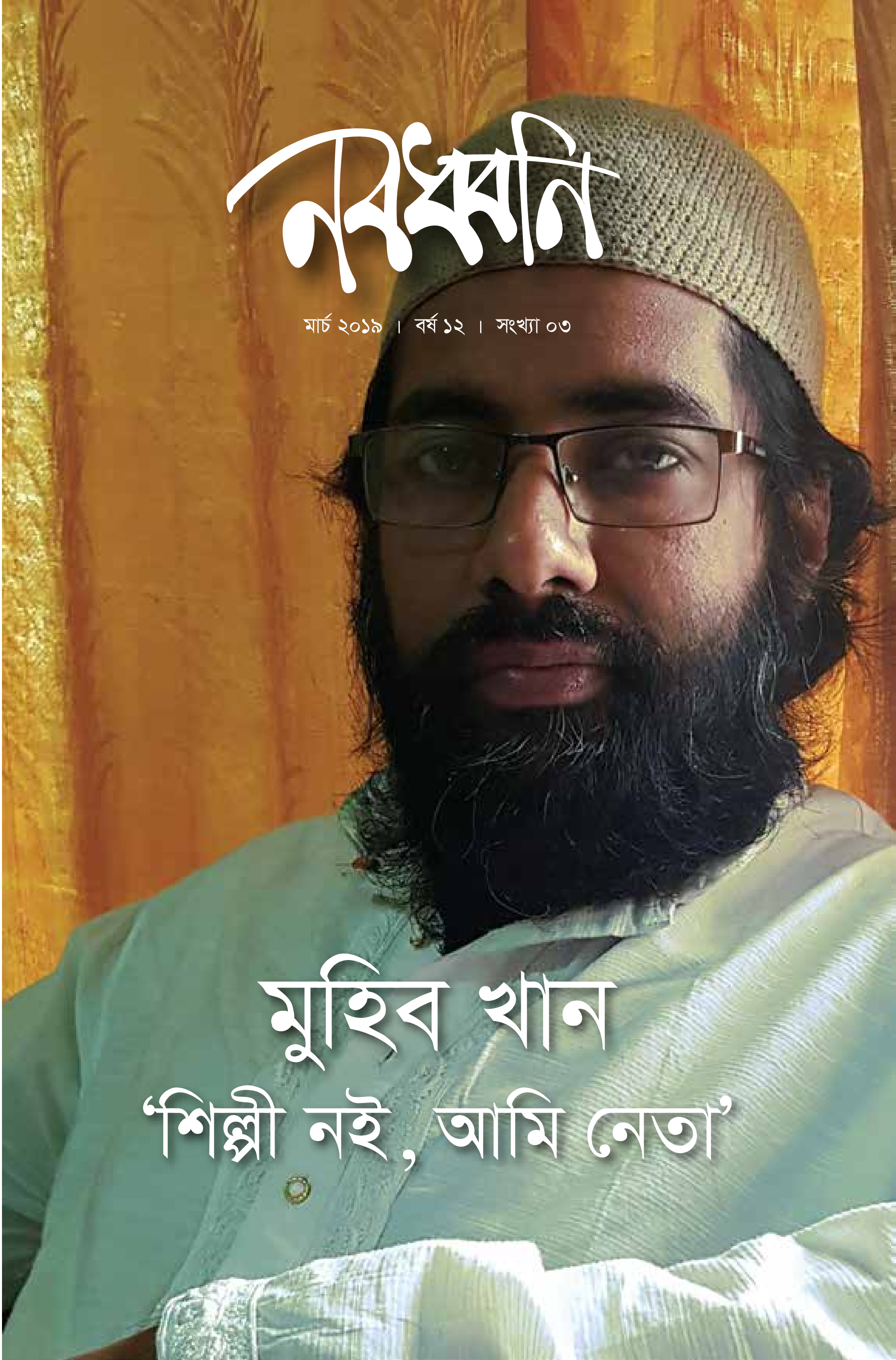
লিবিয়ার রাষ্ট্রপতি হিসেবে গাদ্দাফির কর্মকাণ্ড মূল্যায়নের দুরূহ কাজটি পাঠকের হাতেই রইল। তেমনি ব্যক্তি গাদ্দাফির চারিত্রিক কর্মকাণ্ডের মূল্যায়নও–মনে হয় পাঠক নিজেই অনুধাবন করতে পারবেন।

গাদ্দাফির সঙ্গে আমার জীবন
লেখক: অ্যানিক কোজেন
অনুবাদ: যুবাঈর আহমাদ
মুদ্রিত মূল্য: ৫০০ টাকা
ফোনালাপ: ০১৯৭৪৮৮৮৪৪১



নবধ্বনি

মার্চ ২০১৯ । বর্ষ ১২ । সংখ্যা ০৩



মুহিব খান
'শিল্পী নই, আমি নেতা'

মার্চ ২০১৯ । বর্ষ ১২ । সংখ্যা ০৩

সম্পাদক
তামীম রায়হান

নির্বাহী সম্পাদক
সালাহউদ্দীন জাহাঙ্গীর

সহকারী সম্পাদক
হাম্মাদ রাগিব
নাজমুস সাকিব

প্রকাশনা ব্যবস্থাপক
আসাদুল্লাহ খান

সার্কুলেশন ব্যবস্থাপক
মুহাম্মদ ইসহাক খান

মূল্য ৫ টাকা মাত্র

নবধ্বনি । দোকান নং ২৭ । ২য় তলা । ইসলামী টাওয়ার
১১/১ বাংলাবাজার । ঢাকা । ০১৭৪৫ ১৩৯২১৫

Email: nobodhoni@gmail.com web: noboprokash.com/nobodhoni

স্বাগত কলাম

এ মাসের শুরুতে কবে যেন 'নারী দিবস' পালিত হলো বিশ্বব্যাপী। সঠিক তারিখটা জানি না, ফেসবুকে এ বিষয়ে নানা কূট-ক্যাচাল দেখে জানতে পারলাম নারী দিবস আসছে যাচ্ছে। সে দিবস নিয়ে বিভিন্ন বহুজাতিক কোম্পানি নানা প্রচারণা চালাচ্ছে, দেখতে পেলাম। এবং দেখতে পেলাম একদল তরুণ এ দিবসটিকে বড়ই বে-তমিজ করে এটা সেটা লিখছে, ঠাট্টা করছে।

যাকগে, আমাদের সমস্যা নারী দিবস নিয়ে নয়, আমরা কথা বলি জলজ্যান্ত নারী নিয়ে।

ব্যাপারটা হলো কি, আমরা যারা তরুণ আছি, যারা ইসলাম ভালোবাসি এবং ইসলাম পালন করতে পেরে গর্ববোধ করি, তারা কেন যেন নারী বলতেই একটু উন্নাসিকতা নিজেদের মধ্যে ধারণ করি। ব্যাপারটা বোঝার জন্য একটা উদাহরণ পেশ করি।

ধরা যাক, একজন নারী আমার সামনে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। পরনে আধুনিক পোশাক, মাথায় ওড়না নেই, চলনে ভব্যতা নেই। তো, এমন একজন নারীকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনের মধ্যে তাকে নিয়ে একটা মন্দ ধারণা তৈরি হয়ে যায়। হয় কি-না? হয়ে যায় অনেকেরই। ভাবি, মেয়েটা কেমন! কী উৎকট বেহায়া তার চালচলন! খুব বাজে ব্যাপার...এমন এমন আরও বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয় আমাদের মনের মধ্যে। তার ব্যাপারে একটা তাচ্ছিল্যের ভাব চলে আসে আমাদের ভেতর। খানিকটা ঘৃণাও জন্ম হয় তাকে ঘিরে।

কিন্তু তার এই পোশাক ও চালচলনের জন্য আমরা নিজেরা কি কখনো লজ্জিত হয়েছি? দেখুন, বিষয়টি কিন্তু খুব পরিষ্কার। এই মেয়েটির মাথায় কাপড় পরানোর দায়িত্ব ছিল আপনার, তাকে পর্দার গুরুত্ব বুঝিয়ে পর্দামতো চলাফেরা করার প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করানোর কাজটা আপনার কাঁধে ছিল। কিন্তু আপনি কখনোই এমন মেয়েদের কাছে ধর্মের বাণী নিয়ে যাননি। আপনি কখনো তার কাছে গিয়ে বলতে পারেননি–বোন, তোমাকে পর্দার বিধান পালন করাতে না পেরে আমি লজ্জিত। নিজের বোনকে আমি পর্দায় রেখেছি কিন্তু তোমাকে পর্দায় রাখতে পারিনি। একজন ধার্মিক মানুষ হিসেবে এ ব্যর্থতা আমার, একান্তই আমার। তুমি আমাকে ক্ষমা করে দিও।

কখনো কি নিজেদের অক্ষমতায় আমরা এভাবে আফসোস করেছি? এভাবে লজ্জিত হয়েছি? তাহলে কেন একজন নারী দেখলেই আমরা তাকে অসম্মান করার কথা ভাবি? কেন তাকে দেখে আমরা নাক সিঁটকে তার প্রতি নীরব ঘৃণা প্রকাশ করি?

সমাজের প্রতিটি রন্ধ্রে নারীকে বেপর্দা করার শত শত আয়োজন চলছে। কিন্তু তার বিপরীতে নারীকে পর্দায় রাখার, তাকে ধর্মীয় সম্মান জানানোর আয়োজন চলছে কতখানি? আপনি আর আমিই বা কতখানি তাদের কাছাকাছি গিয়ে তাদের ধর্মীয় বার্তাদি পৌঁছে দিচ্ছি?

নারীকে সম্মান করার সঠিক জ্ঞান আমাদের উপলব্ধ হোক!



"বিপ্লব আমার পেছনে হাঁটে"

কবি মুহিব খান। নতুন করে তাঁকে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার মতো কিছু নেই। সবার কাছে 'জাগ্রত কবি' হিসেবে পরিচিত এই মানুষটি দীর্ঘ এক দশক ধরে আমাকে চেনেন, স্নেহ করেন। বহুমুখী প্রতিভার এই গুণী ব্যক্তিত্ব এখন কী নিয়ে ব্যস্ত–সেটি নিয়ে আমার জানার আগ্রহ ছিল। কাতারে থাকার সুবাদে এসব নিয়ে তাঁর সঙ্গে দীর্ঘ আলাপ করার সুযোগ হয়ে ওঠে না। গত জানুয়ারিতে আমি বাংলাদেশে যাওয়ার পর একদিন তাকে ফোন করে বলি, আমি আসতে চাই। তিনি সরাসরি বললেন, চলে আসো। এরপর মধ্য ফেব্রুয়ারির এক সকালে ঢাকায় গোলাপবাগে তাঁর বাসায় গিয়ে হাজির হই আমি। তিনি হাসিমুখে স্বাগত জানালেন, আমার খোঁজখবর নিলেন। নানা বিষয়ে নিজের স্বপ্ন, পরিকল্পনা ও চিন্তার কথা জানালেন। সবচেয়ে বেশি সময় ধরে কথা বললেন তাঁর রাজনৈতিক চিন্তা, দল ও ভবিষ্যত নিয়ে। প্রায় এক ঘন্টাব্যাপী সাক্ষাতকারের কিছু অংশ নবধ্বনির পাঠকদের জন্য তুলে ধরা হচ্ছে এই সংখ্যায়।

মুহিব খানের সঙ্গে তাঁর বিবিধ জীবন নিয়ে কথা বলেছেন
তামীম রায়হান

বছরের ডিসেম্বর, জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাস কবি মুহিব খান বেশ ব্যস্ত থাকেন। দেশজুড়ে ঘুরে বেড়ান ও বিভিন্ন মাহফিলে অংশ নেন। কথা শুরু হলো তাঁর এই ব্যস্ততা দিয়েই। জানতে চাইলাম, কী নিয়ে ব্যস্ত সময় পার করছেন? মুহিব খান জানালেন, এখন মাসে ৩০ দিনের মধ্যে ১৫-২০ দিন বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশ নিই। তিন মাসে ৫০টির মতো অনুষ্ঠানে অংশ নিচ্ছি। ফলে মূলত এখন 'স্টেজ শো' নিয়ে ব্যস্ততা। আগে শুধু কনসার্ট আকারে প্রোগ্রাম হতো, এখন দেশের বড় বড় মাহফিলে ওলামায়ে কেরাম আমাকে চান। গত দু বছর ধরে কনসার্ট কম হচ্ছে, মাহফিল বেশি হচ্ছে।

জানতে চাইলাম, গত দু বছর ধরে কনসার্ট কম হওয়ার কারণ কী?

মুহিব খান বললেন, গত কয়েক বছরে আমার বয়স ও ব্যক্তিত্বে একটা পরিবর্তন এসেছে। ২০০১ সাল থেকে আমি প্রকাশ্যে সঙ্গীত সফর করি। তখন যারা আমার শ্রোতা ছিল, তারা মাদরাসায় নিচের জামাতে পড়াশোনা করত। তারা এখন বিভিন্ন মাদরাসার প্রিন্সিপাল, বিভিন্ন মসজিদের ইমাম, তারা সারাদেশে ছড়িয়ে আছেন, তারা তাদের প্রতিষ্ঠানের মাহফিলগুলোতে আমাকে নিতে চান।

তাছাড়া এখন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলোর চেয়ে মাহফিলের আয়োজন সহজ। আমি মাহফিলগুলোকেও গুরুত্ব দিই। কারণ, এখানে গণমানুষের জমায়েত থাকে। পাশাপাশি ব্যাপকভাবে উলামায়ে কেরামের উপস্থিতি থাকে, যেটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলোতে থাকে না। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলোতে নির্দিষ্ট বয়সের ও নির্দিষ্ট রুচির বাইরে অন্যরা থাকেন না। আগেও মাহফিলে আমার চাহিদা ছিল, তখন যেতাম না। কিন্তু এখন মাহফিলগুলোতে সময় দিই। মাহফিলগুলোতে যেহেতু প্রচুর সাধারণ মানুষ আসে, তাদের সামনেও আমার কিছু বলার আছে।

এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন ছিল, এই মুহূর্তে নিজেকে কোন পরিচয়ে দেখতে চান মুহিব খান?

তিনি বললেন, আমি শিল্পী নই, কখনো শিল্পী ছিলাম না। আমি বক্তাই ছিলাম। বক্তৃতাটা সঙ্গীতের মতো করে দিতাম, যেহেতু আমি কবি। এখনো সেই কাজটাই করি। প্রয়োজনীয় যে কথাগুলো বলার, সেগুলো বলি এবং সঙ্গে প্রসঙ্গ ও অনুষঙ্গ অনুযায়ী আমি আমার সঙ্গীতগুলোকে সামনে নিয়ে আসি।

তামীম রায়হান: সর্বশেষ কবে সঙ্গীত লিখেছেন?

মুহিব খান: এই মাসেই (ফেব্রুয়ারি) তো লিখলাম।

তামীম রায়হান: এই মুহূর্তে সঙ্গীত নিয়ে আপনার পরিকল্পনা কী?

মুহিব খান: এটা চলতে থাকবে। ভেতর থেকে এমনিতেই বের হবে। আমার কাজগুলো আমি যা করি, খুব একটা পরিকল্পনা নিয়ে করি না। যখন যেটা প্রয়োজন, যতটুকু আমার দ্বারা সম্ভব, আল্লাহ করিয়ে নেন। এটাই বাস্তবতা। সংগীত আমার শক্তি। এটা চলতে থাকবে।

তামীম রায়হান: অনেকদিন ধরে আপনার কোনো অ্যালবাম নেই...

মুহিব খান: অ্যালবাম তো এখন কেউ করে না। সিঙ্গেল সংগীত ইউটিউবে চলে আসে, এটাই নিয়ম। ১০-১২টা গান একসঙ্গে করে অ্যালবাম প্রকাশের রেওয়াজ তো এখন আর নেই।

তামীম রায়হান: আপনার সর্বশেষ অ্যালবাম কবে ছিল?

মুহিব খান: ২০১৫ সালে। 'নতুন ইশতেহার আসছে' শিরোনামে। ১০টি গানের সিডি ছিল সেটি। আরেকটি ছিল 'দাস্তানে মুহাম্মদ'। এ দুটো প্রকাশ করেছিল হলি মিডিয়া। এর পর থেকে একটি করে গান আসছে। যখন যেটা তৈরি হচ্ছে, সেটা বাজারে চলে আসছে।

এবার পেছনে ফেরা যাক। ২০০২ সালে 'সীমান্ত খুলে দাও' দিয়ে অ্যালবাম প্রকাশের যাত্রা শুরু করেন কবি মুহিব খান। এটি প্রকাশ করেছিল প্রত্যয় প্রোডাক্টস। সে সময় এই অ্যালবামের বিনিময়ে কোনো সম্মানি পাননি তিনি।

মুহিব খান বললেন, এর কারণ, তারা আমার অ্যালবাম বের করে কতটা ব্যবসায় সফল হয়েছেন, তা আমি খোঁজ নিইনি। তাছাড়া

সম্মানি চাওয়ার মতো মানসিকতাও তখন আমার ছিল না।

এরপর ২০০৩ সালে প্রকাশিত হলো 'দিন বদলের দিন এসেছে'। এটি প্রকাশ করেছিল সাউন্ড মিডিয়া। এর কর্ণধার ছিলেন শাহ ইফতেখার তারিক, গাজী আতাউর রহমান এবং মুহিব খান। এ প্রসঙ্গে তিনি বললেন, 'আমরা কেউ এ ব্যবসায় পটু ছিলাম না। ফলে দেখা গেছে, বৃহত্তর চট্টগ্রাম, সিলেট, খুলনাসহ বিভিন্ন অঞ্চলে অসাধু ব্যবসায়ীরা এর নকল কপি বের করেছিল। ফলে তারা আমাদেরকে ব্যবসাটা করতে দেয়নি।'

২০০৪ সালে প্রকাশিত হলো ইঞ্চি ইঞ্চি মাটি। সাউন্ড মিডিয়া এটি প্রকাশ করে। এরপর নিজেই প্রতিষ্ঠা করলেন 'হলি মিডিয়া'। সেখান থেকে বের হলো 'ইয়ে মেরা ওয়াতান'। এরপর 'আবার যুদ্ধ হবে', ২০১০ সালে এটি প্রকাশিত হলো।

কবি মুহিব খান সরল স্বীকারোক্তিতে জানালেন, '২০১০ সাল থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত বেশ বড় একটা বিরতি, এ সময়ে আমার কোনো অ্যালবাম প্রকাশিত হয়নি।' কারণ হিসেবে তিনি ব্যাখ্যা দিলেন এভাবে, 'আমি কখনো অ্যালবাম করার জন্য গান লিখতাম না। মার্কেট ধরে রাখার প্রবণতাও আমার ছিল না। ২০১০-২০১৫, এই পাঁচ বছর ধরে মানুষ আমার আগের গানগুলোই শুনছিল। আর এই পাঁচ বছরে আমি কুরআনের কাব্য অনুবাদ করেছিলাম। তাছাড়া এক সময় লিখনীতে খুব ব্যস্ত ছিলাম। সবমিলিয়ে গত ১৮ বছরে আমার অ্যালবামের সংখ্যা ছয়টি। আবার আমি বইও লিখেছি ছয়-সাতটি।

তামীম রায়হান: অল্প কথায় গত দেড় দশকে আপনার যা অর্জন—সেটাকে কীভাবে দেখেন?

মুহিব খান: অর্জন বা সাফল্যের হিসাব আমি অন্যভাবে করি। আমার যে চিন্তাভাবনা ও লক্ষ্য উদ্দেশ্য- সেই তুলনায় দশভাগ সাফল্য আমি অর্জন করেছি। গত দেড় যুগের বেশি সময়ে আমার ছয়টি বই ও ছয়টি অ্যালবাম—আমি জানি না, অন্যরা কী নজরে দেখেন। তবে আমি গুণগত মানকে গুরুত্ব দিয়েছি, সংখ্যাকে নয়। জোর করে কিছু করতে চাইনি। তবে এই দীর্ঘ সময়জুড়ে আমি আমার গতিপথেই ছিলাম, অন্য কোনো কাজে জড়াইনি। ২০০০ বা ২০০১ সালে আমার স্বপ্ন ছিল, আমি তরুণদেরকে শুধুই বিনোদিত করার জন্য কাজ করব না। আমার মনে হতো যে, আমার পেছনে বিপ্লব হাঁটে। আমার সঙ্গীত রাজনৈতিক দর্শনের সঙ্গীত।

মুহিব খান ফিরে গেলেন আরও পেছনে। তিনি বললেন, ১৯৯৮-১৯৯৯ সালে আমি যখন গান লিখি, যেগুলো ২০০০ সালের পর বাজারে আসে, আমি কিন্তু তখন লতা-পাতা ফুল নিয়ে লেখি নাই। তখন আমার একান্ত তারুণ্য ছিল। তখন আমি যা ভেবেছিলাম, তা এখন সবাই বলেন। কিন্তু তখন সবাই এভাবে ভাবেনও নাই, ভাবলেও বলেন নাই। তখন আমি এ প্রসঙ্গে লিখেছিলাম। বাংলাদেশের সাথে ইসলামের সম্পর্ক, ইসলামী অঙ্গনে তরুণদের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগিয়ে তোলা—এমন নির্দিষ্ট চিন্তাধারার উপর আমি আমার সঙ্গীত রচনা করতাম।

তামীম রায়হান: কিন্তু আপনি তো সেসময় পরিস্থিতির প্রভাবে ছিলেন। তখনকার দেশ ও বিশ্বের পরিস্থিতি সেরকম ছিল বলেই আপনি সেরকম কিছু লিখতে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তাই নয় কি?

মুহিব খান: বিশ্ব পরিস্থিতির প্রভাব তো থাকবেই, শুধু প্রভাব না এটা তো দায়িত্বও। একজন কবির দায়িত্ববোধটা কী? কবি তো সাধারণ মানুষকে শুধু কল্পনায় ভাসালে হবে না, বরং মানুষ যে পরিস্থিতির ভেতর দিয়ে যাচ্ছে, সেখানে তার করণীয় বা সে বিষয়ে তার বক্তব্য তুলে ধরাই তো কবির সাফল্য।

তামীম রায়হান: আপনি সবসময় একা একা কাজগুলো করেন..

মুহিব খান: একলা চলাটা অস্বাভাবিক নয়, এটা স্বাভাবিক। আমি একাই চলি। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বা কবি নজরুল ইসলাম, তাদের তো কোনো শিল্পীগোষ্ঠী বা সাহিত্য সংগঠন ছিল না। তারা একা ছিলেন, ভাবুক বা সাধক ধরণের মানুষ ছিলেন, নিজের কাজ করে গেছেন। আমি সেরকমই একজন। আমি তাদের পর্যায়ের কেউ না, কিন্তু আমার

ডিজাইনটা এরকমই। সবাই কিন্তু সাংগঠনিক যোগ্যতাও রাখেন না।

তামীম রায়হান: কিন্তু আপনি তো দল গঠন করলেন...

মুহিব খান: একটা হচ্ছে সাংস্কৃতিক সংগঠন, আরেকটা হচ্ছে রাজনৈতিক প্লাটফর্ম। রাজনৈতিক চিন্তা এবং লক্ষ্য আমার শুরু থেকেই ছিল। এটা তারুণ্য থেকে আমার ভেতরে ছিল, আমি সেদিকেই এগিয়েছি। সাংস্কৃতিক অঙ্গনে দীর্ঘ সময় ধরে আমার যে কাজকর্ম, তা মূলত আমার রাজনৈতিক পথেই এগিয়ে যাওয়া। আমার এই দীর্ঘ সাংস্কৃতিক পথ পরিক্রমায় যে বিপুলসংখ্যক মানুষ আমার সঙ্গে শ্রোতা হিসেবে, সমর্থক হিসেবে এবং অনুসারী হিসেবে এবং ভক্ত হিসেবে যুক্ত হয়েছেন, যাদের অনেকে এখন কৈশোর ও তারুণ্য পেরিয়ে যৌবনে রয়েছেন, তারা সঙ্গীতের পাশাপাশি আমার রাজনৈতিক দর্শন ও চেতনাটাও পেয়েছেন।

এবার মুহিব খান বেশ কিছুক্ষণ সময় নিজের রাজনৈতিক দল 'ন্যাশনাল মুভমেন্ট' নিয়ে কথা বললেন। তাঁর ভাষায়, 'একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে আমি আমার দল গঠন করেছি। এটা খুব তাড়াহুড়োর বিষয় না। কারণ, আমাদের দেশ, জাতি, বিশ্ব পরিস্থিতি, দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতি, ভারতের সঙ্গে আমাদের অবস্থান, আমাদের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত, এই দেশের গণমানুষের প্রকৃতি ও মুসলমানদের বৈশিষ্ট্য ও অবস্থান এবং করণীয় ও ভবিষ্যত–আমাকে এসব নিয়ে ভাবতে হচ্ছে। এই ভাবনা দু-চার বছরের বিষয় না।

২০১৬ সালের ১ ডিসেম্বর এই দলটির আত্মপ্রকাশ ঘটে। আত্মপ্রকাশ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা তখন ছিল। এরপর দীর্ঘ সময় নিরব থাকারও দরকার ছিল। আমার নিরবতা আমার রাজনৈতিক কর্মসূচীর অংশ। ধীরে ধীরে এখন এই নিরবতা ভাঙতে থাকবে এবং আমার সংগঠন সক্রিয় হতে থাকবে।

এই নিরব থেকে আমি যা পেলাম, তা হলো–যে কথাটা সভা-সেমিনার করে লোকজনকে বুঝাতে হতো, যে আমরা এখন কোন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছি, সামনে আমাদের কী হতে পারে, না হতে পারে, আশঙ্কা এবং সেখান থেকে উত্তরণের ধারণা বা তাগিদ মানুষের মধ্যে তৈরি করা, যাতে তারা এই সংগঠনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয় এবং এটিকে মুক্তির পথ মনে করে, সেটা আমার নিরবতা থেকে হয়ে গেছে। বাংলাদেশের চলমান অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে বাইরের হস্তক্ষেপ এবং প্রভাব মানুষ এখন এমনিতেই বুঝতে পারছে। যদি আমি এটা বুঝাতে চাইতাম এবং তখন সেটা বুঝাতে চেষ্টা করতাম, তবে সেভাবে হয়তো মানুষ বুঝত না। যেহেতু মানুষ কোনো না কোনোভাবে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত, তারা নিজেদের দলের কথাটাই বুঝেন, বাইরের কারো কথা তারা নিতে চান না।

দল গঠনের পর আমি ১৬ কোটি মানুষের জন্য ১৬ দফা দিয়েছিলাম। এই ১৬ দফায় সবিস্তারে দেশের ব্যাপারে আমার চিন্তা ও পরিকল্পনা যাদের কাছে পৌঁছেছে, তারা হয়তো পরবর্তী দু বছরে অনুভব করতে পারছেন, দু বছর আগে বিষয়টি বুঝতে কষ্ট হলেও এখন আমরা বুঝতে পারছি যে, এরকমই একটি পরিকল্পনা নিয়ে আমাদের এগিয়ে যাওয়া উচিত।

তামীম রায়হান: মানুষের, আপনার আশেপাশের লোকদের প্রতিক্রিয়া কেমন ছিল সেসময়?

মুহিব খান: দলের আত্মপ্রকাশ ঘোষণা করার পর আমি কিছু ঘোলাটে প্রতিক্রিয়া পেয়েছি। বাংলাদেশের ইসলামি দলগুলো গভীরভাবে বিষয়টি অনুধাবন করতে পারেনি। তারা হয়তো ভেবেছে, দেশে আরেকটি ইসলামি দল হচ্ছে। ইসলামপন্থী কবি ও আলেম ব্যক্তি হিসেবে তারা আমার কাছে আশা করেছিলেন, অন্য কোনো দলের সঙ্গে আমি সম্পৃক্ত হবো। তা না করে আমি ইসলামি দল করেছি; অথচ আমার এই দল ইসলামি দল না।

আরা যারা আমার দলটিকে ইসলামি দল মনে করেননি, বরং গণভিত্তিক দল ভেবেছেন, তাদের মনে তিন ধরণের প্রশ্ন এসেছে। কারণ, বাংলাদেশে বৃহৎ কোনো রাজনৈতিক শক্তির বাইরে নতুন কোনো থিমের উপর নতুন আরো একটি রাজনৈতিক দল গঠন করা সম্ভব নয়।

বড় বড় অনেক নেতা চেষ্টা করেছেন, কিন্তু পারেননি। আমাদের এখন যে নেতারা সক্রিয় আছেন, যেমন ড.কামাল, বি চৌধুরী, বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী–তারাও পারছেন না। এখনো একটা গোলটেবিল বৈঠক করতে গেলে লোক ভাড়া করে আনতে হয় তাদের।

ফলে একজন কবি মানুষ বা গায়ক শিল্পী আমাকে যারা মনে করেন (যদিও আমি গায়ক বা শিল্পী নই) তারা ভাবছেন, সংস্কৃতি থেকে এসে আমি রাজনীতিতে কী অবদান রাখব? কতোটুকুই বা কী করতে পারব? আমি হয়তো রাজনীতিটা বুঝি না।

আবার অনেকেই ভাবছেন, আমি হয়তো উনার সাংস্কৃতিক ভক্ত অনুরাগীদের স্রোত দেখে নিজেকে 'লিডার' ভাবতে শুরু করেছি। আমি হয়তো মনে করছি, এখন রাজনীতির নেতৃত্ব দিতে পারবো।

আসলে এই তিনটার কোনোটিই আমি কখনো ভাবিনি। প্রথমত, আমার 'ন্যাশনাল মুভমেন্ট' কোনো ইসলাম বা ধর্মভিত্তিক দল না। দ্বিতীয়ত, এটা গণভিত্তিক দল।

আমি তো রাজনৈতিক পরিবারের সন্তান। আমার লেখাপড়া রাজনীতিতে, আমার সংগীতজীবন যদি ধরি, তাহলে আমার সংগীতজীবনের থিম ছিলো দর্শন ও রাজনীতি। যারা সংগীতগুলো শুনেছেন, তারা বুঝেছেন এটা শুধু একটা গান না। কাজেই আমার ব্যাপক কাজ হয়েছে। আমি তো আসলে 'হোমওয়ার্ক' করেছি। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত প্রতিটা গ্রামে এবং পাড়ায় অল্প কয়েকজন লোক হলেও আমাকে ভালোবেসে চেনেন। তারা আমার অনুসারী। একজন কবি পারবেন কী পারবেন না, বা একজন কবি হলেই যে রাজনীতি অযোগ্য, বিষয়টা এমন না।

বেশ দীর্ঘ এই রাজনৈতিক বয়ান শেষে এবার কবি মুহিব খানের কাছে কিছু অন্য বিষয়ে জানতে চাইলাম।

তামীম রায়হান: আপনার ব্যস্ততার একটা জায়গা ছিলো সাপ্তাহিক লিখনী। এককথায় যদি জানতে চাই, লিখনী বন্ধ হবার পেছনে কী কারণ ছিলো?

মুহিব খান: দুইটা কারণ ছিলো। আসলে এখানে সময়ের ভালো ভালো সম্পাদক, লেখক, সাহিত্যিক ও অনেকে ছিলেন। কিন্তু কোনো দক্ষ ব্যাবস্থাপক ছিলেন না।

তামীম রায়হান: আপনি কেন হাল ধরলেন না?

মুহিব খান: আমি দক্ষ ব্যবস্থাপক নই, দক্ষ সম্পাদক। আমি লেখক ও সম্পাদক এবং আমি আমার দায়িত্ব ভালো করেই পালন করেছি। আরো যারা ছিলেন পরিচিত মুখ, তারাও ভালো লেখক-সম্পাদক, কিন্তু আমাদের মাঝে কোনো লিডারশিপ ছিলো না।

আরেকটা কারণ হলো অর্থসংকট, হয়তোবা ব্যবস্থাপনার দুর্বলতার জন্যই অর্থসংকট হয়েছিলো। একটা পত্রিকা দু-তিন বছর চলার পর আসলে অর্থসংকট থাকার কথা ছিলো না।

তামীম রায়হান: আপনার প্রতিষ্ঠিত হলি মিডিয়ার বর্তমান অবস্থা কী?

মুহিব খান: ২০০৭ সাল থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত প্রায় ১২ বছর হয়েছে। হলি মিডিয়ার আগামী অল্পকিছু দিনের মাঝে একটা অনলাইন পত্রিকা করার ইচ্ছা আছে। যার নাম হবে 'হলি মিডিয়া ডট নিউজ'। 'হলি মিডিয়া' নামে একটা অনলাইর টিভি করারও ইচ্ছা আছে।

তামীম রায়হান: হলি মিডিয়া কি মুহিব খান ছাড়া অন্য কারো এ্যালবাম করে না?

মুহিব খান: হলি মিডিয়া আসলে আমার নিজের সৃষ্টিশীল কাজগুলো মানুষের মাঝে প্রচার করার একটা মাধ্যম মাত্র।

তামীম রায়হান: হলি মিডিয়া নিয়ে এত কিছু করার কথা বললেন, কিন্তু এতে কে বিনিয়োগ করবে? আপনার তো অর্থসংকটের একটা বাজে অভিজ্ঞতা আছে। ইসলামি ও সাধারণ ধারার সব মিডিয়া এই অর্থসংকটের মধ্যে পড়ে। আপনি এটা কিভাবে কাটাবেন?

মুহিব খান: এটা এখনো আমার প্রক্রিয়াধীন ও বিবেচনাধীন প্রকল্প।

তামীম রায়হান: ইসলামিক কালচারাল ইনস্টিটিউট নামে যে ট্রেনিং সেন্টার করেছিলেন, সেটি কেন বন্ধ হয়ে গেলো?

মুহিব খান: আমি সেটাও ২০০৭ সালে শুরু করেছিলাম। তার বয়স প্রায় ১ যুগ হতে

চলেছে। ইসলামিক কালচারাল ইনস্টিটিউট (আইসিআই) পল্টনে কার্যক্রম পরিচালনা করতো। ২০০৯ সাল পর্যন্ত চলার পর আসলে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে এর কার্যক্রম চালু রাখা সম্ভব হয়নি। বিশেষ করে জামায়াতে ইসলাম ও ইসলামি দলগুলোর অফিস পল্টনে হওয়ার কারণে তারা শুক্রবার বিভিন্ন সভা-সমাবেশ করতো। বিশেষ করে শুক্রবারে ঢাকা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার ছেলেদের জন্য পল্টন নিরাপদ জায়গা ছিলো না। সে কারণেই আমি আমার এই কালচারাল সেন্টারের কার্যক্রম বন্ধ রাখতে বাধ্য হই।

তামীম রায়হান: লিখনী থেকে শুরু করে আইসিআই, এই যে আপনার তারুণ্যের সময়ের বিভিন্ন উদ্যোগ যেগুলো থেমে আছে, এর কারণে কি আপনি হতাশ হন? এই বিষয়গুলো নিয়ে কি আপনি প্রশ্নের সম্মুখীন হন? নিজের কাছে বা অন্যদের কাছে?

মুহিব খান: মানুষের মনে বিভিন্ন প্রশ্ন থাকতে পারে এবং অনেকেই এসব প্রশ্ন করেন, তবে আমি আমার কোনো কাজ নিয়ে হতাশ নই।

তামীম রায়হান: কিন্তু আপনি সবার জন্য কিছু শুরু করার পর সেটা তো শুধু আপনার থাকে না, অনেকে এর সঙ্গে জড়িয়ে যায়।

মুহিব খান: হ্যাঁ, সেটা তখন সবার হয়ে যায়। আশা করি সেটা আবারো হবে। ২০১৯ সালের ভিতরে ইনশাআল্লাহ আমার ইসলামিক কালচারাল ইনস্টিটিউটকে নতুন ইউনিক নামে নিয়ে আসছি ইসলামিক ইনস্টিটিউট। এটার দুটি শাখা থাকবে। একটা ইসলামিক কালচারাল ইনস্টিটিউট। অন্যটা ইসলামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট। আশা করি এটা রমজানের পর থেকে চালু হবে। আমি এটাকে খুব সমৃদ্ধ একটা প্রতিষ্ঠান করতে চাচ্ছি। সেই লক্ষ্য ও পদ্ধতি নিয়ে সামনের দিকে এগোচ্ছি।

তামীম রায়হান: এই ইনস্টিটিউট চালাতে কি দক্ষ জনশক্তি পাবেন, নাকি তৈরি করে নেবেন?

মুহিব খান: ইনশাআল্লাহ, পাবো।

তামীম রায়হান: আপনি কি মনে করেন, ইসলামি ঘরনায় এমন ইনস্টিটিউটে পড়ানো বা চালানোর লোকবল আছে?

মুহিব খান: আছে। যখন আমি ইসলামিক কালচারাল ইনস্টিটিউটে ১২ থেকে ১৬টি বিষয়ে পাঠদান শুরু করেছিলাম তখন অর্থাৎ ২০০৭-২০০৮ সালে আমাদের মাঝে আসলে তেমন যোগ্য লোক ছিলো না। বিশেষ করে ক্যালিগ্রাফি বা চিত্রকল্প শিখাবেন, এমন লোক ইসলামি ঘরনায় ছিলো না। এখন লেখক-সাংবাদিক, সাহিত্যিক অনেক তৈরি হয়েছে। গত কয়েক বছরে হয়েছে। আশা করি এখন সব বিষয়ে যোগ্য লোকের অভাব হবে না। আমার রিসার্চ ইনস্টিটিউটে দাওরা, কামিল, ইসলামিক স্টাডিজে অর্নাস ও মাস্টার্স শেষ করে একটা ছেলে আবাসিক সুবিধাসহ ১ বছরের একটা কোর্স করে নিজেকে আরো যোগ্য করে তুলতে পারবে।

তামীম রায়হান: অনুমোদিত একাডেমিক ধারার পড়ালেখার বাইরে সরকারি অনুমোদনবিহীন এমন কোর্সের আসলে কোনো গ্রহণযোগ্যতা থাকে?

মুহিব খান: আমি মনে করি, যোগ্যতা থাকে। গ্রহণযোগ্যতা থাকুক বা না থাকুক, একটা ছেলে মাদরাসা থেকে দাওরা শেষ করে ইমাম বা মুআজ্জিন হওয়ার কথা ছিলো, সে এখন এই কোর্স করে অনেকগুলো বিষয়ের উপর মৌলিক ধারণা ও

দক্ষতা অর্জন করবে। আমি বাংলাদেশে এই ধরনের কোর্স কাউকে করতে বা প্রকাশ করতে বা বাস্তবায়ন করতে দেখিনি।

তামীম রায়হান: আশেপাশে প্রতিবেশী দেশগুলোর মধ্যে কোনো দেশে দেখেছেন?

মুহিব খান: আশেপাশের দেশে এমন প্রতিষ্ঠান আছে কিনা, তা নিয়ে আমি খুব একটা গবেষণা করি নাই। আমার জানা নেই, ভারত বা পাকিস্তানে এমন ইনস্টিটিউট আছে কিনা। এই জন্য আমি 'উপমহাদেশে অন্যতম বাংলাদেশে প্রথম' কথাটি আমার প্রচারপত্রে লেখার সাহস পেয়েছি।

এই ইনস্টিটিউটে যেসব বিষয় শেখানো হবে, এর মধ্যে রয়েছে: কোরআন ও উলুমুল কোরআন, হাদিস ও উলুমুল হাদিস, ফিক্‌হ ও উলুমুল ফিক্‌হ, সিয়ার ওয়া তাওয়ারিখ, ভূগোল ও বিজ্ঞান, ইতিহাস ও সংস্কৃতি, সমাজ রাষ্ট্র ও রাজনীতি বিজ্ঞান, আইন ও বিচারব্যবস্থা, দর্শন ও যুক্তিবিদ্যা, অর্থনীতি ও বাণিজ্য, তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব, ভাষা সাহিত্য ও সাংবাদিকতা।

তামীম রায়হান: আজকের এই আধুনিক সময়ে আপনি কি মনে করেন যে, দীর্ঘ অনেকগুলো বছর পড়াশোনা করার পর আবার একজন মানুষের এই সবগুলো বিষয় শেখার প্রয়োজনীয়তা আছে?

মুহিব খান: আসলে এটাকে আমি প্রয়োজন বলছি না, বলছি একটা সুযোগ।

তামীম রায়হান: এক বছরের মাঝে এতগুলো বিষয়ে ধারণা নেওয়া কি সম্ভব?

মুহিব খান: আপনার সামনে বিভিন্ন বিষয় আছে। আপনার ইচ্ছামতো বিষয়ে আপনি দক্ষ হতে পারবেন। আপনি যদি দক্ষ হতে চান তাহরে ১২টা বিষয় থেকে বেছে আপনি চাইলে ৪টা বিষয়েও দক্ষ হতে পারেন। আমি মনে করি, একজন মানুষের এই বিষয়গুলোতে মৌলিক ধারণা থাকা দরকার যদি সে সমাজকে নেতৃত্ব দিতে চায়। কারণ, আমি যে বিষয়গুলো দিয়েছি, কেউ যদি অমনোযোগী ছাত্র হিসাবে কিছুটাও গ্রহণ করতে পারে, তাহলে বাস্তব জগতে সে গ্রহণযোগ্য হবে। তার আলাদা একটা গুরুত্ব থাকবে। তার শক্তি, সাহস, সামর্থ্য, দৃষ্টিকোণ ও মানসিকতায় অনেক পরিবর্তন আসবে। একজন মানুষ আলেম হওয়ার পর কিছুতেই যেন হীনম্মন্যতায় না ভুগে। সে যখন দেখবে সব বিষয়ে তার ধারণা আছে তখন তার নিজের মাঝে আলাদা একটা আত্মবিশ্বাস তৈরি হবে।

তামীম রায়হান: আপনার ভক্তদের বিরাট একটা অংশ কওমি মাদরাসার শিক্ষার্থী। আপনি কি অনুভব করেন যে এই ছেলেরা একটা বিরাট নেতৃত্বশূন্যতায় ভুগছে?

মুহিব খান: হ্যাঁ, অবশ্যই আমি এটা মনে করি। আমি আমার কাজের প্রথম থেকেই এটা অনুভব করছি। আমার কাজের বয়স ১৮ বছর। এই ১৮ বছর ধরেই জানি যে এই তরুণরা নেতৃত্বহীনতায় ভুগছে। তাদের মধ্যে কেউ বুঝে, অনেকে তাও বুঝে না। অনেকে না বুঝে অযোগ্য নেতৃত্বের পেছনে পড়ে আছে।

তামীম রায়হান: কেন এই নেতৃত্ব তৈরি হচ্ছে না?

মুহিব খান: একটু সময় তো লাগবেই।

তামীম রায়হান: আপনার সামনে গত দেড় দশকের বেশি সময়ে একটা সমাজ নেতৃত্ব তৈরি করতে পারলো না, এটা কেমন করে দেখেন? বা অনেকে আপনাকে সেই জায়গায় কল্পনা করতো, আপনি কি সেটা টের পেতেন?

মুহিব খান: হ্যাঁ, জানি।

তামীম রায়হান: আমি যদি বলি, আপনি এখন সেই অবস্থানে নেই। আপনার ঘনঘন অবস্থান পরিবর্তনের কারণে কিংবা কখনো আপনি সরব কখনো নিরব, আবার কখনো প্রকাশ্যে কখনো অপ্রকাশ্যে; এসব কারণে–আরও স্পষ্ট করে যদি বলি, আপনার রুটিরুজি বা ব্যাক্তিগত উপার্জনের তাগিদে আপনি বারবার সরে গেছেন?

মুহিব খান: না, আমি সেটা মনে করি না।

তামীম রায়হান: ২০০০ সালে কবি মুহিব খান যে ভালোবাসা পেতেন, এই ২০১৯ সালে এসে কবি মুহিব খানকে আজকের তরুণরা সেই ভালোবাসাটা দেয়?

মুহিব খান: আমি মনে করি, আমাকে আগের

চেয়ে ১০০ গুণ বেশি ভালোবাসা দেয় আজকের তরুণ প্রজন্ম। আমি এটা বাস্তবে পাই, এটা আমার কল্পনা না।

তামীম রায়হান: কিন্তু বাস্তবতা তো ভিন্ন কথা বলে। তখন আপনার এতো সৃষ্টি প্রকাশিত হতো বা এতো ব্যস্ততা থাকতো, সে কর্মব্যস্ততা এখন আর নেই আপনার।

মুহিব খান: আসলে ২০০০ সালে আমাকে মানুষ ভালোবাসতো গায়ক বা শিল্পী হিসাবে। আমার গান শুনতে ভালো লাগে এই জন্য। আর এখন তারা শুধু আমাকে শোনে না, আমাকে ভাবে। তারা আমাকে চিন্তা করে। তারা তাদের কোনো একটা আশা-আকাঙ্ক্ষার জায়গায় আমাকে বসায় এবং সেই অপেক্ষায় তারা আছে। তাদের মাঝে সেই বিশ্বাস আছে, আমি সেই পথেই এগিয়ে যাবো। আর তারা আমাকে সেই পথেই পাবে। আমি সেটা বিশ্বাস করি।

তামীম রায়হান: আপনার আগামী কয়েক বছরের পরিকল্পনা কী?

মুহিব খান: ইসলামিক ইনস্টিটিউট চালু করা। হলি মিডিয়াকে কার্যকর প্রতিষ্ঠান হিসাবে নতুন করে চালু করা। আর আমার রাজনৈতিক যে চিন্তাটা আছে সেটাকে এখন দৃশ্যমান করা এবং দেশব্যাপী এর প্রচার করা।

তামীম রায়হান: এই সময় আর সমাজ আপনার রাজনৈতিক চিন্তা প্রতিকূলে নাকি অনুকূলে?

মুহিব খান: আমি মনে করি, সময় ও সমাজ আমার পক্ষে থাকবে। কারণ, এখানে বিষয় হলো, আমি যাদের জন্য কাজ করবো, যাদেরকে নিয়ে কাজ করবো তারা কাজের প্রয়োজন কতটা অনুভব করছেন–এটাও একটা বড় নেতৃত্বের চ্যালেঞ্জ। একজন নেতার চ্যালেঞ্জ থাকে। নেতৃত্বের চ্যালেঞ্জ কী? যে জাতির জন্য সে কাজ করবে, তারা এখন কী কী সমস্যায় আছে, তাদের আসলে কেমন থাকার কথা ছিলো অথচ নেই, সেটা হওয়া যে দরকার এবং এই অবস্থা থেকে তাদের মুক্তি দরকার–সেটা কিভাবে সম্ভব, এই বিষয়গুলো জাতিকে বুঝাতে তার ৮০% শক্তি সার্মথ্য ও সময় চলে যায়। এটা মানুষকে বুঝাতে পারার পর বাকি ২০% কাজ মানুষ নিজে থেকে তাকে সঙ্গ দেয়, বলে দেয় কী করতে হবে।

তামীম রায়হান: আপনি আপনার ভক্তদের সাথে কিভাবে যোগাযোগ করেন?

মুহিব খান: আমি এখন সরাসরি গণসংযোগ করছি। তাছাড়া সামাজিক মাধ্যম ও আমার বিভিন্ন ওয়াজ মাহফিল ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলোর মাধ্যমেও যোগাযোগ করছি।

তামীম রায়হান: এসব অনুষ্ঠানে আপনি কথা বলেন, কিন্তু আপনি তো সবার কথা শুনতে পারেন না, সবাই আপনার কথা শুধু শোনে।

মুহিব খান: ভক্তদের কথা আমি সামাজিকমাধ্যমের মারফতে জানতে পারি। ব্যাক্তিগতভাবে যারা প্রতিনিধিত্ব করে, প্রতিনিধিত্বশীল তরুণরা কোটি কোটি না, লাখ লাখ না। তারা শত শত, বড় জোড় হাজার; তারা নিজেরা আমার সাথে যোগাযোগ রাখে এবং সারা বাংলাদেশে প্রতিটা জেলায় এবং থানায় রাজধানীর প্রবেশ ও নির্গমন পথের যে ৪ দিক আছে সেখানকার অনেকেই আমার সংগঠনে যুক্ত হবার জন্য সংগঠনকে কার্যকরভাবে এগিয়ে নেওয়া জন্য তৈরি হয়ে আছে। তারা ওলামা, তারা জনতা, তারা সাধারণ শিক্ষিত, তারা তরুণ–তারা সবাই প্রস্তুত হয়ে আছে। তারা আমাকে তাগিদ দিচ্ছে, কবে থেকে এর কার্যক্রম শুরু হবে, সেই অপেক্ষায় আছে।

তামীম রায়হান: এই রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনায় কাকে আপনি আদর্শ হিসাবে ধারণ করেন?

মুহিব খান: আমি আসলে একটা বিকল্প রাষ্ট্র চিন্তা দিতে চাচ্ছি। আমি শুধু রাজনৈতিক দল দিতে চাচ্ছি না। কাজেই আমার হোমওর্য়াক অনেক। আমার অনেক গবেষণা করতে হবে। আশা করি সামনে এগুলো বই আকারে বের করতে পারবো।

তামীম রায়হান: আপনি যে রাষ্ট্রচিন্তা তুলে ধরতে চাইছেন, সেটা আপনার সংগীতে বা লেখালেখিতে দেওয়াটা যথেষ্ট ছিল না?

মুহিব খান: আমি যথেষ্ট মনে করি, না।

তামীম রায়হান: উদাহরণ হিসেবে যদি বলি, কবি ইকবাল কি তার রাষ্ট্রচিন্তা জানানোর জন্য

দল করেছিলেন?

মুহিব খান: না, তিনি দল করেননি। তবে এর মানে এই নয় যে, তার দল করা নিষেধ ছিলো।

তামীম রায়হান: কিন্তু তিনি দল না করেও তাঁর সৃষ্টি ও কর্মে সফল হয়ে আছেন। দল করলে কী তিনি একটি দেশের কবি বা একটি জাতির কবি হিসেবে আজকের অবস্থানে থাকতে পারতেন বলে মনে করেন?

মুহিব খান: বিষয়টা হলো, কবি ইকবালের রাষ্ট্রচিন্তা বাস্তবায়ন করতে পারবেন–এমন নেতৃত্ব তার সামনে ছিল বা তার তেমন লোক জানা ছিল। কিন্তু আমার মনে হয়, আমার কাজ আমাকেই এগিয়ে নিতে হবে। বর্তমানের রাজনৈতিক নেতারা আমার রাষ্ট্রচিন্তা বুঝবেন বা সফল করতে এগিয়ে আসবেন, এমন আস্থাশীল নেতৃত্ব আমি দেখছি না।

তামীম রায়হান: আপনার বর্তমান বয়স কত?

মুহিব খান: ৪০ হতে চলেছে।

তামীম রায়হান: এই চার দশকের কোনো একটি দশককে যদি আপনি আবার ফেরত পেতে চান, তবে সেটি কোন দশক?

মুহিব খান: আমি আসলে অতীত থেকে কিছুই ফিরে পেতে চাই না। আমার মনে হয় না, আমি পিছনে গেলে এখনকার চেয়ে আরো ভালো কিছু করে আসতে পারতাম। আমি আমার বোধ ও মেজাজ মোতাবেক আমার সময়টুকু পার করেছি। আমার ভুল হয়েছে বা আমি কম কাজ করেছি কিংবা আরো বেশি কিছু করতে পারতাম–এমন কখনো মনে হয় না। আমি আমার কাজটা বুঝে শুনে করছি। যখন আমি নিরব থাকি, আমি তখনো কাজ করি। নিরব থাকাটাও আমার একটা কাজ। আমি যখন কাজ করি না, সেটাও আমার একটা কাজ। ইচ্ছা করেই আমি তখন কাজ করি না এবং সেটার ফলাফলও আমি পাই।

তামীম রায়হান: যারা এখন কওমি মাদরাসায় পড়ালেখা করছে, তাদের উদ্দেশ্য কী বলবেন? বিশেষ করে যাদের বয়স ২০-২৫ বা যারা প্রায় পড়াশোনার শেষের দিকে কিংবা কর্মজীবনে প্রবেশ করতে চাচ্ছেন?

মুহিব খান: তাদের উদ্দেশ্য বলব, নিজেদের পথ ও পরিকল্পনা বুঝে নেওয়ার মতো বয়স হয়েছে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক বাস্তবতা এবং আমাদের অঙ্গনের যে বাস্তবতা, এসব বিষয়ে খুলে বলার মতো খুব একটা প্রয়োজন নেই। তারা অনেক কিছু দেখছেন এবং বুঝছেন। এখন তাদের নিজেদের সিদ্ধান্ত নেওয়া দরকার–আমরা কী দেখলাম, আমাদের কী করা দরকার।

তামীম রায়হান: এই সিদ্ধান্তটা কী হতে পারে?

মুহিব খান: আমি আসলে এতোটা খোলামেলা বলবো না। তবে এটাই বলবো, নেতৃত্ব বুঝে নিতে হবে। এটা ইসলাম ও জাতীয় স্বার্থের জন্য বুঝে নিতে হবে। যদি রাজনীতির কথা বলি, তাহলে রাজনীতিতে নেতৃত্ব বুঝে নিতে হবে। আবেগ ও হুজুগ থেকে বের হয়ে আসতে হবে। মন মস্তিষ্ক ও দৃষ্টিভঙ্গিকে উদার করতে হবে। আধুনিক চিন্তা-চেতনা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। গণমানুষের সাথে সখ্যতা ও আত্মীয়তা গড়ে তুলতে হবে। নিজেদেরকে আলাদা বা বিচ্ছিন্ন শ্রেণী হিসেবে আলাদা করে রেখে জাতীয় চিন্তা করার কোনো সুযোগ নাই। আসলে তা থাকেও না। আজকে হোটেল শ্রমিকরা তাদের আন্দোলন করছে, ট্রাকচালকরা আন্দোলন করছে, আলেমরা আন্দোলন করছে, এটাকে আমরা শ্রেণি সংগ্রাম বলতে পারি। বাংলাদেশের ইসলামি রাজনৈতিক দলগুলোকে–যদিও আমি সবাইকে খাটো করছি না–তবে অধিকাংশেরই অবস্থান এমন যে, এটা শ্রেণী সংগ্রাম। এটিকে জাতীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ বলা যায় না। জাতীয় রাজনৈতিক দলও বলা যায় না। শ্রেণী সংগ্রাম, গোষ্ঠী সংগ্রাম আর জাতীয় রাজনীতির মধ্যে অনেক তফাত।

তামীম রায়হান: এর অর্থ হলো, আপনি বুঝাতে চাইছেন, বাংলাদেশের ইসলামি রাজনীতি একটা শ্রেণী সংগ্রামের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে আছে?

মুহিব খান: হ্যাঁ, অনেকাংশেই।

তামীম রায়হান: এতক্ষণ সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

মুহিব খান: তোমাকেও ধন্যবাদ।



যে মুহিব খানকে চিনি এবং যাকে চিনি না

সালাহউদ্দীন জাহাঙ্গীর

মুহিব খানের সঙ্গে আমার পরিচয় হলো রাজধানী মিরপুরের ৬ নং ব্লক, মাদ্রাসায়ে দারুল উলূম মিরপুর-এ। এটা ২০০৩ সালের কথা। আমি তখন পড়াশোনার জন্য ধামরাইয়ের মফস্বল ছেড়ে কেবলই পা রাখলাম রাজধানী শহরে। বুকে ভয়, চোখে স্বপ্ন। যা দেখি তা-ই অবাক লাগে। সবচে অবাক করা বিষয় ছিল দারুল উলূম মিরপুরের প্রিন্সিপাল। মুহিব খানের আব্বা মাওলানা আতাউর রহমান খান রহ.। তিনি সে বছর কিশোরগঞ্জের জামিয়া ইমদাদিয়া ছেড়ে দারুল উলূমের প্রিন্সিপাল হিসেবে দায়িত্বগ্রহণ করেছেন।

অবাক বলা যাবে না, তাঁকে দেখে আমি একদম অভিভূত হয়ে গেলাম। কী রাশভারী মানুষ! অশতীপর লম্বা ব্যক্তিত্ববান পুরুষ, সাদা চুল-দাড়ি। সাদা পাঞ্জাবি, সঙ্গে ঘিয়ে রঙের সদরিয়া; ঢোলা পাজামা আর মাথায় কিস্তি টুপি। প্রথম দেখায় আমার মনে যে খটকাটা লাগলো–তাঁকে দেখতে আর দশজন কওমি হুজুরের মতো লাগছে না। তিনি তাদের চেয়ে চলনে বলনে, চিন্তা আর মননে সম্পূর্ণ আলাদা। কথা বলেন আস্তে আস্তে, কিশোরগঞ্জের টান থাকে সে কথায়।

প্রথম ছয় মাস হুজুরকে দেখে মুগ্ধতায় কেটে গেল। এর মধ্যে একবারও হুজুরের মুখোমুখি হওয়ার সুযোগ হয়নি। মনে প্রবল ইচ্ছা–একদিন হুজুরের সঙ্গে কিছু একটা কথা হবে। তিনি কিছু একটা জিজ্ঞেস করবেন, আমি জবাব দিবো। তিনি কিছু একটা চাইবেন, আমি সামনে এগিয়ে দেবো। এমন একটা সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম।

আমাদের ক্লাসে পড়তো কিশোরগঞ্জের আতাউল্লাহ সাদী। সে হুজুরের একান্ত খাদেম, ব্যক্তিগত সহকারীর মতো। একদিন এসে বললো, তোমার তো লেখালেখির অভ্যাস আছে। হুজুর কিছু একটা লেখাবেন। চলো, আমার সঙ্গে হুজুরের বাসায়।

আমি তো খুশিতে আটখানা। ধোপদুরস্ত হয়ে সাদীর সঙ্গে হুজুরের বাসায় গেলাম। মাদরাসার কাছেই হুজুরের বাসা। হুজুর কোন একটা দৈনিকের জন্য যেন কলাম লিখেছেন, সেটা কপি করে নতুন কাগজে লিখতে হবে। আমি মহানন্দে কপি করতে শুরু করলাম। এর মাঝে কিছু কথা হুজুর নতুন করে বলতেন, সেগুলোও জায়গা বিশেষে লিখে দিতাম।

এভাবেই হুজুরের বাসায় মুহিব খানের সঙ্গে পরিচয়। বিয়ে টিয়ে করেননি, আব্বার সঙ্গে থাকেন। দাওরা শেষ করে মিরপুর বাংলা কলেজে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে মাস্টার্স করছেন। ওদিকে তিনি তখন কওমি অঙ্গনের নতুন ক্রেজ। বছরখানেক আগে তাঁর গানের প্রথম অ্যালবাম বেরিয়েছে–'সীমান্ত খুলে দাও'। ইসলামি সংগীতকে সম্পূর্ণ নতুন একটা আবহে তিনি তরুণদের সামনে তুলে ধরেছেন। ইসলামি সংগীত যে এভাবে গাওয়া যায়, কেউ এতদিন কল্পনাই করেনি। তিনি ইসলামি সংগীতাঙ্গনে সেই কল্পনাতীত ব্যাপার ঘটিয়ে তুলকালাম করে চলেছেন।

এরপর হুজুরের বাসায় অনেকবার যাওয়া হয়েছে। কখনো হুজুরের কাজে, কখনোবা মুহিব ভাইয়ের সঙ্গে আড্ডা দিতে। তিনি দারুণ আড্ডাবাজ মানুষ। তাঁর সেন্স অব হিউমার তীক্ষ্ণ। বাসায় মুহিব ভাইয়ের বড়ভাই তামীম ভাইও থাকতেন। তাঁর আড্ডার দক্ষতা আরেক কাঠি সরেস। কথায় কথায় ছন্দ মিলানোতে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। আড্ডা জমাতে আর কিছু লাগতো না। বিশ্বরাজনীতি থেকে শুরু করে ভবিষ্যত পৃথিবী–এন্তার আলোচনা চলতো। মূলত মুহিব ভাই-ই বলতেন বেশি, আমরা তো ছিলাম কেবলই দর্শত-শ্রোতা। মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাঁর কথাবার্তা শুনতাম।

মুহিব ভাই তরুণদের নতুন ক্রেজ হলেও, তাঁকে নিয়ে সনাতন কওমি অঙ্গনে একটা নাক সিঁটকানো প্রথা গড়ে উঠেছিল তখন। অনেক প্রবীণই তাঁর আধুনিকতা এবং সীমানা পেরুনোকে সাদা চোখে দেখতেন না। একটা বাঁকা নজর সবসময় বজায় থাকতো তাঁর ওপর। তাঁর চুল এত লম্বা কেন, তাঁর দাড়ি এক মুষ্ঠি নয় কেন, টুপি পরেন না কেন, পাঞ্জাবি ছোট পরেন কেন? এমন নানা অভিযোগে জর্জরিত হতেন প্রায়শই। কিন্তু মুহিব ভাই ছিলেন এসবে ড্যামকেয়ার। তিনি বরং এসব শুনে আনন্দই পেতেন। একদিন তো বলেই বসলেন, লোকজন অনেকে আমাকে গোমরাহ বলে। চিন্তা করছি তোমাদের নিয়ে একটা ব্যান্ড গড়বো, ব্যান্ডের নাম হবে 'গোমরাহ'। সেই ব্যান্ডের থিম সং হবে–'তোমরা আমাদের বলো না গোমরাহ/আসল গোমরাহ হচ্ছো তোমরা...।'

মিরপুর থেকে মুহিব ভাইয়ের সঙ্গে যে পরিচয় হলো, সেটা আর কখনো জুদা হয়নি। সময়ের নানা ঝক্কিতে কখনো আলগা হয়েছে, কিন্তু একেবারে মুছে যায়নি কখনো।

দুই

কিছুটা আত্মকেন্দ্রিক, কিছুটা আত্মগরিমায় মগ্ন থাকা এক ব্যক্তি, প্রতিভার পারদে প্রতিনিয়ত নিজেকে উচ্চকিত রাখতে সচেষ্ট একজন। আমার দৃষ্টিতে মুহিব খান এমনই। আপাত দৃষ্টিতে তাঁকে কী বলা যাবে? নিঃসঙ্গ শেরপা? নাকি নিজ স্বার্থের চতুর সারথি? যেভাবেই তাঁকে চিত্রিত করা হোক, তবু তিনি গত দুই যুগের বিনিদ্র নকিব, বাংলাভাষায় ইসলামি সংগীতের সবচেয়ে দামি ব্র্যান্ড।

কিন্তু যেভাবে তাঁকে আমরা 'দামি ব্র্যান্ড' বলে পরিচয় দিচ্ছি, তিনি কি সেই দামি ব্র্যান্ডের মূল্য পরিপূর্ণভাবে চুকিয়েছেন? ইসলামি চেতনা ও নবজাগরণের যে আওয়াজ তিনি তাঁর গান-কবিতায় উচ্চারণ করেন, সেই আওয়াজকে কতোটা তিনি তোয়াজ করেছেন–এ প্রশ্ন রয়েই যাবে।

এ কথা সত্য, ইসলামি চেতনা ও সংস্কৃতি বিতরণ করতে মুহিব খানের বেকারারি যে কোনো ইসলামপ্রিয় মানুষকে উদ্বেলিত করে থাকে। কিন্তু এই উদ্বেলিত মানুষের আবেগকে কাজে লাগিয়ে তিনি নিজের রুটিরুজি ছাড়া আর কতোটা আগুয়ান, এ চিন্তা আমি করি। এ চিন্তা তখনই আসে যখন একই মুহিব খানকে একই সঙ্গে আমি কবিতায় দেখতে পাই, দেখতে পাই ইসলামি গানের কনসার্টে, কখনো ওয়াজের মাহফিলে, কখনোবা রাজনীতির চতুর মঞ্চে, আবার কখনো ফেসবুকে জনপ্রিয়তা লাভের অযাচিত বাক্যবাগিশে। তিনি সবখানেই আছেন। সবখানেই পপুলারিটি আহরণ করে যাচ্ছেন। আমরা বোকা জনতা হয়রান হয়ে যাই–মুহিব খান আসলে কে? কোন মুহিব খানকে আমরা আইডল হিসেবে বরণ করবো?

এখানে আমার হিসাবটা খুব পরিষ্কার: আপনি যদি গায়ক হন তাহলে গায়কী নিয়ে কথা বলুন, গায়কীকে উচ্চকিত করুন। আপনি যদি নিজেকে কবি দাবি করেন তাহলে বিশ্ব কবিসভায় নিজেকে আধুনিক কবি হিসেবে উপস্থাপন করুন। আপনি যদি মাহফিল

মাতানো ওয়ায়েজ হয়ে থাকেন, শীত মৌসুমে জমিয়ে পয়সা কামান। অথবা আপনি যদি মনে করেন রাজনীতিতে আপনি তামাম ভেল্কি দেখাতে পারবেন, তো, সর্বস্ব নিয়ে আসুন ময়দানে জংয়ে। আপনার জন্য তৈয়্যার হয়ে আছে জীবনবাজিতে মাতোয়ারা লাখো তরুণসংঘ।
কিন্তু সবার আগে আপনাকে ঠিক করতে হবে–আপনি কী! কে আপনি! সত্যিকারের মুহিব খান কোনজন! 'লাল সাগরের ঢেউ'-এর কবি? 'দিন বদলের দিন এসেছে'র মঞ্চকাঁপানো জাগরণী সংগীতশিল্পী? ওয়াজ-মাহফিলে স্লোগানতোলা 'আল্লামা মুহিব খান'? নাকি রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে শুধুমাত্র নতুন কিছু ফাঁকা বুলি?
ইকবাল-নজরুল-ফররুখের প্রতিচ্ছবি বলে নিজেকে যতই হাজির করুন, দিনশেষে আপনাকে নির্দিষ্ট একটা পরিচয়ে আসতে হবে জনতার সামনে। এমন মাল্টি ট্যালেন্টেড ভূমিকা দিয়ে আপনি নিজের একক পরিচয়কে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন না। চুক্তি করে গান শোনাতে গিয়ে সেখানে আপনি 'ন্যাশনাল মুভমেন্টের' সূচিপত্র বয়ান করার অধিকার রাখেন না। ওয়াজ করতে গিয়ে মুফতে কিছু গান শুনিয়ে শ্রোতাদের উজ্জীবিত করার বাহুল্য টেকনিকও আপনাকে মানায় না।
হতে পারে এর সবকিছুই চেতনা জাগানিয়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনার রুটিরুজিরও একটা তরিকা। তাহলে আপনাকে ঠিক করতে হবে, আপনি কোন জিনিসটাকে আপনার জীবনের ব্রতী হিসেবে গ্রহণ করেছেন–চেতনা বিতরণের মাধ্যমে রুটিরুজি, নাকি স্রেফ রুটিরুজির জন্য চেতনার ফেরিওয়ালা।

তিন

একজন কবি ও গীতিকার হিসেবে মুহিব খান সার্বজনীন–এমন দাবি কখনোই তিনি করতে পারেন না। মুহিব খান যতো গান লিখেছেন সবই নিজের জন্য। তিনি অন্যের জন্য কখনো কোনো গান লিখেছেন বলে আমার জানা নেই। অথবা তিন কারো গানে সুর করেছেন–এমন তথ্যও পাইনি। নজরুলের কিছু গান তিনি নতুন আঙ্গিকে গেয়েছেন, যেটাকে রিমেক বলা যায়; কিন্তু নতুন কারো গান বা কবিতায় তিনি সুরারোপ করেননি। এখানে মুহিব খানের ভেতরে প্রতিভার যে অহমবোধ, তা সুস্পষ্ট। তিনি হয়তো মনে করেন, আমার লেখা গান আর কেউ গাইবার মতো শক্তি রাখে না; অথবা অন্য কারো গান গাওয়ার মতো ছোট আমি নই। মুহিব খানের ভেতরে এই 'আমিত্ব' সদাজাগ্রত। তিনি কখনোই নিজেকে আর দশজন সাধারণ শিল্পী বা মানুষের কাতারে নিজেকে কল্পনা করেন না। খোদাপ্রদত্ত প্রতিভা তাঁকে সবসময় আর সবার চেয়ে উন্নত বা এলিট হিসেবে ভাবতে বাধ্য করেছে। তিনি সেই যোগ্যতার ধারক বলেই তাঁর ভেতরে এমন আত্মগরিমা জাগরুক–এ কথাও অস্বীকারের জো নেই। গরিমাহীন, ব্যক্তিত্বহীন মুহিব খানও হয়তো দর্শক-শ্রোতাদের কাছে আনুখা মনে হতো। তিনি তাঁর মতোই মননে ও চলনে অদ্বিতীয়। তবে রাজনীতির ক্ষেত্রে এই আত্মগরিমা মুহিব খানের সবচে বড় ব্যর্থতা হতে পারে বলে আমার ধারণা। একজন নেতা কখনোই তাঁর কর্মীদের চেয়ে নিজেকে দেবতাজ্ঞান করতে পারেন না। অলৌকিক ওহি যদি নেতার অন্তকরণে এলহাম হয়, তবে সে পথ ও পদ্ধতি কর্মীদেরও তালিম দেয়া উচিত। কর্মীদের কাঁধে হাত রেখে, গলায় গলা লাগিয়ে যদি একই সুর না তোলা যায়, তবে সে আন্দোলন মোটেও জনমানুষের আন্দোলন হিসেব ধর্তব্য নয়।
মুহিব খান তাঁর গানের ভক্ত বা গুণমুগ্ধ শ্রোতাদের ভাবেন তাঁর চিন্তা বা দলের একান্ত সমর্থক। এটা একটা বিনাশী ভুল। যে শ্রোতা তাঁর গান শুনে স্লোগানে মুখর হয়ে ওঠছে, সে কিন্তু আগামীকাল তাঁর পেছনে এসে তাঁর দলের ধ্বজা ধরে নারায়ে তাকবির বলবে না। তাদের কাছে মুহিব খানের গান কিছুটা চেতনা ঝালাইয়ের মশলা, অনেকখানি বিনোদনমাত্র। এ সত্য যদি মুহিব খান বুঝতে পারেন, তাহলে রাজনীতির মতো কুটিল রঙ্গমঞ্চে তাঁর অনুপস্থিতিই সর্বৈব সুফল বয়ে আনবে।
মুহিব খান জন্মান্তরের একজন কবি ও গায়ক। এটাই তাঁর আদি ও আসল পরিচয়। এই পৃথিবীকে কবিতা ও গানে তাঁর আরও অনেক অনেক কিছু দেবার কথা ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়ই বলতে হবে, তিনি সেসব প্রতিশ্রুত গান-কবিতা অন্য কোথাও স্বল্প দামে বিক্রি করে দিচ্ছেন অকাতরে।



মুহিব খান : কবি বনাম গায়ক

নাজমুস সাকিব

গায়ক না কবি–কোন পরিচয়ে মুহিব খান বেশি জনপ্রিয়? এ প্রশ্নের উত্তর দেয়া কঠিন। গায়ক মুহিব খান যেভাবে মঞ্চ কাঁপাতে জানেন তেমনি কবিতার ছন্দে পাঠকদের বিমোহিত করতে পারে তাঁর কবিতার ছান্দসিক দ্যোতনা। তাছাড়া গায়ক মুহিব খানের মধ্যে কবিত্বের পরিচয়ও তীব্রভাবে ফুটে ওঠে। কারণ কবি মুহিব খানের লেখা গানগুলোই তো গায়ক মুহিব খান আমাদের শোনান।

তবে মনে হয়, ভক্তদের কাছে গায়ক মুহিব খানই বেশি প্রিয়। যদিও তিনি নিজেকে কবি বলে পরিচয় দিতে বেশি ভালোবাসেন। এছাড়া তাঁর আরও বহু পরিচয় আছে। সে ফিরিস্তি কম লম্বা নয়। লেখক, সম্পাদক, কবি, সাংবাদিক, ওয়ায়েজ–নানা পরিচয়ে মুহিব খান ভাস্বর আমাদের কাছে। তবে তাঁর অন্যসব পরিচয়ের চেয়ে গায়ক পরিচয়ই যে বেশি জনপ্রিয় তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

গায়ক মুহিব খানের যাত্রা শুরু হয় ২০০১ সালে 'সীমান্ত খুলে দাও' নামক সংগীত অ্যালবাম দিয়ে। প্রথম অ্যালবামে সম্পূর্ণ নিজরূপে আত্মপ্রকাশ করেন কবি। বাংলাদেশে তখন ইসলামি অঙ্গনে প্রচুর সংগীতচর্চা হতো। প্রায় প্রতি সপ্তাহে নতুন অ্যালবাম পাওয়া যেত

বাজারে। মোবাইল তখনও সবার হাতে হাতে আসেনি। সিডির চেয়ে অডিও ক্যাসেটের সংখ্যাই ছিল বেশি।

সে সময়কার সংগীতগুলো হতো এক ধাঁচের। বেশিরভাগই জিহাদি সংগীত। হামদ ও নাতের পরিমাণ প্রতি অ্যালবামে দু-একটি। এছাড়া অন্য বিষয় নিয়েও যে ইসলামি সংগীত হতে পারে তা নিয়ে ধারণা ছিলো না কারও।

কবি মুহিব খান বাংলাদেশে ইসলামি সংগীতে বিপ্লব এনেছিলেন–এ কথা ইসলামি সংগীতের যে কোনো শ্রোতাই স্বীকার করবেন। গানের বিষয়, কথার ধরন, সুর–সবকিছুতে মুহিব খান ব্যতিক্রম এক ধারা প্রবর্তন করেন। ইসলামি সংগীতের জন্য যেখানে মানসম্মত কথা খুঁজে পাওয়া যায় না সেখানে মুহিবখানের গানের কথা ফুরোয় না।

গত দুই দশক ধরে ইসলামি গানে দেশের সেরা শিল্পীর আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে আছেন মুহিব খান। প্রথম অ্যালবাম 'সীমান্ত খুলে দাও'-এর কিছু গানের কথা বলা যেতে পারে। 'উত্তর হতে দক্ষিণ মেরু সীমান্ত খুলে দাও', 'মাদরাসা জিন্দা রাখো', 'এদেশে আল্লাহু আকবারের সুরে সূর্য ওঠে' ইত্যাদি তাঁর এই অ্যালবামের সেরা গান। এর মধ্যে শেষোক্ত গানটি বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছে। স্বয়ং কবিরও এই গানটি খুব প্রিয়। বহু অনুষ্ঠানে নানা জনপ্রিয় গানের সাথে কবি এই গানটি গাইতে কখনো ভোলেন না।

দ্বিতীয় 'অ্যালবাম দিন বদলের দিন এসেছে' প্রকাশ হওয়ার পর কবির জনপ্রিয়তা তুঙ্গে ওঠে যায়। এই অ্যালবামের গানের কথা ও সুর খুবই উচ্চাঙ্গের ছিল। 'হে যুবক তুমি' এই গানের মতো কোনো কবিতা বা গান পৃথিবীর অন্য কোনো ভাষায় লেখা হয়েছে কিনা আমাদের জানা নেই। তবে কবির মুসলিম ঐক্যের দর্শন সত্যিই অনন্য। এই অ্যালবামের 'দিন বদলের দিন এসেছে'-এর মতো গানই হয়তো কবিকে 'জাগ্রত কবি' উপাধিতে ভূষিত করেছে। তাছাড়া 'এই ভারত' ও 'সীমান্তে ওই কেঁঠা' এই দুটি গান বেশ চমৎকার। এরকম বিষয় নিয়ে সংগীত ইসলামি অঙ্গনে তো দূরের কথা, দেশের ভিন ধারার শিল্পীরাও কখনো ভাবেননি।

মুহিব খানের সংগীতগুলোতে সমসাময়িকতার উপস্থিতি বেশ ভালোভাবে লক্ষ করা যায়। এই অ্যালবামে 'তোরা মার্কিনি সেই পণ্য কিনে হসনে গোনাহগার' গানটি সমসাময়িক ঘটনার প্রেক্ষাপটে লেখা। মূলত সংগীত এমন হওয়া চাই। ইসলামি অঙ্গনের শিল্পীরা সার্বজনীন ধারার গানে অভ্যস্ত। কিন্তু মানুষের মনে রেখাপাতের জন্য সমসাময়িক ঘটনা বা বিষয়ে রচিত সঙ্গীতের গুরুত্ব অপরিসীম।

কবির তৃতীয় অ্যালবাম 'ইঞ্চি ইঞ্চি মাটি'। এই গানটি কবির গানগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত। গানটিও পরে ভিন্ন সংগীতায়োজনের মাধ্যমে বিটিভিতেও প্রচারিত হয়। এ ছাড়া 'আমেরিকা নাইন ইলেভেন' গানটি ছিল চমৎকার। এই গানে আমেরিকা ও তার মিত্রদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের তীব্র ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। গানটি খুব জনপ্রিয়ও হয়। সে সময় দেশের নানা জায়গায় ইসলামি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হতো। কবি এই গানটি প্রায় অনুষ্ঠানে গাইতেন। আর কেউ কোনো জিহাদি অনুপ্রেরণামূলক সংগীত এভাবে জনসম্মুখে গেয়েছে বলে শোনা যায়নি। বাংলাদেশে একটি জিহাদি গানকে এভাবে জনপ্রিয় করে তোলার কৃতিত্বও একমাত্র কবি মুহিব খানের।

এ প্রসঙ্গে আরেকটি গানের কথা না বললেই নয়। কবির পঞ্চম অ্যালবাম 'আবার যুদ্ধ হবে'-তে কবি আরেকটি গান গেয়েছেন জিহাদ নিয়ে। গানটির কথা এমন–'জিহাদ সে তো ইবাদত, সন্ত্রাস কভু নয়। সন্ত্রাস সে তো সন্ত্রাস, জিহাদ কভু নয়।' দুঃখের বিষয়, কবির নানা গানের এমন গভীর মর্মবাণী খুব কম শ্রোতাই হয়তো উপলব্ধি করতে পেরেছেন। তাই কবির যতটুকু সমাদর আমাদের মাঝে পাবার কথা তার অনেক কম আমরা দেখতে পাই। কবির উচ্চাঙ্গের এই গানগুলো নিয়েও তেমন কোনো আলোচনা দেখা যায় না। কবির চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্রেও সমর্থন খুব বেশি বলে আমার মনে হয় না। হয়তো গভীর কথার গভীরতা অনেকেই অনুধাবন করতে পারেন না। এটাই বুঝি পৃথিবীর নিয়ম যে, অযোগ্যরা ফুলের মালা পরবেন আর যোগ্যরা অবহেলায় থেকে যাবেন।

'ইঞ্চি ইঞ্চি মাটি'র পর 'ইয়ে ম্যারা ওয়াতান' নামে কবির আরেকটি অ্যালবাম প্রকাশিত হয়। এই অ্যালবামে বাংলা ইংরেজি ও উর্দুতে একটি দেশাত্মবোধক গান কবি গেয়েছিলেন। উর্দুতে বাংলাদেশের জন্য গান কোনো কবি কি আগে লিখেছিলেন? এই অ্যালবামে একটি গানের কথা বিশেষভাবে বলতে হয়। গানটি মহান স্রষ্টার শানে রচিত। গানটির কথা এমন–'চিনলি নারে মন তাহারে চিনলি নারে মন...'।

সারা জীবনে শোনা ও পড়া অসংখ্য হামদ ও কবিতার মধ্যে এই ধরনের কোনো হামদ পাইনি। কবি এখানে আল্লাহর জ্ঞানের বিশালত্বের কথা বলেছেন অনন্য ভঙ্গিমায়–'কখন কোথায় কোন কারণে কে থাকে কার পাশে/ কোন কবরে কোন সে শিয়াল মুখ দিল কার লাশে..' এমন নানা অভিনব কথা দিয়ে সাজানো এ গানটি।

কবির সর্বশেষ প্রকাশিত অ্যালবাম 'আবার যুদ্ধ হবে'। এই অ্যালবামেও কবি স্বমহিমায় ভাস্বর। প্রতিটি গানই ভিন্ন ধাঁচের। 'আবার যুদ্ধ হবে' গানটির কথাও আলাদা করে বলতে হয়। এই গান দেশপ্রেমিক শ্রোতাদের ধমনীতে ঝড় তোলে। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় নানা গান রচিত হতো মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার প্রায় ৪০ বছর পর এই গান আমাদের এই প্রজন্মে সেই উত্তাল দিনগুলোর অনুভূতি এনে দেয়।

অ্যালবামের বাইরেও অনেক গান আছে কবির। আনসার ও ভিডিপির জন্য এবং নানা উপলক্ষে অনুরোধে গান লিখেছেন কবি। ইসলামিক টিভির জন্য লেখা 'সুন্দর পৃথিবীর জন্য' গানের কোনো তুলনা হয় না। এ ছাড়া জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের কিছু ইসলামি গান নিয়ে 'মরু সাহারা' নামে একটি অ্যালবাম প্রকাশ করেন। অ্যালবামটি কবির গায়ক জীবনের প্রথম দিকে প্রকাশিত।

এখন সময় বদলেছে। গানের অ্যালবাম আর কেউ করেন না। ইউটিউবে একটি একটি করে গান ছাড়া হয়। এর মাঝে কবিও অনেক বদলেছেন। মাঝে 'সাপ্তাহিক লিখনী' নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। সেসময় কবির কিছু কবিতা পাওয়া গেলেও কোনো সংগীত আমরা পাইনি। সম্প্রতি কবিও ইউটিউবে চ্যানেল খুলেছেন। নতুন কিছু গান সেখানে পাওয়া যাচ্ছে। তবে কবির সব গান ও কনসার্টের ভিডিও সম্বলিত একটি চ্যানেল অনেক আগেই তৈরি হওয়ার কথা। একজন ভক্ত হিসেবে প্রযুক্তির এই যুগে এভাবে কবির পিছিয়ে থাকার অনুযোগ আমরা করতেই পারি।

কবি 'লিখনী' ছেড়েছেন বহুদিন। আবার হয়তো সংগীতে মন দিয়েছেন। বাংলা ভাষায় আরও অনেক মুগ্ধকর সংগীত আমাদের উপহার দেবেন–এই প্রত্যাশা আমাদের।

লেখক : সহকারী সম্পাদক, মাসিক নবধ্বনি



মুহিব খানের কাছে তরুণদের প্রত্যাশা

হামমাদ রাগিব

জাগ্রত কবি মুহিব খান। সম্প্রতি ভক্তদের কেউ কেউ ভালোবেসে 'আল্লামা'ও ব্যবহার করেন তাঁর নামের শুরুতে। যেন-বা হালের আল্লামা ইকবাল। হ্যাঁ, আল্লামা ইকবালেরই অনেকটা প্রতিচ্ছায়া ভেসে ওঠে তাঁর গান ও কবিতায়। সেই সঙ্গে পাওয়া যায় আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের দ্রোহ ও জাগরণীর ঝংকার। দুই ভাষার এ দুই মুসলিম কিংবদন্তি কবির ছাপ যে তাঁর কবিতা ও গানে পরিস্ফুটিত, তা জাগ্রত কবি নিজেও স্বীকার করেন। কিন্তু এসব কিছু ছাপিয়ে কবি স্বমহিমায় ভাস্বর। তাঁর কবিতা ও গানের স্বতন্ত্র একটি চেতনা ও ধারা তিনি তৈরি করে নিয়েছেন নিজের মতো করে। এবং এই ধারাটি কবির একান্ত নিজস্ব ও আনকোরা।

তাঁর প্রতিটা কবিতা ও গানে ব্যতিক্রমী ও তাৎপর্যপূর্ণ বার্তা থাকে। গানে গানে তিনি ছড়িয়ে দেন বিশেষ এক চেতনা। যে চেতনা বিশুদ্ধ ও শাশ্বত বিধানের ঐশীজলে বিধৌত। বাংলাদেশের অসংখ্য তরুণ এখান থেকে প্রেরণা ও আলো গ্রহণ করেন। অনেকের চেতনার প্রথম পাঠ শুরু হয় জাগ্রত কবির কবিতা ও গানের ঝংকারে। এবং মুহিব খানকে তাঁরা নিজেদের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে নেন নিজের অজান্তেই।

একজন কবি ও সঙ্গীতশিল্পী হিসেবেই মুহিব খানের মূল খ্যাতি। এ

দেশের তরুণরা তাঁকে এ পরিচয়েই চেনে। কিন্তু শিক্ষাগতভাবে মুহিব খান কওমি ঘরানা থেকে সনদপ্রাপ্ত একজন মেধাবী ও চিন্তক আলেম। তার পরের পরিচয়ে তিনি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র হবার কারণেই কি-না, তিনি সম্প্রতি রাজনীতির দিকে ঝুঁকেছেন। বছর দুয়েক আগে ন্যাশনাল মুভমেন্ট নামে স্বতন্ত্র একটি দলও গড়েন। দলের গঠনতন্ত্র, কাঠামো এবং বক্তব্যের প্রতি খেয়াল করলে মুহিব খানের মেধা ও চিন্তার উচ্চমার্গীয়তা সম্পর্কে খানিকটা ধারণা পাওয়া যায়। একজন রাজনীতিবিদ হিসেবে তিনি যে যথার্থ ও পরিপক্ক–তাঁর দলের এই দিকগুলো লক্ষ করলেই বোঝা যায়। কিন্তু বাংলাদেশের ভূরাজনৈতিক বাস্তবতায় তিনি কতটা সফল হবেন, সেটা হলো ভাবনার বিষয়।

মুহিব খান প্রায়ই বলেন, তাঁর প্রতিটা গান ও কবিতায় একেকটা দর্শন পুঁতে দেন তিনি। প্রতিটা গানেই তাই আলাদা বৈশিষ্ট্য থাকে, থাকে স্বতন্ত্র বার্তা। তাঁর গান যাঁরা এতদিন শুনে এসেছেন, গানে গানে ছড়ানো তাঁর দর্শন, বিশিষ্টতা ও বার্তাগুলো তাঁরা জেনে হোক কিংবা আপনার অজান্তে, নিশ্চয় হৃদয়ঙ্গম করে ফেলেছেন। তিনি দেড় যুগেরও বেশি সময় ধরে 'দিন বদলের গান' শুনিয়েছেন বাংলার তরুণ-যুবাদেরকে, শুনিয়েছেন 'নতুন দিনের ইশতেহার'। ইশতেহার অনুযায়ী তাই এখন 'দিন বদলের' কার্যকর উদ্যোগ নেয়ার সময় এসেছে। বছর দুয়েক আগে ন্যাশনাল মুভমেন্ট গঠনের প্রস্তুতি যখন প্রায় সম্পন্ন, ঘরোয়া এক আলাপচারিতায় এমনটাই শুনেছিলাম কবির মুখ থেকে।

কিন্তু তরুণ-যুবা-নবীন, যাঁরা তাঁকে শোনেন, পাঠ করেন ও ভালোবাসেন, তাঁরা কতটুকু সাড়া দিয়েছেন তাঁর এই রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায়? বছর দুয়েক পার হয়ে গেছে, আমরা কিন্তু সেভাবে কোনো সাড়া লক্ষ করিনি এঁদের তরফ থেকে। এটা ঠিক কী কারণে–কবির কর্মপ্রক্রিয়ার ধীর গতির কারণে, না অন্য কোনো হেতু আছে এর পেছনে, বলতে পারছি না। তবে দেশের নানা প্রান্তের বেশ কিছু তরুণ ও নবীনের সঙ্গে আলাপ করে বুঝেছি, তাঁদের সিংহভাগই মুহিব খানকে একজন কবি ও সঙ্গীতশিল্পী হিসেবে দেখতে বেশি আগ্রহী। রাজনৈতিক মাঠে যদিও দক্ষ ও সৎ নেতৃত্বের তুমুল সংকট এবং মুহিব খান যদিও নেতৃত্বের সব গুণাগুণে সমৃদ্ধ, কিন্তু বিদ্যমান সংকট এতোটাই সংকটপূর্ণ যে, তা মোকাবেলা করা বাংলাদেশের ভূরাজনৈতিক বাস্তবতায় মুহিব খানের মতো নতুন রাজনীতিবিদের জন্য অনেকটা অসম্ভব। তাই মুহিব খানকে রাজনীতির মারপ্যাঁচে ছেড়ে দিয়ে নতুন ও অভিনব পদ্ধতির জাগরণী চেতনাসমৃদ্ধ গান ও কবিতা থেকে বঞ্চিত থাকতে চান না মুহিব খানের অধিকাংশ তরুণ ভক্তশ্রেণি।

লেখক : সহকারী সম্পাদক, মাসিক নবধ্বনি



হৃদয়ের আর্তি

মুনশি মুহাম্মদ উবাইদুল্লাহ

সেই সে রত্ন, হারিয়েছি যা আমি; খুঁজে ফিরি প্রতিনিয়ত। পাই না তাকে। ধরা দেয় না আমায়। দূর থেকে শুধু কাঁদায়, আর সে হাসে। তাকে পাবার জন্য অধরায় হাত বাড়াই। যদি কখনও পাই! আশা আমার। আশার জাল ছিন্ন হয় না কখনও। মাঝেমধ্যে কথা বলি; যা ছিল না-বলা। ছিল আমার মনে, শুধু অব্যক্ত হয়ে। সেই অব্যক্ত কথা শোনে না সে। তবু বলে যাই। যদি শোনে–আশায়। ঘুমোবার জন্য রাতে বিছানায় এলিয়ে দিই দেহ। আসে না ঘুম। বসে থাকি ঘুমপাড়ানি সে গান শোনার আশায়। ভালোবাসি তাকে কত যে! বলিনি কখনও। বলার সুযোগ হয়নি কখনও। এর আগে চলে গেল সে। মাঝেমধ্যে অভিমান হয় তার ওপর। সবাই তার বাবাকে ডাকে। আদর পায়। স্নেহে আপ্লুত হয়। কিন্তু আমি পাই না। তুমি করো না আমায় আদর। বলো তো বাবা! তুমি কি মানুষ নাকি অন্য কিছু? বুঝে আসে না আমার। এই শহরে ঘোরাফেরা করি। দেখি হরেক রকম জিনিস। আমার নিতে ইচ্ছে হয়, খেতে ইচ্ছে করে অনেক কিছুই। কিন্তু তুমি দাও না আমায়। এমন কেন তুমি? বলতে পারো।

আমার বন্ধুরা কত সুখী। কত সুখময় ওদের জীবন। বাবাকে ডাকে। তারা খোঁজ নেন ওদের। কিন্তু তুমি আমার খোঁজ রাখো না। এমন করো কেন বাবা! আমায় কি তোমার পছন্দ নয়? আমি কি তোমার ছেলে নই? তুমি তো আমার জন্মদাতা পিতা। আমি তো তোমার আলোকিত পৃথিবী। একটু চেয়ে দেখো, কতো বড় হয়ে গেছি আমি। কত বন্ধু আমার, কত শুভাকাঙ্ক্ষী। আরও কত কি! এসব দেখলে তুমি একদমই...।

এখনও তোমার কি ইচ্ছে হয় না, খোকাকে স্নেহের পরশ বুলিয়ে দিতে? জানি হয়। কিন্তু পারছ না তুমি। কারণ তুমি তো সাড়ে তিন হাত মাটির নিচে। কিন্তু অনেক অনেক দূরে। আমায় একা ফেলে শুয়ে আছ সুখে। জানি, আমায় মনে পড়ে না তোমার। কিন্তু তোমায় খুব মনে পড়ে বাবা! তোমার বিরহে রাতে চোখের জল ফেলি; কাঁদি একটানা। নীরবে মন খারাপ করে বসে থাকি। কিন্তু তুমি? বোঝো না কিছু। আমার হৃদয়ের আর্তি আমার মাঝেই থাকে; আর তুমি

থাকো তোমার মাঝে। অভিমান করলাম আমি। ভালো থেকো বাবা! জানি, তোমারও ইচ্ছে হয় আমায় দেখতে। কিন্তু পারো না। কারণ তুমি তো সাড়ে তিন হাত মাটির তলে। তাও জানি আমি। তবে এসব আর কিচ্ছু নয়, হৃদয়ের আর্তি।

দুই

ঘরের সঙ্গে লাগোয়া বারান্দায় আমি। বাতায়ন খুলে চেয়ে আছি অদূরে। বাইরে বৃষ্টি পড়ছে, রিমঝিম তানে। মনের ভেতর বেজে ওঠে অচেনা কোনো এক করুণ সুর–'আজ শরৎবেলায় কোন সে সুখের আবেশ? এলে সুখের জানান দিতে। কুয়াশায় ভিজে ভিজে রাত পার কামনা; দূরে যেয়ো না।' কুয়াশা-ভেজা তোমার ঐ চরণদুটি শিহরিত করে আমায়। কাছে টানে এক মায়াবী পুলকে। ভালোবাসার এক অচিনপুর আছে। আজ তা অন্তহীন। এই কুয়াশাজলে সিক্ত হয়ে পেরিয়েছে নিজ সীমানা। আমি সাঁতার কাটছি এর অথৈ জলে। চারদিকে থৈ থৈ জল। কানায় কানায় ভরপুর এর চতুর্পান্ত। 'চিক চিক করে বালু, কোথাও নেই কাদা; একধারে কাশবন ফুলে ফুলে সাদা...।' বন্দে আলী মিয়ার কবিতা মনে পড়ে। মনে পড়ে সেই ডুবুরির কথা। একদিন তুমি হারিয়ে গেছিলে জলগভীরে। ডুবুরিরা তোমায় উদ্ধার করেছিল। আমিও তোমার মতো হারিয়ে যাই; ধূলিখেলার বন্ধুদের সঙ্গে–ু ক-ডুকখেলার সেই স্মৃতিতে। এসব মনে করে কখন যে খেই হারিয়েছি, নিজেও জানি নে।

আমার স্বজনদের কেউ তাদের বাবাকে 'আব্বু', কেউ বা 'বাবা', আবার কেউ 'আব্বা' ডাকে। আমার তোমাকে 'বাবা' ডাকতেই ইচ্ছে হয়। তাদের কেউ ডাকে 'তুমি', কেউ বা 'আপনি'; কিন্তু আমার মানহীন সর্বনামটাই বারবার আওড়াতে ইচ্ছে হয়। কারণ এর ভেতর আছে অন্যরকম ভালোবাসা। 'তুমি' ভেতর থেকে আসে। রবীন্দ্রের ভাষায়–'তুমি যে তুমিই ওগো! সেই তব ঋণ/ আমি মোর প্রেম দিয়ে শুধি চিরদিন।' বেশি বাড়িয়ে বলা ভালো নয়। তাই বলছি না, 'তুমি' বলি কবিগুরুর এ চরণকে অনুসরণ করে। বরং এটা ভালোবাসার সূচনা থেকে, জন্মের পর থেকেই। আজ ভালোবাসার পদ্ম ফুটেছে নতুন করে; নতুনরূপে। বৃষ্টির রিনিঝিনি তানে কী এক ছন্দ খুঁজে পাই। এই অবুঝ মনটাও দুটি হাত বাড়িয়ে হাতে হাত মিলিয়ে ভিজতে চায়। আমার কপোল বেয়ে আজ বইছে দুঃখের জলধারা। বলছে তোমায়–'ওগো তুমি! তুমিই পারো আমার দুঃখ ঘোচাতে; আমায় চির আপন করে নিতে।'

পড়ন্ত বিকেলে চেয়ে থাকি গোধূলিবেলার আকাশের দিকে। দেখি জীবনের এই ঘন-কালো মুহূর্তের প্রতিচ্ছবি। আভাহীন সূর্য হয়তো তখন আমার দিকে চেয়ে হাসে উপহাসের হাসি। দূরপাহাড় আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকে। আমি ভ্রুক্ষেপ করি না কারোর উপহাস; সাড়া দিই না কারোর ডাকেই। শুধু চেয়ে থাকি পৃথিবীর এই আমার চতুর্দিকে। হয়তো তুমি আসবে কোনো দিগন্ত থেকে। আসবে হাত বাড়িয়ে। ধরবে আমায় জড়িয়ে। বুকে নেবে। চুমু খাবে। আদর সোহাগে ভরিয়ে দেবে এ হৃদয়। কথা বলবে চুপটি করে। আমিও তেমনই আচরণ করবো তোমার সঙ্গে। মুচকি হাসি নয়; ভালোবাসার শেষ হাসিটুকু হলেও অন্তত দেখা দেবে আমার এই মুখাবয়বে। কত আশা আর কল্পনা এ বুকে। হৃদয় উজাড় করে দাঁড়িয়ে আছি শ্যামলমাখা কোনো এক মাঠে। যার অবারিত সবুজ আমায় মুগ্ধ করে প্রতিনিয়ত। চারপাশ থেকে ডাকছে পাখপাখালি; আমায় আপন বাসায় নেবে বলে। পাহাড় হাতছানি দিয়ে ডাকে; আমার সঙ্গে আলাপ জুড়ে দেবে বলে। উপহাস করছে অদূরে চেয়ে থাকা সূর্যের রক্তিমাভা। কারোর প্রতিই নেই আমার খেয়াল। আজকাল সব খেয়ালই যেনো হারিয়ে ফেলেছি আমি। শুধু একটাই খেয়াল আমার; আর একটাই স্বপ্ন–তোমার মিলন।

প্রেমের সুরভি দিয়ে কীভাবে ফুলকুঁড়ি গাঁথে–জানি নে। তবে আবেগে হয়তো তোমাকেই তেমন করে ভেবেছি। আমি এখনও দাঁড়িয়ে; সময়ের ঝড়ো হাওয়ায় পা পিছলে সরে যাইনি সে বিস্তর প্রান্ত হতে। খেয়ালি হাওয়ায় ভাসেনি মন। শুধু কল্পনায় বরাবরই সাঁতার কেটেছে। মাঝেমধ্যে মনে হয়েছে, এ জীবনঘুড়ির লাটাই তোমার বিরহী বেদনার হাতে। ইচ্ছে হলেই সে টান দেবে। কিন্তু কই? কই তুমি? এলে না তো! সেই চারপাশের নানাজনের নানান ডাক আর উপহাসের রঙিন

জালেই ফেঁসে আছি আমি। বন্দী হয়েছি একঘেয়ে কোনো কারাগারে। যেখান থেকে না বেরোনোর পথ আছে; না আছে সেখানে থাকবার কোনো সুযোগ। বারবার কেবলই ভেতর থেকে কোনো এক অসহনীয় দহন আঁৎকে ওঠে–পীড়া দেয়। যার ঘানি আজও টানছি আমি। বয়ে বেড়াচ্ছি দূর থেকে বহুদূরে। কিন্তু তুমি বোঝোনি তা। বোঝোনি এই ম্লান মুখের ভাষা। অম্লান মুখের হাসি কী ছিলো তোমার চাওয়া? তাহলে দাও না কেন ধরা! আর না-হয় হোক না একবার অধরায় কথা বলা। তুমি হয়তো দেখবে আমায়। কিন্তু আমি দেখবো না তোমায়। শুধু আড়াল থেকে তোমার ধ্বনি বাজবে আমার কানে। বর্ষার এই রিনিঝিনি তান কত তুচ্ছ হবে সেই প্রতিধ্বনির কাছে! ভেসে বেড়াবো অজানা কোনো এক সুখে। চিরসুখী হবে আমার এ মন। থাকবে না আর তার কোনো আর্তি। শুধুই সুখের জোয়ারে ভেসে যাবে অজানা কোনো সুখনগরীতে। নিজেকে হারিয়ে ফেলবে সুখের মাঝে; যার কোনো অন্ত নেই। নেই কোনো অন্তের ভাবনা। কথ্যভাষায় যাকে 'স্বর্গসুখ' আখ্যা দেওয়া হয়। সেই প্রতীক্ষায়ই আছি আজও। চাই না আর কোনো দহন সইতে। কারণ এ দহন বড়ই যন্ত্রণার, বড়োই অসহনীয়। তাই চেয়ে আছি–আসবে তুমি; আসবেই একটিবার। এ আর্তির তানই বারবার ভেসে বেড়ায় আমার শরতের রোজকার বেলায়।

তিন

তোমার কবর পাশে দাঁড়িয়ে আমি কত-না কেঁদেছি। তুমি হয়তো দেখেছ; টের পেয়েছও আমার পদধ্বনি। কিন্তু দাওনি সাড়া। অশ্রু টপটপ করে গড়াচ্ছিলই শুধু। তবু তুমি সাড়া দাওনি। অনেক কষ্টে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছি। বাবা! তোমার প্রতি আমার এতো টান কেন বলতে পারো? আমার জীবনের চেয়েও আমি তোমায় অনেক বেশি ভালোবাসি। কত-না নিশিযাপন করেছি তোমায় ভেবে ভেবে। নিজেরও জানা নেই। সেদিন পত্রিকা আপিসে কী একটা কাজে মগ্ন ছিলাম। পাশে কারোর মৃদু হাসিতে আমার একাগ্রতায় বাঁধ সাধলো। ভালো করে তাকাতেই দেখলাম ছোট্টপায়ের অনুরণন। মিষ্টিসুরে বাবাকে ডেকে বলছে–'আব্বু! আব-বু!' আমার ভেতরটা তখন হাহাকারে ভরে উঠল। হয়ে গেলাম মরুঅঞ্চলে রোদের তীব্রতায় পিপাসার্ত লোকটির মতো। বুকের ভেতরটা আচমকা দড়ফড়িয়ে উঠল। কী যেন বলতে গিয়েও পারলাম না বলতে। অজান্তেই আটকে গেল মুখ। নীরবকান্নায় বেশ সময় গড়ালাম। সেটাও হয়তো দেখোনি তুমি। সেদিন শপিংমলের নানান লোকের ভীড়ে নিজেকে মিলিয়ে দিলাম তাদের সঙ্গে। হঠাৎই চোখের সামনে ধরা দেয় এক অযাচিত দৃশ্য। কাণ্ডটি আমায় একেবারে হতবাক করেই ছাড়ল–'আব্বু এটা নয়, ওটা নেবো।' ইঁচড়েপাকা শহুরে একটি বাচ্চার ওর বাবার কাছে আবদার। আমার তখন বড়ই একা মনে হলো। ভাবলাম, তুমি যদি থাকতে, তাহলে ওদের মতো আমরাও হয়তো বা দুজনে দুজনার হাত ধরে ঘুরে বেড়াতাম এই আঁকাবাঁকা নগরীর পথঘাট। মজা করতাম শপিংমলের এই কফিহাউসে। তুমি হয়তো আমায় খাইয়ে দিতে। সত্যি! বিনিময় দিতে একটুও কার্পণ্য করতাম না আমিও। কিন্তু সেটা আর হলো না। তোমার কাছে আমিও করতে পারতাম বিভিন্ন জিনিসের বায়না। তোমার সাধ্যমতো দিলেই হতো। এতে আমার কোনো আপত্তি থাকত না বাবা! শুধু একটাই আশা বুকে বেঁধে রাখতাম–বাবা ডেকে আরেকটিবার তোমায় বলবো–'এটা নয় ওটা বাবা!' এমন স্নেহমাখা ডাক আর দৃশ্যের চেয়ে বড় কী পৃথিবীর অন্য সবকিছু?
এখনও ঘুম ঘুম রাত আসে যায় রোজ। চুপ কথা চুপ বনে বিছানায় এলিয়ে দিই দেহখানা। গভীর রাতে বেজে ওঠা টেলিফোনে ভাঙে কখনও ঘুম। তবে তোমায় ভেবে আমি আজ আর রাত জাগি না। চোখের নিচে এখন আর কালি পড়ে না। তোমায় নিয়ে আমি আর কবিতা লিখি না। কাব্যরা সব যেন আমায় ছেড়ে চলে গেছে দূর-বহুদূরে। আজ আমি কাউকেই আর তেমন ভালোবাসি না। ভালোবাসার শবদেহ আমার ঘরের পাশেই যেন-বা হাজির। তুমি ছিলে, আছো; তবে থেকেও যেন আজ আমি আর নেই। এমন করে পাড়ি দেবো হয়তো পৃথিবীর কয়েক কদম পথ।

লেখক : শিক্ষক, আল জামিআতুল ইসলামিয়া ইসলামপুর (ভবানিপুর মাদরাসা), গোপালগঞ্জ



(ছোটগল্প)

কন্যাদায় কিংবা কন্যার যন্ত্রণা

কাউসার মাহমুদ

'লইয়া যাও দিবাকর, ওরে আমার দরকার নাই। সোনামুখি সুঁই গাঁইথা গাঙ্গে ভাসায় দিয়ো।'

চিমনি ভাঙা চুঁইচুঁই আলোর ভেতর বড্ড উদাস কণ্ঠে উল্টোমুখে কথাগুলো বললেন নির্মল ঠাকুর। নিঃসাড় অন্ধকারমাখা ছায়ার ভেতর একফোঁটা জল কি নেমে পড়ল ঠাকুরের গাল বেয়ে? কোমরে ধূতি গাঁথতে গাঁথতে ভেতরে চলে গেলেন এ বাড়ির কর্তাটি। ওইদিকে কে যেন এক আকাশ শোক মেখে নির্লিপ্ততা মেনে নিয়েছে অনন্তকালের। জীবন ও সময়ের গ্রন্থিতে আঁটা তাঁর আটাশ বছর।

গেল বর্ষায় ঠাকুরের সব শেষ। ফসল সমেত সাতকানি ভরা জমি এক মুখেই নিয়ে গেল বেহায়া গঙ্গা। তারপর গোসাইহাটের চালের মিল এবং সর্বশেষ তীনু তপদার আটকে দিল বয়ড়া বাজারের দোকানঘর। সর্বস্বান্ত ঠাকুর এরপর আর দাঁড়াতে পারেননি। ধর্মে-কর্মে এখন আর মন কই! সারাদিন হুঁকো আর অনূঢ়া মেয়ের সঙ্গে প্যানপ্যান করেই দিন সারা। তাঁরই বা কী করার! জীবনের এই বেপরোয়া মহাস্রোত যে এভাবে আটকে দেবে, এ কি দিব্যি খেয়েও বিশ্বাস করেছিলেন নির্মল?

পূজো-অর্চনা তো আর কম করেননি এক জীবনে। তাহলে এ ঘরেই কেন মেয়েটি অমন ট্যারা হবে। এরপর ভয়ে ভয়ে আর সন্তানও নেননি নির্মল। তাঁর চেয়ে বউয়ের ডরটাই ছিল বেশি। যদি আবারও আরেকটা এমন সন্তান হয়, আবারও যদি মেয়ে আসে সংসারে!

বুড়ো নির্মল হুঁকোতে টান দিয়ে নেতিয়ে পড়েন একদম। বিষণ্নতায় ছেয়ে যায় তাঁর চারপাশ। উঠোনে ছুটোছুটি করা একটি ধূসর রঙের প্রজাপতি দেখে তাঁর শখ জাগে, বড় শখ জাগে উড়ে যাবার। মেয়েটাকে উড়িয়ে দেবার। তাঁর কান্না পায়। জড়তাগ্রস্ত দ্বিধাভরা চোরের মতো তাঁর পালাতে ইচ্ছে করে বারবার। মেয়েটি তবে আটাশ পেরিয়ে গেল এ চন্দ্রেই। বাবা হিসেবে তাঁর এ উনপঞ্চাশ বছর তাহলে মরীচিকার মতোই মিথ্যে। অথবা অকর্মণ্য মাঝির মতোই কসরত করে দাড় টেনেছেন জীবনের। দিনশেষে থলে হাতড়ে দেখেন ওখানে জমা পড়েছে নিতান্ত তুচ্ছ দু'পয়সার রেজগি। অথবা তিনি কী উন্মাতাল, দায়িত্বহীন ঘোড়ার মতো শুধু ছুটে গেছেন সামনেই। পেছনে রেখে যাওয়া খুড়ের পদচিহ্ন ধরে পরিবার তাঁকে খুঁজে বেরিয়েছে যুগ যুগ। তাঁর ফিরে তাকাবার ফুরসত মেলেনি তবুও। একদম বেলাশেষে অস্তাচল নামছে যখন, তখন কি তাঁর সমস্তই ঢেকে নিয়েছে জীবনের এই অন্ধকার, যেখানে এসে নির্মল ঠাকুর মহাশূন্যের বিপর্যস্ত পেন্ডুলামে দেখছেন তাঁর মুখ, তার অতীত সমস্ত?
শাড়ীর আচল ছুঁয়ে মেলে ধরা আকাশ। দিগন্তরেখায় যে ছোপছোপ মেঘের দাগ, ঠিক তেমনই ছোপছোপ কষ্ট জমে আছে নির্মলার ভেতর। বাবার নামে মিল রেখেই রাখা হয়েছে নির্মলা। নির্মল ঠাকুরের মেয়ে নির্মলা ঠাকুর। গৃহস্থ বাড়ির পিসি বলল, বাবা নাকি আজকাল তার কথা এড়িয়ে যান। নির্মল কেন এড়িয়ে যান তাঁর মেয়ে নির্মলার কথা? তাঁর চোখ ট্যারা বলে? বাবাকে বোধহয় হাঁটে-বাজারে নানান কথা শুনতে হয় তার ব্যাপারে। লোকে বোধহয় ঠেস মেরে বলে, 'ও ট্যারা বেটির বাপ। ঘরে আইবুড়ো মাইয়া বসায় রাইখা করো কী, অ্যাঁ?' অথবা এমনও বলতে পারে, 'বুইড়া মাইয়া কার গলায় ঝুলাইবা ঠাকুর?' অনেক বছর আগে পূবপাড়ার মৌমিতা'দি লোকের কথা সইতে না পেরেই তো গলায় দড়ি দিল। শুধু একপা ছোট বলে পাড়াগাঁয়ে কত কী বলত লোকে। শেষে আর সইতে পারেনি মৌমিতা'দি। এক ভোরে পুকুরপাড়ের হিজল গাছটাতেই ঝুলে পড়ল সে।
তাহলে কি পৃথিবীতে মেয়েদেরই পূর্ণাঙ্গ হতে হবে? কত ছেলেরই তো হাত-পা নেই। মূক, অন্ধ, বধির–আরও কত দোষে ভরা। ওরা তো জীবন কাটাচ্ছে দিব্বি। মানুষের যত ক্ষোভ, ক্লেশ, মজা-আনন্দ সব কি মেয়েদের ঘিরেই? নির্মলা নিঃসীম দাঁড়িয়ে থাকে মায়ের ঘরের কোণে। স্থিত ভাগ্যের চক্রবাক কোথায় নিয়ে যাবে তাকে? বিছানায় পড়ে থাকা রোগা টিনটিনে মায়ের বয়সটাই বা হলো কত? একটি ঘোর এবং অহেতুক জীবনের পেছনে তাকিয়ে নির্মলা দেখে, প্রকৃতি তাকে নিয়ে মিছেমিছি সংসার ছড়িয়েছে। যুদ্ধ করা এত শুক্রাণুর ভেতর একটি পঙ্গু বিষাক্ত শুক্রাণুই কি সে? এ কেমন ভাবনা! অবাস্তব বিহ্বলতার ভেতর আটকে যায় নির্মলা। নিঃশব্দ কান্না আসে তার। মনে হয় যদি একটিবার বেরিয়ে পড়ে এই কান্নার স্বর, তাহলে ভেঙে যাবে জগতের সমস্ত দেবালয়। আটাশ বছরের অস্পৃশ্য এই নারীটি উঠে যায় ধীরে ধীরে। তার যৌবন ও আহ্লাদপ্রেম নুইয়ে পড়ে মাটিতেই। নিজের বুক দেখে ঘেন্না লাগে তার। আস্তে আস্তে আরেকটু কুঁজো হয়ে পড়ে সে। আগুনের তাপটুকু বড্ড লাগছে এবার। চড়চড় করে উঠছে শাড়ির পাড়।
উফ! গতকাল রাতে বাবার কথাগুলো কানে বাজছে মন্দিরের ঘন্টার মতোন। প্রতিধ্বনিত হচ্ছে বারবার। 'লইয়া যাও দিবাকর। ওরে আমার দরকার নাই। সোনামুখি সুঁই গাঁইথা গাঙে ভাসায় দিয়ো।'

লেখক : তরুণ কবি ও গল্পকার, ঢাকা



(ছোটগল্প)

স্থায়ী রুহে, ভয় নতুবা অভয়ের গুঞ্জন

সালমান সাদ

'মধ্য উনিশ বয়স এই, কী ভয়ংকর
নিজেকে মনে হতে থাকে অকারণ ঈশ্বর'
এই পঙক্তিটা সেদিন তুষারপাতের মতো অনবরত ঝরছিল বনবিভাগের বাংলোটার উঠোনে, পুরনো মরচে ধরা দোলনাটাকে কেন্দ্র করে জমছিল অহংকারী বাক্যের স্তূপ।

ঝিরঝির হিমঝরা রাতে কারই-বা মন শুয়ে থাকে বিছানায়? আর যদি বিগত ষাট হেমন্তের স্মৃতিরা সব মনের বন্ধ দরজা-জানালার ওপাশে হানা দেয়, কাঁচের ওপর রক্তখেকোদের মতো কাটতে থাকে বিষাক্ত নখের আঁচড়, থাকা যায়? ঘরে?

যাপিত জীবনের সব বিস্মৃতি এক ঝিঁ ঝিঁ রাতে হঠাৎ জান্তব হলে আমার শুকনো বৃদ্ধ দেহ থরথর করে, বুক, চোখ, হাত, কাঁপে। ছিটকিনি খুলতে খুলতে ও বেরোতে বেরোতে টের পেলাম, আমাকে ডাকছে কোনো এক অশ্রুত ভাষার জগত।

পুরোনো দোলনাটায় কেউ বসে বসে দোল খাচ্ছে। উঠোনে ল্যাম্পপোস্ট, গাঢ় কুয়াশায় তার আধুনিক আলো বাসি হয়ে আছে। দোলনায় যে দুলছে ধীরে জোরে, দশদিকের ঠিক কোনদিক বরাবর তার মুখ, সংজ্ঞায়িত করা গেল না। সমান্তরাল কোনো ভিন্ন জগতের দিকে মুখ করে কি সে অধিষ্ঠিত?

আমি একা থাকি। কিশোরবেলায় ছিলাম ভবঘুরে। বিয়ে-থা'য় যাইনি কখনো। পাখি ভালোবেসেছিলাম এক–উড়ে যায় পাখি, এই তার বিধি। আমার এই বাড়ি, শহর থেকে বহুদূরে, থানা-মফস্বলও ছাড়িয়ে, না গঞ্জ, শেষ গ্রামটিও এখান থেকে সাত তবক জমিন বা জিবরাইলের শেষ গন্তব্য সিদরাতুল মুনতাহা থেকে আরশের সত্তর হাজার পর্দা পর্যন্ত দূরে, আমি ছাড়া আর কোনো মানুষ আসবে না এখানে। কে বসে আছে তবে ওখানে?

সদ্য কৈশোর পেরোনো অথবা তারুণ্যসুলভ স্পর্ধী শরীরের কেউ বসে আছে। নিবিড় কুয়াশার আড়ালের ভেতর ঢুকছে, বের হচ্ছে, ঢুকছে, বের হচ্ছে, দোলনা দোলার তালে তালে।

আমি তাকে ডাকতে ডাকতে গিয়ে ধাম করে এক হোঁচটে পড়লাম। পৃথিবীর বাছুমণ্ডলের মতো একটা দুর্ভেদ্য বলয় যেন ছেলেটার চারপাশে পাঁক খাচ্ছে। আমি হঠাৎ প্রচণ্ড ডিনামাইট বিস্ফোরণের মতো ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে অসংখ্যেয় পরমাণুর ধাক্কায় সেই বলয়ের পাকটিকে চকিত বিভ্রান্ত করে ওইপাশে গিয়ে পড়লাম।

থরহর করে কেঁপে উঠল যামিনী, সামাল দিতে গিয়ে আমার লাফ, ওর দেহে। আমি দাঁড়িয়ে রইলাম স্থির... সাত সমুদ্রের সব বাতাস আমাকে উড়িয়ে নিতে চাইছে আবছা অবয়বটির সামনে থেকে।

যেন মাথা নিচু করে অথবা মাথাই নেই কোনো তার–বসে থাকা অবয়বটির দিকে চল্লিশ হাজার বছর এক প্রখর ধারালো তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে রওয়ার পর, ধীরে ধীরে, আবার এক পলকে, সজোরেও হতে পারে, আরো চল্লিশ হাজার বছরে ব্যাপ্ত স্রোতস্বতী সময়ের উজান বেয়ে সে মুখ তার দেখা দিল।

তারপর আমার চোখের সামনে দিয়ে পলকে পলকে যেন লক্ষ লক্ষ মুখ, লক্ষ লক্ষ চেহারা, লক্ষ লক্ষ আকৃতির আলোর গতিতে বেগবান মিছিল গেল, আমি তাঁর একটি নির্দিষ্ট রূপ ধরে উঠতে পারলাম না।

দীর্ঘ সময় বা ওটা যেন সময় নয়, কিন্তু কিছু একটা কিছু একটা... অপেক্ষার মতোন–পর, দেখলাম তার মুখ, ওটা আমার চেহারা। আসলে সে তো আমিই। চারপাশ উজালা অন্ধকার। আগুনপোড়া তারুণ্যের ঝলসিত আমি'র সেই মুখ।

তবে, আমার চোখ দুটি তো ওরকম গনগনে চুলার চোখের মতো লাল জ্বলজ্বলে ছিল না! যেন লাখ লাখ তারকা জ্বলছে নিভছে প্রবল আক্রোশে ওর চোখেমুখে, আমার তো অত ক্রোধ ছিল না। সারাজীবনই অন্যে আমাকে নিঃস্ব করে নিয়ে গেছে, আবার গড়েছি, আবার নিঃস্ব করেছে, কই, চিরকাল অপ্রতিভ নির্বিবাদী আমি সলাজ আপত্তিটুকুও করতে পারিনি। আমি যেন তাকে ঠিক, বা হয়তো অতীতের আমিকেই চিনতে পারছি না।

আবার মনে হলো সে খুব মায়াবান চোখের, জগতব্যাপী সকল প্রাণীর সমস্ত মায়ার শত শত গুণ বেশি মায়া ধরা তার চাহনীতে, যেন এখনই গলে যাবে ভালোবেসে ছুঁয়ে দিলে।

'তোমার কথা এত যে লিখলাম, তা নাম কী তোমার খোকাবাবু?'

'আমি তোমার পরম সত্য, আমিই জ্যোতির্ময় পরম সত্তা।'

'না না, হতেই পারে না, অসম্ভব! তোমাকে আমি কল্পনায় গড়েছি। তোমাকে আমি দেখিনি।'

'আমি তোমার কণ্ঠহারের চেয়েও কাছে বাস করি। আমাকে আড়াল করে, মানুষের দৃষ্টির সে ক্ষমতা নেই, যদি না আমি নিজেই নিজেকে আড়াল করে রাখি।'

আমার সামনে কেউ নেই। আমি দাঁড়িয়ে আছি এক তেপান্তরের গড়ে, চারদিকে হু হু শূন্যতা, যেন অতলান্তিক সমুদ্রের মাঝখানে আমার টাইটানিকটি পুরোপুরি ডুবে যেতে যেতে কেউ এক চুমুকে শেষ করে ফেলেছে সমুদ্রের শেষ জলবিন্দুটি, আর আমি পৃথিবীর অতল তলের এক তাজা মরু বিয়াবানে একাকী পথহারা মুসাফির।

কে কথা বলে, কথা কে বলে, সংলাপগুলো বেজে উঠলো কার কণ্ঠে, আমি খুঁজতে থাকি তারে, দিগন্ত থেকে দিগন্তে কদম কদম ছুটতে ছুটতে সহসা আবিষ্কার করি, আমিই মূলত সে, আরে আমারেই তো আমি খুঁজছি!

লেখক : তরুণ গল্পকার, ঢাকা



(ইতিহাসের আয়না)

মাৎস্যন্যায়'

রাইয়ান কবির

কবি শামসুর রাহমানের কবিতাগুলো রাশেদের বরাবরই ভালো লাগে। বাংলা কবিতায় আধুনিকতা, ব্যক্তির নৈঃসঙ্গ, বিবমিষা ও আনন্দলহরীর অনিন্দ্য রূপকার শামসুর রাহমান–ঝরনা যাঁর কলমে–ভালো লাগে তার নিখুঁত ও গূঢ়াশ্রয়ী শব্দচয়ন। সেই তাঁরই একটি কবিতায় রাশেদ পরিচিত হয় একটা নতুন শব্দের সঙ্গে–'মাৎস্যন্যায়'। মাৎস্যন্যায় শব্দটির সঙ্গে মৎস্য মৎস্য একটা গন্ধ থাকার কারণে স্বভাবতই রাশেদ একটু দ্বিধায় পড়ে যায়। শব্দটির আসল অর্থ কী হতে পারে তা নিয়ে ভেবে ভেবে সে যখন কিছুতেই কোনো কূলকিনারা করতে পারছিল না, ঠিক তখনই তার হঠাৎ মনে পড়ে ইতিহাসের কথা। শেষ চেষ্টা হিসেবে রাশেদ যখন ফিরে যায় ইতিহাসের কাছে, ইতিহাস তখন তার শরণার্থীকে আশ্রয় দিয়ে মেলে ধরে এক অজানা অধ্যায়।

মাৎস্যন্যায় একটি সংস্কৃত শব্দ। যার অর্থ–অরাজক পরিস্থিতি। মূলত খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতকে বাংলায় যে এক ভয়ংকর অন্ধকার যুগ নেমে এসেছিল তাকেই মাৎস্যন্যায় বলে অভিহিত করা হয়।

ষষ্ঠ শতাব্দীতে বাংলার ক্ষমতা ছিল গুপ্ত বংশের হাতে। গুপ্তরা মূলত ছিল বাংলার বাইরে থেকে আসা সাম্রাজ্যবাদী শক্তি। গুপ্তদের আগে বাংলায় শাসন করেছিলো মৌর্যবংশীয় রাজন্যবর্গ। বাংলাকে তখন অভিহিত করা হতো 'গৌড়' নামে। সেই গৌড়েরই বাসিন্দা ছিলেন

শশাঙ্ক নামের এক ব্যক্তি। তিনি ছিলেন সনাতন ধর্মাবলম্বী। শশাঙ্কের বংশপরিচয় ও প্রাথমিক জীবন সম্পর্কে তেমন কিছু জানা না গেলেও তিনি যে মনে মনে মাতৃভূমি বাংলাকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির হাত থেকে মুক্ত করে স্বাধীন এক রাজ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার স্বপ্ন দেখতেন–সেটা তাঁর পরবর্তী কর্মকাণ্ড থেকেই বোঝা যায়। ষষ্ঠ শতকের শেষ দিকে এসে গুপ্ত রাজারা দুর্বল হয়ে পড়লে তাঁদের দুর্বলতার সুযোগে ৬০৬ সালে শশাঙ্ক গৌড় দখল করে প্রতিষ্ঠা করেন বাংলার প্রথম স্বাধীন রাজ্য।
ইতিহাস থেকে জানা যায়, শশাঙ্ক একজন সুশাসক ছিলেন। সামরিক দক্ষতার বলে তিনি বহিঃশত্রুর হাত থেকে বাংলাকে রক্ষা করেছিলেন। তাঁর আমলে বাংলার কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির ব্যাপক উন্নয়ন ঘটে। বিশ্ব পরিব্রাজক হিউশেন সাঙ তাঁর গ্রন্থে শশাঙ্ককে 'গৌড়ের সম্রাট' বলে উল্লেখ করেছেন। শশাঙ্ক ৬৩৭ সালে মৃত্যুবরণ করেন।
শশাঙ্কের মৃত্যুর পরপর গোটা বাংলায় নেমে আসে চরম অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা। এই সময়কেই বলা হয় মৎস্যন্যায়। বাংলার ইতিহাসের এই মাৎস্যন্যায়ের স্থায়িত্ব ছিলো প্রায় একশ বছর। সেই একশ বছরে বাংলা পরিণত হয়েছিলো নরকে। লামা তারানাথ মাৎস্যন্যায়ের বর্ণনা দেওয়ার পর তাঁর কারণ উল্লেখ করেছেন এভাবে–'সমগ্র দেশের তখন কোনো রাজা ছিল না।' অর্থাৎ যোগ্য নেতৃত্বের শূন্যতার ফলেই মাৎস্যন্যায়ের সৃষ্টি হয়েছিল। আমরা জানি, মাছের রাজত্বে ছোট ও দুর্বল মাছ সবসময় বড় মাছগুলোর গ্রাসে পরিণত হয়। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর বাংলাও যেন মাছের রাজত্বে পরিণত হলো। হিংসা, দ্বেষ ও নির্মম অত্যাচারের মাধ্যমে সবলরা দুর্বলদের জন্য নারক করে তুলল বাংলাকে। বিষাক্ত হয়ে গেল আকাশ বাতাস নদী নালা। ভেঙে চুরে মিসমার হয়ে গেল শান্তিকামী জনগণের আজন্ম লালিত স্বপ্ন সাধ কল্পনা। আর, তারও বহু যুগ পর এক কবির কবিতায় ধ্বনিত হলো মাৎস্যন্যায়ের কথা–
জলজ দুপুরে কিংবা টইটম্বুর রাত্তিরে নদী/ যখন সংগীতময় হয়, সে আপন অন্তরালে/ ভাসমান খুশি যেন। তবু ভয়, কাঁটাতার-ভয়/ তার এই মাঝারি সত্তায় লেগে থাকে সারাক্ষণ/ কেমন রহস্যময় বিষাক্ত গুল্মের মতো, বড়ো/ মাছ তাকে দেখলেই ধেয়ে আসে, লোভাতুর–আর/ সে পালায় ঊর্ধ্বশ্বাসে, যেন-বা দেহের কাঁটাজাল/ আসবে বেরিয়ে ত্বক ফুঁড়ে, খোঁজে সগোত্রের ব্যূহ/ এখানে-সেখানে শত্রুতাড়িত, সন্ত্রস্ত, দিক ভুলে/ হায়, এসে যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষুধার্ত মাছের সঙ্গে। /আক্রমণে মত্ত ওরা। সে অত্যন্ত একা, মীনরাজ্যে/ অভিমন্যু, আর্ত, ক্লান্ত সাঁতার- রহিত, নিরূপায়।
জলের গভীরের মাছের মতোই মাৎস্যন্যায়ের শব্দটির পাতালেও যে এতো গভীর একটা অর্থ আছে, ইতিহাসের আশ্রয় না নিলে এটা রাশেদের হয়তো কখনোই জানা হতো না।

মোহাম্মদপুর, ঢাকা



(মার্চের গল্প)

ফিরে আসব

মুতিউল মুরসালিন

তাওহিদ আমার পরিবারের ট্রাজেডিটা জানুক; জানুক, কেন আমি এত দরিদ্র; এসব জেনে আমার প্রতি তার দুর্বলতাটা আরও বেড়ে যাক–আমি কখনোই চাইনি এমনটা। একদিন কী বুঝে ও বলে উঠল, 'তোদের বাড়ি যাব, নিবি?' আমিও চট করে বলে বসলাম, 'নেব না কেন? তুই যাবি? তোর পরিবার এই অজপাড়া গাঁয়ে যেতে দেবে তোকে?'

আমার অমন কথায় ভীষণ কষ্ট পায় ও। শহরের ধনাঢ্য ছেলে হলেও গরিবদের নাক ছিঁটোনির অভ্যেস কিংবা ভেতরে জিলেপির মতো প্যাঁচপাচ একটুও নেই তার। অভিধান যাকে সহজ-সরল বলে–ও তেমনই। আমার কলেজজীবনের নানান সমস্যায় তীব্র তেজি অশ্বের মতো সবসময় ছুটে এসেছে। যেন আমি তার আপন বোন। শহরে থেকে একটা মেয়ের লেখাপড়া করতে যে কী নিদারুণ কষ্ট পোহাতে হয়–ভুক্তভোগীরাই জানে। তার উপর আমি নিম্নমধ্যবিত্ত বরং নিম্নবিত্ত ঘরের মেয়ে। টিউশনির টাকা দিয়ে মেস ও কোচিং কুলিয়ে নিতে হয়। এতসব বাধা উথরে জীবন-নদীতে নৌকো বেয়ে যাচ্ছি বা যেতে হচ্ছে। সত্য কথা বললে, এসবকে কোনা বাধাই মনে হয় না আমার। বরং মনে করি, আমিই, আমার শরীরটাই আমার সবচেয়ে বড় বাধা। এই শরীরের উপর ক্রোধাক্ত হয়ে একটা কবিতায় লিখেছিলাম–

'বলো, তুমিহীন আমি হলে কী হতো কার?

তবে কেন পথে পথে এত শত ইভটিজার?'
তাওহিদ পাশে থেকে ওই বাধাটা দূর করে দিয়েছে। ও শুধু এটুকুই জানত–গ্রামের একটা গরিব ঘরের মেয়ে আমি। এর চেয়ে বেশিকিছু জানানোর প্রয়োজ পড়েনি কখনো। এই এটুকুতেই গলে গিয়ে টিফিনের টাকার অর্ধেকটা বাঁচিয়ে প্রতি বৃহস্পতিবার চাল-ডালসহ রান্নাবান্নার যাবতীয় খরচ করে দেয়। আমার প্রতি আপাদমস্তক দুর্বল এই তাওহিদকে কখনোই ট্রাজেডিটা জানানোর ইচ্ছে ছিল না। সে আসার আগে একবারও স্মরণ হয়নি; হলে আম্মাকে বলে রাখতাম। আসলে হবার কথাও না। ও আমার বাড়ি আসছে, গ্রাম দেখার তার তুমুল শখ–এই শখটা পূরণ করতে যাচ্ছি–খুশিতে সব ভুলে গিয়েছিলাম আমি। সে বাড়িতে পা রাখার এক মুহূর্ত আগে মনে হলেই সবাইকে বিষয়টা গোপন রাখতে বলতাম।

দুই

আমি রান্নাঘরে ব্যস্ত ছিলাম। নাস্তা দিতে এসে যখন দেখলাম আম্মা তাকে গল্প বলছেন–'লিনা তোমাকে কিছু বলেনি? সে এক করুণ কাহিনি বাবা! ওর বাবা তখন ঢাকার এক মাদরাসার বাবুর্চি। রাতে দারোয়ানগিরিও করতেন। ছাব্বিশে মার্চের ওই রাতে হাত-পায়ে গুলি খেয়ে পরদিন বাড়ি আসেন। টাকার অভাবে ভালো চিকিৎসা করাতে পারিনি। ফলে ক্ষতগুলো বেড়ে যায়। ভয়ংকরভাবে ফুলে ওঠে আর পুঁজ জমতে থাকে। একটা গরু ছিল আমাদের। চিকিৎসার জন্য একেবারে পানির দামে বিক্রি করে দিই ওটা। তখন তো সবাই তটস্থ, কে এসব কেনে। যাক, শেষমেশ কিছুটা সেরে উঠলেন, টুকটাক কাজ করতে পারেন–এমন। একদিন ধান খেতের কাজ থেকে হাঁপাতে হাঁপাতে বাড়ি এসে আমার নাম ধরে বলতে লাগলেন, "কুলসুম কই, কই রে।" আমি দৌড়ে বেরোই। বলতেছেন, "শনিদাসের পুরো বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে খিনজিরের বাচ্চা মিলিটারিরা।" চরম রাগে কথাগুলো বলতে বলতে ঘরে ঢোকেন তিনি। লিনা তখন ছোট। ওকে জড়িয়ে কয়েকটা চুমো খেয়ে আমাকে বললেন, "আমি গেলাম, লিনার বড় মামাকে বলে যাব তোমাদের এসে নিয়ে যেতে...।"
'পেছন পেছন আমি ডাকলাম, লিনা কাঁদতে কাঁদতে দৌড়ে গেল রাস্তা অবধি, কিন্তু ফিরেও তাকাননি আর। পরনের লুঙ্গি আর পাঞ্জাবিটাও বদলাননি। একবার ঘাড় ফিরিয়ে কেবল বলেছিলেন, "ফিরে আসব আবার...।"
কিন্তু তিনি কথা রাখেননি, ফিরে আর আসেননি। তবে, বাবা, এই যে একখণ্ড স্বাধীন ভূমি পেয়েছি আমরা, নিঃশ্বাস নিতে পারছি সবাই প্রাণ ভরে, ফিরে না-আসার বিনিময়ে এই ভূখণ্ডের মানুষকে এটাই দিয়ে গেছেন তিনি এবং তাঁর মতো নাম না-জানা অসংখ্য মুক্তিযোদ্ধা।'

লেখক : সম্পাদক, মাসিক বিহান, সিলেট

(অনুভব)

জীবন এবং প্রদীপ

উবায়দুল ইসলাম

জীবন প্রদীপের মতো নাকি প্রদীপ জীবনের মতো? প্রদীপ তো জ্বলে অনবরত, গলে। জ্বালায় নিজেকে, আলোকিত করে ঘর। জীবন তেমন পুড়িয়ে নিঃশেষ করে দিতে পারে স্বার্থ, কাম-কামনা, মায়া, মোহ, হিংসা-বিদ্বেষ, অহম সব। নিঃস্বার্থভাবে নিজেকে উজাড় করতে পারে সবার মাঝে। জায়গা করে নিতে পারে উপকৃত মানুষের অন্তরে।

প্রদীপ নিজেকে জ্বালিয়ে লাখো শিশুর হৃদয়কে আলোকিত করে যায়। আঁধারের মাঝে আলোর মশাল নিয়ে বেঁচে থাকার সম্বল এ প্রদীপই। পড়ন্ত বিকেলে পূবাকাশে উদিত সূর্যটা যখন পশ্চিমাকাশে অস্তমিত হয়ে দিনের আলোকে বিদায় জানায়, ধীরে ধীরে সন্ধ্যার আবরণে ছেয়ে যায় সমস্ত নগরী, ক্রমান্বয়ে আঁধার গাঢ় হতে থাকে, ঘরে ঘরে জ্বলতে থাকে বিভিন্ন রকমের প্রদীপ।

কারও ঘরে মোমবাতি, কারও কুপি। এভাবেই আলোকিত হতে থাকে ঘর-বাড়ি। বাঁশ কেটে বানানো ঢেঁড়ার বেড়ার ফাঁক গলে বেরিয়ে আসে ক্ষীণ আলো। ঘরের ভেতর তরিঘরি করা হয় পড়তে বসার জন্য। পড়তে যারা বসবে, সন্ধ্যার পর তাদের জন্য বাড়ির বাইরে বেরোনো নিষেধ।

আঁধার-আলোর সংমিশ্রণে ভেসে আসে বাংলা স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণ, ইংরেজি শব্দমালা উচ্চারণের আওয়াজ। কিংবা মধুর স্বরে আলিফ, বা, তা। কী মধুর শুনতে! আত্মায় প্রশান্তি জোগায়। ধন্য হয় আলোকচ্ছটা।

রাতের আঁধারের মাঝে একটা প্রদীপ নিজ অস্তিত্বকে বিলীন করে দিচ্ছে আঁধারকে আলোকিত করতে।

স্রষ্টা তাঁর প্রতিটি সৃষ্টিকে একটা নিজস্ব গণ্ডিতে রেখে সৃষ্টি করেছেন। প্রত্যেকে প্রতেকের স্ব-স্ব অবস্থানে থেকে চলতে থাকে অবিরাম। যখন তার সময় শেষ হয়ে যাবে তখন তার অস্তিত্বও ফুরিয়ে যাবে। জীবন এবং প্রদীপের মাঝে রয়েছে যোগসূত্র।

'একটি প্রদীপ জ্বলবে অপরের মাধ্যমে, জ্বালবে নিজেকে, প্রজ্জ্বলিত করবে ঘরকে।' বেঁচে থাকে আলো থেকে অর্জিত শত-শত সৎকর্মগুলো।

অপরদিকে একটি প্রাণ জন্মাবে অপর দু'য়ের মাধ্যমে। বাঁচবে নিজ পরিচয়ে, বাঁচাবে আত্মীয়তার সম্পর্ককে। একটি প্রদীপ গলে গলে হারিয়ে যাবে। আর একটি প্রাণ সময়ের পরিক্রমায় তার দৈহিক গঠনে, চিন্তা এবং মন-মস্তিস্কে উন্নতি ঘটবে। তারপর সময় ঘনিয়ে আসলে হারিয়ে যেতে হবে প্রকৃতির অমোঘ আহ্বানে সাড়া দিয়ে। বেঁচে থাকবে শুধু সৎকর্মগুলো।

গলে গলে নিঃশেষ হয়ে যায় না। থেকে যায় সামান্য ছিটেফোঁটাগুলো। খোদার নিপুণ হাতে গড়া এ জগত সংসারের মোহ ছেড়ে যেতে চায় না কেউ। জগতের প্রতি এক অপার মুগ্ধতা সবাইকে ঘিরে রাখে।

একটি মানবাত্মা কালের স্রোতে জীবনের হিসেব-নিকেশের ফলাফল শেষে পড়ন্তবেলার সূর্যের মতন বিদায় নেয় রিজিকের পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে। সারাদিনের সূর্যের মতন যদি জীবনটা আলোকিত করে বিদায় নিতে পারে, তাহলে কবর হবে জোছনাময়ী, পূর্ণিমার রাত।

জীবনটা যাপন করার জন্য। কাটানোর জন্য নয়।

সিরাজদিখান, মুন্সিগঞ্জ

হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ
শেষ সিপাহির রক্ত

পৃথিবীর ইতিহাসের স্মরণযোগ্য শাসকদের কথা বলতে গেলে অবধারিতভাবে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ আসসাকাফির নাম অনায়েসে সামনে চলে আসে। একসাথে ভালো এবং মন্দ–দুই ময়দানেই তার মতো প্রশ্নসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব দ্বিতীয় কাউকে হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে না।

তিনি ছিলেন উমাইয়া রাজবংশের বিখ্যাত শাসক। শুধু শাসকই নন, বলা যায় অন্যতম রক্ষাকর্তা। তার হাতেই উমাইয়াদের শাসন স্থিতি লাভ করে। হেজাজ ও ইরাকের 'বিদ্রোহী'দের তিনি পরাজিত করেন কঠোরহস্তে। পুরষ্কার হিসেবে খলিফা আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ান তাকে হেজাজ, ইয়েমেন ও ইরাকের গভর্নর নিযুক্ত করেন।

উমাইয়াদের পক্ষে কাজ করতে গিয়ে খুব কঠোর ছিলেন হাজ্জাজ। দীর্ঘ শাসক-জীবনে প্রায় এক লক্ষের বেশি মানুষ তার হাতে নিহত হয়। এদের মধ্যে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের প্রিয় সাহাবিদের কয়েকজনও ছিলেন। অতি কঠোরতা ও মহান সাহাবিদের প্রাণ হরণ হাজ্জাজকে কলংকিত করে রেখেছে ইতিহাসে। এতে তার ভালো কাজগুলো ঢাকা পড়ে গেছে। কিন্তু তার ফিরিস্তিও অনেক লম্বা।

উমাইয়া খেলাফতের সূচনাকালের গল্প বলার পাশাপাশি লেবাননী লেখক জুরজি যায়দান এখানে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের চরিত্রের কিছু ঝলক দেখিয়েছেন পাঠককে। হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফকে কেন্দ্র করে এ উপন্যাস নয়। উপন্যাসে পাঠক তার উপস্থিতি টের পাবেন সামান্য মাত্র। কিন্তু পুরো উপন্যাস নির্মাণ হয়েছে তাকে কেন্দ্র করেই।

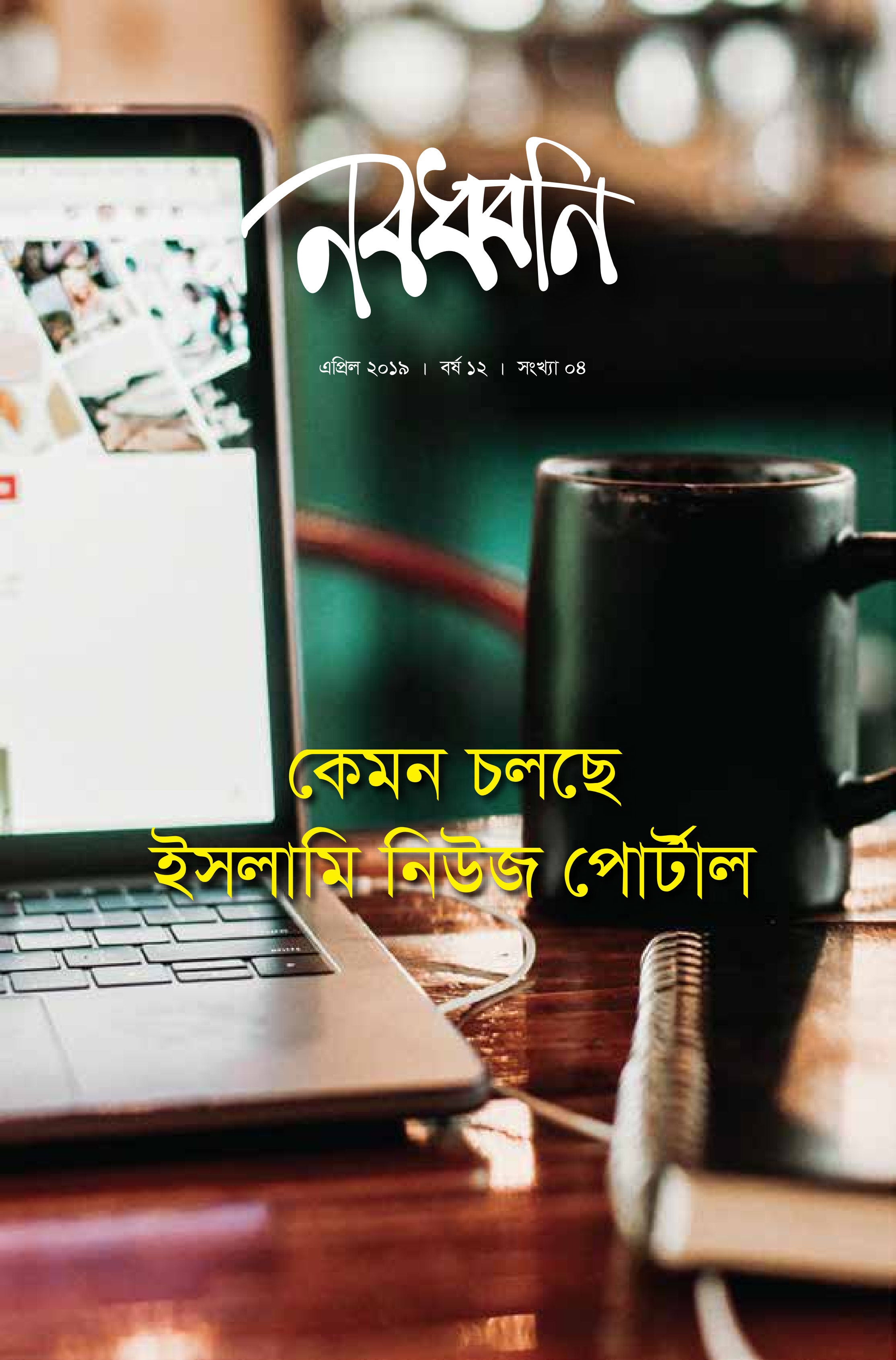
খোলাফায়ে রাশেদিনের শাসনের পর যে সংক্ষুব্ধ সময় ইতিহাসকে রক্তাক্ত করে তুলেছিল, এ উপন্যাস সেই সংক্ষুব্ধ সময়কে পাঠের আলোয় নিয়ে এসেছে। একদিকে খেলাফতে রাশেদার পদছাপকে আঁকড়ে ধরে কাবার দুয়ারে সিনাটান করে দাঁড়িয়েছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে জুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু, অন্যদিকে উমাইয়া সাম্রাজ্যের ক্ষমতালোভী শাসকগণ খেলাফতের কেন্দ্রবিন্দু ধুলিস্যাৎ করতে সর্বোচ্চ শক্তি প্রয়োগে ছিল বদ্ধপরিকর। রক্তের বন্যা বয়ে যেতে লাগল পবিত্র শহরের গলি গলিতে।

সেই সময়ের নিষ্পাপ এক প্রেমকাহিনির হাত ধরে পাঠক প্রবেশ করবেন খেলাফত রক্ষার সাহসী সংগ্রামে। আশা করি ইতিহাস ও উপন্যাস পাঠক–সকলেই উদ্দীপ্ত হবে এই অনবদ্য গ্রন্থপাঠে।

ইতিহাসের অন্যতম সময়ের সবচে বড় ও শক্তিশালী রাষ্ট্রের ক্ষমতার পালাবদল, প্রিয়নবির প্রিয় এক সহচরের অসীম বীরত্ব ও শাহাদাত, একজন স্বৈরশাসক এবং সে যুগের একজোড়া তরুণ ও তরুণীর ভালোবাসায় তার অনুপ্রবেশ–সব মিলিয়ে স্বল্প কলেবরের এই হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ : শেষ সিপাহির রক্ত সত্যিই উপন্যাসের চেয়ে বেশিকিছু।

হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ:
শেষ সিপাহির রক্ত
লেখক: জুরজি যায়দান
অনুবাদ: নাজমুস সাকিব
মুদ্রিত মূল্য: ৪০০ টাকা
ফোনালাপ: ০১৯৭৪৮৮৮৪৪১





নবধ্বনি

এপ্রিল ২০১৯ । বর্ষ ১২ । সংখ্যা ০৪

কেমন চলছে ইসলামি নিউজ পোর্টাল

এপ্রিল ২০১৯ । বর্ষ ১২ । সংখ্যা ০৪

মূল্য ৫ টাকা মাত্র

নবধ্বনি । দোকান নং ২৭ । ২য় তলা । ইসলামী টাওয়ার
১১/১ বাংলাবাজার । ঢাকা । সার্কুলেশন : ০১৯৭৪৮৮৮৪৪১ । সম্পাদনা : ০১৭৪৫১৩৯২১৫

Email: nobodhoni@gmail.com web: noboprokash.com/nobodhoni

স্বাগত কলাম

বৃষ্টির দিন শুরু হয়ে গেল। ফুল ফুটবে–হাসনাহেনা, রংগন, কামিনী, চামেলী, মহুয়া, মাধবীলতা, কাঁঠালচাঁপা, বেলী এবং জুঁই। ফুলের নামগুলো সব মেয়েরা নিয়ে নিয়েছে। সকল সুন্দর নাম তাদের দখলে। দুনিয়ার সৌন্দর্যের সকল কিছুই নারীদের কব্জায়। পুরুষের জন্য বরাদ্দ নামগুলো দেখুন, কেমন রাগত নাম-ধাম। শুনলেই কাজী নজরুল ইসলামের বিদ্রোহী কবিতা মনে পড়ে। অথচ নারীদের নামগুলো হয় কোমল, বারবার উচ্চারণ করতে আরাম লাগে। বৃষ্টি ঝরে পড়ার মতো মোলায়েম মিহি শব্দ।

বৃষ্টি নিয়ে বাঙালিদের আদিখ্যেতার অন্ত নেই। কবি-সাহিত্যিক তো বটেই, সাধারণ মানুষও বৃষ্টি এলে কেমন বর্তে যায় প্রকৃতির সঙ্গে। শহুরে রাস্তায় চলতে চলতে হঠাৎ বৃষ্টি–কোনো টং দোকান বা অফিসের নিচে হুল্লোড় করে ভীড়। 'যাচ্চলে' বলে যতই বিরক্তি প্রকাশ হোক না, কালো আকাশ থেকে যখন একটানা অঝোর বৃষ্টি ঝরে পড়ে রাস্তার পিচে, মনের মধ্যে একটা সমাহিত ভাব এসে যায়। কাজে যাওয়ার তাড়া খাওয়া ভীড়টা তবুও জমাটি হয়। সবাই চুপচাপ। তখন মানুষ ভীড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে একা একা কী ভাবে? হয়তো ভাবে ফেলে আসা স্কুলঘরের কথা। বৃষ্টি এলে রিমঝিমঝিম আওয়াজ হতো যে স্কুলের চালে। অথবা ভাবে নদীটার কথা। ছেলেবেলায় সাঁতরে পার হওয়া যেতো যার ঢেউখেলা বুক।

গ্রামে যখন বৃষ্টি নামে, ফসলের খেতের হিন্দোল একটা দৃশ্য তৈরি করে। কলাপাতায় বৃষ্টির ফোঁটা পড়ে ছলকে নেমে যায়। মেঠোপথের আঁড় দিয়ে তৈরি হয় কুল কুল স্রোত। সোঁদা গন্ধে ভরে উঠে বাড়ির উঠোন। পাতারা নাচে। বাড়ির বয়স্ক দাদিটা ঝাপসা চোখে বসে থাকে বারান্দায় পিঁড়ি পেতে। মনে বাজে সেই কিশোরী বেলায় শোনা যাত্রাপালার গানটা–'লইয়া যাইয়ো মাঝি আমায়, বেলা থাকতে ছাইড়ো মনের নাও...।' দাদির বেলা তরিয়ে গেছে। এখন আর মাঝির জন্য প্রতীক্ষা নেই। তবু কিসের জন্য আঁকুপাকু করে স্মৃতি-পোষা হৃদয়টা?

মানুষের মনোজাগতিক অধ্যায়টা বড় অদ্ভুত। এখানে স্মৃতি থাকে, স্মৃতির সঙ্গে লেগে থাকে বেদনা-সুখ-হর্ষ-হতাশা-অনুতাপ। মগজের বিস্তীর্ণ কোষে কোষে তারা সাঁতার কাটে। যখন যেটা দরকার হওয়ার, সেটা মনের রূপালি পর্দায় ভেসে উঠে। চলতে থাকে স্মৃতির চলচ্চিত্র। ক্যামেরার রিলের মতো প্রতি সেকেন্ডে পার হয়ে যাচ্ছে হাজার হাজার স্থির ও চলৎচিত্র।

বৃষ্টি এলে আমাদের মনের থিয়েটার যেন হাউজফুল হয়ে যায়। একটার পর একটা স্মৃতির চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হতে থাকে। কত পুরোনো দিনের সাদাকালো স্মৃতি, ঝাপসা সেগুলোর রিল। সেগুলো ঘুরেফিরে দেখে তবু আমরা মনে মনে হর্ষ করি, কখনো বেদনাহত হই।

বৃষ্টি বস্তুত, কেন আমাদের আনমনা করে? কেন করে? বৃষ্টির শব্দে স্মৃতিরা কেন জেগে উঠে? কেন রিমঝিমে বর্ষায় মনের অন্তিম কোনগুলা হু হু করে?

আল্লাহর কাছে একদিন এ কথাগুলো জিজ্ঞেস করবো।



অনলাইনভিত্তিক ইসলামি সংবাদমাধ্যম কতটা প্রত্যাশা পূরণ করতে পারছে?

আবু তাশফি

গত দশকের শেষ ও চলতি দশকের শুরুর দিকে বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাদী ইসলামি অঙ্গনে, আরেকটু নির্দিষ্ট করে বললে, আমাদের কওমি ঘরানায় মাসিক, পাক্ষিক, সাপ্তাহিক পত্রিকা করার একটা হিড়িক পড়েছিল। কেউ বাস্তবতা ও স্বপ্নের সঙ্গে মোটামুটি সামঞ্জস্য রেখে, কেউ-বা এ দুটোর মধ্যখানে আসমান-জমিন তফাৎ রেখে পত্রিকা প্রকাশে নামতেন। দ্বিতীয় প্রকারের লোকজনই বেশি ছিলেন, তাই অধিকাংশ পত্রিকা অঙ্কুরেই মারা গেছে। আর বাকিগুলো দু-এক বছর চলার পর ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে গেছে। সে-সময়ের খুব কম পত্রিকাই আছে, যা নিয়মিত প্রকাশনা এখন অবধি ধরে রাখতে পেরেছে।

চলতি দশকে এসে ইন্টারনেট ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম যখন

বাংলাদেশের মানুষের কাছে সহজলভ্য হয়ে উঠল, প্রিন্ট পত্রিকা করার এ ঝোঁকটা ওয়েব পোর্টালের দিকে চলে আসে। শুরু হয় 'টোয়েন্টিফোর ডটকম' তৈরির প্রতিযোগিতা। অনেকে কেবল নিজের নামের সঙ্গে পত্রিকা-সম্পাদকের লকব লাগানোর খাহেশে খুলে বসেন এ ধরনের পোর্টাল। তাতে না থাকে কোনো পরিকল্পনা, না কোনো লক্ষ্য। এবং না থাকে নিজেদের বিশেষ কোনো কাজ। কেবল অন্য পত্রিকা থেকে কপি ও পেস্টের ওপরই থাকে তাদের যাবতীয় ভরসা। তবে এর বাইরে কিছু পত্রিকা আছে, যারা একটা লক্ষ্য নিয়ে দাঁড়িয়েছে এবং মোটামুটি ভালো কাজ আঞ্জাম দেওয়া ও পত্রিকাকে নিয়মিত রাখার চেষ্টা চালাচ্ছে।

ইনসাফ

কওমি অঙ্গনে সর্বপ্রথম আয়োজন করে অনলাইন সংবাদমাধ্যম হিসেবে কাজ শুরু করেছে ইনসাফ টোয়েন্টিফোর ডটকম। এমনটাই দাবি ইনসাফ কর্তৃপক্ষের। প্রথমে চট্টগ্রামে তাদের মূল অফিস থাকলেও পরে রাজধানীতে নিয়ে আসা হয়েছে। এ ধারার অন্যান্য ইসলামি সংবাদমাধ্যমগুলোর তুলনায় ইনসাফের অফিস বেশ গোছালো এবং অফিসিয়ালি কাজ-কর্মে তারা মোটামুটি পেশাদার। তবে গতানুগতিকতা ছাপিয়ে খুব নতুন কিছু তারা দিতে পারছে, বোদ্ধা পাঠকরা তা স্বীকার করতে প্রস্তুত নন। ইনসাফ-শো নামে মাঝে মাঝে বিভিন্ন আলেমের সাক্ষাৎকারধর্মী ভিডিও কন্টেন্ট তৈরি করা হয়, সেগুলোর মানও খুব একটা ভালো হয় না। উপস্থাপকের অপেশাদারিত্ব, কথা বলায় পারদর্শিতার অভাব—এসব দৃষ্টিকটু হয়ে ফুটে ওঠে প্রায় কন্টেন্টেই। তাছাড়া নিউজ রিরাইটের বাইরে নিয়মিত কোনো বিশেষ কাজও খুব একটা চোখে পড়ে না। তবে মুসলিম ও মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন খবরাখবর অন্যান্য ইসলামি পোর্টালের তুলনায় ইনসাফেই বেশি ও সর্বাগ্রে পাওয়া যায়। পথচলার বেশ কয়েক বছর হয়ে যাওয়ায় পত্রিকাটির বড় একটি পাঠকগোষ্ঠীও তৈরি হয়েছে ইতিমধ্যে।

আওয়ার ইসলাম

আওয়ার ইসলাম টোয়েন্টিফোর ডটকম ইনসাফের পরে এলেও কওমি ঘরানায় মিডিয়া হিসেবে সমমনা অন্যসব পোর্টাল থেকে জনপ্রিয়তা পেয়েছে বেশি। কওমি-পড়ুয়া বা কওমি সংশ্লিষ্টদের কাছে বেশ কিছুদিন 'নিজেদের' মিডিয়া হিসেবে একমাত্র আওয়ার ইসলামই পরিচিত ছিল। এই পরিচিতি বাগিয়ে নেওয়ার পেছনে মূল কারণ পত্রিকা-সংশ্লিষ্টদের তৎপরতা। কওমি ঘরানার নেতৃস্থানীয়দের সঙ্গে তাঁরা একটা যোগাযোগ তৈরি করতে পেরেছেন, পাশাপাশি পত্রিকার ব্যানারে বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও সেমিনার করে কওমি-পড়ুয়া সাধারণ ছাত্রদের কাছেও পৌঁছে যেতে পেরেছেন। কওমি মাদরাসা, কওমি মাদরাসা ভিত্তিক রাজনীতি এবং কওমি মাদরাসা-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ইস্যুতেই মূলত এ পত্রিকা কাজ করে। এবং কাজগুলো হয় কওমি মাদরাসা-স্বার্থের পক্ষে। কিন্তু কাজের মান ও ধরনে যথেষ্ট অপরিপক্কতা থাকার কারণে কওমি ঘরানারই অনেক পাঠকের বিরক্তি আছে পত্রিকাটির ওপর।

ফাতেহ

বছরের চেয়ে খানিকটা বেশি সময় হলো ফাতেহ টোয়েন্টিফোর ডটকম প্রতিষ্ঠার। বিশেষায়িত সংবাদমাধ্যম হিসেবেই নিজেদের পরিচয় দেয় পত্রিকাটি। শুরুতে নির্দিষ্ট স্টাফ তৈরি করতে না পারার কারণে কাজে খানিকটা কমতি হলেও বেশ কয়েক মাস হলো আলাদা অফিস ও নতুন স্টাফ নিয়ে কাজ শুরু করেছে পত্রিকাটি। সমমনা অন্য পত্রিকার তুলনায় তাদের কাজ সুন্দর ও ব্যতিক্রমধর্মী। ইসলাম ও মুসলিম বিশ্বের ঐতিহ্য ও ইতিহাস বিষয়ে প্রায় নিয়মিতই আলাদা কাজ করে তারা। কওমি ঘরানার স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ইস্যুতেও বিশেষ কাজ করে নিয়মিত। কাজগুলোর মান ও ধরনও খারাপ না। তবে ইতিহাস বিষয়ে পত্রিকাটির বিশেষ কাজগুলো খুব সংক্ষিপ্ত থাকে, ফলে পাঠকের অভিযোগ আছে এ নিয়ে। তাছাড়া সাধারণ নিউজের ক্ষেত্রে সমমনা অন্যান্যদের থেকে খানিকটা পিছিয়ে আছে পত্রিকাটি।

ইসলাম টাইমস

ইসলাম টাইমস টোয়েন্টিফোর ডটকমের পথচলার বেশিদিন হয়নি। মাস কয়েক হলো। অলিখিতভাবে মারকাযুদ দাওয়াহর পৃষ্ঠপোষকতা আর দক্ষ ও অভিজ্ঞ সম্পাদকের কারণে পত্রিকাটি ইতিমধ্যেই কওমি ঘরানার নজর কেড়েছে। বিশ্ব মুসলিম ও বাংলাদেশের ধর্মীয় ঘরানার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ইস্যুতে ইসলাম টাইমসের নিয়মিত কাজ থাকে। তবে স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে অনেক সময় বাড়াবাড়ির শিকার হয়ে যায় তাদের কোনো কোনো কাজ–বোদ্ধা পাঠকের কারও কারও তরফ থেকে এমন অভিযোগ আছে।

পাবলিক ভয়েস

পাবলিক ভয়েস টোয়েন্টিফোর ডটকমেরও পথচলার বেশিদিন হয়নি। তবে এ কয়দিনে পত্রিকাটি যতটা না আলোচিত হয়েছে তারচেয়ে বেশি হয়েছে সমালোচনার শিকার। পত্রিকার মালিকপক্ষ ও স্টাফের কেউ কেউ বিশেষ একটি দলীয় পরিচয়ে পরিচিত হবার কারণে পত্রিকাটিকেও দলীয় পত্রিকা বলে মনে করেন অনেকে। তবে পত্রিকাটিকে যতটা দলীয় ভাবা হয়, আদতে ততটা না। দলীয় স্বার্থ রক্ষা করে যতটা নিরপেক্ষ থাকা যায়, ততটুকু তারা অবশ্যই থাকে। কওমি ঘরানার আভ্যন্তরীণ বিতর্কিত ইস্যুতে অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে আগ্রহী পত্রিকাটি। যথেষ্ট পরিমাণ নিউজ তারা রিরাইট করে, কিন্তু রিরাইট করতে গিয়ে মাঝে মাঝেই অদক্ষতার পরিচয় দেয়। এ নিয়ে বেশ কয়েকবার তীব্র সমালোচনারও মুখোমুখি হয়েছে তারা।

অন্যান্য

উল্লিখিত এ পাঁচ সংবাদমাধ্যমই মোটামুটি পেশাদারিত্বের সঙ্গে কাজ করছে। প্রত্যেকের আলাদা আলাদা অফিস ও নির্ধারিত স্টাফ আছে। এর বাইরে উম্মাহ, পাথেয়, যমযম, নুরবিডি, কওমিকণ্ঠ, যুবকণ্ঠ, ডেইলি ইসলাম ইত্যাদি নামে আরও বেশ অনেক নিউজ পোর্টাল আছে আমাদের অঙ্গনে, তবে তাদের কারোরই নিউজ রিরাইটের বাইরে সাধারণত বিশেষ কোনো কাজ পাওয়া যায় না। কেউ কেউ রিরাইট করতে গিয়ে হুবহু কপিই করে ফেলে, আবার কারও কারও তো নিউজ প্রকাশও অনিয়মিত। এদের মধ্যে পাথেয় টোয়েন্টি ফোর মূলত মাসিক পাথেয়-এর অনলাইন ভার্সন। পত্রিকাটি কওমি ঘরানার সর্বজন শ্রদ্ধেয় ইসলামি ব্যক্তিত্ব নিয়ে কটাক্ষমূলক প্রতিবেদন করার কারণে তুমুল সমালোচনা ও নিন্দার মুখোমুখি হয়েছে বেশ কয়েকবার।

প্রত্যাশা পূরণ করতে পারছে কতটা?

ইসলামি এই সংবাদমাধ্যমগুলোকে ঘিরে কওমিধারার সাংবাদিকতার একটা চর্চা শুরু হয়েছে। যা ধর্মপ্রাণ সচেতন জনগোষ্ঠীর দীর্ঘদিনের একটা প্রত্যাশা ছিল। তাছাড়া এ সংবাদমাধ্যমগুলোর কল্যাণে সংখ্যায় অল্প হলেও গতানুগতিকতার বাইরে এসে কওমিপড়ুয়াদের নতুন এক কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়েছে। অনলাইন ভিত্তিক ইসলামি সংবাদমাধ্যমের এ দুটো দিক নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। তবে যে সাংবাদিকতার চর্চা এখানে হচ্ছে, তাকে মূলধারা বা জাতীয় ধারার সাংবাদিকতা বলা যাবে না। বড়জোর কমিউনিটি সাংবাদিকতা বলা যেতে পারে। কারণ এখানে নির্দিষ্ট একটা কমিউনিটি বা ঘরানাকে কেন্দ্র করেই সাংবাদিকতার চর্চাটা করা হয়। জাতীয় কোনো ইস্যুতে তাদের সরব কোনো তৎপরতা খুব একটা পরিলক্ষিত হয় না। অথচ জাতীয় ধারার সাংবাদিকতায় না পৌঁছুতে পারলে আমাদের নিয়ে বর্তমান গণমাধ্যমের যে বিদ্বেষ ও প্রোপাগান্ডা, তা পুরোপুরিভাবে কাটিয়ে ওঠা সম্ভবপর না। অবশ্যি আমাদের সংবাদমাধ্যমগুলোর বর্তমান যে আঙ্গিক, ফান্ড এবং পরিসর, তাতে এরচেয়ে বেশি কিছু করা তাদের পক্ষে কতটা সম্ভবপর, তাও প্রশ্নসাপেক্ষ ব্যাপার।

তবে আমাদের আশা থাকবে, কমিউনিটি সাংবাদিকতার এ চর্চার মধ্য দিয়ে তারা একদিন জাতীয় ধারার সাংবাদিকতায় অবাধ মাত্রায় বিচরণ করবেন, সাংবাদিকতা-পেশায় নিয়ে আসবেন সততা ও আদর্শবাদিতার অনুপম কোনো দৃষ্টান্ত।



জাতীয় দৈনিকের ধর্মপাতার হালচাল

হামমাদ রাগিব

বাংলাদেশের জাতীয় দৈনিকগুলোতে ধর্মবিষয়ক একটি বিভাগ থাকে। চরম সেকুলার এবং ইসলাম-বিদ্বেষী পত্রিকায়ও এ বিভাগটি রাখা হয়। এ বিভাগ রাখাটা যেন নিয়ম। তবে তা খুব অবহেলিত ও উপেক্ষিতভাবেই রাখা হয়। এমন অবহেলা বা উপেক্ষার সঙ্গে বিভাগটি রাখার কীই-বা দরকার, সংশ্লিষ্টজনরাই ভালো বলতে পারবেন। সপ্তাহের 'ধর্মবার' বা ছুটির দিন শুক্রবারে এ বিভাগের জন্য কোনো পত্রিকা ভেতরের সাদা-কালো একটি পৃষ্ঠা কোনো পত্রিকা অর্ধ পৃষ্ঠা 'খয়রাত' করে রাখে। শুক্রবার দিন পাঠক একটু ধর্মমুখো হন, মসজিদে জুমা পড়তে যান, এ দিনে ধর্ম বিষয়ক কিছু কথাবার্তা তাঁদেরকে শোনাতে পারলে পত্রিকার প্রতি তাঁদের একটা ধার্মিক ধারণা তৈরি হবে যে, নাহ, পত্রিকাটা ধর্ম-কর্ম মানে–এই চিন্তা থেকেই হয়তো ধর্মপাতার প্রচলন হয়েছিল আমাদের জাতীয় দৈনিকগুলোতে।

গৎবাঁধা সেই প্রচলন এখনও চলমান। সাম্প্রতিক কালে দু-একটি পত্রিকায় কওমি ঘরানার আলেম লেখকদের সম্পৃক্তির কারণে এই বিভাগটিতে খানিকটা পরিবর্তন ও নতুনত্ব এলেও অধিকাংশ পত্রিকাই থেকে গেছে পুরোনো গৎবাঁধা আয়োজনে। গত কয়েক শুক্রবারের পত্রিকাগুলোর ধর্মপাতা ঘেটেঘুটে মনে হলো ইসলাম নিছক একটি ধর্ম; শবে মেরাজ, রজবের ফজিলত, দরুদ শরিফের আমল,

নামাজ-রোজা–এসবের বাইরে যেন ইসলামের খুব কোনো কাজ নেই। কেমন যেন মনে হলো ইসলামকে খণ্ডিত ও পঙ্গু একটি জীবনব্যবস্থা হিসেবে উপস্থাপন করার জন্যই পত্রিকাগুলোর এ আয়োজন।

দৈনিক ইত্তেফাকের ২৯ মার্চ ২০১৯ শুক্রবার সংখ্যায় ধর্মচিন্তা শিরোনামে ভেতরের একটি পৃষ্ঠার সিকিভাগ বরাদ্দ ছিল। কাজা নামাজের বিধান এবং রজব ও শাবানের করণীয় শিরোনামে ছোট্ট দুটো লেখা তাতে স্থান পেয়েছে। একই দিন দৈনিক সমকালে ইসলাম ও সমাজ শিরোনামে ভেতরের একটি পৃষ্ঠার অর্ধেক বরাদ্দ ছিল ধর্মবিভাগের জন্য। সেখানেও গৎবাঁধা আয়োজন। দৈনিক নয়া দিগন্তে পূর্ণ একপৃষ্ঠা বরাদ্দ থাকলেও বিষয়বস্তুতে কোনো নতুনত্ব নেই।

বাংলাদেশ প্রতিদিন এ ক্ষেত্রে নিজেদের উদারতার পরিচয় দিতে গিয়ে সম্পাদকীয় পাতার এক কোণায় প্রতিদিনই ইসলামের এবাদত-বন্দেগি ও ফজিলত সম্বন্ধীয় ছোট্ট একটি কলাম রাখে। শবে মেরাজের শিক্ষা ও করণীয়, দরুদের ফজিলত, নামাজের গুরুত্ব, ইসলামে নারী ও শিশুদের বিশেষ মর্যাদা–এই ধরনের বিষয়বস্তুর ওপরে নিতান্ত দায়সারা গোছের লেখা থাকে। জায়গার অপ্রতুলতার কারণে তাও প্রকাশিত হয় খুব সংক্ষেপে। দুঃখজনক ব্যাপার হলো, ধর্ম বিষয়ক জীর্ণ শীর্ণ এই কলামের পাশেই থাকে তসলিমা নাসরিনের বিশাল লেখা। যেখানে এই মহিলা তার চিরায়ত নোংরা পদ্ধতিতে ইসলাম ও মুসলমানকে আচ্ছামতো তুলোধুনো করেন।

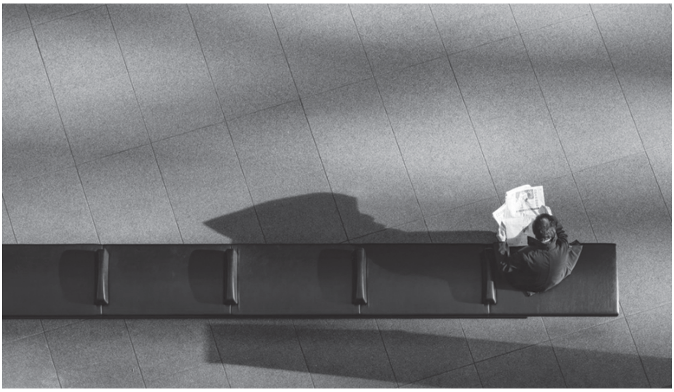
দৈনিক ইনকিলাবের ধর্মপাতা পূর্ণ পৃষ্ঠা জুড়ে থাকলেও সেখানে বিদআতি ও বিভ্রান্ত মতবাদের লেখাই বেশি স্থান পায়। এবং সেগুলোও যথামাফিক দায়সারা গোছের।

দৈনিক যুগান্তরেও প্রতি শুক্রবারে পূর্ণ এক পৃষ্ঠা বরাদ্দ থাকে ইসলাম বিভাগের জন্য। উল্লেখিত পত্রিকাগুলোর তুলনায় যুগান্তরের আয়োজন খানিকটা ব্যতিক্রমধর্মী। বাংলাদেশের বিভিন্ন পর্যায়ের ইসলামি ব্যক্তিত্বের সাক্ষাৎকার, ইসলাম বা মুসলিম উম্মাহর সঙ্গে সম্পৃক্ত বিভিন্ন ফিচার, নিবন্ধ থাকে তাদের আয়োজনে। ধর্মপাতার সম্পাদকের সঙ্গে সম্পর্কের সুবাদে বেশ কয়েকজন কওমি পড়ুয়া তরুণ এই আয়োজনগুলো সাজান। তবে ধর্মপাতার এ সম্পাদকের ব্যক্তিগত আকিদা বিভ্রান্তিমূলক হবার কারণে মাজার ও বিদআতের সমর্থনেও মাঝে মাঝে বেশ কিছু লেখাজোখা ছাপা হয়।

দৈনিক কালের কণ্ঠের আয়োজন ব্যতিক্রমধর্মী না হলেও বেশ গোছালো এবং চমৎকার। তবে এ মাস থেকেই ইসলাম বিষয়ে ব্যতিক্রমী আয়োজনের উদ্যোগ নিচ্ছে পত্রিকাটি। একদিনের পরিবর্তে এখন সপ্তাহে ছয় দিন রাখছে ইসলাম পাতা। রোববার থেকে বৃহস্পতিবার অর্ধ পৃষ্ঠা আর শুক্রবার পূর্ণ পৃষ্ঠা নিয়ে থাকছে তাদের এ আয়োজন। কুরআনের ধারাবাহিক তাফসির, হাদিসের আয়নায় মানবজীবন, মুসলিম বিশ্বের সর্বশেষ খবরাখবর, ইসলামি সভ্যতা সংস্কৃতি অর্থনীতি ও বিজ্ঞান বিষয়ে ফিচার, আলোকিত জীবন গড়ার সার্বিক নির্দেশনা–এই বিষয়গুলো নিয়ে সাজানো হচ্ছে আয়োজনটি। নিঃসন্দেহে এটা প্রশংসনীয় এবং ইসলামের সার্বিক সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলতে তা বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

দৈনিক সময়ের আলো নামে নতুন একটা দৈনিক এসেছে বাজারে। গতানুগতিকতার বাইরে এসে এরাও আলাদা একটা গুরুত্ব দিচ্ছে ইসলাম পাতায়। অর্ধ পৃষ্ঠার আয়োজন হলেও সপ্তাহের প্রতিদিনই থাকছে এ আয়োজন। বিষয়-মান বিচারে তাদের কাজও প্রশংসাযোগ্য।

তবে বাংলাদেশের দৈনিক পত্রিকার ইতিহাসে অভূতপূর্ব ও প্রশংসনীয় কাজটা করছে আলোকিত বাংলাদেশ। সপ্তাহের সাতদিনই আলাদা গুরুত্বের সঙ্গে পূর্ণ একটি রঙিন পৃষ্ঠা নিয়ে তারা ইসলাম বিষয়ক ব্যতিক্রমী আয়োজন করে থাকে। মজার ব্যাপার হলো, সপ্তাহের একেক দিন ইসলাম সম্পর্কিত একেকটা বিষয়ের ওপর ভিন্ন শিরোনামে তারা কাজ করছে। এবং আক্ষরিকভাবে ইসলাম শব্দটা তারা শিরোনামে রাখে না। কিন্তু সপ্তাহের সবদিনের কাজ একত্রিত করলে ইসলামের সামগ্রিক সৌন্দর্যই যেন ফুটে ওঠে তাদের এ আয়োজনে।



ধর্মপাতায় সম্পৃক্তি ও জাতীয় ধারার সাংবাদিকতায় আলেমদের সম্ভাবনা

আজ থেকে ১০ বছর আগেও বাংলাদেশের জাতীয় দৈনিকগুলোতে কওমি মাদরাসার আলেমদের পদচারণা খুব একটা ছিল না। হাতেগোনা কয়েকজন কাজ করতেন পত্রিকাগুলোর ধর্মপাতায়। তারও আগে হাতে গোনার মতোও কেউ ছিলেন না। কিন্তু চলতি দশক বা গত দশকের গোড়ার দিক থেকে বাংলাদেশের কওমি মাদরাসাগুলোতে লেখালেখি ও সাহিত্যচর্চার একটা স্রোত তৈরি হওয়ায় জাতীয় ধারার দৈনিকগুলোতে এখন কওমি পড়ুয়া আলেমদের পদচারণা উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। যদিও এ পদচারণা কেবল পত্রিকাগুলোর ধর্মপাতায় সীমাবদ্ধ।

ধর্মপাতায় কওমি পড়ুয়া আলেমদের এই লেখালেখি এবং জাতীয় ধারার সাংবাদিকতায় তাঁদের অংশগ্রহণ বিষয়ে এক বিকেলে আলাপ হয়েছিল দৈনিক আলোকিত বাংলাদেশের সহ-সম্পাদক মাওলানা আলী হাসান তৈয়বের সঙ্গে। দৈনিক আলোকিত বাংলাদেশের ধর্মপাতা ও এর ব্যতিক্রমধর্মিতা সম্পর্কে জানতে চাইলে মাওলানা আলী হাসান তৈয়ব বলেন, 'দৈনিক আলোকিত বাংলাদেশে আমি কাজ শুরু করার পর থেকে সপ্তাহের সাত দিনই ইসলাম বিষয়ে আলাদা একটা রঙিন পাতা থাকছে। যেটা আমার জানামতে বাংলাদেশের আর কোনো পত্রিকায় ইতিপূর্বে ছিলও না, এখনও নেই।

'এই পাতাটি প্রতিদিন প্রকাশিত হয় ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে। সরাসরি ইসলাম শব্দটা বেশিরভাগ শিরোনামেই নেই। যেমন নবীজীবন, তাসাউফ, অর্থনীতি, সভ্যতা, প্রকৃতি, ইসলামি সমাজ—এই সব শিরোনামে ইসলামের নির্দেশনাগুলোকে আমরা উপস্থাপন করি। পাশাপাশি সমসাময়িক টপিকেও এই বিষয়গুলোর আলোকে ইসলামের ভাবনাগুলো আমরা তুলে আনার চেষ্টা করি।

'মোটকথা ইসলাম যে একটা পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা—সাতদিনের এই সাতটি পাতায় আমরা সাধ্যমতো সে-বার্তাই উপস্থাপন করার চেষ্টা করি।

'আরেকটা সুখের কথা বলি, ইসলাম বিষয়ে ব্যতিক্রমধর্মী এই আয়োজনের কারণেই আলোকিত বাংলাদেশ পাঠকরা পড়ে। এটা আমাদের সম্পাদক থেকে নিয়ে অফিসের সাধারণ কর্মচারী পর্যন্ত—সকলের কাছে স্বীকৃত। এবং এ পাতার

দরুণই আলোকিত বাংলাদেশ টিকে আছে। এটা আমাদের জন্য অনেক বড় একটা অর্জন, আলহামদুলিল্লাহ, যে, শুধু ইসলাম বিষয়ক একটা পাতার জন্য পুরো একটা দৈনিক পত্রিকা দাঁড়িয়ে আছে। এখান থেকে ভবিষ্যতে অন্যান্য পত্রিকাও উদ্বুদ্ধ হবার একটা সুযোগ তৈরি হয়েছে।'

প্রায় প্রতিটা দৈনিকেরই তো সপ্তাহে একদিন ধর্মপাতা আছে, এখানে কওমি-পড়ুয়া অনেক তরুণ লিখছেন, তো ধর্মপাতাগুলোর সংকট এবং সম্ভাবনা নিয়ে একটু বলবেন?

এমন প্রশ্নের উত্তরে মাওলানা আলী হাসান তৈয়ব বলেন, 'সংকটের কথা যদি বলি, তবে দু'ধরনের সংকট আছে জাতীয় দৈনিকগুলোর ধর্মপাতায়। প্রথম সংকটটা তৈরি হয়েছে পত্রিকার মূল সম্পাদক ও মালিকপক্ষ থেকে। তাঁরা ধর্মপাতার দায়িত্বশীলদের কাছে চান, ইসলামকে যেন তাঁরা পঙ্গু কিংবা কেবল আমল-ফজিলত সর্বস্ব একটা ধর্ম হিসেবে উপস্থাপন করেন। ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসেবে উপস্থাপনে বাধ সাধেন সম্পাদক কিংবা মালিকেরা, অথবা ইসলাম যে সার্বজনীন, পূর্ণাঙ্গ ও চমৎকার একটা জীবনব্যবস্থা সে ব্যাপারে তাঁরা জানেনই না।

'আরেকটা সংকট হলো আমাদের দিক থেকে সৃষ্ট। আমরা যাঁরা ধর্মপাতাগুলোর দায়িত্বে থাকি বা ধর্মপাতায় লেখালেখি করি, তাঁদের অধিকাংশেরই ইলমি ইসতেদাদ ওভাবে নেই। গতানুগতিক আলেম হয়ে দু'কলম লিখতে পারার যোগ্যতা নিয়েই ওখানে চলে যাই। ইলমি যোগ্যতাসম্পন্ন আমাদের বোদ্ধা অংশ খুব কমই এ পাতাগুলোতে সম্পৃক্ত হন বা লেখালেখি করেন। এতে হয় কী, ইসলাম যে পূর্ণাঙ্গ ও চমৎকার জীবনব্যবস্থা সেটা আমরা লেখার মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারি না, বা মালিকপক্ষকে ভালোভাবে বোঝাতে পারি না। গতানুগতিক আমল-ফজিলত সম্পর্কিত কিছু লেখা লিখে পত্রিকায় পাঠিয়ে দিই বা ছাপি, যার দরুণ কেবল এইসব বিষয়েই ইসলাম সীমাবদ্ধ–এই ভুল ধারণার তৈরি হয়।

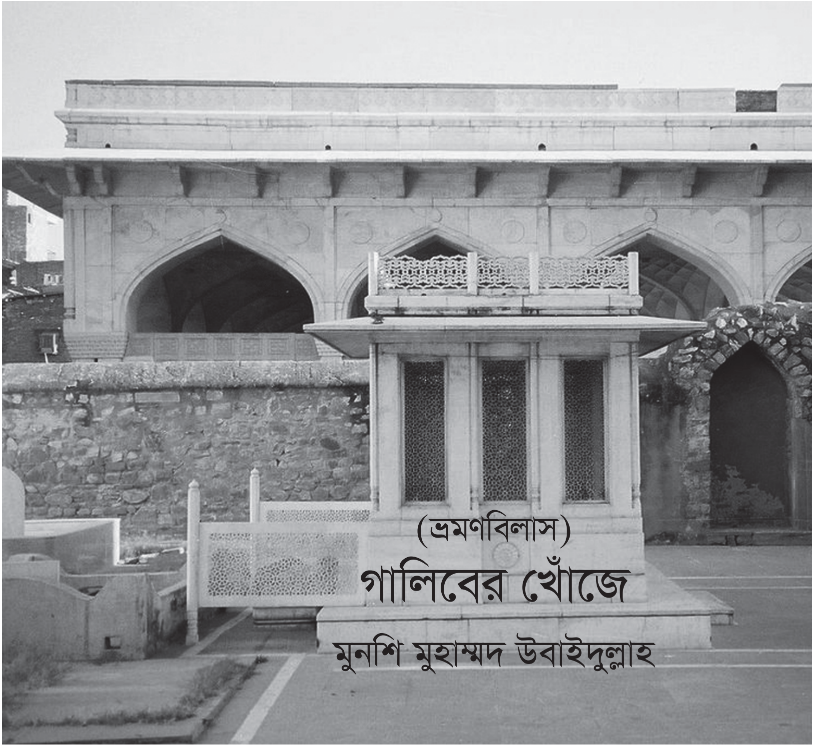
'এই সংকট কাটাতে ধর্মপাতাগুলোতে আমাদের মেধাবী ও ইলমি যোগ্যতা সম্পন্ন বোদ্ধা শ্রেণির সম্পৃক্ততা ও লেখালেখি অতীব জরুরি। এটা করতে পারলে মালিকপক্ষ থেকে যে সংকটের তৈরি হয়েছে সেটাও কেটে যাবে। কারণ তখন যোগ্যদের প্রভাব ও ইসলামের যথার্থ উপস্থাপন মালিকপক্ষকে প্রভাবিত করবে এবং ধর্মপাতা বিষয়ে মালিকপক্ষ নিজেদের ভাবনা পরিবর্তনে উদ্বুদ্ধ হবেন।

'তাই আমি মনে করি, ধর্মপাতাগুলোতে যাঁরা লেখালেখি করছেন, তাঁদেরকে গভীরভাবে পড়াশোনায় মনোনিবেশ করে ভালো যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। পাশাপাশি যোগ্য যাঁরা আছেন এই আওতার বাইরে, তাঁদেরও ধর্মপাতাগুলোতে নজর দেওয়া উচিত।'

মূলধারার সাংবাদিকতায় কওমি তরুণদের সম্ভাবনার কোনো ক্ষেত্র আছে কি-না জানতে চাইলে মাওলানা আলী হাসান তৈয়ব বলেন, 'অবশ্যই আছে। কওমি তরুণরা নিজেদের প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনার কল্যাণে এম্নিতেই তিন-চারটা ভাষা আয়ত্ত করে ফেলেন। একটু চেষ্টা করে যদি ইংরেজিটাও তাঁরা শিখে নিতে পারেন, তবে জাতীয় দৈনিকগুলোর আন্তর্জাতিক পাতাগুলোতে তাঁদের কাজ করার সুযোগ অবারিত। কারণ, ওই ধারার সাংবাদিক যাঁরা, তাঁরা কিন্তু আরবি-উর্দু জানেন না। আন্তর্জাতিক পাতাগুলোর রিপোর্টার নিয়োগের সময় আপনি যেকোনো পত্রিকায় আবেদন করলে এবং আপনার অনুবাদের হাত মোটামুটি ভালো থাকলে পত্রিকা আলেম-ওলামা বা কওমি-বিদ্বেষী হলেও আপনাকে নিতে বাধ্য। কারণ, আপনি ইংরেজি অনুবাদের পাশাপাশি যখন বলবেন আল-জাজিরা থেকেও সরাসরি অনুবাদ করে দিতে পারবেন, বা ফার্সি কি উর্দু সংবাদমাধ্যম থেকে নিউজ উদ্ধার করে দিতে পারবেন, তখন অন্যদের তুলনায় অনিচ্ছা সত্ত্বেও আপনাকে অগ্রাধিকার দেবে। কারণ তাঁদের কাজ দরকার।

'তাই আমাদের অঙ্গনের তরুণ যাঁরা সাংবাদিকতাকে পেশা হিসেবে নিতে চান, আমি মনে করি তাঁদের জন্য ধর্মপাতায় নিজেকে সীমাবদ্ধ না রেখে মূলধারার সাংবাদিকতার এই অবারিত সুযোগটা গ্রহণ করা উচিত।'

লিখেছেন: হামমাদ রাগিব



(ভ্রমণবিলাস)

গালিবের খোঁজে

মুনশি মুহাম্মদ উবাইদুল্লাহ

সূয্যিমামা হেসে উঠেছে সবে। পায়ে পায়ে চলার দৃশ্য নজরে পড়ছে পথের দু-সারিতে। আমি দাঁড়িয়ে আছি দিল্লির আইটিও বাসস্টেশনে। ৪০৫ নম্বরে চড়ে যাবো হজরত নিজামুদ্দিনে। দেখবো এক উর্দুকবির ওপর নির্মিত গবেষণাগার। দুদিন হলো আবারও বেড়াতে এসেছি নগরসম্রাট দিল্লিতে। ঘুরেছি ঐতিহাসিক বেশ কয়েকটি জায়গা। হারিয়েছি বেশ নন্দন মুগ্ধতায়। লাল কেল্লা, পুরোনো কেল্লা, শেরশাহ'র সমাধি, ইন্ডিয়া গেট, দিল্লি গেট, কুতুবমিনার, রাজঘাট, চিড়িয়াঘর–এ ঝালিয়েছি মেধা-মনন। 'দিল্লি বড়ি আজিব শেহের হ্যায়।' মর্ম বুঝেছি কথাটির।

ছেলেবেলায় জেনেছি গালিবকে। মির্জা আসাদুল্লাহ খান গালিবের কথা বলছি। 'মুহাব্বত কি শায়েরি' পড়েছি হপ্তাখানেক হলো। 'দেওয়ান-ই গালিব' আওড়াচ্ছি আজকাল। তার উর্দুকাব্যের গতিময়তায় উপলব্ধ হয় এক ভিন্ন জীবন। পাতায় পাতায় দারুণভাবে মোহিত করে তার প্রতি। সহসাই প্রেমযমুনায় হাবুডুবু খাই যে বার কতো! ইয়ত্তা নেই তার। কবি আজ বেঁচে নেই। বেঁচে আছে তার পদাবলি। উর্দুসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ চূড়ো দখল করে রয়েছে যেসব হালে।

ইশক পর জোর নেহি হ্যায়
ইয়ে ও আতিশ গালিব
কে লাগায়ে না লাগে
বুঝায়ে না বানে।

আহ, কতো স্বচ্ছ বাণী তার প্রেমদুনিয়া ঘিরে। কতো অকপটে বলে গেছেন–'প্রেমের ওপর জোর চলে না, এমনই গালিব সে। জ্বালালেও জ্বলে না, নেভালেও নেভে না।'

স্টেশনে বাস এসে দাঁড়ালো ততোক্ষণে। টিকেট নিয়ে বসলাম সিটে। কাঁচ গলে গলে নজর পড়ছিলো বাইরেই কেবল। দিল্লির পথঘাট, উড়াল সেতু, মেট্রোরেল–দেখার মতো বেশ। মনের আয়নায় গাঁথতে লাগলাম চোখে দেখে দেখে। দশমিনিটের মাথায় বাস এসে দাঁড়ালো হজরত নিজামুদ্দিন স্টেশনে। যথারীতি নামলাম বাস থেকে।

'শায়ের গালিব কা ঘর কাহা পর হে?' জিজ্ঞেস করলাম এক ভদ্রলোককে। মহাসড়ক পেরিয়ে একটি সরুপথ হাতের ইশারায় দেখিয়ে দিলেন তিনি। মিনিট দুয়েক হাঁটলাম। আশপাশে রয়েছে হোটেল, বিলাসবহুল আবাসিক ভবন। পথের দু-পাশে সারিবদ্ধ ক্ষুদে ব্যবসায়ীদের বহর। ফুল-ফল, কাপড়, পারফিউম, জল নিয়ে রাস্তা জড়ো করে রেখেছে তারা।

'ভাইয়া, সুনিয়ে!' হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে এক দোকানিকে বললাম।

'হাঁ জী, বোলিয়ে।'

'শায়ের গালিব কা ঘর কেধার হ্যায়?'

'উন কা ঘর তো হ্যায় চাঁদনিচক পে। লেকিন একাডেমি হ্যায় এহি পে হি।'

গালিবের ঘর এখানে নেই, শুনতেই তথমত খেলাম। বন্ধুরা বলেছে এখানেই। কিন্তু লোকটি বলছে ভিন্ন কথা। আমার অবাক হবার বিষয়টি বোধয় বুঝতে পারলো সে। মুচকি হেসে তাই জিজ্ঞেস করলো–'নয়া হ্যায় কিয়া?'

মাথা নাড়ালাম।

'লেকিন ইন্ডিয়া মে নেহি।' হিম্মত করে জানালাম কথাটি। 'নয়া' বলে হয়রানি করবার পথ বন্ধ করে দিলাম একেবারেই। লোকটি এবার হেসে ওঠলো খিলখিলিয়ে। বললো–'কৈ বাত নেহি। ম্যায় তো মজাক কার রাহা থা জি!' ইশারায় দেখিয়ে দিলো সামনের বিল্ডিংটা। প্রথমে আগাগোড়া দেখে নিলাম ইমারতটি। লাল বেলে পাথরে রঙ চড়ানো ভবনটির গায়ে। লম্বালম্বি দাঁড়িয়ে আছে গাছের মতো। আলিশান কোঠাবাড়ির মতো তিনতলা বিল্ডিংটি। চারপাশে টাঙানো উর্দুতে লেখা বেশ কয়েকটি ফেস্টুন। প্রধান গেট বরাবর রয়েছে একটি রঙিন ব্যানার। 'মুশায়ারা মাহফিল ২০১৬' লেখা রয়েছে তাতে বড় বড় হরফে।

এগোলাম গেটের দিকটায়। বাঁপাশে দেখলাম টুপি-দাড়িসমেত কবি গালিবের ছবি টাঙানো। ডানপাশে রয়েছে একাডেমির সাদাকালো মনোগ্রাম। বেশ নিরবচ্ছিন্ন এলাকা এটি। কাউকে দেখা গেলো না গেটে।

প্রবেশ-অনুমতির প্রয়োজন আছে কিনা, জানা নেই। তবু অপেক্ষা করলাম ইজাজত মেলার। এর ভেতরই হুট করে বেরোলো এক ভদ্রলোক। মাথায় ক্রিকেটারদের মতো ক্যাপ। পরনে তার লাল পাঞ্জাবি। পায়ে চটির মতো জুতো। কাঁধে রয়েছে চামড়ার ব্যাগ ঝুলানো। বুঝে নিলাম–লোকটি কোনো কবি-টবি হবেন। তার কাছেই ভেতরে ঢুকবার বিষয়ে জানা যাবে। সালাম দিলাম। বললাম–'আঙ্কেল! আন্দার জা সাকতা হুঁ কিয়া?' বেরোতে বেরোতে গোঁফে-দাঁড়িভর্তি ভরাট চেহারার লোকটি আমার পিঠে হাত রাখলেন। মুচকি হেসে বললেন–'ইজাজত কি কিয়া জরুরত হ্যায়? জরুর, যাও।' শুকরিয়া জানালাম তাকে।

এবার সানন্দে পা রাখলাম একাডেমির ভেতরে। শুরুতেই দেখলাম প্রচ্ছদে ঠাসা চত্বর। কবি গালিব, কবি আল্লামা ইকবাল, কবি ফয়েজ আহমদ ফয়েজের সব বইয়ের প্রচ্ছদে ঘেরা এক অন্যরকম দুনিয়া। হাতালাম দু-চারটে। উর্দু ক্যালিগ্রাফিতে গড়ালাম মিনিট বিশেক। ততোক্ষণে পেছনে কারোর হাঁটার শব্দ ভাসলো কানে। ঘুরে দাঁড়ালাম ঘাড় বাঁকিয়ে। সালাম দিলাম। জবাব দিলেন বুড়ো মতোন লোকটা। হয়তো তিনিও একজন কবি, প্রথম দেখাতেই মনে হলো এমনটাই। আমায় এড়িয়ে দরোজা ঠেলে ভেতরে ঢুকছেন তিনি। পিছু নিলাম তার।

ভেতরে যেতেই চোখ আমার ছানাবড়া। এ কী! এ তো দেখছি কবি আর কবি। কবিদের বিশাল মিলনমেলা। বাইরের ফেস্টুন, ব্যানারের মর্মটা এবার বুঝে এলো। প্রেয়সীদের উপলক্ষ করে কবিতা আবৃত্তি করছেন একের পর এক কবি। শুনতে শুনতে

বসে পড়লাম গ্যালারির একটি সিটে। গ্যালারিটি সুবিশাল। জমকালো বেশ, দৃষ্টিনন্দনও বটে। তবে শ্রোতার উপস্থিতি নেই তেমন। অর্ধটা ভরে আছে তরুণ, যুবাবৃদ্ধ কবির আগমনে। সামনের ব্যানারটা জ্বলজ্বল করছে লাল-নীল ঝাঁড়বাতিতে। মঞ্চটা আলোময় হয়ে ওঠছে ধীরে ধীরে। লম্বা কেশে ঘেরা চশমাপরুয়া ক'জন রয়েছেন মূল আসনে। উপস্থাপক হাত নাড়িয়ে ছন্দে ছন্দে আহ্বান করছেন কবিদের। একে একে বেশ ক'জন কবি দাঁড়ালেন কবিতামঞ্চে। শোনালেন উর্দু-হিন্দি কবিতা। দু-একজন পরেই মূল মঞ্চের একজন দাঁড়ান হঠাৎই। পাঠ করেন গালিব, ইকবাল চরণ। আমি মুগ্ধতায় হারাই। শুদ্ধতায় বনে যাই ইকবাল, গালিবের সহচর-সহোদর।

ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে অনুষ্ঠানটির রৌনক, রৌশন। 'ওয়াহ ওয়া!' বলে চিৎকার করে ওঠে সামনের শ্রোতারা। 'কিয়া বাত হে!' আওড়িয়ে ওঠে হঠাৎ হঠাৎ। আমারও মেলাতে ইচ্ছে হয় তাদের সুরে সুর। দাপিয়ে বেড়াতে মন চায় কবি গালিব, রুমি, ইকবালের ছন্দকাব্যের শহর-বন্দরে। কিন্তু আমার সিটটা পেছনে সবার। অনেকটা ওপরতলার মতো। সামনের লোকজনকে দেখা যায় না তেমন। ঠাওর করা যায় না তাদের অঙ্গভঙিমা। কানে শোনা কেবল যতোটুকুন। ছাগলের তিন নম্বর বাচ্চার মতো লাফিয়ে ওঠা শুধু। তবু চেষ্টা চালালাম দেখতে।



দাঁড়িয়ে পড়লাম একপর্যায়ে। বেশ ছোটোখাটো মনে হলো সামনের সারিটাকে। সবার চেহারা অনুমান করা গেলো না একপলকে। একেবারে ওপরের দিকে নজর আটকালো তখন। দেখলাম পিতলের শিকে ঘেরা সামনের সারিটা। ওপর বরাবর যথেষ্ট ফাঁকা। মাথায় বুদ্ধির ঢেউ খেললো ফট করে–দোতলায় যাওয়া যেতে পারে তবে। যেই ভাবা সেই কাজ। বেরিয়ে পড়লাম বাইরে। হাতের ডানে দেখলাম কার্যালয়ের মতো আরেকটি কক্ষ। দুজন লোককে দেখলাম কবিতা রিহার্সেলে মগ্ন। বিরক্ত করলাম না তাদের। সিঁড়ি ভেঙে সোজা ওপরে চড়তে লাগলাম একাই। মাঝবরাবর দেখা এক কবির। সালাম দিলেন তিনি আমায়। হাল-ফুরসৎ জানতে চাইলেন কথায় কথায়। কোথা থেকে এসেছি, জিজ্ঞেস করলেন প্রথম পরিচয়েই। সিঁড়ির রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই মিনিট দুই কথা বললাম তার সঙ্গে। বেশ খুশি হলেন তিনি। উর্দুকাব্যের প্রতি অনুরাগী দেখে হাদিয়া দিলেন একটি বই। প্রচ্ছদে আঁকা আল্লামা ইকবালের ছবি তাতে। আর উর্দুহরফে লেখা 'শিকওয়া : শিকওয়া-ই জালওয়া।' লোকটাকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষমেষ পা রাখলাম দ্বিতীয়তলায়।

এই তলার সামনের দুটো সারিতে রয়েছে হাতেগোনা কয়েকজন দর্শক। আরেকজন যোগ হলাম আমি। এক এক করে ডিঙিয়ে বসলাম সবার সামনের সিটটাতে। দেখলাম নিচতলার সামনের আসল রহস্যটি। গালিবের ফেস্টুন জড়ানো চেয়ারে বসা তারা। রঙিলা লাইটিংয়ের ক্রমাগত আলোর ফোয়ারায় জ্বলজ্বল করছে চেয়ারসহ কবিদের আপাদমস্তক। বেশ ভালো লাগছে দেখতে। কবিতা শোনাতে শোনাতে ক্লান্ত হয়ে পড়লো একসময় কবিগণ। ঘোষণা হলো বিরতির। আমি বেরিয়ে পড়লাম বাইরে। এ তলায় দ্বিতীয় আর কোনো কক্ষ

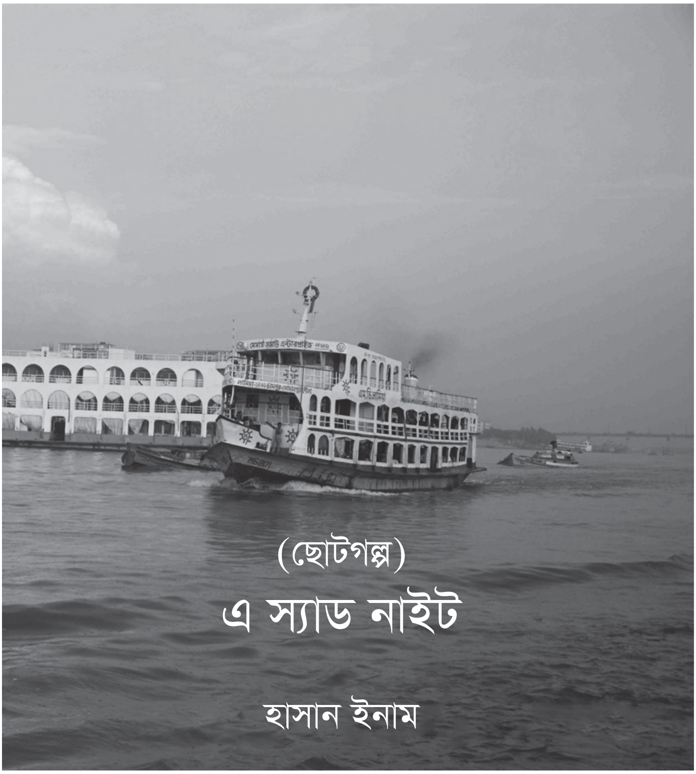
নজরে এলো না। দু-পাশে টয়লেট, বাথরুমের লাইন দেখা গেলো কেবল। ভিড় ঠেলে চড়তে লাগলাম তৃতীয়তলায়। সিঁড়ির সাদাটে কাঁচের ফাঁক গলে পড়ছে সূর্যের রশ্মি। মুখটা হয়ে ওঠলো বেশ রোদেলা। ততোক্ষণে হাজির হলাম তৃতীয়তলায়। একেবারেই নীরব পরিবেশ এই ফ্লোরটির। রিসিপশনে বসে আছেন তিরিশের মতোন বয়সী একজন নারী কবি। কম্পিউটারে কম্পোজ করছেন উর্দুকবিতা। সালাম দিলাম তাকে। হাতের ইশারায় ডানদিকে যেতে বললেন তিনি।

বইয়ে ঠাসা এই ফ্লোরটির চারপাশ। বিশাল লাইব্রেরি দেখলাম বাঁপাশে। ডানপাশে দেখলাম সারিবদ্ধ টেবিল, চেয়ার। উর্দু, হিন্দি, ইংরেজিভাষার সবধরনের ম্যাগাজিন-দৈনিক পত্রিকা রাখা আছে তাতে। ক'জনকে দেখলাম বসে বসে পড়ছেন উর্দু,হিন্দি দৈনিক। আমি হাতে নিলাম হিন্দি দৈনিক 'হিন্দুস্তান'। ভারতের জাতীয় পত্রিকা এটি। সবচে তরতাজা খবর থাকে পাতায় পাতায় এর। ফিচারপাতাগুলোও বেশ হিটের। চোখের তারায় 'মনোরঞ্জন' পাতাটি মেলে ধরলাম যখন, ঠিক তখনই দেখলাম একাডেমির ইউনিফর্মপরুয়া একজন তরুণকে। একটু এগিয়ে তার কাছে জানতে চাইলাম 'মুহাব্বত কি শায়েরি'র কথা। 'ম্যাম কো পুছিয়ে।' সাদা গলায় জানালো সে। তিরিশের মতো বয়সী রিসিপশনের সেই ম্যাডামের কাছে গেলাম আবার। কম্পোজে বেশ ব্যস্ত দেখা গেলো তাকে। তবু সময় দিলেন আমায়। চশমার ফাঁক গলে তাকালেন। খানিকটা বিরতি নিয়ে এবার চোখ কপালে তুলে বললেন–'ইস নাম সে তো কৈ কিতাব হি নেহি গালিব কি!' অবাক হলাম খুব তার কথায়। তবে কি আমি ভুয়া কারোর কবিতা পড়েছি? আর প্রেমে পড়েছি মির্জা গালিবের? তবু মিনিট দুয়েক একাডেমির সব বইয়ের তালিকায় ঘাঁটলেন নামটি তিনি। পেলেন না শেষমেষ। বললেন–'ওধার জাও। লাইব্রেরি মে ঢুণ্ডো।' ম্যামের কথামতো এগোলাম বাঁপাশে। আলমারির তাকে তাকে হাজারো কবিতার বই দেখলাম সাজানো। কোনোটা কবি গালিবের নিজের লেখা, কোনোটা তার কবিতার ওপর লেখা সমালোচনাগ্রন্থ; আর কোনোটা বা কবি ইকবাল ও অন্যান্য উর্দুসাহিত্যের কবিদের কবিতাসমগ্রের সংকলন। সারিতে সারিতে প্রতিটার নিচে রয়েছে সংকেত-ইশারা। আমি ঢুকলাম কবি গালিবের রচনালয়ে। ঘাঁটলাম মিনিট দশেক। মিললো না তবু তার প্রেমময় সেই কাব্যসংকলনটি। অগত্যা কৌতূহলী হলাম ইকবাল দরোজায়। গুটি গুটি পায়ে এগোলাম ওদিকটায়। দেখলাম ইকবালের শতো শতো উর্দুকবিতার বিপ্লবী কারনামা। তৃতীয়তলা থেকে এবার বেরোবার পালা। ম্যাডামকে বললাম–'ও কিতাব মিলি নেহি।' বললেন–'ঠিক হে, আগার মিল জায়ে তো ফৌরান হি ইনফর্ম কারোঙ্গি। ইস পার্চি মে আপনা নাম, নাম্বার, আওর পাতা লিখ দো।' খাতায় নামটি লিখতে যাবো, ঠিক তখন প্রশ্ন করে বসলেন আরেকটি–'উস কিতাব কা কিয়া নাম বাতায়া থা তুম নে?'

'মুহাব্বত কি শায়েরি।'

মুচকি হাসলেন তিনি। জানালেন–'ও তো ফিলহাল নেহি। কুচ্ছ দিন পেহলে খতম হো চুকি হে। দারাসাল ও গালিব কি কৈ মুস্তাকিল কিতাব হি নেহি, বাল্কে উনকে প্রেমকবিতা কা মজমুয়া হ্যায়।' স্বস্তির হাসি হাসলাম খানিকটা। এতোক্ষণে মিললো তবে। অর্ডার রেখে চললাম বাইরে। বইটির বাংলা-হিন্দি ভার্সন পড়েছি কেবল। কিন্তু উর্দুটা নজরে পড়েনি এখনও। এতো পাগলপারা তাই এর জন্য। এরপর স্বজোরে পা ফেলে নিজেকে আবিষ্কার করলাম নিচতলায়। লোকের ভিড়ভাট্টা ঠেলে বেরোলাম বাইরে। হাঁটতে লাগলাম মেট্রোস্টেশনের দিকে। কিন্তু কে যেনো কী এক মোহে আমায় জড়াচ্ছে বারবার। পেছন ফিরে তাকাই বার কয়েক একাডেমিটার দিকে। উর্দু অক্ষরে লেখা 'গালিব একাডেমি' যেনো হাতছানি দিলো ক্রমাগত। তবু জানালাম 'আলবিদা।' পাশের দরোজায় হিন্দিতে লেখা নামটি যেনো ডেকে ডেকে বললো কেবলই–'কভি আলবিদা না কেহনা।'

লেখক : শিক্ষক, আল জামিআতুল ইসলামিয়া ইসলামপুর (ভবানিপুর মাদরাসা), গোপালগঞ্জ



(ছোটগল্প)

এ স্যাড নাইট

হাসান ইনাম

মুজাহিদ। মুজাহিদুল ইসলাম। এসএসসি পরীক্ষার পর বন্ধুবান্ধব যখন সব আয়েশ করে পায়ের ওপর পা তুলেছে ঠিক তখনই মুজাহিদ পা চালিয়েছে কুড়িগ্রামে। ঢাকার ছেলে কুড়িগ্রামে। মুজাহিদরা ঢাকার স্থানীয়। অনাত্মীয় বা দূরাত্মীয়দের কেউ ঢাকার বাইরে থাকে না। সারারাত লঞ্চের ভেঁপু আর সূর্য উঠবার আগে টাটকা সবজির ঘ্রাণ নিয়ে বড় হয়েছে মুজাহিদ। শ্যামবাজারের পাশ দিয়ে বড়জোর তিন মিনিট হাঁটলেই মুজাহিদদের বাড়ি। তিন পুরুষের বাড়ি। সে যাইহোক, আমরা কথা বলছিলাম মুজাহিদের কুড়িগ্রাম যাত্রা নিয়ে। কুড়িগ্রামের প্রায় কুড়িটি মসজিদে মানে প্রায় কুড়িটি এলাকায় ঘুরেছে মুজাহিদ। ও হ্যাঁ, মুজাহিদ তাবলিগে গিয়েছিলে। তাবলিগি শাস্ত্রীয় ভাষায় যাকে বলা হয় 'চিল্লা'। মুজাহিদ ইচ্ছায় নাকি অনিচ্ছায় গিয়েছিল সে আলাপে আমরা যাব না। আমরা ভূমিকা আর দীর্ঘ না করে মূল গল্পে ঢুকে যেতে চাচ্ছি।

আজ মুজাহিদের তিন চিল্লা শেষ হলো। প্রথমে কুড়িগ্রাম তারপর শরীয়তপুর। আর শেষ চিল্লা দেয়া হলো চাঁদপুরে। প্রথম চিল্লায় সবাই ছিলো সমবয়সী। এসএসসি পরীক্ষার্থীদের জামাত। শরীয়তপুরের জামাতে দু'-একজন সমবয়সী ছিল অবশ্য। তবে এবার মুজাহিদ সম্পূর্ণ একা। একা মানে একাই। জামাতে সর্বকনিষ্ঠ। এজন্য সবাই আদরও করে খুব। তবুও দিনগুলো তেমন ভালো কাটেনি মুজাহিদের। তারাবি শেষ করেই সবাই মাল-ছামানা গোছাতে ব্যস্ত। মুজাহিদ বসে আছে মসজিদের বারান্দায়। বারান্দা থেকে নদীটা একদম স্পষ্ট দেখা যায়। আকাশে চাঁদ

আছে তবে লুকোচুরি খেলছে মেঘের সাথে। মুজাহিদের বুকের ভেতর কী যেন একটা দলা পাকিয়ে উপরে উঠে আসছে। কষ্ট হচ্ছে ভীষণ। কেন কষ্ট হচ্ছে সেটা বুঝতেও পারছে না মুজাহিদ। এখন খুশি হবার কথা। রাত পোহালেই ঢাকা। চিরচেনা সেই সদরঘাট। পরিচিত সেই গন্ধ। 'এইখানে এমনে দাঁড়াই আছো কিল্লিগা? গাট্টি বানছো? লঞ্চ ছাইড়া দিবো সোয়া বারোটায়। জলদি গোছাও।' কথাগুলো বলেই পাশ কাটিয়ে চলে যায় খসরু ভাই। মুজাহিদের মন আরও খারাপ হয়। খসরু ভাই কি দেখতে পায়নি মুজাহিদের চোখের জল? নাকি বুঝতে পারেনি? একবার অন্তত জিজ্ঞেস করতে পারত কেন মন খারাপ। মুজাহিদ ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে। নদীতে ছলাৎ ছলাৎ ঢেউ। চাঁদ উঁকি দিয়েছে মেঘের ফাঁকে। ঘড়িতে সময় বারোটা দশ। আধঘন্টা আগে লঞ্চে এসেছে মুজাহিদরা। মুজাহিদ লঞ্চটা একবার ঘুরে দেখবার জন্য আমির সাহেবের কাছে অনুমতি চেয়েছিল। আমির সাহেব শীতল চোখে মুজাহিদের চোখে তাকাতেই দমে গেছে ইচ্ছেটা। লঞ্চের নাম 'ময়ূরী-৭'। তিনতলা লঞ্চ। মুজাহিদরা উঠেছে লঞ্চের পেছন দিককার ছাদে। ছাদে একটা নামাজের ঘর আছে। সেখানেই বেডিং বিছিয়েছে সবাই। নামাজের স্থানে এভাবে বেডিং খুলতে ইতস্তত লাগত মুজাহিদের কাছে। এখন আর কিছু মনে হয় না। ছাদের মাঝখানে সুন্দর একটা ছাতাওয়ালা টেবিল। টেবিলের চারপাশে ছোট ছোট টুল। ছাতা-টেবিল-টুল–সব স্টিলের। রেলিংয়ের পাশ ঘেঁষে ছোট ছোট চেয়ারও আছে। যেখানে ইঞ্জিনের ধোঁয়া বের হয় তার চারিপাশে ফুলের টব ছড়ানো। সবুজবাগ। মুজাহিদ চেয়ারে বসে নদী দেখছে। লঞ্চ ছাড়তে এখনও মিনিট পাঁচেক বাকি। ছাতাওয়ালা টেবিলের পেছনে দুটো চাদর বিছানো। এখানে হয়তো কেউ জায়গা রেখে গেছে। কিন্তু এখনও আসছে না তারা। লঞ্চ মিস করলে এই চাদর দুটোর কী হবে? চাদর দুটোর জন্য খুব মন খারাপ হয় মুজাহিদের। এর মধ্যেই হালকা আওয়াজে শোরগোল শোনা যায়। নীল পাঞ্জাবি, কালো পাঞ্জাবি আর বেগুনি পাঞ্জাবির তিনজন। তিনজন এসে চাদর বিছানো জায়গাটার উপর এসে দাঁড়িয়েছে। এরাই বোধহয় চাদরের মালিক। কিন্তু শোরগোল করছে কেন? দেখতে দেখতে লোকজন বাড়তে লাগে। সাদা পাঞ্জাবি পরা দুইজন ছাদে ওঠে। এক মিনিটের মধ্যে আরও অনেক লোক উঠে আসে ছাদে। চেয়ারে বসে সঠিক হিসেব করতে পারে না মুজাহিদ। লঞ্চ ছাড়ার এক মিনিট আগে শোরগোল বেড়ে যায় আরও। সবাই এসে পৌঁছেনি হয়তো। লম্বা চুলের এক ছেলেকে পাঠানো হয় সারেং-এর কাছে। যেন একটু পর ছাড়ে লঞ্চ।

বসে বসে দেখতে থাকে মুজাহিদ। লঞ্চ ছেড়ে দেয়। হিসেব করে মুজাহিদ। আটাশ জন। তিনজন বাদে সবাই পাঞ্জাবিপরা। গোল টেবিলে বসে কয়েকজন। কিছু ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছাদে আর বাকি কয়েকজন নিচে চলে যায় লঞ্চ ছাড়বার কিছু পরেই।

মুজাহিদ নদীর দিকে তাকিয়ে থাকে। মোহনা। তিন নদী মিশেছে এখানে। মুজাহিদ ভাবতে থাকে কীভাবে কাটলো একশো বিশ দিন। কত কত দিন সে বন্ধুদের থেকে আলাদা। আরো অনেক কিছু মনে আসতে গিয়েও আসে না। কেন আসে না? আবারও মন খারাপ হয় ওর। একশো বিশ দিনের অর্জন নিয়ে চিন্তা করতে থাকে মুজাহিদ। দিল পরিবর্তন হয়েছে অনেকটা। তাছাড়া শিখতে পারা গেছে অনেক কিছু। জুম্মা আর ঈদের নামাজ ছাড়া আর কোনো নামাজ পড়া হতো না মুজাহিদের। সুরা ফাতিহা আর সুরা ইখলাস ছাড়া জানা ছিল না কোনো সুরা। একশো বিশ দিনে অনেক অনেক কিছু জেনেছে এবং শিখেছে সে।

চিন্তায় ছেদ পড়ে মুজাহিদের। লঞ্চ নিজস্ব গতিতে চলছে। চাঁদ ঢাকা পড়েছে মেঘের নিচে। ফিনফিনে বাতাস বইছে। ভ্যাপসা গরমটা কেটে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। ছাতাওয়ালা গোল টেবিলটায় তর্ক চলছে খুব। সেই তর্কের সুরেই কাটা পড়েছে মুজাহিদের চিন্তার সুতো। আশ্চর্য, এরা না সবাই একসাথে উঠল লঞ্চে। এদের তো একসাথেই মনে হয়েছিল। বেশভূষাও এক। তাহলে তর্ক করছে কেন এভাবে? মনে মনে ভাবতে থাকে মুজাহিদ। ভাবতে ভাবতেই টেবিলের পাশে এসে দাঁড়ায়। আমির সাহেবসহ আর দুই-তিনজন উৎসুক দৃষ্টি নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে টেবিলের

পাশে। তর্কের বিষয়বস্তু মুজাহিদের মাথার উপর দিয়ে যায়। 'বাবা-মার অনুমতি ছাড়া বিয়ে করা জায়েজ কি-না? জায়েজ হলে বাবা-মা মেনে নিলে তালাক হয়ে যাবে কি-না?'

আমীর সাহেবের দিকে তাকায় মুজাহিদ। বড় বড় চোখ নিয়ে তাকিয়ে আছেন যে কথা বলছেন তাঁর দিকে। একজনের মুখ থেকে আরেকজন কথা কেড়ে নিচ্ছেন আর আমির সাহেব দ্রুত সেই দিকে নজর দিচ্ছেন। যেন চোখ দিয়ে গোগ্রাসে গিলছেন কথা। এই অবস্থা সবার। যারাই দাঁড়িয়ে আছে টেবিলের চারপাশে।

এই সুযোগটা হাতছাড়া করল না মুজাহিদ। আমির সাহেব এখন ওদিকে ব্যস্ত। এই সুযোগে একটু নিচ থেকে ঘুরে আসলে মন্দ হয় না। মুজাহিদ সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে আসে। একদম নিচ তলায়। চা-পান-সিগারেটের দোকান। অনেকদিন পর সিগারেট খেতে ইচ্ছে করে মুজাহিদের। কেউ নেই আশেপাশে। দোকানের সামনে গিয়ে হাঁক ছাড়ে–'একটা গোল্লিপ।' দোকানি তীর্যক চোখে তাকায়। যেন-বা খুব বড় অপরাধ করে ফেলেছে সে। মেজাজ খারাপ হয় মুজাহিদের। কেউ এসে পড়লে বিপদ। আবার বলে। তবে এবার একটু নরম গলায়–'একটা গোল্লিপ সিগ্রেট দেন।' দোকানি এবার আরও তীর্যক চোখে তাকায়। শ্লেষমাখা স্বরে বলে–'আপনি খাবেন?'

'আচ্ছা, লাগবে না।' বলে দোকানের সামনে থেকে সরে আসে মুজাহিদ। মন খারাপ হয় আবার। ছিঃ ছিঃ, শয়তানের ওয়াসওসাতে কী করতে যাচ্ছিল সে? অনুশোচনায় ভরে ওঠে মন। পরক্ষণেই মনে হয় দোকানদারের সিগারেট না দিতে চাওয়াটা আল্লাহ পাকের ইশারা। আল্লাহ মুমিন বান্দাদের এভাবেই হয়তো গুনাহ থেকে বাঁচান।

দোকানদারের জন্য দোয়া করতে করতে সামনের দিকে এগোয় মুজাহিদ। সামনের ডেকে চলে যায়। ডেকের একদম সামনে সুঁচালো জায়গাটায় বসে আছে তিনজন। উপরের দলের এরা। সবার আগে এরাই এসেছিল। চিনতে পারে মুজাহিদ। কিন্তু তর্ক-বিতর্ক ছেড়ে এরা এখানে কী করছে? কৌতূহল নিয়ে কাছে যায় সে। পাশে বসে। বসতে বাধ্য হয় মূলত। নীল পাঞ্জাবি পরা ছেলেটা গান গাচ্ছে। এতো চমৎকার গানের গলা সামনাসামনি কখনই শোনেনি মুজাহিদ। আকাশের দিকে তাকাতে গিয়ে দুই তলার ডেকে নজর পড়ে। জটলা সৃষ্টি হয়েছে দুই তলার ডেকে। সবাই তন্ময় হয়ে শুনছে গান। ছেলেটা গান গাচ্ছে 'আমি তো ভালা না, ভালা নিয়াই থাইকো....।'

মুহূর্তে কই যেন হারিয়ে যায় মুজাহিদ। পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে হুট করে একটা প্রেম হয়েছিল তার। হুট করেই আবার ভেঙে গেছে। মেয়েটা বলেছিল কয়েকদিন যোগাযোগ বন্ধ রাখবে। আবার যখন সব ঠিকঠাক হবে তখন ফিরে আসবে। এর মাঝখানে কারো সাথে আর সম্পর্কে জড়াবে না। কিন্তু সব ঠিকঠাক হবার আগেই মেয়েটা অন্য আরেকটা ছেলের সাথে জড়িয়ে যায়।

মুজাহিদ নদীর দিকে তাকিয়ে থাকে। এদিকে একের পর এক গান গাইছে নীল পাঞ্জাবিওয়ালা। বাকিদুজন গানের তালে তালি আর তুড়ি বাজাচ্ছে। ওদিকে খেয়াল নেই মুজাহিদের। সন্ধ্যা থেকে একের পর এক মন খারাপ হতেই আছে।

মুজাহিদ আবার উপরে এসেছে। গোল টেবিলটার চারপাশ ঘুরে ঘুরে একজন ছবি তুলছে ক্যামেরায়। ডিএসএলআর ক্যামেরা। মুজাহিদের ইচ্ছে করে তাকে বলে নিজের একটা ছবি উঠাতে। কতদিন ফেসবুকের প্রোফাইল

পিকচার বদলানো হয় না। ফেসবুকের কথা মনে আসতে আবারও মন খারাপ হয় ওর। মন ভালো করতে টেবিলের আলোচনায় মনোযোগ দেয়। এখন আলোচনা চলছে 'ইসলামে বহু বিবাহ' নিয়ে। অনেক্ষণ দাঁড়িয়ে আলোচনা শোনে মুজাহিদ। কিন্তু কিছুই বুঝতে পারে না। অগত্যা মানুষগুলোকে পর্যবেক্ষণ শুরু করে। এই কাজ করে অনেক সময় মন ভালো করেছে সে।

সবথেকে বেশি কথা বলছে ঘন চাপ দাড়ি। মুখে গোশ নেই। কথার আওয়াজে খুব জোর। অনেক পড়াশোনাওয়ালা লোক বোধহয়। এরপর, এইপাশে বাবরিওয়ালা মাঝবয়সী একজন। দাড়িতে পাক ধরেছে। কথা বলছেন মেপে মেপে। মূলত তিনি কথা উস্কে দিচ্ছেন। খণ্ডন করছে অন্যরা। এদিকে ব্রাজিলের জার্সি পরা এক যুবক প্রচুর তর্ক করছে সেই শুরু থেকে। মনে হচ্ছে অনেক বড় আলেম। কিন্তু বেশভূষা এমন কেন? মোটামতো আরেজন যুবক আছে এইপাশে। সেও কথা বলছে খুব। এছাড়া যারা আছে সবাই চুপচাপ। দু-এক কথায় তাল মিলিয়ে শ্রোতার ভূমিকা পালন করছে। কালো টিশার্টের একজন আছে। একদম চুপচাপ। গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছে সব। একজন ঘুমিয়ে গেছে ওদিকে। সেই যে চাদর বিছানো ছিল, সেখানে। কয়েক জন মিলে চেয়ারে বসে আড্ডা দিচ্ছে।

আবার নিচে দেখে এসেছে দুজন বসে বসে ভাজি আর পরোটা খাচ্ছে। দুজনই কেমন যেন অপ্রকৃতস্থ। হাসছে একটু পরপর। কোনো কারণ ছাড়াই হাসছে।

এরা কারা আসলে? নানানরকম মানুষজন। কিন্তু সব আবার একরকম। কারা এরা? জানতে খুব ইচ্ছে হয় মুজাহিদের। সাহস করে টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একজনকে ডেকে আনে পেছনে। 'আপনারা কারা ভাই?'

'মানে?'

'মানে কইতাছি যে আপনেরা কারা? কী করেন সবতে?'

'আমি কিছু করি না। তবে এখানের সবাই লেখক। বড় বড় লেখক। আমি ইনাদের ভক্ত। তাই সাথে আসছি।'

ছেলেটা আবার চলে যায় টেবিলের পাশে। মুজাহিদও যায়। কিন্তু কিছুই মাথায় ঢোকে না। কীসব মাসনা-সুলাসা নিয়ে আলোচনা! আচ্ছা দেশের বর্তমান অবস্থা নিয়ে আলোচনা করে না কেন এরা? মাদকবিরোধী অভিযান নিয়ে কিছু বলে না কেন? ইসলাম ধর্মের বাইরে যারা আছে এদের নিয়ে কোনো চিন্তা হয় না এসব লেখকের? ও খুব করে চেষ্টা করে কিছু বুঝতে। কিন্তু সব মাথার উপর দিয়ে যায়। মুজাহিদের ঘুম ধরে প্রচুর। মাথার ভেতর ধপ ধপ করে বাজছে একটা লাইন–'আমি তো ভালা না, ভালা নিয়াই থাইকো।'

মুজাহিদ ঘুমাতে যায়। ঘুমিয়েও যায়। ঘুম থেকে উঠে খসরু ভাইয়ের ডাকে। এই লোকটা খুব খেয়াল রাখে ওর। সেহরির সময় হয়েছে। দ্রুত উঠে পড়ে মুজাহিদ। হাত মুখ ধুতে যায় কলে। নামাজের ঘরের সাথেই কল লাগানো আছে একটা। খেতে বসে চিন্তা করে লেখকরা কী খাবে? আদৌ কি কিছু খাবে? কিছু আছে তাদের? লেখকদের তো আবার খাবার-দাবারের ঠিক-ঠিকানা থাকে না।

মুজাহিদ উঁকি দিয়ে দেখার চেষ্টা করে। গোল টেবিল থেকে সবাই উঠে গেছে। চাদরের উপর বসেছে। বিরানি খাচ্ছে সবাই। বিরানি দেখে আবারো মন খারাপ হয় ওর। দেখতে দেখতে ফজর হয়ে যায়। লেখকদের দলটা নামাজের জন্য সামনের কাতারে দাঁড়ায়। দেখতে থাকে মুজাহিদ। এরা আবার কেমন লেখক? নামাজও পড়ে।

নামাজে দাঁড়িয়ে চিন্তা করতে থাকে মুজাহিদ। সদরঘাট থেকে কোথায় যাবে আগে? কাকরাইল যাওয়ার তো কোনো দরকার নেই। লঞ্চ থেকে নামলেই বাসা। তবুও যেতে হবে। নামাজের ভেতরেও মন খারাপ হয় ওর। ওদিকে লঞ্চ মুক্তারপোল ব্রিজ পার হয়ে এসেছে। আকাশ ফর্সা হচ্ছে।

পুনশ্চ : গত রমজানের এক রাতে আমরা ও আমি চাঁদপুরে গিয়েছিলাম একদল লেখকের সঙ্গে। আমার জীবনের অন্যতম একটা রাত ছিল সেটা। ভ্রমণপথের বর্ণনা আমি লিখতে বসেছিলাম বারকয়েক। এর মধ্যেই দেখলাম মাথায় একটা গল্প আসছে। তাই বলে ফেললাম। গল্পটা লিখতে গিয়ে মুজাহিদের মতো আমারও মন খারাপ করেছে বারবার।



(সিরাতালাপ)

তাঁর ওপর দরুদ ও শান্তির হোক বর্ষিত বর্ষণ

সালমান সাদ

এ যাবৎ কত গল্প বলে এলাম–শব্দে বাক্যে সত্য-মিথ্যার কত ফিরিস্তি পাড়া গেল–আজ একটু মুহাম্মদের গল্প বলি? এ যাবৎ যা লিখেছি তার মধ্যে নিশ্চয় এটি একটি শ্রেষ্ঠতম রচনা; রচয়িতার সামান্য সৃষ্টিগুণে নয়, যাঁকে নিয়ে রচনা তাঁর সুমহান মর্যাদার আবেদনে। যদি না-ই হয় তো বক্ষ্যমাণ লেখাটি লিখতে লিখতে এ অদ্ভুত সুবাস কোত্থেকে পাচ্ছি আমি? হৃদয়ের উদ্যানে কোত্থেকে ভেসে আসছে এ সুরভি?

শোনো মুহম্মদের কাহিনি!

কোনো এক গ্রীষ্মঋতুর দিনে, তিনি মসজিদে, তাঁর ধর্মবাণী প্রচারের বিশ্বকেন্দ্রে। মিম্বারে অধিষ্ঠিত মুহাম্মদ। উপবিষ্ট তাঁর বন্ধুরা, আদর্শিক পথচলার সনুজ সারথি যাঁরা। আরব উপত্যকা, গ্রামীণ এক পল্লী থেকে জনৈক এসেছেন মুহম্মদের শহরে। আল্লাহর বার্তাবাহক, তাঁর সাথে দেখা করতে। দূর-দূরব্যাপ্ত অন্ধকারের মধ্যে কোথাও আলোর পিদিম জ্বলতে থাকলে পথিক কেন সেখানে এসে দাঁড়াবে না? লোকটি এলেন, হাতে এক থোকা আঙুর। মুহম্মদের হাতে দিয়ে বললেন, 'আপনি এবং আপনার সঙ্গীদের ভালোবাসায়, ইয়া রাসুলাল্লাহ, নিবেদন।' মুহাম্মদ আলগোছে একটা আঙুর মুখে পুরলেন। কিছুক্ষণ

কী ভেবে তারপর আরেকটা তারপর আরেকটা তারপর... সবগুলো আঙুর নিজেই একটার পর একটা খেয়ে শেষ করে ফেললেন। যেন অনুমান হচ্ছে খুব রসালো পুষ্ট এই ফল। অন্য কাউকে দিলেন না। সাধলেন না খেতে।
সঙ্গীরা কিছুটা আশ্চর্যবোধক চোখে লক্ষ করছিলেন। কখনো তাঁর দরবারে এমন চিত্র তো ঘটে না! কেউ কিছু নিয়ে এলে সাহাবি সবাইকে বিলিয়ে দেন। প্রায়ই সামান্য কিছুও রাখেন না নিজের জন্য। গ্রামের সরল সহজ লোক তো ভারি খুশি! তাঁর আনা আঙুর নবির এতো পছন্দ হয়েছে! বাহ বা! খুশিমনে তিনি ফিরে গেলেন। রাদিয়াল্লাহু আনহুম।
তাঁর প্রফুল্ল প্রস্থানের পর সাহাবিদেরকে তিনি যেটা জানালেন, এই আঙুরগুলো আসলে ছিল মারাত্মক টক। তোমরা মুখে নেয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চিত, টকের ধাকে চোখমুখ বিকৃত করে ফেলতে, সেটা দেখে লোকটি বুঝে ফেলতো তার উপহারের খুঁত, মনে কষ্ট নিয়ে সে ফিরে যেত। তার আঙুর টক ছিলো, তার ইখলাস তো টক ছিল না!
আরেকদিন মুহাম্মদকে তাঁর একজন সাথি বললেন, 'হে প্রত্যাদিষ্ট, আপনাকে আমি ভালোবাসি।'
'সত্যিই কি আমাকে ভালোবাসো?'
'অবশ্যই, ও নবি, আপনার জন্য উৎসর্গিত হোক আমার জীবন।'
মুহাম্মদ স্মিত হাসেন। সে হাসি উজ্জ্বল মুক্তোর মতো দেখায়। বলেন–জলদ গম্ভীর মেঘের সুরে, যেন এক মহাকালের দিকে ফিরে ঘোষণা করছেন এই অলৌকিক মানুষ–'আমাকে যারা ভালোবাসো তারা জেনে রেখো, তারা তৈরি থেকো, অন্যেরা লোভের যে তীব্রতায় সম্পদের দিকে ছুটে যায়, বৈষয়িক দারিদ্র্য তোমাদেরকে তারচেয়ে তীব্রবেগে গ্রাস করবে। অনাড়ম্বর জীবনকে ভালোবাসো। অল্পে সন্তুষ্টি তোমাদের সকল চাহিদাকে সুখে তৃপ্ত করুক। শপথ আল্লাহর! আমার শহরের সবচেয়ে উঁচু পাহাড়টি ভরে স্বর্ণরৌপ্য চাকচিক্য আর ধনজৌলুসের স্তুপ আমি নিজের জন্য করে নিতে পারি। কখনো না, আমি গরিবদেরকে ভালোবাসি, গরিবদের মতো থাকতে ভালোবাসি, পুনরুত্থানের দিন আমি গরিবদের সাথেই থাকব।'
মুহাম্মদ বলেন, 'প্রকৃত ধনী তো আত্মায় ধনী। হৃদয়ের বিশালতায় যে মৌনমহান, অন্তরের প্রাচুর্যে ভরপুর যে ফকির।'
এই যে মুহাম্মদ। এই তাঁর জীবনবেদ। এই তাঁর দর্শন। না মুসলিম, না হিন্দু, না খ্রিষ্টান, না ইহুদি–ধর্ম-অধর্ম, গোত্রবর্ণ–সকল কিছুর ওপরে এই মহান মানবীয় দর্শনকে আমরা কেন পৃথিবীর সেরা দর্শন বলে মান্য করব না? আজকের গতিপ্রগতি, অস্থির পৃথিবী, দিশেহারা বস্তুবাদী জগতের প্রধান সমস্যার আসল সমাধানের বীজটি কি এই দর্শনের ভেতরেই লুকিয়ে নেই? বলো, আমরা কেন এই দর্শন বুকে নিয়ে পৃথিবীর প্রত্যেকটা মানুষের দ্বারে দ্বারে পৌঁছে যাব না?
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তাঁর ওপর দরুদ ও শান্তির হোক বর্ষিত বর্ষণ।

শিরোনামহীন গল্পের আসর | হাসিব ইমতিয়াজ

অনেক দিন পরে চিরচেনা এই শহরে আসলাম। জীবনের অনেক বড় একটা অংশ কেটেছে এখানে। এই শহরের পথ, মানুষ–তুমুল ভালোবাসায় কাছে টেনেছে বারবার। আর এখন আমি বহুদূর! ভুলে গেছি অনেক কিছু। তবুও খুব ইচ্ছে করে, তিতাসের পাড়ে আবার জমাই শিরোনামহীন গল্পের আসর, যখন ঢেউয়ে-ঢেউয়ে ভাঙতে থাকে চাঁদের আরশি–মৃদু হাসির কলরোল মিলিয়ে যাবে দূরের কাশবনে। কিন্তু সময় যে বড় কঠিন বাস্তবতা, হারিয়ে গেলে আর ফিরে আসে না।

ফিরতি পথে আরও কত কিছু মনে পড়ে! লিখতে পারি না। পথে-পথে ফেলে আসা স্মৃতির নির্দয় হাতছানি, বিমূর্ত মায়ার নির্ভেজাল টান; তবু দিনশেষে গোধূলির গোত্তা খাওয়া ঘুড়ির মতো ফিরে আসতে হয় দীর্ঘশ্বাসে ভরা জীবনের কাছে। সময়ের অফুরান ভালোবাসা বুকে তুমি আপন স্রোতে বয়ে যাও তিতাস। আসা-যাওয়ার এই ধারাবাহিকতা হয়তো খুব বেশিদিন থাকবে না, ব্যস্ত এই জীবনের বিরামহীন ঘূর্ণনে পেছনে তাকানোর সময়ও নেই, তবু আমার মনে থাকবে, জীবনের সবচেয়ে স্বর্ণালী অধ্যায়ের কথা। ভাষা পাওয়ার আগে মরে যাওয়া ভালোবাসার কথা। পরিচিত সেই অট্টালিকা, বিনম্র কোলাহল।

স্নেহ, শাসনের মধ্য দিয়ে বয়ে চলা কোমল সময় আর নির্মোহ ভালোবাসায় ভরপুর সেইসব প্রহর–আমি কখনো ভুলতে পারব না। আগামী কয়েকটি বছর খুব ব্যস্ত থাকব আমি, তবু তোমার সান্নিধ্যের একটি প্রহর বুকে আমৃত্যু প্রতীক্ষায় থাকব। দিনশেষে বিষণ্ন বিকেল, হু হু বাতাস, রক্তিম গোধূলি–নৈঃশব্দ্যের সুরে সুরে বয়ে যাওয়া বেলা, তুমি দূর আকাশের নির্লিপ্ত তারার মতো হারিয়ে যেতে থাকো দূরের কোনো পথে, বহুদূর!

অনেক কথা বলার ছিল তোমার সাথে। কষ্টের, যন্ত্রণার, মুগ্ধতার–যাপিতের কত কত গল্প জমিয়ে রেখেছি হৃদয়ের গোপন কুঠুরিতে। ইচ্ছে ছিল, এক-এক করে সব বলব তোমাকে। নিঝুম নীরবতা বয়ে গেল সময়, কিন্তু কিছুই তো বলা হলো না। কিছু কথা থাকে, যেগুলো চাইলেই বলে ফেলা যায় না। সেই না-বলতে পারার যন্ত্রণা বুকে প্রতিনিয়ত বেঁচে থাকতে হয়। না-বলা কথাগুলো শুধু নীরবে পোড়ায়। শেষ রাতের ক্ষয়ে যাওয়া চাঁদের মতো ক্ষীণ আলোর রেখা হয়ে বুকের ভেতর জ্বলতে থাকে বেদনা। এভাবে কত না-বলা কথা বুকে চাপা দিয়ে ফিরে আসি, ফিরে আসতে হয় প্রতিবার–তুমি হয়তো জানো না কিংবা জানবেও না কোনোদিন। এমনি, নিদ্রাহীন রাতের হাহাকারের মতো নিভৃতে কত স্বপ্ন ভেঙে যায়। কেউ জানে না। আমাদের আকাশে তারা নেই, মলিন চাঁদ বিকেলের চুপসে যাওয়া শাপলার মতো জেগে আছে ক্ষণিক। এই মধ্যরাতে কেউ জেগে নেই। আমি অলস হাতে বইয়ের পাতা ওল্টাই। পড়ায় মন বসে না। তোমার ছবিটা সামনে আসলেই মনটা হু হু করে ওঠে। বুকের ভেতর উথলে উঠতে থাকে অনিরুদ্ধ কান্না। নিজেকে বড় অসহায় লাগে। চারপাশে সব আছে, এতো কোলাহল–তবু যেন কেউ নেই, নিঝুম চারপাশ। নিশুতি রাতে মুঠো-মুঠো বিষাদ নিঃশব্দে বুকের ভেতর ঢুকে স্বপ্নগুলো এলোমেলো করে দেয়। কোত্থেকে যেন ছুটে আসে মেঘের দল। বিজলি চমকায়, প্রবল বাতাসের ঝাপটা এসে লাগে জানালায়। মনখারাপের এই দিনে অঝোর ধারায় বৃষ্টি নামলে বুকের ভেতর জমা হওয়া তুমুল হাহাকার হাসনাহেনার সৌরভে বিমোহিত অন্ধকারের মতো বাতাসে মিলিয়ে যায়।

লেখক : শিক্ষার্থী, জামিয়া ফরিদাবাদ, ঢাকা



সন্ত্রাস

তামীম আদনান

মুম্বাই, ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৯, রাত ০৩:৪৩

ধুপ ধুপ ধুপ...! দরজায় জোর আঘাতের শব্দে জেগে উঠল সাইফুল্লাহ। মাথাটা ঝিমঝিম করছে তার। মোবাইলের আলো জ্বালতেই সময়টা চোখে পড়ল। অবাক হলো খানিকটা। মুম্বাইয়ের মতো ব্যস্ত শহরেও এই সময়টাকে গভীর রাত বলা হয়। পুরো শহর ঘুমপুরিতে পরিণত হয়েছে। সিনেমা হলের শেষ শো দেখা মানুষগুলোও বিছানায় পিঠ ঠেকিয়েছে। অবশ্য কিছু চায়ের দোকান এখনও খোলা আছে নির্ঘুম রাত কাটানো নিশাচরদের জন্য। সারা রাতই হয়তো খোলা থাকবে খদ্দেরের চাহিদা মেটাতে। সেরকম একটি চায়ের দোকানের টুংটাং শব্দ আসছে সাইফুল্লাহর তিন তলার এই রুমে।

ধুপ ধুপ ধুপ...! দরজায় আরও একবার শব্দ হলো। এবারের শব্দটা আগের

বারের চাইতেও জোরে। অনাকাঙ্ক্ষিত এক আতঙ্ক ভর করল সাইফুল্লাহর মনে। সে কখনো ভাবতেও পারেনি, এরকম রাতও তার জীবনে আসবে।
ধুপ ধুপ ধুপ...! দরজায় আবার শব্দ হলো। হতেই থাকল। প্রথম দুবার একটা হাতেরই আঘাতের শব্দ হচ্ছিল। এখন একাধিক হাতের আঘাতের শব্দ আসছে। কিন্তু বোঝা যাচ্ছে না মূলত কতগুলো হাতের আঘাত সহ্য করে যাচ্ছে তার রুমের বিশ্বস্ত দরজা। দ্রুত নাম্বার ডায়েল করে বন্ধু ধারমিন্দরকে কল দিল সাইফুল্লাহ। ওপাশ থেকে যান্ত্রিক নারী কণ্ঠটা বেজে উঠতেই সজোরে খিস্তি দিল সে। এই শীতেও পুরো শরীর ঘেমে উঠেছে তার।
ধুপ ধুপ ধুপ...! 'নিকাল সালা! তেরে মা কি...! হামারা নিন্দ হারাম কারকে সুকুন সে সো রাহাহে? নিকাল!' আতঙ্কিত চোখে দরজার দিকে তাকিয়ে আছে সাইফুল্লাহ। যে কোনো সময় ভেঙে যেতে পারে সেটা। ওপাশের গালিগুলো গায়ে মাখার পরিস্থিতি এখন নেই। তার মাথায় এখন শুধু একটা কথাই ঘুরছে। 'পালাতে হবে।'

দিল্লি এক্সপ্রেস ট্রেন, ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৯

রাতের ট্রেনে দিল্লি ছাড়ছে খাদিজা। একটা অফিসের রিসেপ্টারের চাকরি করত এখানে। হঠাৎ করেই চাকরিটা হারাল আজ। কেবিনে নিজের সিটে বসে অপেক্ষা করছে ট্রেন ছাড়ার। 'আচ্ছা, বাকি দু'সিটেই কি পুরুষ যাত্রী?' হঠাৎ করেই প্রশ্নটা মাথায় এলো খাদিজার। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই প্রশ্নের উত্তরটা পেয়ে গেল সে। হ্যাঁ, দুজনই পুরুষ। দুজনের মাথাতেই এক বিশেষ দলের পতাকা বাঁধা। আতঙ্কে বুক কেঁপে উঠল খাদিজার। ওড়না দিয়ে পেঁচিয়ে ভালো করে মুখ ঢাকল সে। ট্রেন চলছে পুরোদমে। আচমকাই আরও দুজন প্রবেশ করল তাদের কেবিনে। সবার মাথায় একই পতাকা বাঁধা। এদের দেখে গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল খাদিজার। কিছুই ভাবতে পারছে না ও। ঘুরেফিরে একটা চিন্তাই আসছে মাথায়–এদের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে হবে।

কলকাতা, ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৯, রাত ১১:৪৭

'জাহানারা, কী হলো? দ্রুত করো!'
স্ত্রীকে তাড়া দিয়ে হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে সময়টা দেখে নিলেন ডা. খালিদ হাসান। যত দ্রুত সম্ভব বাড়ি থেকে বের হতে হবে। কিছুক্ষণের মধ্যেই হয়তো ওরা এসে পড়বে।
'তোমাকে সেই সকালেই বলে রেখেছি সবকিছু গুছিয়ে রাখতে। এখন রাত বারোটা বাজতে চলল। এতো কী নিচ্ছ ব্যাগে খোদাই জানেন।' গলা চড়িয়ে স্ত্রীর ওপর বিরক্তি প্রকাশ করলেন খালিদ হাসান।
'এই তো শেষ! চলো বের হই।' বোরকার নেকাব বাঁধতে বাঁধতে স্বামীকে বললেন জাহানারা।
আবাসিক এলাকা। মধ্যরাতের সুনসান নিরবতা বিরাজ করছে চারদিকে। নাম না-জানা কোনো এক পাখি ডেকে উঠল অদূরে। হয়তো কোনো অশনি সংকেত দিতে চাইছে সে। বাড়ি থেকে বের হয়ে অনেকদূর চলে এসেছে ডাক্তার দম্পতি। এই পথটা বিশ বছরের চেনা ডা. খালিদ হাসানের। তাই অন্ধকারে পথ চলতে এতটুকু কষ্ট হয়নি তাঁর। একইভাবে পরিচিত এলাকাটাও। তবুও আজ কেন যেন বড্ড অপরিচিত লাগছে সব।
পেছনে ফিরে বাড়ির দিকে তাকালেন ডা. খালিদ। বাড়ির সামনের স্ট্রিট লাইটের আলোতে স্পষ্ট দেখতে পেলেন, তাকে না পেয়ে একদল লোক তার বাড়ির উপর আক্রোশ মেটাচ্ছে। একধ্যানে সেদিকে তাকিয়ে রইলেন ডাক্তার সাহেব।
'কী হলো, চলো! এভাবে দাঁড়িয়ে কী দেখছ?' স্ত্রীর তাড়ায় ধ্যান ভাঙল খালিদ হাসানের। জবাবে ভাবলেশহীন কণ্ঠে বললেন, 'এতদিন দেবী বিসর্জন দেখেছি, আজ নিজ বাড়ি বিসর্জন দেখছি!'

গুজরাট, ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৯, সন্ধ্যা ০৭:০৫

সারাদিনের ক্লান্তি নিয়ে দেয়ালের সাথে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে অমি গৌতম। দেয়ালটা একটা কট্টরপন্থী হিন্দু রাজনৈতিক দলের অফিসের। দলের অফিসের সামনের খালি

জায়গায় জাগরণী সমাবেশ হচ্ছে হিন্দু যুবকদের নিয়ে। অমির একদমই মত ছিল না এরকম দলের সমাবেশে আসার। কিন্তু তার বন্ধু এই দলের একজন উল্লেখযোগ্য নেতা। তার জন্যই এখানে আসা। গতকাল কাশ্মীর সীমান্তে আত্মঘাতী হামলার প্রতিবাদে আজ সারাদিন মিছিল-মিটিংয়েই সময়টা পার হয়ে গেছে অমির। ক্লান্ত শরীরে বাড়ি ফেরার পথ থেকে একরকম টেনে-হিঁচড়েই এখানে এনেছে তার বন্ধু। ক্লান্তিতে রাজ্যের ঘুম এসে নামছে অমির চোখে। তন্দ্রায় দুচোখের পাতা এক হতে যাচ্ছিল মাত্রই। কিন্তু মাইকে বেজে ওঠা একটা কথা কানে বাজতেই চোখটা টানটান হয়ে গেল তার।
'আভি ওয়াক্ত জঙ্গ কা।' কেন্দ্রীয় সরকারি দলের এক নেতা প্রধান অতিথির ভাষণ দিচ্ছেন। 'যুদ্ধের সময় এসে পড়েছে। বাইরের শত্রুদের খতম করার আগে আমাদের মাতৃভূমিতে শান্তিতে বাসকরা শত্রুদের খতম করতে হবে।' এই কথা শুনে সকলেই একসাথে ভারত মাতা কি জয়ের স্লোগান তুলল। শুধু অবাক হয়ে ভাবছে অমি, জন্মের পর থেকে কত মুসলিমই তার বন্ধু হয়েছে, একসাথে চলেছে, এমনকি আজকের বিক্ষোভ মিছিলেও ছিল, কোনো সময় খারাপ ব্যবহারটা পর্যন্ত করেনি। সেই তারাই বিনা অপরাধে শত্রু হয়ে যাবে? মুসলমানদের যেই জিহাদকে তারা সন্ত্রাস বলে, তার সাথে এই নেতার 'জঙ্গ'-এর কোনো তফাৎ খুঁজে পায় না সে।

ঢাকা, বাংলাদেশ, ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৯, সকাল ০৮:২০

ছেলের বুঝ হওয়ার পর থেকেই নাস্তার টেবিলে তাকে নিয়ে পত্রিকা পড়েন বিশিষ্ট কলামিস্ট রুহুল আমিন। এখন তাঁর ছেলে ক্লাস নাইনে পড়ে। আজও তার রুটিনে কোনো পরিবর্তন হয়নি। দুদিন ধরে পাক-ভারত উত্তেজনা চলায় নাস্তার টেবিলে পত্রিকা হাতে নিয়েই আন্তর্জাতিক পৃষ্ঠা খুলে ছেলেকে শুনিয়ে শিরোনামগুলো পড়তে শুরু করলেন। 'সন্ত্রাসের ব্যাপারে কোনো ছাড় নেই, হামলার খেসারত দিতে হবে পাকিস্তানকে : মোদি'। নিচেই আরেকটা হেডলাইনে লেখা, 'ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে মুসলিমদের বাড়িতে হামলা, চলন্ত দিল্লি এক্সপ্রেস ট্রেনে এক মুসলিম নারী গণধর্ষণ'।
'আচ্ছা বাবা! সন্ত্রাসের সংজ্ঞা কী?' বাবার শিরোনাম পড়ার মাঝপথেই প্রশ্নটা করল রুহুল আমিন সাহেবের ছেলে সিয়াম।
'এতদিন ধরে পত্রিকা পড়িস, বিভিন্ন বই পড়িস অথচ এটাই জানিস না?' ছেলের প্রশ্নে যারপরনাই অবাক হয়ে বললেন রুহুল আমিন। এরপর উত্তরটা দিলেন, 'বে-আইনিভাবে নিরপরাধ কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর ওপর একা বা দলবল নিয়ে আক্রমণ বা হামলা করাই সন্ত্রাস।'
'তাহলে ধর্ম বা দেশপ্রেমের আবেগে নিরপরাধ মুসলিমদের ওপর যেই হামলাগুলো হলো সেটাকে কেন জঙ্গি হামলা বলা হচ্ছে না? নাকি 'জঙ্গি' নামের পোস্টারটা শুধু মুসলমানদের পিঠেই লাগানোর নিয়ম?'
ছেলের এই প্রশ্ন শুনে কলামিস্ট রুহুল আমিন লা-জাওয়াব হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন ছেলের দিকে। এরপর বললেন, 'তাড়াতাড়ি নাস্তা শেষ করো! ক্লাসের সময় হয়ে যাচ্ছে!'



(ছোটোগল্প)

জনকের কান্না

আহমাদ সাব্বির

নাজমুল হায়দার একা বসেছিলেন সার্কিট হাউজের চওড়া বারান্দার একেবারে শেষ কোণে। বারান্দার আলো-আঁধারিতে তাকে বেশ রহস্যময় মনে হচ্ছিল। এমনিতেও তাকে যখন দিনের আলোতে হাসি-ঠাট্টার কোনো মজলিসে আবিষ্কার করে উঠি, সেই মউজ মস্তির পরিবেশেও তাঁকে–আমাদের নাজমুল হায়দার সাহেবকে–বেশ রহস্যময় মনে হয় আমার কাছে। এই সেদিনও–রংপুর থেকে যখন আমরা এক মাইক্রোবাসে করে ফিরছি–সেই শেষ বিকেলে আলম সাহেব আমার কানের কাছে ফিসফিসিয়ে বলে উঠলেন, 'শামীম ভাই, নাজমুল ভাইরে দেখসেন? তারে দেখলেই আমার শরীর কেমন শিউরে উঠে!'

আমি কপট রাগত দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকাই। বলি, 'এ কেমন কথা আলম সাহেব! নাজমুল ভাইয়ের মতো একজন মানুষ-যে কিনা কারও সাতে-পাঁচে থাকে না–তাঁর ব্যাপারে আপনার এ কেমন মন্তব্য!' আলম সাহেব বলে চলেন, 'এইটাই তো সমস্যা! সে সারাদিন কেমন ভ্যাবদা মাইরা বইসা থাকে। অফিসে কারও সাথে কথাবার্তা তেমন কয় না। এমন হইলে তারে দেইখা কেমন কেমন লাগব না?'

আমি জানি, নাজমুল হায়দার একটু নির্ঝঞ্ঝাট থাকতে পছন্দ করেন। কিন্তু তিনি কি জানেন না, বর্তমান সময়ে ঝামেলাহীন থাকার চেষ্টাটাই একটি বাড়তি ঝামেলা? আমি নিশ্চুপে নাজমুল সাহেবের সামনে গিয়ে দাঁড়াই। তাঁর

পাশে একটি চেয়ার খালি পড়ে আছে; চাইলেই বসতে পারি। কিন্তু আমি বসি না, দাঁড়িয়েই থাকি। বৃটিশ একটি এনজিওতে কর্মরত আমি, নাজমুল হায়দার ও আরও কতিপয়। স্বাস্থ্য উন্নয়ন-মূলক একটি প্রজেক্টের তদারকিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত আমরা। বছরভর টেকনাফ-তেঁতুলিয়া করি। প্রথম প্রথম ভালোই লাগছিল। দেশটাকে দেখছি, প্রতিদিন নতুন শহর, নতুন অঞ্চল, নতুন নতুন গ্রাম, মেঠো পথ, মাঠ প্রান্তর! ভাবতাম কত্ত কী আছে দেখার এ দেশে! যা দেখতাম তাতেই মুগ্ধ হতাম। বন্ধুরাও ঈর্ষায় পুড়তো। বলতো, 'কী দারুণ চাকরি জুটিয়ে নিয়েছিস একখান! প্রতিদিন নতুন জায়গায় ভ্রমণ!' মুগ্ধতার নদী চিরকাল একই গতিতে বহমান থাকে না। এক সময়ে আমারটাও শুকিয়ে এলো। এখন কেবল কাজের তাগিদেই ছোটি। ভেতরে আর কোনো আকর্ষণ–যা প্রথম জীবনে ছিল–অনুভূত হয় না।
আমার ঠিক বছর দুয়েক পর এ চাকরিতে আসেন নাজমুল হায়দার সাহেব। বয়েস আমার চেয়ে খুব বেশি হবে না। চুল-গোফ এর মধ্যেই পাকিয়ে ফেলেছেন।
চেয়ার টেনে নাজমুল সাহেবের পাশে বসলাম। লক্ষ করলেন না, আনমনে আগের মতোই চেয়ে রইলেন। সত্যিই, আশ্চর্য মানুষ তিনি! কতকাল একসাথে চাকরি করছি, অথচ তার ব্যক্তিজীবন সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না। কতজন সদস্য নিয়ে তাঁর সংসার, ছেলেমেয়েরা কোথায় কী করে, কেমন তারা? কিছুই না। অথচ এসব নিয়ে এই আমরাই পরস্পরে হারহামেশা আলাপচারিতায় মেতে উঠছি। তিনি সে আলাপচারিতায় অংশীদার হন বটে, তবে কেবলই শ্রোতার চরিত্রে। কখনও-সখনও কারও বেখাপ্পা মন্তব্যে ফর্সা অবয়ব জুড়ে এক চিলতে হাসি ফুটিয়ে তোলেন শুধু। স্বল্প-বাক এ মানুষটি আমার বেশ পছন্দের, সেই চাকরিতে ঢুকেছেন যেদিন তার দিন কতক পর থেকেই। বহুবার ঘনিষ্ঠ হতে চেয়েছি, কিন্তু তিনি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ হাসি দিয়েই এড়িয়ে যেতেন। বুঝে নিই, একা থাকাতেই তাঁর স্বাচ্ছন্দ্য। আমিও তাই তাঁকে আর বিশেষ ঘাটি না। স্রেফ কাজের কথাই বিনিময় হতে থাকে তাঁর সাথে আমার ও অন্যদের। কিন্তু আজ, এই এতদিন বাদে, সার্কিট হাউজের চওড়া বারান্দার শেষ কোণে তাঁকে একদমই একা বসে থাকতে দেখে হৃদয়ের গহীন ভেতরে কেমন যেন একটা নিঃসঙ্গতা বোধের অনুভূতি সঞ্চারিত হলো, হু হু করে কেঁপে উঠল যেন অন্তরের কোথাও! ফলে অতঃপর এই আমি বর্তমানে তাঁর পাশের চেয়ারটিতে বসে আছি।
'রাত তো অনেক হলো, ঘুমোতে যাবেন না, নাজমুল ভাই?' অকস্মাৎ এ আহ্বানে চমকে উঠলেন যেন! নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, 'বাকীরা শুয়ে পড়েছে?' আমি সম্মতিসূচক মাথা নাড়ি। বলি, 'হ্যাঁ, শুয়ে পড়েছে। শুনেছেন? আগামীকালের সিডিউলে কিছু পরিবর্তন এসেছে। আমরা কাল থেকে যাচ্ছি।' নাজমুল সাহেব আমার কথায় বিশেষ কর্ণপাত করছেন বলে মনে হলো না।
'ভাই, আপনি এতো কী ভাবেন, বলেন তো? সারাদিন কেমন যেন নিশ্চুপ, নিথর হয়ে থাকেন! এভাবে থাকতে কষ্ট হয় না? আমরা তো কথা ছাড়া থাকতেই পারি না।'
প্রতি উত্তর করেন না নাজমুল সাহেব। কেবল সেই পুরোনো হাসিটাই ঝুলিয়ে দেন দু'ঠোঁটের কোণে। আমি এ সুযোগে আরও ঘনিষ্ঠ হবার প্রয়াসী হই, বলি, 'ভাই, আমাকে খুলে বলেন তো সমস্যা কী? পাঁচ বছর হতে চলল একসাথে আছি। আপনাকে দেখলেই বুঝি, ভেতরে গভীর কোনো ক্ষত বয়ে বেড়াচ্ছেন! ছোট ভাই ভেবে আমাকে বলতে পারেন। কী, বাসায় কোনো সমস্যা? আজ আপনাকে আরও বেশি ম্রিয়মাণ লাগছে।'
বারান্দাতে আলো ছিলো সামান্যই। দ্বাদশীর চাঁদ নীলাভ আলো ছড়িয়ে দিয়েছে প্রকৃতির বুকে। সে আলোর ঝলকানি খানিক নাজমুল সাহেবের মুখে এসেও পড়ছে। দেখলাম তাঁর চোখের কোণ চিকচিক করছে। চোখের কোণ ভিজিয়ে দিয়ে অশ্রুকণা তাঁর ফর্সা রক্তিম গণ্ডদেশে এসে ভোরের শিশির বিন্দুর মতো ঝলমলিয়ে উঠল।
নাজমুল ভাই কি কাঁদছেন? গড়িয়ে পড়া অশ্রুকণা হাতের তালুতে মুছে নিলেন। বললেন, 'ভাই, মেয়েটার কথা খুব মনে পড়ছে। একটাই মেয়ে ছিল।'
'ছিল মানে! কি বিয়ে হয়ে গেছে?'

'হুম!'

'তাহলে আগামীকাল ছুটি নেন না কেন? ছুটি নেন! মেয়েকে দেখে আসেন! সন্তানের মায়া বড় কঠিন জিনিসরে ভাই! চোখের দেখা না হওয়া অবধি এ মায়া কাটবে না। বেড়েই চলবে শুধু!'

ছোটমানুষ বড়দের সমুখে ভুল কিছু বলে ফেললে বড়োরা যেভাবে প্রশ্রয়ের চোখে তাকায়, নাজমুল ভাই আমার দিকে সেভাবে যেন তাকালেন। তাঁর দৃষ্টিপাতই বলে দিচ্ছে, আমি অযাচিত কিছু বলে ফেলেছি। অল্প সময় পর চোখজোড়া নামিয়ে নিলেন। দৃষ্টি আবারও ছড়িয়ে দিলেন দূরে; সার্কিট হাউজের দেয়াল ঘেঁসে যে বড় সড়কটি চলে গেছে তার দু'পাশ ধরে নদীর বুকে।

আমি আর নাজমুল ভাই, রাতের আলো-আঁধারিতে সার্কিট হাউজের এই বারান্দায় দুটি মাত্র প্রাণী বসে আছি। দু'জনই চুপ। ঈষৎ তেড়ছা হয়ে আমাদের দীর্ঘায়িত ছায়া সমুখের দেয়ালে আছড়ে পড়েছে। উভয়ের ছায়ার দিকে তাকিয়ে আছি। এভাবে কেটে গেল কিছুটা সময়। অকস্মাৎ নাজমুল ভাই কথা বলে উঠলেন; অতঃপর তিনি বলেই চলেন, 'ও তখন খুব ছোট, যখন ওর মা মারা যায়। আমার বয়েসও তখন খুব বেশি না। বন্ধুরা বলেছিল আবার বিয়ে করতে, মেয়েটার মুখের দিকে চেয়ে করলাম না। নতুন মা ওকে কষ্ট দেয় কিনা। নিজে কোলে-পিঠে করে বড় করেছি। সে সময়ের চাকরিটা ছোট ছিল। ওই ছোট সাধ্যের মধ্যেই মেয়েটার সবটুকু শখ-আহ্লাদ পূরণ করতে চেয়েছি। ভাল ছিলাম; বাবা-মেয়ে বেশ সুখেই ছিলাম। ও দেখতে ওর মায়ের চেয়ে সুন্দর হয়েছিল। পড়াশোনাতেও ছিল বেশ।'

নাজমুল ভাই থামলেন। তার গলা কেমন ধরে এসেছে। বুঝলাম, কান্না চাপতে তাঁর বেশ বেগ পেতে হচ্ছে। আলতো করে ডান হাতটা তাঁর কাঁধে রাখলাম। হাতের তালুতে চোখের কোণ মুছে নিলেন। আমি বললাম, 'নাজমুল ভাই, তারপর?'

'একদিন অফিস থেকে বাসায় ফিরে আমার টেবিলে ভাঁজ করা একটি কাগজ পাই। খুলে দেখি–আমার মেয়ে–সাদিয়ার চিঠি। প্রথমে ভাবলাম বান্ধবীর বাসায়-টাসায় গেছে হয়তো। পড়ে দেখি সাদিয়া লিখেছে, আবির নামে কোন ছেলেকে সেদিন সকালে সে বিয়ে করেছে। ছেলে জার্মানি থাকে। ফেসবুকে যোগাযোগ; কেবল সাদিয়াকে বিয়ে করতেই দেশে এসেছে। রাতেই তারা জার্মানি ফিরে যাবে।'

নাজমুল ভাইয়ের কথার মাঝেই আমি চিৎকার দিয়ে উঠলাম–'আশ্চর্য! আপনি তার বাবা। কত কষ্টে বড় করেছেন! একটিবার আপনাকে জানানোর প্রয়োজন মনে করলো না?'

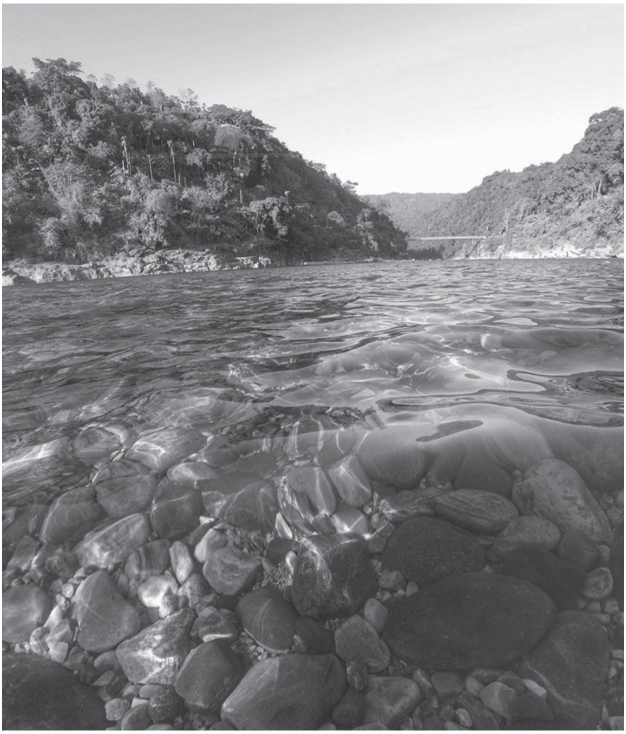
'ওর ভয় ছিল, আমাকে জানালে হয়তো রাজি হবো না।'

'তারপর? খোঁজ নেননি আর?'

নিয়েছিলাম। আসলে ছেলেটা একটা ফ্রড; দালাল ধরনের ছিল। বিদেশে মেয়ে সাপ্লাই দেয়। আমার মেয়েটা গিয়ে ওর খপ্পরেই পড়ল।'

আমাকে অবাক করে দিয়ে ছোট্ট বাচ্চার মতো হাউমাউ করে কেঁদে উঠলেন নাজমুল হায়দার সাহেব। তাঁকে থামানোর কোনো চেষ্টাই আমি করলাম না। নিথর, নিশ্চুপ হয়ে বসে থাকি কেবল তাঁর পাশের চেয়ারটায়। আসলে এমন পরিস্থিতিতে লাগসই ভাষা আবিষ্কার করে ওঠা আমার জন্য একটু কষ্টকরই বটে! আমি বরং আমার চোখের আর্দ্রতা হাতের তালুতে শুঁষে নিতে মনোযোগী হই।

ফরিদাবাদ, ঢাকা



একটি অবিস্মরণীয় ভ্রমণনামা

হুসাইন আল হাফিজ

ঘুম ভেঙে চোখের পাতা মেলে থাকাতেই মাথায় ভর করল অদেখা সৌন্দর্যের অভিনব জল্পনাকল্পনা। বিছানা ছেড়ে জানালার পর্দা সরিয়ে দেখি সকালের পিঠ বেয়ে টপ টপ করে ঝরে পড়ছে কুয়াশা। চারপাশে সাদা সাদা তুলোর ওড়াউড়ি যেন। উপচে পড়া সাদা কুয়াশা ভেদ করে হঠাৎ লাল সূর্যের আভা মধুরতা ছড়িয়ে দিল মনের কোণে।

আত্মার জন্য যেমন দরকার খাদ্য, প্রয়োজন মানসিক অক্সিজেন, চেতনার জন্য দরকার বিদ্যুৎ, তেম্নি মনের জন্য দরকার প্রেরণা ও প্রাণশক্তি। আত্মা, চেতনা ও হৃদয়ে আলোর দোলা লাগাতে প্রয়োজন প্রসারিত জীবনদৃষ্টি; উদ্যম ও উচ্ছ্বলতা। সীমানার পাচিল ও সীমাবদ্ধতার বেষ্টনির ভেতর সেই উদ্যম ও উচ্ছ্বলতার নদী শুকিয়ে যায়। জীবনকে তাই জগতের বিস্তৃত অঙ্গন থেকে নবশক্তিতে করতে হয় শক্তিমান।

সে লক্ষ্যেই পর্যটকরা বেরিয়ে পড়েন পর্যটনে, অভিযাত্রীরা অভিযানে। আজ আমরা পর্যটনে যাবো, ভাবতেই কেমন যেন ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠলো মৃদুহাসির আভা। সৃষ্টিকর্তার বিচিত্র সৃষ্টির মধ্যে ছড়ানো-ছিটানো

অসংখ্য রহস্য, নিদর্শনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন, সৃষ্টির মধ্যে লুকিয়ে থাকা স্রষ্টার প্রজ্ঞা ও বিস্ময়কর বৈচিত্রকে আবিষ্কারের পর্যটন ছিল এটি। এ পর্যটনে যখন কেউ সফল হয়, তখন আল্লাহর কুদরতের নির্দশন অবলোকন করে। কবির কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে ঘোষণা করে–'বিচিত্র সৃষ্টির মাঝে আমি আল্লাহকে দেখেছি।'
পুরোটা ভ্রমণ উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং আনন্দে টইটুম্বুর ছিল। শুরু হয়েছিল ভোরে; সিলেট উপশহর থেকে আমরা ক'জন মিলে একটি অত্যাধুনিক গাড়ি করে যথাসময়ে রওয়ানা হলাম। কাফেলার গন্তব্য ছিল বাংলাদেশের বিখ্যাত পর্যটনস্পট জাফলং। আমাদের গায়ে ছিল একই রঙের সাদা পোশাক। পোশাকের শুভ্রতা একটি পবিত্র আমেজ ছড়িয়ে দেয় মনের কুটিরে। ইসলামি সংগীত, মার্জিত ও রুচিশীল সাংস্কৃতিক উপস্থাপন যাত্রাপথে অন্যরকম এক অনভূতি এনে দেয়। দর্শনার্থীদের মধ্যে মুগ্ধতা ছড়িয়ে আমাদের কাফেলা ছুটে চলে গন্তব্যপানে। সূর্যাস্তে সাক্ষী হওয়া গাছগুলো ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে, বাতাসের পালক সরিয়ে, বাস নয়, যেন ছুটে চলল এক উড়োজাহাজ, রূপকথার পঙ্খিরাজ ঘোড়ার মতো। বাংলার চিরসবুজ সুন্দর মাঠ পেরিয়ে একসময় গাড়ি তার ঊর্ধ্বশ্বাসের পাখাগুলো থামিয়ে স্থির হয় জৈন্তাপুর বাজারে। তখন নতুন পরিবেশ ও প্রকৃতির সাথে খানিকটা বন্ধুত্ব জমে ওঠে। জীবন তো কেবল বাঁক ঘোরে নদীর মতো পৌঁছায় মোহনায়। বন্ধুরা মিলে সেন্টারফ্রেশ চিবোতে চিবোতে নির্দয়-পাষাণের মতো আবারো স্বপ্নাচ্ছন্ন গাড়িতে সওয়ার হয়ে ছুটে চলি গন্তব্যের দিকে, বিরল এক সৌন্দর্যের আহ্বানে।
নিসর্গের অপরূপ-রূপ চোখে মেখে মেখে আমরা নামলাম জাফলং বাসস্ট্যান্ডে। দাঁড়াতেই প্রকৃতির সৌন্দর্য এসে বাসা বাঁধলো চোখে। শুরু হয় অভিযান, প্রকৃতি পাঠের অভিযান। স্রষ্টার শ্রেষ্ঠত্বকে অনুধাবন করার অভিযান। যেন একদল চাতক পাখি বসে গেছে মেঘের তলে। সারিবদ্ধভাবে একই পোশাকে আমরা নেমে পড়ি সকলে, পাহাড়িয়া পথ ধরে। অগণিত মানুষের কোলাহলে মুখর পর্যটনস্পটে সৌন্দর্যের পসরা সাজানো, এক দিকে ভারত একদিকে বাংলাদেশ–যেন পরস্পরের সাথে হাত মিলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সারি সারি পাথর, অগণিত বৃক্ষ, টিলা, পাহাড়, ঘন সবুজের বিস্তার আর স্বচ্ছ নদীর জলস্রোত–সব মিলিয়ে ছবির মতো সবকিছু। দুঃখ শুধু, পর্যটন খাতকে সুপরিকল্পিতভাবে বিকশিত করার উদ্যোগের অভাব।
জাফলং দেখা হলো। জাফলং পর্ব সেরে রওয়ানা দিলাম পর্যটনস্পট জাকারিয়া সিটির উদ্দেশে। একসাথে পরিদর্শন করি পুরো পরিসর। অতঃপর সেখানকার মসজিদে আসরের নামাজ আদায় করি আমরা। চোখে মুখে অফুরন্ত মুগ্ধতার আবহ নিয়ে প্রত্যাবর্তন করি নিজ আবাসের দিকে। পথে পথে রুচি ও প্রগতির সমন্বয়ে বিনোদনের অসাধারণ প্রদর্শনী হলো। এভাবে সেদিনকার ভ্রমণ হয়ে উঠল একটি উন্মুক্ত পাঠশালা। প্রেরণার এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়।

জকিগঞ্জ, সিলেট

ভালোবাসার অন্য রঙ

আবিদা সুলতানা উমামা

‘আচ্ছা আপু, একটা মানুষকে কি একই সাথে ঘৃণা করা এবং ভালোবাসা যায়?’
মেয়েটার প্রশ্ন শুনে আমি অবাক হলাম। মাথায় হাত বুলিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, ‘এতোটুকুন একটা প্রাণ, কাকে এমন ঘৃণা করে?’
বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, ‘জানো আপু, আমি আমার আব্বুকে খুব ভালোবাসতে চাই। পারি না।’
ছাদের রেলিংয়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম। ওর কথা শুনে সোজা হয়ে ওর দিকে তাকালাম। মাথা নিচু করে পায়ের বুড়ো আঙুল মেঝেতে ঘষছে। আমি তাকিয়েই রইলাম ওর দিকে। শুনেছি সুন্দরী মেয়েরা অকারণেও হাসে। সদ্য কৈশোরে পা দেয়া এই মেয়েটা অতিমাত্রায় সুন্দরী। কিন্তু কোনো এক অজানা কারণে সে খুব একটা হাসে না। হাসলেও ঠোঁট দুটো সামান্য প্রসারিত করে আবার মিলিয়ে ফেলে। আমাকে তাকিয়ে থাকতে দেখে তেমনিভাবেই একটু হাসল। কী যেন আছে হাসিটার মধ্যে। আমি সামান্য ভ্রু কুঁচকালাম। ও আবার বলতে শুরু করল, ‘শুধু টাকা ঢাললেই বাবা হওয়া যায় না, জানো? টাকায় সব হয়-কথাটা মিথ্যে। সুখ হয় না। স্নেহ পাওয়া যায় না। পাওয়া যায় খোঁচানো কথা–মাসে মাসে কত খরচ করি তোমাদের পেছনে, সে তোমরা কী বুঝবে? বিশ্বাস করো আপু, একমাত্র মেয়ে হিসেবে আমি কোনোদিন কোনো কিছুর আবদার করিনি। শুধু চেয়েছি আব্বুর একটু স্নেহ, একটু ভালোবাসা। আমার মনে পড়ে না আব্বু কখনো আমাকে আদর করে নাম ধরে ডেকেছে কি না! আমি এতো নামি স্কুলে পড়তে চাইনি, এসির নিচে থাকতে চাইনি, শুধু আব্বুকে কাছে পেতে চেয়েছি।’
একনাগাড়ে অনেকগুলো কথা বলে একটু বিরতি নিলো মেয়েটি। আমি কিছু বললাম না। আমি জানি এখন ও মন হালকা না হওয়া পর্যন্ত কথা বলবে। হলোও তাই। আবার বলতে শুরু করলো, ‘দামি দামি ড্রেসে কি আব্বুর ভালোবাসা থাকে আপু? থাকে ঔদ্ধত্য–দেখেছো তোমাকে কত ভালো রেখেছি। এমন কৃত্রিম ভালো থাকা আমি চাইনি। আব্বু মাসের পর মাস বাসায় আসে না, কেবল কাড়ি কাড়ি টাকা পাঠায়। শেষ কবে ভালো আছি কি-না জিজ্ঞেস করেছে কে জানে! অথচ তোমাকেই দেখো! তোমাদের আব্বু প্রতি সপ্তাহে সপ্তাহে বাড়িতে আসে, তবু তোমরা চারবোনই ফোনে, ভিডিও কলে কত কথা বলো। আনন্দে থৈ থৈ করো!’
এই পর্যন্ত বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল সে। ওর শেষের কথায় আমার ছোটবেলার কথা মনে পড়ে গেল। তখন আমরা ঢাকায় থাকতাম। আব্বু ব্যবসায়ী হওয়া সত্ত্বেও শত ব্যস্ততার মাঝেও আমরা তাঁকে প্রতিদিনই কাছে পেতাম। তবে শুক্রবারে একটু বেশি পেতাম। শুক্রবারগুলোতে আব্বু বেশ বেলা করে ঘুম থেকে উঠতেন। আব্বুকে গঠানোর দায়িত্ব আঞ্জাম দিতাম আমরা চারবোন।
আমার তখন সবে ন'বছর বয়স। বাকি তিনজন আরও ছোট ছোট। এক শুক্রবার সকালে চারজন চারবার আব্বুকে ডেকে দিয়ে গেছি, তবু আব্বু ওঠে না। ঘুম ভেঙে গেছে, তবু চোখ বন্ধ করে শুয়ে ছিল। সবচেয়ে ছোট বোনটা ছিল চার বছরের। ও আব্বুর পিঠে উঠে বসল। আর বলতে লাগল, ‘আম্মু রান্নাঘরে রুটি বানাচ্ছে, আমরা আব্বুকে রুটি বানাবো।’ যেই ভাবা সেই কাজ! রুটির খামিরের মতো আব্বুর হাত

আর পিঠ মলতে শুরু করলো। সাথে আমি আর আমার সেজো বোন।
মেজো বোন মাহবুবার বয়স তখন ছয় কি সাত! ও হুট করে আম্মুর রুটি ছ্যাঁকার খুন্তি এনে আব্বুর বাহুতে লাগিয়ে দিয়ে বলে বসল, 'মাসনুনা, তুই রুটি বানা, আমি ছ্যাঁকছি।'
আব্বু যন্ত্রণায় আঃ শব্দ করে উঠে বসে গেলেন। মাহবুবা প্রথমে বুঝতে পারেনি, আব্বুকে উঠে বসতে দেখেও ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থাকল।
এদিকে আব্বুর শব্দ শুনে দাদু পাশের রুম থেকে এসে দেখেন, আব্বু হাসছে। মাহবুবার হাতে খুন্তি দেখে দাদু ঘটনা আঁচ করতে পারলেন। আব্বুকে বললেন, 'এদেরকে তুমি আদর করে করে মাথায় তুলেছ। কোথায় ধমক দেবে, তা না করে হাসছো!'
আব্বু হেসে বললেন, 'আম্মা, ও তো বুঝতে পারেনি। বুঝলে কি এখানে দাঁড়িয়ে থাকত? সামান্য এটার জন্য আমি ধমকালে তো ওরা আমার কাছে আসতেই ভয় পাবে।' দাদু আর কিছু বললেন না। কিন্তু আমি সেদিন বুঝতে পেরেছিলাম, বাবারা এমনই হন। নিজের যন্ত্রণার চেয়ে সন্তানের চিন্তাই তাঁদের কাছে প্রাধান্য পায়।
চুপচাপ দাঁড়িয়ে ঘটনাটা কল্পনা করছিলাম। পাশে যে কেউ আছে ভুলেই গিয়েছিলাম। সম্বিৎ ফিরে পেতেই মেয়েটার দিকে তাকালাম। জিজ্ঞেস করল, 'কী ভাবছো?'
বললাম, 'তুমি বড্ড অভিমানী। পাগলী মেয়ে, সবাই কি একরকম হয়? একেকজন ভালোবাসার প্রকাশ একেকরকমে করেন। তোমার আব্বুও তোমাকে ভীষণ ভালোবাসে।'
'আমাকে সান্ত্বনা দিচ্ছ?
'না রে পাগলী! এটাই সত্যি। দিনশেষে সব বাবাই তাঁর সন্তানকে ভালোবাসেন। তাঁদের সমস্ত কিছু সন্তানের জন্যই। সন্তানের ভালো থাকাই তাঁদের একমাত্র প্রার্থনা।'
'কিন্তু আমি তো ভালো নেই আপু।'
'তুমি কতোটা ভালো আছো, তুমি জানো না। কখনো বাবার দিক থেকে ভেবে দেখেছ, তিনি কী চান? কখনো বাবা বাসায় আসলে হাসিমুখে দরজা খুলে বাবা বলে জড়িয়ে ধরেছো? জানো, আমরা রোজ রোজ আব্বুকে দেখতে পেতাম। তবু প্রতিদিন আব্বু কলিং বেল দিলেই ছুটে যেতাম কে কার আগে দরজা খুলতে পারে...। এখনো বৃহস্পতিবার রাতে জেগে থাকি আব্বুর ফেরার অপেক্ষায়।'
'তোমার আব্বু তো অনেক রাতে ফেরে।'
'বৃহস্পতিবারে শুধু আব্বুর অপেক্ষায় ঘুমাই না। এই যে জেগে থাকি, এই ব্যাপারটাই আব্বুকে সুখের একটা অনুভূতি এনে দেয়। আব্বুর চোখে মুখে আমি আনন্দের ঝিলিক দেখতে পাই।'
'কিন্তু আমার আব্বু তো মাস পেরোনোর আগে বাসায়ই আসে না।'
'এইবার আসলে তুমি এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দেবে। হাসিমুখে সালাম জানাবে। তোমার বাবা খুশি না হয়ে পারবেনই না।'
'এটা তো সাময়িক।'
'তাহলে স্থায়ী করে নেবে। নিজে কুশল জিজ্ঞেস করবে। বাবার কী লাগবে, কী চাইছে সব নিজ হাতে করে দেবে। ঠিকঠিক দেখো, বাবার মনে জায়গা করে নেবে। এরপর থেকে দেখবে বাবাও তোমাকে সময় দিচ্ছে। তোমার কাজ, তোমার শ্রদ্ধাবোধ তাঁকে অবশ্যই স্পর্শ করবে। তখন দেখবে তোমার অভিযোগের সুযোগই থাকবে না।'
আমি কখনো এভাবে চিন্তাই করিনি যে, আমারও কিছু করার থাকতে পারে। আসলেই, আমিই তো কখনো নিজ থেকে আব্বুর সাথে সহজ হইনি। তুমি ধরিয়ে না দিলে হয়তো বুঝতেই পারতাম না। হ্যাঁ, আব্বু সত্যিই আমাকে ভালোবাসেন। আমিই বুঝতে পারিনি।'
'এই তো বুঝে গেলে।'
সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে দেখে তাড়া দিলাম, 'চলো! ঘরে চলো।'
'এক মিনিট দাঁড়াও।' বলেই মেয়েটা আমাকে জড়িয়ে ধরলো। ত্রিশ সেকেণ্ড পরে সরে দাঁড়িয়ে মিষ্টি একটা হাসি দিলো। এই হাসি আর সাথে সাথেই মিইয়ে গেল না। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে লক্ষ করলাম, মেয়েটার হাসি খুব সুন্দর। এমন মুক্তোঝরা হাসির বর্ণনায়ই বোধহয় বলা হয়েছিল– 'ইয়াফতাররু আন লুঅ্লুইন আন রাতবিন ওয়া আন বারদিন।'

বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী



ঝরে পড়া ফুল

নাঈমুর রহমান নাহিদ

সাঈদ পেশায় ফটোগ্রাফার। ছবি তোলার জন্য রাতের নির্জন শহরটা তার বেশ প্রিয়। এই সময়টায় ফ্ল্যাডলাইটের আবছা হলদে আলোর সঙ্গে রাতের অন্ধকারের একটা নীরব যুদ্ধ চলে। অপরূপ এক পরিবেশ তৈরি হয় তখন। এইরকম বিচিত্র দৃশ্যকে নিজের ক্যামেরায় বন্দী করতে প্রতিদিন রাতে বেরিয়ে পড়ে সাঈদ। ক্যামেরাটা গলায় ঝুলিয়ে ঘুরে বেড়ায় বিভিন্ন পার্ক, উদ্যান কিংবা রাস্তার ধারে ফুটপাত দিয়ে। এই সময়টায় অনেক পথশিশুকে দেখা যায় ফুটপাতে পাতলা চাদর গায়ে ঘুমিয়ে থাকতে। সাঈদ সেসব শিশুদের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়। এই শক্ত ইটের তৈরি ফুটপাতে কী প্রশান্তি নিয়ে ঘুমোচ্ছে ছেলেগুলো। অথচ আমাদের নরম বিছানায় শুয়েও ঘুম আসে না বলে ঘুমের ওষুধ খেতে হয়। ডিপ্রেশন নামক আধুনিক রোগে ভোগে সবাই। সত্যি, কী বিচিত্র এই পৃথিবী। কী বিচিত্র মানুষের জীবনযাত্রা।

প্রতিদিনকার মতো আজও সাঈদ ক্যামেরাটা গলায় ঝুলিয়ে রাতের শহরের ফুটপাত ধরে হাঁটছিল। কখনো থেমে কোনো বন্ধ দোকানের সামনে জ্বলতে থাকা লাল বাল্বের গায়ে উড়তে থাকা পোকাদের ছবি তোলে। কখনো

আবার দূর থেকে আলো-আঁধারের মাঝে দাঁড়িয়ে থাকা কোনো সত্ত্বার ছবি তোলে। হঠাৎ ফ্ল্যাডলাইটের হলদে আলোর নিচে একটি ছেলেকে বসে থাকতে দেখে থমকে দাঁড়ায় সাঈদ। বয়স আট কি নয় হবে। ছেলেটি ফুটপাতে বসে ফ্ল্যাডলাইটের আলোতে পড়ালেখা করছে। সাঈদ তার গলায় ঝুলানো ক্যামেরটা চোখের সামনে এনে ক্যামেরাবন্দী করে ফেলে দৃশ্যটা।
কিন্তু তার মনের কৌতূহল তখনও মেটেনি। সে এগিয়ে যায় ছেলেটির দিকে। ছেলেটির পাশে ফুটপাতেই বসে পড়ে সাঈদ। তার মাথায় হাত দিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'তোমার নাম কি বাবু?'
'সাহস।' মাথা না তুলেই জবাব দেয় ছেলেটি।
'সাহস! বাহ, বেশ সুন্দর নাম তো!'
ছেলেটি সাঈদের কথা শুনল বলে মনে হলো না। সাঈদ আবার জিজ্ঞেস করল, 'তুমি থাকো কোথায়?'
সাহস বিরক্তমুখে পেছনের একটি বস্তি দেখিয়ে বলে, 'ওই বস্তিতে।'
সাঈদের উপস্থিতি তার মোটেও পছন্দ হচ্ছে না, বোঝা যায়। কিন্তু সাঈদও নাছোড়বান্দা। সে সাহসের সাথে কথা বলেই ছাড়বে। 'তা তুমি এখানে বসে পড়ছ কেন? বাসায় গিয়ে পড়ো!'
'লাইটের টাকা দিতে পারে নাই দেইখা আমগো ঘরের লাইন কাইটা দিসে। ঘরে আলো নাই। একটা কুপি আছে ঘরে ঐটা দিয়ে মায়ে রান্না করতাসে। এল্লিগা এইখানে আইসা পড়তাসি।'
সাহসের কথা শুনে হতবাক হয়ে যায় সাঈদ। যেখানে সভ্য ঘরের ছেলেরা সকল সুবিধা থাকা সত্ত্বেও পড়ালেখা থেকে রেহাই পেতে চায়, সেখানে এই ছোট্ট সাহস পড়ালেখা করার জন্য ফুটপাতে এসে বসেছে। সাঈদ আবার জিজ্ঞেস করে, 'বড় হয়ে কী হতে চাও তুমি?'
'মায়ে কইসে আমারে অনেক বড় মানুষ হইতে হইব। বড় মানুষগো নাকি অনেক সম্মান। সবাই তাগোরে সালাম করে। আমরা গরিব বইলা আমগো কোনো সম্মান নাই।'
সাহসের জবাব শুনে বাকরুদ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকে সাঈদ। আরো কিছু জিজ্ঞেস করতে চাইছিল সে, কিন্তু পেছনের বস্তি থেকে কে যেন ডেকে উঠল, 'সাহস খাইতে আয়।'
'যাইগা আমি। মায়ে ডাকতাসে।'
বই-খাতা সব গুটিয়ে সাহস বস্তির দিকে চলে যায়। সাঈদ ফুটপাতের উপরেই বসে থাকে। অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে সাহসের চলে যাওয়ার পথে।

দুই

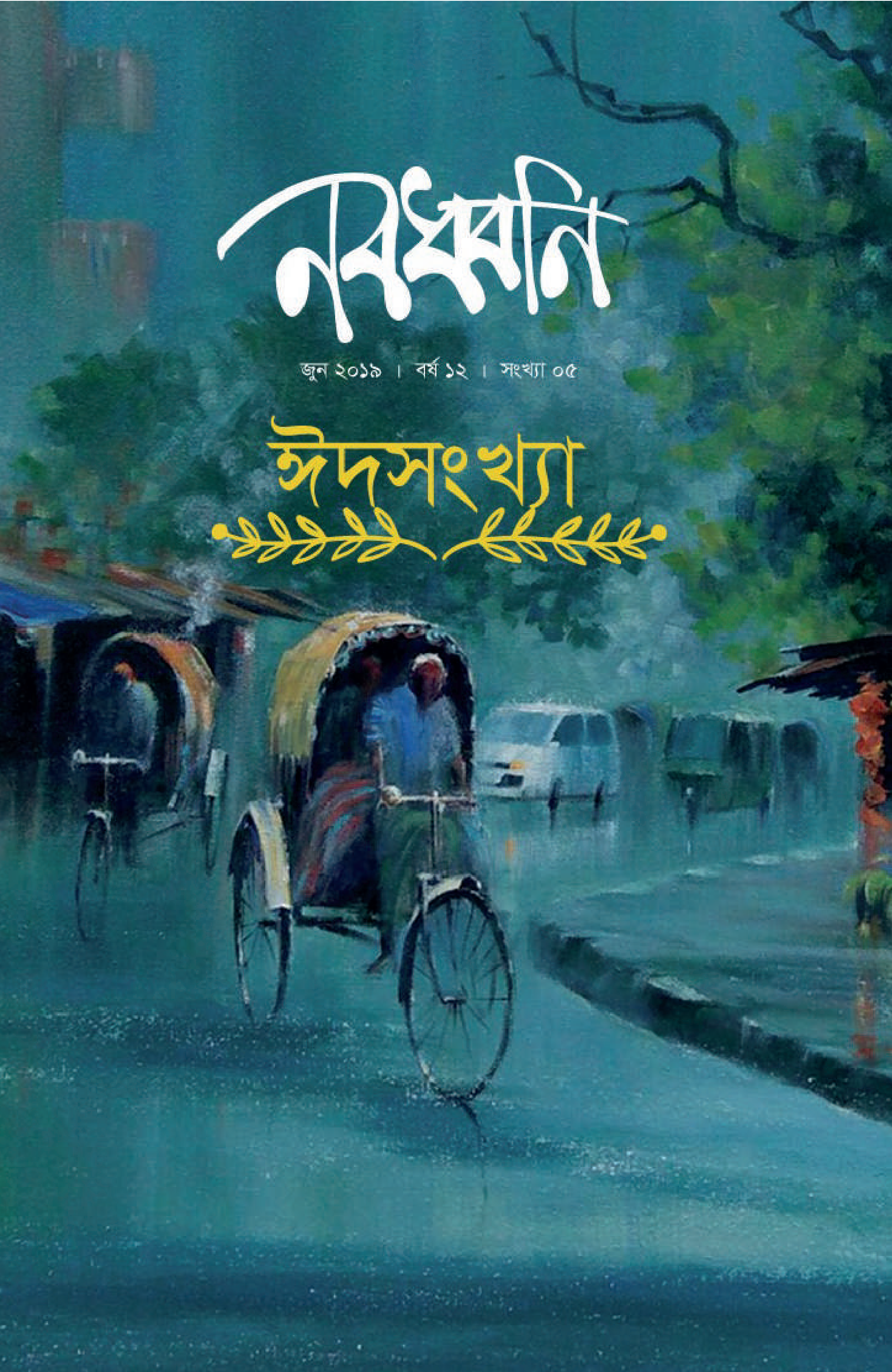
ঘটনাটার বেশ কিছুদিন পর মাঝদুপুরের কাঠফাটা রোদে সাঈদ রিক্স দিয়ে কোথাও যাচ্ছিল। সিগনালে বেশ কিছুক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আছে রিক্স। আশেপাশে হাঁক ছেড়ে নানান জিনিস বিক্রি করছে হকাররা। হঠাৎ একটি ছেলেকে দেখে চোখ আটকে যায় তার। এটা তো সাহস। ওর তো এই সময় স্কুলে থাকার কথা। ও চিপস বিক্রি করছে কেন? সাহসকে ডাক দেয় সাঈদ। সাহস সাঈদের কাছে এসে বলে, 'চিপস দিমু স্যার?'
'তুমি সাহস না?'
'হ, আপনে কেমনে জানেন?'
সাঈদকে সাহসের মনে রাখার কথা না। মনে মনে ভাবে সাঈদ।
'তোমার তো এখন স্কুলে থাকার কথা। তুমি চিপস বিক্রি করছ কেন?'
হেসে ওঠে সাহস।
'মায়ে স্কুলে চার মাসের বেতন দিতে পারে নাই দেইখা আমারে স্কুল থেকে বাইর কইরা দিসে। মায়ে কইসে আমার বড় মানুষ হওয়া লাগব না। পড়া-লেখা আমগো মতো গরিবগো লিগা না। চিপস দিমু স্যার?'
'ওহ হ্যাঁ, দাও।'
সাহস টাকা নিয়ে 'চিপস' 'চিপস' বলে হাঁক ছেড়ে চলে যায়। সাঈদ এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকে সাহসের দিকে। পার্থক্য খোঁজার চেষ্টা করে সেদিন রাতে দেখা পড়ালেখার প্রতি পূর্ণমনস্ক সাহস আর আজকের এই পড়ালেখার ওপর থেকে আস্থা উঠে যাওয়া সাহসের মধ্যে। এভাবেই প্রতিদিন টাকার অভাবে ঝরে পড়ে যায় শত শত ফুল।

ইসলাম নগর জামে মসজিদের পূর্ব পার্শ্বে,
মাতুয়াইল মেডিক্যাল, ঢাকা

নবধ্বনি

জুন ২০১৯ । বর্ষ ১২ । সংখ্যা ০৫

ঈদসংখ্যা



জুন ২০১৯ । বর্ষ ১২ । সংখ্যা০৫

সম্পাদক
তামীম রায়হান

নির্বাহী সম্পাদক
সালাহউদ্দীন জাহাঙ্গীর

সহকারী সম্পাদক
হাম্মাদ রাগিব
নাজমুস সাকিব

প্রকাশনা ব্যবস্থাপক
আসাদুল্লাহ খান

সার্কুলেশন ব্যবস্থাপক
মুহাম্মদ ইসহাক খান

প্রচ্ছদে ব্যবহৃত চিত্রকর্ম : রাজিব আহসান

ঈদসংখ্যার মূল্য : ৪০ টাকা মাত্র

নবধ্বনি । দোকান নং ২৭ । ২য় তলা । ইসলামী টাওয়ার
১১/১ বাংলাবাজার । ঢাকা । সার্কুলেশন : ০১৯৭৪৮৮৮৪৪১ । সম্পাদনা : ০১৭৪৫১৩৯২১৫

Email: nobodhoni@gmail.com web: noboprokash.com/nobodhoni

স্বাগত কলাম

AI - বর্তমান বিজ্ঞানের সবচে আলোচিত বিষয় হলো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (Artificial Intelligence), সংক্ষেপে যাকে বলা হয় AI। এই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মূলত কী জিনিস, সে ব্যাপারে প্রাথমিক কিছু কথা বলা যেতে পারে।

বছর দুই আগে আমাদের দেশে সোফিয়া নামের এক রোবটমানবী নিয়ে আসা হয়েছিল। সে রোবটমানবী আমাদের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বাতচিত করেছিল একটা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে। বেশ একটা হই চই হয়েছিল সোফিয়াকে নিয়ে তখন। অনেকের মনেই প্রশ্ন জেগেছিল, এই আপাদমস্তক কলকব্জা দিয়ে তৈরি সোফিয়াকে নিয়ে এত হই চইয়ের কারণ কী? হই চইয়ের কারণ হলো, সোফিয়া পৃথিবীর সর্বপ্রথম যন্ত্রমানব যার মধ্যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা স্থাপন করা হয়েছে।

এখানে বিষয়টা আরেকটু খোলাসা করে বলা জরুরি। রোবট বা যন্ত্রমানব বলতে আমরা যেসব জিনিস দেখি, সেগুলো কম্পিউটারে প্রোগ্রাম করা যন্ত্রবিশেষ। রোবটের প্রোগ্রামের মধ্যে যেসব কর্মক্ষমতা স্থাপন করা আছে সে সেভাবেই তার কাজ আঞ্জাম দিতে পারবে। এর বাইরে সে আর কোনো কাজ করতে পারবে না। যেমন একটা রোবটকে যদি অফিসের কাজের জন্য তৈরি করা হয় তাহলে সে কেবল অফিসের কাজই করতে পারবে, সে গাড়ি চালাতে পারবে না। যাকে কৃষিকাজের জন্য তৈরি করা হয়েছে সে হাসপাতালে অস্ত্রোপচার করতে পারবে না। অর্থাৎ, বর্তমানের যেসব রোবট আছে সবই বিশেষায়িত রোবট।

কিন্তু AI দিয়ে তৈরি একটা রোবট কিন্তু এমন হবে না। সে একদিকে যেমন হবে সর্ববিদ্যায় পারদর্শী, তেমনি এই বিদ্যা সে নিজের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কাজে লাগিয়ে নিজে নিজেই প্রয়োগ করতে পারবে। ধরুন, রাস্তা দিয়ে একটা AI রোবট যাচ্ছে, এমন সময় বৃষ্টি শুরু হলো। রোবটটি সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি থেকে বাঁচতে হয়তো মাথার উপর ছাতা ধরবে নয়তো পাশের দোকানে গিয়ে আশ্রয় নেবে। রান্নাঘর থেকে দুধ পোড়ার গন্ধ আসছে, রোবট সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে চুলা বন্ধ করে দেবে। এগুলো করবে সে নিজের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা খাটিয়ে। মানুষের মতো ইন্দ্রিয়শক্তি থাকবে এসব রোবটের, তেমনি সুখ-দুঃখ, ভালোবাসা-প্রেম, উল্লাস, হতাশা—এমন ধরনের মানবিক গুণাবলি ও অনুভূতিশক্তিও থাকবে তাদের।

গুগল নতুন ধরনের গাড়ি উদ্ভাবন করেছে, যে গাড়িতে চালকের প্রয়োজন হবে না। গাড়িতে স্থাপিত কম্পিউটার নিজের মেধা খাটিয়ে গাড়ি চালাবে। ডানে-বামে, আস্তে-জোরে, ট্রাফিক সিগন্যাল, রাস্তার অবস্থা, সামনে-পেছনে-পাশের গাড়ি—সবকিছু যাচাই করে কম্পিউটার নিজের মেধা খাটিয়ে গাড়ি চালাবে। শুনে অবাক হওয়ার কিছু নেই, এই গাড়ি এখন আমেরিকার রাস্তায় পরীক্ষামূলকভাবে চলাচল শুরু করেছে। আরেক প্রাযুক্তিক-গাড়ি নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ‘টেসলা’ও AI সমৃদ্ধ গাড়ির পরীক্ষামূলক চলাচল জারি রেখেছে।

পরিস্থিতি অনুযায়ী সে আপনার সঙ্গে কৌতুকও করতে পারবে। আবার যদি আপনি কখনো দুঃখ পান তাহলে সে আপনার কণ্ঠের আওয়াজ শুনেই পরিমাপ করতে পারবে যে আপনি কষ্ট পাচ্ছেন। সে সেই নিজের কৃত্রিম মেধা অনুযায়ী আপনাকে খুশি করতে কিছু একটা করার চেষ্টা করবে। আপনি ক্রিকেট খেলতে গিয়ে ছক্কা মারলে সে দর্শকসারিতে বসে আনন্দে চিৎকার করে উঠবে। কারণ এই খেলার সকল তথ্য তার কৃত্রিম মস্তিষ্কে ধারণ করা আছে। খেলার মধ্যে কখন আনন্দ প্রকাশ করতে হবে আর কখন হতাশ হতে হবে–সবকিছু তার মস্তিষ্কের কৃত্রিম ডাটাবেজে সাজানো।

এখন অনেকেই মনে করছেন, তাহলে এসব বুদ্ধিমান রোবট দিয়ে নিশ্চয় দুই নম্বরি কাজ করিয়ে নেয়া যাবে। না, সেটা সম্ভব নয়। কারণ রোবট তৈরিকারী প্রতিষ্ঠান তৈরির সময় তাদের মস্তিষ্কে ন্যায়-অন্যায়ের সকল ধারাপাত সংযোজন করে দেবে। মানবিক সকল অপরাধের জ্ঞান থাকবে তাদের, তেমনি কোন কাজটা রাষ্ট্রীয়ভাবে অপরাধযোগ্য–সে জ্ঞানও থাকবে তাদের টনটনে।

বিজ্ঞান এখন এমন রোবট আবিষ্কার করার চেষ্টা করছে যারা হবে ঠিক মানুষের মতো। ভেতরে কলকব্জা দিয়ে উপরে কৃত্রিম চামড়া পরানো হবে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দিয়ে কথা বলবে মানুষের মতো, হাঁটা-চলা, খেলা-ধুলা, অফিসের কাজ, ঘরের কাজ–সব করবে। এবং প্রত্যেকটা কাজ করবে মানুষের চেয়ে ১০০ গুণ নিখুঁতভাবে। সে তরকারি রান্না করলে সেখানে কখনো বেশি ঝাল বা লবণ কম-বেশি হবে না। সে গাড়ি চালালে দুর্ঘটনার আশঙ্কা কমে যাবে বিপুল হারে। তাদেরকে আইন-শৃঙ্খলায় নিয়োজিত করলে অপরাধ সংঘটনের হারও কমে আসবে।

অনেকেই হয়তো মনে করছেন, এসব পশ্চিমাদের আজগুবি সংবাদ মাত্র। কেবলমাত্র হলিউডের সিনেমায় এগুলো দেখতে পাওয়া যায়, বাস্তবে এর কোনো ভিত্তি নেই। প্রবাদ আছে ‘অন্ধ হলে কি আর প্রলয় বন্ধ থাকবে?’ আপনি-আমি বিজ্ঞানকে অস্বীকার করলেও বিজ্ঞান বসে থাকবে না। বিজ্ঞান তার নিজস্ব গতিতে এগিয়ে যেতে থাকবে। নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দেবে। মানুষের জীবনযাপনকে সহজ করতে বিজ্ঞানের এ অগ্রযাত্রা তাই রোখার উপায় নেই।

আজ থেকে ত্রিশ বছর আগে বাঙালির কাছে কম্পিউটার ছিল এক বিস্ময়ের নাম। এটার কথা শুনলে মনে করা হতো, আজগুবি কথা বলছে লোকটা। অথচ আজ বাংলাদেশের ঘরে ঘরে কম্পিউটার। আজকের স্মার্টফোনের কথাই বা কে ভাবতে পেরেছে? এখন ছোট-বড় সবার হাতে স্মার্টফোন। আঙুলের স্পর্শে পুরো দুনিয়া চলে আসে চোখের সামনে। আজ থেকে পনেরো-বিশ বছর আগে কে ভাবতে পেরেছিল এমন এলাহি কাণ্ডের ব্যাপার স্যাপার। কিন্তু সেই বাস্তবতা আমাদের চোখের সামনে জাজ্বল্যমান।

সুতরাং, বিজ্ঞানকে অস্বীকার করা বা বিজ্ঞানকে অবজ্ঞা করার দ্বারা আপনি বড় কোনো দিগ্বিজয় করতে পারবেন না। এর দ্বারা জগতসংসারে আপনার অজ্ঞতাই কেবল প্রকাশ পাবে। আপনার উচিত হলো, বিজ্ঞানকে অনুধাবন করা এবং সেই অনুযায়ী ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা। অযথা বাগাড়ম্বর নয়।



এখানে আমার পিতারা ঘুমায়

১২৮৪ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের এক সকালবেলা। দিল্লি বাদশাহি মসজিদে ফজরের নামাজ পড়ে প্রাসাদে ফিরছিলেন সুলতান গিয়াসউদ্দীন বলবন। কিছুদিন আগে বাংলার বিদ্রোহ দমন করে রাজধানী দিল্লিতে ফিরে এসেছেন তিনি। মন মেজাজ বেশ ফুরফুরে। সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সহকারী হাশিম বেগ। সামনে পেছনে ষোলজন রক্ষী তাঁকে ঘিরে এগিয়ে যাচ্ছে।

আজ থেকে সাত শ বছর আগের এক বাংলার ছায়াছবি এবং জরুরি বিষয়ের বয়ান এনেছেন **সালাহউদ্দীন জাহাঙ্গীর**।

পড়ুন ০৯ নম্বর পৃষ্ঠায়।



সিরাতচর্চার সূচনা, বিকাশ ও সমৃদ্ধি

পৃথিবীর ইতিহাসে মহানবি হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামই একমাত্র ব্যক্তি, যাঁর মহান জীবন, জীবনের প্রতিটি বাঁক ও সময়কে কেন্দ্র করে স্বতন্ত্র একটি শাস্ত্র গড়ে উঠেছে। সেই শাস্ত্রের সূচনা বিকাশ ও সমৃদ্ধির গল্প নিয়ে ঈদসংখ্যায় হাজির হয়েছেন **যিয়াদ বিন সাঈদ**। পড়ুন ২৩ নম্বর পৃষ্ঠায়।



শাহজালালের সিলেট

হিন্দু রাজার অত্যাচাওে অতিষ্ঠ ছিলেন সিলেটের মুসলমান। গরু জবাই ছিল এ অঞ্চলে কড়াভাবে নিষিদ্ধ। তারপরও অভিজাত এক মুসলিম পরিবার গরু জবাই করে নিজেদের এক নবজাতকের আকিকা করেছিল। রাজা এ খবর শুনতে পেয়ে শিশুটিকেই হত্যা করে ফেলে। তারপর? তারপরের গল্পই বিবৃত হয়েছে এই নিবন্ধে। উঠে এসেছে সিলেটে শাহজালালের আগমন বিজয় দাওয়াত এবং সিলেটের ইসলাম-বান্ধব লোকসংস্কৃতির নানা কথা। লিখেছেন **রাসেল মাহফুজ**। পড়ুন ২৯ নম্বর পৃষ্ঠায়।



প্রবাসযাত্রার গল্প ও আরবের দিনলিপি

জীবনের নানা প্রয়োজনে মানুষকে প্রবাসে যেতে হয়, আত্মীয়-স্বজন আর চিরপরিচিত পরিবেশ ছেড়ে রুটি-রুজির জন্য বিদেশ যাত্রা যে কতটা কষ্টদায়ক আর বিরহজাগানিয়া, এ গদ্য মর্মে মর্মে টের পাইয়ে দেবে সে-যন্ত্রণা। লিখেছেন **কাউসার মাহমুদ**। পড়ুন ৪১ নম্বর পৃষ্ঠায়।



আলেম সাংসদ ড. আবু রেজা নদভীর মুখোমুখি

তাঁর পুরো নাম প্রফেসর ড. আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দীন নদভী। চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী আলেম পরিবারের সন্তান এবং নিজেও একজন তুখোড় আলেম। গত দুই নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনয়নে চট্টগ্রামের সাতকানিয়া আসনের সংসদ সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হয়েছেন। বর্তমান সংসদের একমাত্র আলেম সংসদ সদস্য তিনি। নবধ্বনির বিশেষ আলাপচারিতায় তাঁর মুখোমুখি হয়েছেন **হামমাদ রাগিব**। পড়ুন ৪৭ নম্বর পৃষ্ঠায়।



অটোমানের রাজকীয় হারেম : বিস্ময়ভরা এক অন্দরমহল

অটোমান সাম্রাজ্য বা উসমানি খেলাফত–ইউরোপ জুড়ে প্রবল প্রতাপে এক সময় ছড়ি ঘুরিয়েছে মহান এই মুসলিম রাজবংশ। উসমানি খেলাফতের বীর-বাহাদুরি নিয়ে যেমন অনেক গল্প আছে, তেম্নি এ সালতানাতের হেরেম নিয়েও আছে নিদারুণ রহস্য। ঈদসংখ্যায় সেই রহস্যের জট খুলেছেন **নাবিলা আফরোজ জান্নাত**। পড়ুন ৫১ নম্বর পৃষ্ঠায়।



ছোটোগল্প
পাত্রী নুরুন্নাহার ও তার মা হাফসা বেগম

পাত্রী দেখার আসরে শামিমের মনে একটা বিষয় খচ করে উঠল। এই খচ করে ওঠা পূর্বপরিচিতির কোনো বিষয় না। পাত্রী নুরুন্নাহারকে সে দেখেনি আগে। চেনেও না। কিন্তু নুরুন্নাহারকে তার খুব আপন মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে খুব কাছের কেউ। এবারের ঈদসংখ্যায় এ নিয়ে লিখেছেন **রোকন রাইয়ান**। পড়ুন ৬৩ নম্বর পৃষ্ঠায়।



কক্সবাজার ও সেন্টমার্টিন : নীল জলের হাতছানি

কক্সবাজার থেকে সেন্টমার্টিন–নীল জলের হাতছানি কীভাবে মুগ্ধ করেছিল একজন তরুণের সৃষ্টিবান্ধব হৃদয়কে, **নাজমুস সাকিব** ঝরঝরে গদ্যে লিখছেন সেই গল্প। পড়ুন ৬৯ নম্বর পৃষ্ঠায়।



সাইয়্যেদ কুতুব : মহাকালের ধ্রুবতারা

ফাঁসির দণ্ড কার্যকর করার প্রাক্কালে আজহারের এক শায়েখ আসেন সাইয়্যেদ কুতুবকে তওবা করিয়ে কালিমা পড়াতে। তিনি সাইয়্যেদ কুতুবকে বললেন, 'কালিমা পড়ুন।' সাইয়্যেদ কুতুব মুচকি হেসে বললেন, 'ভাই আমার! তুমি যে কালিমা দিয়ে উদরপূর্তি করো, রুটিরুজির ইনতেজাম করো, আমরা তো সেই কালিমা প্রতিষ্ঠা করার জন্যই জীবন দিচ্ছি। আর তুমি এসেছো আমাদের ঈমান পূর্ণ করতে?' মিশরের অমিততেজা এই ষংগ্রামীর সংগ্রাম ও শাহাদাতের গল্প লিখেছেন **ফাহাদ আবদুল্লাহ**। পড়ুন ৭৯ নম্বর পৃষ্ঠায়।



আরমোগানে হেজাজ : ওমরার অসমাপ্ত সফরনামা

ওমরার অসমাপ্ত সফরে একজন তরুণ কীভাবে দেখেছেন আরবের মাটি, মানুষ, প্রকৃতি ও রাজনীতিকে; নবিজির রওজা পাকে কীভাবে নিবেদন করেছেন নিজের 'আরমোগানে হেজাজ'–**ইফতেখার জামীলের** বিশ্লেষণধর্মী সফরনামায় উঠে এসেছে বিস্তারিত। পড়ুন ৮৭ নম্বর পৃষ্ঠায়।

তর্কবাগীশের আন্দোলিত জীবন



বাংলাদেশের মুসলিম রাজনীতির অন্যতম ব্যক্তিত্ব মওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ। আপাদমস্তক একজন মওলানা কীভাবে দাপিয়ে বেড়িয়েছেন ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলের রাজনীতির পিচ্ছিল ময়দান, তারই বৃত্তান্ত উঠে এসেছে সালমান সাদের জীবনীভিত্তিক এ মুক্তগদ্যে। ভাষা ও বর্ণনার লালিত্যে মওলানা তর্কবাগীশের বর্ণাঢ্য জীবন অন্যরকম এক শৈলিতে এঁকেছেন **সালমান সাদ**। পড়ুন ১০১ নম্বর পৃষ্ঠায়।

চট্টলায় ইসলামের আগমন, বিকাশ ও সমৃদ্ধি



বায়েজিদ বোস্তামি রহমতুল্লাহি আলায়হিকে নিয়ে অনেক মিথ প্রচলিত আছে চট্টগ্রামে। আছে তাঁর মাজারও। কিন্তু আদৌ কি তিনি এসেছিলেন চট্টগ্রামে? ইতিহাস কী বলে? 'খায়রুল কুরুন'-এর যুগে দুজন মহান সাহাবির আগমনের গল্পও আছে উপকূলীয় এই অঞ্চলে। দূর আরব হতে কীভাবে এসেছিলেন তাঁরা? কী ছিল তাঁদের পরিচয়? আদৌ কি এসেছিলেন, নাকি এ আগমনের গল্প কেবলই মিথ? বিখ্যাত মুসলিম পরিব্রাজক ইবনে বতুতা এসেছিলেন চট্টগ্রামে, সে-সময় কী দেখেছেন তিনি? চট্টগ্রামকে কীভাবে চিত্রায়ন করেছেন নিজের সফরনামায়? এমনতর আরও নানা প্রশ্নের উত্তর নিয়ে চট্টগ্রামের ইতিহাস লিখেছেন **আমজাদ ইউনুস**। পড়ুন ১১১ নম্বর পৃষ্ঠায়।

মোঘল হেরেমের জ্ঞানতাপসী

মোঘল হেরেমের জ্ঞানতাপসী জেবুননেসা বিনতে বাদশাহ আলমগির। পিতার মতোই ছিলেন ধর্মপরায়ণ এবং ধর্ম সম্পর্কে অগাধ পাণ্ডিত্যের



অধিকারী। বাবার অগোচরে লুকিয়ে লুকিয়ে লিখতেন কবিতা। সমকালের কবিরা হয়রান হয়ে পড়তেন অজ্ঞাতনামা এক কবির কবিতা পড়ে। জ্ঞানতাপসী সেই শাহজাদির জীবনের গল্প লিখেছেন **সুমাইয়া মারজান**। পড়ুন ১২২ নম্বর পৃষ্ঠায়।

রণাঙ্গনের বীরাঙ্গনা

খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হয়রান হয়ে গেছেন, হয়রান অন্যান্য মুজাহিদগণও–কে এই মুখোশধারী যুবক? রোমান কাফেরদেরকে কচুকাটা করতে করতে ঢুকে পড়ছে শত্রুসারিতে, বীরত্বের সঙ্গে বেরিয়েও আসছে আবার। আপাদমস্তক কালো কাপড়ে আবৃত কে এই নওজোয়ান?যুদ্ধ যখন শেষ হলো, জানা গেল এ কোনো নওজোয়ান না, ইনি বীরাঙ্গনা খাওলা বিনতে আজুর রাদিয়াল্লাহু আনহা। বীরাঙ্গনা খাওলার রণাঙ্গনের গল্প নিয়ে হাজির হয়েছেন **অরিশা জান্নাত**। পড়ুন ১৩৬ নম্বর পৃষ্ঠায়।



মহীয়সী নারী জয়নব বিনতে জারির

স্বামী-অনুগতা এক মহীয়সী নারী। বিষধর সাপ এসে কামড় দিয়েছে, জায়গা থেকে নড়েননি একচুলও–স্বামীর হুকুম নেই বলে। তাঁকে নিয়ে লিখেছেন **উবায়দুল হক খান**। পড়ুন ১৪৩ নম্বর পৃষ্ঠায়।



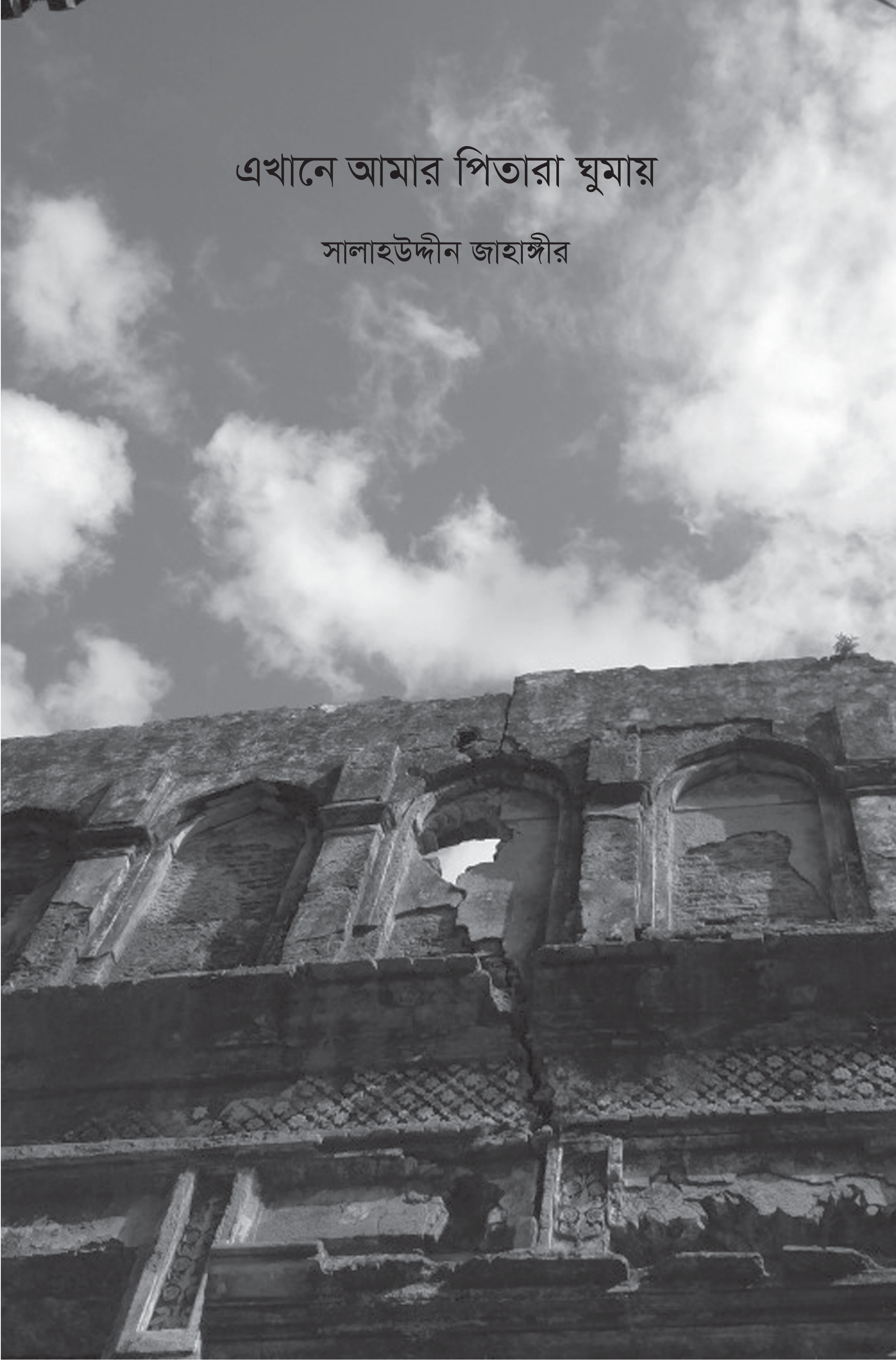
বীরাঙ্গনা সাহাবিয়্যাহ

উহুদের যুদ্ধে শুরুতে মুসলমানদের বিজয় সুনিশ্চিত থাকলেও শেষের দিকে বেশ বেকায়দায় পড়ে যেতে হয়েছিল তাঁদেরকে। উহুদের গিরিপথ ধরে পলায়নপর মুশরিক বাহিনীর একটি দল নিয়ে খালিদ বিন ওয়ালিদের কামাণ্ডো আক্রমণে সাহাবায়ে কেরাম ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছিলেন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম যে জায়গাটায় দাঁড়ানো ছিলেন, মুশরিকদের আক্রমণের তীব্রতায় তাঁর পাহারাদারের সঙ্গে বেশ দূরত্ব তৈরি হয়ে গিয়েছিল। এমন সুযোগে একজন মুশরিক উদ্ধত তরবারি নিয়ে ধেয়ে আসছিল সারওয়ারে কায়েনাতের দিকে। ঠিক তখনই অতুল বীরত্ব নিয়ে গর্জে উঠেছিলেন এক বীরাঙ্গনা–নবিজির প্রিয় ফুপ্পিজান হজরত সাফিয়্যাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা। তাঁকে নিয়ে লিখেছেন **আবিদা সুলতানা উমামা**। পড়ুন ১৪৮ নম্বর পৃষ্ঠায়।



এখানে আমার পিতারা ঘুমায়

সালাহউদ্দীন জাহাঙ্গীর



১২৮৪ খ্রিষ্টাব্দ।

দিল্লিতে তুর্কি বংশোদ্ভূত সুলতান গিয়াসউদ্দীন বলবনের রাজ্যশাসনের শেষ সময় চলছে। ১২৬৬ সালে ৬০ বছর বয়সে তিনি দিল্লি সালতানাতের সুলতান নির্বাচিত হন। এখন তাঁর বয়স ৭৮। সুলতান হিসেবে প্রায় আঠারো বছর রাজ্যশাসন, সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি এবং বিদ্রোহ দমনে ছিলেন দুর্দণ্ড প্রতাপশালী। সিংহাসনের যোগ্যতা প্রশ্নে তাঁর চেয়ে যোগ্য আর কেউ ছিল না।

এই বয়সেও কিছুদিন আগে দিল্লি সালতানাতের সবচে বিদ্রোহপ্রবণ অঞ্চল বাংলার দীর্ঘ বিদ্রোহ দমন করে এসেছেন। দিল্লি কর্তৃক নিযুক্ত সেখানকার তুর্কি শাসক মুগিসউদ্দীন তুগরল তুগান খান বিগত ছয় বছর ধরে নিজেকে স্বাধীন সুলতান হিসেবে দাবি করে আসছিল। উত্তর ভারতে মোঙ্গলদের আক্রমণ প্রতিহত করতে গিয়ে সুলতান এতদিন বাংলার দিকে মনোযোগ দেয়ার সময় পাননি। ১২৭৭ সালের পর ধারাবাহিক কয়েকজন সেনাপতিকে পাঠান তুগরল খানকে শায়েস্তা করার জন্য। কিন্তু একে একে তিনজন সেনাপতি তুগরল খানের সামরিক কৌশলের কাছে পরাজিত হয়। অবশেষে তাকে শায়েস্তা করতে সুলতান গিয়াসুদ্দীন বলবন শাহজাদা নাসিরুদ্দীন বুগরা খানকে সঙ্গে নিয়ে ১২৮০ সালে স্বয়ং বাংলায় আগমন করেন।

প্রায় দুই লাখ যোদ্ধায় সজ্জিত দিল্লি বাহিনী নিয়ে তিনি বাংলায় আগমন করলেও তুগরল খানকে গ্রেফতার মোটেও সহজ ছিল না। বাংলার রাজধানী লক্ষ্মণাবতী ছেড়ে তুগরল খান দীর্ঘ তিন বছর নদীপথে যুদ্ধ অব্যাহত রাখেন। অবশেষে ১২৮৩ সালে উড়িষ্যা সীমান্তের কাছে তুর্কি সেনাপতি মালিক বেকতুরসের সঙ্গে এক সম্মুখযুদ্ধে তিনি গ্রেফতার হন। গ্রেফতারের পর তাকে বাংলার রাজধানী লক্ষ্মণাবতীতে নিয়ে আসা হয়। সুলতান গিয়াসুদ্দীন বলবন তখন লক্ষণাবতীতে অবস্থান করছিলেন। তুগরুল খানকে লক্ষ্মণাবতীতে নিয়ে আসা হলে সুলতান তাঁকে ও তাঁর পরিবারের নারী-পুরুষ সবাইকে খোলা মাঠে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যার নির্দেশ দেন।

দিল্লি সাম্রাজ্যের মধ্যে বাংলাই সম্ভবত একমাত্র অঞ্চল, যেখানে দিল্লির শাসনের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছে। আপাত শান্ত নিরীহ এই বাঙালি জাতি কিছুতেই যেন অন্যের আধিপত্য মেনে নিতে ছিল নারাজ। এ কারণে দিল্লির আধিপত্যবাদী সুলতানদের বার বার হোঁচট খেতে হয়েছে এখানে এসে।

তা ছাড়া নদীমাতৃক অঞ্চল হওয়ায় এখানকার বিদ্রোহীরা সহজেই ছোট-বড় নদীপথে পালিয়ে যেতে পারে। অন্যদিকে দিল্লির নেতৃত্বাধীন তুর্কি বা আফগান যোদ্ধারা জালের মতো ছড়িয়ে থাকা এসব নদীতে মোটেও সাচ্ছন্দ্য বোধ করে না। বর্ষা মৌসুম হলে তো কথাই নেই, বাঙালি সৈনিকরা তুর্কি-আফগানদের রীতিমতো নাকানি-চুবানি খাইয়ে ছাড়ে।

১২৮৪ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের এক সকালবেলা। দিল্লি বাদশাহি মসজিদে ফজরের নামাজ পড়ে প্রাসাদে ফিরছিলেন সুলতান গিয়াসউদ্দীন বলবন। কিছুদিন আগে বাংলার বিদ্রোহ দমন করে রাজধানী দিল্লিতে ফিরে এসেছেন তিনি। মন মেজাজ বেশ ফুরফুরে। সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সহকারী হাশিম বেগ। সামনে পেছনে ষোলজন রক্ষী তাঁকে ঘিরে এগিয়ে যাচ্ছে।

এমন সময় নিকটবর্তী কোথাও থেকে সমবেত মানুষের তকবিরের আওয়াজ শুনতে পেলেন তিনি। দাঁড়িয়ে আওয়াজের উৎস শোনার চেষ্টা করলেন। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সহকারী হাশিম বেগের দিকে তাকাতেই সে এগিয়ে এসে বলল, 'আলামপনা, এটা ইয়েমেনি শায়খের দরসের আওয়াজ। প্রতিদিন সকালে শহরের ধর্মপ্রাণ মুসলিম এবং তাঁর শিষ্যরা তাঁর কাছে হাদিস শোনে। পাশের লাল মসজিদে শায়খের খানকাহ।'

সুলতান গিয়াসুদ্দীন ভ্রু কুঁচকে বললেন, 'কোন শায়খ? ওই যে ইয়েমেন থেকে এসেছিলেন শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা, উনি?'

'জি, আলামপনা।'

'আচ্ছা, প্রতিদিন সকালে এভাবে হাদিসের দরস হয় এখানে?'

'জি, আলামপনা।'

‘কেমন লোক সমাগম হয় প্রতিদিন?’
‘আমি মাঝেমধ্যে বসি ওই হাদিসের দরসে। আমার ধারণা, ১০ থেকে ১৫ হাজার মানুষ প্রতিদিন উপস্থিত থাকে তাঁর দরসে।’
হাশিমের কথা শুনে চোখ বড় বড় হয়ে গেল সুলতানের। এত মানুষ আসে হাদিস শুনতে! একটু চিন্তা করে বললেন, ‘তুমি এখন গিয়ে শায়খকে দরবারে ডেকে পাঠাও। বলবে, সুলতান আপনাকে জরুরি তলব করেছে...।’ কী মনে করে থেমে গিয়ে আবার বললেন, ‘না, তাতে হিতে বিপরীত হতে পারে। ক্ষেপে যেতে পারে শায়খের ভক্ত-শিষ্যরা। আমিই বরং যাচ্ছি তাঁর খানকায়।’
কোনো ধরনের রাজকীয় বিহার ছাড়া সুলতান গিয়াসুদ্দীন লাল মসজিদে গিয়ে হাজির হলেন। গিয়ে যা দেখলেন তা দেখার জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। কাঠের একটা অনাড়ম্বর মিম্বারে বসে হাদিস পাঠ করছেন শায়খ, আর তাঁর সামনে মসজিদের চাতালে মন্ত্রমুগ্ধের বসে আছে হাজার দশেক মুসলিম। তারা সবাই যে শায়খের শিষ্য—এমন নয়, দিল্লির অভিজাত থেকে শুরু করে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষও বসেছে চাতালে। কারো মধ্যে কোনো ব্যস্ততা বা বিতৃষ্ণা নেই, সকলেই নিবিষ্ট মনে শায়খের নসিহত শুনছে। এত মানুষের এমন সম্মোহন দেখে মনে মনে ভীতি অনুভব করলেন সুলতান। কম্পিত হৃদয়ে ভীড়ের একপাশে বসে পড়লেন। যতক্ষণ দরস চলল ততক্ষণ কিছু বললেন না কাউকে।
দরস শেষ হলে সুলতান এগিয়ে গেলেন শায়খের দিকে। সুলতান ও তাঁর দেহরক্ষীদের আসতে দেখে ভক্ত-শিষ্যরা জায়গা করে দিল। শায়খ মিম্বার থেকে নেমে এগিয়ে এলেন সুলতানের দিকে, বুকে জড়িয়ে ধরলেন তাঁকে।
কিছুক্ষণ পর। শায়খ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা রহ. এবং সুলতান বসে আছেন মসজিদ লাগোয়া খানকায়। বয়সে শায়খ সুলতানের চেয়ে ঢের ছোট। সুলতানের চুল-দাড়ি এরই মধ্যে পেকে সাদা হয়ে গেছে, শায়খের কেবল পাক ধরেছে। ফলে দুজন দুজনকে যথাযোগ্য সম্মান দিতে কসুর করেননি। সামনে একটা রেকাবিতে আঙুর, নাশপাতি, ডালিম, খেজুরসহ নানা ফল পরিবেশন করা হয়েছে। দুজনে কথার ফাঁকে ফাঁকে মুখে দিচ্ছিলেন দু-একটা।
‘আমি বেশ কিছুদিন রাজধানীতে অনুপস্থিত ছিলাম। আপনার এখানে এত বড় মজমা শুরু হয়েছে—সে ব্যাপারে আমার জানা ছিল না।’ ধীরে ধীরে কথা আগাচ্ছেন সুলতান।
‘সবই আল্লাহর ইচ্ছা, আলামপনা। আল্লাহ সবসময় মানুষকে হেদায়েত দিতে চান।’ শায়খ ধীরে সুস্থে জবাব দিলেন।
‘মহামান্য শায়খ, বাংলায় দীর্ঘ তিন-চার বছর থাকার ফলে আমার মনে হয়েছে, সেখানকার মানুষগুলো এখনো ইসলাম থেকে অনেক দূরে। সত্তর বছর আগে সেখানে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা হলেও মানুষের মধ্যে ইসলামের শিক্ষা সেভাবে প্রসার লাভ করেনি। প্রতিমা পূজা, জাগযজ্ঞ, কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হয়ে আছে পুরো জনপদের মানুষ।’ গলায় বেশ আবেগ ঢেলে বললেন সুলতান।
‘জি মহামান্য সুলতান, আমিও শুনেছি মুলকে বাংলার ব্যাপারে। শুনেছি সেখানে নাকি ধর্মের নামে নরবলি দেয়া হয়!’ সুলতানের কথায় প্রভাবিত হলেন শায়খ।
সুযোগ পেয়ে সেটা কাজে লাগালেন সুলতান, ‘শুধু নরবলি নয়, সেখানকার হিন্দুদের মধ্যে কেউ মারা গেলে স্বামীর লাশের সঙ্গে তার স্ত্রীকেও জীবিত আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়।’
‘কী ভয়াবহ অবস্থা! মানুষের হৃদয়ে ইসলাম না থাকার কারণে ধর্মের নামে এমন কুসংস্কার তৈরি হয়েছে।’ শিউরে উঠলেন শায়খ।
‘আমি অনেকদিন ধরে চিন্তা করছিলাম, বাংলায় যদি সুযোগ্য কোনো মুবাল্লিগে ইসলাম থাকতো তাহলে হয়তো তাঁর স্পর্শে মানুষ হেদায়েত পেতো। সুজলা উর্বর এই ভূমি আল্লাহর নেয়ামতে ভরপুর, কিন্তু ইসলামের আলো না থাকার কারণে সেখানে মানুষ মানুষের খোদা সেজে বসে আছে। ব্রাহ্মণ আর উঁচু জাতের হিন্দুরা ধর্মের দোহাই দিয়ে নীচু জাতের মানুষদের অকথ্য নির্যাতন করে। নীচু জাতের মানুষের নিজেদের অধিকার বলতে কিছু নেই। সেখানে মুসলিম শাসন আছে ঠিকই, কিন্তু জনগণের মধ্যে ইসলামের প্রসার



নেই, মানুষের মাঝে ইসলামের কথা বলার আলেম নেই। সেখানে আজানের বদলে সন্ধ্যাবেলা শোনা যায় শঙ্খ আর উলুধ্বনি।' বলতে বলতে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়লেন সুলতান।

তাঁর আবেগ ছুঁয়ে গেল শায়খ শরফুদ্দীনকেও। তিনি সুলতানের হাত ধরে বললেন, 'মহামান্য সুলতান, আমার বাড়ি ইয়েমেন। সেখান থেকে আমি এই হিন্দুস্তানে এসেছি শুধুমাত্র দীন প্রচারের জন্য। আমি আমার পৈতৃক সহায় সম্পদ সব ছেড়ে পরিবার নিয়ে পথে নেমেছি শুধু আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠা করতে। আমি আপনাকে ওয়াদা দিচ্ছি, অধর্মে আচ্ছন্ন বাংলায় যাবো আমি। সেখানে দাওয়াতের কাজের মাধ্যমে ইসলামের আওয়াজ উচ্চকিত করব ইনশাআল্লাহ।'

১২৮৪ সালের কোনো এক মাসে ইয়েমেনের সুফি সাধক শায়খ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা দিল্লি থেকে বাংলার পথে যাত্রা করেন। সঙ্গে পরিবারের লোকজন ছাড়াও কয়েক হাজার ভক্ত-শিষ্য তাঁর অনুগামী হয়। তবে সরাসরি বাংলায় আসার আগে তিনি বিহারের রাজধানী পাটনার কাছাকাছি মানেরে যান। সেখানে শায়খ আবু ইয়াহইয়া নামে এক বড় আলেমের সান্নিধ্য লাভ করেন।

দুই

শায়খ আবু ইয়াহইয়ার তরুণ ছেলে ইয়াহইয়া তাঁর সামনে বসা শায়খ শরফুদ্দীনের দিকে চোখ তুলে তাকাতে সাহস পাচ্ছে না। মনে হচ্ছে, তাঁর চোখের দিকে তাকালেই তিনি ইয়াহইয়ার অন্তর্গত সকল পাপ ও গোস্তাখি পড়ে ফেলতে পারবেন। তাঁর অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যত বায়োস্কোপের মতো ঘুরতে থাকবে শায়খের অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে।

'বেটা, তোমার আব্বাজান আসতে কতক্ষণ লাগতে পারে?' দাড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে জিজ্ঞেস করলেন শায়খ।

'জি...এখনই চলে আসবেন। মানের বাজারে গেছেন খাসি কিনতে, বেশি দূরে না...! অমি কি তাঁকে ডাকতে যাবো?' একবার চোখ তুলে তাকিয়েই আবার দৃষ্টি নিচু করে ফেলল ইয়াহইয়া। শায়খ এখনও একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন তাঁর দিকে।

'না না, তার দরকার নেই। তুমি এখানেই বসো। তোমার আব্বাজান হয়তো শিগগির চলে আসবেন। ততক্ষন আমি তোমার সঙ্গে গল্প করি।' হাসিমুখে বললেন শায়খ। শায়খের

হাসিমাখা মুখ দেখে ইয়াহইয়ার ভেতরে কম্পন আরও যেন বেড়ে গেলো।
‘কী পড়ো তুমি?’
‘জি...পড়ছি, মানে...আব্বাজানের কাছে...কিতাবাদির তালিম...?’
‘আরে বেটা, তুমি এভাবে ভয় পাচ্ছো কেন আমাকে দেখে? তোমার মুখও তো লাল হয়ে গেছে। এদিকে আসো, এদিকে আসো...।’
তরুণ ইয়াহইয়া কম্পিত হৃদয় নিয়ে শায়খের পায়ের কাছে এসে বসল। শায়খ তাঁর মাথায় হাত রেখে বললেন, ‘দোয়া করি, একদিন তোমার নাম এই ‘মানের’ জনপদ থেকে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ুক।’

তিন

শায়খ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা রহ. বেশ কিছুদিন মানেরে অবস্থান করেন। এ সময় পাটনার শায়খ আবু ইয়াহইয়ার ছেলে ইয়াহইয়া মানেরীর সঙ্গে নিজ কন্যার বিয়ে দেন। এরপর সম্ভবত ১২৮৫ খ্রিষ্টাব্দের শুরুর দিকে তিনি বাংলার সমৃদ্ধ জনপদ সোনারগাঁওয়ে আগমন করেন। নিজ জামাতা ও অন্যতম শিষ্য ইয়াহইয়া মানেরীকেও সঙ্গে নিয়ে আসেন।
নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁও সে সময় ছিল দক্ষিণবঙ্গের সবচে বড় নৌবন্দর। নৌবন্দর হওয়ার সুবাদে বন্দরের আশপাশের বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে গড়ে উঠেছিল সোনারগাঁও শহর এবং কালক্রমে এটি একটি বাণিজ্যকেন্দ্রে রূপ নেয়। বঙ্গোপসাগর হয়ে যেসব ব্যবসায়ী জাহাজ উত্তরবঙ্গ এবং বাংলার রাজধানী লক্ষ্মণাবতীর দিকে যেতো, সেসব জাহাজ আবশ্যিকভাবে যাত্রাবিরতি করতো এখানে। এভাবে সোনারগাঁওয়ের সঙ্গে নৌযোগাযোগ ছিল সুদূর আরব ও প্রাচ্যের।
শায়খ শরফুদ্দীনের দিল্লি থেকে সোনারগাঁওয়ে আসার যাবতীয় ব্যয়ভার দিল্লির সুলতান গিয়াসুদ্দীন বলবন বহন করেন। শুধু তাই নয়, সোনারগাঁওয়ে যাতে তিনি একটি ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে পারেন তারও বন্দোবস্ত করে দেন। সে সময় বাংলার শাসক ছিলেন সুলতানের ছেলে নাসিরুদ্দীন বুগরা খান। সুলতানের নির্দেশে বুগরা খান শায়খকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় সর্বাত্মক সহায়তা প্রদান করেন।
অবশ্য এখানে রাজনৈতিক কারণও ছিল। দিল্লির মসনদ ছিল সে সময় স্পর্শকাতর অধ্যায়ে। যে কোনো সময় কোনো বিদ্রোহী গোষ্ঠী বা ব্যক্তি সিংহাসন দখল করে নিতে পারে। তাই খোদ রাজধানীতে যদি শায়খ আবু তাওয়ামার মজলিসে প্রতিদিন ১৫ হাজার লোকের সমাগম হয়, সেখান থেকে যে কোনো ধরনের রাজনৈতিক আওয়াজ উঠলে সে বিদ্রোহ দমন করা কঠিন হয়ে যাবে। আর সেটা যদি ধর্মীয় সুরমা লাগিয়ে ব্যবহার করা হয় তাহলে সাধারণ মানুষও সিংহাসনের বিরুদ্ধে চলে যেতে পারে। এ কারণে সুলতান গিয়াসুদ্দীন বলবন শায়খকে সুকৌশলে রাজধানী দিল্লি থেকে বিদায় করতে চাচ্ছিলেন। শায়খ সুলতানের রাজনৈতিক দুরভিসন্ধি বুঝতে পেরে দিল্লিতে অবস্থানকে নিরাপদ মনে করেননি। তাই স্বেচ্ছায় বাংলা চলে আসার আগ্রহ প্রকাশ করেন।
দিল্লিতে থাকার সময় শায়খ শরফুদ্দীনের হাদিসপাঠের সুনাম ছড়িয়ে পড়েছিল দেশ-বিদেশে। তিনি যখন সোনারগাঁওয়ে নতুন করে ইসলামি বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠা করেন, দূর-দূরান্ত থেকে জ্ঞানপিয়াসী শিক্ষার্থীরা ভীড় জমাতে থাকে সেখানে। মেঘনা ও শীতলক্ষ্যা নদী তীরবর্তী হওয়ার দরুণ সোনারগাঁওয়ের যাতায়াতব্যবস্থা ছিল তুলনামূলক ভালো। দেখতে দেখতে কয়েক বছরের মধ্যে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ১০ হাজারে উন্নীত হয়। এর আগে বিহারের নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া দক্ষিণ এশিয়ার আর কোনো শিক্ষায়তনে এত ছাত্রের সন্নিবেশ হয়নি। এখানে বিধিবদ্ধ কুরআন এবং হাদিসের দরসের পাশাপাশি ভেষজ চিকিৎসাশাস্ত্র, অংক, ভূগোল, ইতিহাস এবং রসায়ন শাস্ত্রসহ অন্যান্য জরুরি বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করা হতো।
ধারণা করা হয়, ১২৮৫ থেকে ১২৯০ সালের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় সোনারগাঁও ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকে জ্ঞানের এক আধারে পরিণত হয় এ বিশ্ববিদ্যালয়। এবং সবচে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, শায়খ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা রহ. সর্বপ্রথম

উপমহাদেশে উচ্চতর হাদিসের দরস শুরু করেন। তিনি সোনারগাঁও বিশ্ববিদ্যালয়ে সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম এবং মুসনাদে আবু ইয়ালা গ্রন্থের দরস প্রদান শুরু করেন। এ কারণেই তাঁর নামের শেষে 'বুখারি' যোগ করা হয়। এর আগে আর কেউ উপমহাদেশে হাদিসের এ সর্বোচ্চ বিশুদ্ধ গ্রন্থের পাঠ শুরু করেননি বলে ইতিহাস থেকে অনুমিত হয়।

চার

এখন জ্ঞাতব্য বিষয় হলো, শায়খ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা বুখারি বাংলার সোনারগাঁওয়ে বুখারি শরিফের যে দরস প্রদান করতেন, সে দরসের কিতাবাদি কীভাবে সংগ্রহ করা হতো? আমার ধারণা, যেহেতু সোনারগাঁওয়ের সঙ্গে আরব বণিকদের যোগাযোগ ছিল এবং সোনারগাঁও বন্দরে প্রায়ই আরবীয় বাণিজ্য জাহাজ নোঙর করতো, সম্ভবত তাদের মাধ্যমে আরব থেকে প্রয়োজনীয় কিতাবাদি সংগ্রহ করা হতো। এছাড়া স্থলপথে এসব কিতাবাদি সংগ্রহ করা ছিল প্রায় অসম্ভব। এ থেকে বুঝা যায়, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম আরবেও কম-বেশি প্রসিদ্ধ ছিল।

গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রেও শায়খ শরফুদ্দীন সমান আগ্রহী ছিলেন। তাঁর তত্ত্বাবধানে শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে 'মসনবিয়ে নামে হক' নামে ফারসি ভাষায় একটি গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়। এ গ্রন্থে সাধারণ ধর্মীয় বিষয়াদি কবিতাকারে বর্ণনা করা হয়েছে। এ গ্রন্থে ১৮০টি কবিতা লিপিবদ্ধ আছে। গ্রন্থটি ১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দে মুম্বাই থেকে এবং ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে কানপুর থেকে প্রকাশিত



হয়। আমার কাছে এ গ্রন্থের একটি পিডিএফ সংস্করণ রয়েছে। এটি পাকিস্তানের লাহোর থেকে মাকতাবায়ে কাদেরিয়া কর্তৃক প্রকাশিত। মাত্র ১৭ পৃষ্ঠার ছোট গ্রন্থটিতে তাওহিদ, রিসালাত, ফরজ, ওয়াজিবসহ বিভিন্ন জরুরি বিষয় কবিতাকারে বর্ণিত। শায়খ প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিকাংশ শিক্ষার্থীই ছিলেন বাংলার। এ কারণে তিনি বাংলাভাষায় গ্রন্থ রচনায় তাদের উৎসাহ প্রদান করেন। তাঁর তত্ত্বাবধানে 'মনজিলে মাকামাত' নামে বাংলাভাষায় একটি সুফিতাত্ত্বিক দর্শনগ্রন্থ রচিত হয় বলে জানা যায়। যদিও এ গ্রন্থের কোনো অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। তবে বিভিন্ন তথ্য থেকে জানা যায়, শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা লিখিত একাধিক পাণ্ডুলিপি ব্রিটিশ জাদুঘরের আর্কাইভ ভবনে রক্ষিত আছে। শায়খ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামার অন্যতম শিষ্য শায়খ ইয়াহইয়া মানেরীও গ্রন্থ রচনায় ছিলেন সিদ্ধহস্ত। জানা যায়, সুফি সাহিত্য এবং দর্শন শাস্ত্রে তিনি শতাধিক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। শায়খ আবু তাওয়ামার মৃত্যুর কিছুদিন পর তিনি বিহারে নিজ এলাকায় চলে যান এবং পরবর্তীকালে বিহারের একজন শ্রেষ্ঠ ইসলামি চিন্তাবিদ হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। তাঁর রচিত 'মকতুবাতে সাদি' সুফি সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। এছাড়া 'মালফুজুস সফর' নামেও মানেরীর একটি বিখ্যাত গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যায়।
এখানে দুটো বিষয় লক্ষণীয়। এক. শায়খ শরফুদ্দীন ইয়েমেনের অধিবাসী হওয়া সত্ত্বেও দীন প্রচারের লক্ষ্যে ছুটে এসেছিলেন এই বাংলায়। শুধু তাই নয়, তিনি সময়ের সবচে বড় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে এখানে হাদিসের দরস প্রদান করে বাংলাকে ধন্য করেছিলেন। একই সঙ্গে এই জনপদের মানুষের জন্য তিনি বাংলাভাষায় গ্রন্থ রচনা করে বাংলাভাষা এবং বাংলা সাহিত্যকে যে অনুপম সম্মান দিয়েছেন, সেটা অনন্য। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, বাংলার মানুষের কাছে দীন পৌঁছাতে হলে তাদের ভাষায় কথা বলতে হবে, তাদের ভাষায় লিখতে হবে। এটাই ইসলামের সাংস্কৃতিক অগ্রযাত্রা। ইসলাম যখন যে জনপদে আগমন করেছে, সেই জনপদের ভাষা ও সংস্কৃতি ইসলামীকরণ করেছে।
বিগত ১৩-১৪ শ বছরে এই দেশে আরব, পারস্য, হিন্দুস্তান থেকে শত সহস্র মুসলিম মনীষীর আগমন ঘটেছে। এই দেশে জন্ম নিয়ে প্রথিতযশা আলেম হয়েছেন—ইতিহাসে এমন ব্যক্তির উদাহরণও কম নয়। তারা আরবিতে কম গ্রন্থই রচনা করেছেন। বরং বিভিন্ন মুসলিম দেশ থেকে যারাই দাওয়াতের ব্রত নিয়ে এ দেশে এসেছেন, তারা কাল পরিক্রমায় এ দেশের মানুষের ভাষায় কথা বলেছেন। তাদের নিয়ে রচিত হয়েছে বড়জোর ফার্সি বয়েত, কিন্তু অঢেল লেখা হয়েছে বাংলা পুঁথি।
বঙ্গদেশে আগত বিখ্যাত প্রত্যেকজন মুসলিম সাধককে নিয়ে বাংলায় রচিত হয়েছে পুঁথিসাহিত্য। তাতে বাংলাদেশ থেকে ইসলাম বিদায় নিয়ে ইয়েমেন চলে যায়নি। বরং তারাই এসে বাংলার মাটি-বাতাস, জল-প্রকৃতির সঙ্গে নিজেদের একীভূত করে নিয়েছেন। এর ফলে বাংলাদেশের ইসলাম এদেশের প্রতিটি জনপদের নদী, ক্ষেত, বিল, হাওড় আর শহরের সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে গিয়েছে। যে দেশের ভাষা ও কৃষ্টি-সংস্কৃতির সঙ্গে ইসলাম মিশে যেতে পারে সেই দেশে ইসলাম চিরন্তন।
দুই. আমাদের দুর্ভাগ্যই বলতে হবে, শত সহস্র বছরে এই বাংলাদেশে হাজার হাজার আলেমে দীন, শায়খ, দরবেশ, মুবাল্লিগের আগমন ঘটেছে। বাংলাদেশেও জন্ম নিয়েছেন বিরাট মাপের অনেক আলেম। কিন্তু তাদের অবদান ও জীবন সম্পর্কে আমরা সম্পূর্ণ বেখবর। না জানি তাদের ত্যাগ ও দীক্ষার কথা, আর না জানি তাদের অবদানের কথা। এই বাংলাদেশে বিগত এক হাজার বছরের ইতিহাসে ইসলাম নিয়ে আরবি, ফারসি, বাংলাভাষায় হাজার হাজার গ্রন্থ রচনা হয়েছে। কিন্তু সেগুলোর কোনো অস্তিত্ব আমাদের কাছে নেই। চিন্তা করুন, আজ থেকে সাত শ বছর আগে শায়খ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা রহ. ফারসি ও বাংলাভাষায় ইসলামি অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন বলে ইতিহাস থেকেই আমরা জানলাম। যদি সাত শ বছর আগে তিনি গ্রন্থ

রচনা করে থাকেন এবং সেগুলোর অস্তিত্ব আজ পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায়, তাহলে তাঁর পরবর্তী আলেমগণ নিশ্চয় আরও অনেক গ্রন্থ রচনা করে থাকবেন। এটাই স্বাভাবিক বিষয়। কিন্তু সেই গ্রন্থগুলো কই? আমরা জানি না। হয়তো কালের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। অথবা ইংরেজরা চুরি করে ব্রিটিশ লাইব্রেরি আর্কাইভে তালাবদ্ধ করে রেখে দিয়েছে। যদি কোনোদিন ব্রিটেনে যাওয়ার সুযোগ ঘটে, বাংলাদেশ থেকে চুরি করা সেসব দুর্লভ গ্রন্থ ব্রিটিশ লাইব্রেরির আর্কাইভে দেখতে চাই। যাই হোক, শায়খ শরফুদ্দীন নামের এই বীর হাদিসবেত্তা খুব সম্ভবত ১৩০০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে সোনারগাঁওয়ে ইন্তেকাল করেন। সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়। তাঁর মৃত্যুর বহুদিন পরও শিক্ষা জারি ছিল এই ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ে। হাদিস এবং অন্যান্য শাস্ত্রের রীতিমাফিক দীক্ষা চলত এখানে।
আজও সোনারগাঁওয়ের মোগরাপাড়ার দরগাবাড়িতে সেই ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্বংসাবশেষের দেখা পাওয়া যায়। কালের ক্ষয়ে ধ্বসে পড়েছে ইট-সুড়কি। আগাছা আর অশ্বত্থে ছেয়ে গেছে দালানের দেয়াল। যে বিদ্যায়তনে একদিন প্রথম উচ্চারিত হয়েছিল 'ক্বলা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম...' সেই জনপদ আজ ইসলামি শিক্ষাশূন্য বিরান। হাজার হাজার হাদিসের শিক্ষার্থী যেখানে হাঁটু মুড়ে বসে নিমগ্ন হতো হাদিসপাঠে, সেখানে এখন কেবলই সাপ-ইঁদুর আর পোকামাকড়ের ঘরবসতি। ন্যুব্জ প্রতিটি ইট থেকে যেন বেরিয়ে আসছে মহাকালের হাহাকার।

পাঁচ

নিচে আমি কিছু নাম উল্লেখ করছি, দেখে নিন কেউ তাদের চেনেন কি-না:
১. শেখ আখি সিরাজউদ্দীন উসমান বাদায়ুনী (১৩৫৭ খ্রিষ্টাব্দ, গৌড়)
২. নুরুদ্দিন কুতুবুল আলম (১৪১৫ খ্রিষ্টাব্দ, পাণ্ডুয়া)
৩. সফিউদ্দিন শহীদ (১২৯৫ খ্রিষ্টাব্দ, পাণ্ডুয়া)
৪. শাহ ইসলাম ঘায়ী (১৪৭৪ খ্রিষ্টাব্দ, উত্তরবঙ্গ)
৫. শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা (১৩০০ খ্রিষ্টাব্দ, সোনারগাঁও)
৬. শাহ আবদুল্লাহ কিরমানি (চতুর্দশ শতাব্দী, বীরভূম)
৭. আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানি (১৪২০ খ্রিষ্টাব্দ, জৌনপুর)
৮. শেখ জালালুদ্দীন তাবরিজি (১৩৮৪ খ্রিষ্টাব্দ, পাণ্ডুয়া)
৯. সাইয়িদ ইবরাহিম দানিশমন্দ (১৫৬০ খ্রিষ্টাব্দ, সোনারগাঁও)
১০. মাওলানা আতা (১০ম শতাব্দী আনুমানিক, দিনাজপুর)

উপরে যাদের নাম উল্লেখ করা হলো, সকলেই এই বঙ্গদেশে বসবাসকারী আলেম ও দরবেশ। পৃথিবীর নানা দেশ থেকে তারা বাংলাদেশে এসেছিলেন ইসলাম প্রচারের জন্য। তাদের ধর্মরক্ষার প্রচেষ্টা এবং ইসলাম প্রচারের নানামুখী কার্যক্রম এই বঙ্গভূমিকে ইসলামের দুর্গে পরিণত করেছে। কিন্তু আমরা তাদের জন্য কী করেছি? কিছু করা তো দূরের বিষয়, আমরা তাদের নামই ভুলে গেছি। তাদের অবদানের সামান্য তথ্যও আমাদের কাছে রক্ষিত নেই। তাদের জীবন তালাশে ইতিহাস আর গবেষণার প্রয়োজন মনে করিনি কখনো। অথচ আজকে বাংলাদেশে আমরা নামাজ পড়ছি, রোজা রাখছি, ওয়াজ মাহফিল করছি, বড় বড় মসজিদ-মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করছি, পাঁচ বেলা মিনার থেকে ধ্বনিত হচ্ছে আজান; এ কাদের অবদান? যারা রক্ত-ঘামে আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছে ইসলামের নজরানা, আমরা তাদের ভুলে গেছি বেমালুম। এমনই এক অকৃতজ্ঞ জাতি আমরা।
আমরা আরবের ইতিহাস জানি, উমাইয়া, আব্বাসি, উসমানি খেলাফতের বিস্তর ইতিহাস আমাদের নখদর্পণে। কিন্তু আমরা জানি না গৌড়ের ইতিহাস, জানি না লক্ষ্মণাবতী, পাণ্ডুয়া, ঘোড়াঘাট, সোনারগাঁও, মুর্শিদাবাদ কিংবা নদীয়ার ইতিহাস। পূর্বপুরুষদে অবদান ও ত্যাগের ইতিহাস অনুপস্থিত আমাদের পাঠ্যতালিকা থেকে।
এভাবে হয় না। এভাবে কখনো ইতিহাস রচনা



হয় না। কৃতজ্ঞতা জানানো হয় না। মুসলিম হিসেবে মাথা উঁচু করে এভাবে কখনো দাঁড়ানো যায় না। যে তার পায়ের নিচের মাটি সম্পর্কে বেখবর, সে দৃঢ়পদে দাঁড়াবে কীভাবে?

এখনও সময় শেষ হয়ে যায়নি। পাঠাগার আর কুতুবখানার অন্ধকারে পড়ে থাকা ধুলোপড়া গ্রন্থগুলো আমাদের ডাকছে। আমাদেরই খুঁজতে হবে ইতিহাসের প্রতিটি পৃষ্ঠা। ইতিহাসের প্রতিটি গলি-ঘুঁপচি তালাশ করতে হবে পূর্বপুরুষদের পদছাপ অনুসরণ করতে। সহস্র বছরের বাংলার মানচিত্রে যদি আমরা একবার নজর বুলাই, আমাদের পূর্বসূরীরা আমাদের সামনে এসে দাঁড়াবে। যদি একবার সাহস করে অনুসন্ধান শুরু করতে পারি, আপনি আমি সবাই মিলে ঠিকই একদিন তৈরি করতে পারব আমাদের গৌরবজ্জ্বল ইতিহাসের অমূল্য দাস্তান।

ছয় : একটি উপন্যাসের 'পূর্বাভাস'

ষোড়শ শতকের গোড়ার দিক। বাংলায় তখন হোসেন শাহি বংশের পতনকাল। হোসেন শাহি বংশের শেষ স্বাধীন সুলতান গিয়াসুদ্দিন মাহমুদ শাহর মসনদে লাগছিল পতনের আখেরি কাঁপন। রাজধানী গৌড়ের আসমানে ক্রমশই পুঞ্জিভূত হচ্ছিল পতনের কালো মেঘ। একদিক থেকে ধেয়ে আসছিল বিহারের সুবেদার শেরশাহের লশকর, অপরদিকে তার দরবারের কতিপয় উমারা খেলছিল গাদ্দারির এক নিপুণ খেলা।

বাংলার মসনদে হোসেন শাহি বংশের আগমন ঘটে ঈসায়ি ১৪৯৩ সালে। সৈয়দ আলাউদ্দিন হোসেন শাহ আল হোসাইনি ছিলেন এ বংশের প্রথম সুলতান। বাংলার মসনদে তার আরোহনের পথ ও পন্থা মোটেও পুষ্পসজ্জিত ছিল না। খুন এবং খঞ্জরের যথেষ্ট ব্যবহার করেই তিনি নিশ্চিত করেছিলেন গৌড়ের মসনদের সিঁড়ি। যদিও তিনি তার নামের শুরুতে 'সৈয়দ' উপাধি লাগাতে পছন্দ

করতেন, কিন্তু বাস্তব জীবনে ইসলামি তাহজিব তমদ্দুনের এখতিয়ারি করতে তিনি ছিলেন বরাবরই নাখোশ। তার চেয়ে তিনি বরং হিন্দুয়ানি আচার-অনুষ্ঠানের অনুরক্ত ছিলেন অধিক। জনশ্রুতি রয়েছে, তরুণ বয়সে কোনো এক ব্রাহ্মণের কাছ থেকে সবধর্ম সহিষ্ণু 'বৈষ্ণব ধর্মে' দীক্ষা নেন তিনি। সেই ব্রাহ্মণের আশ্রমে অতিবাহিত করেন তারুণ্যের দীক্ষাকালীন অনেকটা সময়। পরবর্তী জীবনে এই ব্রাহ্মণের শিক্ষাই তিনি তামিল করেন সর্বক্ষেত্রে।

সুলতান নিজে ব্রাহ্মণ্যবাদের অনুরক্ত ছিলেন বলে জনগণের মাঝেও হিন্দুয়ানি রীতিনীতির ব্যাপকতা ছড়িয়ে দেন। ফলে কিছুদিনের মধ্যে মুসলিম সমাজের ধর্মীয় বা সামাজিক অনুষ্ঠানে ঢুকে পড়ে হিন্দুয়ানি আচার-অনুষ্ঠান, সংস্কৃতি-প্রবণতা।

মুলকে বাংলায় এর আগে যদিও হিন্দু-মুসলমান সহাবস্থান ছিল, কিন্তু তাদের সংস্কৃতি ছিল স্বতন্ত্র। সুলতান ও তার কিছু ব্রাহ্মণ উমারার কূটচালে ধীরে ধীরে ভেঙ্গে পড়ে সেই স্বাতন্ত্রবোধ। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহের শাসনামলেই মূলত সাড়ম্বরে মুসলিম তাহজিব-তমদ্দুনে হিন্দু সংস্কৃতির অনাধিকার অনুপ্রবেশের দ্বার তার স্বহস্তে উন্মোচিত হয়। ঈসায়ি ১৪৯৩ থেকে ১৫১৯ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ শাসনকালে সুলতান হোসেন শাহ একজন যোগ্য শাসকের ভার কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন–একথা ঐতিহাসিক সত্য ধরা হলেও, তিনি যে ইসলামি মূল্যবোধকে নিজের কাঁধে থেকে নিপাট নির্দ্বিধায় নামিয়ে দিয়েছিলেন, সে ইতিহাসও বিস্মৃত নয়।

১৫১৯ সালে তার মৃত্যুর পর গৌড়ের মসনদে আধিষ্ঠিত হন তার পুত্র নাসিরউদ্দীন নসরত শাহ। একজন প্রজাদরদি শাসক হিসেবে তিনি ছিলেন মশহুর। তার শাসনামলে তিনি মুসলিম সমাজ থেকে বিদআত, কুসংস্কার, ভিন্ন সংস্কৃতির লেজুড়বৃত্তিকে দূর করার কোশেশ করেন বটে, তবে তার প্রচেষ্টা বড় একটা ফলপ্রসু হয়নি। কারণ শাহিমহল এবং সমাজের অভিজাতশ্রেণির অন্দরমহলে ততোদিনে ঢুকে পড়েছিল সুরাপানের চমকদার সোরাহি আর দিল-বেচাইনি সুরেলা সেতার। হিন্দুদের পূজা-পার্বনে নাচ আর ভজন গাইতে আসতো যেসব বাঈজী-নর্তকীরা, তাদের নিয়মিত ডাক পড়তো মুসলিম অভিজাত মহলের বালাখানায়। একথা যেন বাংলা আরেকবার স্মরণ করতে পারলো–জাতির মগজের মধ্যে যখন পঁচন শুরু হয় তখন সে পঁচন সহজেই পুরো শরীরে ছড়িয়ে পড়ে।

ঈসায়ি ১৫৩২ সালে নাসিরউদ্দীন নসরত শাহর মৃত্যুর পর গৌড়ের মসনদে বসেন তার পুত্র আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহ। ১৫৩৩ সালে দৈবক্রমে তার মৃত্যু হলে আলাউদ্দিন হোসেন শাহর আরেক পুত্র গিয়াসুদ্দিন মাহমুদ শাহ বাংলার মসনদে আরোহন করেন। ধর্মপরয়াণ এবং একজন যোগ্য শাসক হওয়ার সমস্ত গুণাবলি তার মাঝে বিদ্যমান থাকলেও ভাগ্য সম্ভবত বাংলার ললাটলিখন লিখেছিলেন অন্যভাবে।

গিয়াসুদ্দিন মাহমুদ শাহর শাসনের তৃতীয় বছরের শুরুতে হঠাৎই বাংলার আকাশে জমতে থাকে দুর্যোগের কালোমেঘ। খবর পাওয়া যায়, বিহারে নিযুক্ত দিল্লির সুবাদার শেরশাহ বিরাট ফৌজ নিয়ে বাংলা আক্রমণের অভিলাষে গৌড়াভিমুখে রওনা দিয়েছেন। সুলতান গিয়াসুদ্দিন মাহমুদ শাহ শেরশাহকে নিরস্ত্র করতে সন্ধির পয়গাম পাঠান। বিশাল অঙ্কের নগদ অর্থ পেয়ে শেরশাহ বাংলা আক্রমণ না করে আবার বিহারে ফিরে যান। কিন্তু সুলতান গিয়াসুদ্দিন মাহমুদ শাহ সম্ভবত শেরশাহকে চিনতে ভুল করেছিলেন। এবং এই গোপন খবর জানতেও তিনি বেখবর থাকেন যে, শেরশাহকে বাংলায় হামলা করার জন্য গোপনে আহবান জানিয়েছিল তার দরবারেরই কতিপয় উচ্চাভিলাষী উমারা। যারা স্বাধীন বাংলার আকাশের নিচে নিঃশ্বাস নিয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে রঙমহলের আলো-আঁধারিতে শ্বাস নিতে বেশি অভ্যস্ত ছিল। ফলে ঈসায়ি ১৫৩৭ সালে শেরশাহ ফের বাংলা আক্রমণ করেন। শেরশাহকে রুখার মতো লশকর যদিও বাংলার ফৌজি ছাউনিতে ছিল, কিন্তু সুলতানের সেইসব উমারার কূটচালে বাংলার লশকর রাজধানী ছেড়ে বিভিন্ন দূরবর্তী ছাউনিতে

তাহলে কেন এতটুকু ভূমিকা এখানে উল্লেখ করলাম? আছে, কারণ আছে। এই ভূমিকা হারিকেনের একটা সলতের মতো। যেটা আগুন জ্বেলে কেবল আমাকে নয়, আলোকিত করবে আরও শত জনকে। যারা বাংলার ইতিহাস পড়তে চায়, লিখতে চায়, জানতে চায়–এই ভূমিকা তাদের আলোড়িত করবে প্রতি রাতে। তাদের বুকের মধ্যে দীপশিখা হয়ে জ্বলতে থাকবে নিরবধি। যতক্ষণ পর্যন্ত না বাংলাদেশে নিজেদের পূর্বপুরুষদের ইতিহাস দৃঢ় হাতে লেখা হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এই সলতের আগুন ফুরোবে না।

সরিয়ে ফেলা হয়। শেরশাহ রাজধানী গৌড়ে হামলা করলে সুলতান গিয়াসুদ্দিন মাহমুদ শাহ রাজধানী হেফাজতের দায়িত্ব তার দুই শাহজাদার হাতে অর্পণ করে তিনি ভাটি অঞ্চলে তার জামাতা সুলায়মান খানের কাছে সাহায্যের জন্য গৌড় ত্যাগ করেন।

বাংলার মসনদ খালি দেখে শেরশাহ প্রবলবেগে ধেয়ে আসেন রাজধানী গৌড়ের দিকে। গৌড়ের ফৌজিনিবাসের মুষ্টিমেয় সেনাবাহিনী কোনো প্রতিরোধই গড়ে তুলতে পারলো না। শেরশাহ খুব সহজেই পরাজিত করেন দুই শাহজাদার মামুলি প্রতিরোধকে। প্রবল বিক্রমে রাজধানীতে প্রবেশ করে শুরু করেন লুটতরাজ। পুরো গৌড় নগরীকে তিনি ধ্বংস্তূপে পরিণত করেন। পর্তুগিজ বর্ণনামতে, শেরশাহ রাজধানী গৌড় দখল করে বিশ মণ সোনার গহনা ও ছয় কোটি স্বর্ণমুদ্রা হস্তগত করেন।

এদিকে সুলতান গিয়াসুদ্দিন মাহমুদ শাহ ভাটি অঞ্চলে তার জামাতা সুলায়মান খানের আশ্রয়ে যাওয়ার পথে টাঙ্গাইলের আতিয়া নামক স্থানে ইন্তেকাল করেন এবং তাকে সেখানেই দাফন করা হয়। তবে শাহি পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা নিরাপদেই সুলায়মান খানের জায়গির 'সরাইলে' পৌঁছতে সক্ষম হন।

সুলতান গিয়াসুদ্দিন মাহমুদ শাহ'র ইন্তেকালের সাথে সাথে শেষ হয় বাংলার দু'শো বছরের স্বাধীন সুলতানি আমল। এরপর বাংলার মসনদ কব্জা করে দিল্লির আধিপত্যবাদী শাসকেরা।

আর ঠিক এই সময় থেকে বাংলার ইতিহাসে সূচিত হয় এক নতুন অধ্যায়। শত শত বছর ধরে বাংলার যে পাক জমিনে রোপিত হয়েছিল আজাদির বীজ, যে ময়দানে ঝলসে উঠেছিল বখতিয়ারের নাঙা তলোয়ার, যে আকাশে একবার উত্থিত হয়েছিল আজানের

তাকবিরধ্বনি–সে বাংলাকে কখনো পরাধীন করা যায় না।
গৌড়ের সিংহাসন থেকে সুলতানি শাসন শেষ হওয়ার পরই দিল্লির মুঘল সালতানাতের অধীনে চলে যায় মুলকে বাংলা। মুঘলদের অধীনে চলে গেলেও বাংলার আজাদির আওয়াজ কখনো থেমে থাকেনি। সুলতানি আমল শেষ হওয়ার পরপরই দিল্লির আধিপত্যবাদী কায়েমি শাসনের বিরুদ্ধে হতিয়ার তুলে নেয় বাংলার মুষ্টিমেয় কয়েকজন জমিদার। যারা পরাধীনতার সোনার জিঞ্জিরের চেয়ে বেশি পছন্দ করতো আজাদির খুন রাঙা পথ। এই জমিদারদের নেতৃত্ব দেন প্রয়াত সুলতান গিয়াসুদ্দিন মাহমুদ শাহর জামাতা সুলায়মান খান।
সুলায়মান খানের ব্যাপারে ইতিহাস কথা বলেনি খুব বেশি। পূর্বাপর ইতিহাস থেকে জানা যায়, যৌবনে তিনি ছিলেন হিন্দু ধর্মাবলম্বী। ভারতের অযোধ্যা থেকে ভাগ্যান্বেষণে গৌড়ে এসে সুলতানের নেকনজরে পড়ে যান। সুলতানের আরেক জামাতা ইবরাহিম মালেকুল উলামার বদান্যতায় তিনি রাজস্ব বিভাগে চাকরি পান। সুলতানের অধীনে চাকরি করার সময় ইসলামের মহানুভবতা দেখে ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হন এবং নিজের কর্মদক্ষতা, মেধা, সততা, যোগ্যতা দিয়ে তিনি সুলতানকে এতোটাই মুগ্ধ করেন যে, সুলতান নিজের কনিষ্ঠ কন্যাকে তার কাছে বিয়ে দিয়ে তাকে নিজের জামাতা হিসেবে গ্রহণ করে নেন। বিয়ের পর সর্ববিদ্যায় পারদর্শী এ জামাতাকে উপহারস্বরূপ প্রদান করেন ভাটি অঞ্চলে সরাইল পরগণার জায়গির। জায়গির পাওয়ার পর সুলায়মান খান সস্ত্রীক সরাইলে বসবাস শুরু করেন।
ওদিকে শেরশাহ যদিও দিল্লির নিযুক্ত বিহারের সুবাদার ছিলেন, কিন্তু তিনি বাংলা দখল করেন দিল্লির আদেশে নয়, বরং নিজের লোভ ও উচ্চাভিলাষ চরিতার্থে। যার দরুণ দিল্লির মোগল সম্রাট হুমায়ুন ১৫৩৮ সালে বাংলা আক্রমণ করে শেরশাহের দখল থেকে বাংলা ছিনিয়ে নেন। সম্রাট যখন বাংলা থেকে দিল্লির পথে যাত্রা করেন তখন শেরশাহ বক্সরের কেল্লার নিকটবর্তী চৌসার ময়দানে সম্রাট হুমায়ুনের বাহিনীর উপর আচমকা হামলা করেন। বক্সরের লড়াইয়ে সম্রাট পরাজিত হয়ে দিল্লির দিকে পালিয়ে যান। শেরশাহ এই বিজয়ে উদ্দীপ্ত হয়ে বিহারের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং ত্বরিতবেগে বাংলায় হামলা চালিয়ে দিল্লির নিযুক্ত সুবাদার জাহাঙ্গীর কুলিকে পরাজিত ও হত্যা করে পুনরায় বাংলা দখল করে নেন। ১৫৪০ সালে শেরশাহ কানৌজের যুদ্ধে সম্রাট হুমায়ুনকে পরাজিত করে দিল্লির মসনদ দখল করে নেন।
ঈসায়ি ১৫৪০ সালে শেরশাহ দিল্লির সম্রাট হলেও নানা কারণে তিনি বাংলার দিকে খুব একটা নজর দিতে পারেননি। এ সময় তিনি হিন্দুস্তানের বিভিন্ন মোগল সুবাদারদের বিদ্রোহ দমনে ছিলেন মশগুল। ফলে বাংলার কয়েকজন জায়গিরদার ও জমিদার সুলায়মান খানের পতাকাতলে একতাবদ্ধ হন দিল্লির কায়েমি শাসনের নাগপাশ থেকে বাংলাকে আজাদ করার প্রত্যয়ে। গোপনে ধীরে ধীরে তারা বাড়াতে থাকেন তাদের ফৌজ এবং নিজ নিজ অঞ্চলে গড়তে থাকেন প্রতিরোধ ব্যূহ।
ঈসায়ি ১৫৪৫ সালে শেরশাহের ইন্তেকালের পর দিল্লির মসনদে আরোহণ করেন তার পুত্র ইসলাম শাহ। শেরশাহ জীবদ্দশায় বাংলার দিকে নজর না দিতে পারলেও তার পুত্র ইসলাম শাহ একই ভুল করতে ছিলেন নারাজ। মসনদে আরোহন করেই তিনি শামসউদ্দিন মুহাম্মদ খান সুরকে বাংলার সুবাদার করে পাঠান।
সুবাদার মুহাম্মদ খান বাংলায় আগমনের পরপরই সমগ্র বাংলা দিল্লির নিয়ন্ত্রণে আনার প্রচেষ্টা চালান। কিন্তু ততোদিনে দেরি হয়ে গেছে অনেক। পূর্ব বাংলার ভাটিরাজ্যের জায়গিরদার সুলায়মান খান শক্তভাবে ভিত রচনা করে ফেলেছেন সরাইল ও তার আশপাশের এলাকায়। বাংলার পূর্বাঞ্চলের আজাদিকামী অন্যান্য জমিদারদেরও করে নিয়েছেন সংঘবদ্ধ। তাকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছিলেন তরফরাজ্যের সুবাদার ও সুলতান গিয়াসুদ্দিন মাহমুদ শাহর বড় জামাতা ইবরাহিম মালেকুল উলামা। যার হাত ধরে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে এসেছিলেন

জায়গিরদার সুলায়মান খান।
ঈসায়ি ১৪৪৬ সালে দিল্লির সুবাদার মুহাম্মদ খান সুর ও বাংলার সম্মিলিত বিদ্রোহী বাহিনীর প্রধান সুলায়মান খানের সাথে কয়েকটি খণ্ডযুদ্ধ সংঘটিত হয়। মুহাম্মদ খান সুর সব ক'টি লড়াইয়ে পরাজিত হয়ে রাজধানী গৌড়ে ফিরে আসেন। দিল্লির সম্রাট এ খবর পেয়ে ক্রোধে ফেটে পড়েন এবং তখনই মুঘল ফৌজের নামকরা দুই সেনাপতি– তাজ খান ও দরিয়া খানকে বিপুল সৈন্য সামন্ত দিয়ে বাংলায় প্রেরণ করেন। অবশেষে লক্ষ্যা নদীর তীরে পানিশ্বর নামক ময়দানে এক মরনপণ লড়াইয়ে পরাজিত হয়ে সুলায়মান খান দিল্লির সাথে সন্ধি করতে সম্মত হন।
সন্ধিবস্থায় অল্প কিছুদিন সময় অতিবাহিত হয়। কিন্তু এর কিছুদিন পর বাংলার কয়েকজন জমিদার সুলায়মান খানের সঙ্গে বিদ্রোহে একাত্মতা ঘোষণা করলে তিনি আবার বিদ্রোহ করেন। তিনি বিদ্রোহ করেন এমন এক মোক্ষম সময়ে যখন দিল্লিবাহিনীর ভেতরে চলছিল ক্ষমতার দ্বন্দ। যার দরুণ বাহিনী ছিল বিশৃংখল ও ছত্রভঙ্গ। এ সময় সুলায়মান খান কয়েকটি যুদ্ধে মুঘলদের পরাজিত করতে সক্ষম হন।
দিল্লির সম্রাট থেকে দুই সেনাপতি তাজ খান ও দরিয়া খানের ওপর কড়া নির্দেশ ছিল–সুলায়মান খানকে হত্যা না করে তারা যেন দিল্লি ফেরত না আসে। কোনোভাবেই সুলায়মান খানকে পরাস্ত করতে না পেরে মুঘল সেনাপতি তাজ খান ও দরিয়া খান এক ঘৃণিত চক্রান্তের আশ্রয় নেন। তারা বুঝতে পেরেছিলেন বাংলার এই লড়াকু সিপাহিকে লড়াই করে পরাভূত করা যাবে না। তাই তারা সুলায়মান খানকে আলোচনার জন্য তাদের শিবিরে ডেকে আনেন। দিল্লির সেনাপতিদের সঙ্গে আলোচনা করতে তাদের শিবিরে এলে সুলায়মান খানকে নির্মমভাবে শহিদ করা হয়।
তার হত্যার মধ্য দিয়ে বাংলার জমিদার ও জায়গিরদারদের নিয়ে দিল্লির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ কিছুদিনের জন্য স্তিমিত হয় বটে, তবে মোগল



সেনাপতিদ্বয় যেমন ভেবেছিলেন সুলায়মান খানের মৃত্যুর ভেতর দিয়েই খতম হয়ে যাবে বাংলার আজাদিপাগল মানুষের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা, চিরদিনের জন্য তাদেরকে আবদ্ধ করে ফেলবেন দিল্লির কায়েমি শাসনের জিঞ্জিরে; এ ছিল তাদের এক বড় ভুল।
সুলায়মান খানের শাহাদাতের মধ্য দিয়ে বাংলার সেই ইতিহাসের শুরু হলো কেবল– যে ইতিহাস পরবর্তী পাঁচশো বছর বাংলাকে করে তুলেছিল স্বাধীনতার অতল পিয়াসী। স্বাধীনতার যে বীজ সুলায়মান খান নিজের খুন ঢেলে রোপন করে গিয়েছিলেন বাংলার জমিনে, বছরে বছরে তা ফলিয়েছে স্বাধীনতার সূর্যসন্তানদের, বাংলার প্রতিটি দীপশিখায় প্রতিদিন জ্বলে উঠেছে চেতনার অবিনাশী বহ্নি হয়ে। সুলায়মান খানের শাহাদাত বাংলার বুকে সর্বপ্রথম আওয়াজ তুললো স্বাধীনতার।
শহীদ হওয়ার পূর্বে সুলায়মান খান তার দশ বছর বয়সী কিশোর ছেলের হাতে তুলে দিয়েছিলেন একটি জাতির মুক্তির পরোয়ানা। বুকের ভেতর সিল করে দিয়েছিলেন বাংলার আজাদির সনদ। সেই কিশোরই একদিন হয়ে উঠেন বাংলার আজাদির মহানায়ক, বারোভূঁইয়ার সিপাহসালার–ঈসা খান। শুরু হয় এক নতুন ইতিহাস। শুরু হয় বাংলার আজাদির লড়াইয়ের এক নতুন দাস্তান।

[এটি একটি উপন্যাসের ভূমিকা। লিখেছিলাম আজ থেকে ১৫ বছর আগে। সে সময় ঈসা খানকে নিয়ে বছরখানেক বেশ বুঁদ হয়ে পড়ে রইলাম। যেখান থেকে পারি বইপত্র সংগ্রহ করে পড়াশোনা করলাম। মনে প্রবল ইচ্ছা–ঈসা খানের ওপর একট উপন্যাস লিখেই ফেলবো। দু-তিনবার দুটো পাণ্ডুলিপিতে ২০-৩০ পৃষ্ঠা করে লিখেও ফেললাম। কিন্তু কেন যেন আর লেখা হয়ে উঠল না। এই ভূমিকাটা ছিল ওই বুঁদ-জমানার একদম শেষদিককার লেখা। ভূমিকাটাই কেবল কম্পোজ করা হয়েছিল, বাদবাকি পৃষ্ঠাগুলো কই আছে–আমি নিজেও জানি না। তাহলে কেন এতটুকু ভূমিকা এখানে উল্লেখ করলাম? আছে, কারণ আছে। এই ভূমিকা হারিকেনের একটা সলতের মতো। যেটা আগুন জ্বেলে কেবল আমাকে নয়, আলোকিত করবে আরও শত জনকে। যারা বাংলার ইতিহাস পড়তে চায়, লিখতে চায়, জানতে চায়–এই ভূমিকা তাদের আলোড়িত করবে প্রতি রাতে। তাদের বুকের মধ্যে দীপশিখা হয়ে জ্বলতে থাকবে নিরবধি। যতক্ষণ পর্যন্ত না বাংলাদেশে নিজেদের পূর্বপুরুষদের ইতিহাস দৃঢ় হাতে লেখা হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এই সলতের আগুন ফুরোবে না।]

লেখক: নির্বাহী সম্পাদক, নবধ্বনি



সিরাতচর্চার সূচনা বিকাশ ও সমৃদ্ধি

যিয়াদ বিন সাঈদ

শুষ্ক মরুপ্রান্তর আর সারিসারি পাহাড়ঘেরা এক অভিনব নগরী মক্কা। মক্কার বুকেপিঠে রোজকার দিনগুজরানো লোকগুলোর হৃদয়ও যেন একেকটি উজান সাহারা; যেখানে পানি নেই, শূন্য শূন্য পেয়ালা। অথবা তাদের হৃদয়গুলো এমন, যেন সময়ে-অসময়ে ছুটে বেড়ায় সাফা থেকে মারওয়া বিবি হাজেরার মতো উদগ্র বাসনা নিয়ে। তারা জানে না কবে, কোত্থেকে একপশলা রহমের বৃষ্টি পবিত্র করবে তাদের দেহমন, মেটাবে আজন্মের পিপাসা। এই ঘনঘোর অনাচারের মত্ততা থেকে ফিরে আসার পথটি পাওয়ার আনন্দও তাদের খুব অচেনা।

অনুভূতিশূন্য এ মানুষগুলোর চারিদিকে বইছে কেবলই পাপাচার। পবিত্র ঘরটি জুড়ে অসংখ্য প্রতিমা দাঁড়িয়ে আছে। যত্রতত্র পড়ে আছে নোংরা যত সব ছবি। অন্যকে শোষণ আর অন্যায় আচরণ তখনকার নিত্তনৈমিত্তিক ঘটনা। নৈতিকভাবে এতটাই অধঃপতিত তারা, নিছক বংশগৌরব ও খাদ্যসংকটের আশঙ্কায় তাদের মেয়েশিশুরা জীবন্ত সমাহিত হচ্ছে। যেন পৃথিবীর পূর্বাপর সমগ্র জাহিলিয়্যাতের এক অভিনব সম্মিলন এ মক্কার দিগ্বিদিকে, প্রতিটি প্রান্তে।

এমন এক মক্কার বুকে মক্কার বাতাসের গতিপথ থেকে নিজেকে আড়াল করে রাখবার মতোই কেউ যেন উদয় হলেন। যিনি জানতেন ভালো-মন্দের পার্থক্য। অরাজকতা, অনাচার, ধোঁকা আর প্রবৃত্তির আবদিয়্যাতের মধ্যে নিজেকে সংবরণ করে রাখবার এক জীবন্ত নমুনা যিনি। বিনয়াবনত সমুজ্জ্বল প্রদীপের আলোয় রাঙা একজন মহান মানুষ। শত বছর পাপাচারে জড়িয়ে অন্তর মরে যাওয়া মক্কার সেই ফাসেক-ফুজ্জার অধিবাসীরাও যেন তাঁর প্রেমের কাছে পরাজিত। পরাজিত তাঁর আকাশস্পর্শী চরিত্রের কাছে। অবশ্যই সে মানুষটি কেবল মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম।

অবিসংবাদিত নেতা হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের এ নামটি জুড়ে যেন সত্যিই রচিত হয়ে গেছে এক পৃথিবীর অবিস্মরণীয় এক মহাবিপ্লব। সূচিত হয়েছে মানবেতিহাসের একটি সম্পূর্ণ নতুন ও অভিনব অধ্যায়। যে অধ্যায়ের প্রতিটি স্কন্ধ-শিরায় খচিত আছে উত্থান-পতন, ত্যাগ-তিতিক্ষা এবং বিজয়ের সুপ্রশস্ত হাসি-কান্নার অমোঘ মিশেল। ঐশীভাবে পবিত্রতার ছাপ যার প্রতিটি শিরা-উপশিরায়। মহান প্রভুর নিজস্ব ইশারায় ঐশ্বরিক আলোকে রাঙায়িত যেন তাঁর এ 'মুহাম্মাদি জীবন'। ভাবলে পুলকিত হতে হয়–ব্যক্তি, সমাজ এবং রাষ্ট্র ছাপিয়ে কোন অঙ্গনটি অপূরণীয় রয়ে গেছে এ জীবন থেকে? কখনো শিক্ষকের মসনদে অথবা মাঝেমাঝে রাষ্ট্রপ্রধানের সম্মানে, আবার কখনোসখনো মেষের পাল নিয়ে মক্কার ধূ ধূ প্রান্তরে ঘুরে ঘুরে। কী অভূতপূর্ব! নিজেকে গোছিয়ে, অপরকে সাজিয়ে আলোয় ভরিয়ে দিয়ে গেছে পুরোটা পৃথিবী। প্রমাণ করেছেন সত্যিই এ এক 'উসওয়াতুন হাসানাহ'।

অবিশ্বাস্যই বটে, তিনি ইতিহাসের এক বিরলতম শক্তির অধিকারী, যাঁর জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত মানবের ইতিহাসে হরফে হরফে লিখিত এবং উচ্চারিত। ভেতরগত-বহিরাগত সব কিছুই তো চর্চায় অগ্রগণ্য। এমন দুঃসাহসী হবার বল কি আছে কারও, যাঁর জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত লিপিবদ্ধ হবে, হবে চর্চিত? বিন্দুমাত্র দোষের দাগটুকু যে জীবন থেকে মুক্ত, তাঁর ছাড়া কার আছে এত বড় দুঃসাহস?

যেন এক অনস্বীকার্য কৃতিত্ব এটি, নবিজীবনের এই বৈপ্লবিক উপাখ্যান এবং সাফল্যের এই কীর্তি বয়ানে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম একমাত্র ব্যক্তি, যাঁর জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে পাখির দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। শুধু যে জীবদ্দশায়, তা নয়, মৃত্যু-পরবর্তী সময়েও মহাসমারোহে বিশ্লেষিত হয়েছে তাঁর সমস্ত জীবন। তাঁর জীবনের ঘটে যাওয়া ঘটনাপঞ্জি, মুখ থেকে বেরিয়ে আসা পবিত্রতম বাক্য এবং তাঁর কার্যকলাপসহ সম্মতি বা ক্ষোভের বিষয়গুলোও লিপিবদ্ধ হয়েছে গ্রন্থে গ্রন্থে। জীবনের এই ভয়াবহ পথে চলার উপপাদ্য প্রতিপাদ্য হিসেবে সম্মুখে রাখা হয়েছে এই পবিত্র জীবন।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সুরম্য জীবনের এই বয়ান তো সামান্য নয়।

বিস্তৃত এবং সুপ্রশস্ত। মহান এবং অবশ্যই আলোচনার সবচেয়ে উপযোগী। তবে আমাদের আজকের আলাপ সেদিকে নয়। তাঁর এই বর্ণাঢ্য জীবনের বর্ণনার গতিধারা কখন কীভাবে কোন মাত্রায় আজ পর্যন্ত পৌঁছুলো, কখন কেমন করে হলো 'সিরাতচর্চা' এবং যুগ থেকে যুগান্তরে কীভাবে ছড়িয়ে পড়ল সিরাতচর্চার বৈপ্লবিক গতি-প্রকৃতি, তা নিয়েই আমাদের আজকের সব কথা।
সিরাত শব্দটি সত্তাগতভাবে এমন বিস্তৃত অর্থ ধারণ করে আছে যার মধ্যে জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত চলার পথের যে বিশাল সময়টুকু, তার সবটাকেই অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া যায়। যদিও ইসলামের প্রথম যুগে সিরাত কেবল নবিজি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের ওই সফরগুলোকেই বলা হতো, যা তিনি যুদ্ধের উদ্দেশে সম্পন্ন করতেন। পরবর্তীকালে এ সিরাত শব্দের বিস্তৃতি এতটাই ব্যাপ্ত হয়েছে, যুদ্ধাভিযান ছাড়াও তাঁর পূর্ণ ব্যক্তিগত ও পারিবারিক বিবরণ, বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি, অভ্যাস, এবং যাবতীয় সব বিবরণ এতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। ফলে 'সিরাত'-এর আকারও ক্রমান্বয়ে বড় পরিসরে অগ্রসর হয়েছে।

সিরাতচর্চার সূচনা

পৃথিবীর সবচেয়ে নির্ভুল যে ব্যক্তিটি, তিনিই তো নবিজি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম। একজন নবি ও খোদা তাআলা-প্রেরিত রাসুল হিসেবে তাঁর ব্যক্তিসত্তার মৌলিক রূপ কুরআনুল কারিম অধ্যয়ন করার মাধ্যমেই স্পষ্ট হয়ে যাওয়া সম্ভব। কিন্তু তাঁর জীবনের বিশাল ফিরিস্তি বর্ণনা বা 'সিরাত'-এর বিশদ বর্ণনার প্রধানতম মারজি' হলো একমাত্র সাহাবায়ে কেরাম আজমাঈন রাদিয়াল্লাহু আনহুমের আগ্রহের প্রচণ্ডতা। যাঁরা শেষ অস্তিত্বটুকু দিয়ে হলেও তাঁদের মহান নেতা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে থেকেছেন। সংগ্রাম করেছেন। যুদ্ধপরবর্তী সময়ে তাঁর দীর্ঘ বর্ণনাও তাঁরা দিয়ে গেছেন। এখান থেকেই সূচিত হয়েছে সিরাত চর্চার ঐতিহাসিক অধ্যায়।
হাদিসের গ্রন্থগুলোতে দেখা যায় এ ক্ষেত্রে বর্ণনায় অগ্রবর্তী ভূমিকায় ছিলেন হজরত আলি, হজরত আব্বাস, হজরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ, হজরত জায়েদ বিন সাবিত, হজরত আবু কাতাদাহ, হজরত আবু মুসা আশআরি, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুম প্রমুখ সাহাবি। যেমন হুনাইনের যুদ্ধের বর্ণনা পাওয়া যায় হজরত আবু কাতাদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণনাসূত্রে। হজরত সালামাহ ইবনুল আকওয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে পাওয়া যায় হুদাইবিয়ার সেই ঐতিহাসিক সফরের বর্ণনাগুলো। এমনিভাবে তাঁরই সূত্র ধরে খায়বারের বর্ণনাগুলোও পাওয়া যায়। পাশাপাশি হজরত তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু উহুদ যুদ্ধের বর্ণনা আর হজরত সাহাল ইবনে সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু খন্দক যুদ্ধের বর্ণনা দিয়েছেন। এমন করেই প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করা সাহাবিগণ বিভিন্ন গাজওয়ার বর্ণনা দিয়ে গেছেন।
এ বর্ণনাকারীদের দ্বিতীয় স্তরে রয়েছেন হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, হজরত বারা ইবনে আজেব, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস, হজরত আনাস ইবনে মালেক এবং হজরত আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহুম প্রমুখ সাহাবি। এ সাহাবিদের বর্ণনা-অনুসারে পরবর্তীকালে সিরাতের নানাদিকের চর্চা শুরু হয়েছে।

প্রথম যুগে সিরাত

সিরাত সম্পর্কিত বর্ণনায় এ যুগে সবচাইতে অগ্রগামী এবং গভীর আগ্রহ লালন করতেন হজরত সাহাল ইবনে আবি হাসামাহ ও হজরত সাঈদ ইবনুস সাদ ইবনে উবাদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুমা। এ দুজন সাহাবি তৎকালে সিরাতের ওপর ছোট্ট সংকলনও তৈরি করেছিলেন।

তাবেয়িনে কেরামের হাতে সিরাতচর্চা

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের যুগ অতিক্রান্ত হওয়ার পর তাবেয়িনে কেরাম

সিরাতচর্চার ধারা সমুন্নত রাখেন। বরঞ্চ তাঁরা সিরাতের অগ্রসরমান ধারায় নতুন মাত্রা যোগ করেন। বিভিন্ন গাজওয়া এবং সিয়ার সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরামের বর্ণনাগুলো সংকলন করে রাখেন; যার ফলে সে বর্ণনার সূত্রগুলো আজও প্রশ্নাতীত হয়ে সগৌরবে বলবৎ আছে।

সাইদ ইবনুল মুসাইয়্যিব রহমতুল্লাহি আলায়হি (মৃত্যু : ৯৪ হিজরি) এ যুগের সিরাত-রচয়িতাদের অন্যতম। তাঁর সঙ্গে রয়েছেন আবু ফুদালাহ আবদুল্লাহ ইবনে কাব ইবনে মালিক রহমতুল্লাহি আলায়হি (মৃত্যু : ৯৭ হিজরি), আবান ইবনে উসমান ইবনে আফফান রহমতুল্লাহি আলায়হি (মৃত্যু : ১০১ হিজরি), আমির ইবনে শুরাহিল শাবি রহমতুল্লাহি আলায়হি (মৃত্যু : ১০৩ হিজরি), কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর সিদ্দিক রহমতুল্লাহি আলায়হি, মুসা ইবনে উকবাহ রহমতুল্লাহি আলায়হি (মৃত্যু : ১৪০ হিজরি), ওয়াহহাব ইবনে মুনাব্বাহ রহমতুল্লাহি আলায়হি (মৃত্যু : ১৪৪ হিজরি), আসেম ইবনে উমর ইবনে কাতাদাহ রহমতুল্লাহি আলায়হি, ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে মুসলিম কুরাশি রহমতুল্লাহি আলায়হি এবং ইমাম জুহরি রহমতুল্লাহি আলায়হির মতো প্রখ্যাত তাবেয়িনে কেরাম। সিরাতের ওপর এ আলেমদের স্বরচিত গ্রন্থ সিরাতের সঠিক তথ্য সংরক্ষণে অনেক সহায়ক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে। অনেক বড় বড় সিরাতগ্রন্থে তাঁদের বর্ণনা গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে প্রশ্নাতীতভাবে।

পরবর্তীকালে সিরাতের ক্রমবিকাশ

হিজরি প্রথম শতাব্দীর শেষ দিকে এবং দ্বিতীয় শতাব্দীর কিছুকাল পেরিয়ে গেলে সিরাত-সাহিত্য ও এর গতানুগতিক ধারার পরিবর্তন ঘটে। বিস্তৃত আকারে উপস্থাপিত হতে শুরু করে নবিজীবন। কেবল ভ্রমণবিষয়ক আলাপ এবং যুদ্ধাভিযান সম্পর্কিত বর্ণনার ভেতরে সীমাবদ্ধ না থেকে নবিজীবনের পূর্বাপর সময়কাল, এমনকি তৎসংশ্লিষ্ট আলোচনাসহ সবকিছুই অন্তর্ভুক্ত হতে থাকে। এ ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা রাখেন প্রখ্যাত সিরাত-রচয়িতা ইবনে ইসহাক (মৃত্যু : ১৫১ হিজরি)। মা'মার ইবনে রাশিদও (মৃত্যু : ১৫০ হিজরি) তাঁর সমকালীন সীরাত বিশেষজ্ঞ। সিরাতের এ পরিবর্তনীয় ধারায় ইবনে ইসহাকের পাশাপাশি আবু মুহাম্মদ আবদুর রহমান ইবনে আবদুল আজিজ, মুহাম্মদ ইবনে সালেহ ইবনে দিনার, আবদুল্লাহ ইবনে জাফর এবং আবু মা'শার প্রমুখ সিরাত-গবেষকদের কার্যক্রমও উল্লেখযোগ্য। পরবর্তীকালের সিরাত-গবেষণায় এ কালের সর্বাধিক উচ্চারিত যে বর্ণনাকারীদের নাম উঠে আসে তাঁদের মধ্যে আবু ইসহাক ইবরাহিম ইবনে ফাজারি (মৃত্যু : ১৮৬ হিজরি), ইয়াহইয়া ইবনে সাইদ উমাবি (মৃত্যু : ১৯৪ হিজরি) এবং ওয়ালিদ ইবনে মুসলিম দিমাশকি (মৃত্যু: ১৯৫ হিজরি) অন্যতম। সিরাতের ওপর এ যুগে তাঁদের অনন্য স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচিত ছিল।

সিরাতের পুনর্বিন্যাস ও তৃতীয় শতাব্দী

হিজরি দ্বিতীয় শতাব্দীর একেবারে শেষে ও তৃতীয় শতাব্দীর শুরুর দিকে সিরাত-সাহিত্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও নতুন মোড় তৈরি হয়। অভিনবত্ব, তথ্যের যাচাই-বাছাই, পরিমার্জন ও বিন্যাসের ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায় নতুন কার্যক্রম। এ কাজটি সূচিত হয় প্রখ্যাত সিরাত-গবেষক আবদুল মালেক ইবনে হিশামের (মৃত্যু : ২১৩ হিজরি) সুচিন্তিত পন্থায়। তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্যের ফলে পরিমার্জিত হয়ে প্রকাশিত হয় 'সিরাতে ইবনে হিশাম'। যেখানে ইবনে ইসহাকের তথ্যের অপূর্ণতা এবং স্বনির্ভরতার বাছবিচার সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পরিমার্জনের এ

সময়ে তাঁর সঙ্গে মুহাম্মদ ইবনে সাদের (মৃত্যু : ২৩০ হিজরি) 'তবাকাতে ইবনে সাদ'-ও বহুল প্রসার ও প্রসিদ্ধি লাভ করে।

সিরাত-গবেষক ও ঐতিহাসিকদের প্রাণান্তকর প্রচেষ্টার পাশাপাশি এ শতাব্দীতে মুহাদ্দিসিনে কেরামের সিরাতচর্চায় অসামান্য অবদান আছে, যাঁরা সুনান গ্রন্থাবলি রচনার পাশাপাশি সিরাতের ওপরও স্বতন্ত্র কিতাবাদি রচনা করে গেছেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন সাইদ ইবনে মুগিরা (মৃত্যু : ২২০ হিজরি), আহমদ ইবনে মুহাম্মাদ ওয়াররাক (মৃত্যু : ২২৮ হিজরি), মুহাম্মাদ ইবনে আয়েজ (মৃত্যু : ২৩৪ হিজরি), আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ (মৃত্যু : ২৩৪ হিজরি), ইমাম আবু বকর ইবনে আবি শায়বা (মৃত্যু : ২৩৫ হিজরি), খলিফা ইবনে খাইয়াত (মৃত্যু : ২০৪ হিজরি), ইবরাহিম ইবনে ইসমাইল আম্বারি তুসি (মৃত্যু : ২৯০ হিজরি), ইমাম আবু জুরআহ (মৃত্যু : ২৮৪ হিজরি) ও বিখ্যাত হাদিস বিশারদ আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইবনে মুসলিম ইবনে কুতাইবা দাইনুরির (মৃত্যু : ২৭৬ হিজরি) মতো মুহাদ্দিসিন।

তৃতীয় শতাব্দীর এ বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সময়ে ঐতিহাসিকদের সিরাত-গবেষণাও ছিল ঐতিহাসিক মাত্রায়। যেমন আহমদ ইবনে ইয়াহইয়া বালাজুরি (মৃত্যু : ২৭৯ হিজরি) ও মুহাম্মাদ ইবনে জারির তাবারির (মৃত্যু : ৩১০ হিজরি) মতো ঐতিহাসিকদের হাত ধরে 'তারিখুল ইমাম ওয়াল মুলুক' ও 'ফুতুহুল বুলদান' নামক রচনায় সিরাত-গবেষণার একটি বড় অংশ পরিলক্ষিত হয়।

চতুর্থ শতাব্দীতে সিরাতচর্চা

হিজরি চতুর্থ শতাব্দী সীরাত ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়। মরক্কো ও আন্দালুসের একটি বড় অংশ জুড়ে মুহাদ্দিসিনে কেরামের পৃষ্ঠপোষকতায় শুরু হয় এর ব্যাপক কার্যক্রম। তথ্যের সঠিকতা এবং যাচাই-বাছাই করতঃ সারনির্যাস উত্থাপন করে সিরাত সংকলন ছিল এ সময়ের মূল লক্ষ্য। এ সময়কার উল্লেখযোগ্য রচনার শীর্ষে রয়েছে আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইবনে আবি জায়েদের (মৃত্যু : ৩৮৬ হিজরি) 'কিতাবুল জামি' এবং ইমাম ইবনে আন্দালুসির (মৃত্যু : ৪৫৬ হিজরি) 'তাজরিদ ওয়া তালখিস' গ্রন্থদ্বয়।

পঞ্চম শতাব্দীর সিরাতচর্চা

হিজরি পঞ্চম শতাব্দীতে বৈশিষ্ট্যময় যে কাজটি হয়েছে তা হলো 'দালায়িলুন নুবুওয়াহ'র ওপর যথেষ্ট মনযোগ। বিভিন্ন গ্রন্থাবলি এর ওপর রচিত হয়। আল্লামা আবু নাইম আহমদ ইবনে আবদুল্লাহ (মৃত্যু : ৪৩০ হিজরি) ও ইমাম আবু বকর আহমদ ইবনে হুসাইনের (মৃত্যু : ৪৫০ হিজরি) স্বতন্ত্র গ্রন্থগুলো এখনও বহুল সমৃদ্ধাকারে গবেষকদের আলোচনায় আসে।

পরবর্তীকালেও এ শাস্ত্রে ব্যাপক সমৃদ্ধি দেখা গেছে। ওরিয়েন্টালিস্টদের বিতর্কের জবাবে যেগুলো মোক্ষম ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়েছে।

ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীর সিরাতচর্চা

হিজরি ষষ্ঠ শতাব্দীতে সিরাতচর্চার গুরুত্বপূর্ণ দিক অতোটা দৃশ্যমান না হলেও সপ্তম শতাব্দীতে সিরাতে অভূতপূর্ব কাজ হয়। আবদুর রহমান ইবনে আলি ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে জাফর জাওজির (মৃত্যু : ৬৯৭ হিজরি) 'আল-মুনতাজাম', প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইবনে আসির আল-জাজারির (মৃত্যু : ৬৩২ হিজরি) 'আল-কামিল ফিত তারিখ', ইয়াহইয়া ইবনে হুমাইদার (মৃত্যু : ৬৩০ হিজরি) 'সিরাতে ইবনে আবি তায়', ইমাম আবু জাকারিয়া ইয়াহইয়া ইবনে শরফ নববির (মৃত্যু : ৬৭৬ হিজরি) 'তাহজিবুস সিরাতিন নাবাবিয়্যাহ' এবং শাফেয়ি ঐতিহাসিক আলি ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে মাহমুদ কাজরুনির 'আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যাহ' এ শতাব্দীর গুরুত্বপূর্ণ রচনাবলির শীর্ষস্থান দখল করতে পেরেছে।

অষ্টম শতাব্দীর সিরাতচর্চা

হিজরি অষ্টম শতাব্দী অভাবনীয় শক্তিমানদের সিরাতচর্চা সমৃদ্ধ একটি যুগ। এ সময়ে রচিত হয় হাফেজ আবদুল মুমিন দিময়াতির (মৃত্যু : ৭০৫ হিজরি) 'সিরাতে দিময়াতি' তথা

'আল-মুখতাসার ফি সিরাতি সাইয়িদিল বাশার'-এর মতো গ্রন্থ। পাশাপাশি আল্লামা আলাউদ্দিন আলি ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হাসান খাল্লাতির (মৃত্যু : ৭০৮ হিজরি) 'সিরাতে খাল্লাতি' খুবই প্রসিদ্ধি অর্জন করে। এই শতাব্দীর সবচেয়ে বিখ্যাত মুহাদ্দিস হাফেজ শামসুদ্দিন জাহাবির (মৃত্যু : ৭৪৮ হিজরি) হাত ধরেও সিরাতের ওপর উন্নত ও বৃহৎ পর্যায়ের গবেষণাধর্মী কাজ হয়। তবে সবচেয়ে আনন্দ ও গর্বিত বোধ করবার মতো বিষয় হলো এই শতাব্দীতেই হাফেজ ইবনে কাসিরের (মৃত্যু : ৭৭৪ হিজরি) 'আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া' রচিত হয়, যা যুগ যুগ ধরে সিরাতের ওপর অবিস্মরণীয় অবদান ধরে রেখেছে।

এরপর প্রশংসা ও অসামান্য প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিতে যুগ যুগ ধরে চলে আসতে থাকে সিরাতের নানাবিধ কার্যক্রম। পরিসর হতে থাকে আরও বিস্তৃত। ইসলাম ও মুসলমানের ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিত্তিটা দৃঢ়তার সঙ্গে গেঁথে যেতে থাকে সমাজে-রাষ্ট্রে এবং ব্যক্তিজীবনে—যা অমুসলিমদের জন্যে ভীষণ পীড়াদায়ক জ্বলনের সৃষ্টি করে। তাদেরকে ভাবিয়ে তোলে এর গতিপ্রক্রিয়া। গতিরোধ করার নানান কৌশল তারা হাতড়ে ফেরে। হিজরি ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বিশেষত সিরাতের এই অপ্রতিরোধ্য গতিকে থামিয়ে দেবার প্রত্যয় নিয়ে ময়দানে নেমে আসে ওরিয়েন্টালিস্ট। তারাও শুরু করে সিরাতচর্চা। সিরাতের এপার-ওপার ঘেটেঘুটে চষে বেড়ায়। তারপর সূক্ষ্মতম কৌশল প্রয়োগ করতঃ ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে জনমনে ত্রাস সৃষ্টি করে। ইসলামি আকিদা ইহুদি ও নাসারাদের চিন্তা থেকে আহরিত এবং কুরআন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের স্বরচিত গ্রন্থ—এরকম অমূলক কথাবার্তা তারা তাদের গবেষণায় ব্যাপকভাবে প্রচার শুরু করে দেয়। যার ফলে শুধু অনৈসলামিক জনগোষ্ঠীই এই ভ্রান্তির শিকার হয় না, বরং মুসলিমদের একটি মেধাবী গোষ্ঠীও এর মুখোমুখি হয়ে খেই হারিয়ে ফেলেন। ভারত উপমহাদেশে এর প্রকোপ অসামান্য আকারে ছড়িয়ে পড়ে। ঠিক সে সময়ই প্রয়োজন দেখা দেয় তাদের এই প্রোপাগাণ্ডার বিরোধিতা করা এবং শুদ্ধ তথ্যসম্বলিত গ্রন্থের প্রসার। তখন এর মোকাবেলা করে আগের চাইতে আরও উদ্যমের সঙ্গে শুরু হয় একের পর এক উৎকৃষ্ট সিরাতগ্রন্থের প্রকাশ। যেখানে সিরাতের প্রকৃত রূপ স্পষ্টকরণ, ছড়িয়ে পড়া সন্দেহ দূরীভূতকরণ এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে যথাযথ মর্যাদাপূর্ণ ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশের মতো গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলোর প্রতি লক্ষ রাখা হয়। এ ক্ষেত্রে মাওলানা সালমান মানসুরপুরি রহমতুল্লাহি আলায়হির 'রাহমাতুল্লিল আলামিন' সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হয়। এরপর ফরাসি ও ইংরেজি ভাষায় রচিত ড. মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ-এর 'ষব ঢ়ৎড়ঢ়যবঃ ফব ষ'রংষধস'-ও এ সংকট মোকাবেলায় দুর্দান্ত অবদান রাখে। শোনা যায় এ গ্রন্থটি পাঠ করার ফলে হাজার হাজার খ্রিষ্টান যুবক ইসলামে প্রবেশ করে। এমনই এক বিপ্লবের ধারা যুগ থেকে যুগান্তর অবধি অব্যাহত থাকে। ওরিয়েন্টালিস্টদের অপতৎপরতা ক্রমশ নিভে নিভে আসে।

শুদ্ধতার ক্ষেত্রে চূড়ান্ত তৎপর থেকে সিরাতচর্চার এ ধারা আজও চলমান আছে। যুগের অবসানে প্রকৃতির রূপ পাল্টে যাবার ফলে সিরাতের ক্ষেত্রেও যোগ হয়েছে আরও নতুন নতুন মাত্রা। পূর্ববর্তী গবেষক, ঐতিহাসিক এবং মুহাদ্দিসিনে কেরামের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সাধনার বদৌলতে এখন তার চর্চা হয়ে উঠেছে সহজ থেকে সহজতর। একটি উত্তম জীবন থেকে উৎকৃষ্ট চিন্তা ও কর্মের মহৎ সংগ্রহ মানুষ প্রয়োগ করছে নিজস্ব জীবনের নানাদিকে নানাভাবে; যার ফলে মানুষ স্বপ্ন দেখতে পারছে আরও উচ্চতার, আগে বেড়ে যাওয়ার। অবশ্যই এ সিরাত এর যোগ্য প্রতিপাদ্য। জীবনের বহুমাত্রিক সফলতার জন্যে এ সিরাতই এক অনন্য উপজীব্য বিষয়। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এর যথাযথ মর্যাদা দেয়ার সুযোগ আমাদের দান করুন। আমিন।

লেখক : শিক্ষার্থী, মাদরাসাতুল কাউসার, ঢাকা



শাহজালালের সিলেট

রাসেল মাহফুজ

'ওই যে ভিখারি যায়
ঝোলা ঘাড়ে ফিরে চায়
ডাক ওরে জিজ্ঞাস কী বলে
বাপ-দাদা ধনবান
ছিল বড় মান্যমান
মাথা হেঁটে পূজিত সকলে
তাদের বংশধর
ভিক্ষা মাগে ঘরে ঘর
হাতে কাঁধে ছালা আর ঝুলি
গলায় তসবি দানা
দে রে বাবা এক কণা
প্রাণ যায় মুখে এই বুলি'

মীর মশাররফ হোসেনের 'ঝোলা ঘাড়ে নিয়ে ফিরে ফিরে চাওয়া' হতভাগা একজন ভিখারি এই আমিও। শুধু আমিই নয়, মুসলিম উম্মাহর ১৬০ কোটি সদস্যের প্রতিজনই এখন ঝোলাঅলা ভিখারি। কবি মশাররফ হোসেন ভেতরের চোখ দিয়ে মুসলিম উম্মাহর করুণচিত্র অবলোকন করেছেন। গভীরভাবে উপলব্ধি করেছেন তাদের ক্রমাবনতি। পঙক্তিগুলো লেখার সময় হয়তো-বা মনেমনে ভেবেছেন–হায়, ওই যে ঝোলাঅলা ভিখারিরা, তাদের বাব-দাদারা তো ছিলেন কত ধনবান, ছিলেন বড় মান্যমান, কিন্তু তাদের এই অবস্থা কেন? তাদের বাপ-দাদারাই তো হাজার বছর শাসন করেছিলেন পৃথিবী। গোটা পৃথিবীর সভ্যতার নগরীগুলোর জন্মদাতা তো তাদের বাপ-দাদারাই। শিক্ষা-সংস্কৃতি, শিল্প-বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষসাধন তো করেছিলেন প্রথমত তাঁরাই।

স্পেন, করডোভা, গ্রানাডা আর বাংলাদেশের সোনারগাঁ ও জালালাবাদের মতো সভ্যতার রাজধানীগুলো আজও ইতিহাসের সাক্ষী বহন করে চলছে। কিন্তু তাদের বংশধররা আজ ভিখারির বেশে যেন সন্ন্যাসীর জীবনযাপন করছে। সামান্য শান্তির জন্য 'হা' করে তাকিয়ে আছে তাদের দিকে, যারা মুসলিম উম্মাহর ক্রমাগত এই অধঃপতনের জন্য দায়ী। যারা আমাদের শিক্ষা ও বদান্যতায় শিক্ষিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়ে একপর্যায় আমাদেরই শিক্ষা খেয়েছে, শিল্প খেয়েছে, সাহিত্য খেয়েছে, বিজ্ঞান খেয়েছে, সংস্কৃতি খেয়েছে, এবং খেয়েছে আমাদের পবিত্র মানচিত্রও। ভারত-আমেরিকা আর চীন-রাশিয়া ও জাতিসংঘের কাছে শান্তি ও মুক্তির চাওয়াটা যেন 'ভিক্ষা মাগে ঘরে ঘর, হাতে কাঁধে ছালা আর ঝুলি' এবং 'গলায় তসবি দানা, দে রে বাবা এক কণা'-এর মতো শোনাচ্ছে।

আমাদের পূর্বপুরুষেরা (আল্লাহ তাঁদের ওপর অনিঃশেষ অনুগ্রহ বর্ষণ করুন) শেষরাতের অশ্রুজল, শরীরের ঘাম আর বুকের তাজা খুন দিয়ে রচনা করে গেছেন এমনসব ইতিহাস যা আমাদের প্রতিনিয়ত ভাবানোর কথা ছিল, গভীর রাতে কাঁদানোর কথা ছিল আর কথা ছিল মনন-মিনারে প্রেরণা জোগানোর। কিন্তু জাতি হিসেবে আমরা যেন খুব অকৃতজ্ঞ এবং চরম পর্যায়ের আলসে। তাই তো আমরা শতাব্দীকাল ধরে নির্যাতিত, নিপীড়িত, লাঞ্ছিত, বঞ্চিত আর নিজভূমি থেকে বিতাড়িত। শুধু তাই নয়, স্বাধীন দেশেও যেন পরাধীনতার শিকলে আবদ্ধ। কারণ, আমরা জানি না 'মানুষ জীবিত থাকতে হলে যেভাবে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে হৃৎপিণ্ডে রক্তবাহী নালিতে প্রাণস্পন্দন থাকতে হবে, ঠিক সেভাবে একটি জাতি জীবিত থাকতে হলে শিক্ষা-সংস্কৃতি, ইতিহাস-ঐতিহ্য ও চিন্তা-চেতনার স্রোতধারাকে অবশ্যই অবশ্যই প্রবহমান রাখতে হবে।'

জাগ্রত কবি মুহিব খান অচেতন এই জাতির কাছে প্রশ্ন রেখেছেন, এবং ঠিকই রেখেছেন–

'তুমি কি তোমার পরিচয় জানো?
জানো তব ইতিহাস?
জানো না, জানো না, জানো না তাই তো
বেঁচে থেকে মরা লাশ
জানো না তোমার পূর্বসূরির
অমর গর্বগাঁথা
বিশ্ব-দুয়ারে তাই তো তোমার
চির অবনত মাথা
তুমি কি খুঁজেছ শিকড় তোমার
কোথা হতে পায় রস?
খোঁজোনি, খোঁজোনি, খোঁজোনি তাই তো
ভাগ্যে নেমেছে ধ্বস
খোঁজোনি তোমার হারানো অতীত
মুছে যাওয়া পরিচয়?
হারাতে হারাতে হেরেই চলেছ
ভুলেই গিয়েছ জয়...'

আমরা যেমন ভুলে গেছি নববিকালের মরণজয়ী সব কাফেলার ইতিহাস, যেমন ভুলে গেছি সোনালি যুগের সব অমর অধ্যায়, যেমন ভুলে গেছি স্পেন-বিজয়ী তারিক বিন জিয়াদ, কনস্টান্টিনোপল-বিজয়ী মুহাম্মদ আল-ফাতিহ, ভারত-বিজয়ী মুহাম্মাদ বিন কাসিমদের গৌরবময় সব বিজয়াভিযান, ঠিক তেমনি ভুলে গেছি গৌড়-বিজয়ী শাহজালালের অমর গর্বগাঁথাও। যিনি পবিত্র মহানগরী মক্কা থেকে দাওয়াতি অভিযান শুরু করেন। যেই অভিযান গৌড় পর্যন্ত এসে জিহাদি অভিযানে পরিণত হয়। আর অবিশ্বাসের অন্ধকূপে প্রজ্বলিত হয় বিশ্বাসের আলো। গোবিন্দালয়ে উড্ডীন হয় তওহিদের পতাকা। প্রতিষ্ঠিত হয় ইসলামি সমাজ ও রাষ্ট্র। পৃথিবীর বুকে গড়ে ওঠে সভ্যতার আরেকটি নতুন নগরী। বস্তুত ইসলামের সুবিমল জ্যোতি যেখানেই তার মহিমা নিয়ে ভাস্বর হয়েছে, সেখানেই রচিত হয়েছে নতুন অধ্যায়, প্রতিষ্ঠিত হয়েছে উন্নত সভ্যতা, বিলুপ্ত হয়েছে অন্ধকার, অসভ্যতা আর কুসংস্কার। গৌড়ের ক্ষেত্রেও ঘটেছে ঠিক তাই।

আজকের সিলেট তখন ছিল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত। এর মধ্যে তুলনামূলক বৃহৎ রাজ্য ছিল গৌড়, জৈন্তিয়া ও লাউড়। সিলেটে ইসলামের আলো কখন প্রবেশ করেছে, তার নির্দিষ্ট কোনো সনতারিখ কারও জানা নেই, তবে ধারণা করা হয়, ইসলামের সূচনাকালেই সিলেটে ইসলামের আলো পৌঁছেছে। কারণ, আজকের সিলেটের যে বন্দরবাজার, প্রাচীনকালে এটি ছিল একটি নদীবন্দর। বিখ্যাত আরব পরিব্রাজক সুলায়মান সাররাফিও বাংলার দুটি বন্দরের কথা আলোচনা করেছেন। 'চট্টগ্রাম' ও 'সিলেট'—এই দুটি ছিল প্রাচীন বাংলার বিখ্যাত দুই নদীবন্দর। বিভিন্ন জায়গা থেকে ব্যবসায়ীরা মালবাহী জাহাজ এনে নোঙর করতেন এই বন্দরগুলোতে। বিভিন্ন মশলা, তেজপাতা, রেশম, কাঠ ও হাতির দাঁতের জন্য আরব ব্যবসায়ীরা বারবার আসা-যাওয়া করতেন সিলেটে। এভাবে আরবের সঙ্গে সিলেটের ব্যবসায়িক বন্ধন তৈরি হয়। এই সত্যটি ইতিহাস-স্বীকৃত। এখানেই আমাদের ধারণা—আরবের ব্যবসায়ী দলের সিলেট আগমন যদি সত্য হয়, তাহলে ব্যবসায়ীর পোশাকে ইসলাম প্রচারকদের আগমনও অসত্য নয়। কারণ, মুসলিম মানেই দাঈ, মুসলিম মানেই মিশনারি। মুসলিমরা যেখানে যে উদ্দেশ্যেই যান না কেন, তাঁরা দাওয়াহ ইলাল্লাহ বন্ধ রাখেন না, সত্য প্রতিষ্ঠার মিশন কখনোই ভুলে যান না। যদিও কালের বিবর্তনে আজকের মুসলিমরা এই স্বভাব হারিয়ে ফেলেছেন প্রায়ই।

ইতিহাসবিদ অধ্যাপক দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ সিলেটের গাজি বুরহানুদ্দিনকে আরবের সেই বণিকদলের কারও বংশধর বলে উল্লেখ করেছেন। ধারণা করা হয়, গৌড়গোবিন্দ রাজ্যলাভের অনেক আগ থেকে তিনি সিলেটের বাসিন্দা ছিলেন। অধ্যাপক আজরফ লিখেন, 'সিলেটের বুকে ইসলামের সত্যিকার রূপের পরিচয় সর্বপ্রথম কে দিয়েছিলেন, তা এখনো সঠিকভাবে নির্দিষ্ট হয়নি। তবে সপ্তম শতাব্দীতে হজরত মাহমুদ ও হজরত মুহাইমিন-এর দ্বারা বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারিত হওয়ার যে তথ্যটি আমরা বর্ণনা করেছি, তার ঢেউ যে সিলেটেও এসে লেগেছিল, সে সম্বন্ধে অনুমান করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। কেননা, শাহজালালপূর্ব যুগে সিলেট সদরের টুলটিকওে ছিল গাজি বুরহানুদ্দিনের বসতি। তার ওপর তরফে কাজি নুরুদ্দিনের বসবাস। এ দুটো স্থিতি ব্যতীত পূর্ববর্তী পর্যায়ে আজমুরদান বা আজমিরিগঞ্জ নামক স্থান মুসলিম সুলতান মালিক উজবেক তুঘরল-এর হাতে ১২৪৪ খ্রিষ্টাব্দে বিজিত হয়েছিল। শাহজালাল কর্তৃক গৌড় বিজয়ের পূর্বে তদানীন্তন সিলেটের এ অঞ্চলগুলোতে মুসলিমদের বাস ছিল।'

ইসলামের উত্থানকালেই সিলেটে ইসলামের বাণী প্রচারিত হলেও ইসলাম 'বিজয়ী' বেশে আসে হজরত শাহজালাল রহমতুল্লাহি আলায়হির মাধ্যমে রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হবার মধ্য দিয়ে। এই তথ্যে ইতিহাসবিদদের কোনো বিতর্ক নেই। তবে শাহজালালের আগমন ও রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলাম প্রতিষ্ঠার সাল নিয়ে ছিল প্রচুর মতভেদ, যার

সমাপ্তি হয়েছিল ১৫১২ খ্রিষ্টাব্দে, ৯১৮ হিজরিতে। তখন বাংলার মসনদে অধিষ্ঠিত সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহ। তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টায় সিলেটের আম্বরখানা মহল্লায় চালানো হয় প্রত্নতত্ত্ব গবেষণা। মাটির নিচ থেকে বেরিয়ে আসে ফার্সি ভাষার একটি শিলালিপি। যা বর্তমানে ঢাকা জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। তাতে যা লিখিত ছিল, তা অনুবাদ করলে দাঁড়ায়–'মুহাম্মদের ছেলে শায়খ জালাল মজররদের আধ্যাত্মিক শক্তিবলে সুলতান ফিরোজ শাহ দেহলভির আমলে ৭০৩ হিজরি সনে সিকান্দার খান গাজি সিলেটে মুসলিম পতাকা উত্তোলন করেন।' সেই থেকে ৭০৩ হিজরি মোতাবেক ১৩০৩ খ্রিষ্টাব্দকে 'সিলেটে মুসলিম শাসনের শুভযাত্রা' ধরা হয়।

শাহজালালের আগমন ও সিলেটে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার গল্পটি অত্যন্ত রোমাঞ্চকর এক উপাখ্যান। যদিও প্রামাণ্য ইতিহাসের সঙ্গে মিশ্রিত আছে কিছু কথা-উপকথা বা বহুল জনশ্রুতি। ইয়েমেন থেকে মক্কা হয়ে দিল্লি, অতঃপর অনেক চড়াই-উৎরাই আর নদ-নদী পাড়ি দিয়ে গৌড়ে। সত্যিই হজরত শাহজালালের এই অভিযাত্রাটি শত্রু-মিত্র সকলের হৃদয়ে রোমাঞ্চ সৃষ্টি করে আজও।

শাহজালালের জন্মস্থান আরবের হেজাজ ভূমির দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত ইয়েমেনের কুনিয়া শহরে। ৬৭১ হিজরি মোতাবেক ১২৭১ খ্রিষ্টাব্দে। শাহজালালের বয়স যখন তিন মাস, মৃত্যুবরণ করেন তাঁর মহীয়সী মা। বয়স যখন পাঁচ, শাহাদতবরণ করেন তাঁর বাবা। তাঁর বাবা হজরত মুহাম্মদ রহমতুল্লাহি আলায়হি ছিলেন বীর মুজাহিদ। ইয়েমেনে একটি জিহাদে তিনি শহিদি শরাব পান করেন।

শাহজালাল যখন মা-বাবাহীন, বলা যায় দুনিয়াবি আশ্রয়হীন, তখনই এগিয়ে এলেন তাঁর মামা। তাঁর মামা শায়েখ আহমদ কবির সোহরাওয ার্দি ছিলেন আধ্যাত্মিক ব্যক্তি। তাঁর পিতা সৈয়দ জালাল সুরুখ বুখারিও আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি শাহজালালের জন্মেরও আগে ভারতবর্ষে ইসলামের প্রচারাভিযান পরিচালনা করেন। তিনি ভারতের মুলতানের নিকট আউচে বসবাস করেন এবং শেষ নিঃশ্বাস সেখানেই ত্যাগ করেন।

শায়েখ আহমদ কবির শিশু জালালকে ইসলামের মৌলিক বিষয়াবলি শিক্ষাদান করেন। তিনি নিয়ত করেন, তাঁকেও বানাবেন আধ্যাত্মিক মহাপুরুষ। সেই লক্ষ্য থেকেই তিনি তাঁকে নিয়ে যান পবিত্র শহর মক্কায়। মক্কায় শায়েখ শিহাব উদ্দিন রহমতুল্লাহি আলায়হি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ইসলাহি খানকাহ–আধ্যাত্মিক বিদ্যালয়-এর তিনি ছিলেন তৎকালীন প্রধান খাদেম বা তত্ত্বাবধায়ক। মামাপীরের সাহচর্যে শরিয়ত-মারেফতের জ্ঞানলাভ করে করে তিলে তিলে গড়ে উঠতে শুরু করলেন শাহজালার। যখন পরিণত বয়সে উপনীত হলেন, একরাতে তিনি একটি স্বপ্ন দেখেন। স্বপ্নের ব্যাখ্যায় শায়েখ আহমদ কবির শাহজালালকে ভারতবর্ষে দাওয়াতাভিযান পরিচালনার পরামর্শ দেন। তিনিও তা সাদরে গ্রহণ করে নিয়ে ভারতে আসার প্রস্তুতি শুরু করেন।

বহুল জনশ্রুতি আছে, শাহজালাল যখন ভারতের উদ্দেশে পাড়ি দিতে যাবেন, মামাপীর তাঁর হাতে একমুঠো মাটি তুলে দিয়ে নাকি বলেছিলেন–'যাও, যেখানে এই মাটির স্বাদ, গন্ধ ও বর্ণের মিল পাবে, সেখানেই তুমি দাওয়াতি অভিযানের আস্তানা গড়ে তুলবে।' মুর্শিদে কামেল সৈয়দ আহমদ কবির রহমতুল্লাহি আলায়হির দোয়া নিয়ে মক্কা শরিফ থেকে বেরিয়ে পড়েন শাহজালাল।

মক্কা শরিফ থেকে হিন্দুস্তানে আসার পূর্বপর্যন্ত পথিমধ্যে অনেক সহচর তাঁর সাথে মিলিত হন। তাঁদের মধ্যে হাজি ইউসুফ, হাজি খলিল, হাজি দরিয়া, চাশনি পীর, সমরকন্দের সৈয়দ ওমর, রোমের করিমদাদ, বাগদাদের নিজামউদ্দিন, ইরানের জাকারিয া ও শাহ দাউদ এবং সৈয়দ মুহাম্মদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁদের নিয়েই তিনি ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন। ভারতবর্ষে প্রবেশের পরে আধ্যাত্মিক শক্তির পরিচয় পেয়ে তাঁর সহচরদের সংখ্যা ক্রমশ বাড়তে

থাকে। আজমির শরিফ থেকে মুহাম্মদ শরিফ, মুলতান থেকে আরিফ, গুজরাট থেকে জুনায়েদ, দাক্ষিণাত্য থেকে সৈয়দ কাসিম, মধ্যপ্রদেশ থেকে হেলিমউদ্দিন প্রমুখ এসে তাঁর সাথে মিলিত হন। যখন তিনি দিল্লি পৌঁছলেন, তাঁর শিষ্যদের সংখ্যা দাঁড়াল আনুমানিক ২৪০-এ। দিল্লিতে এসে তিনি বিশ্ববিখ্যাত দরবেশ হজরত নিজামুদ্দিন আউলিয়া রহমতুল্লাহি আলায়হির সাথেও সাক্ষাৎ করেন। কথিত আছে শায়েখ নিজামুদ্দিন শাহজালালকে দোয়া করার সাথে সাথে ভালোবাসার নিদর্শনস্বরূপ একজোড়া সুরমা রঙের কবুতরও উপহার দেন। আরো কথিত আছে যে, আজকের দরগাহে হজরত শাহজালাল ও আশপাশের এলাকাজুড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে যেসব কবুতর, এগুলো নাকি তাদেরই বংশধর।

হজরত শাহজালাল তাঁর সাথিদের নিয়ে যখন দিল্লিতে অবস্থান করছিলেন, তখন সিলেটের গাজি বুরহানুদ্দিনও ছিলেন দিল্লিতে। আল্লাহর ইচ্ছা—সেখানেই উভয়ের সাক্ষাৎ ঘটে। তাঁর কাছ থেকেই গৌড়রাজ্য সম্পর্কে অবহিত হন শাহজালাল। কালবিলম্ব না করে ২৪০ জন সহচর নিয়ে বেরিয়ে পড়েন তিনি। গন্তব্য গৌড়রাজ্য।

তখন গৌড়রাজ্যের সিংসাহসনে অধিষ্ঠিত গোবিন্দ। সে ছিল চরম পর্যায়ের অত্যাচারী শাসক। তার শাসনামলে যাদুবিদ্যা ধারণ করেছিল চরম রূপ। নরবলি, কুসংস্কার, অপবিশ্বাস, অন্ধবিশ্বাস—এসব তো ছিল রাজ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ। শিক্ষা বলতে যা ছিল, তা একেবারে গৌণ। যাদুবিদ্যা কি কোনো শিক্ষা? সভ্যতা বলতে যা ছিল, তাও অনুল্লেখ্য। বস্তুত মুসলিম বিজয়ের আগপর্যন্ত শিক্ষা-সভ্যতার উল্লেখযোগ্য কোনো নিদর্শন পাওয়া যায়নি গৌড়ে।

টুলটিকর নিবাসী গাজি বুরহানুদ্দিন তাঁর পুত্রসন্তানের আকিকা দিলেন গরু জবাই করে। গোবিন্দের তা সহ্য হলো না। সে গাজি বুরহানুদ্দিনকে ডেকে এনে কাঠগড়ায়



দাঁড় করালো। একপর্যায়ে তাঁর শিশুসন্তানকে নির্মমভাবে হত্যা করে ফেলল। পিতা হিসেবে এই নির্মমতা সহ্য হলো না বুরহানুদ্দিনের। তিনি তৎকালীন বাংলার সুলতান ফিরোজ শাহের নিকট গেলেন। খুলে বললেন সব ঘটনা। সুলতান শুনেই চকিতে ফিরে তাকালেন। যেন মনে মনে ভাবলেন—'এই নির্মমতার খেসারত তোমাকে দিতেই হবে গোবিন্দ।'
সুলতান জরুরি তলব করলেন ভাগ্নে সিকান্দার গাজিকে। জানালেন সব কাহিনি। যেন নির্দেশ দিলেন—'সেনাদল নিয়ে ছুটে যাও গৌড়ের দিকে, মাটির সাথে মিশিয়ে দাও গোবিন্দের মসনদ।' নির্দেশ পাওয়া মাত্র ছুটে চলল শাহি সেনাদল।
সিকান্দার গাজির সেনাদল যখন ব্রহ্মপুত্র নদী পার হতে যাবে, তখনই গোবিন্দ বাধা হয়ে দাঁড়ায়। সশরীরে তো সামনে আসার সাহস হয়নি, তাই আশ্রয় নেয় যাদুবিদ্যার। প্রয়োগ করে ভৌতিক শক্তি। মুসলিম সৈন্যদের ওপর নিক্ষেপ করতে লাগল অগ্নিবাণ। যার মোকাবেলা করার মতো কোনো অস্ত্র ছিল না সেনাবাহিনীর কাছে। এখান থেকেই ফিরে আসতে হলো সিকান্দার গাজিকে। ফিরে আসতে হলো মুসলিম মুজাহিদ কাফেলাকে। এই খবর যখন পৌঁছল দিল্লির সম্রাট আলাউদ্দিন খিলজির নিকট, তিনি খুব মর্মাহত হলেন। ডাকলেন রাজদরবারের আলেমদের। পরামর্শ করলেন তাঁদেও সঙ্গে। সিদ্ধান্ত হলো, গৌড়গোবিন্দের যাদুকরদের মোকাবেলায় অস্ত্রশক্তির সাথে আধ্যাত্মিক শক্তির সমন্বয় প্রয়োজন। এজন্য প্রয়োজন এমন একজন সেনাপতির, যিনি অস্ত্রশক্তি ও আধ্যাত্মিক শক্তি উভয় দিক দিয়ে বলিয়ান হবেন। খোঁজা শুরু হলো সেই হবু সেনাপতিকে। পাওয়া গেল একটি তাবুতে। সাধারণ সেই সেনা একাগ্রচিত্তে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করছেন। তিনি সৈয়দ নাসিরউদ্দিন রহমতুল্লাহি আলায়হি। সম্রাট তাকে সেনাপতির সনদ প্রদান করে, তার নেতৃত্বে গৌড় অভিমুখে প্রেরণ করলেন জিহাদি কাফেলা।
সাতগাঁও-এর ত্রিবেণী হুগলী নদী। এখানে এসে নাসিরউদ্দিনের অগ্রবর্তী সেনাদল ও শাহজালালের অনুচরদের সাক্ষাৎ হয়। সিপাহসালার সৈয়দ নাসিরউদ্দিন শাহজালালের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ফলে যৌথবাহিনীর আমিরুল মুজাহিদিন হয়ে যান শাহজালাল।
যৌথবাহিনীর আমির হজরত শাহজালাল ও যৌথবাহিনীর সিপাহসালার নাসির উদ্দিনের নেতৃত্বে ত্রিবেণী থেকে কাফেলা এখন বিহারের উদ্দেশে রওয়ানা। যাত্রাপথে হিসামউদ্দিন ও আবু মোজাফফরসহ আরও বেশ কয়েকজন অনুচর যুক্ত হলেন এই কাফেলায়।
বিহার থেকে বিশাল কাফেলা এখন সোনারগাঁয়ের পথে। নাসিরউদ্দিনের আনীত এক হাজার অশ্বারোহী ও তিন হাজার পদাতিক সৈন্যসহ শাহজালাল নিজ সহচরদের নিয়ে সিকান্দার গাজির সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে সোনারগাঁ অভিমুখে রওয়ানা দেন। শাহজালাল সোনারগাঁ আসামাত্র সিকান্দার গাজি তাদের অভ্যর্থনা জানান। তারপর সসম্মানে নিয়ে যান প্রশিক্ষণশিবিরে। সিকান্দার গাজি নিজ হাতেই তাদের যুদ্ধকৌশল রপ্ত করিয়ে দেন। একপর্যায়ে সিকান্দার শাহজালালের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এক-দু'জন করে এভাবে শাহজালালের বিশেষ অনুচরদের সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৬০-এ। শাহজালালের বিশাল কাফেলা এখন 'এইম ইন অ্যাডভেঞ্চার' গৌড়রাজ্যের দিকে। অগ্রসরমান এই কাফেলার আগমন-সংবাদ গোবিন্দ পর্যন্ত আসতে খুব বেশি দেরি হয়নি। নিজস্ব গুপ্তচর দ্বারা সংবাদপ্রাপ্ত হয়েই রাজা নড়েচড়ে বসল। কাফেলাকে গৌড়ে প্রবেশ করতে দেবে না বলে যেন প্রতিজ্ঞা করে নিল। এজন্য ব্রহ্মপুত্র নদীতে নৌ-চলাচল বন্ধ করে দিল। কিন্তু আল্লাহর সাহায্যপ্রাপ্ত জালালি এই কাফেলাকে থামায় কে? শাহজালাল রহমতুল্লাহি আলায়হি নদীর পানিতে নিজের জায়নামাজ বিছিয়ে দিলেন আর অনায়াসে ভেসে ভেসে পার হয়ে এলেন স্রোতস্বিনী ব্রহ্মপুত্র।
কাফেলাটি ব্রহ্মপুত্র নদী পার হয়ে প্রথমেই

সাময়িক অবস্থান নেয় নবিগঞ্জের দিনারপুর পরগণার পাশে স্থাপিত রাজ্যের সীমান্ত-চৌকিতে। সীমান্তরক্ষীরা ভৌতিক শক্তির সাহায্যে অগ্নিবাণ প্রয়োগ করে তাদেরকে প্রতিহতের ব্যর্থ চেষ্টা করে। রাজা গোবিন্দ মুসলিম কাফেলাকে সীমান্তে প্রতিরোধের উপায়ান্তর না পেয়ে বরাক নদীতে নৌ-চলাচল বন্ধের গোষণা করে। কিন্তু অপ্রতিরোধ্য এই কাফেলাটি পূর্বের মতো জায়নামাজের সাহায্যে পার হয়ে আসে। বরাক পাড়ি দিয়ে বাহাদুরপুর হয়ে আধুনিক সিলেটের বালাগঞ্জ উপজেলার ফতেহপুর এলাকায় রাত্রিযাপন করে কাফেলা।

শাহজালাল রহমতুল্লাহি আলায়হির রোমাঞ্চকর এই অভিযাত্রাটি সিলেটের মানুষদের মুখেমুখে ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। শত শত বছর পর প্রবীণ ব্যক্তিদের মুখে এখনো শোনা যায়–

'চৌকি নামে ছিল যেই পরগণা দিনারপুর
ছিলটের হর্দ্দ ছিল সাবেক মসুর
সেখানে আসিয়া তিনি পৌঁছিলা যখন
খবর পাইলা রাজা গোবিন্দ তখন
এপারে শাহজালাল তার লস্কর সহিতে
আসিয়া পৌঁছিলা এক নদীর পারেতে
বরাক নামে নদী ছিল যে মসুর
যাহার নিকট গ্রাম নাম বাহাদুরপুর
যখন পৌঁছিলা তিনি নদীর কেনার
নৌকা বিনা সে নদীও হইলেন পার...'

সর্বোচ্চ শক্তির যথেষ্ট প্রয়োগ করেও গোবিন্দ যখন যৌথবাহিনীকে প্রতিরোধ করতে ব্যর্থ হয়, তখন সর্বশেষ প্রচেষ্টা হিসেবে যাদুমন্ত্রসহ একটি লৌহধনুক শাহজালালের কাছে এই শর্তে প্রেরণ করে যে, মুসলিমদের কেউ একজন যদি এই ধনুকের 'জ্যা' ছিন্ন বা 'শরযোজনা' করতে পারেন, তাহলে গোবিন্দ তার রাজ্য ছেড়ে চলে যাবে। হজরত শাহজালাল তৎক্ষণাৎ ঘোষণা করলেন–'আছে কি কেউ এই বাহিনীতে, যার সারাজীবনে কোনোদিনও ফজরের নামাজ কাজা হয়নি বা বাদ পড়েনি?' পাওয়া গেল একজন। তিনি সিপাহসালার সৈয়দ নাসিরউদ্দিন। আল্লাহর ইচ্ছায় তিনিই প্রকাণ্ড এই ধনুকের 'জ্যা' ছিন্ন করতে সক্ষম হন।

এখানেও রাজা গোবিন্দকে পরাজয়ের গ্লানি মাথা পেতে মেনে নিতে হলো। সে এখন বিশ্বাস করছে, স্বাদের এই রাজসিংহাসন এখন ছেড়ে দিতে হবে, এমনকি পূর্বপুরুষদের স্মৃতিবিজড়িত এই রাজ্যটিও। হয়তো-বা মনেমনে তখন ভাবছিল, হায়! কেন এই কাজ করতে গেলাম! কেন বুরহানউদ্দিনকে কাঠগড়ায় দাঁড় করালাম! কেন-বা তার ফুটফুটে শিশুটিকে নির্মমভাবে হত্যা করলাম! হয়তো-বা সে নিজের মাথা পাথরে আছড়াচ্ছিল আর দুইহাতে নিজের চুল ছিঁড়ছিল। কে জানে? ইতিহাস এখানে নীরব। তবে শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত গ্রন্থে আছে–'শিশুরা জুজুর ভয়ে স্বভাবত ভীত হইলেও যেমন কোনো কোনো দুরন্ত শিশু জুজু কেমন দেখিতে ইচ্ছা করে, কথিত আছে, পলায়নের পূর্বে তেমনই গোবিন্দের মনে একটা কৌতূহলের উদয় হয়। এবং তিনি সেই কৌতূহল তৃপ্তির জন্য সর্পক্রীড়নকের পেটিকাভ্যন্তরে লুক্কায়িতভাবে থাকিয়া শাহজালালকে দেখিতে গমন করেন। শাহজালাল তাহার এ চাতুর্য ধরিয়া ফেলিলেন, তখন তিনি লজ্জিত হইয়া অবনত মস্তকে শাহজালালের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতঃ রাজ্য ছাড়িয়া যাইতে স্বীকৃত হন। গোবিন্দ বিমর্ষমনে প্রত্যাগমন করিলেন।'

গোবিন্দ নিশ্চিত পরাজয় জেনেও সুরমা নদীতে নৌ-চলাচল নিষিদ্ধ ঘোষণা করল। কেন করল? যেহেতু সে ভালো করেই জানে যে, মুসলিমদের এই কাফেলাটি আগেও দু'-দু' বার জায়নামাজ বিছিয়ে ব্রহ্মপুত্র ও বরাক পেরিয়ে এসেছে, তারপরও নিষিদ্ধ করেছিল এইজন্য যে, পলায়নের সময়টা একটু বেশি পাওয়া যাবে। কারণ, সুরমা পার হলেই গৌড়ের রাজধানী। তাই পলায়নের জন্য খানিকটা সময় হাতে রাখা দরকার। হজরত শাহজালাল সুরমা নদীর তরঙ্গমালায় বিছিয়ে দিলেন পবিত্র জায়নামাজ। আর পূর্বের মতো পেরিয়ে এলেন সাথিদের নিয়ে অনায়াসে।

রাজা গোবিন্দ সখের সাজানো-গোছানো রাজবাড়ি ছেড়ে দিয়ে আত্মগোপন করে। সে

শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত গ্রন্থমতে–'মিনারের টিলা সাততলা উচ্চ ছিল, শাহজলালের ও তাহার শিষ্য নুরের আজান-ধ্বনির প্রতিঘাতে তাহা ভাঙ্গিয়া পড়িয়া যায়।'
হজরত সিকান্দার গাজিকে রাজ্যের শাসক নিয়োগ দিয়ে তিনি ইসলাম প্রসারের কাজে মশগুল হয়ে যান।

পলায়ন করে কোথায় গিয়েছিল, তার ধারাবাহিক ইতিহাস সংরক্ষিত নেই। তবে প্রাথমিক অবস্থায় পেচাগড় পর্বতের গুপ্ত গিরিদুর্গে আশ্রয় নেওয়ার তথ্য আছে। এই দুর্গটি সিকান্দার গাজির গৌড়াভিযানের পরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তাতে একটা ধারণা করা যায় যে, ভৌতিক শক্তির সাহায্যে সিকান্দার গাজিকে পরাভূত করলেও গোবিন্দের মনে মুসলিমভীতি রয়েই গিয়েছিল, এজন্য পরিস্থিতির শিকার হলে নিরাপদে পালানোর পথ আগে থেকেই তৈরি করে রেখেছিল। তাই যখন সে পালিয়ে যায়, কোথায় গিয়েছিল, তার খবর কেউ জানে না।

তবে আমার ধারণা হয়, সে পার্শ্ববর্তী রাজ্য জৈন্তিয়ায় আশ্রয় নেয়। কারণ, তখনও জৈন্তিয়ারাজ্য মুসলিমদের দখলে আসেনি। সম্ভবত জৈন্তিয়ায় তখন কৃষক রাজাদের বা পুরোহিত রাজাদের শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই ধারণাটি মোটামুটি মজবুত হয় তখন, যখন দেখি সিলেট শহরের অদূরস্থ মালনিছড়া চা বাগানের পাশের 'হারং হুরং' নামের বিকল্প সুড়ঙ্গপথটি। ধ্বংসপ্রাপ্ত এই সুড়ঙ্গপথের আশপাশের বাসিন্দাদের বিশেষ করে কুলিদের (চা-শ্রমিক) ধারণা সুড়ঙ্গপথটির শেষপ্রান্ত রয়েছে জৈন্তায়। কিন্তু জৈন্তার কোথায়, তা কেউ বলতে পারেনি। আমার ধারণা, এই সুড়ঙ্গের শেষপ্রান্ত বর্তমান জৈন্তাপুর উপজেলার চিকনাগুল এলাকায় রয়েছে। কারণ, চিকনাগুল এলাকার পাত্র সম্প্রদায় (যারা মাটির হাড়ি-পাতিল ইত্যাদি তৈরি করে) জোরগলায় দাবি করে যে, তারা নাকি রাজা গোবিন্দের বংশধর। এই সুড়ঙ্গে প্রত্নতত্ত্ব গবেষণা পরিচালিত হলে সত্যটি বেরিয়ে আসবে। সেই পর্যন্ত আমাদের ধারণায় থাক–গৌড়গোবিন্দ রাজবাড়ি পরিত্যাগ করে পেচাগড়ের গুপ্ত গিরিদুর্গ থেকে হারং হুরং সুড়ঙ্গপথ দিয়ে বর্তমান জৈন্তার চিকনাগুল এলাকায় নিরাপদ আশ্রয় গ্রহণ করে।

গোবিন্দের আত্মগোপন নিয়ে যেমন প্রামাণ্য কোনো ইতিহাস নেই, তেমনি তার জন্ম নিয়েও ফাঁদা হয়েছে আজগুবি এক কেচ্ছা। শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্বাংশে শ্রী অচ্যুত চরণ চৌধুরী লিখেন–'গোবিন্দের পিতার নাম কী

ছিল তা জানা যায় না। কিংবদন্তি মতে তিনি সমুদ্রতনয়। কথিত আছে যে, পূর্বকালে ত্রৈপুর রাজবংশের কোনো এক রাজার শতশত মহিষী (স্ত্রী) ছিল। সমুদ্রদেব (বরুণদেব) তন্মধ্যে কোনো এক মহিষীর সহিত মনুষ্যাকারে সম্মিলিত হন। তাহার কৃপাতেই রানী গর্ভধারণ করেন। এই গর্ভের কথা প্রকাশিত হইলে রাজা সেই রানীকে নির্বাসিত করেন। তদাবস্থায় রানী এক সুলক্ষণান্বিত পুত্রসন্তান প্রসব করেন। এ নির্বাসিত রানীর পুত্রই গোবিন্দ।' অনেকেই মনে করেন, এসব পাগলের প্রলাপ। অচ্যুত চরণ কীভাবে তা বিশ্বাস করলেন?

'রাজা গৌড়গোবিন্দ স্বভাবত ধর্মভীরু ছিলেন। তিনি মুসলমানদের আগমনে স্বধর্ম রক্ষার জন্য বাড়ি পরিত্যাগ করেন। শাহজালাল রাজবাড়ি ভাঙ্গিয়া তথায় এক মসজিদ নির্মাণ করে।' শ্রীহট্টের ইতিহাসগ্রন্থে মোহিনী মোহন দাসগুপ্ত এমন আজগুবি ও বিদ্বেষমূলক কথাই বয়ান করেছেন। এভাবেই তারা তাদের অন্তরের মুসলিমবিদ্বেষ প্রকাশ করেছেন। তা আবার মুসলিমদেরই গেলাচ্ছেন কৌশলে।

হজরত শাহজালাল সুরমাপাড়ে তিনদিন অবস্থান করার পর মিনারের টিলায় অবস্থিত গৌড়ের রাজবাড়ি দখল করেন।

যৌথবাহিনীর সিপাহসালার সৈয়দ নাসিরউদ্দিনের আজানের মাধ্যমে গৌড়রাজ্যের আনুষ্ঠানিক পতন হয় আর সিলেটে সূচিত হয় নতুন অধ্যায়, প্রতিষ্ঠিত হয় মুসলিম শাসনব্যবস্থা। শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত গ্রন্থমতে–'মিনারের টিলা সাততলা উচ্চ ছিল, শাহজলালের ও তাহার শিষ্য নুরের আজান-ধ্বনির প্রতিঘাতে তাহা ভাঙ্গিয়া পড়িয়া যায়।'

হজরত সিকান্দার গাজিকে রাজ্যের শাসক নিয়োগ দিয়ে তিনি ইসলাম প্রসারের কাজে মশগুল হয়ে যান।

দিল্লির সুলতান আলাউদ্দিন খিলজি হজরত শাহজালালকে নবাবি প্রদান করে একটি সনদপত্র প্রেরণ করেন। কিন্তু শাহজালাল তা প্রত্যাখ্যান করেন। এক পর্যায়ে আলাউদ্দিন খিলজি তাঁকে সিলেটের জায়গির গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন। তাতেও রাজি হননি তিনি। শেষ পর্যায় শাহজালালের প্রতি শ্রদ্ধা, সম্মান ও অকৃত্রিম ভালোবাসা প্রদর্শনের জন্য সিলেট শহরকে রাজস্বমুক্ত (কসবে) বলে ঘোষণা করা হয়।

হজরত শাহজালাল সিলেটের সরাসরি শাসক না হলেও 'নেপথ্য শাসক' ছিলেন নিশ্চয়। কারণ, তিনি জীবিত থাকাবস্থায়ই সিকান্দার গাজি নিহত হন। 'তোয়ারিখে জালালী' গ্রন্থে উল্লেখ আছে–

'যখনে মরিল সেই গাজি সিকান্দর
বেসরদার হৈল ছিলট নগর
এজন্যে হজরত শাহজালাল এমনী
নিযুক্ত করি দেন সরদার তখনি...'

হজরত সিকান্দার গাজির মৃত্যুর পর শাহজালাল তাঁর আরেক বিশ্বস্ত সহচর হায়দার গাজিকে সিলেটের শাসক নিযুক্ত করেন। এভাবে শাহজালাল একেবারে পাশে থেকে সিলেটের শাসকদের আন্তরিকভাবে পরিচালনা ও নিবিড়ভাবে পরিচর্যা করেছেন আজীবন।

জনশ্রুতি আছে, শাহজালালের সহচর চাষনী পীর ইয়েমেনের মাটির স্বাদ, গন্ধ ও বর্ণের মিল পেয়ে যান সিলেটের মাটিতে, তাই শাহজালাল সিলেটেই স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন আর ৩৬০ জন সাথিদের 'দাওয়াহ ইলাল্লাহ' ও 'তাবলিগে দীন'-এর জন্য ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দেন চারদিকে। এই তথ্যটি জনশ্রুতি হলেও ইতিহাসবিজ্ঞান ও প্রত্নতত্ত্ববিদ্যার নিক্তিতে মাপলে সঠিক এবং সঠিকই প্রমাণিত হবে আমার বিশ্বাস। কারণ, আরবের মাটির সঙ্গে সিলেটের মাটির মিল প্রমাণের জন্য সিলেটের তেল ও গ্যাসক্ষেত্রকে সামনে নিয়ে আসা যেতে পারে।

শাহজালাল রহমতুল্লাহি আলায়হি সিলেট বিজয় করে মুসলিম বাংলার রাজধানী সভ্যতার নগরী সোনারগাঁয়ের সাথে সম্পর্ক তৈরি করে সিলেটকেও সভ্যতার নগরী হিসেবে গড়ে তুলতে প্রয়াসী হন। বিশ্ববিখ্যাত পর্যটক মরক্কোর ইবনে বতুতা ১৩৩০ সালে আরব সাগর পাড়ি দিয়ে, সিন্ধুর সমুদ্রবন্দরে অবতরণ করে, অনেক দেশ পরিভ্রমণ পরে, ভারত হয়ে চীন যাবার পথে, ১৩৪৬ সালে শাহজালালের সাথে সাক্ষাতের জন্য সোনারগাঁ

থেকেই সিলেট এসেছিলেন। তিনি শাহজালাল সম্পর্কে লিখেন–'তাঁর দেহের গঠন ছিল হালকা-পাতলা। মুখমণ্ডলে ছিল অল্প দাড়ি। তিনি রাতের বেশিরভাগ সময় আল্লাহ তায়ালার ইবাদত-বন্দেগি করতেন। নিষিদ্ধ দিন ছাড়া সারা বছর রোজা রাখতেন। ১০ দিন পরপর রোজা ভাঙতেন। গাভীর দুধ পান করতেন। তাঁর জীবনযাপন ছিল সাদাসিধা। দিলের দরদ ও ভালোবাসা দিয়ে তিনি মানুষের মন জয় করেছেন। তাঁর কাছে দলে দলে লোক ইসলামধর্ম গ্রহণ করেছে। প্রতিদিন ভক্তজনরা তাঁর কাছে নিয়াজ-নজর নিয়ে আসতো। এ সকল নিয়াজ-নজর দ্বারা লঙ্গরখানা (বিনামূল্যে খাবারঘর) পরিচালিত হতো। এভাবেই বহু লোক প্রতিপালিত হতো।' (ইবনে বতুতার সফরনামা : নাসির আলি)

শাহজালালের সিলেট থেকে ফেরার পথে ইবনে বতুতা যা দেখেছিলেন, আত্মভ্রমণকাহিনি 'রেহালা' গ্রন্থে তার বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে–'এটি (সিলেট) একটি সুন্দর শহর। একটি নদী 'নহরুল আজরক' (সুরমা নদী) মাঝখান দিয়ে বয়ে গেছে। কামরূয়া (কামরূপ) পর্বত থেকে নদীটি উৎপন্ন হয়েছে। এ নদী দিয়ে লোকজন বাঙ্গালা ও লখনৌতিতে (গৌড়ের অন্যনাম) ব্যবসা-বাণিজ্য করে। নদীর দু'তীরের বাসিন্দারা চড়কি দিয়ে পানি তোলে। 'হবঙ্কের' (আজমিরিগঞ্জ বা বানিয়াচং) মজলুম মানুষ এখানকার কাফির পাষাণ জালিমদের হাতে জিম্মি। জালিমরা জোর করে নিরীহ মানুষের ফলানো ফসলের আধা-আধি নিয়ে যায়। এই দুর্বৃত্তরা মানুষকে বেগার খাটায়। গাঙের উভয় তীর গাছ-গাছালিতে ভরা। নৌপথে কাছাকাছি হলে নাকাড়া বাঁজিয়ে হুঁশিয়ারি-ঘণ্টা কিংবা সালামি সংকেত বাঁজানো হয়। বাদশাহ ফখরুদ্দিনের হুকুমে রাহি মুসাফিরদের কাছ থেকে কোনো ধরনের ট্যাক্স নেয়া হয় না। ১৫ দিন পথ চলার পর আমরা সুদাকাবা (সোনারগাঁ) পৌঁছুলাম।" (ইসলাম প্রসঙ্গ : ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ)

ইতিহাসবিদ টি এইচ অনার্ল্ড বলেন–'ইসলাম এ উপমহাদেশে এসেছিল যুগযুগ ধরে লাঞ্ছিত, বঞ্চিত, ভাগ্যাহত, মূক জনগণের মুক্তির প্রতিশ্রুতি নিয়ে।'

উপমহাদেশে ইসলামের সূর্য উদিত হওয়ার অনেক পরে হলেও যে সিলেটে তার ঝলমলে আভা ছড়িয়ে পড়েছে শাহজালালের মাধ্যমে, এটা আল্লাহর অনেক বড় অনুগ্রহ। আলহামদুলিল্লাহ। শাহজালালের যৌথবাহিনীর দুর্দান্ত সফরের মধ্য দিয়ে অবিশ্বাসের অন্ধকূপে প্রজ্বলিত হয় বিশ্বাসের আলো। গোবিন্দালয়ে উড্ডীন হয় তওহিদের পতাকা। প্রতিষ্ঠিত হয় ইসলামি সমাজ ও রাষ্ট্র। পৃথিবীর বুকে গড়ে ওঠে সভ্যতার আরেকটি নতুন নগরী। আগেই বলা হয়েছে–'বস্তুত ইসলামের সুবিমল জ্যোতি যেখানেই তার মহিমা নিয়ে ভাস্বর হয়েছে, সেখানেই রচিত হয়েছে নতুন অধ্যায়, প্রতিষ্ঠিত হয়েছে উন্নত সভ্যতা, বিলুপ্ত হয়েছে অন্ধকার, অসভ্যতা আর কুসংস্কার।'

আজ যে শিক্ষা-সংস্কৃতি, শিল্প-সভ্যতা নিয়ে সিলেটের মানুষ গর্ববোধ করেন, তার সূচনা হয়েছিল সেই শাহজালালের আমলে। মুসলিম শাসনের অধীনে গৌড় না এলে, অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি বলতে পারতেন না–'শ্রীহট্ট হলো পৃথিবীর এক ক্ষুদ্র সংস্করণ।' পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুও বলতে পারতেন না–'সিলেট ইজ বেঙ্গল বাট উইথ এ ডিফারেন্স।' পল্লীকবি জসিমউদ্দীনও যথার্থ বলতে যেতেন না–'সিলেট একটি কবিত্বময় পরিবেশের আদি নিবাস, এখানে বাস করে কবি না হয়ে পারা যায় না।' আর পাকিস্তানের মোহাম্মদ আলি জিন্নাহ সিলেট সফরে এসে আশাবাদ ব্যক্ত করতেন না–'ইচ্ছে হয় তোমাদের এই সবুজ সুন্দর পরিবেশে আমিও একটি বাড়ি নির্মাণ করি।' কারণ, ঐতিহাসিক সত্য–শিকড়হীন কোনোকিছু বেশিদিন টিকে থাকে না। আর সবচেয়ে মজবুত শিকড় হচ্ছে ইসলাম। যার শিকড় প্রোথিত মাটির অত্যন্ত গভীরে। কিন্তু এই শিকড়ে আজকের মুসলিমরা বুকের তাজা খুন সিঞ্চন করে না, তাই যথেষ্ট পরিমাণে ফলে না ফসল। বলতে পারেন, পশ্চিমা সভ্যতা তো টিকে আছে আজ বহুদিন। খুঁজে দেখুন, সেই সভ্যতার শিকড়েও আছে মুসলিমদের অবদান, আছে ইসলামের আলো। অন্যভাবে বলা

> অনেকেই হয়তো বলবেন যে, লোকসাহিত্য দিয়ে ইসলামের প্রভাব কীভাবে বুঝানো সম্ভব? এই ধারণা মনে আসতেই পারে। কারণ, বিষয়টি কিছু জটিল-জটিল। আমাদের মনে রাখতে হবে, লোকসাহিত্য তৈরি হয় লোকসংস্কৃতি থেকে। আর লোকসংস্কৃতি গড়ে ওঠে সমাজের গভীর থেকে।

যায়–ইসলামহীন সভ্যতা, সভ্যতাই নয়। শাহজালালের জালালাবাদ আজ দেশের আধ্যাত্মিক রাজধানী। মসজিদ, মাদরাসা, খানকা, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, ইন্সটিটিউট, গণগ্রন্থাগার, পাঠাগার, গবেষণাগার, পর্যটন স্পট–এককথায় সভ্যতার নগরী হতে হলে যা যা দরকার মোটামুটি হলেও সবই আছে আধুনিক এই সিলেটে। শাহজালালের আধ্যাত্মিক প্রভাব সমাজের সর্বত্রই করছে ঝলমল। এমনকি সিলেটের লোকজ ঐতিহ্যও ইসলাম-প্রভাবিত। আর যে সমাজের লোককথা, লোককাহিনি, লোকসাহিত্য আর লোকসংস্কৃতিতে ইসলাম প্রভাব সৃষ্টি করতে পেরেছে, সেই সমাজে ইসলামের শক্তি পরিমাপের জন্য মসজিদ, মাদরাসা, খানকা আর আলেম-ওলামার সংখ্যাধিক্য মুখ্য হয় না। কারণ, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান আর ধর্মীয় পণ্ডিতদের মুখ্য-উদ্দেশ্যই হচ্ছে, লোকজ ঐতিহ্যে ইসলামের প্রভাব বিস্তার করা। এ ক্ষেত্রে শাহজালালের নিকটোত্তরসূরি আলেমসমাজ সফলই বলা যায়। যদিও আজকের আলেম-ওলামা সমাজ থেকে কেন যেন খানিকটা দূরে থাকার চেষ্টা করেন, যা কোনোভাবেই কাম্য নয়।

সিলেটের সাবেক সীমা নিয়ে 'ছিলটী নাগরী' ভাষায় লেখা একটি বন্দনা থেকে অনুমান করা যায়, সিলেটের লোকসাহিত্যে ইসলাম কতটুকু গভীরে প্রবেশ করেছে। বন্দনাটি এই–

'পহেলা বন্দনা করি মালিক ছততার
দুছরা বন্দনা করি নবী মছতফার।
পূবেতে বন্দনা করি আসামর পা'ড়
দখখিনে বন্দনা করি জিলা তিরপুরার।
উত্তরে বন্দনা করি হিমালী পর্বত
পছচিমে বন্দনা করি ময়মনসিংয়ের পথ।
তিছরা বন্দনা করি ছিলটী মানুষ
না-কিছের কথাগুলি হুন দিয়া হুঁশ।
কিতার লাগি গম কর আল্লা আছইন লগে
পীর মুরশিদ আউলিয়ার দোয়া আছে সংগে।
কত নিয়ামত দিছইন আল্লায় ছিলটর মাঝ
বাশশাগিরি করা অইল ছিলটির কাজ।
আরব দেশের মাটির লগে মিল ছিলটর
এর লাগি বাস এথা বাবা শাহজলালর।'

মানবজীবন যে অতিসাধারণ ও সামান্যকিছু, তা বোঝাতে সিলেটের মানুষ আওড়ান–

'আইতে খুশি যাইতে বেজার
মাইজখানো রঙের বাজার।'

সিলেটের প্রবীণ মানুষেরা নতুন প্রজন্মকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন–

'ইনশাল্লা কইয়া কইরো কাজ
অইবো কাম, না-পাইবায় লাজ।'

যখন ছোট ছিলাম, সঙ্গদোষ বোঝাতে দাদা প্রায়ই বলতেন–

'আনা চুরে চুরা অয়
চুরার বাড়িত গেলে
মুরিদ অয়না ভালা
পির ভালা না অইলে।
গাই ভালা যার বাছুর ভালা
দুধ ভালা তার ঘি
বাপ ভালা যার পুত ভালা
মাই ভালা যার ঝি।'

আমার ৩ বছরের ছোট্ট ভাতিজিটি প্রায়ই জায়নামাজে দাঁড়িয়ে মনের মাধুরী মিশিয়ে ছিলটী ভাষায় গায়–

'সুবহানাল্লা, সুবহানাল্লা, সুবহানাল্লাজি
অন্ধকার কয়বরে যাইতে সংগে নিতাম কী?
সংগে নিতাম ফজরের নামাজ কযা কইরাছি

হায় রে আমার ময়নাপাখি ঘুমাইয়া রইছনি?' সে আরও অনেককিছুই জানে এমনতর। হাঁটতে-বসতে, খেতে-ঘুমোতে জপে আর জপে। এই মুহূর্তে সেসব মনে পড়ছে না। আমার ভাতিজি ফারজানার মতো কতশত ফারজানা যে তাদের দাদা-দাদি আর বড়োমা-বড়োবাবা'র কাছ থেকে এমন আরও প্রচুর লোকসাহিত্য মুখস্থ করছে, তার কোন ইয়ত্তা নেই। সিলেটিরা এভাবেই তাদের ঐতিহ্যকে লোককথা, লোককাহিনি দিয়ে মুখেমুখে ধরে রেখেছেন।

অনেকেই হয়তো বলবেন যে, লোকসাহিত্য দিয়ে ইসলামের প্রভাব কীভাবে বুঝানো সম্ভব? এই ধারণা মনে আসতেই পারে। কারণ, বিষয়টি কিছু জটিল-জটিল। আমাদের মনে রাখতে হবে, লোকসাহিত্য তৈরি হয় লোকসংস্কৃতি থেকে। আর লোকসংস্কৃতি গড়ে ওঠে সমাজের গভীর থেকে। আর সমাজের গভীরে যে চেতনা কাজ করে, তা-ই সংস্কৃতিতে প্রকাশ পায় আর সাহিত্যে ফুটে ওঠে। গৌড় বিজয়ের সুদীর্ঘ সাতশত বছর পরেও জালালাবাদের পরতে পরতে এখনো শাহজালাল, সিকান্দার গাজি ও নাসিরউদ্দিনের 'ইসলামিক রাজ্য সিলেট'-এর যথেষ্ট প্রভাব ও অসামান্য অবদান লক্ষ করা যায়।

শিক্ষা, দাওয়াত, আত্মশুদ্ধি ও জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ–নববি এই চার কর্মসূচিকে যথাসময়ে যথাযথ পালন করে করে ১৩৪৭ সালের কোনো এক নীরব ও নিস্তব্ধ দিনের মধ্যভাগে সিলেটের মহাপুরুষ হজরত শাহজালাল মুজাররদে ইয়ামানি রহমতুল্লাহি আলায়হি মাওলার সান্নিধ্যে পাড়ি জমান। তাঁর মাকবারা এতই সুপরিচিত ও সুপ্রসিদ্ধ যে, এর পরিচয় দিয়ে সময় নষ্ট করার মানেই হয় না।

বিশ্ববিখ্যাত পরিব্রাজক ইবনে বতুতা লিখেন–'ইন্তেকালের একদিন আগে শায়েখ তাঁর ভক্ত-অনুরাগীদের বলেছিলেন, "আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছায় আমি আগামীকাল তোমাদের ছেড়ে মাবুদের দরবারে চলে যাব। তোমরা রাব্বুল আলামিনের হুকুম মেনে চলবে। তাঁকে ভয় করবে।" পরদিন জোহরের নামাজের শেষ সেজদারত অবস্থায় তিনি ইন্তেকাল করেন। শায়েখের হুজরাখানার পাশে (দক্ষিণে) একটি খনন করা কবর পাওয়া গেল। সেখানে কাফন ও আতর মওজুদ ছিল। ভক্তগণ গোসল দিয়ে জানাজা শেষে লাশ দাফন করলেন।' (ইবনে বতুতার সফরনামা : নাসির আলী)

হজরত শাহজালালের পুরো নাম শায়েখ শাহজালাল মুজাররাদে ইয়ামানি বিন মুহাম্মদ। চিরকুমার হিসেবে ডাকা হয় মুজাররাদ। জন্মস্থানের দিকে সম্পৃক্ত করে বলা হয় ইয়েমানি। পিতার নামের সাথে মিলিয়ে মুহাম্মদ। শায়েখ তাঁর মৃত্যুর সময় ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি কিছুই রেখে যাননি। তবে যা রেখে গিয়েছিলেন, তা অতি মূল্যবান, হ্যাঁ অতি মূল্যবান–তরবারি। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামও মৃত্যুকালে এই তরবারি ছাড়া উল্লেখযোগ্য কোনো সম্পদই রেখে যাননি। কারণ, তাঁরই ঘোষণা–'নিশ্চয় জেনে রাখো! তরবারির ছায়ার নিচে রয়েছে জান্নাত।'

শাহজালালের ব্যবহৃত ঐতিহাসিক তরবারিটি দরগাহর দক্ষিণ দিকে অবস্থিত মুফতি নাজিমুদ্দিন আহমদের বাড়িতে সংরক্ষিত আছে। দর্শনার্থীরা এই তরবারি দেখে আর দেখে, কিন্তু দেখে না তরবারিতে নিহিত সেই রাজ্যজয়ের শক্তি। রাজপথের মিছিলে 'শাহজালালের তলোয়ার/ গর্জে উঠুক আরেকবার' বলে গলা ফাটানো হয় ঠিকই, কিন্তু বাস্তবে এই তরবারির আধুনিক ব্যবহার কেউ জানে না। অথচ ইতিহাস সাক্ষী, মুসলিম উম্মাহর হাত থেকে যেদিন তরবারি খসে পড়েছে বা তারা নিজেরা প্যাকেটিং করে তাকে তুলে রেখেছে, সেদিন থেকেই তাদের পরাজয় শুরু হয়েছে আর গোলামির শেকলে আবদ্ধ রয়েছে শতাব্দীকাল ধরে।

লেখক : বিভাগীয় সম্পাদক, সিলেটের দৈনিক শুভ প্রতিদিন



প্রবাসযাত্রার গল্প ও আরবের দিনলিপি

কাউসার মাহমুদ

মার্চের নয় তারিখ ক্রমশ ঘনিয়ে আসছিল আমার দিকে। চোখের পলকে দিনগুলো ফুরিয়ে এলো বুঝি। মৃদু শীত ও পড়ি পড়ি গরমের আবহে কিছুটা নাতিশীতোষ্ণ সময়। ফেব্রুয়ারির হুল্লোড়ে কোনোরকম ভুলে ছিলাম ছেড়ে যাবার কথা। জগদ্দল পাথরটা ততদিন দূরেই ছিল। সুদূর কোনো ভূমি, মরুভূমি কিবা পাহাড় চূড়ায়। ভাবতেই চাইনি আজন্ম সবুজ ছায়াবীথি গ্রাম, জলডোবা পুকুর, পাখির ডাক, আম্মা ও ফুলের মুখ দুটি ছেড়ে কোথাও যেতে হবে। ব্যক্তিজীবনে আড্ডা ও কাফেতে কবিতার চরণ উল্টে নির্ঘুম রাত্রিযাপন চির-বোহেমিয়ান আমি কিছুটা বাৎসল্যপরায়ণ। চরিত্রগুণ কি অকৃত্রিমতা–যাহোক বন্ধুভাগ্য আমার বরাবরই ভালো। ছোট্টকালে ভবিষ্যৎ পণ্ডিত বানাবার অভিপ্রায়ে বাবা-মা তাঁদের প্রথম পুত্র সন্তানকে সেই যে ঘরছাড়া করলেন, এখনও ফিরতে পারলাম কই? প্রাতিষ্ঠানিক পাঠ চুকোবার প্রথম দিনই চাকুরি। তারপর ছ'মাস না যেতেই এ আরবভূমিতে চির আড্ডাপ্রিয় বন্ধুবাজ যুবকের নিঃসঙ্গ যাপন। (কোনোদিন পুস্তক রচনা হোক না হোক আত্মজীবনী আমি লিখবোই, সেখানেই দেব ও দেবীতুল্য আমার বন্ধু ও বান্ধবীদের কথা লিখবো বলে সঙ্গত কারণেই এ রচনায় তা এড়িয়ে গেলাম)।

সেদিন বৃহস্পতিবার। কুসুমিত ভোরটা এক ডুবে পার হয়ে গেল দেখলাম। বাবা কিছুক্ষণ কেঁদেকুটে বিদায় হলে দ্রুত ছাদে গিয়ে স্বস্তিতে কাঁদলাম। মা তো রাজ্যের ব্যস্ততা নিয়ে ঘুরছেন। কী নিলাম আর কী রাখলাম ওই খোঁজে হণ্য। সারা বাড়িতে যেন গোছগাছের ধুম পড়েছে। কে জানে কেন অভিমান হলো! রাগ হলো খুব। মনে মনে ভাবলাম, আমাকে তাড়াবার কি উচ্ছ্বাস তাদের। একটিবার যদি আমার ভেতরটা দেখত কেউ–কী বইছে ওখানে!

যাকগে, তা গোছগাছে লাগেজ ভরেটরে তিনটিতে গিয়ে ঠেকলো। তাতে বস্ত্র ও প্রয়োজনীয় আসবাব থেকে বই-পুস্তকই যে বেশি তা বলে আর বিদ্যাপতি সাজছিনে। তারপর ঝিম দুপুরের একটু আগে এয়ারপোর্টের উদ্দেশ্যে বাড়ি ছাড়লাম। এমনিতে আমার বাড়ি আসা হতো নিতান্তই গুণে গুণে। এমন অনেক হয়েছে, তিনচার কিস্তি বাবার আর্তনাদ শুনে তবেই বাড়ি এসেছি। কিন্তু সেদিন, সেদিন যে আমার ঘরটা, বইয়ের আলমারি ক'টা, শোবার খাটটা আমাকে ক্রমাগত গলা টিপে ধরছিল, আমার দম বন্ধ হয়ে আসছিল কী এক গোপন অসহ্য ও ব্যথায়, তা আমার জানা নেই। তবু শ্লথ, নিঝঝুম, বাক্যহীন বিষণ্ন পথিকের মতো হেঁটে হেঁটে গাড়িতে উঠলাম। আমি সামনে ড্রাইভারের পাশে। পেছনে আম্মা, খালামণি, বড়োআপা, ভাগ্নী ও ছোটোভাইয়েরা। খোলা রাস্তা ধরে মাইক্রো চলছে।

বাম পাশের লুকিং গ্লাসে হঠাৎ দেখি আম্মার মুখ। সেখানে এমন মেঘ, যেন তাবত পৃথিবী ধ্বসে যাবার পূর্বে আকাশে তারই প্রলয়মূর্তি। আর তার ভারে আকাশটা ভেঙে পড়ছে। ঠিক তেমনই আমার মা ভেঙে পড়ছেন। তার জলটলমল চোখের সে কাঁপনে মনে হলো প্রবল ঝড়ে যেন জানালার কপাট দুটি মেলছে আর ঠাসঠাস বন্ধ হচ্ছে। এই দেখে সেই যে চোখ বন্ধ করলাম, ঘণ্টা দুই পরে একদম এয়ারপোর্টে এসে তবেই পাতা দুটি মেলে ক্রমশ সংকীর্ণ হয়ে আসা পৃথিবীটা দেখতে পেরেছিলাম।

বেলা যায়। আমার এক যুগের পরিচিত ঢাকাটি কেমন বিষাদে ঘেরা। বিকেল হাঁটছে অন্তপুরীতে। বন্ধুদের কথা বলেছিলাম, আমার একটা জীবন যাদের কাছে তুলে দিতে পারি, একেএকে তাদের অনেকেই এলো। কে আমি, কীই-বা দিয়েছি তাদের, অথচ তারা এলো। কেউ কেউ চকিতে চোখটাও মুছে নিল অলক্ষে। কিন্তু সেদিন কি আর ফাঁকি দেয়া যায়? দেখে ফেলি। আর ভাবি এই অস্তমান সূর্যটা আরেকটু ধীর হোক। একদিন সন্ধ্যা না নামুক। আমরা এভাবেই একটি বিকেলে দাঁড়িয়ে থাকতে চাই। আমাদের একছত্র পদচ্ছাপের গল্প বলে বলেই কাটাতে পারি এ বিরহী মায়াবেলার অনুরাগ। কিন্তু এ লহমার আবেগ যতটা করুণ তার চেয়ে প্রকৃত বিষয়টি হলো আমাকে যেতে হবে। আর ফিরতে হবে আমার সকল আত্মীয়দের। তারা

ফেরে না। আমিই বরং ঢুকে যাই এয়ারপোর্টের বদ্ধ লাউঞ্জে। কে নিষ্ঠুর? আমি না তারা? সময় ও জীবনের কোনো বিপর্যস্ত কাল কখনো কখনো এমন প্রশ্ন রেখে যায়। যা মেনেই হয়তো চলতে হয় আমাদের। তেমনই করুণ ও অস্বস্তিভরা সন্ধ্যাটা কাটিয়ে রাত দশটার ফ্লাইটে চড়লাম। গন্তব্য দুবাই, শারজাহ। সেখানে ঘণ্টা ছয়ের ট্রানজিট শেষে আভা। আমার কর্মক্ষেত্র।

দুরুদুরু বুক। গহীনে চাপা নিঃশ্বাসটা ছেড়ে আলোজ্বলা ঢাকাকে দেখলাম জানালার কাঁচ দিয়ে। তারপর আর কী! ব্যাগ থেকে গোলাম মোস্তফার 'বিশ্বনবী'টি বার করে পুনর্পাঠ শুরু করলাম। মহাপুরুষের দেশে যাই, পথে পথে তাঁকে ভাবি। বহুবছর আগে মওলানা আবু তাহের মেসবাহ সাহেবের অনুবাদকৃত গুরুদত্ত সিংয়ের 'তোমাকে ভালোবাসি হে নবী' পড়ে যেমন আপ্লুত হয়েছিলাম, আজ তেমনই হচ্ছি। কী মসৃণ বিভোরতায় ডুবে যাচ্ছি আমি। ভাবালুতার গহীন অরণ্যে হেঁটে এই বুঝি পালিয়ে যাচ্ছি কোনো যাজকের মতো। ইবনে হিশামের 'সিরাতে ইবনে হিশাম', ইদরিস কান্ধলভির 'সিরাতে মুস্তফা' পুস্তকক'টিও তো অধমের পড়া। কিন্তু গোলাম মোস্তফার এই বই আগে একবার পড়ার পরও কী মনে করে যে ব্যাগে ভরলাম! কী গদ্য, কি প্রেম, বাক্যের কী গাঁথুনি আর সহজাত কাব্যিকতার কী অদ্ভুত উপমা সব! বাংলাসাহিত্যে বোধকরি রাসুলের জীবনভিত্তিক এরচেয়ে উচ্চমার্গীয় কোনো পুস্তক এখনো রচিত হয়নি। ইনি হয়তো শাস্ত্রীয় কোনো পণ্ডিত নন, কিন্তু একজন কবি তাঁর হৃদয়োৎসারিত প্রেমের নৈবদ্য যখন অঞ্জলি ভরে পেশ করেন তাঁর ভাষায়, তাঁর আকুলতায়, তাঁর মর্মে মর্মে উপলব্ধ পবিত্র গচ্ছিত সে-প্রেম, তা তো পাঠককে নাড়া দেবেই। সমস্ত বায়বীয়তাকে তছনছ করে কোনো এক নিঃসীম অনুভবে পাঠিয়ে দেবে ছত্রে ছত্রে। বিদ্যে তো নেই-ই, সাকুল্যে একআনা, ততধিক অক্ষমতা প্রকাশে, নইলে সেসময় নবিজিকে অনুভবের কিঞ্চিতও তুলে ধরার ব্যর্থ চেষ্টাটি করতুম।

রাত দুটো নাগাদ শারজাহ পৌঁছি। এখান থেকে সকাল আটটায় ট্রানজিট বিমানে আভার উদ্দেশে রওয়ানা। বিমানবন্দর কেমন, সেখানের হালচাল নিয়ে আর গ্যাজর গ্যাজর করছিনে। তবে এটুকু বলে যাই, বন্ধুভাগ্য যে আমার ভালো তা তো জানতুমই। কিন্তু পরদেশে এসে প্রথম সকালেই যে ওয়েটিং লাউঞ্জের এককোণে বসে পাকিস্তানি, ভারতীয় ও আফগানিদের সঙ্গে আড্ডা জমিয়ে দিতে পারব তা জানতুম না। (এই তিন জাতের মানুষের সঙ্গে পরবর্তী সময়ে খুব অল্পদিনেই আমার বিস্তর মেশা হয়েছে, তাদের লোকাচার ও অদ্ভুত সব কর্মকাণ্ডের কথা গ্রন্থিত রচনায় আসলেও আসতে পারে।) এর মাঝে কখন যে একপাশে চুপটি করে বসা বাঙালি কিশোরীটির প্রতি মন টইটই করে উঠল টেরই পাইনি। দু'চারবার চোখাচোখিতে তিন তিনটে দুষ্প্রাপ্য আগাছা কবিতার জন্ম কখন যে দিলেম, সেদিন সন্ধ্যায় ডায়েরি হাতড়ে তাই মনে করার চেষ্টা। শাস্ত্র তাই বলে–ঢেকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে।

দুপুর গড়িয়ে আসছে এখানে। জানালার ওপারে নিচে তাকিয়ে দেখি সার সার উঁচু-নিচু বিস্তৃত পাহাড়ি উপত্যকা। আভা পাহাড়বেষ্টিত অঞ্চল। এখানে আরবের অন্যান্য শহরের চেয়ে প্রকৃতি ও আবহাওয়া একেবারেই উল্টো। মার্চের এ সময় রিয়াদ, মক্কা, মদিনায় যেখানে ঠাঁ-ঠাঁ গরম, এখানে তখন প্রাত ও সন্ধ্যায় হাঁড়কাঁপানো শীত। সে যাহোক, এলেবেলে এসব কথা আসবে সময়ে সময়ে।

ঘড়ির কাঁটা এগারো ছুঁইছুঁই। আভায় অবতরণের মাধ্যমে টানা তেরো ঘণ্টার ঝক্কিঝামেলা ও গুমোট একটি দীর্ঘশ্বাসের যবনিকাপাত ঘটে। এ এয়ারপোর্টটা কেমন নিঃস্তব্ধতায় মোড়া। শান্ত। খুব বড়সড় কিছু নয়। আগাগোড়া একতলা বন্দর। অল্পক্ষণেই ইমিগ্রেশনের কাজ শেষ করে বাইরে বেরিয়ে দেখি বেলাল ভাই দাঁড়িয়ে। আমার খালাতো ভাই। খুব ছোট থাকতে আম্মা বাঘের বদলে তাঁর কথা বলে ভয় দেখাতেন। এতকাল পরে একসঙ্গে থেকে বুঝতে পেরেছি, কী

বোকাটাই না ছিলাম তখন। মানুষও এমন সহজ, সুন্দর ও নির্মল মনের হতে পারে! যেন মৃৎপাত্র। কোনো ক্ষোভ নেই, অভিযোগ-অনুযোগের বালাই নেই। হাজারটা ভুল করলেও ঢলে পড়া সূর্যটির মতো দিনটাকে আগলে রাখতে চায়। তা এভাবে আর কতক্ষণ? বললাম, ‘ভাইজান! পেটে তো ক্ষুধা চোঁ চোঁ করছে।

জ্ঞানতাপস প্রফেসর আব্দুর রাজ্জাক একদা বঙ্গদেশের আরেক মনীষা আহমদ ছফাকে বলেছিলেন,‘যখন কোনো নতুন জায়গায়



যাইবেন, দুইটা বিষয় পয়লা জানার চেষ্টা করবেন। ওই জায়গার মানুষ পড়ালেখা কী খায়। আর পড়ালেখা কী করে।’ দু দুবার ‘যদ্যপি আমার গুরু’ পড়ে কিছু অর্জন হোক না হোক খাবারের কথাটা ঠিক মনে রেখেছি। কী খাবো, কোথায় খাবো, জিজ্ঞেস করতেই বললুম, ‘তা ভাইজান, নিয়ে চলুন আরবের কোনো হোটেল রেস্তোরাঁয়। প্রথমে এ স্বাদটাই চেখে নিই। বিদ্যে-বুদ্ধি বা পণ্ডিতসংশ্রব হবে কি হবে না তা পরে দেখা যাবে ক্ষণ।

রন্ধনশিল্পে আরবরা কতটা অভিজাত তা এখনো জানা হয়ে ওঠেনি। কিন্তু আরবের মেহমানদারির সে ঐতিহ্য এবং নিজেকে নিঃস্ব করে মুসাফিরের চিত্ত জয় করার গল্পগাঁথা তো ইতিহাস। এদের মতো এতটা আপ্যায়নে সুখী কোনো জাতি পূর্বকালে পৃথিবীতে কোথাও ছিল কিনা তা খোঁজা বড় মুশকিল।

বলিহারি কারবার। দোকানটা ইরানির। কিন্তু সমস্ত খাবার আরবীয়। বঙ্গদেশের পূর্বআমলের বৈঠকখানার মতো করে বিছানো লম্বা চৌকি-মতো সিমেন্ট বাঁধা বসার স্থান। পুরু কার্পেট আর মোলায়েম ফোমের সাহায্যে এতটাই উঁচু করা হয়েছে যে, বসতেই নিতম্বটা ধীরে দেবে যায়। তা আপনি সেখানে শুয়ে পড়ুন কি তেহাতি হয়ে বসে আহার করুন, ও কারো দেখার সামান্য ইচ্ছে নেই। না কেউ নাক সিঁটকাবে না আঁড়চোখে দেখে ফিসফিসিয়ে তাচ্ছিল্য করবে। কাষ্ঠ কপাল! এ জ্ঞান আমার পরে আহরিত হয়। নইলে সেদিন কি আর অমন বসে বসে কৃত্রিম বাঙালিপনা দেখিয়ে কিছুটা ইংরেজ ও কিছুটা ইউরোপীয় হয়ে ভদ্রস্থের ভান করি! বিনাবাক্যে সটান শুয়ে তবেই ঘণ্টা আধেক বাদে আহার সারতুম।

দস্তরখানার প্রচলন তো মুসলিম জাতির সর্ব দেশেই আছে। তা চেনাও বটে আমাদের। কিন্তু যখন দেখলুম ধবধবে সাদা পুরো টেবিলসমেত বিরাট একখানা পলিথিন এনে বেয়ারাটা সামনে বিছালো, প্রথমে কিছুটা হতভম্ব তো হয়েছিলুমই, পরে যখন এক পাতিল সাদা চিক্কন চালের পীতবর্ণের ভাত ও আস্ত দুটো মোরগ ভাঁজা তার ওপর ছেড়ে দিল, তখন হতভম্বের ঘোর কেটে বিস্ময়ে বিমূঢ়। এ কোথা এলেম ভাই! এ কেমনতর খাবার আর পদ্ধতিই বা কী! গোলগোল চোখে নতুন দেশের নানাবিধ আচার-পদ্ধতি দেখে যে আমি কিছুটা অস্বস্তিতে পড়েছিলাম, ভাই ও তাঁর পাতানো এক মামা ততক্ষণাৎ তা উপলব্ধি করলেন। হাসতে হাসতে গল্পচ্ছলে তাঁরা যে কী করে সে খাবার গলধঃকরণ করলেন তা আমার বুঝতে এবং খেয়ে অভ্যেস করতে টানা দুমাস লেগেছে। এ সোয়াদী খাবারের নাম 'ফাহম'। সাধারণত বৃহদাকারের চওড়া থালা ও ডেগচিতে করে এ খাবার পরিবেশন করা হয়।

বঙ্গদেশে অনায়াসে যা ছ'সাত জনের পেটপুরে খাওয়া হবে, আরবিরা তা নেয় দুজনে। সংখ্যাধিক্যে তা কখনো অতিমাত্রায় পৌঁছলে তিন-চারে গিয়ে পৌঁছে। সেইসাথে রুটি, কাবাব, কোপ্তা, বুরুস্ট (অধুনা আমরা যেটিকে গ্রিল বলি, তারই এক রকমফের) এবং মোলায়েম মাছের মাংস (কী এক বিশেষ কায়দায় ভেতরের সমস্ত কাঁটা বার করে শুধু মাংসই সেদ্ধ করে দেয়) নিয়ে বসে। এন্তার বাহারি খাবারে দস্তরখান ভরে শেষাবধি তার অধিকাংশটাই ফেলে যায়। এ বড় আজব জাতি। খোদাতাআলা ফলমূল-খানাখাদ্যে যত প্রাচুর্য দিয়েছেন তাদের, তারা যেন ঠিক ততটাই অপচয় করে। এ বড় নির্মম সত্য ও প্রকৃত আরবীয় ইতিহাস। তা এর ব্যতিক্রমও যে নেই সেটা বলেছিনে। তবে এমন আরব লোকের সংখ্যা বিশাল আরব ভূখণ্ডে নিতান্ত সামান্য বলেই একদিন কথায় কথায় জানিয়েছিল আমার আরবীয় বন্ধু আনাস। সামনে তার সঙ্গে কাটানো সময় ও নানা বিষয়ে আমাদের বাতচিতের গল্প আসবে।

সাত-আষ্টেক গোবদাগাবদা পুরুষের আহার 'ফাহাম'-এ মোটে গুণেগুণে আটটি এলাচ, দুটো তেজপাতা আর উপরে রাখা দুটো আস্ত মুরগিই সার। এই হলো আরবদের কওমি খাবারের সাধারণ শ্রী। ভোজনরসিক তো নই, সেহেতু আরবরা নিত্য তাদের খাদ্যাভ্যাসের তালিকায় কীসব উমদা খাবার রেখেছে তা অতোটা রপ্ত হয়নি। তবুও একজন নবাগত পরবাসী নাগরিক হিসেবে সাধ্যে যতটা কুলোয়, বা কী খাচ্ছে এ জাতি এ সন্ধানে কিছুটা খোঁজখবর নিয়ে জানতে পারলুম। তাদের বিবাহশাদি, অথবা কোনো আচার-অনুষ্ঠানে যেসব খাবার বাহ্যত ঐতিহ্য হিসেবে রাখতেই হয় তা হলো–ইদাম (তিরমিজি শরিফে এই খাবারের কথা রাসুলের পছন্দের বলে উল্লেখ আছে), মুশাক্কাল, আদাস। তবে এই প্রকার থেকে আরেকটু শালীন ও উচ্চাভিলাষী খাদ্য হলো 'মান্দি'। চালের তুলনায় এতে গোশতের পরিমাণ বেশি। তারপর তার ওপর আস্ত একখানা বকরি ভেজে কি ফ্রাই করে বসিয়ে দাও। এর স্বাদ এখনো চেখে দেখা হয়নি। শুনেছি রমজানের পরপরই এ অঞ্চলে বিবাহের ধুম পড়ে। সেখানেই এ খাবার পরিবেশন করা হয় সাধারণত। আসন্ন কোনো বিবাহযজ্ঞে নেমন্তন্ন পাবার যে সুপ্ত বাসনা মনে আতিপাতি করছে, তা আর লুকিয়ে

রেখে লাভ কী!
নতুন দেশ, নতুন মানুষ। সময়গুলোও কেমন নতুন মনে হচ্ছে। কখনো মন টেকে আবার মুহূর্তেই তা যেন বিষাদে ভর করে ঘনঘোর অমাবস্যার রূপ নেয়। আপন দেশ, মাটি, পরিবার ও পরিচিতদের গন্ধ ছেড়ে যারা এমন দূরদেশে পাড়ি জমায়, তারাই বোঝে শূন্যতা কী! একাকিত্বের কষ্ট কেমন। সে কষ্টই বুঝি আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে আমাকে। টানা ১৫ দিন কেবল কর্মক্ষেত্রে যাওয়া আর বিকেলে দোতলার গুমোট রুমটাতে ফেরাই ছিল প্রত্যহকর্ম। যে বাড়িতে থাকি, তার পেছনেই পাহাড়ি এলাকা। সন্ধ্যার একটু আগে তিরোহিত আলোটা যাচ্ছি যাব বলো যেই এপাশ-ওপাশ করে, তখনই ঘনায়মান অন্ধকার কী মসৃণ করে তাকে টেনে নেয়। হঠাৎই যেন তা পাহাড়ের পেছনে ডুবে যায়। মনে হয় সূর্যটা বুঝি ও পাহাড়ের পেছনেই ঘুমোতে যাচ্ছে। সেইসাথে ভাবতাম, আহা! আমার বাঙালি সূর্যটা না কতক্ষণ আগেই ঘুমিয়ে গেছে। তার সাথে গভীর নিদ্রামগ্ন আমার পরিচিত সকল নারী। মনটা কেমন ককিয়ে উঠতো। জল টলমল চোখ কখন যে ঝাপটা মেরে কপোল ধুইয়ে দিত, তা টের পেতাম শুকোনোর পর।

এমন নিঃসঙ্গ একেলা যাপনের কালে আনাসের সঙ্গে প্রথম পরিচয়। সদ্য কৈশোর পেরোনো এই যুবক কী অদ্ভুত অমলিন সুন্দর। যেন কোনো স্নিগ্ধ পবিত্রতায় মোড়ানো তার চোখ। যা থেকে ঠিকরে ঠিকরে পড়ে অকৃত্রিম বিশ্বাস। ভালোবাসা তার প্রতিটি উচ্চারণে।

আনাস মদিনা ইউনিভার্সিটিতে ইতিহাসে পড়ছে। সাথেসাথে ইবনে খালদুন বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্য শিল্পকলা নিয়েও একটা আলাদা কোর্স করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। পৃথিবীর নানান দেশের ইতিহাস বুঝি তার নখদর্পনে। বলছে তো বলছেই। আরবি শিল্প-সাহিত্যেও বিস্তর জ্ঞান। আমারও যেহেতু এদিকেই ঝোঁক, তাই ক্রমে তার সঙ্গে অন্তরঙ্গতা গাঢ় থেকে প্রগাঢ়ে উপনীত হলো। প্রথাগত সাহিত্যের ছাত্র যেহেতু নই, জানাশোনাও শূন্যের কোটায়, তবুও কী করে কীভাবে যেন আমাদের আলোচনাগুলো জমে যাচ্ছিল। বোধকরি সেই ছাত্রজীবনে সাবয়ে মুয়াল্লাকা পাঠ আর মাদরাসার চৌহদ্দিতে থেকে কখনো ফারাজদাক, ইমরুল কায়েস, তরফা বিন আল-আবদ, জুহায়ের বিন আবি সুলমা, লাবিদ বিন রাবিয়া, আমর বিন কুলসুম, কাব ইবনে জুহাইর, আনতারা বিন সাদ্দাদের কবিতা নেড়েচেড়ে দেখায়; তাই বলতে পারছিলুম। আর তাতেই আনাসের চক্ষু ছানাবড়া। 'তুমি আরবের এত কবিদের চেনো!'

বললুম, 'অমন চোখ রগড়াচ্ছ কেন? সম্প্রতি দেখছি আলি আবু শামলার 'সালিনা' উপন্যাস নিয়ে তোমাদের নবীন ছেলেমেয়েদের ত্রাহিত্রাহি উত্তেজনা, ও-ও পড়ে নিয়েছি এখানে এসেই।'

'আনতা মুমতাজ' বলেই উচ্ছ্বসিত হয়ে আনাস জড়িয়ে ধরে আমাকে।

বললুম, 'ছাড়ো, ছাড়ো!'

আনাস হকচকিয়ে বলে, 'হলোটা কী?'

'বলো, জায়্যিদ জিদ্দান!'

'কেন?'

কিছুক্ষন চুপ থেকে মৃদু হেসে বললাম, 'সারাজীবন কাব্যি করা ছেলেটা বেশিরভাগ ও-ই হয়েছে। দেখা যেত গোটা কয়েক নম্বরের জন্য নচ্ছার মুমতাজটা হাতছাড়া হয়ে গেছে।'

দুজনেই হো-হো করে হেসে উঠলাম।

পুনশ্চ : ভারতীয়, পাকিস্তানি ও পাঠানদের কথা বলব ভেবেছিলেম। এদের নানা সব রসাত্মক গল্প বিস্তারিত হয়ে আছে আমার ভেতরে ও উপরে। কিন্তু বিধিবাম। হাফেজ না হয়েও খোদাতাআলা রহমত করে তারাবিহ পড়ানোর ভাগ্য খুলেছেন। প্রথমদিন পড়ানোর পরই বুঝেছিলুম হাফেজরা কেন এই মহান ইবাদতটি সম্পন্ন করে এসে ফরাসে চিৎপটাং হতেন। আপাতত ওদিকেই ছুটলুম।

লেখক : প্রবাসী কবি ও গল্পকার



আলেম সাংসদ ড. আবু রেজা নদভীর মুখোমুখি

হামমাদ রাগিব

তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের সময় নির্ধারিত হয়েছিল রাত সাড়ে নয়টা। মুঠোফোনে দুদিন আগেই সময়টা নেওয়া হয়েছিল। পল্টন মোড় থেকে জ্যাম ঠেলে জাতীয় সংসদ ভবন এলাকায় পৌঁছুতে পৌঁছুতে ঘড়ির কাঁটা সাড়ে দশটার ঘর ছুঁইছুঁই। নির্ধারিত সময়ের এক ঘণ্টা পরে গিয়ে তাঁর সাক্ষাৎ পাবো কি-না, দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে গেলাম। সঙ্গে এহসান সিরাজ (জীবন্তিকা সম্পাদক) ছিলেন। সাক্ষাতের ব্যবস্থা তিনিই করেছেন। বললেন, সময় খরচ করে যখন আসা হলো, একবার গিয়েই দেখা যাক।

জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজার ন্যাম ভবনের নির্ধারিত অ্যাপার্টম্যান্টের সামনে দাঁড়িয়ে কলিং বেলের সুইচ টিপলাম। দরোজা খুলে দিলেন তাঁর পিএস। সহাস্যে স্বাগত জানালেন। জানালেন, স্যার আমাদের অপেক্ষা করে অন্য একটা মিটিংয়ে বসে গেছেন। মিটিং শেষ হওয়া অবধি অপেক্ষা করতে হবে। আমরা অপেক্ষার প্রহর গুণতে

বসলাম ড্রয়িং রুমের সোফায়।
তাঁর পুরো নাম প্রফেসর ড. আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দীন নদভী। চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী আলেম পরিবারের সন্তান এবং নিজেও একজন তুখোড় আলেম। গত দুই নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনয়নে চট্টগ্রামের সাতকানিয়া আসনের সংসদ সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হয়েছেন। বর্তমান সংসদের একমাত্র আলেম সংসদ সদস্য তিনি।
কওমি মাদরাসার সর্বোচ্চ স্তর দাওরায়ে হাদিস সমাপণ করে ১৯৮৮ সালে ভারতের নদওয়াতুল ওলামা লাখনৌ থেকে আরবি সাহিত্য ও ইসলামিক শিক্ষায় বিএ (অনার্স) ডিগ্রি অর্জন করেন। একই প্রতিষ্ঠান থেকে পরের বছর দ্য সাইন্স অব ইসলামিক ল'-এর ওপর লাভ করেন স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। পরবর্তী সময়ে লাখনৌ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। নদওয়ায় থাকাকালে বিশ্বখ্যাত ইসলামিক স্কলার মাওলানা আবুল হাসান আলি নদভির একান্ত সাহচর্য ও স্নেহও লাভ করেন বলে জানতে পারি আমরা তাঁর কাছ থেকে।
চট্টগ্রামের বিখ্যাত মাদরাসা জামিআ দারুল মাআরিফ আল-ইসলামিয়ায় ১৯৮৯ সালে শিক্ষাসচিব হিসাবে যোগদানের মাধ্যমে তাঁর কর্মজীবনের সূচনা। ১৯৯৫ সালে চট্টগ্রাম আন্তর্জাতিক ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ে দাওয়াহ ও ইসলামিক শিক্ষা বিভাগের প্রভাষক হিসেবে নিয়োগ পান। অল্পদিনের ভেতরই তিনি একজন তুখোড় অধ্যাপক হিসেবে সুনাম অর্জন করেন এই বিশ্ববিদ্যালয়ে। ২০১৪ সালে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের সদস্য হবার পরও নিজের শিক্ষকতা পেশা ছেড়ে দেননি। এখনও তিনি প্রফেসর হিসেবে নিয়মিত ক্লাস নেন। পাশাপাশি নিজের নির্বাচনী এলাকার একেকটি মসজিদে একেক জুমা বারে জুমার নামাজের ইমামতি করেন। আরবি ভাষা বিষয়ে উচ্চতর পড়াশোনার সুবাদে আরব বিশ্বের সঙ্গে তাঁর ভালো একটা যোগাযোগ ও সম্পর্ক আছে। আরব দেশগুলোর বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে তাঁর সম্পৃক্তি সেই নব্বইয়ের দশক থেকেই। আমাদের আজকের সাক্ষাৎ আরব দেশের সঙ্গে তাঁর সম্পৃক্তি, আরব বিশ্বে বাংলাদেশকে উপস্থাপনের গল্প, আলেম হয়েও আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে জড়ানো ইত্যকার বিষয়ে আলাপ জমানোর জন্য।
অপেক্ষাটা বেশ দীর্ঘ সময়ই করতে হলো। রাত বারোটার দিকে পাওয়া গেল তাঁর সাক্ষাৎ। রাত গভীর হলেও আন্তরিক ও অমায়িক ভঙ্গিতে কথা বললেন আমাদের সঙ্গে। প্রথমেই জিজ্ঞেস করলাম, 'একজন শিক্ষক আপনি, শিক্ষা এবং আরবি ভাষা ও সাহিত্যের সেবা করছিলেন, রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ার কারণ কী?'
উত্তরে তিনি জানালেন, 'জ্ঞান বিতরণের পাশাপাশি সমাজ সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করা আমাদের আকাবিরে দেওবন্দ, নদওয়া ও তাবলিগি মুরব্বিদের একটা বিশেষ গুণ। পৈত্রিক সূত্রে এ গুণটা আমি পেয়ে এসেছি। আমার বাবা তাঁর নিজের গোলার ধান বিক্রি করে মাদরাসার শিক্ষকদের বেতন দিয়েছেন। রাজনীতি মানে সমাজের সেবা করা, প্রতারণা করা নয়। রাজনীতিতে প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন করা, ওয়াদা খেলাফ না করা, জনগণের জন্য কাজ করা, তাদের পাশে থাকা, তাদের সমস্যার সমাধান করা, জনকল্যাণমূলক কাজ করা ইত্যাদি বিষয় আছে। এবং এসব কাজ যথাযথভাবে করতে পারলে সমাজসেবায় অনন্য অবদান রাখা সম্ভব। বায়হাকির বর্ণনায় এক হাদিসে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি কারও অভাব পূরণ করবে, এবং উদ্দেশ্য থাকবে ওই ওই ব্যক্তিকে সন্তুষ্ট করা, প্রকৃতপক্ষে সে আমাকে সন্তুষ্ট করল। আর যে আমাকে সন্তুষ্ট করল, সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করল। আর যে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করল, আল্লাহ তাকে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন।" রাজনীতির যদি সঠিক ব্যাখ্যা করা হয় তাহলে রাজনীতি এবং সমাজসেবা একটা আরেকটার সঙ্গে অঙ্গা-অঙ্গিভাবে জড়িত; একরকম ইবাদতও বটে। এজন্যই মূলত আমার রাজনীতিতে আসা।'
কিন্তু আওয়ামী লীগের রাজনীতিকেই কেন বেছে নিলেন?
এর উত্তরে ড. আবু রেজা নদভী বলেন, 'আমি

যে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করি, চট্টগ্রাম আন্তর্জাতিক ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, এটা আমাদেরই হাতে গড়া। আরব রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে আমার বিশেষ যোগাযোগ থাকার কারণে এ বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণে প্রচুর অর্থকড়ি এসেছে আরব রাষ্ট্রগুলো থেকে। যে বিশাল ক্যাম্পাস গড়ে উঠেছে সেখানে, এসব আরব রাষ্ট্রগুলোর সহায়তায়ই সম্ভব হয়েছে, এবং আলহামদুলিল্লাহ, আমার বিশেষ যোগাযোগ ও প্রচেষ্টা এখানে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। কিন্তু চারদলীয় জোট সরকারের আমলে এ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে পুরোপুরিভাবে জামায়াতের লোকজন গ্রাস করে নেয়। আমাকে ট্রাস্টি বোর্ডসহ প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন পদ থেকে বের করে দেয়। অবশ্যি নানা হীনচেষ্টার পরও অধ্যাপনা থেকে বাদ দিতে পারেনি। সে-সময়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও সেমিনারে অংশগ্রহণের অজুহাতে জামায়াতের শীর্ষ নেতারা এখানে সময়ে সময়ে আসতে থাকেন। আমি ছিলাম নির্যাতিত। কিছু বলতেও পারছিলাম না, সইতেও পারছিলাম না। জামায়াতের শীর্ষ নেতা গোলাম আজম, মাওলানা দেলোয়ার হোসাইন সাঈদী নানাভাবে চেষ্টা করছিলেন আমাকে জামায়াতের রোকন বানাতে। কিন্তু আমি সাফ জানিয়ে দিয়েছি, আমি একজন আলেম, আমাকে আল্লাহ তাআলা বিবেক-বুদ্ধি-জ্ঞান দিয়েছেন, আমি কী করব কী করব না, সেটা বোঝার ও সিদ্ধান্ত নেবার যথেষ্ট ক্ষমতা আমার আছে।

'তারা যখন নানাভাবে আমাকে বুঝিয়ে বাগে আনতে পারল না, তখন আমার ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। কারণ, চট্টগ্রাম আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার অবদান অনেক, এখানকার সবকিছু থেকে আমাকে বাদ দিলেও অধ্যাপনা থেকে তারা বাদ দিতে পারছিল না। আর অধ্যাপনার সুবাদে আমি এখানে যথেষ্ট প্রভাব খাটাবার ক্ষমতা রাখতাম। এজন্য প্রতিষ্ঠানটিকে পুরোপু-রিভাবে তারা গ্রাস করতে পারছিল না। আমার ওপর ক্ষিপ্ত হবার পর বেশ কয়েকবার তারা আমার ওপর আক্রমণ চালায়। আল্লাহর অশেষ রহমতে আমি এসব আক্রমণে প্রাণে বেঁচে যাই।

'আওয়ামী লীগের নেতৃত্বেই স্বাধীন হয়েছিল আমাদের প্রিয় এই বাংলাদেশ। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতার ডাকে সাড়া দিয়ে আপামর জনতা নেমে এসেছিল বীরবিক্রমে। স্বাধীন করেছিল এই ভূমি। তাই আওয়ামী লীগের প্রতি আমার আলাদা একটা দুর্বলতা ছিল আগ থেকেই। কিন্তু আওয়ামী লীগকে ইসলামের বিরুদ্ধ-শক্তি হিসেবে দাঁড় করানোর চেষ্টা করত জামায়াতে ইসলামী। আমি চিন্তা-গবেষণা করে দেখলাম, এটা জামায়াত ও বিএনপির রাজনৈতিক একটা চাল। তারা আওয়ামী লীগকে ইসলামের বিরুদ্ধ-শক্তি হিসেবে দাঁড় করিয়ে রাজনৈতিক স্বার্থ হীনভাবে চরিতার্থ করতে চাচ্ছিল। জামায়াত-বিএনপির তুলনায় আমি আওয়ামী লীগে ইসলাম-বিরোধিতার কিছুই পেলাম না। তাই রাজনীতিতে প্রবেশের সিদ্ধান্ত যখন গ্রহণ করি, দল হিসেবে আওয়ামী লীগকেই বেছে নিই। ২০১৪ সালের নির্বাচনে যখন আমি আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পেলাম, তখনও জামায়াত-শিবির আমাকে হত্যার জন্য আক্রমণ চালিয়েছিল। আল্লাহর অশেষ দয়ায় সে যাত্রায়ও প্রাণে রক্ষা পাই।'

ড. আবু রেজা নদভীর সঙ্গে আরব বিশ্বের ভালো একটা সম্পর্ক আছে, ইতিমধ্যেই আমরা তা বলেছি। তিনি কাতার ভিত্তিক আন্তর্জাতিক মুসলিম স্কলার অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং আন্তর্জাতিক ইসলামি সংস্থা রিয়াদের (কেএসএস) ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি আরব ভিত্তিক বেশ কয়েকটা আন্তর্জাতিক সংগঠনের সঙ্গে জড়িত। শিক্ষা, উন্নয়ন ও গবেষণার কাজে আরবসহ বিশ্বের ৪৬টা দেশে নিয়মিত সফর করেন। সামাজিক ও শিক্ষা সংক্রান্ত স্বীকৃতির জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ১০০টিরও অধিক স্বর্ণপদকে ভূষিত হয়েছেন। নব্বইয়ের দশক থেকে তিনি নিয়মিত সফর করছেন আরব রাষ্ট্রগুলোতে। আরবের নেতৃবর্গের পাশাপাশি বড় বড় ওলামায়ে কেরামের সুহবতেও ধন্য হয়েছেন তিনি। সৌদি আরবের বিখ্যাত আলেম শায়েখ বিন বাজের সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল।

সৌদি সফরে গেলে বিন বাজের সান্নিধ্য গ্রহণ করতেন।

ড. আবু রেজা নদভী বলেন, 'শায়েখ বিন বাজের কাছে গেলেই আমি ইলমি আলোচনা শুরু করতাম। বিভিন্ন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করে নিজের জানার পরিধিকে বিস্তৃত করতাম। চট্টগ্রামের দারুল মাআরিফের জন্য আর্থিক ও অন্যান্যভাবে নানা প্রকারের সহযোগিতা করেছেন। আমাকে খুব স্নেহ করতেন। ব্যক্তিগতভাবে আমার অনেক উপকার করে দিয়েছেন। সে-সময়ের সৌদি ধর্মমন্ত্রীর কাছে আমার বিষয়ে লেখা একটি চিঠিতে খুব প্রশংসা করেছেন তিনি। চিঠিটা আজও আছে আমার সংরক্ষণে।'

আরব বিশ্বে বাংলাদেশকে কীভাবে উপস্থাপন করেন জানতে চাইলে আলেম এ সাংসদ বলেন, 'জামায়াত-বিএনপি সরকার যখন ক্ষমতায় ছিল, আরব বিশ্বের সঙ্গে জামায়াতের সম্পর্ক থাকার সুবাদে তারা সেখানে আওয়ামী লীগ ও বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে নানা রকমের অমূলক কুৎসা রটিয়েছে। আওয়ামী লীগ ও বঙ্গবন্ধুকে ইসলামের বিপক্ষ-শক্তি হিসেবে উপস্থাপন করেছে। তাই আরবে একটা ভুল ধারণার প্রচলন ঘটেছিল বাংলাদেশ সম্পর্কে। আমার আরব সফরগুলোতে সে ভুল ধারণাগুলো ভাঙানোর চেষ্টা করি। আওয়ামী লীগ বাংলাদেশে ধর্মীয় শিক্ষা ও ইসলামি অঙ্গনের বিকাশে নানামাত্রিক যে কাজগুলো করেছে এবং করে যাচ্ছে, সেগুলো উল্লেখ করে বাংলাদেশে ইসলামের সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির কথা তুলে ধরি। এবং আশাতীত সাড়াও পাই।'

আরব বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্ক থাকার সুবাদে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আরব সফরে প্রায় নিয়মিতই সফরসঙ্গী হিসাবে থাকেন ড. আবু রেজা নদভী। ফলে বিদেশের এইসব সফরে প্রধানমন্ত্রীকে কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়েছে তাঁর। জিজ্ঞেস করেছিলাম সে সম্পর্কে–বিদেশ সফরে কীভাবে দেখেছেন প্রধানমন্ত্রীকে?

উত্তরে ড. নদভী বলেন, 'মাননীয় প্রধানমন্ত্রী-কে ব্যক্তিগত জীবনে নামাজি-কালামি ও ধর্মপরায়ণা হিসেবে জেনে এসেছিলাম অনেক আগ থেকেই। আরব সফরগুলোতে তাঁর সঙ্গে থেকে সেটা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছি।

'তাঁর সঙ্গে কুয়েত সফরের একটা স্মৃতি বলি। কুয়েতে প্রচুর বাঙালি প্রবাসী থাকেন। প্রধানমন্ত্রী কুয়েতের সে-সফরে গিয়ে অভিযোগ পেলেন, বাঙালি প্রবাসীরা প্রচুর মাত্রায় সেখানে অনিয়ম করেন। তিনি খুব ব্যথিত হলেন শুনে। তারপর প্রবাসী বাঙালিদের আয়োজিত একটা অনুষ্ঠানে গেলেন। বাঙালিরা প্রধানমন্ত্রীর জন্য ফুলসহ বিভিন্ন উপহার সাজিয়ে রেখেছিল সেখানে। তিনি তাঁর বক্তৃতায় খুব মনঃক্ষুণ্নতা প্রকাশ করেন এবং নীতি-নৈতিকতার ওপর এত চমৎকার বক্তৃতা দেন যে, আমি বিস্মিত হয়ে যাই। প্রধানমন্ত্রী সেদিন বাঙালি প্রবাসীদের কোনো উপহার গ্রহণ করেননি, বলেছিলেন, আগামী বার কুয়েত সফরে এসে যদি শোনি আপনারা নীতি-নতিকতায় উন্নতি করছেন, অনিয়ম থেকে দূরে থাকছেন তখন এসব উপহার গ্রহণ করব। এখন নয়।

'ওই সফরে কুয়েতের আমির প্রধানমন্ত্রীকে ব্যক্তিগত যেসব উপহার দিতে চেয়েছিলেন, প্রধানমন্ত্রী তা বিনয়ের সঙ্গে ফিরিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, এসব উপহার আমার লাগবে না, যদি একান্তই কিছু দিতে চান, বাংলাদেশের নদী খননের জন্য ড্রেজারের ব্যবস্থা করে দিন। ওতে আমার জনগণ উপকৃত হবে।

'প্রধানমন্ত্রীর এই যে অভিভাবকত্বসুলভ আচরণ এবং জনগণের জন্য এই যে তাঁর চিন্তা–বিদেশ সফরগুলোতে এগুলোই আমাকে আপ্লুত এবং অভিভূত করে।'

রাত তখন অনেক হয়ে গেছে। তাঁর বিশ্রামের প্রয়োজন, আমাদেরও ফিরবার তাড়া। আলাপচারিতায় ইতি টানতে হলো। তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা নেমে এলাম ন্যাম ভবনের লিফটে চড়ে। ঘড়ির কাঁটা তখন একটার ঘর পেরিয়ে গেছে। সংসদ এলাকার রাস্তায় অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকেও রিকশা পেলাম না। অগত্যা হাঁটতে শুরু করলাম ফার্মগেট মোড়ের দিকে। মোড় বেশি দূর না।



অটোমানের রাজকীয় হারেম: বিস্ময়ভরা এক অন্দরমহল

নাবিলা আফরোজ জান্নাত

অটোমান সাম্রাজ্য বা উসমানি খেলাফত–ইউরোপ জুড়ে প্রবল প্রতাপে এক সময় ছড়ি ঘুরিয়েছে মহান এই মুসলিম রাজবংশ। অটোমান সাম্রাজ্য বলতে বর্তমান তুরস্ককে বোঝায়। অটোমান সাম্রাজ্যের মতো এত বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে শাসন সেই সময়ে অন্য কোনো সাম্রাজ্যের ছিল না, যে কারণে অটোমান সুলতান প্রথম সুলাইমানকে বলা হতো পৃথিবীর বাদশাহ। অটোমান সাম্রাজ্য ছিল বিশ্বের সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে বেশিদিন টিকে থাকা সাম্রাজ্য। ইউরোপ থেকে শুরু করে এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল অটোমান সাম্রাজ্য। উসমানি খেলাফতের বীর-বাহাদুরি নিয়ে যেমন অনেক গল্প আছে, তেমনি এ সালতানাতের হেরেম নিয়েও আছে নিদারুণ রহস্য।

অটোমান সংস্কৃতির এই রহস্যময় অংশ দূর প্রাচ্য থেকে সুদূর পশ্চিম–সব জায়গার মানুষের কাছে এক গোপন আগ্রহের বিষয়। আক্ষরিকভাবে, হারেম মানে হচ্ছে মুসলিম ধনাঢ্য বাড়ির মহিলামহল। ইসলাম ধর্মের নির্দেশানুযায়ী মুসলিম নারীদের অনাত্মীয় পুরুষের সামনে আসা নিষিদ্ধ। অনেকটা সেকারণেই অটোমান ধনাঢ্য ব্যক্তিরা তাঁদের স্ত্রীবর্গ, সন্তান আর দাস-দাসীদের জন্য গড়ে তোলেন এই অন্দরমহল।

'হারেম' শব্দটিকে কখনো কখনো 'হেরেম'-ও বলা হয়। তবে মূল অর্থ একই। 'হারেম' শব্দটি তুর্কি হলেও হিব্রু 'হেরেম' এবং গ্রিক 'হারেমিও'-এর সমগোত্রীয় শব্দ এটি। আবার তুর্কি শব্দটির উৎপত্তি আরবি শব্দ থেকে। আরবি 'হারাম' শব্দ থেকেই হেরেমের উদ্ভব। আরবি 'হারাম' শব্দের আভিধানিক অর্থ নিষিদ্ধ বা অলঙ্ঘনীয় সীমারেখা। তুর্কি ভাষায় হারেম বোঝানো হয়েছে মহিলাদের বসবাসের নিরাপদ স্থান–যেখানে পরপুরুষের প্রবেশ নিষিদ্ধ। হিব্রু ভাষায় হেরেম-এর অর্থও একই। গ্রিক শব্দ হেরেমি-এর অর্থ গোত্রচ্যুতকরণ।

মূলত আরবি 'হারাম' শব্দটিকে তুর্কিরা খানিকটা সহনীয় করে হারেম-এ পরিণত করে। এরপর যোগ করে 'লিক'। ফলে তুর্কি শব্দটি দাঁড়ায় 'হারেমলিক'। বাড়ির যে অংশে মহিলারা থাকেন তুর্কিতে সেই স্থানকে 'হারেমলিক' বলা হয়। এই উপমহাদেশে হারেম নামে পরিচিত হলেও ইউরোপীয়দের কাছে হারেম হচ্ছে 'সেরালিয়ো'। এখানে ইতালিয়ান ও ফারসি ভাষার অদ্ভুত এক সম্মিলন ঘটেছে। ইতালিয়ান ভাষায় 'সেররালিয়োন' মানে হচ্ছে 'বন্য প্রাণীর খাঁচা'। 'সেররালিয়ো' এসেছে ফারসি 'সেরা' থেকে। তবে ফারসি 'সরা' ও 'সরাই' মানে হচ্ছে ভবন বা প্রাসাদ বিশেষ। মূলত এই শব্দের সঙ্গে মিলিয়েই এমন অদ্ভুত নামকরণ। অবশ্য ১৬৩৪ সালে হারেম শব্দটি ইংরেজি ভাষার অন্তর্ভুক্ত হয়।

তবে সব শব্দের অর্থ মোটামুটি একই ধরনের, যার অর্থ নিষিদ্ধ। অন্যভাবে বললে এর অর্থ হচ্ছে নিষিদ্ধ বা গোপনীয় স্থান। রাজপ্রাসাদের যে আলাদা অংশে শাসকের মা, বোন, স্ত্রী, কন্যা, নারী-কর্মচারী, উপপত্নী প্রমুখ বাস করতেন তা হারেম, হারিম বা হেরেম নামে অভিহিত হতো। বহিরাগতদের হারেমে প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। হারেমকে মহল, জেনানা, হেরেম-সারা, হেরেম-গাঁ, মহল-সারা, রানীবাস ইত্যাদি নামেও আখ্যায়িত করা হতো।

অটোমান সাম্রাজ্যের হারেম পরিচিত ছিল 'সেরাগ্লিয়ো' নামে। সেরাগ্লিয়োতে অটোমান সম্রাটের স্ত্রী ও উপপত্নীরাই বসবাস করতেন। সঙ্গে থাকতেন রাজার মনোরঞ্জনের জন্য কংকুবাইন ও দাসীরা।

অন্তঃপুরের নারীদের থাকার জায়গা হিসেবে যার শুরু, এর বিবর্তন কিন্তু ইতিহাসের সবচেয়ে বড় রহস্য। সাধারণের জন্য নিষিদ্ধ হওয়ার কারণে 'হারেম' সব সময়ই ছিল মানুষের চিরন্তন আগ্রহের কারণ। তবে হারেম মানেই কেবল রাজা-বাদশাহদের মনোরঞ্জনের জায়গা নয়, পেছনে রয়েছে অনেক গল্প, অনেক কাহিনি।

অটোমান হারেমে কঠোর নিয়ম ছিল। এই নিয়ম এতটাই কঠোর ছিল যে, খুব নিকটাত্মীয় না হলে মহিলাদের পর্যন্ত হারেমে প্রবেশ করতে দেয়া হতো না। সুলতান ব্যতীত অপরাপর সকল পুরুষের সেরাগ্লিয়োতে প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। তবে হারেমে বসবাসরত নারীদের পুত্র, স্বামী, ভাই ও পিতার ক্ষেত্রে

এই নিয়ম কিছুটা শিথিল ছিল। রাজ্যের শিশুদের ক্ষেত্রে বয়স ১৬ হওয়ার আগ পর্যন্ত হারেমে থাকার সুযোগ ছিল। এই সময়টাতে তারা হারেমে সাধারণ শিক্ষা, রাজ্য পরিচালনার কলাকৌশল, ভাষাশিক্ষা, সাংস্কৃতিক শিক্ষা, সমরবিদ্যাসহ সব ধরনের শিক্ষা গ্রহণ করত। অটোমান আমলে হারেমের উদ্দেশ্য ছিল রাজপরিবারের কন্যাশিশুদেরকে প্রচলিত সাংস্কৃতিক ধারায় এবং সঠিক শিক্ষায় বড় করা। হারেমের অভ্যন্তরে থাকা সকল নারী ও দাসীদের ক্ষেত্রেও একই রকম শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল।

ইতিহাস-বিখ্যাত তোপকাপি হারেম ছিল অটোমান রাজপ্রাসাদের বিশেষ একটি অংশ। এটি সুলতানের পরিবারের মহিলাদের একান্ত স্থান। হারেমের আরও একটি উদ্দেশ্য ছিল–কন্যাশিশুরা যেন সেখানে অবস্থানরত মহিলাদের কাছ থেকে রাজকীয় আদর্শ শিখতে পারে এবং ভবিষ্যতে যেন কোনো রাজকীয় ও বিখ্যাত ব্যক্তির স্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন দেখতে পারে। এখানে তাদের বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষাও গ্রহণ করতে হতো। কারণ ভবিষ্যতে রাজপরিবারের স্ত্রী হয়ে তাকে জনগণের সম্মুখে আসার সম্ভাবনা থাকত। অটোমান হারেমের অনেক মহিলাই বিশেষ করে সুলতানের স্ত্রী, মাতা কিংবা কন্যারা রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভূমিকা রেখেছেন। কিছু কিছু ঐতিহাসিক মনে করেন অটোমানদের আমলে এক সময় গোটা শাসনব্যবস্থাই হারেম-নির্ভর হয়ে পড়ে।

এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ পাওয়া যায় অটোমান শাসনের সবচেয়ে সফল শাসক সুলতান সুলাইমানের শাসনকাল বিশ্লেষণ করলে। ইউরোপীয়দের কাছে তাঁর পরিচয় সুলেমান দ্য ম্যাগনিফিসেন্ট হিসেবে। সর্বকালের সেরা অটোমান শাসক সুলাইমানের একজন স্ত্রী ছিলেন হুররেম সুলতান। সাধারণ একজন দাসী থেকে সুলতানের স্ত্রী হয়ে রাজ্যশাসনে বিশাল প্রভাব রেখেছিলেন হুররেম। বিশ্ব ইতিহাসে এই ঘটনা এখনো বিস্ময়ের জন্ম দেয়। শুধু সুলাইমানের আমলেই নয়, এর আগে-পরেও হারেমের নারীদের প্রভাব চোখে পড়বে ইতিহাসের অন্দরে হাঁটলেই। অটোমান সম্রাট দ্বিতীয় সেলিমের স্ত্রী ও সম্রাট চতুর্থ মুরাদের মাতা কুসেম সুলতানও দারুণ প্রভাবশালী ছিলেন।

অটোমান হারেমেরই আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল হারেমে বসবাসকারী একটি বিশেষ গোত্রীয় মানুষ বা খোজা। এরা প্রাচীন ও মধ্যযুগে রাজকীয় হারেমে বা জেনানামহলে প্রহরী, কর্মী ও কর্মকর্তা হিসেবে নিযুক্ত থাকত। হারেমের পাহারার কাজে আফ্রিকা থেকে নিয়ে আসা হতো খোজা দাসদের। সেই সঙ্গে অন্যান্য দাসীরা সুলতান ও রাজপরিবারের সদস্যদের সেবা ও সুলতানের সেবায় নিয়োজিত ছিল। এই খোজা ও দাসীদের সকলেরই বসবাস ছিল হারেমের ভেতরে।

এদেরকে কিশোর এবং শিশু অবস্থায় নিয়ে আসা হতো। তারপর তাদের ক্যাস্ট্রেশন অর্থাৎ প্রজনন-অঙ্গ কেটে ফেলা হতো, যাতে তাদের সন্তান জন্ম দানের ক্ষমতা না থাকে। ফলে হারেমের নারীদের পাহারাদার ও কর্মচারী হিসেবে এদের চেয়ে উপযুক্ত আর কেউ ছিল না।

সব ক্ষেত্রেই খোজারা সাধারণত চাকর বা দাস শ্রেণির ছিল। তাদের দিয়ে ক্ষমতাসীন লোকদের উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যই তাদেরকে খোজা বানানো হতো। সেই প্রাচীন আমল থেকেই রাজকীয় কোর্ট কিংবা প্রাসাদের অন্দরমহল–যেখানে কেবল রাজা ব্যতীত অন্যান্য পুরুষের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল সেখানে রাজা ও অন্যান্য নারীদের পাহারা নিশ্চিত করার জন্য খোজা প্রহরীর প্রয়োজনীয়তা ছিল অপরিহার্য। শুধু হারেম পাহারা নয়, আসলে খোজাদের অনেক কাজই করতে হতো। যেমন প্রভুর বিছানা তৈরি, গোসল করানো, চুল কাটা, পালকি টানা, মলমূত্রের পাত্রবহন করা ইত্যাদি কাজ তারা আঞ্জাম দিত। কোনো কোনো বিশ্বস্ত খোজাকে দিয়ে চরের কাজও করানো হতো।

খোজারা কেবল শাসকের নিকটই অনুগত ছিল। সরাসরি শাসক ব্যতীত রাজ্যের অন্য কোনো উঁচু পদের কর্মচারী বা প্রশাসক হলেও খোজাদের নিকট খুব বেশি পাত্তা পেতো না।

খোজারা রাজা বা প্রভু-অন্তঃপ্রাণ থাকত। এমনকি কোনো কোনো খোজা কোনো কোনো রাজার জন্য জীবন দিতেও প্রস্তুত ছিল। তারা তাদের বিশ্বস্ততার গুণটিকে খুবই সম্মান এবং মর্যাদার মনে করত। যেহেতু এদের জৈবিক চাহিদা বলতে কিছুই ছিল না, সেহেতু এদের ব্যক্তিগত বংশপ্রতিষ্ঠা বা সংসারস্থাপনের ব্যাপারে কোনো ইচ্ছা ছিল না। তাদের শারীরিক অক্ষমতার কারণেই সমাজে তাদের অবস্থান ছিল খুব দুর্বল। এই দুর্বলতার কারণে তাদেরকে প্রচুর নির্যাতন সহ্য করতে হতো। কখনো কখনো খুব তুচ্ছ কারণে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেয়া হতো, এমনকি হত্যাও করা হতো। তারা এতই সহনশীল ছিল যে, এরপরও খোজাদের মধ্যে তেমন কোনো প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হতো না। তবে অনেকেই স্বেচ্ছায় এই পদ চাইতেন। কারণ একটাই, উচ্চপদ লাভ।

হেরেমের প্রতিষ্ঠান, খোজা এবং নারীদের দেখভালের জন্য নিয়োজিত থাকতেন একজন প্রধান খোজা। তুর্কি ভাষায় যাদের বলা হতো কিজলার আগাসি বা প্রধান কালো খোজা। তিনি মূলত হেরেমের নারীদের প্রধান বা মাস্টার হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন। তুর্কি হারেমে খোজাদের দারুণ ভূমিকা ছিল। তাদের হারেমে দু'ধরনের খোজা ছিল-কৃষ্ণাঙ্গ খোজা, শ্বেতাঙ্গ খোজা। কৃষ্ণাঙ্গরা মূলত আফ্রিকার। তারা হেরেমের নারী, অন্যান্য কর্মকর্তা ও নিচুশ্রেণির বাঁদিদের দেখাশোনা করত। তোপকাপি প্রাসাদের শ্বেতাঙ্গ খোজারা ছিল মূলত ইউরোপীয় বলকান এলাকার। যা এখনকার বুলগেরিয়া-রুমানিয়া। শ্বেতাঙ্গ খোজারা তোপকাপি প্রাসাদের বিদ্যালয়ের দেখভাল করত। তবে ১৫৮২ খ্রিষ্টাব্দের পর এরা আর হারেমের ভেতরে ঢোকার অনুমতি পায়নি।

তবে তুরস্কের প্রাসাদের খোজারা তুর্কি ছিলেন না। এদেরকে বাইরে থেকে আনা হতো। কারণ ইসলামে কাউকে জোরপূর্বক কিংবা স্বেচ্ছায় খোজা বানানো নিষিদ্ধ। তাই অটোমান সম্রাটরা যখন কোনো খ্রিষ্টান দেশ জয় করতেন, তখন তারা সেখান থেকে সাদা ও কালো চামড়ার খোজা নিয়ে আসতেন। প্রধানত মিশর, আবিসিনিয়া, সুদান প্রভৃতি স্থান থেকে খোজাদের সংগ্রহ করা হতো। অটোমান সাম্রাজ্যের দরবার ও হারেমে ৬০০ থেকে ৮০০ খোজা ছিল বলে জানা যায়। অটোমান দরবারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল প্রধান কৃষ্ণকায় খোজার। এদের বলা হতো–চিফ ব্ল্যাক ইউনাখ। চিফব্ল্যাক ইউনাখ ছিল হারেমের গুপ্তচর নেটওয়ার্কের কেন্দ্রে। আর যে কোনো ধরনের প্রাসাদ ষড়যন্ত্রে তার প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছিল। হারেমের সকল নারী, খোজা এবং দরবারের অনেকেই তাকে খুব সমীহ করে চলতেন। হারেমের নারীদের নিরাপত্তার বিধান করা তার প্রধান কাজ হলেও সে রাজকীয় অনুষ্ঠানের তদারকি কিংবা হত্যার জন্য কোনো মেয়েকে হত্যাকারীর নিকট নিয়ে যাওয়া ইত্যাদি কাজ করত।

মধ্যযুগে মুসলিম এবং তুর্কি রাষ্ট্রগুলোতে উপঢৌকন হিসেবে খোজা প্রেরণ করা শুরু করেন অটোমান সুলতান প্রথম মুহাম্মদ। এর পরে মুহাম্মদের উত্তরসূরিরা এই প্রথা অক্ষুণ্ন রাখেন।

১৭ ও ১৮ শতকে কোনো কোনো খোজা খুব শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। প্রভাবশালী এসব খোজা সুলতানের সাথে সরাসরি সাক্ষাতও করতে পারত। এমনকি কোনো কোনো খোজা-প্রধানদের সুলতানের পরিবারে প্রবেশের অধিকারও ছিল। প্রধান কালো খোজা অনেকসময় উজিরের অনুপস্থিতিতে দ্বিতীয় প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করত। উজির যদি কোনো কাজে বাইরে অবস্থান করতেন কিংবা সেনাবাহিনী নিয়ে দরবার থেকে দূরে অবস্থান করতেন তখন প্রধান খোজাই তাঁর হয়ে দায়িত্ব পালন করত। প্রধান খোজা সুলতানের ঘুমাবার কক্ষেও প্রবেশ করতে পারত। এমনকি প্লাস আল্ট্রা অর্থাৎ হেরেমের নারীদের শোবার কক্ষেও তার অবাধ প্রবেশাধিকার ছিল। প্রধান কালো খোজা কখনো কখনো সেনাবাহিনীর বিশেষ ইউনিট হালবারডিয়াস-এর নেতৃত্ব দিত। অটোমান সাম্রাজ্যের জেনারেল বা গভর্নর মর্যাদার পদ 'পাশা'-তেও অনেক খোজার নিয়োগ দৃশ্যমান ছিল।

অটোমান সাম্রাজ্যে প্রধান শ্বেতাঙ্গ খোজাকে

বলা হতো কাপি আগাসি। হেরেমে এবং দরবারের ভেতরে ৩০০ থেকে ৯০০ সাদা খোজা কাজ করত। তারা সাধারণত প্রশাসন সংক্রান্ত বিষয়াদি, সংবাদ আদান-প্রদান, মামলা মোকদ্দমার কাজ, সুলতানের কাছে প্রেরিত রাষ্ট্রীয় নথিপত্র দেখভালের কাজ করত। খোজাদের প্রশিক্ষণের জন্য বিশেষ স্কুলের প্রধান হিসেবেও প্রধান সাদা খোজা কাজ করত। এ ছাড়া প্রাসাদের ফটকের প্রধান, চিকিৎসা-প্রধান এবং রাজকীয় অনুষ্ঠানের সমন্বয় সাধনেও সাদা খোজাদের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। সকল সাধারণ সাদা খোজা প্রধান খোজার অধস্তন হিসেবে কাজ করত। প্রধান সাদা খোজা অনেকসময় সুলতানের সাথে একান্তে আলাপ-আলোচনারও ক্ষমতা রাখত। ধীরে ধীরে সাদা খোজাদের প্রভাব বাড়তে থাকলে তা নজরে আসে সুলতান তৃতীয় মুরাদের। তিনি সাদা খোজাদের ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে হ্রাস করে কালো খোজাদের নিকট বিলিয়ে দেন।

অটোমান সাম্রাজ্যের শেষদিকে এসে কালো ও সাদা উভয় খোজাই প্রবল ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে। রাজনৈতিকভাবে এসব খোজারা প্রভাব কায়েম করতে গিয়ে প্রায়শই সাম্রাজ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করত। শেষদিকে এদের প্রভাব ও ক্ষমতা উত্তরোত্তর বাড়তে থাকলে তার লাগাম টেনে ধরেন মুরাদ-পরবর্তী সুলতানগণ। আর এরই সাথে অটোমান সালতানাতে খোজাদের অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটতে থাকে।



হারেমে আরও যা পদ ছিল

ভ্যালিদে সুলতান (সুলতানের মা) : ইনি হচ্ছেন হারেমের শাসনকর্ত্রী এবং সুলতানের পরেই তাঁর অবস্থান। অনেক সময় যেহেতু সুলতানেরা অল্পবয়সে সিংহাসনে আরোহণ করতেন সেহেতু গোটা সাম্রাজ্যেরই ক্ষমতা থাকত ভ্যালিদে সুলতানের হাতে।

হাসেকি সুলতান : সুলতানের প্রিয়তমা।

খাদিম এফেন্দি : সুলতানের প্রথম সন্তানের মা।

ইকবালার : প্রথম সন্তানের জন্ম হওয়ার পর সুলতানের অন্য সন্তানদের জন্ম দিতেন এসব মহিলা। তাঁদেরকে সুলতানের স্ত্রী হিসেবেই গণ্য করা হতো।

হারেমের নতুন সদস্যার জীবনের লক্ষ্য থাকতো একটাই, আর তা হলো সুলতানের আকাঙ্ক্ষার বিষয়ে পরিণত হওয়া। সুতরাং সে লক্ষ্য অর্জনের জন্য তাঁরা আকর্ষণীয় পোষাক পরতেন, অলংকার পরতেন, এবং যদি কোনোভাবে সুলতানের দৃষ্টি আকর্ষণের সুযোগ পেতেন তবে তাঁদের ব্যক্তিত্বের আকর্ষণীয় ক্ষমতাটা যেকোনোভাবে প্রদর্শনের চেষ্টা করতেন। কারণ, হয়তো এখান থেকেই তিনি পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষমতাধরের পত্নী হয়ে যেতে পারেন।

বসফরাস প্রণালির কাছে অবস্থিত রাজপ্রাসাদ তোপকাপি সাম্প্রতিক সময়ে জাদুঘর হিসেবে

ব্যবহৃত হলেও একশ’ বছরেরও কম সময় আগে তা ছিল এক সুলতানের আবাস, তাঁর হারেম, তাঁর সভাসদদের পদচারণায় মুখর। অধিকাংশ মানুষের প্রাসাদের এই অংশে প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। আগে তো সুলতানের প্রাসাদ থেকেও এটি পৃথক ছিল, কিন্তু এই নিয়ম বদলে যায় সুলতানের উপর এক নারীর প্রভাবে। যাঁর নাম ছিল রোক্সানা, আর সুলতান তাঁকে ডাকতেন হুররেম বলে। অ্যান্ড্রু কোল্ট তাঁর বইতে লিখেছেন–‘যখন আগুন পুরনো সেরাগলিওর (পুরনো প্রাসাদ) ব্যাপক ক্ষতি করল, রোক্সেলেন এই সুযোগটা কাজে লাগালেন নতুন প্রাসাদে বসবাসের অনুমতি চেয়ে, যা তোপকাপি নামে পরিচিত ছিল এবং যা সুলতানের দরবার ও রাজনৈতিক জীবনের কেন্দ্র ছিল, যেখানে তাঁরও (রোক্সেলেন) একটি আবাস ছিল। তিনি তাঁর সঙ্গে অনেকগুলো কালো ও সাদা খোজা, ক্রীতদাস ও গৃহস্থালি এনেছিলেন; একবার সেগুলো স্থাপনের পর তিনি রয়ে গেলেন। হারেম ও রাজ্য আর পৃথক রইল না; এর পরিণতি ছিল শোচনীয়।’
হারেম ইতিহাসের নানা সাম্রাজ্যে প্রচলিত হলেও এখন যখন হারেম শব্দটা উচ্চারণ করা হয় তখন ইতিহাস মনে করিয়ে দেয় তোপকাপি প্রাসাদের অভ্যন্তরে অটোমান সুলতানদের হারেমের কথা, যার আরেকটা নাম ছিল আনন্দবাড়ি (দারুস সাদ)।
হারেমে ক্ষমতার কেন্দ্র ছিল ভ্যালিদে সুলতানের আবাসে। সুলতানের মা অথবা স্ত্রীর হাতেই হারেমের কর্তৃত্ব থাকত। হুররেম সুলতান ছিলেন প্রথম ভ্যালিদে, কিন্তু সেলিম দ্বিতীয়ের স্ত্রী নুরবানু সুলতান, আহমেদ প্রথমের স্ত্রী কোসেম সুলতানের নামও এখানে উল্লেখযোগ্য। এই নারীরা যেমন ছিলেন ক্ষমতাধর, তেমনি তাঁদের ছিল দক্ষতা, যার কারণে তাঁরা হারেম কর্তৃক আয় কয়েকগুণ বাড়াতে পেরেছিলেন।
তোপকাপি হারেমে এখনও ১৬ শতকে শাসন করা নারীদের কাজের নমুনা পাওয়া যায়, তবে এখানে সংরক্ষিত বেশিরভাগ কাজই ১৯ ও ২০ শতকের।
সুলতানের হারেমে নারীর সংখ্যা কখনও ৩০০-এর কম ছিল না এবং ঊনবিংশ শতকে এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৯০০-তে। তোপকাপি প্রাসাদে দাস-দাসী ও কর্মচারীসহ প্রায় হাজার খানেক লোক বাস করত।
১৩৬৫ সালে সুলতান প্রথম মুরাদ সিদ্ধান্ত নিলেন যে, তাঁর সার্বভৌমত্বের প্রতিফলন ঘটে এমন একটা প্রাসাদ তৈরি করা দরকার। ফলে অটোমান সাম্রাজ্যের তৎকালীন রাজধানী এডির্নে (আর্ডিআনপোল) জন্ম হলো একটি প্রাসাদের। প্রাসাদটির নাম ছিল ‘চিয়ান্নুমা কাসরি’। তবে প্রাসাদটির সত্যিকার ঐশ্বর্য বিকশিত হয় এবং হারেমের জন্ম হয়, যখন ১৪৫৩ সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহ ইস্তাম্বুল জয় করেন।
অটোমান প্রাসাদগুলো ঘিরে থাকত ভীষণ যত্নে দেখভাল করা বিশাল বিশাল সব বাগান। সেসব বাগানে থাকত নানা আকারের জলাশয় ও ঝর্ণা। আর স্বর্গোদ্যান মাথায় রেখে তৈরি করা সেসব বাগানে ঘুরে বেড়াত বহু বিচিত্র সুন্দরী পরীরা। তাদের মধ্যে যেমন ছিল আয়ারল্যান্ড থেকে আসা লাল চুলের শ্বেতাঙ্গ সুন্দরী, তেমনি ছিল ভারতের বাদামি চোখের অপরূপারা।
সুলতান ও তাঁর উজিরেরা খুব আহ্লাদিত হতেন যদি তাদেরকে কেউ উপঢৌকন হিসেবে সুন্দরী রমণী দাসী পাঠাতেন। ফলে সুলতানকে যাঁরা শ্রদ্ধা জানাতে চাইতেন, তাঁদের অনেকে পৃথিবীর দূর প্রান্ত থেকে তাঁদের পরিবারের সুন্দরী কন্যাদের উপহার হিসেবে নিয়ে আসতেন এসব প্রাসাদে। এই ভাণ্ডারের রত্ন বৃদ্ধিতে দাসব্যবসায়ীরাও একটা বিরাট ভূমিকা রাখতেন।

অটোমানের ক্ষমতাধর নারীরা

হুররাম সুলতান, যিনি রোক্সোলানা হিসেবেও পরিচিত, তিনি ছিলেন উসমানীয় সম্রাট প্রথম সুলাইমানের প্রিয়তম কানিজ (উপপত্নী) ও পরবর্তীকালে তাঁর বৈধ স্ত্রী এবং সম্রাটের সন্তান শাহজাদা মুহাম্মদ, মিরহিমাহ সুলতান, শাহজাদা আবদুল্লাহ, সুলতান দ্বিতীয় সেলিম, শাহজাদা বায়েজিদ এবং শাহজাদা জাহাঙ্গীরের মা। তিনি ছিলেন উসমানীয় ইতিহাসের সবচেয়ে প্রভাবশালী ও ক্ষমতাধর নারীদের মধ্যে একজন এবং নারীদের সালতানাত নামে

পরিচিত শাসনকালের একজন অন্যতম ব্যক্তিত্ব। হুররেম সুলতানের হাত ধরেই উসমানীয় সাম্রাজ্যে সর্বপ্রথম নারীদের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। তাঁর স্বামী প্রথম সুলায়মানের শাসনকালে তিনি সুলতানের প্রধান স্ত্রী বা 'হাসেকি সুলতান' ছিলেন। তিনি তাঁর স্বামীর মাধ্যমে ক্ষমতা অর্জন করে উসমানীয় সাম্রাজ্যের রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন এবং সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছিলেন।

অধিকাংশ সুলতানেরা যেখানে হেরেমকন্যাদের রক্ষিতা বানিয়ে রাখতেন, সেখানে সুলতান সুলায়মান উসমানীয় সালতানাতের ২০০ বছরের প্রথা ভেঙে এক হেরেম-কন্যাকে ভালবেসে বিয়ে করেছিলেন, তিনিই এই হুররাম সুলতান। সুলায়মান তাঁকে এতটাই ভালোবাসতেন যে, তাঁর অধিকাংশ কাব্য ছিল হুররামকে উৎসর্গ করা।

আধুনিক তথ্যলিপিসমূহে হুররাম সুলতানের প্রাথমিক জীবন সম্পর্কে তেমন কোনো নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না। এ সকল তথ্যভাণ্ডার হুররাম সুলতানের রুসাইন ও ইউক্রেনীয় জাতিত্ব অথবা তাঁর জন্মস্থান হিসেবে পোল্যান্ড রাজ্যকে উল্লেখ করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

১৬ শ' শতাব্দীর মাঝামাঝি, ক্রিমীয় খানাতে লিথুনিয়ার রাজ ডিউক জমিদারির প্রতিনিধি মিখালন লিটভাইন তাঁর ১৫৪৮ থেকে ১৫৫১ সালের রচনা 'অ্যাবাউট কাস্টমস অফ তাতারস, লিথুনিয়ান্স অ্যান্ড মস্কো'-তে বাণিজ্য বিষয়ক বর্ণনার মাঝে উল্লেখ করেন, 'বর্তমান তুর্কি সম্রাটের সবচেয়ে প্রিয়তম স্ত্রী–তাঁর ভবিষ্যৎ-পুত্রের মাতা, যে পুত্র তাঁর পরবর্তীকালে শাসন করবেন, তিনি আমাদের ভূমি থেকে অপহৃত হয়েছিলেন।'

১৬ শ' শতাব্দীর পরবর্তী এবং ১৭ শ' শতাব্দীর শুরুর দিকে তুর্কি বিষয়ে গবেষক পোলিশ কবি সামুয়েল তারদভস্কির দেয়া তথ্য অনুসারে, হুররেম সম্ভবত কোনো ইউক্রেনীয় অর্থোডক্স ধর্মযাজক পিতার ঘরে জন্ম নিয়েছিলেন। তিনি পোল্যান্ড রাজ্যের রুথেনীয় ভয়ভডেশিপের রুহাটাইন নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন (বর্তমান পশ্চিম ইউক্রেন)।

১৫২০-এর দশকে ক্রিমিয়ার তাতাররা ওই এলাকার একটি তড়িৎ অভিযানের সময় তাঁকে বন্দী করে একজন দাসী হিসেবে নিয়ে আসে (সম্ভবত প্রথমে ক্রিমিয়ার নগরী কাফফায়, যা দাসব্যবসার একটি প্রধান কেন্দ্র, এরপর কনস্টান্টিনোপলে) এবং তাঁকে প্রথম সুলাইমানের হারেমের জন্য বাছাই করে। অল্প সময়ের মধ্যেই রোক্সেলেনা তাঁর মনিব সুলাইমানের সুনজরে চলে আসেন এবং সমসাময়িক প্রতিদ্বন্দ্বীদের ঈর্ষার পাত্রীতে পরিণত হন। শীঘ্রই তিনি সুলাইমানের প্রিয়তম সঙ্গিনী বা 'হাসেকি সুলতান' হয়ে ওঠেন। সুলতানের ওপর হুররামের প্রভাবের কথা দ্রুত আশেপাশের সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। তিনিই সুলতানের সর্বাধিক সংখ্যক সন্তানের জন্ম দেন, এবং আশ্চর্যজনকভাবে চিরায়ত প্রথা ভঙ্গ করে তিনি দাসত্ব হতেও মুক্তি লাভ করেন। দুইশত বছরের অটোমান ঐতিহ্যকে ভঙ্গ করে, একজন প্রাক্তন উপপত্নী এভাবে অবশেষে সুলতানের বৈধ পত্নী হয়ে ওঠা প্রাসাদ ও নগরীর প্রত্যক্ষদর্শীদের জন্য অত্যন্ত হতবাককারী একটি বিষয় ছিল। এই ঘটনা সুলাইমানকে ওরহান গাজির (১৩২৬-১৩৬২) পর প্রথম কানিজ বিবাহকারী সুলতানের পরিচয় এনে দেয় এবং প্রাসাদে হুররামের অবস্থানকে আরও শক্তিশালী করে, যার ফলশ্রুতিতে তাঁর অন্যতম পুত্র দ্বিতীয় সেলিম ১৫৬৬ সালে সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকার লাভ করেন।

সুলাইমান হুররেম সুলতানকে অটোমান সম্রাজ্যের সম্রাজ্ঞী বানিয়েছিলেন আর তাঁর সমান মর্যাদা দিয়েছিলেন। অটোমানের ইতিহাসে অন্য কোনো সুলতানের স্ত্রীকে এই মর্যাদা দেয়া হয়নি। এমনকি সুলতান সুলাইমান দরবার-সভায় হুররেমকে তাঁর পাশে বসাতেন এবং সভায় যেকোনো বিষয়ে হুররামের পরামর্শ নিতেন। এমনকি কোনো অফিসিয়াল কাগজে সুলতানের পাশাপাশি সম্রাজ্ঞী হুররেম সুলতানেরও সাক্ষর আর সিল থাকত।

সুলাইমান বাকি জীবনে রাজসভাতেও হুররেমকে তাঁর সাথে থাকতে দেন, যার ফলে আরেকটি প্রথা ভঙ্গ হয়, আর তা হলো, যখন

সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারীগণ উপযুক্ত বয়সে পৌঁছুবে, তাঁদেরকে তাঁদের রাজ উপপত্নীসহ নিকটস্থ প্রদেশে শাসনের জন্য পাঠিয়ে দেয়া হবে। উক্ত উপপত্নীদের সন্তান ক্ষমতায় বসার আগ পর্যন্ত তারা ফিরে আসতে পারবে না। সুলতানের রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম বিষয়ক উপদেষ্টা হিসেবেও হুররেম ভূমিকা পালন করেছেন, এবং প্রতীয়মান হয় যে, তিনি বৈদেশিক নীতি ও আন্তর্জাতিক রাজনীতিতেও প্রভাব রেখেছিলেন। রাজা সিগিসমন্ডাস দ্বিতীয় অগাস্টাসকে প্রেরিত তাঁর দুটি চিঠি এখনো টিকে আছে, এবং স্বভাবতই তাঁর জীবদ্দশায় পোলিশ-অটোমান মৈত্রীচুক্তির মাধ্যমে পোল্যান্ড রাজ্যের সঙ্গে অটোমান সাম্রাজ্যের শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক বিরাজমান ছিল।
রাজনৈতিক উদ্যোগসমূহের পাশাপাশি, হুররেম মক্কা থেকে জেরুজালেম পর্যন্ত বহু রাষ্ট্রীয় স্থাপনার প্রধান কাজের সাথে জড়িত ছিলেন। সম্ভবত সেখানে খলিফা হারুনুর রশিদের স্ত্রী জুবাইদার কাজের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি এ সকল সমাজসেবামূলক কার্যক্রম হাতে নেন। তাঁর প্রথম স্থাপনাসমূহের মধ্যে ছিল একটি মসজিদ, দুটি মাদরাসা, একটি জলের ফোয়ারা এবং কনস্টান্টিনোপলে নারী-কৃতদাসী বাজারের সন্নিকটে একটি মহিলা হাসপাতাল। তাঁর নির্দেশে নিকটবর্তী হাজিয়া সোফিয়ার উপাসক সম্প্রদায়ের সেবায় 'হাসেকি হুররেম সুলতান হামামি' নামে একটি স্নানাগার নির্মিত হয়। ১৫৫২ সালে তিনি জেরুালেমে দুস্থ ও অসহায়দের খাদ্যাভাব মেটাতে 'হাসেকি সুলতান ইমারেত' নামে একটি রাষ্ট্রীয় লঙ্গরখানা প্রতিষ্ঠা করেন।
হুররেম গরিব-দুঃখীদের অনেক সাহায্য-সহযোগিতা করতেন। এমনকি তিনি গরিব-দুঃখীদের অবস্থা জানার জন্য ছদ্মবেশে বের হতেন মাঝে মাঝে হারেমের বাইরেও। তাঁর নিজের করা অথবা তাঁর নিজস্ব তত্ত্বাবধানের অধীনে করা কিছু সূচিকর্ম এখনো বিদ্যমান আছে। উদাহরণস্বরূপ ১৫৪৭ সালে ইরানের শাহ দ্বিতীয় তাহমাস্পকে দেয়া এবং ১৫৪৯ সালে রাজা দ্বিতীয় সিগিসমন্ড অগাস্টাসকে দেয়া সূচিকর্মের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।



এস্থার হান্ডালি বহু আনুষ্ঠানিকতায় তাঁর সহকারী ও মধ্যস্থতাকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

সুলতান সুলাইমান তাঁর 'মুহিব্বি' নামক ছদ্মনাম ব্যবহার করে হুররেম সুলতানের জন্য নিম্নোক্ত কবিতাটি লিখেছিলেন–

'আমার নির্জনতার সিংহাসন, আমার সম্পত্তি, আমার প্রেম, আমার পূর্ণিমা
আমার শ্রেষ্ঠ বন্ধু, আমার সখী, আমার চিরন্তন অস্তিত্ব, আমার সুলতান, আমার একমাত্র ভালোবাসা।
সুন্দরীদের মাঝে সবচেয়ে সুন্দরীতমা...
আমার বসন্তকাল, আমার সদা প্রফুল্লমুখী ভালোবাসা, আমার দিবস, আমার প্রাণের প্রিয়া, আমার হাস্যোজ্জ্বল পত্র...
আমার গুল্ম, আমার মিষ্টি, আমার গোলাপ–এ জগতে একমাত্র সেই আমাকে কোনো দুঃখ দেয়নি...
আমার ইস্তাম্বুল, আমার কারামান, আমার আনাতোলিয়ার পৃথিবী
আমার বাদাকশান, আমার বাগদাদ আর খোরাসান
আমার সুকেশী রমণী, আমার হেলানো ভুরুর প্রণয়, আমার দুষ্টুমিভরা চোখের প্রেম...
আমি সর্বদা তোমার গুণ গাইবো
আমি, এই ভগ্ন হৃদয়ের প্রেমিক, অশ্রুভরা চোখের মুহিব্বি (প্রেমিক), আমিই তো সুখী।'

হুররেম সুলতান ১৫ ই এপ্রিল ১৫৫৮ সালে মৃত্যুবরণ করেন এবং ইজনিক মার্বেলপাথর দ্বারা সুসজ্জিত গম্বুজবিশিষ্ট স্বর্গের উদ্যানের আদলে তৈরি করা সমাধিতে (তুরবা) তাঁকে সমাহিত করা হয়। এটি সম্ভবত তাঁর সদা হাস্যোজ্জ্বল প্রকৃতির স্মৃতির প্রতি সম্মান রেখে করা হয়েছিল। সুলাইমানের সমাধির পাশেই তাঁর সমাধি অবস্থিত, যা সুলাইমানিয়া মসজিদের প্রাঙ্গণে অবস্থিত আরও গাম্ভীর্যপূর্ণ গম্বুজবিশিষ্ট একটি পৃথক স্থাপত্য।

হুররেম সুলতানের মৃত্যুর পর সুলতান সুলাইমান নিজ কাঁধে তাঁর লাশের খাটিয়া বহন করেন। অটোমান সম্রাজ্যের ইতিহাসে কোনোদিন কোনো সুলতান তাঁদের স্ত্রীদের লাশের খাটিয়া বহন করেননি। একমাত্র সুলতান সুলাইমান তাঁর প্রানপ্রিয় স্ত্রী হুররেমের মৃত্যুর পর তাঁর সন্তানদের সাথে হুররামের লাশের খাটিয়া বহন করেছিলেন। হুররেমের মৃত্যুর পর সুলতান সুলাইমান বেশ কয়েকদিন দুঃখে কাতর ছিলেন।

ক্ষমতাধর হারেম কন্যাদের মধ্যে আরও ছিলেন কোসেম, তুরহান, মিহরিমাহ, নুরবানু, সাফিয়া, হান্দান, হালিমে। তবে সবচেয়ে শক্তিশালী ছিলেন কোসেম সুলতান। তিনি সুলতানের থেকেও বেশি ক্ষমতাধর হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর ইশারায় সুলতান পরিবর্তন হতো।

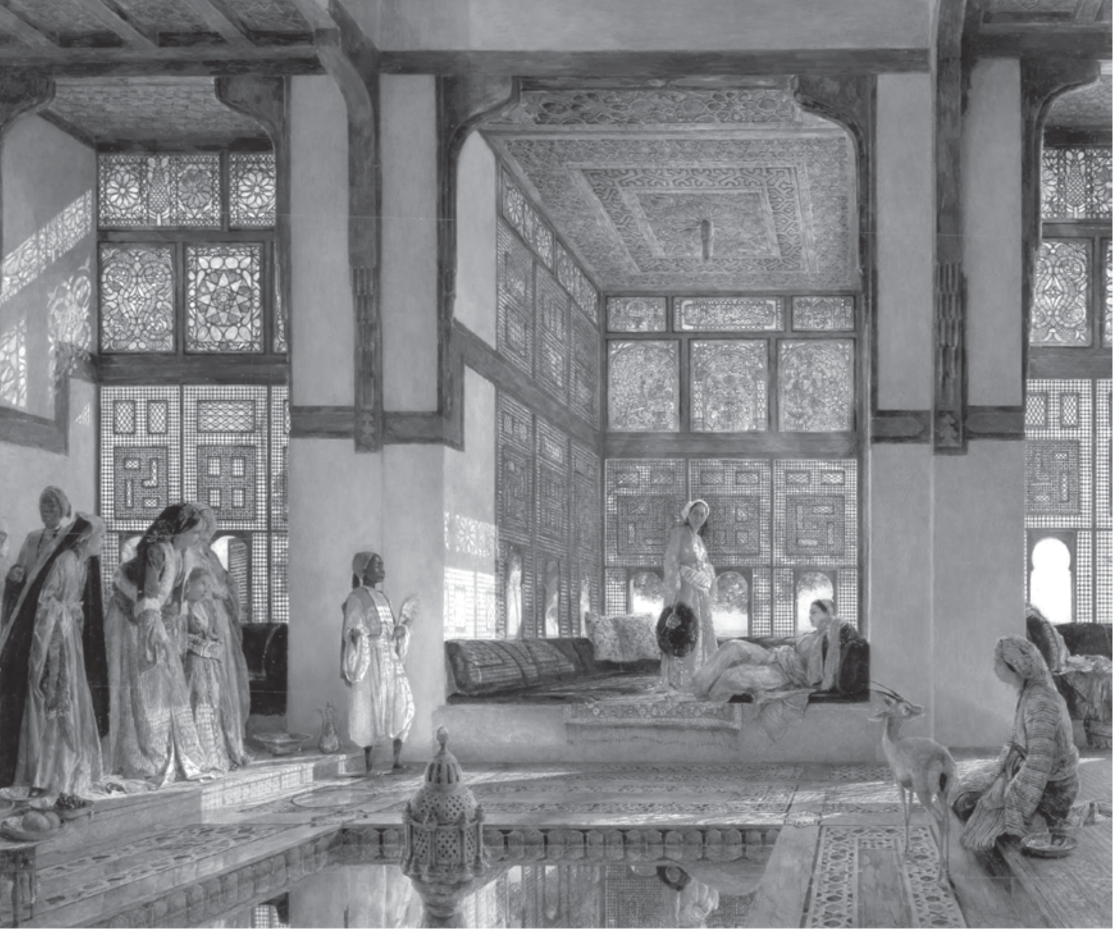
তিনি সুলতান প্রথম আহমেদের বিবাহিত স্ত্রী এবং সুলতান চতুর্থ মুরাদ ও সুলতান ইব্রাহিমের মাতা।

কোসেম সুলতান জীবিতকালে অটোমান সম্রাজ্যে ছয়জন সুলতান সিংহাসনে বসেন। কিন্তু তাঁর ক্ষমতা ছিল এসব সুলতানের আয়ত্তের বাইরে।

আনুমানিক ১৫৮৯ সালে তিনোস দ্বীপে কোসেম সুলতান জন্মগ্রহণ করেন। কিছু ঐতিহাসিক মনে করেন যে, কোসেম ছিলেন গ্রিক বংশোদ্ভূত তিনোস দ্বীপের (পূর্বনাম আনাসতাসিয়া) একজন ধর্মযাজকের মেয়ে। কিন্তু এই সূত্রটিকে বিশ্বাসযোগ্য মনে করেন না অনেক ঐতিহাসিক।

কাভিদ বাইসুন নামক এক ঐতিহাসিক বলেন যে, মাত্র ১৫ বছর বয়সে তাঁকে বসনিয়ার কর্তৃপক্ষ দাসী হিসেবে ইস্তাম্বুলে এনে সুলতান প্রথম আহমেদের হারেমে পাঠান। পরবর্তী সময়ে মুসলিম হওয়ার পর তাঁর নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় মাহপেয়কার–যার অর্থ চাঁদের মতো মুখ যার এবং তারপরে সুলতান প্রথম আহমেদ তাঁর নাম রাখেন কোসেম।

অটোমান সুলতানদের হারেম পরিচালনার দায়িত্ব থাকত সুলতানাদের কাছে এবং হারেম পরিচালনার দায়িত্ব বংশানুক্রমে পরিবর্তিত হতো। কোসেম সুলতান আহমেদের খাস বাঁদি হওয়ার পর থেকে তাঁর জীবন রাতারাতি বদলে যেতে থাকে। কোসেম খাস বাঁদি থাকার সময় হারেম-এর কর্তৃত্ব ছিল সুলতানের দাদি সাফিয়ে সুলতানের হাতে। কিন্তু সাফিয়ে সুলতান ১৬০৪ সালে তাঁর কর্তৃত্ব হারান এবং তিনি তাঁর বাকিজীবন অন্য একটি প্রাসাদে



কাটান। একই বছর সুলতান আহমেদের মা এবং ভ্যালিদে হান্দান সুলতানের মৃত্যুর পর কোসেম সুলতানের নিকট সুযোগ আসে হারেমের কর্তৃত্ব গ্রহণ করার।
সুলতান আহমেদ তাঁকে বিয়ে করলে তিনি হাসেকি সুলতান হিসেবে আখ্যা পান।
কোসেম সুলতান অনেকগুলো সন্তান জন্ম দেন এবং হারেমের কর্তৃত্বও চলে আসে তাঁর হাতে।
সুলতান প্রথম আহমেদ মাত্র ২৭ বছর বয়সে মারা যাওয়ার কারণে কোসেম সুলতান তোপকাপি প্রাসাদে তাঁর অবস্থান হারিয়ে ফেলেন এবং তাঁকে তোপকাপি প্রাসাদ থেকে ইস্কি সারাহ প্রাসাদে থাকতে দেওয়া হয়।
সুলতান প্রথম আহমেদ মারা যাওয়ার পর সিংহাসনে প্রথমবারের মতো সুলতানের ছেলে না বসে তাঁর ভাই প্রথম মুস্তফা বসেন, যিনি ছিলেন একজন পাগল প্রকৃতির মানুষ। খুব দ্রুত মুস্তফাকে সরিয়ে সুলতান বানানো হয় কোসেম সুলতানের সৎ ছেলে দ্বিতীয় উসমানকে।
যেহেতু কোসেম সুলতানের ছেলে সিংহাসনে বসতে পারেননি, তাই অটোমান রাজ বংশের রীতি অনুযায়ী তাঁকে অন্য কোনো জৌলুসহীন প্রাসাদে থাকতে হবে। কিন্তু কোসেম সুলতানকে খুব বেশি দিন পুরাতন বা ইস্কি প্রাসাদে থাকতে হয়নি। তাঁর ছেলে চতুর্থ মুরাদ সিংহাসনে আরোহণ করার পর তিনি পুনরায় 'হাসেকি সুলতান' পদবী ফিরে পান এবং মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তাঁকে এক হাজার মুদ্রা করে মাসিক খরচ দেয়া হতো। কোসেম সুলতানের মৃত্যুর পর হাসেকি সুলতান পদবীটি বিলুপ্ত হয়ে যায়।
কোসেম সুলতানের ভ্যালিদে সুলতান হিসেবে ক্ষমতাপ্রাপ্তি ও প্রয়োগ মোট তিনটি ধাপে ছিল।

প্রথম ধাপ : সুলতান প্রথম আহমেদের মৃত্যুর পর কোসেম সুলতান যে অবস্থান হারান সেই অবস্থানে আবার ফিরে আসেন যখন তাঁর ছেলে সুলতান চতুর্থ মুরাদ সিংহাসনে বসেন। সুলতান মুরাদ ১৬২৩ সালে সিংহাসনে বসার পর কোসেম সুলতান অটোমান সাম্রাজ্যের শীর্ষ অবস্থানে চলে আসেন। সুলতান চতুর্থ মুরাদ অপ্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার কারণে কোসেম সুলতান শুধু ভ্যালিদে সুলতানে সীমাবদ্ধ ছিলেন না, তিনি নিজেকে একজন রাজপ্রতিনিধি হিসেবে নিযুক্ত করেন। সুলতান চতুর্থ মুরাদের–১৬২৩ সাল হতে ১৬৩২ সাল পর্যন্ত–শাসনকালে কোসেম সুলতান আড়াল থেকে সাম্রাজ্য চালাতেন। তিনি পর্দার আড়ালে থেকে রাজ সভায় অংশগ্রহণ করতেন। এমনকি ১৬৩২ সালের পর যখন তিনি রাজপ্রতিনিধি ছিলেন না, তখনও। কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যেই সাম্রাজ্যে অরাজকতা দেখা দেয়। পারস্যের সাফাবিদেরা ইরাক দখল করে নেয় এবং উত্তর আনাতোলিয়ায় বিদ্রোহ শুরু হয়ে যায়। এসব দেখে জেনেসারিরা ক্ষিপ্ত হয়ে উজিরে আজমকে মেরে ফেলেন। এটা দেখে সুলতান মুরাদ ভয় পেয়ে যান এবং তাঁকেও তাঁর সৎ ভাই দ্বিতীয় উসমানের মতো মেরে ফেলা হবে ভেবে ভয় পেয়ে সুলতান পদ থেকে সরে যান। সেই সময় থেকে কোসেম সুলতানের আসল শাসন শুরু হয়।

দ্বিতীয় ধাপ : কোসেম সুলতানের আরও একজন ছেলে ছিলেন, যাঁর নাম ইবরাহিম। সুলতান মুরাদ তাঁকে মেরে ফেলার আদেশ দেন। কিন্তু সে-সময় তাঁকে তাঁর মা কোসেম সুলতান বাঁচান। সুলতান চতুর্থ মুরাদের পর ইবরাহিম ছিলেন তাঁদের মৃতপ্রায় রাজবংশের শাহজাদা। মুরাদের মৃত্যুর পরও ইবরাহিম ভাবতেন মুরাদ এখনও বেঁচে আছে এবং এটা হয়ত তাঁর ফাঁদ। কিন্তু কোসেম সুলতান এবং উজিরে আজম মুরাদের লাশ দেখানোর পর ইবরাহিম সিংহাসনে বসেন। কিন্তু ইব্রাহিম রাজ্য পরিচালনার জন্য মানসিকভাবে অযোগ্য ছিলেন। এর ফলে আবার ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসেন কোসেম এবং তিনিই সাম্রাজ্য পরিচালনা করতেন আড়াল থেকে।

১৬৪৭ সালে কোসেম সুলতান এবং উজিরে আজম সালিহ পাশা ইবরাহিমকে ক্ষমতাচ্যুত করতে গিয়ে ব্যর্থ হন, কিন্তু তিনি তাঁর আরেক সন্তানকে সিংহাসনে বসান।

এই ঘটনা প্রকাশ হওয়ার পর সালিহ পাশাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় এবং কোসেম সুলতানকে প্রাসাদ থেকে বের করে দেওয়া হয়। তার পরের বছর জেনেসারি এবং ওলামাগণ বিদ্রোহ শুরু করলে ইবরাহিমকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয় এবং তোপকাপি প্রাসাদে বন্দী করা হয়। ইবরাহিমের মৃত্যুদণ্ডের বিরুদ্ধে নতুন উজিরে আজম আদেশ স্থগিত করতে বলেন। কিন্তু রাষ্ট্রের বিজ্ঞজনেরা মতামত দেন যে 'যদি দুইজন খলিফা থাকে তবে একজনকে মেরে ফেলো'। কোসেম সুলতান ইবরাহিমের মৃত্যুদণ্ডের পক্ষেই সায় দেন। ১৯৪৮ সালে ইবরাহিমকে মেরে ফেলা হয়।

তৃতীয় ধাপ : কোসেম সুলতান তাঁর সাত বছরের নাতি চতুর্থ মুহাম্মদকে সিংহাসনে বসিয়ে নিজে সরাসরি সাম্রাজ্য পরিচালনা করা শুরু করেন। তিনি নিজেকে পুনরায় রাজপ্রতিনিধি হিসেবে ঘোষণা করে সাম্রাজ্যের সকল দায়িত্ব পালন করেন শিশুনাতিকে সামনে রেখে। চতুর্থ মুহাম্মদ সিংহাসনে বসার কারণে ভ্যালিদে সুলতান হবার কথা তুরহান সুলতানের। কিন্তু কোসেম সুলতান ভ্যালিদে সুলতানের পদ ছেড়ে দেননি।

তুরহান সুলতান কোসেম সুলতানের অন্যায়ের প্রতিশোধ নিতে চাইলেন। তুরহান সুলতানের বয়স যখন মাত্র ১২ বছর তখন ক্রিমিয়ার খান তাঁকে উপহার হিসেবে তোপকাপি প্রাসাদে পাঠান। কোসেম সুলতান নিজে ইবরাহিমের জন্য তুরহান সুলতানকে খাসদাসী হিসেবে পছন্দ করেন। কিন্তু তুরহান সুলতান বিনা রক্তপাতে নিজের পদ দখল করতে চাইলেন। তুরহান সুলতানের পক্ষে ছিলেন উজিরে আজম এবং কোসেম সুলতানের পক্ষে ছিল জেনেসারিরা। কোসেম সুলতান ভ্যালিদে সুলতান পদকে গুরুত্বপূর্ণ বলে ধরে নিয়ে জেনেসারিদেরকে তুরহান সুলতানের বিরুদ্ধে যাওয়ার জন্য প্রভাব খাটান।

ক্ষমতার যুদ্ধে কোসেম সুলতান তাঁর নাতি

মুহাম্মদকে সরিয়ে আরেক জনকে সিংহাসনে বসানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু তার পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। তুরহানের আদেশে হোক বা অন্য কারও আদেশে, কোসেম সুলতান তাঁর ব্যর্থ চেষ্টার তিন বছর পর খুন হন। মনে করা হয় তুরহান সুলতানই এই আদেশ দিয়েছিলেন। ১৬৫১ সালে অটোমান সাম্রাজ্যের এই ক্ষমতাধর নারীর মৃত্যুর পর তাঁকে তাঁর স্বামী প্রথম আহমেদের কবরের পাশে দাফন করা হয়।

তুরহান ছিলেন কোসেমের পুত্রবধূ এবং প্রধান শত্রু। দুজনেরই ছিল ক্ষমতাশীল পুত্র এবং দুজনেরই ইচ্ছা ছিল শাসকের স্থানটি নেয়া। তবে তুরহান তাঁর কাজকর্মে প্রমাণ করেছেন যে, তিনি ছিলেন নিতান্তই ধূর্ত ও নির্দয়। তিনি কোসেম ও তাঁর বাহিনীকে কোসেমের ঘরেই হত্যার পরিকল্পনা করেন। শেষমেশ তাঁর পরিকল্পনা সফল হয় ও রাজপ্রতিনিধিত্বের সুযোগটা তিনি পান এবং রাজত্ব করেন অটোমান সাম্রাজ্যে।

কোসেম সুলতান সাম্রাজ্যের সাধারণ মানুষ এবং শাসক শ্রেণী উভয়ের জন্য দান করেছেন। তিনি প্রতি জেলখানায় গিয়ে কিছু মানুষকে মুক্ত করে দিতেন। গরিব পরিবারে মেয়েদের দক্ষ করে তাদের বিয়ে দিতেন। তিনি ১৬৪০ সালে উস্কুদারে একটি মসজিদ ও স্কুল তৈরি করেন। ভ্যালিদে মাদরাসা তৈরি করেন, মানুষের জন্য পানির ঝর্ণা তৈরি করেন। ইস্তাম্বুলের বাইরেও ছিল তাঁর অনুদানে তৈরিকৃত পানির ঝর্ণা। তিনি মিশরের বন্যাদুর্গতদের সাহায্য করেছেন, এবং মক্কার গরিব মানুষদের বিপদে আপদে এগিয়ে আসতেন।

অটোমান সাম্রাজ্যের পতনের সাথে সাথে বিলুপ্ত হয় আভিজাত্যের এইসব হারেমও। বছরের পর বছর চলে যায়, অথচ হারেমের বিস্ময় জাগানো শেষ হয় না, হারেম নিয়ে জনমনের আগ্রহ কমে না। সেই নারীরা সুলতানের মতো করে আজ পর্যন্ত সাধারণের মনে প্রভাব ফেলেই যাচ্ছেন, হয়তো তা চলবে আরও অনেক দিন।

অটোমান সাম্রাজ্যের পতনের সাথে সাথে বিলুপ্ত হয় আভিজাত্যের এইসব হারেমও। বছরের পর বছর চলে যায়, অথচ হারেমের বিস্ময় জাগানো শেষ হয় না, হারেম নিয়ে জনমনের আগ্রহ কমে না। সেই নারীরা সুলতানের মতো করে আজ পর্যন্ত সাধারণের মনে প্রভাব ফেলেই যাচ্ছেন, হয়তো তা চলবে আরও অনেক দিন।

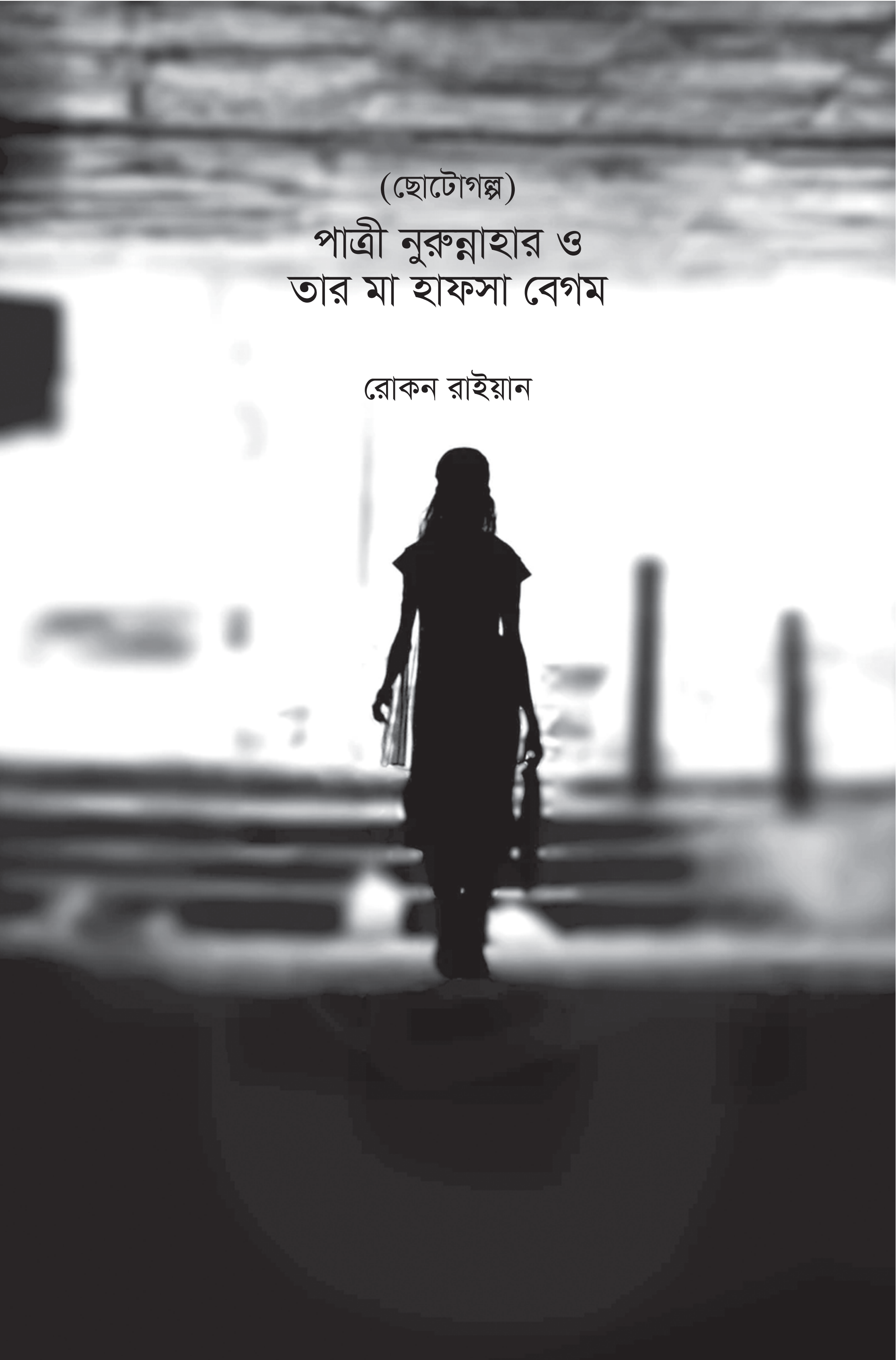
ইন্টারনেট থেকে সংগৃহীত ও পরিমার্জিত

লেখক : ছাত্রী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

(ছোটোগল্প)

পাত্রী নুরুন্নাহার ও তার মা হাফসা বেগম

রোকন রাইয়ান



পাত্রী দেখার আসরে শামিমের মনে একটা বিষয় খচ করে উঠল। এই খচ করে ওঠা পূর্বপরিচিতির কোনো বিষয় না। পাত্রী নুরুন্নাহারকে সে দেখেনি আগে। চেনেও না। কিন্তু নুরুন্নাহারকে তার খুব আপন মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে খুব কাছের কেউ। বিয়ের পর শামিমের খুব কাছেরই হয়ে যাবে নুরুন্নাহার। কিন্তু বিয়ের আগেই কেন আত্মিক একটা টান অনুভব করছে শামিম, তার জানা নেই। বিষয়ের কোনো কূলকিনারা করাও তার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না।

'আচ্ছা ভাইয়ের এসএসসি সাল কত?'

নুরুন্নাহারের পাশে বসা মেয়েটা প্রশ্ন করে। কে হবে ও? জানা নেই। তবে মেয়েটার প্রশ্ন শুনে কিছুটা ঘাবড়ে যায় শামিম। ভাবছিল বয়স কিছুটা লুকোবে। তার প্রকৃত বয়স শুনলে নির্ঘাত হারাতে হবে নুরুন্নাহারকেও। এর আগে অন্তত আটটা বিয়ে ক্যান্সেল হয়েছে এই দোষে। কিন্তু প্রশ্নকারী তো বিপদে ফেলে দিল শামিমকে। পরীক্ষার সন ভুল বললে ঠিকই বের হয়ে যাবে। অবশ্য এই মেয়েকে নিয়ে এতো চিন্তা নেই। এতিম মেয়ে। মা-বাবা নেই। নানা-নানির কাছে বড় হয়েছে। যেভাবে যত দ্রুত পাত্রস্থ করা যায় সেটাই বর্তে যায়।

শামিম দোনামোনা করে বলেই ফেলল–'আটাশি, ঊনিশশো আটাশি।'

পাশে বসা নুরুন্নাহারের নানি কিছুটা আঁতকে উঠে বললেন, 'আটাশিতে এসএসসি হলে তো বয়স অনেক। ছেলের কি দ্বিতীয় বিয়ে?'

পাশে বসা শামিমের বাবা আবসার আলী হালকা কাশি দিয়ে কথাটা লুকোনের ব্যর্থ চেষ্টা করলেন। তারপর বললেন, 'না না দ্বিতীয় বিয়ে হবে কেন? প্রথম বিয়েই। আসলে এখনকার সময়ে ছেলেরা একটু দেরিতেই বিয়ে করে। পয়সাপাতি হলে, একটা বাড়ি-গাড়ি ঠিক করে তারপর। তাই আরকি ওর একটু দেরি হলো। তাছাড়া বয়স বেশি হলেও চেহারা কিন্তু তা বলে না, দেখুন না ভালো করে।'

ছেলেকে উপযুক্ত পাত্র বানাতে সহায়-সম্পত্তির ঝাঁপিও খোলেন বাবা। 'এই দেখুন, এখনকার রাস্তাঘাটে গাড়ির যে অবস্থা, নিজের একটা প্রাডো ছাড়া কি চলে, বলেন। আর একটা বাড়ি না হলে ঢাকা শহরে থাকা যায়? ছেলে মাশাল্লাহ নিজের টাকায় প্রতিষ্ঠিত। বনশ্রীতে বারো শতাংশ প্লটের ওপর ডুপ্লেক্স বাড়ি। এসব করতেই তো ওর একটু দেরি হলো।'

আবসার আলীর কথায় কিছুটা আশ্বস্ত হয় পাত্রী পক্ষ। মেয়ে সুখে থাকুক সেটা সব অভিভাবকের প্রধান চাওয়া। তাছাড়া একটা কম বয়েসী ছেলে চাকরির পাঁচ-সাত বছর নিজের ভবিষ্যত নিয়ে কনফিউজড থাকে। এই ভালো তো এই খেই হারানো দশা। সেখানে শামিমের একটু বয়েস হলেও মন্দ কী।

'আচ্ছা, ওয়াশরুমটা কোন দিকে?' জানতে চায় শামিম। ঠিক টয়লেটে পায়নি, বয়সের আলোচনা উঠতেই তার নিজেকে একটু লজ্জা লজ্জা লাগে। কিছুক্ষণের জন্য লুকোতে পারলে মনে হয় ভালো লাগতো।

ডান হাতে বাম দিকে ইশারা করে ওয়াশরুম দেখিয়ে দেয় নুরুন্নাহারের পাশে বসা মেয়েটা। একটু টিপ্পনিও কাটে হয়তো। শামিমের সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই। সে দ্রুত পায়ে নিজেকে আবদ্ধ করে ফেলে জীবনের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এ সংকীর্ণ ঘরে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ভাবতে থাকে। কীভাবে কীভাবে ওর বয়সটা পার হয়ে গেল, টেরই পায়নি। হিসাব করে দেখলে যে কেউ আঁতকাবে। শামিম কী করেছে এতদিন, কেন বিয়ে করেনি? আসলে বিয়ের প্রয়োজনটা হয়তো হয়নি। প্রয়োজনীয় সব ও পেয়েছে

টাকার জোরে। একটা মেয়ের আবর্তে জীবনকে ঘিরে ফেলার অর্থ হয়তো তার কাছে অনর্থ ছিল। যাই হোক, অনেক পাপ তো জীবনে হয়ে গেছে, এবার না-হয় সেসব ভুলে আপন কুটিরে ডুব দেয়া যাক। সে-ক্ষেত্রে নুরুন্নাহারকে পেলেই হয়। অনেক মেয়েই তো দেখা হলো। কেউ তো তাকে দেখে এগোচ্ছে না। একটা সময় মনে হয়েছে টাকা-পয়স-াতেই মানুষ টলবে। কিন্তু তা সব ক্ষেত্রে অবাস্তব।

ওয়াশরুম থেকে ফিরে সোফায় বসতেই বন্ধু মারুফ চিমটি কাটল। কানে কানে বলল, 'কীরে শালা, ওয়াশরুমেই বিশ মিনিট পার করে দিলি। একটা কলেরা রোগীও তো বিশ মিনিট ওয়াশরুমে থাকে না।'

শামিমের মনে হয়েছিল গেল আর এলো। এর মধ্যে যে বিশ মিনিট কেটে গেছে টেরই পায়নি। বিষয়টা লজ্জার। শামিম দ্বিতীয়বার লজ্জায় আক্রান্ত হলো। তবে বেশিক্ষণ সে লজ্জা ধরে রাখা গেল না। টেবিলে চা-নাস্তা দেয়া হয়েছে। কেউ একজন তাড়া দিল, চা নেন বলে। শামিম চা নিলো। প্রথম যে চুমুক দিল তাতে সুরুক করে একটা আওয়াজ হলো এবং শামিমের মনে হলো সে তৃতীয়বারের মতো লজ্জাজনক কাজ করল।

জীবনের কত কত কাজ করা শামিম কখনো লজ্জিত হয়নি। কিন্তু মেয়ে দেখতে এসে এভাবে লজ্জাজনক কাণ্ড ঘটতে থাকবে সেটা তার কাছেই বেমানান ঠেকছে। মনে মনে সিদ্ধান্ত নিল আর কখনো ফ্যামিলিবেষ্টিত পাত্রী দেখবে না। একা এক ঘরে বা রেস্টুরেন্টে কাজটা সেরে নেবে।

নাস্তাপর্ব শেষে আবসার আলী বললেন, 'মেয়ে মাশাল্লাহ আমাদের পছন্দ হয়েছে। আপনাদের কোনো আপত্তি না থাকলে কাজ এগিয়ে নেয়া যায়।'

আবসার আলীর কথা শুনে মেয়েপক্ষের লোকেরা কিছুক্ষণ ইশারা-ইঙ্গিতে একে অপরে কথা বলল। তারপর নুরুন্নাহারের নানি বললেন, 'আমাদেরও তেমন কোনো আপত্তি নেই।'

শামিমের জন্য একটা সুযোগ করে দিল মারুফ। 'দুই পক্ষের যেহেতু আপত্তি নেই আমাদের মনে হয় কাজ আগানো দরকার। তবে মেয়ে ও ছেলেকে একটু আলাদা সময় দেয়া দরকার কথা বলার জন্য। তারা না-হয় একান্তে কিছু সময় কাটাক। নিজেদের কোনো বক্তব্য থাকলে আলোচনা করুক।'

মারুফের প্রস্তাব মন্দ না। দুইজনকে একটা রুমে ঢুকিয়ে দেয়া হলো। যেখানে একটা বড় বারান্দা আছে। পাশে একটা সচল রাস্তা আর কিছু গাছ-গাছালি চোখে পড়ছে। শামিম আর নুরুন্নাহার বারান্দাতেই দাঁড়ায়।

লজ্জায় আড়ষ্ট নুরুন্নাহারকে ডেকে শামিম রাস্তায় চলতে থাকা রিকশার দিকে ইশারা করে বলে, 'বলো তো, ওই রিকশায় কয়টা পা?'

'তিনটা।'

'হয়নি, চারটা পা। রিকশাওয়ালার দুইটা বাকি দুইটা প্যাসেঞ্জারের।'

'আপনি তো রিকশার কয় পা সেটা জিজ্ঞেস করেছেন।'

'আমি তো বলেছি রিকশায় কয় পা। হা হা হা।' কথাটা বলেই শামিম হাসে। 'আচ্ছা বাদ দাও, কেমন আছো বলো?' জিজ্ঞেস করে শামিম।

'ভালো আছি। আপনি?'

'এই তো চলে যাচ্ছে।'

কিছুক্ষণ থেমে শামিমই আবার বলে, 'তোমাকে আমার পছন্দ হয়েছে। কিন্তু তোমার ব্যাপারটাও গুরুত্বপূর্ণ। আমার যদিও বয়সটা একটু বেশি, কিন্তু আমার ভেতর এখনো তারুণ্য বসবাস করে। আমার সব সময় মনে হয় আমি হয়তো রসিকতার বয়সটা পার করে যাইনি। তোমার জন্য আমি সবদিক থেকে ফিট। এখন তুমি বলো, আমাকে তোমার কেমন লাগছে। দশে কত দেয়া যায়?'

কথা শুনে নুরুন্নাহার রাস্তার দিকে তাকায়। কিছুক্ষণ আগেই ডুমুর গাছ থেকে একটা শুকনো পাতা রাস্তায় পড়েছে। সেটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে নুরুন্নাহার ভাবে, তার জীবন ওই পাতাটার মতো। বাবাকে দেখার সৌভাগ্য তার জীবনে হয়নি। কে তার বাবা সেটাও জানে না। মা ছোটোবেলায়ই মারা গেছে বলে জানে। সে মানুষ হয়েছে নানা-নানির কাছে। তার চাওয়া-পাওয়ার খুব বেশি কিছু নেই। একটা খড়কুটো হলেই

হলো, যাতে সে বাকি জীবনটা পার করে দিতে পারে।
'কী ব্যাপার, কিছু বলছ না যে?' উদাসী নুরুন্নাহারের মুখে প্রশ্ন ছোড়ে শামিন। বলে, 'আমি খুব স্পষ্টভাষী। সরাসরি সবকিছু বলতে পছন্দ করি। এই দেখো আমি। আমার জীবনে কিন্তু অনেক অন্যায় আছে। আমি অর্থ উপার্জনে বেপরোয়া ছিলাম। তবে এখন ঠিক হয়ে গেছি। বিয়ের পর তো পুরোপুরি অন্যরকম হয়ে যাবো। তোমাকে নিয়ে একটা স্বপ্নের দোতলা বানাবো। তুমি তোমার কথা ফ্রি মনে বলতে পারো। কোনো রাখঢাক আমার পছন্দ না।'
নুরুন্নাহার কিছুটা ইতস্তত করে। একটা ভাবী সংসারমনযোগী পুরুষকে সবকিছু খুলে বলাই উচিত।
'কী ব্যাপার, কিছু বলো।' শামিম তাড়া দেয়।
'আসলে আমার পছন্দ বলে তেমন কিছু নেই। আমার জীবনটা সুতোকাটা ঘুড়ির মতো। একটা ঠিকানা হলেই সেরে যায়। কোনো উচ্চাকাঙ্ক্ষাও নেই।'
'একটা ছুটন্ত সংসারের দুইটা প্রাণ লাগে। দুইটা প্রাণ মানে দুইটা চাকা। বাইসাইকেল যেমন। দুইটা চাকা সচল থাকলেই সাইকেল চলে, সংসার গতি পায়। তুমি হবে আমার একটা চাকা। সেজন্য তোমার চপলতা সংসারে জরুরি। আমি মেরামত করে করে সে-চাকা সচল করতে পারবো না যদি না তোমার ভেতর সজীবতা থাকে।'
'আপনি খুব গুছিয়ে কথা বলেন। স্পষ্টবাদীও। সেজন্য আমার সবকিছু আপনাকে খুলে বলতে ইচ্ছে করছে। যাতে ভবিষ্যতে এটা নিয়ে কোনো আফসোস তৈরি না হয়।' বলে নুরুন্নাহার।
'হ্যাঁ, আমি তো তাই বলছি। আমরা একটা নির্মিমেষ জীবন গড়তে চাই। সেখানে আলো আঁধারি যেন প্রবেশ করতে না পারে।'
'কিন্তু আমার একটা অতীত যদি আপনার কাছে মনে হয় খুব বাজে, যেটা সহজে মেনে নেয়ার মতো না হয়। তাহলে? তাহলে তো আপনার সংসার, স্বপ্ন দেখার অর্থটা ভেস্তে যাবে।'
'আমি জীবনের চরম বাস্তবতায় বড় হয়েছি। তুমি হয়তো ধীরে ধীরে জানবে। আমারও খুব বাজে একটা সময় গেছে। কলেজের আড্ডাবাজ ছেলেদের সঙ্গ পেয়ে আমি বখেই গিয়েছিলাম। তারপর...' থামে শামিম। মনে করে এর বেশি বলা তার উচিত নয়। একটা ঘৃণ্য অতীত তারও আছে। সেই হাফসার কথা তার মনে পড়ছে। যার সঙ্গে দীর্ঘ সম্পর্ক ছিল। ডেটও হয়েছে। নব্বইয়ের মাঝামাঝি সময় তখন। আজ থেকে ২০ বছরের বেশি সময়। হাফসা সন্তানসম্ভবাও হয়েছিল। যদিও পরে তার সঙ্গে সম্পর্ক রাখেনি বলে শামিম তার আপডেটও রাখেনি।
'বখে যাওয়ার পর কী, বলুন।'
'ওই তো যা হয় আর কি, উড়ালপঙ্খী জীবন।' বলে উড়িয়ে দেয় নিজের গোপন জীবন। 'তুমি বলো, তোমার কথা।' একটু নড়েচড়ে দাঁড়ায় শামিম।
বারান্দার গ্রিলে হাত রেখে নুরুন্নাহার বলে, 'সব কিছু কি বলা ঠিক? বিপদ তো ডেকে আনতে পারে।'
শামিম ফিক করে হাসে। ভাবসাবে বোঝায় ওর কোনো সম্পর্ক

থাকলে বা একটু-আধটু ডেট-ফেট হলেও কোনো আপত্তির কিছু নাই। ওসব তো নিজের জীবনেও কত হয়েছে। তুমি নির্ভয়ে বলে যাও। আমাদের সুন্দর আগামীর জন্যই তো বলবে।

‘আমি যতদূর শুনেছি, আমার বাবা বলে কেউ নেই। মা আমাকে জন্ম দিয়েছিলেন একটা হাসপাতালে। কিছুদিন নিজের বাড়িতে থেকেছেন, কিন্তু এমন একটা বিষয় নিয়ে তার বাবা-মার সাথে প্রায়ই ঝগড়া হতো। খুব কটূ কথা শুনতে হতো তাকে। এটা হয়তো সহ্য করতে পারেননি। একদিন আমাকে ফেলে তিনি চলে গেছেন। আর ফেরেননি। কোথাও ফেলে দেয়া সম্ভব হয়নি বলে বাড়িতে ঘর ঝাড়ু দেয়ার যন্ত্রের মতো তারা আমাকে পুষেছে।’

শামিমের মনে হলো মাত্র ভূতের স্বপ্ন দেখে ঘুম ভাঙল। এখন কী বলা উচিত এমন ধারণা জ্ঞানও তার নেই। মাথায় কিছুই আসছে না। এতটা ভয়ংকর কিছু শুনতে হবে সে জন্য হয়তো তার কান প্রস্তুত ছিল না।

‘কী ব্যাপার, শকড হয়ে গেলেন? বলছিলাম না, শুনলে ভিন্ন কিছু ভাববেন। আমি নিজে প্রতারিত এক জীবন বয়ে বেড়াচ্ছি। উচ্ছন্নে যাওয়া কাকের মতো আমি ঠিকানাহীন। কাউকে এ প্রতারণার ভাগিদার করতে চাই না। তাই আপনাকে বিষয়টা বললাম। আমার রূপ-রঙ দেখে অনেকেই পাগল হয়। কিন্তু ভেতরের গল্পটা কেউ মানতে চায় না, জানেন? অথচ এই যে আমাকে বিয়ে করতে আসা অনেক ছেলেই কিন্তু এসব করে বেড়াচ্ছে। তাদের কারণেই আমাদের জন্ম হচ্ছে। সেখানে আমার কী দোষ ছিল বলুন তো? বলতে বলতে কেঁদে ফেলে নুরুন্নাহার। হাফসার কথা মনে পড়ে যায় শামিমের। নুরুন্নাহারের ছুড়ে দেয়া গালি তার শরীরেও বিদ্ধ হয়। তার শরীরও সে-দোষের ক্রিয়া বহন করছে। নুরুন্নাহারকে সে সান্ত্বনা দেয়।

‘আমি আরও শুনতে চাই। তোমার ব্যাপারে আর কী জানো, বলো সব।’

‘আমার তো বাকি জীবনটাই কষ্টের। আমার নানারা আগে থাকত উত্তরা। আমার জন্মও হয়েছিল এখানকার একটা মেডিক্যালে। জন্মের পর অনেক অকথ্য শুনতে হয়েছে ওদের। একটা সময় বাসাটা ছেড়ে দিতে হয়েছে। ধানমণ্ডিতে এসেছেন। তবে তারা আমাকে ফেলে দেননি। পড়িয়েছেন। বড় করেছেন।’

‘তোমার মায়ের কোনো স্মৃতি?’

‘মায়ের কোনো স্মৃতি আমার নেই। সম্ভবত আড়াই-তিন বছরের মাথায় তিনি আমাকে ছেড়ে যান। শুধু তার নামটা মনে আছে। হাফসা।’

নামটা শুনেই শামিমের মনে হলো তার গায়ে কেউ শক্ত পাথর ছুড়লো। কোন হাফসা? তিতুমীর কলেজের ইংলিশ ডিপার্টমেন্টের? যার সঙ্গে তার দীর্ঘ সম্পর্ক ছিল? রুমডেটেও গড়িয়েছিল, যার ফলে সে সন্তানসম্ভবা হয়েছিল। নাহ এ হাফসাকে নুরুন্নাহারের মায়ের সঙ্গে মেলাতে চায় না শামিম। তাহলে ভয়ংকর এক খেলার সম্মুখীন হয়ে যাবে সে।

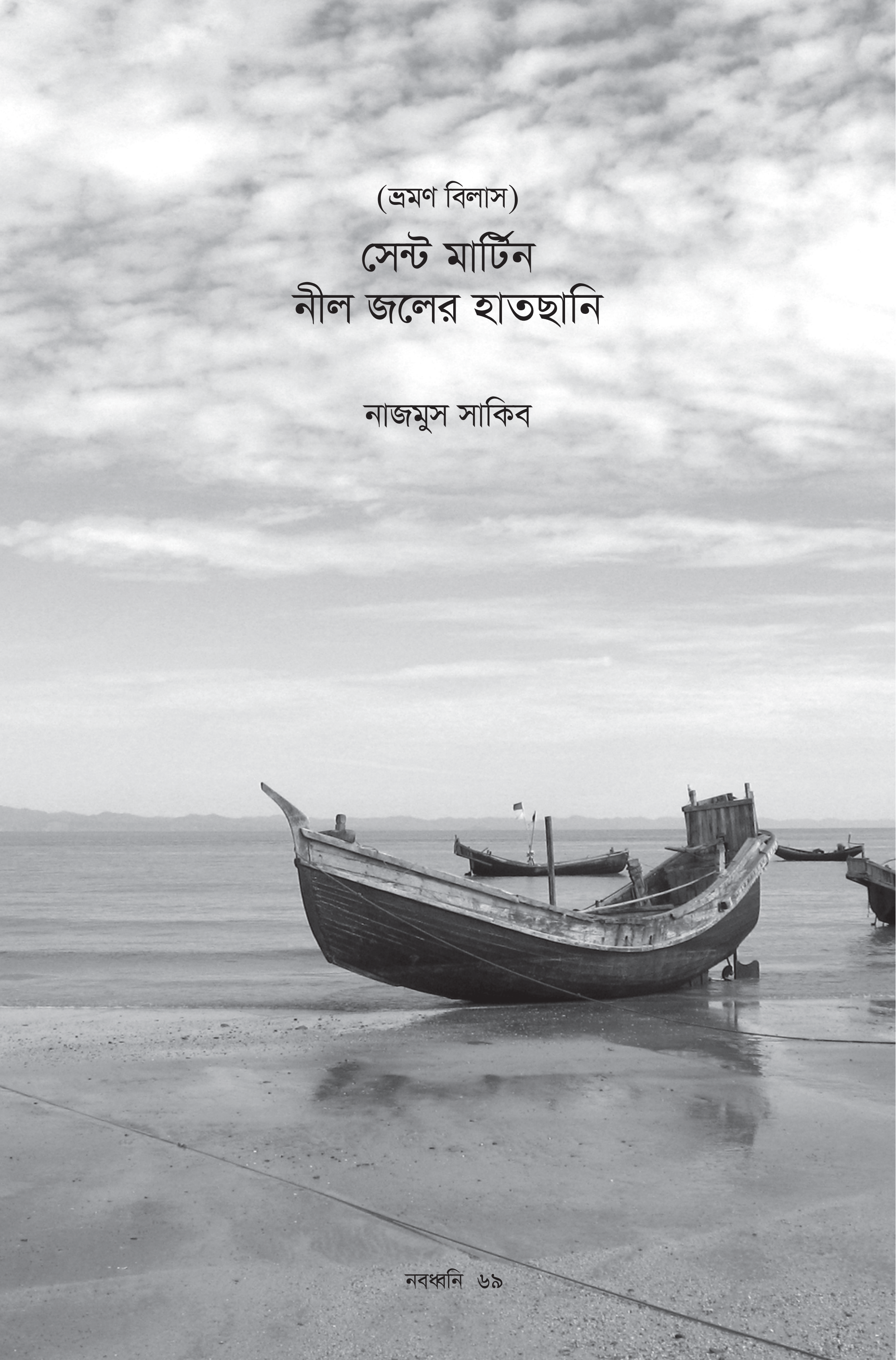
প্রথম দিনের মতো দেখালাপ শেষ হয়। শামিম বাসায় ফিরলেও তার মন পড়ে থাকে সির্ক্সটি নাইন ধানমণ্ডির থ্রি ফ্লোরের ঝুল বারান্দায়। যেখানে হাফসা-কেন্দ্রিক জটিল ধাঁধার এক জট সে রেখে এসেছে। আসার পর এক সপ্তাহ পার হয়ে গেলেও শামিম বা তার পরিবার থেকে তাদের কিছুই জানানো হয়নি। শামিম নুরুন্নাহারের নম্বরও এনেছে। সেও রেখেছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত কথা বলেনি কেউ। দেখতে দেখতে দ্বিতীয় সপ্তাও পার হলো। শামিম ভাবছে নুরুন্নাহারকে কিছু জানানোর আগে হাফসা-কেন্দ্রিক জটিলতা আগে মেটাতে হবে। নিশ্চিত হতে হবে এই হাফসা ওর এক্স জিএফ নয়।

হাফসাকে বের করার মোটামুটি দুটি উপায়। এক হলো, যে হাসপাতালে প্রসব করেছে সেখানকার রেকর্ড বের করা। সেটা বেশ কঠিন। আরেকটা সহজ উপায় নুরুন্নাহারের নানা বা নানির কাছে জেনে নেয়া। এটাও কঠিন, কেননা তারা এ প্রসঙ্গে কথা বলতে চাইবে না।

ফোনটা বেজে উঠল। শামিম পকেট থেকে বের করে দেখল নুরুন্নাহারের কল। কয়েকবার ধরবে না ধরবে না করেও রিসিভ করে ফেলল।

‘কী ব্যাপার, আপনি তো স্পষ্টবাদী, তবু যে পিছিয়ে গেলেন?’ রাখঢাক না রেখেই নুরুন্নাহারের আক্রমণ।
‘না, আসলে আমার একটা বিষয় ক্লিয়ার হওয়া দরকার। সে কারণেই একটু সময় নিচ্ছি। তবে আমি এটা শিউর, তোমার কোনো ব্যাপারেই আমার কোনো আপত্তি নেই।’
‘তাহলে আপত্তিটা কোথায়, বলবেন?’
‘আচ্ছা, তোমার মা কোন কলেজ থেকে মাস্টার্স কমপ্লিট করেছিল সেটা কি বলতে পারবে?’
‘না, বিষয়টা আমার জানা নেই।’
‘বাসা থেকে জেনে নিতে পারো।’
‘এ বিষয়ে তাদের সাথে কথা বলতে আগ্রহী নই। তারাও এসব নিয়ে কথা বলে না আমার সঙ্গে।’
‘আচ্ছা, আমি কি তাদের সঙ্গে কথা বলতে পারি?’
‘হ্যাঁ, সেটা পারেন। আমি টিএন্ডটি নাম্বার দিচ্ছি। নানু ধরবে।’
পরদিন দুপুরে ফোন করে শামিম।
‘হ্যালো, কে বলছেন?’
‘আমি শামিম। ওই তো সেদিন নুরুন্নাহারকে দেখতে গেলাম।’
‘ও হ্যাঁ, কী খবর, তোমরা তো কিছু জানালে না।’
‘এই তো আজ জানাবো বলে ফোন করা।’
‘তো সব পজেটিভ তো? আমাদের কোনো আপত্তি নেই।’
‘হ্যাঁ, আমাদেরও নেই। আমরা এগুতে পারি বিষয়টা নিয়ে।’
‘তাহলে শুভকাজটা কবে করা যায়?’
‘আচ্ছা, নুরুন্নাহারের মা সম্পর্কে একটু জানার ছিল। একচুয়েলি সে শুধু তার মার নাম বলতে পেরেছে।’
‘আসলে আমরা এ নিয়ে আর কথা বলতে চাই না।’
‘আচ্ছা, আপনার মেয়ে হাফসা, ও কি তিতুমীরে ইংলিশ ডিপার্টমেন্টে ছিল? ১৯৯২/৯৩-এর দিকে?’
‘হ্যাঁ, তুমি কী করে জানলে?’
আর কোনো কথার প্রয়োজন হয় না শামিমের। কান থেকে ফোন নামিয়ে কল কেটে দেয়। মাথাটা ঝিম ঝিম করছে। দ্রুত বাসা থেকে নিচে নামে। গ্যারেজ থেকে সদ্য কেনা প্রাডোটা বের করে শা করে টান দেয়। দুই চোখ যেদিকে যায় ছুটতে থাকে শামিম। এই দুরন্ত গতির কাছে মৃত্যু এসে ধরা দিলেও আজ তার আপত্তি নেই।

লেখক : কথাসাহিত্যিক, সাংবাদিক



(ভ্রমণ বিলাস)

সেন্ট মার্টিন
নীল জলের হাতছানি

নাজমুস সাকিব

ভ্রমণের পরিকল্পনা হয় একদম হঠাৎ করে। সেন্ট মার্টিন যাবার ইচ্ছে লুকিয়ে রেখেছিলাম অনেক দিন থেকেই। নানা কারণে সেই ইচ্ছে আর পূরণ হয়ে উঠছিল না। এবারে সুযোগ এসে গেল। একদল তরুণ তুর্কি, উঠোন পেরিয়ে দুই পা যাদের পড়েনি কোথাও, তাদের সঙ্গে কথা হলো। পরীক্ষার ছুটিতে তারা ভ্রমণে যেতে চায়। সঙ্গে একজন অভিজ্ঞ ভ্রমণসঙ্গী দরকার।

আমি অভিজ্ঞ কেউ নই। সেন্ট মার্টিনের পথ আমারও অচেনা। অবশ্য আমার দৌড় কক্সবাজার পর্যন্ত আছে। কয়েক মাস আগে ঘুরে এসেছি। তাই এই সুযোগ হাতছাড়া করিনি। আমাকে পেয়ে তরুণদল আটখানা। এই তরুণদলের সবাই মাদরাসার ছাত্র। সারাবছর বেড়াবার সুযোগ নেই। বছরে অল্প ক'দিন ছুটি পাওয়া যায়। সেই সময়টা পরিবার তাদের বেঁধে রাখে। একটু দম ফেলার জন্য কোথাও যাওয়ার সুযোগ নেই। কোনোভাবে এবার তারা একটা ভ্রমণের পরিকল্পনা করেছে। আমি তাদের সঙ্গী হয়েছি। আমারও একটি ছোট দলের দরকার ছিল ঘুরতে যাবার জন্য।

ট্রেনের টিকেট কাটা ছিল আগে থেকেই। রাতের বেলা স্টেশনে দেখা হলো সবার সঙ্গে। যথারীতি ট্রেনে উঠলাম। রাতের ট্রেনে মাঝে মাঝে ছিনতাই হয়। সে বিষয়ে সবাইকে আগে থেকে সাবধান করে দিলাম। ক্যামেরাওয়ালা এ কথা শুনে তাঁর ক্যামেরা লুকিয়ে জড়িয়ে বসে রইলেন। অক্টোবরের শেষ সময়। শীতের লেশমাত্র নেই। গরম যাই যাই করছে। ট্রেনে সামনের সিটে এক দম্পতি। সঙ্গে দুটি ফুটফুটে শিশু। তাদের জন্য জানালা বন্ধ রাখতে হলো। কিছুটা ঘেমে উঠলাম।

রাতের পৃথিবী অনেক বেশি কাব্যিক হয়ে ওঠে। অন্ধকার পেরিয়ে কখনো সোডিয়ামের আলো চোখে পড়ছিল। সেই আলোতে দেখা যাচ্ছিল ঘুমন্ত শহর। নিস্তব্ধ কল-কারখানা আর বাড়ি-ঘর। আমি ঢাকা শহরের দালান-কোঠা আর যানজটের মানুষ। সেই দৃশ্যে কী মুগ্ধতা খুঁজে পেয়েছিলাম বলে বুঝাতে পারব না।

ঘুম হয়নি সেই রাতে। ফজরের আজানের পর অজু করলাম। এর মধ্যে কত স্টেশনে ট্রেন থামল তার হিসাব রাখিনি। ঢাকা-চট্টগ্রামের ট্রেনে এবার প্রথম। পথ চিনবার চেষ্টাও করিনি। থাক না অচেনা হয়ে। এইটুক দেশ আমার।

নামাজের জায়গা খুঁজে পেতে বেগ পেতে হলো। পঁচিশ বগি পার হয়ে যখন নামাজের জায়গা পেলাম না তখন একজন স্টাফ দেখিয়ে দিলেন আমার বগির পাশের বগিতেই নামাজের ঘর। ভেতরে ঢুকে দেখি বেশ ক'জন সেখানে ঘুমিয়ে আছেন। না ডেকে পারলাম না।

ভোরবেলার দৃশ্যের তুলনা হয় না। ট্রেনের জানালা দিয়ে বেশ কিছু টিলা চোখে পড়ল। মনে হলো দেশের বাইরে কোথাও এসেছি। ঢাকার মতো

ঘিঞ্জি শহরে থাকলে এমন মনে হওয়াটা অস্বাভাবিক না। টিলা আর গাছের ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো এসে পরশ বুলিয়ে দিল মুখে। চট্টগ্রাম স্টেশনে থামার পর ভেবেছিলাম আরও স্টেশন বাকি আছে। ভোরবেলা ট্রেনে চড়তে ভালো লাগছিল। অবশেষে নামতে হলো। গেট পার হয়ে বাইরে গেলাম। কোনো ভালো হোটেলে জম্পেশ নাস্তা করার ইচ্ছা ছিল। এত ভোরে কই যাব ভেবে পাচ্ছিলাম না। সোজা চলে গেলাম বাসস্ট্যান্ডে, কক্সবাজারের বাস ধরার জন্য।

বাসস্ট্যান্ডে নাস্তা শেষে বাসে ওঠার সময় ঘটল বিপত্তি। একসঙ্গে চার-পাঁচজন এসে টানাটানি শুরু করল তাদের বাসে ওঠানোর জন্য। এমন অযাচিত সমাদর পেয়ে আমরা রীতিমতো বিব্রত। তবে কারও ডাকে সাড়া না দিয়ে অন্য এক বাস কাউন্টারে গেলাম। বন্ধুদের কাছ থেকে আগেই জেনে নিয়েছিলাম সবচেয়ে ভালো বাসের নাম।

এই বাসের নাম খুব সুন্দর। মারসা। শুনেছি একজন পীর সাহেব এই বাসের নাম রেখেছেন। মারসা আরবি শব্দ। মানে বন্দর। চট্টগ্রাম-কক্সবাজার উপকূলীয় এলাকা। নামটি যথার্থ হয়েছে।

কক্সবাজার যখন পৌঁছলাম তখন দুপুর প্রায় ১২টা। হোটেল ঠিক করা ছিল না। অটো দিয়ে খুঁজতে হলো। এক হোটেলের সামনে লেখা, আপনার মূল্যবান সামগ্রী নিজ দায়িত্বে রাখবেন। এমন সতর্কবাণী দেখেও যে এই হোটেলে আসবে তাকে সাহসীই বলতে হবে। দুইরুমে আটজনের থাকার ব্যবস্থা হলো। জোহরের নামাজ পড়ে খেতে বের হলাম। ভাত-ভর্তা, সাথে কোরাল মাছ। সমুদ্রের পাড়ে এসে মাছ না খেয়ে থাকার মানে হয় না। তবে সেবার আমাদের ভাগ্য মন্দ ছিল। অক্টোবরের শেষ দশদিন মাছ ধরা বন্ধ ছিল। সেসময় তেমন মাছ পাওয়া যায়নি। যাও ছিল তা চড়া দামের।

খেয়েদেয়ে ঘুরতে বের হলাম। প্রথম গন্তব্য মেরিন ড্রাইভ এবং ইনানী সমুদ্র সৈকত। ইনানী সমুদ্র সৈকতের আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে। এই সৈকতে প্রচুর প্রবাল পাথর দেখা যায়। অবশ্য সেজন্য সময়মতো আসতে হয়। জোয়ার শুরু হলে পাথর তলিয়ে যায় পানির নিচে। ইনানী সৈকতের একপাশে পাহাড় আর আরেকপাশে সমুদ্র এক অপরূপ দৃশ্যের অবতারণা করে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মেরিন ড্রাইভ নামের নতুন রাস্তা। প্রায় টেকনাফ পর্যন্ত বিস্তৃত এই রাস্তা সরকার সম্প্রতি তৈরি করেছে। রাস্তা দিয়ে যাবার সময় যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য চোখে পড়ে তাতে যে-কেউ অবাক হতে বাধ্য। একপাশে সমুদ্র আরেক পাশে পাহাড়। মাঝখান দিয়ে আকাবাঁকা রাস্তা। কক্সবাজার থেকে ইনানী সমুদ্র সৈকতের দূরত্ব প্রায় ২৭ কিলোমিটার। চাঁদের গাড়ি নামে একধরনের পিকআপে করে যাওয়া যায়। এখন অটোবাইকও যায়। একবারে আপ-ডাউন ভাড়া করা হয়।

সূর্যাস্তের ঠিক আগে রওয়ানা হলাম ইনানী বিচের দিকে। দূরে লাল সূর্যটা দেখা যাচ্ছিল। ডুব দেয়ার অপেক্ষায় আছে। লম্বা পথে চলতে চলতে ফিরতি পথে ক্লান্তি এসে গেল। ঘুম এসে গেল কারও কারও। এমন যাত্রাপথে ভালো গান জানেন এমন কাউকে দরকার হয়। দুঃখের বিষয়, আটজনের মধ্যে গান গাইবার মতো কেউই ছিল না। অগত্যা ঘুমের কাছে হার মানতে হলো।

সন্ধ্যার পর হোটেলে এসে পৌঁছলাম। এশার পর রাতের বেলা গেলাম সুগন্ধা সমুদ্র সৈকতে। রাতের সমুদ্র অন্যরকম। শো শো শব্দ। অন্তহীন জলরাশি। অপরূপ ভয়ংকর সৌন্দর্য। সেই সৌন্দর্যে আকর্ষণ যেমন জাগে তেমন ভয়ও লাগে।

আকাশে চাঁদ ছিল। চাঁদের আলো মুগ্ধতা বাড়িয়ে দিয়েছিল বহুগুণে। সমুদ্রের পাড়ে বসার চেয়ার একটাও এই সময় খালি পাওয়া যায় না। নবদম্পতিদের জন্য এটা মধুর সময়।

আমার সঙ্গে থাকা ভ্রমণসঙ্গীদের উচ্ছ্বাস ছিল দেখার মতো। জীবনে এই প্রথম শো শো শব্দ ও অন্ধকারে সাগরের পাড়ে দাঁড়ানোর অনুভূতি তারা ফোন করে শুনিয়েছেন অনেককে।

সৈকত থেকে মেইন রোডে যাবার যে রাস্তা তাতে মাছের দোকান। মাছ কিনলে ভেজে দেয়া হয়। আমার কাছে কক্সবাজার ভ্রমণের সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয় এটা। তবে মনে হয়



এখানে আরও কিছু ভালো দোকান হতে পারে। উন্নত দেশগুলোতে সাগর-তীরে অনেক কিছুর দোকান থাকে। কক্সবাজারে এখনও এসব তৈরি হয়নি। শহরটিকে অনুন্নত বলা যায় না। বেশ ক'টি ফাইভ স্টারসহ অনেক নামী-দামী রিসোর্ট ইতিমধ্যে চালু হয়ে গেছে সেখানে।

ব্যাগ গুছিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। খুব ভোরে উঠতে হবে। গন্তব্য সেন্ট মার্টিন। ক্লান্তিতে চোখ বুজে এল খুব সহজেই।

ভোরে উঠে আবারও গেলাম সৈকতে। সকালের সমুদ্র অন্যরকম। সমুদ্রকে কেন যেন একেক সময় একেক রকম মনে হয়। কেমন শান্ত, স্নিগ্ধ।

বাস ঠিক করা ছিল আগ থেকে। প্রথম গন্তব্য টেকনাফ। সুদূর দূর্গম পথ। প্রায় ৫৬ কিলোমিটার।

গুগলের হিসাবে দু ঘন্টার পথ। কিন্তু লক্কর ঝক্কর বাস দিয়ে যেতে প্রায় তিন ঘণ্টা লেগে যায়। ভোর ৭টায় রওয়ানা দিয়ে আসতে আসতে প্রায় সকাল ১০টা বেজে গেল। টেকনাফ আসার পথে রোহিঙ্গাদের ক্যাম্প চোখে পড়ল। পাহাড়ের গায়ে থরে থরে সাজানো ঝুপড়ি। কোথাও কোথাও রাস্তার পাশে বাজার দেখলাম। সবগুলো মানুষ টুপিপরা। শরণার্থী ও অনুদান নিয়ে বেশ কিছু সুন্দর বাণী সম্বলিত বিলবোর্ড চোখে পড়ল। একটা বিলবোর্ডে লেখা ছিল, গ্রহীতার সম্মান রক্ষা করা দাতার কর্তব্য। খুব সুন্দর নীতি। কাউকে কিছু দেয়ার সময় তার সম্মান-মর্যাদা রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে খুব কম মানুষই ভাবে। তাই তো জাকাতের শাড়ি-লুঙ্গি নিতে গিয়ে আমাদের দেশে প্রতি বছর বহু মানুষ মারা যায়।

রোহিঙ্গা ক্যাম্পজুড়ে নানা দেশের নানা সংস্থার অফিস। প্রায় ১০ লক্ষাধিক মানুষের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে এখানে। দু পাশে পাহাড়ের ওপর তাদের ঝুপড়ি। একটু বেশি ঝড় বৃষ্টি হলে বাজে অবস্থার সৃষ্টি হবে। পাহাড় ধ্বসেও মানুষ মারা যেতে পারে।

টেকনাফ বাংলাদেশের সর্বদক্ষিণের উপজেলা। এখান থেকে সেন্ট মার্টিনের জাহাজ ছাড়ে। বছরে ৫-৬ মাস এই জাহাজ চালু থাকে। তা শুধু শহুরে পর্যটকদের জন্য। অন্যসময় স্থানীয়রা ট্রলারে যাতায়াত করে থাকেন। প্রায় ৪৬ কিলোমিটারের এই পথ পাড়ি দিতে আড়াই ঘণ্টারও বেশি লেগে যায়।

প্রতি বছর সাধারণত অক্টোবরের শুরু থেকে

জাহাজ চলাচল শুরু হয়। তবে এবার ঘূর্ণিঝড়ের কারণে কর্তৃপক্ষ অনুমতি দেয়নি। তাই ট্রলারই ভরসা আমাদের।

ট্রলারে যাওয়া নিয়ে নানা মুখে নানা কথা শুনেছি। কেউ বলেন, না ওপথে যাওয়া যাবে না। প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটে। আর দুর্ঘটনা না ঘটলেও উত্তাল সমুদ্র দেখে অনেকে অজ্ঞান হয়ে যায়। কেউ এসব উড়িয়ে দিয়ে বলেন, আরে কিছু না। ট্রলারে গেলে আরও মজা। তবে ট্রলার যাত্রার অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলতে পারি, কিছুটা ঝুঁকি আছে। সমুদ্র শান্ত থাকলে এর চেয়ে আনন্দদায়ক ভ্রমণ আর নেই।

তবে স্থানীয় লোকজন বা কেউ চায় না পর্যটকরা এভাবে যাক। কারণ পথ নিরাপদ না। আমাদের বাসচালক উষ্মা প্রকাশ করেছিলেন এ কথা জেনে। তবে হাসি ফুটেছিল ট্রলার মালিকের মুখে। কারণ একসঙ্গে প্রায় ৪০ জন পর্যটক তাঁর নৌকা ভাড়া করতে গিয়েছিলাম।

এই বিশাল দল দেখে তিনি ইচ্ছামতো ভাড়া হাঁকালেন। সেই ভাড়া কমিয়ে আনতে বেশ বেগ পেতে হলো। পর্যটক দলের বেশ ক'জন এগিয়ে গেলেন। এখানে মজার কথা বলে রাখি। কক্সবাজারের স্থানীয় ভাষা এখানে কাজে লেগেছিল। কয়েকজন পর্যটক কক্সবাজারের ভাষায় বকাবকি শুরু করতেই তিনি নরম হন।

অবশেষে ১০ হাজার টাকায় যেতে রাজি হলেন তিনি। মালবাহী ট্রলার। বসার জায়গা নেই। মাঝখানে মাল রাখার জায়গায় বসতে হলো। সরকারের আইন অনুযায়ী এসব নৌকায় লাইফ জ্যাকেট পরে থাকা বাধ্যতামূলক। তবে তাদের কাছে থাকা জ্যাকেটগুলোর অবস্থা শোচনীয়।

আকাবাঁকা নদী পেরিয়ে ট্রলার সাগরে পড়ল। দূরে পাহাড়ের সারি। ভারত-পাকিস্তান আলাদা করার সময় র‍্যাডক্লিফ পাহাড় দিয়ে সীমান্ত এঁকেছিলেন। তাই বেশিরভাগ পাহাড় বিশেষ করে সিলেট অঞ্চলে সব পাহাড় পড়েছে বাংলাদেশের বাইরে। নাফ নদীর ওপারে মায়ানমার। ৭-৮ কিলোমিটারের বেশি হবে না। মাঝে মাঝেই মোবাইলের সময় বদলে যাচ্ছিল। সেখানে বাংলাদেশের চেয়ে মায়ানমারের নেটওয়ার্কের সিগন্যাল বেশি। তবে নাফ নদীতে মোবাইলে ফোরজি পেয়েছি। অবাক হয়েছি কিছুটা। দেশ সত্যি এগিয়ে যাচ্ছে। এমন অভাবনীয় উন্নয়ন যদি সব ক্ষেত্রে হতো তাহলে কতই না ভালো হতো।

নাফ নদীর ওপর দিয়ে যেতে যেতে চোখ কিছুটা ভিজে এলো। ওপাড়ের মায়ানমারকে মনে হলো ঘৃণিত একটি ভূখণ্ড। এই একবিংশ শতাব্দীতে তারা এমন ঘটনা ঘটিয়েছে যা কল্পনাও করা যায় না। প্রায় সাড়ে পাঁচ কোটি মানুষের এই দেশে স্বেচ্ছাচারী এক সেনাবাহিনী ও কিছু মানুষ কীভাবে হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করল, লক্ষাধিক মানুষকে দেশছাড়া করল–ভাবলে দুঃস্বপ্নের মতো লাগে। ওই দেশে কি কোনো ভালো মানুষ নেই? মায়ানমারের প্রায় ৮৮ ভাগ জনগোষ্ঠী বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী। বুদ্ধ কত দয়াবান একজন মানুষ ছিলেন। তাঁর অনুসারীরা এমন ঘটনা কীভাবে ঘটায় ভাবলে অবাক লাগে।

আধুনিক পৃথিবীর বহু মন্দ দিক আছে। তবে কিছু কিছু ভালো দিক আছে যেগুলো মানব-ইতিহাসে আগে কখনো ছিল না। এর মধ্যে একটি হচ্ছে সাহায্যসংস্থা। এই যে ১০ লাখের বেশি মানুষের সাহায্যে পুরো পৃথিবী এগিয়ে এসেছে, নাহলে আমরা কি পারতাম এতগুলো মানুষের ভার বহন করতে? তবে এখানে একটা ফাঁক আছে। জাতিসংঘের শরণার্থী সাহায্য বা বিশ্বের যে কোনো মানবাধিকার সংস্থা, তারা অপরাধ হওয়ার আগে কোনো কাজ করে না। কারণ এতে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ হয়ে যায়। তবে তা করতে পারলে ভাল হতো। তাদের নীতি হচ্ছে এমন, তুমি মার খেয়ে আসো আমরা তোমার সেবায় নিবেদিত। কিন্তু যে তোমাকে মেরেছে তার বিষয়ে আমরা কিছু বলতে পারি না।

ট্রলারে বেশ লম্বা পথ। আড়াই ঘণ্টার মতো লেগে যায়। সমুদ্রে নৌযানে চড়া এই প্রথম। সাগর সেদিন বেশ শান্ত। একজন সহযাত্রী তো ভাবতেই পারেননি নদী পেরিয়ে আমরা সমুদ্রে এসে পড়েছি। তিনি খুব ঔৎসুক কণ্ঠে জিজ্ঞেস

করলেন, ‘সমুদ্রে কখন যাব?’
চলার পথে কোস্ট গার্ডের সদস্যরা দুবার নৌকা চেক করলেন। কয়েকটি ব্যাগেও তল্লাশি চালালেন। মাদকের বিরুদ্ধে বিশেষ অভিযান চলছে বলে কথা। অবশেষে দূর থেকে সেন্ট মার্টিন দ্বীপ দেখা গেল। দ্বীপ আমাদের দেখে যেন হাতছানি দিল। সেন্ট মার্টিনের বাংলা নাম নারকেল জিঞ্জিরা। আরবি জাজিরা থেকে জিঞ্জিরা। আরবরা এর এই নাম দিয়েছিলেন। নারকেল শব্দটি যুক্ত হয়েছে প্রচুর নারকেল পাওয়া যায় বলে। পরে ব্রিটিশরা সাধু মার্টিনের নামে এর নামকরণ করে।
ট্রলার থেকে নামতেই একজন কোস্ট গার্ড সবাইকে চেক করলেন। পিপাসা পেয়ে গেছে ততক্ষণে। জেটি পার হতেই একজন ডাবওয়ালা পাওয়া গেল। চেহারায় কিছুটা রাখাইনদের ভাব আছে। কথায় কথায় জানালেন, সেন্ট মার্টিনে প্রথম ১৩টি পরিবার বসত গড়ে। তিনি সেই ১৩ পরিবারের এক পরিবারের বংশধর। সেন্ট মার্টিন আসার পর এই ডাব খাওয়া শুরু। কত ডাব খেয়েছিলাম দু দিনে তার হিসেব করিনি। মাছ না পেলেও ডাব পাওয়া গিয়েছিল বেশ কম মূল্যে।
ভাগ্যক্রমে ভালো একটা হোটেলে উঠলাম। একে হোটেল বললে ভুল হবে। মফস্বলের বাড়ির মতন। লম্বা বারান্দা। তার মাঝে মাঝে কক্ষ। দ্বিতীয় তলায় সামনে খোলা ছাদ। একেবারে সমুদ্রের কাছে। রুমে শুয়ে শো শো শব্দ শোনা যায়। সেন্ট মার্টিন এলে এমন জায়গায় না থাকলে পুরো ভ্রমণই বৃথা। সেন্ট মার্টিনে বিদ্যুৎ নেই। জেনারেটর ছাড়া হয় দিনে কিছু সময়ের জন্য। রাতের বেলা বাতাস বয় অনেক জোরে। সেই বাতাসে শান্তিতে ঘুমানো যায়। সন্ধ্যার পর গাছে ঝোলানো দোলনায় শুয়ে ছিলাম। আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ। চাঁদের আলোতে এক স্বর্গীয় দৃশ্যের অবতারণা হয় সমুদ্র সৈকতে। তার কোনো তুলনা হয় না। আকাশ থেকে সাদা দুধের মতো জোছনার আলো ছড়িয়ে পরে সবখানে। সেই আলোতে সমুদ্রের পানিকে দুধের মতো মনে হয়। মনে হয় রূপকথার দুধ-সাগর। সেই রাতে ক্লান্ত ছিলাম। জলদি ঘুম এসে গেল। পরদিন সকাল সকাল উঠে ছেঁড়া দ্বীপে যাত্রা করতে হবে।

তারপর আগামী সংখ্যায়...



(ছোটগল্প)

প্রতীক্ষাকাল

জীম হামযাহ

নগরীর উপকণ্ঠে পূর্ত ভবনের পাশে মনোহর যে মসজিদটি সেখানে নামাজের সময় ছাড়াও মানুষজন আসে। বিশেষ করে অবসর বিকেলে সময় কাটানোর জন্যও বহু লোকের সমাগম হয় সেখানে। বিশাল দেয়াল-ঘেরা মসজিদের পুকুর, পুকুর পাড়ের চারদিকে ছায়াদার বৃক্ষের নিচে অনেক মুসল্লি আসে নগর-জীবনের অবসাদ ঘোচাতে। পুকুরের বাঁধানো সিঁড়িতেও বসে বসে তারা গল্প করে। পুকুর-ঘাটে মাছের ঝাঁক দেখার জন্য কেউ কেউ আসার সময় নিয়ে আসে খানিক মুড়িও। একমুঠো মুড়ি ছুড়ে দিলেই শুরু হয় মাছেদের লোফালুফি। এটা দেখে তারা আনন্দ পায়।

এ মসজিদের খতিব মুফতি বদরুদ্দিন সাহেব। তিনি দেশের নাম করা একজন আলেম। প্রতি শুক্রবারে এসে জুমার নামাজটা পড়ান। দারুল উলুম দেওবন্দ, মদিনা ভার্সিটি পাশ করা মধ্য বয়সি এ আলেম এখানকার মানুষের কাছে খুবই শ্রদ্ধাভাজন। তিনি সরকারি সনদপ্রাপ্ত দেশের রেজিস্টার্ড মুফতিদেরও একজন। দূর-দূরান্ত থেকে বিভিন্ন শ্রেণী-পেশ-ার মানুষ তাঁর কাছে আসে দুআ নিতে। মাসআলাগত কিছু জিজ্ঞেস থাকলে তিনি অতি সুন্দর করে বুঝিয়ে দেন। কেউ কেউ আসে তেলপড়া, পানিপড়ার জন্যও। তবে এসবে তাঁর বেশ অস্বস্তি থাকলেও কাউকে হতাশ করতে দেখা যায় না। তিনি মনে করেন মানুষ সান্ত্বনার জন্য আসে তিনি সান্ত্বনাটাই দেন। অসুখ-বিসুখের জন্য পরামর্শ দেন অনর্থক অর্থ ও সময় নষ্ট না করে ভালো ডাক্তারের শরণাপন্ন হবার। তাঁর কাছ থেকে মানুষ সব সময় ভালো পরামর্শটাই পায়।

মসজিদের পুকুরপাড়ের এক কোণে দেবদারু গাছের নিচে অনেকক্ষণ যাবত একজন বৃদ্ধ বসে আছেন। সাদা পাঞ্জাবি-পাজামা পরিহিত দু হাঁটুতে হাত বেঁধে বসায় তাঁকে বেশ আত্মমগ্ন কিংবা চিন্তিত দেখাচ্ছে। তিনি এসেছেন মুফতি বদরুদ্দিন সাহেবের কাছে। বেশ দূর থেকে এসেছেন একটা প্রশ্নের উত্তর জানতে। তবে মুফতি সাহেব কোনো একটি বাসায় দাওয়াতে থাকায় আসতে বিলম্ব হচ্ছে। তাঁর না আসা পর্যন্ত এভাবে বসে অপেক্ষায় কাটাতে হচ্ছে এই বৃদ্ধকে।

এই বৃদ্ধ মানুষটাকে এখানকার উপস্থিত কেউ হয়তো না চিনলেও তিনি হচ্ছেন কুলাউড়া কলেজের দর্শন বিভাগের একসময়কার তুখোড় শিক্ষক ফরাজ উদ্দিন স্যার। দেশ-বিদেশের বহু জায়গায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে তাঁর ছাত্ররা। গুণমুগ্ধ ছাত্রদের মুখে আজও ফরাজ উদ্দিন স্যারের প্রশংসার খই ফোটে।

অবসরপ্রাপ্ত এই শিক্ষক একসময় অনেককিছু তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিলেও আজ তিনি পরিস্থিতির শিকার। নিজেকে সামান্য প্রবোধ দিতে আশ্রয় নিতে হয়েছে অনেক ছলনারও। তন্ত্র-মন্ত্র, ঝাঁড়-ফুঁক এসবে তাঁর তীব্র অবিশ্বাস থাকলেও কালের দুর্বিপাকে পড়ে সামান্য আশ্বাস কিংবা সান্ত্বনা খুঁজতে সে-সব জায়গায়ও তাঁকে যেতে হয়েছে। যেমন, কেউ তাঁকে এসে বলেছে অমুক জায়গায় এক তান্ত্রিক কবিরাজ আছে, অনেকেই বিভিন্ন সমস্যার জন্য যায়। ঐখানে এক জিন-সাধক আছে, যে কিনা জিনের মাধ্যমে অনেক কিছু বলে দিতে পারে! মিথ্যা-ধোঁকা জ্ঞান রেখেও যে যেখানে বলেছে এমন অনেক জায়গায় মেয়েকে নিয়ে গিয়েছেন। সাধ্যমতো কোনো চেষ্টা বাদ রাখেননি তিনি। ব্যর্থ হয়ে আশা, সান্ত্বনা, ছলনার মধ্যে খুঁজেছেন বেঁচে থাকার মতো ভর। জীবনকে দাঁড় করিয়ে রাখতে একটা স্পেস তাঁর দরকার। যে স্পেসেই গিয়ে তিনি প্রদীপ জ্বালান, হতাশা এসে সেখানে হানা দিয়ে নিভিয়ে দেয়। তখন তাঁকে আরেকটি স্পেস খুঁজতে হয়। এসব যতটা না তাঁর নিজের জন্য, তারচেয়েও বেশি মেয়েটার প্রয়োজনে।

চোখের সামনে আপন মেয়ের এমন দুর্দশা কোন বাবারই-বা সহ্য হবে? কে-বা ভেবেছিল তাঁর এমন আদুরে মেয়ের ভাগ্যে নেমে আসবে এমন বিষাদ শর্বরী!

মুক্তিযোদ্ধা বাবার সন্তান। সম্ভ্রান্ত পরিবার। শিক্ষিত, স্মার্ট, ভদ্র-সজ্জন। সামাজিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত পরোপকারী ছেলে। সবার প্রিয়জন সে। প্রস্তাব পেয়ে দ্বিমত করেননি ফরাজ উদ্দিন সাহেব। মেয়ে ইকোনমিকসের ছাত্রী। পাঠ না চুকিয়েই তিনি মেয়েকে বিয়ের পিঁড়িতে বসিয়ে দেন। ছেলে-পক্ষ বলেছে, মেয়ে যতদূর লেখাপড়া করতে চায় সে দায়িত্ব

তাদের। সে-কথা তারা রেখেছেও। বিয়ের পর সংসারের কাজ-কর্মে না জড়িয়ে লেখাপড়ার প্রতি গুরুত্ব দেয় তারা। কোনো কিছুর অভাব ছিল না মেয়ের দাম্পত্য জীবনে। স্বামী তার মোটর বাইকের পেছনে বসিয়ে কলেজে পৌঁছে দিত। আবার নিয়ে আসত। কোনোদিন এমনও হতো, ঘণ্টার পর ঘণ্টা কলেজের গেটে দাঁড়িয়ে থাকত অপেক্ষায়। দুজনের সম্পর্ক এমনভাবে জমেছিল যেন হাজার বছরের পরিচয়ের সূত্রে তারা দুজন দুজনার মাঝে মিশে একাকার হয়ে গেছে। কী প্রেমময় জুটি! সবাই বলত বেশ মানিয়েছে দুজনকে। পিতা ফরাজ উদ্দিন একমাত্র মেয়েকে যথাযোগ্য পাত্রের হাতে তুলে দিতে পেরে নিজেকে করেছিলেন নির্ভার, নিশ্চিন্ত। বলতেন, মেয়ের সুখ আমার সুখ। এমনভাবে চললে মরে গিয়েও তাঁর আর কোনো দুঃখ নেই।

সবকিছুই তো ঠিকঠাক ছিল। এমন উজ্জ্বল ফকফকা আকাশ হঠাৎ করে কালো মেঘ আর অমাবশ্যায় ঘোর হয়ে যাবে তা কে গুনেছিল? সেদিন সন্ধ্যার কিছুক্ষণ আগে তার স্বামী বাসা থেকে বের হয়েছিল। রাতে পুষ্পিতার মোবাইলে একটা এসএমএস আসে–'ডিবি পরিচয়ে কয়েকজন লোক আমাকে উঠিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।'

এটুকুই। তারপর থেকে মোবাইলটিও বন্ধ। মানুষটিও নিখোঁজ!

গত তিন বছরে পুলিশ, র‍্যাব, ডিবি এমন কোনো সংস্থা বাদ রাখেননি। দেশের সকল থানা, জেলা সম্ভাব্য সব জায়গায় তাঁরা খোঁজ নিয়েছেন। কোনো সন্ধান মেলেনি। মিডিয়াতেও এ নিয়ে অনেক নিউজ হয়েছে। যতজন যত পরামর্শ দিয়েছে শুনেছেন। যে যে জায়গায় বলেছে, গিয়েছেন। বিভিন্নভাবে পাত্তা লাগিয়েও কোনো কাজ হয়নি। পুলিশও অনেক চেষ্টা করেছে কিছুতেই কিছু হয়নি। তিন বছর গত হয়ে গেলেও পুষ্পিতা এখনো তার স্বামীর প্রতীক্ষায় পথ চেয়ে আছে। স্বামীকে মুছতে পারেনি একটি বারের জন্যও। স্বামীর জন্য কেঁদে কেঁদে বুক ভাসিয়েছে। একলা নিশীথে বালিশ ভিজেছে তার দু নয়নের জলে। চোখের জল ফুরিয়ে গেছে, সে আজও অপেক্ষা করে তার স্বামী আসবে। রাত জেগে থাকে আশায় আশায়, হঠাৎ তার স্বামী এসে বলবে–দরজা খোলো পুষ্পিতা, আমি যে এসেছি! এমনও হয়েছে মাঝরাতে ঘুম থেকে উঠে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এসেছে। তার স্বামী নাকি এই মাত্র এসে তাকে ডেকেছে! সেদিনের বাগানে ফোটা ভোরের তরতাজা ফুলের মতো মেয়েটার দিকে তাকালে আজ সবার মনটা ব্যথাতুর ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। ফরাজ উদ্দিন সাহেব সেদিন যখন মেয়েকে তার স্বামীর বাড়ি থেকে আনতে গিয়েছিলেন তার বেয়াই কিছুক্ষণের জন্য পাথর হয়ে যান! 'মেয়েকে নিয়ে যেতে চান বেয়াই সাহেব, না করব না। তবে আমার একটা কথা আছে। মেয়েটা শুধু আপনার দাবি করে বসবেন না। মেয়েটা আমারও। আপনার ওখানেও থাকবে, আমার এখানেও থাকবে। আমি যদি আনতে যাই, আপনি না করবেন না বেয়াই সাহেব...। আমার কপাল, সব আমার কপাল বেয়াই সাহেব...।' দু হাত জোড় করে বুকে মাথা আছড়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন। জড়াজড়ি কান্নায় সেদিন আবারও বাড়িতে নেমে এসেছিল শব্দিত শোক আর অশ্রুর বর্ষা। 'মাইনষে কয় একদিন না একদিন ফিরে আসবে। তারা নজির দেখায়, অমুক জায়গায় এক ব্যক্তি এভাবে দুবছর গুম ছিল। তারপর তাকে পাওয়া যায় ভারতের কোনো এক এলাকায়। আরেক জায়গার আরো কাকে নাকি একবছর গুম রেখে একদিন তাকে কে বা কারা রাস্তায় ফেলে দিয়ে চলে যায়।'

মানুষজন এমন অনেক ঘটনার উপমা টেনে বুঝায়। ফরাজ উদ্দিন এসবে আর বিশ্বাস করতে চান না। এ সবই মিথ্যা সান্ত্বনা। গত তিন বছরে তিনি নিজেও মেয়ের সাথে মিথ্যা সান্ত্বনা আর ছলনার খেলা কম খেলেননি। আর কত? এখন আর পারছেন না। তিনটি বছরে কি কম সময় গড়িয়েছে? এ তিন বছরে পৃথিবীতে কতবার সূর্য উঠেছে, কতবার অস্ত গিয়েছে। কত মানুষ জন্মেছে, কত মানুষ মৃত্যুবরণ করেছে। কতকিছুই না ঘটে গেছে পৃথিবীতে, কে তার হিসেব রাখে?

এখন আর আগের মতো তাঁর মনের জোরটাও নেই। যতটা না বয়সের ভারে, দুঃশ্চিন্তার

বোঝায় তারচেয়েও বেশি ন্যুব্জ হয়ে পড়েছেন তিনি। কয়দিন বা আর বাঁচবেন। মেয়ের একটা বিহিত না করে গেলে মরেও যে শান্তি পাবেন না! তার জীবন, তার প্রেম অন্যে একজনের মাঝে হলেও জীবিত থাকুক। মেয়েটা সব ভুলে আবার জীবন শুরু করুক নতুন করে। তিনি এমনটা ভাবছিলেন কিন্তু মুখ খুলে বলতে পারছিলেন না। কয়দিন আগে পুষ্পিতার শশুড় এসেছিলেন। তিনিও বলেছেন–'সব বুঝি বেয়াই সাহেব, সব বুঝি। মেয়েটারও একটা ভবিষ্যৎ আছে। কপালের এমন লিখন ছিল কে জানত? আমার ছেলেটা বেঁচে আছে না মরে গেছে তাও জানি না...।' চোখ মুছতে মুছতে বলেন–'বেয়াই সাহেব, মেয়ে যতটা আপনার ততটা আমারও। ভালো কোনো জায়গা যদি পান, আমার কোনো আপত্তি নাই।'

কিন্তু পুষ্পিতাকে এ ব্যাপারে সহজে রাজি করানো যাচ্ছে না।

'এটা কী বলছেন, আমার স্বামী তো আমাকে তালাক দেয়নি। সে যে মারা গেছে তা কি করে নিশ্চিত হই? একজনের বিবাহিত স্ত্রীকে আপনারা কেমন করে অন্যজনের সাথে বিয়ে দেবেন?'

বোকা মেয়ে কি এখনো মনে করে যে তার স্বামী আসবে? শিক্ষিত মেয়ে। কিছু যে বুঝে না তাও তো না। শুধু শুধু এমন অজুহাত কেন? আর যদি হয়েও থাকে সে যা ভাবছে তাহলে সেটাও ভেঙে দেবেন ফরাজ উদ্দিন। একজন স্ত্রী, যার স্বামী গুম হয়ে গেছে, বছরের পর বছর যার কোনো খোঁজই নেই, এমন স্বামীর জন্য স্ত্রী কতদিন অপেক্ষা করবে? দেশের নির্ভরযোগ্য কোনো মুফতি, কাজিকে জিজ্ঞেস করে ধর্মের বিধানটাও তিনি মেয়েকে জানিয়ে দেবেন।

ফরাজ উদ্দিন স্যারের মন আবারও ভারাক্রান্ত হয়ে ঢুকরে ওঠে–'...হুজুর আমরা সংসার, সমাজ নিয়ে বসবাস করি। ধর্মকর্ম ঠিকমতো পালন না করলেও মেনে চলার চেষ্টা করি। আল্লাহর কাছে অনেক কেঁদেছি, আজও ফরিয়াদ জানাই...। তিনটি বছর হুজুর, তিনটি বছর হয়ে গেল কোনো সন্ধান নেই। আমরা জানি না ছেলেটা মরে গেছে না বেঁচে আছে। আর আমার মেয়েটা...!' ফরাজ উদ্দিন স্যার হু-হু করে কান্নায় ভেঙে পড়েন।

মুফতি বদরুদ্দিন সাহেব তাঁকে সামলে বুকে টেনে নিলেন। তাঁর মাথা-পিঠে হাত বুলাতে বুলাতে নির্বাক তাকিয়ে রইলেন সুদূর আকাশের দিকে। তাঁরও দু চোখ অশ্রুতে টল টল।

লেখক : তরুণ গল্পকার, মৌলভীবাজার



সাইয়্যেদ কুতুব শহিদ
মহাকালের ইতিহাসে এক ধ্রুবতারা

ফাহাদ আব্দুল্লাহ

নবধ্বত্রি ৭১
নবধ্বনি ০৪

১৯১৫-এর জুলাই মাস। উসমানি খেলাফতের মৃত্যুঘণ্টা বাজার সময় ঘনিয়ে এসেছে। ইহুদি লবি খেলাফতের পতন ঘটাতে নিজেদের সর্বস্ব নিয়ে মাঠে নেমেছে। পবিত্রতম নগরী মক্কায় নিযুক্ত উসমানি খেলাফতের আমির ও প্রতিনিধি শরিফের সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠক হচ্ছে। দীর্ঘ আলাপ হচ্ছে। আলোচনা চলছে দিনের পর দিন। সপ্তাহের পর সপ্তাহ। মাসের পর মাস। অবশেষে তা সমাপ্ত হয় ১৯১৬-এর মার্চে; ব্রিটিশ প্রতিনিধি ম্যাকমোহন আর মক্কার আমির শরিফের মধ্যে সম্পাদিত হয় এক চুক্তি। গোপন চুক্তি। বিশ্বাসভঙ্গের চুক্তি। বিশ্বাসঘাতকতার চুক্তি। ইতিহাসের নির্মমতার চুক্তি। মুসলিম উম্মাহর ভাগ্যবিপর্যয়ের চুক্তি। শরিফ তাঁর সমস্ত 'শারাফাত' ভুলে গিয়ে, তাঁর আভিজাত্যের কথা বিস্মৃত হয়ে বিশ্বাসভঙ্গ করে বসেছিলেন। বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন উম্মাহর প্রতিটি সদস্যের সঙ্গে। বিদ্রোহ করেছিলেন ইসলামের সঙ্গে। মুসলিম উম্মাহর ভাগ্যবিপর্যয়ের ষোলকলা পূর্ণ করেছিলেন তিনি। ইসলামের শত্রুদের প্রণোদনায় তাদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন উম্মাহর হৃদস্পন্দনে আঘাত হানার। মুসলমানদের শান্তি, সুরক্ষা ও নিরাপত্তাব্যবস্থা ধ্বংস করার। বিশ্বাসীদের ঐক্যের বন্ধন খেলাফতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার। যার বিনিময়ে তিনি পাবেন আরব, সিরিয়া, ইরাকসহ পুরো আরব ভূ-খণ্ডের রাজত্ব। স্বাধীনতা। স্বায়ত্ত শাসন।

তদানীন্তন সময়ে উসমানি খেলাফতও অনেক দিক থেকে দুর্বল হয়ে পড়েছিল। কিন্তু সেই দুর্বলতা কাটানো যেত, সম্ভব ছিল; যদি খলিফা আরবদেরও সঙ্গে পেতেন। আরবদের সমর্থন পেতেন। আর যদি না তারা বিদ্রোহের দাবানল ছড়াত। কিন্তু আরবরা... তখন তারা বিদ্রোহের নেশায় বুঁদ হয়ে ছিল। সাম্রাজ্য আর ক্ষমতা লাভের আশায় ভুলে গিয়েছিল বাস্তবতা। ইসলামের শত্রুদের শঠতা।

অবশেষে ১৯১৬-এর ১০ জুন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি হওয়ার দিবাস্বপ্নে শরিফ বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। খেলাফতের বিরুদ্ধে ব্রিটিশদের পক্ষে অবস্থান নিলেন। আর ঈমান-আকিদা ও ইসলামের ভ্রাতৃত্বের কথা ভুলে গিয়ে নির্মমভাবে উসমানি খেলাফতের সৈন্যদের গলায় ছুরি বসিয়ে দিলেন। বিশ্বযুদ্ধের আগে থেকেই খেলাফতের অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল ভঙ্গুর, তারপর আবার বিশ্বযুদ্ধে জড়িয়ে লাগাতার হার এবং ভূমি হারানো। ইতিহাস সাক্ষী, আরবদের এই বিশ্বাসঘাতকতা খেলাফতের পতনকে আরও ত্বরান্বিত করেছিল। আর উম্মাহকে ঠেলে দিয়েছিল দুর্যোগপূর্ণ অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে।

১৯২৪ সালের ৩ মার্চ। উসমানি খেলাফতের পতন হয়েছে। পুরো পৃথিবী শোকে মুহ্যমান। দুমড়ে-মুচড়ে গিয়েছিল প্রতিটি মুসলমানের হৃদয়। ক্ষত-বিক্ষত হয়েছিল অন্তর। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চলে আসা খেলাফত ছিল উম্মাহর ঐক্যের বন্ধন। ভালোবাসার নিদর্শন। মুসলমানদের শান্তি, সুরক্ষা ও নিরাপত্তা। যখনই খেলাফতের পতন হয়েছিল, মুসলমানরা নিজেদের অসহায় মনে করছিল। বুঝতে পারছিল আসন্ন বিপর্যয়ের কথা। বস্তুত খেলাফতের পতনের পরই উম্মাহর ভাগ্যাকাশ ছেয়ে গিয়েছিল বিপর্যয়ের কালোমেঘে। অশুভ সব বিপদে।

সত্যিই খেলাফতের পতনের পরই মুসলমানদের ওপর নেমে আসছিল একের পর এক দুর্যোগ। ফিলিস্তিনের ভূমি হারানোর মধ্য দিয়েই যেন দুর্দশার সূচনা। আর নির্বোধ শরিফ? ইতিহাস হয়ে গেল বাকি সব...।

খেলাফতের পতনের পরপরই মুসলমানদের ওপর নেমে আসা দুর্যোগ আর দুর্দশা দেখে উম্মাহর উল্লেখযোগ্য একটা অংশ বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েন। তাছাড়া খেলাফতের ছায়া না থাকায় ততদিনে মুসলমানদের মধ্যেও আত্মিক অবক্ষয় ও নৈতিক বিপর্যয় দেখা দেয়। সবকিছু মিলিয়ে উম্মাহর জন্য দরদি কিছু মানুষ খুব বেশিই চিন্তিত ছিলেন। তাই তাঁরা খেলাফত ও ইসলামি শাসনব্যবস্থা ফিরিয়ে আনতে শুরু করেছিলেন বিভিন্ন আন্দোলন। গ্রহণ করছিলেন নানা পদক্ষেপ। তারই ধারাবাহিকতায় ১৯২৮ সালে মিসরে প্রতিষ্ঠিত হয় ইখওয়ানুল মুসলিমিন। ইমাম হাসান আল-বান্নার হাত ধরে এগিয়ে যেতে থাকে বিপ্লবী এ সংগঠনটি। উম্মাহর বিশিষ্টজনদের

বোঝানোর চেষ্টা করে খেলাফতের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য। ইখওয়ান-কর্মীরা সমাজসংস্কারের প্রতি বিশেষভাবে মনযোগী হন। সবার মধ্যে ইসলামি মূল্যবোধকে জাগ্রত রাখার জন্য নিতে থাকেন গুরুত্বপূর্ণ ও সুদূরপ্রসারী সব পদক্ষেপ। কিন্তু আচানক ঘটে যায় এক নির্মম দুর্ঘটনা। আততায়ীর গুলিতে শহিদ হন ইমাম হাসান আল-বান্না। যার কারণ ঐতিহাসিকরা বলেছেন, 'ততদিনে ইহুদিরা নিজেদের জন্য এই আন্দোলনকে খুব ভালোভাবেই বিপদজনক হিসেবে ধরে নিয়েছিল। তাই খুব দ্রুতই এই বিপদজনক আন্দোলনের নেতাকে সরিয়ে দেয় তারা। যাতে কালের গর্ভে হারিয়ে যায় এই আন্দোলনও।'

ইমাম হাসান আল-বান্নার শাহাদাতের পর এই আন্দোলনের হাল ধরা, উম্মাহর মাঝে ইসলামি মূল্যবোধ জাগ্রত রাখা, উম্মাহকে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা থেকে রক্ষা করা, সমাজ থেকে সার্বিক অবক্ষয় রোধ করা এবং উম্মাহকে খেলাফত প্রতিষ্ঠায় উজ্জীবিত করার জন্য খুব প্রয়োজন ছিল এমন এক মহান নাবিকের, যাঁর মধ্যে থাকবে শুদ্ধতা, গভীরতা, চিন্তার প্রখরতা, অতুলনীয় প্রতিভা এবং যথাসময়ে পদক্ষেপ নেয়ার সার্বিক যোগ্যতা। ঠিক সেই প্রতিকূল সময়টাতেই উম্মাহর ভাগ্যাকাশে সৌভাগ্যের ধ্রুবতারা হয়ে উদিত হন সাইয়্যেদ কুতুব শহিদ।

পুরো নাম সাইয়্যেদ ইবরাহিম শাজেলি। আর 'কুতুব' তাঁর বংশগত নাম। সাইয়্যেদ কুতুবের পূর্বসূরিরা ছিলেন জাজিরাতুল আরবের বাসিন্দা। মূল আরব ভূ-খণ্ডেই ছিল তাঁদের বসবাস। পরবর্তী কালে তাঁরা হিজরত করে মিসরে এসে থিতু হন। শুরু করেন বসবাস। ১৯০৬ সালের ৯ অক্টোবর মিসরের উসইউত জেলার মুশা নামক গ্রামে সাইয়্যেদ কুতুবের জন্ম। গ্রামের মকতবে কুরআন হিফজ সম্পন্ন করেন। প্রাথমিক শ্রেণীগুলোও তিনি গ্রামের মাদরাসাতেই পড়েন। মাধ্যমিক শ্রেণীগুলোর পাঠ চুকান কায়রোস্থ মাদরাসাতুল মুআল্লিমিন আবদুল আজিজে। মেধার তীক্ষ্ণতা ও জ্ঞানার্জনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা তাঁকে নিয়ে যায় সমকালীন মিসরের বিখ্যাত বিদ্যাপীঠ দারুল উলুমে। আর ১৯৩৩ সালে সাহিত্যের উপর ডিগ্রি নিয়ে সমাপ্ত করেন প্রাতিষ্ঠানিক পড়ালেখা। প্রাতিষ্ঠানিক পড়ালেখা শেষ করার আগেই তাঁকে একপ্রকার চাপে পড়েই শিক্ষকতায় নিযুক্ত হতে হয়। নিজের পড়ালেখা চালিয়ে নেয়ার জন্যই ছিল মূলত এই কসরত। তারপর ভাগ্যের চাকা সেই সমান্তরালেই ঘুরল। কায়রোতে পড়াকালেও তাঁকে একই পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হলো। কারণ কায়রোতে তিনি তাঁর মামা আহমদ হোসাইন মুশির বাসায় থাকতেন। যিনি ছিলেন একাধারে কবি, সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ। পড়ালেখা শেষ না হতেই অর্থসংকটে তাঁর মামার পারিবারিক অবস্থা হয়ে গেল শোচনীয়। সেই সময়টাতে রুটিরুজির জন্য সাইয়্যেদ কুতুবকেও মামার সঙ্গে কিছুদিন সাংবাদিকতা করতে হয়।

শৈশবে হিফজ সম্পন্ন করার সময়ই সাইয়্যেদ কুতুব দেশপ্রেমে উজ্জীবিত হয়ে উঠেছিলেন। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে বিপুলভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। প্রভাবিত না হয়েও উপায় নেই, কারণ তাঁদের বাড়িই যে ছিল আন্দোলনের কর্মীদের পরামর্শকেন্দ্র। তাঁর পিতাও ছিলেন সেই আন্দোলনের তৎপর একজন কর্মী। এতে নিজের অজান্তেই তিনি শৈশবেই বক্তৃতা ও লিখনীর মাধ্যমে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। পারতপক্ষে সাইয়্যেদ কুতুব উচ্ছলতামুখর শৈশবে তাঁর খেলার বয়সের অন্য আট-দশটা বাচ্চার মতো ছিলেন না। তিনি ছিলেন খুব গম্ভীর প্রকৃতির। ভবিষ্যতে যিনি হবেন ইসলামি আন্দোলনের পথিকৃৎ, কুদরত শৈশবেই তাঁকে দান করেছিলেন সেই ভাব ও ভাবনা। সাইয়্যেদ কুতুব ১০ বছর বয়স থেকেই নামাজের প্রতি খুব যত্নবান ছিলেন। বড়দের সঙ্গে আলোচনাসভায়ও বসতেন এবং সবকিছু মনযোগ দিয়ে শুনতেন। অথচ সমবয়সী বন্ধুরা তখন মত্ত থাকত তুমুল দুরন্তপনায়। তিনি শৈশবেও বেশ সাহসী ছিলেন। মাদরাসার ছাত্রদের পরস্পরের বিরোধ ও দ্বন্দ্বও তিনি উদ্যোগী হয়ে মিটিয়ে দিতেন।

কর্মজীবনে মায়ের ইচ্ছাপূরণের জন্য প্রথমেই সাইয়্যেদ কুতুবকে শিক্ষকতায় আত্মনিয়োগ করতে হয়। কারণ শিক্ষকতা ছিল কুতুব

একটা প্রবন্ধ ছিল ‘যেমন আমেরিকা আমি দেখেছি’। এই প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন—‘তারা এমন এক জাতি যারা জ্ঞান-বিজ্ঞান, উন্নতি ও অগ্রগতিতে পৃথিবীর নেতৃত্ব দিচ্ছে। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, তাদের মানবিক অবস্থা ও সমাজব্যবস্থা এতো হীন যে, তা মানবিক অবস্থার প্রাথমিক স্তরেও নেই। আর কিছু কিছু ক্ষেত্রে তো তা আরও অধঃপতিত...।’

পরিবারের বংশ ও ঐতিহ্যগত পেশা। কিন্তু পরিবারের ব্যয়ভার বহন করার জন্য এই পেশা যথেষ্ট ছিল না। সাইয়্যেদ কুতুবের সৌভাগ্যই বলা যায়, তাঁর যোগ্যতা এবং একনিষ্ঠতায় অভিভূত হন সরকারি শিক্ষাকর্মী ও পর্যবেক্ষকরা। সময় বেশি না গড়াতেই শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে তাঁর ডাক আসে। ১৯৪৪ সালে মন্ত্রণালয়ের অধীনেই তিনি নিযুক্তি পান প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের শিক্ষা-পর্যবেক্ষণ টিমে। চার বছর টানা কাজ করেন এই পেশায়। তাঁর যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতায় কর্মকর্তারা প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন। আর সেটাই তাঁর জন্য সুফল বয়ে আনে। ১৯৪৮ সালের ৩ নভেম্বর মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে সাইয়্যেদ কুতুবকে আমেরিকা পাঠানো হয়। আধুনিক শিক্ষা পরিচালনা এবং এর কর্মপন্থার ওপর ডিগ্রি ও বিশেষজ্ঞতা অর্জনই ছিল এই সফরের মূল ও প্রধান উদ্দেশ্য।

আমেরিকায় অবস্থানকালে সাইয়্যেদ কুতুব আমেরিকার জীবন ও সমাজব্যবস্থা, তাদের বস্তুবাদী ও ভোগবাদী দর্শনের দূরবস্থা নিয়ে অনেক প্রবন্ধ লিখেছেন। যা মিসরের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হতো। তন্মধ্যে একটা প্রবন্ধ ছিল ‘যেমন আমেরিকা আমি দেখেছি’। এই প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন—‘তারা এমন এক জাতি যারা জ্ঞান-বিজ্ঞান, উন্নতি ও অগ্রগতিতে পৃথিবীর নেতৃত্ব দিচ্ছে। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, তাদের মানবিক অবস্থা ও সমাজব্যবস্থা এতো হীন যে, তা মানবিক অবস্থার প্রাথমিক স্তরেও নেই। আর কিছু কিছু ক্ষেত্রে তো তা আরও অধঃপতিত...।’

এমনই আরও চরম কিছু বাস্তবতা তিনি বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রবন্ধে তুলে ধরেছেন। তাঁর আমেরিকা-অবস্থানের সময়টাতেই বিশ্বব্যাপী প্রচারিত হতে থাকে মিসরের সংস্কারধর্মী বিপ্লবী সংগঠন ইখওয়ানুল মুসলিমিন-প্রতিষ্ঠাতা হাসান আল-বান্নার শাহাদাতের সংবাদ। এতে আমেরিকা ও পশ্চিমাদের আনন্দ উদযাপন দেখে তিনি খুব কৌতূহলী হয়ে ওঠেন এই আন্দোলনের ব্যাপারে। আমেরিকায় অবস্থানকালে এই আন্দোলন নিয়ে তিনি ব্যাপক গবেষণা করেন। তারপর দেশে প্রত্যাবর্তনের পর কাছে থেকে প্রত্যক্ষ করেন তাদের আন্দোলন ও কর্মধারা। এতে সাইয়্যেদ কুতুবের কাছে দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে যায়, পশ্চিমারা কেন এই আন্দোলনের ব্যাপারে বীতশ্রদ্ধ, কেন তারা এই আন্দোলনকে ঘৃণা করছে, আর কেনই-বা তারা হাসান আল-বান্নার শাহাদাতে আনন্দ উদযাপন করছে। তারপর ইখওয়ানের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ বাড়তে থাকে। সম্পর্ক হয়। একসময় তা গভীরে চলে যায়, আর সেসময় সাইয়্যেদ কুতুবও হয়ে যান এই আন্দোলনের একজন কর্মী ও সদস্য। একজন উচ্চপদস্থ সদস্য। ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়েন ইখওয়ানের কর্মধারার সঙ্গে। এরপর তিনি শিক্ষা মন্ত্রণালয়েও আর বেশিদিন কাজ করতে পারেননি। কর্মকর্তাদের দুর্নীতিতে তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে তাদের চরম বিরোধিতা করতে শুরু করেন। এতে কর্মকর্তাদের প্রভাবশালী একটা অংশ তাঁর শত্রুতে পরিণত হয়। আর তারাই কৌশলে তাদের পথের কাঁটা সাইয়্যেদ কুতুবকে সরিয়ে দেয়। এতে অবশ্য সাইয়্যেদ কুতুবের কোনো আফসোসই ছিল না, থাকার কথাও নয়।

কারণ তিনি ততদিনে একটি ইসলামি আন্দোলনের উচ্চতর সদস্য। যে আন্দোলনের কর্মীরা শরিয়াহর জন্য নিজেদের কুরবান করার দৃপ্ত শপথ নিয়েছিল।
ইখওয়ানে যোগ দেয়ার আগে সাইয়্যেদ কুতুব হিযবুল ওয়াফদ নামক একটা সংগঠনের দ্বারাও প্রভাবিত ছিলেন। যাদের সঙ্গে ইখওয়ানের বিশ্বাস ও কর্মধারার তেমন একটা পার্থক্য ছিল না। অবশ্য ইখওয়ানে যোগ দেয়ার পরও তিনি সালাফি জিহাদ আন্দোলন-এর সমর্থক ছিলেন। বিশেষত আব্বাস মাহমুদ আক্কাদের রচনা তাঁর মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করত। আন্দোলিত করত তাঁর সত্তাকে। আমার যদ্দূর ধারণা, আব্বাস মাহমুদ আক্কাদের রচনা থেকেই ইসলামি সাহিত্য অধ্যয়নের প্রতি ঝুঁকে পড়ার প্রেরণা লাভ করেন সাইয়্যেদ কুতুব। তারপর ডুবে থাকেন দীর্ঘ অধ্যয়নে। গভীরে চলে যান ইসলামের। উপলব্ধি করতে থাকেন শরিয়াহর মানহাজ, পথ ও পন্থা। তারপর তাঁর চিন্তাধারায়ও ব্যাপক পরিবর্তন আসে। তখন তাঁকে প্রভাবিত হতে দেখা যায় শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ, ইবনুল কায়্যিম, ইবনে হাজম, হাসান আল-বান্না, আবদুল্লাহ আজজাম, আসেম মাকদিসি, আবদুল হামিদ কিশক, শাকরি মুস্তফা, আহমদ শাওকি, মুস্তফা রাফেয়ি, আইমান আল-জাওয়াহিরি প্রমুখের চিন্তাধারা দ্বারা।
সাইয়্যেদ কুতুব শারীরিকভাবে শীর্ণকায় ছিলেন। আরব বিশ্বের প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শায়েখ আলি তানতাবি যখন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করতে আসেন–সবিস্ময়ে বলেন, ‘আমার ভাবতেও অবাক লাগছে, এই শীর্ণকায় ব্যক্তি কীভাবে এতো সূক্ষ্ম ও জটিল বিষয়ে কলম ধরেন?’ অনেকে সাইয়্যেদ কুতুবের বাগ্মিতা ও উপলব্ধিশক্তির উপমা দিতে গিয়ে তাঁকে ইবনে হাজম জাহিরির সঙ্গে তুলনা করেছেন। ততদিনে সাইয়্যেদ কুতুবের ‘আল-আদালাতুল ইজতিমাইয়্যাহ’ গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়ে গেছে। যা মিসরের জনসাধারণের মধ্যে তুমুল প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়। আর এর পরপরই ১৯৫৪ সালে তিনি সংগঠনের মুখপত্র ইখওয়ানুল মুসলিমিন-এর সম্পাদক নিযুক্ত হন। এতে সংগঠনের কর্মধারায় নতুনভাবে প্রাণ সঞ্চার হয়। কিছুদিন না গড়াতেই সামনে আসে ব্রিটিশদের সঙ্গে মিসর সরকারের চুক্তি-প্রসঙ্গ। ইখওয়ানুল মুসলিমিন পত্রিকাতে কঠোরভাবে এর সমালোচনা করা হয়। এতে জামাল আবদুন নাসেরের সরকার ক্রুদ্ধ হয়ে পত্রিকা প্রকাশের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। তার পরপরই ঘটে ইস্কান্দারিয়ায় ভাষণ দানকালে প্রধানমন্ত্রী জামাল আবদুন নাসেরের ওপর প্রাণঘাতী হামলার ঘটনা। এতে সরকার দোষারোপ করে ইখওয়ানকে এবং ঢালাওভাবে গ্রেপ্তার করে ইখওয়ানের কর্মীদের। সময়টা ছিল ১৯৫৪ সাল। সাইয়্যেদ কুতুবও গ্রেপ্তার হন। ১৫ বছরের কারাদণ্ড দেয়া হয় সবাইকে। শিকার হতে হয় নির্মমতার। লোমহর্ষক সব শাস্তির। সেই সময়টাতেই জেলের অভ্যন্তরে জবাই করা হয় সে-সকল ইখওয়ান কর্মীকে, যাঁরা সরকারকে তাগুত ও কাফের সরকার মনে করতেন। ১৯৬৪ সালে স্বাস্থ্যগত অবনতির কারণে ইরাকের প্রধানমন্ত্রী আবদুস সালামের সুপারিশে সরকারিভাবে সাইয়্যেদ কুতুবকে মুক্তি দেয়া হয়। যদিও তা কেবল আট মাসই স্থায়ী হয়েছিল। জেলে অবস্থানকালে তিনি বলেছিলেন–‘ইসলামি শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হলে দীর্ঘ সময় নিয়ে সার্বিকভাবে প্রস্তুত হতে হবে। এই-সেই আন্দোলন করে কখনো ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়।’
জেল থেকে মুক্তি পেয়ে তিনি নিজের অসমাপ্ত কাজে আত্মনিয়োগ করেন। পূর্ণতা দেন বিখ্যাত ও প্রসিদ্ধ তাফসিরগ্রন্থ ‘তফসির ফি জিলালিল কুরআন’-এর। পাশাপাশি ‘মাআলিম ফি তারিক’ এবং ‘আল-মুসতাকবিল লিহাজাদ দীন’ গ্রন্থ দুটোও রচনা করেন।
১৯৬৫ সালের ৩০ জুলাই গ্রেপ্তার হন সাইয়্যেদ কুতুবের প্রিয় ভাই মুহাম্মদ কুতুব। যিনি নিজেও ইখওয়ানের উচ্চ পর্যায়ের একজন সক্রিয় কর্মী ছিলেন। এতে সাইয়্যেদ কুতুবসহ দলের কর্মীরা থেমে থাকেননি। তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করে সাইয়্যেদ কুতুব একটি পুস্তিকা রচনা করে ছড়িয়ে দেন জনসাধারণের মধ্যে। যার ফলে পরিস্থিতি

উত্তপ্ত হয়ে যায়। আর সেই অপরাধে ১৯৬৫ সালের ৯ আগষ্ট গ্রেপ্তার করা হয় সাইয়্যেদ কুতুবসহ ইখওয়ানের ২০ হাজারেরও অধিক কর্মীকে। যাঁদের মধ্য সাতশেরও অধিক ছিলেন নারী। সাইয়্যেদ কুতুবের দুই বোন আমিনা কুতুব ও হামিদা কুতুবও ছিলেন সেই বন্দীদের মধ্যে। তারপর রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে সাইয়্যেদ কুতুবকে শোনানো হয় ফাঁসির শাস্তি।

পরবর্তী সময়ে এক ইখওয়ান কর্মকর্তা বলেন, 'আমি সেই সময়টাতে সাইয়্যেদ কুতুবের পাশে ছিলাম। আমি তাঁকে বললাম, "আদালতে জিজ্ঞাসাবাদের সময় তো আপনি কৌশল গ্রহণ করে, নমনীয়তা দেখিয়ে বাঁচতে পারতেন।" তখন সাইয়্যেদ কুতুব বলেছিলেন, "বাতিলের সামনে নমনীয় হওয়াকে আমি জায়েজ মনে করি না। তাছাড়া একজন নেতার জন্য এমন ঘৃণ্য পথ অবলম্বন করা মোটেই উচিত নয়।" ফাঁসির সংবাদ যখন তিনি শুনেছিলেন, বলেছিলেন, "আলহামদুলিল্লাহ, গত ১৫ বছর আমি অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করেছি এই শাহাদাতের মর্যাদা অর্জনের জন্য।"'

যেদিন সাইয়্যেদ কুতুবের ফাঁসি কার্যকর করা হবে, সেদিন তাঁর সম্মুখে পেশ করা হয় শরিয়াহ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের জন্য ওজর পেশ করে ক্ষমা চাওয়ার শর্ত। যা মেনে নিলে, তাঁকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে বলেও প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়। জবাবে সাইয়্যেদ কুতুব রুদ্রমূর্তি ধারণ করে বলেছিলেন, 'আমার দাওয়াত ও কাজের জন্য ক্ষমা চেয়ে আমি কখনো আল্লাহর দীনের সঙ্গে গাদ্দারি করব না।' তারপর তাঁকে বলা হলো, ওজর পেশ না করলে সমস্য নেই, প্রধানমন্ত্রীর কাছে প্রাণভিক্ষা চাইলেও তাঁকে ক্ষমা করা হবে। তখন সাইয়্যেদ কুতুব বলেছিলেন, 'আশ্চর্য! আমি কেন প্রাণভিক্ষা চাইতে যাবো? তোমরা যদি নিজেদের সত্যপথের অনুসারী মনে করে আমাকে শাস্তি দিতে চাও, তবে তো আমি সত্যকেই মাথা পেতে নেবো। এতে আমার কোনো সমস্যা নেই। আর যদি বাতিলপন্থী হয়ে থাকো, তবে বাতিলের কাছে মাথা ঝুঁকানো মুমিনের স্বভাব নয়।'

রবর্তী সময়ে এক ইখওয়ান কর্মকর্তা বলেন, 'আমি সেই সময়টাতে সাইয়্যেদ কুতুবের পাশে ছিলাম। আমি তাঁকে বললাম, "আদালতে জিজ্ঞাসাবাদের সময় তো আপনি কৌশল গ্রহণ করে, নমনীয়তা দেখিয়ে বাঁচতে পারতেন।" তখন সাইয়্যেদ কুতুব বলেছিলেন, "বাতিলের সামনে নমনীয় হওয়াকে আমি জায়েজ মনে করি না। তাছাড়া একজন নেতার জন্য এমন ঘৃণ্য পথ অবলম্বন করা মোটেই উচিত নয়।" ফাঁসির সংবাদ যখন তিনি শুনেছিলেন, বলেছিলেন, "আলহামদুলিল্লাহ, গত ১৫ বছর আমি অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করেছি এই শাহাদাতের মর্যাদা অর্জনের জন্য।"'

এটা এক শাশ্বত সত্য যে, সাইয়্যেদ কুতুব রহমতুল্লাহি আলায়হি বাতিলের সামনে যে দৃঢ়তা ও অবিচলতা প্রদর্শন করেছিলেন তা কোনো সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব ছিল না। যুগের অসাধারণ মানুষেরাই কেবল এমন দৃঢ়তা দেখাতে পারেন। তাই তো সাইয়্যেদ কুতুবের এই দৃঢ়তা যারা উম্মাহর জন্য কিছু করতে চায়, তাদের জন্য প্রেরণার বাতিঘর হয়ে আছে কালান্তরে।

ঐতিহাসিকরা লিখেন, সাইয়্যেদ কুতুবের ফাঁসির দণ্ড কার্যকর করার প্রাক্কালে আজহারের এক শায়েখ আসেন সাইয়্যেদ কুতুবকে তওবা করিয়ে কালিমা পড়াতে। তিনি সাইয়্যেদ কুতুবকে বললেন, 'কালিমা পড়ুন।' সাইয়্যেদ কুতুব মুচকি হেসে বললেন, 'ভাই আমার! তুমি যে কালিমা দিয়ে উদরপূর্তি করো, রুটিরুজির ইনতেজাম করো, আমরা তো সেই কালিমা প্রতিষ্ঠা করার জন্যই জীবন দিচ্ছি। আর তুমি এসেছো আমাদের ঈমান পূর্ণ করতে?'

অবশেষে ১৩ জুমাদাল উলা ১৩৮৬ হিজরি মোতাবেক ১৯৬৬ সালের ২৯ আগস্ট মহাকালের ইতিহাসের এই ধ্রুবতারা অস্তমিত হয়। শাহাদাতের সৌভাগ্য লাভ করেন উম্মাহর ইতিহাসে বরিত বাতিলের সঙ্গে আপোষহীন এই মহান বীর-শার্দুল। উম্মাহর জন্য রেখে যান এক উত্তম আদর্শ। বাতিলের সামনে মাথা না ঝুঁকানোর দুর্দান্ত দৃষ্টান্ত।

সার্বিক বিচারে বলতে গেলে, উম্মাহর গঠন, চেতনা, প্রেরণা ও বিপ্লবের নীতি প্রণয়নে সাইয়্যেদ কুতুব শহিদ রেখে গেছেন অনন্য ও অসাধারণ কিছু রচনাবলি। বাস্তবতা হচ্ছে, তাঁর প্রতিটি গ্রন্থই মনস্তত্ত্ব, বিষয়ের গভীরতা ও সুদূরপ্রসারী চিন্তার দিক থেকে অতুলনীয়। তিনি তাঁর প্রত্যেকটা রচনা দিয়েই উম্মাহর নির্লিপ্ততাকে দূর করতে চেয়েছেন। দিতে চেয়েছেন নির্জীব চেতনাকে সজীবতা। যা থেকে পরবর্তী কালে বাস্তবিকপক্ষেই উপকৃত হয়েছেন দাওয়াতের সব অঙ্গনের ব্যক্তিরা। প্রেরণা লাভ করেছে মুসলিম উম্মাহ যুগ-যুগান্তরে।

ঐতিহাসিকরা সাইয়্যেদ কুতুবের সাহিত্য ও ইসলামি দর্শন নিয়ে লেখালেখির সময়কে দুই ভাগে ভাগ করে থাকেন। প্রথম ভাগের সময়টা ছিল যখন সাইয়্যেদ কুতুব দারুল উলুমের শিক্ষানবিশ ছিলেন। তখন মিসরের খ্যাতনামা সাহিত্যিক আহমাদ হোসাইন জাইয়্যাত সম্পাদিত মাজাল্লাতুর রিসালায় সাইয়্যেদ কুতুবের লেখা ছাপা হতো। ১৯৪৬ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর শৈশব-কেন্দ্রিক আত্মজীবনীগ্রন্থ 'তিফলুম মিনাল কারইয়াহ'। আর তারপরই তিনি রচনা করেন, 'আন-নাকদুল আদাবি : উসুলুহু ওয়া মানাহিজুহু'। আর তাঁর ইসলামি জীবনব্যবস্থা, বিপ্লব এবং রাজনৈতিক বিষয়ের ওপর যতো রচনা সব প্রকাশিত হয়েছিল দ্বিতীয় ভাগে। 'তাফসির ফি জিলালিল কুরআন', 'মাআলিম ফিত তারিক', 'খাসাইসুত তাসাউরিল ইসলামি', 'আল-মুসতাকবিল লি হাজাদ দীন'–এসব সাইয়্যেদ কুতুবের সবচেয়ে মূল্যবান রচনা এবং বিখ্যাত গ্রন্থ। যা আজও সবার কাছে সমাদৃত।

সাইয়্যেদ কুতুব শহিদ রহমতুল্লাহি আলায়হি ছিলেন অত্যন্ত দূরদর্শী। অনুভব ও অনুভূতি ছিল তাঁর সূক্ষ্ম। তাঁর সবকিছুতেই ছিল গভীরতার ছাপ। আবেগকে ছাপিয়ে বিবেককে প্রাধান্য দেয়ার শক্তি তাঁর মধ্যে খুব ভালোভাবেই ছিল। অন্তর্দৃষ্টিও ছিল প্রখর। যার গভীরতা ও প্রখরতা তাঁর বিভিন্ন সময়ে লেখা প্রবন্ধ ও গ্রন্থ থেকে খুব সহজেই অনুমিত হয়। তাঁর অনুভবের পর্দায় ভেসে ওঠা কিছু কথা দিয়েই ইতি টানছি...

এক জায়গায় তিনি খুব চমৎকারভাবে নিজের অনুভূতির কথা লিখেছেন এভাবে–'যখন আমরা নিজেদের জীবনকে আত্মকেন্দ্রিক করে ফেলি, তখন এই জীবন আমাদের কাছে খুব তুচ্ছ ও নগণ্য হয়ে ধরা দেয়। যেন মৃত্যুর আভাস দিয়ে তার সূচনা আর নির্ধারিত একটা সময়ের পর তার সমাপ্তি। কিন্তু যখন আমরা জীবনকে ধারণ করি অন্যের জন্য, অর্থাৎ আমাদের জীবন যাপিত হয় একটা বিশেষ মিশন ও মহান চিন্তাধারার বাস্তবায়নে, তখন এই তুচ্ছ জীবনই আমাদের কাছে উদ্ভাসিত হয় ব্যাপ্তি ও গভীরতার সঙ্গে। তখন মনে হয়, এই জীবনের সূচনাও মানবজীবনের সূচনালগ্ন থেকে। আর পার্থিব জীবন থেকে আমাদের

বিদায়ের পর তা আরও ব্যাপ্তি পেতে থাকে। প্রসারিত হতে থাকে। আর সে অবস্থার সবচেয়ে উপকারের দিকটা হচ্ছে–আমরা আমাদের একাকী জীবনের অর্জনের চেয়েও দ্বিগুণ কিছু পেয়ে যাই। আর এই অর্জন কোনো দিবাস্বপ্ন নয়। এক অনস্বীকার্য বাস্তবতা।'

আরেক জায়গায় নিজের আত্মোপলব্ধির কথা তিনি এভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন–'আমার অভিজ্ঞতা থেকে যতটুকু উপলব্ধি করতে পেরেছি, সেই আত্মিক নির্মল প্রশান্তির মতো অন্যকিছুই হতে পারে না, যা আমরা লাভ করে থাকি অন্যকে সান্ত্বনা দিয়ে, সন্তুষ্ট করে, অন্যের বিশ্বস্ততা অর্জন করে, অন্য কারো মধ্যে আশার আলো জ্বালিয়ে এবং অন্যকে প্রফুল্ল করে।'

হৃদয়ের গভীর থেকে উৎসারিত কথাটাই তিনি এমন সহজভাবে লিখতেন–'যখন আমরা মানুষের আত্মার চমৎকার দিকটা অনুভব করতে পারি, তখন নিজেদের অজান্তেই আমাদের মনে হতে থাকে–তার মধ্যে বিপুল কল্যাণ প্রোথিত আছে, যা হয়তো প্রথমবারের দেখায় অনুভব করা যায়নি।'

আত্মতৃপ্তি প্রসঙ্গে তিনি এক জায়গায় লিখেন–'অনেক সময় আমরা মানুষদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাই, কারণ আমরা নিজেদের চারপাশে আত্মতৃপ্তির একটা অদৃশ্য প্রাচীর তৈরি করে ফেলেছি, ফলে মনে হয়, আমি তো আত্মিকভাবে তাদের চেয়ে অধিক পবিত্র। অন্তরের দিক থেকে অনেক উত্তম। ব্যক্তিগত দিক থেকে অতি উদার। কিন্তু তিক্ত বাস্তবতা হচ্ছে, পরবর্তী সময়ে আমরা আমাদের দাবিমতে বড় কিছু করতে পারি না। আফসোস, আত্মতৃপ্তি কেবল আমাদের ক্ষতিই করল, আমাদের সীমাবদ্ধতায় ফেলে দিলো।

লেখক : তালিবুল ইলম ও নবীন অনুবাদক



আরমুগানে হেজাজ
ওমরার অসমাপ্ত সফরনামা

ইফতেখার জামীল

আল্লামা ইকবাল কখনো হেজাজ সফর করেননি। তবুও হেজাজের প্রতি তাঁর টান ছিল অনেক। তিনি তাঁর কবিতায় হেজাজের প্রতি ভালোবাসা ও বেদনার কথা বলেছেন। মক্কা-মদিনার রাস্তায় ঘুরেছেন কল্পনায়। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে কথা বলেছেন; ভারতবর্ষের সংকট ও স্বপ্নের যে কক্ষপথের তিনি অভিযাত্রী ছিলেন, বিনয়াবনত অভিযোগ ও ক্লান্তির সুরে সে-আলাপ করেছেন নবিজির সঙ্গে। এই অভ্যাস ইকবালের একার নয়, ফার্সি ও উর্দু ভাষার অনেক কবি এমন অলৌকিক আলাপচারিতায় মেতেছেন। যিনি সাইয়েদুল কাওনাইন ও রাহমাতুল্লিল আলামিন, তাঁর সঙ্গে তো বলার আছে অনেক কিছুই। আছে আক্ষেপ, জমাটবাঁধা অভিমান। ভালোবাসা যখন গভীর হয়, ভক্তির উচ্চতা থেকেও সম্পর্ক তখন হয়ে ওঠে ব্যক্তিগত।

ইকবালের জীবন নানারকম ব্যস্ততা ও অসুস্থতায় কেটেছে। গুছিয়ে হেজাজ সফরের ফুরসত হয়ে ওঠেনি। শেষজীবনে তিনি হেজাজ সফরের জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। একটা কাব্যগ্রন্থ লেখাও শুরু করেন। তাঁর ইচ্ছে ছিল হেজাজ সফরে উপঢৌকন হিসেবে কাব্যগ্রন্থটি নিয়ে যাবেন, ভালোবাসার দাবি ও নিবেদন হিসেবে পেশ করবেন হাবিবের দরবারে-দরজায়। গ্রন্থটির নাম দিয়েছেন আরমুগানে হেজাজ, হেজাজের হাদিয়া। তবে দুঃখজনকভাবে ইকবালের হেজাজে সফর করা হয়ে ওঠেনি। সবকিছু গোছানোর পূর্বেই তিনি মাওলায়ে মেহেরবানের দরবারে তাঁকে হাজিরা দিতে হয়েছে।

ইকবালের জীবনের এই বেদনা আমাকে নানাভাবে নাড়া দিত। মনে হতো, জীবনের অনেকটা তো চলে গেল, যাঁকে ঘিরে এতকিছু; কালিমায়ে শাহাদাত থেকে শুরু করে নামাজ ও জিহাদ, যাঁর কথা কুতুবে সিত্তায় জেনেছি ঘনিষ্ঠভাবে, তাঁর চিন্তা, যাপন ও সংগ্রাম, খাদিজার প্রতি তাঁর মহব্বত, আয়েশার সঙ্গে কাটানো একান্ত মুহূর্ত থেকে জিহাদ ও মুজাহাদা; তাঁর অস্থিরতা, কান্না, হাসি ও উদ্বেগ—এসব কিছু কত ঘনিষ্ঠভাবে জেনেছি, মুস্তফায়ে রাব্বিল আলামিন, তাঁর আবাসস্থলে না গিয়ে আমিও তো অগুনতি মানুষের মতো পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে পারি। তারচেয়ে বরং সব আগোছালোভাবে ওঠানো থাকুক, একটা ছোট সফরে হেজাজ থেকে ঘুরে আসি। মনে হলো, ইকবালের মতো কৈশোর ও যৌবনে আমারও আছে নানারকম স্মৃতি ও অভিজ্ঞতা, বেদনা ও অভিমান, আমার একান্ত আরমুগানে হেজাজ।

দুই

ইসলামি ইতিহাসে দূর দেশ থেকে ওমরার জন্য হেজাজে সফর করা অতটা ব্যাপক ছিল না। হজ ছাড়া হেজাজ সফরের ছিল নির্দিষ্ট অর্থ। পড়াশোনার প্রাথমিক পর্ব শেষ করে তালিবে ইলমরা বের হতেন রিহলায়, ইলমি সফরে। মুসলিম বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে। ইলমি মাদারেস, দীনি মারাকেজ ও সুফিদের খানকায় বিরতি দিতেন। পথে থাকত মেহমানখানা। মুসলমানরা তালিবে ইলমদের গুরুত্ব বুঝতেন। করতেন যথাযথ সমাদর। তালিবে ইলমরা রিহলায় কালের প্রখ্যাত শায়েখদের হালকা ও দরসে হাজির হতেন। সনদ সংগ্রহ করতেন। এবং সবশেষে হেজাজে আসতেন এবং কিছুদিন থাকতেন। মক্কা ও মদিনা সর্বদাই ছিল ইলম ও ইবাদতের মারকাজ। সারা বিশ্ব থেকে রিহলায় বের হওয়া তালিবে ইলমদের জমায়েত হতো। তাঁরা মুজাকারা, মুনাকাশা ও তাকরার করতেন। চিন্তা ও অভিজ্ঞতা বিনিময় করতেন এবং তারপর খেদমতের জন্য স্বদেশে ফিরে আসতেন। স্বদেশের রাজনৈতিক অবস্থা প্রতিকূল হলে অবস্থানের মেয়াদ বাড়ত। বাড়ত অভিজ্ঞতা। আমরা আজকাল যেভাবে সংকলিত জ্ঞানভাণ্ডার পাই, একসময় মোটেই এমন ছিল না। ছিল হালকা ও রিহলার সমষ্টি। প্রতিটা হাদিসের সনদ ও ফিকহের কওল সংগ্রহের জন্য সফর করতে হতো। হাদিস ও ফিকহের কিতাবের পেছনে তাই লুকিয়ে আছে এমন শত শত হালকা ও রিহলাহ।

তালিবে ইলমরা শায়েখদের দরসে লিপিবদ্ধ করতেন ইলম। এভাবেই একসময় ইসলামি জ্ঞানব্যবস্থা সংকলিত রূপ পায়। শুরুতে

অনেক আলেম এর বিরোধিতা করে বলেছিলেন, 'ছাত্ররা তো অলস হয়ে যাবে, প্রত্যক্ষ বোঝাবুঝি হাসেল হবে না, কপিতে হবে অনেক সংযোজন ও বিয়োজন। ভুল বোঝাবুঝি।' তবে ব্যাপকভাবে সংকলন শুরু হলেও রিহলাহ ও হালকা ছিল চলমান। খোদ উপমহাদেশে ইলমি ও রাজনৈতিক ধারার বিকাশে এই রিহলার ভূমিকা ছিল অনেক। শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভি হেজাজ সফর থেকে ফিরে উপমহাদেশে ব্যাপকভাবে সুনান ও ফিকহের সিলসিলার চর্চা শুরু করেন। তিতুমীর ও হাজী শরীয়তুল্লাহও হেজাজ সফর থেকে নিয়ে আসেন আন্দোলনের স্পিরিট। এভাবে উপমহাদেশের ইলমি ও রাজনৈতিক ধারার বিকাশে রিহলার ভূমিকা অপরিসীম। তবে উপনিবেশ ও আধুনিক জাতিরাষ্ট্রের সীমান্তনীতিতে কাটা পড়ে যায় এই ইলমি ব্যবস্থা। ইসলামি ইতিহাসে এই প্রথম ইলম চর্চা দেশের গণ্ডির ভেতরে আটকে পড়ে। মানুষের চিন্তা হয়ে ওঠে জাতীয়তাবাদী। আন্তর্জাতিক হালকা ও রিহলাহ অনেক সীমিত হয়ে যায়। মানুষ এখনো বিদেশে পড়াশোনার জন্য যায়, হজ ও ওমরার সফরে যায় অগণিত মানুষ, তবে ঐতিহাসিক অর্থে রিহলাহ করার সুযোগ কারও হয়ে ওঠে না।

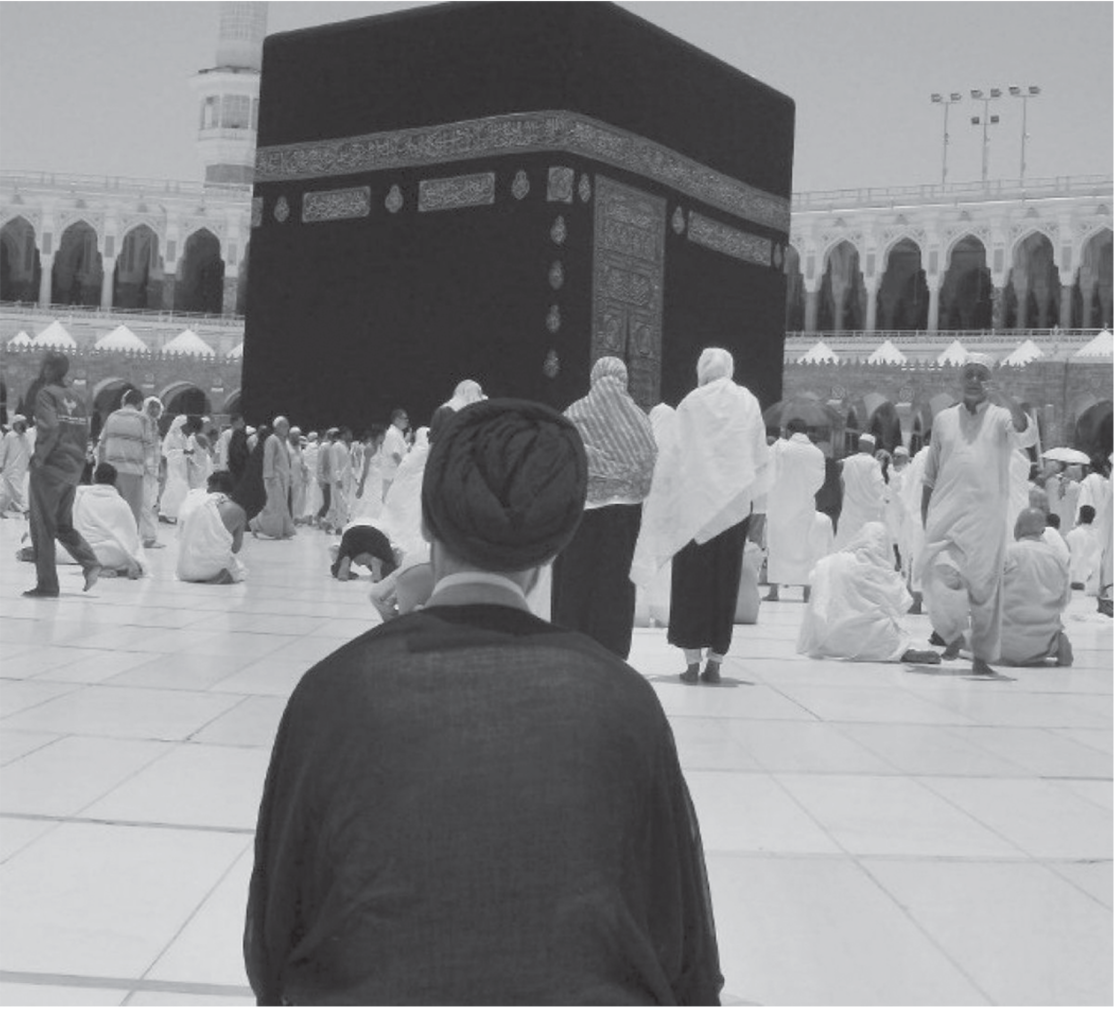
তিন

ওমরার সফরে যাওয়ার আগে এর মাকাসেদ নিয়ে কিছু পড়াশোনা করার চেষ্টা করেছি। ইমাম গাজালি ইহইয়াউ উলুমিদ দীনের মধ্যে হজ ও জিয়ারতের মাকাসেদ বর্ণনা করার চেষ্টা করেছেন। শাহ ওয়ালিউল্লাহ হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা'র মধ্যেও গুছিয়ে আলোচনা করেছেন। আল-আরকানুল আরবাআহ গ্রন্থে এর সমষ্টি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন আবুল হাসান আলি নদভি। প্রায় পঞ্চাশ পৃষ্ঠার দীর্ঘ আলোচনা। মূলত হজ ও জিয়ারত বিষয়ে একটা মৌলিক প্রশ্ন আছে। ইসলামের মৌলিক আকিদা হচ্ছে, আল্লাহর ইবাদতের জন্য কোনো মাধ্যম ও অবলম্বনের দরকার নেই। পৃথিবীর সমস্ত ভূমি ইবাদতের জন্য সমানভাবে প্রস্তুত। ইবাদত পেশ করার জন্য কোনো পুরোহিত বা পাদ্রীর দরকার নেই। বরং কোরআন ও হাদিসে এই এই মাধ্যম-ব্যবস্থার নিন্দা জানানো হয়েছে। কেননা পর্যায়ক্রমে এভাবে শেরেকির প্রসার ঘটে। ধর্মের নামে গড়ে ওঠে ক্ষমতাকাঠামো ও ব্যক্তিপূজা। সম্মানের শিরোনামে গড়ে ওঠে বস্তুবাদী প্রাতিষ্ঠানিকতা, পুরোহিত ও মাজারের ব্যবসা। সুরা জুমারের শুরুতে আল্লাহ এই মাধ্যম-ব্যবস্থাকে জুলফা হিসেবে উল্লেখ করে একে খালেস তওহিদের প্রতিবন্ধক হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

এই মাধ্যম-ব্যবস্থার নিন্দা জানালেও ইসলাম মানুষের আত্মিক প্রয়োজন ও আধ্যাত্মিকতাকে অস্বীকার করে না। আত্মিক ভালোবাসা অবলম্বন ও প্রাসঙ্গিকতা চায়; স্থান, আকার বা চিহ্ন চায়। এখান থেকেই ইসলামে শাআয়ের ও মাশায়ের ধারণার জন্ম হয়েছে। অর্থাৎ যদিও মূলগতভাবে ইসলাম মাধ্যম-ব্যবস্থার বিরোধী, তবে মানবিক আবেগের অবলম্বন হিসেবে কিছু কাঠামো ও স্থান নির্ধারণ করা হয়েছে, যেখানে বান্দারা আবেগের প্রাসঙ্গিকতায় ইসলাম ও ইসলামের ইতিহাসের সঙ্গে সংযুক্ত হতে পারবে।

হেজাজে অনেক নবির স্মৃতিচিহ্ন আছে। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম থেকেও ঐতিহাসিক স্থানে স্মৃতিচারণের প্রমাণ পাওয়া যায়। নবিজি ওয়াদিয়ে আজরাতে মুসা আলায়হিস সালাম ও হারশায় ইউনুস আলায়হিস সালামের স্মৃতি স্মরণ করেছেন। পাশাপাশি কাবা ঘরের আশপাশও ইবরাহিমি স্মৃতিতে পরিপূর্ণ। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম যদিও স্বতন্ত্র শরিয়ত নিয়ে এসেছেন, তবে এই শরিয়ত মিল্লাতে ইবরাহিমের ধারাবাহিকতা। মিল্লাতে ইবরাহিমের সাথে সম্পর্কযুক্তিও ওমরা-জিয়ারতের মৌলিক লক্ষ্য।

হজ ও ওমরায় পৃথিবীর নানাপ্রান্ত থেকে আসেন নিযুত মানুষ। সাথে নিয়ে আসেন আঞ্চলিক সংকট, সম্ভাবনা ও অভিজ্ঞতা। পারস্পরিক মতবিনিময় ঘটে। যদিও আধুনিক রাষ্ট্রের কাঁটাতারে কাটা পড়েছে উম্মাহর শরীর ও সম্পর্ক। উম্মাহর কোনো অঞ্চল আক্রান্ত হলে এখন আর আরেক অঞ্চলে প্রতিবাদ দানা বাঁধে



না। সবাই ব্যস্ত একান্ত জাতীয়তাবাদী স্বার্থে। নাগরিক কল্যাণের সীমিত আয়তনে। হজ ও ওমরার মিলনায়তনে উম্মাহের বোধ জাগ্রত হয়। সাদা, কালো, বাদামি ও তামাটে মানুষ, আফ্রিকার নিগ্রো থেকে সোনালি চুলের শ্বেতাঙ্গ নারী–অনেকেই আরবিতে কথা বলছে, কান পাতলেই শুনবেন হিন্দি-উর্দু; বাংলাদেশিও পাবেন, পাবেন ফ্রেঞ্চ ও আফ্রিকান অজানা ভাষা। সব যেন জমায়েত হয়েছে একবিন্দুতে–মিল্লাতা ইবরাহিমা হানিফা! আমরা সাধারণত যেসব ইবাদত করি, তার স্থায়িত্ব সীমিত। সীমিত সময়ে নামাজ শেষ করা যায়। রোজা ও জাকাত আদায় করার সময়েও যাপিত জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হতে হয় না। ফলে আমাদের স্বাভাবিক লিপ্ততায় অনেক ক্ষেত্রে ইবাদত প্রভাব বিস্তার করতে পারে না; দুনিয়াদারির ব্যস্ততায় ঢেকে যায় ইবাদতের আসর। হজ ও ওমরার মধ্যে এটা সম্ভব নয়। এতে জীবনের নির্লিপ্ত লিপ্ততা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ইহরামের কাপড়সহ আল্লাহর দিকে মুতাওয়াজ্জেহ হতে হয়। একটা দীর্ঘ সময় ইবাদতের জন্য ওয়াকফ করতে হয়। ফলে, আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, একটা আবেশ তৈরি হয়। সবাই এক কাপড়ে–ধনী-গরিব-জাতপাত-বংশে কোনো পার্থক্য নেই। কারও কোনো শিক্ষা বা সামাজিক মর্যাদাগত প্রাধান্য নেই। সবাই একসুরে বলতে থাকে–লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক!

চার

আমাদের ফ্লাইট ছিল মার্চের ২৫ তারিখ

বিকেলে। সফর ২২ দিনের, আসা-যাওয়ায় আরও দুইদিন–মোট ২৪ দিন। প্রথমে মক্কায় যাবো, সেখানে ১১ দিন থেকে মদিনায় বাকি ১১ দিন। বাসা থেকে বের হবার আগে আব্বু দোয়া করলেন। বিদেশ সফরের আগে দোয়া করা আমাদের পারিবারিক সংস্কৃতির অংশ। অন্যসময় বিদায় জানাতে গিয়ে আম্মু অঝোরে কেঁদে ফেলেন। এবার সেই প্রাসঙ্গিকতা ছিল না। সপরিবারে যাচ্ছি, তাই আমাদেরকে পারিবারিক বিদায় জানানোর কেউ নেই। আমি ইহরাম পরে উবার ডাকলাম। রাস্তায় বের হয়ে দেখি, সবাই একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। কেউ কেউ হাত মেলানোর চেষ্টা করছে। পুরান ঢাকার লালবাগে কেটেছে আমার শৈশব ও কৈশোর। যেতে যেতে ভাবলাম, যদি আর না ফিরি, যদি দুর্ঘটনায় পড়ি, তাহলে তো আর আরিফের চটপটি খেতে পারব না, শাহী জুস বা রয়েলের গ্রিল থেকে শুরু করে সেলিম মামার বট–অনেক কিছুই মিস করবো। ভাবতে ভাবতে বিমানবন্দরে পৌঁছুলাম। আমার এই প্রথম বিদেশ সফর। ইমিগ্রেশন সহজেই শেষ হলো। বিমানে উঠে মানচিত্রে দেখলাম অনেক দূরের সফর। আমার মনে হলো, আমি এই প্রথম পৃথিবীর সঙ্গে সংযুক্ত হচ্ছি। গোলাকার পৃথিবীর প্রায় অর্ধেকটা পথ অতিক্রম করছি। পৌঁছুলাম রাত ১০টার দিকে। সৌদি ইমিগ্রেশনের তরুণ আমার দিকে তাকাতেই আমি আরবিতে উত্তর দিলাম। তরুণ কাজ করতে করতে আমার সঙ্গে আলাপ জমাল। সে আঞ্চলিক আরবিতে কথা বলে। আমি অর্ধেক বুঝি তো বাকি অর্ধেক থাকে অস্পষ্ট। তবু কথা চালিয়ে নেওয়া যায়। মনে হলো, ভাষা অনেক শক্তিশালী মাধ্যম। ভাষা ছাড়া সংযুক্ত হওয়া অনেক কঠিন। বিমানবন্দর থেকে বের হবার আগেই সিম কোম্পানির লোকেরা জোর করে সিম ধরিয়ে দিল। বের হবার মুখে কারপার্কিংয়ে গিয়ে জানলাম কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। আধা ঘণ্টার মধ্যে বাস আসলো। আমরা মক্কার পথে রওনা দিলাম। হাইওয়ে রোড আলোকিত হলেও চারদিকে জমাট অন্ধকার। আমি জানালা দিয়ে চারদিক দেখার চেষ্টা করলাম। চারদিকে মরুভূমি। পাথুরে চরাচর। বড় বড় পাহাড়। জনবসতি নেই বললেই চলে। ভাবছিলাম, এই পথে কি কখনো কোন সাহাবি এসেছিলেন? এই পথের বয়স কত জানি না। গুগল করলে হয়তো জানা যেত।

মক্কায় পৌঁছুলাম একটার দিকে। প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে। আম্মু কড়াভাবে নির্দেশ দিলেন, আগে খেতে হবে। খাবার কিনতে বের হয়ে ভাবছিলাম, কী কেনা যায়, শুনেছি বাংলা খাবার নাকি পাওয়া যায়। এই মধ্যরাতে পাওয়া তো মুশকিল। একটু সামনে গিয়ে আরবিতে জিজ্ঞাসা করলাম, 'বাঙালি হোটেল আছে আশপাশে?' ভদ্রলোক আমাকে নোয়াখালীর ভাষায় বললেন, 'আঁর সাথে বাংলায় কন।'

হোটেলে গিয়ে আমি অবাক, এত রাতেও তাদের সব আয়োজন প্রস্তুত। মাছ-মাংস সবকিছুই আছে। রুই মাছ, ভর্তা ও ডাল দিয়ে মোটামুটি ভালোমাত্রায় খাওয়া হয়ে গেল। এবার ওমরার আনুষ্ঠানিকতা শেষ করতে হবে।

পাঁচ

আমরা বাঙালি পাড়ায় উঠেছিলাম। মিসফালায়। মক্কার কবুতর চত্বর থেকে দুটি পথ চলে গেছে সমান্তরালে। বামেরটার নাম শারেউল হিজরাহ। এই পথ ধরে মিনিট দুয়েক হাঁটলেই আমাদের হোটেল। আশেপাশের সবাই প্রায় বাঙালি। হোটেল, দোকান বা খাবারের দোকান, সবখানেই বাংলায় কথাবার্তা চলছে। শারেউল হিজরায় গাদাগাদি করে দালান উঠেছে। চক্রের মতো জড়িয়ে আছে অনেক গলি। আমার কাছে মাঝেমাঝে একে পুরান ঢাকার অংশ বলে ভ্রম হয়েছে। সে যাই হোক। খাবার পর্ব শেষ। কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে ফজরের পরপর সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করলাম। এবার ওমরার উদ্দেশ্যে বের হবো। অনেক দিন থেকে কাবার যে ছবি মনে এঁকে রেখেছি, তার সাথে মিলিয়ে দেখবো বাস্তবের রূপ ও রূপকল্প। পথে পড়ল কবুতর চত্বর। মক্কা ওয়াচখ্যাত জমজম টাওয়ারের সামনের বিশাল প্রাঙ্গণে উড়ছে হাজারও কবুতর, এই প্রাঙ্গণকেই কবুতর চত্বর বলে। হারামের

এরিয়ায় বলে কেউ কবুতরগুলোর কোনো ক্ষতি করে না। এই কবুতর প্রাঙ্গণ যেন মক্কার ঐতিহ্যের অংশ। কবুতরকে বলা হয় শান্তির প্রতীক, মনে হচ্ছিল শান্তির বাতাস গায়ে মেখে আমরা হাঁটছি বাইতুল্লাহর উদ্দেশে। আমি আগে কখনও ওমরা করতে আসিনি। কোন পথ ধরে যাবো বুঝতে পারছি না। জমজম টাওয়ারের বাম পাশের পথ ধরে এগুলাম। হোটেল থেকে তিন-চার মিনিট হাঁটতেই বাইতুল্লাহর চত্বরে পৌঁছুলাম। বাইতুল্লাহর চত্বর অনেক বিশাল, একে কোনো ছবিতে ধরা যায় না, এই বিশালতার চারদিকে মার্বেল পাথরে বাঁধানো সুদৃশ্য প্রাঙ্গণ। ঠাণ্ডা বাতাস। সূর্যের আলো উঁকি মারা শুরু করেছে। আমার কাছে মনে হলো আমি পবিত্রতম কোনো জায়গায় ঢুকে পড়লাম। কয়েক মিনিট হাঁটতেই কাবা চত্বরে পৌঁছুলাম। বহুল আকাঙ্ক্ষি সেই স্থান, আমার চোখে হাদিসের বিবৃত ঘটনাগুলো ভাসছিল। এখানেই তো ছিলেন হজরত ফাতেমা ও তাঁর বাবা, তাঁদের ঘিরে কাফেরদের বিদ্রুপ। প্রথম কাবা দর্শনে দোয়া কবুলের ওয়াদা আছে। আমি সাধ্যমতো দোয়া করলাম। আমার বোন কান্না শুরু করল। আমি স্বপ্নের কাবা ঘরকে দেখে দোয়া ভুলে যাচ্ছিলাম। তাওয়াফ করা শুরু করলাম। সকালবেলা বলে অতটা ভিড় নেই। তাওয়াফে হাঁটছি আমিসহ পরিবারের তিনজন, সাথে হাঁটছে অযুত মানুষ, একেকজন একেক দেশের, একেক বর্ণ ও ভাষার, কেউ অনেক লম্বা, কেউ-বা বেটে, কেউ আমাদের মতো মাঝারি আকারের, আমার কাছে মনে হচ্ছিল, আমি হয়তো এই প্রথম বৃহত্তর উম্মাহের সাথে সংযুক্ত হলাম। কাবা ঘরের থেকে কিছুটা দূর দিয়ে তাওয়াফ শেষ করলাম। কাবা ঘরের যত কাছে যাবেন, আনুপাতিকভাবে তত ভিড় বাড়বে, আবার বেশি দূরে গেলে চক্রাকারে ঘুরতে হয় বলে বাড়বে আনুপাতিক দূরত্ব। মাকামে ইবরাহিমকে ঘিরে কিছু মানুষের জটলা দেখলাম। কেউ চুমু দিচ্ছে, কেউ জড়িয়ে ধরে রেখেছে, নির্ধারিত নিরাপত্তা সদস্য বলছেন, এগুলো বিদআত। কিন্তু কে শুনে কার কথা। তাওয়াফের নামাজ পড়ে সাই'র উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। পথে জমজমের পানি খেলাম। সাই মানে সাফা থেকে মারওয়ার উদ্দেশ্যে হাঁটা। যেভাবে হেঁটেছেন ইসমাইল আলায়হি সালামের মা। এখন সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের কিছুই অবশিষ্ট নেই, এগুলোকে ঘিরে গড়ে উঠেছে কয়েক তলাব্যাপী স্থাপত্য। তবে দুই প্রান্তে দুই পাহাড়ের কিছু নিদর্শন রেখে দেওয়া হয়েছে। ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে ওমরার সব কাজ সম্পন্ন করে হোটেলে ফিরলাম।

ছয়

যেহেতু এটি ধর্মীয় সফর, তাই যথাসম্ভব অধিকাংশ সময় মসজিদেই কাটাতাম। তিলাওয়াত করতাম, কিতাব পড়তাম বা জিকির-দোয়া করতাম। ক্লান্তি লাগলে এমনিতেই চোখ বন্ধ করে বসে থাকতাম। মনে অদ্ভুত রকমের শান্তি এসে ভর করত। মক্কায় প্রতিবছর কোটি কোটি মানুষ আসেন। চারদিকে মুসাফিরদের জন্য ব্যবস্থাপনা। বাইতুল্লাহকে ঘিরে যে সংস্কৃতি বিকশিত হয়েছে, সেখানে সৌদির নাগরিক সমাজের খুব একটা বসবাস নেই। ফলে বাইতুল্লাহকে কেন্দ্র যে সংস্কৃতি ও চর্চা গড়ে উঠেছে, তাতে আরবদের প্রভাব কম। যেহেতু ভারতবর্ষ থেকে প্রচুর মানুষ আসে, তাই সেখানে ভারতবর্ষের প্রভাব অনেক বেশি। ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানগুলোতেও উপমহাদেশের নিয়ন্ত্রণ বেশি। তবে তার মধ্যে একটা আরবের মিশ্রণ আছে, সবাই একটা বিকৃত কথ্য আরবিতে কথা বলে, তাতে কিছু ইংরেজি ও উর্দু শব্দও ঢুকে গেছে।

বাইতুল্লায় ঢুকলে মনে অদ্ভুত শান্তি আসলেও আশপাশের পরিবেশ ও প্রতিবেশে সবকিছু অপরিচিত লাগে। বাইতুল্লাহ বাদে আশপাশের ঐতিহাসিক স্থাপত্যগুলো বিদআত চর্চার অজুহাতে গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তার বদলে চারপাশে নির্মিত হয়েছে পশ্চিমা স্টাইলে বহুতল ভবন। এতে জীবনযাপনের মান অনেক উন্নত হয়েছে, তবে হারিয়ে গেছে স্মৃতি ও ইতিহাস। বাইতুল্লাহতেও হয়েছে অনেক সংস্কার ও সম্প্রসারণ। যদিও আশপাশের অনেক স্থাপত্যকলায় মুসলিম



ঐতিহ্যের প্রতি লক্ষ রাখা হয়েছে, তারপরও এতে তো ঐতিহাসিক স্থাপত্যের উপস্থিতি ফিরিয়ে আনা যায় না। বাইতুল্লাহ থেকে বের হলেই মনে হয় আপনি বুঝি কোনো শপিং অঞ্চলে চলে এসেছেন। বাইতুল্লাহর পাশেই কেএফসি। বিশাল বিশাল শপিং মল। একে কে কীভাবে দেখবেন জানি না, তবে ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছে এই পরিবেশে বেশ অস্বস্তি লেগেছে।

মক্কা পাথুরে শহর। চারদিকে বড় বড় পাহাড়। একটু হাঁটলেই কোনো পাহাড়ি পথে উঠে যাবেন। ঘরবাড়ি সেভাবেই নির্মিত হয়। ফলে বাংলাদেশে যেমন সবকিছু সমান্তরাল, মক্কায় এমন সমান্তরাল নয়, চারদিকে উঁচুনীচু বাড়ি। একটু দূরে তাকালেই দেখবেন, পাহাড়ের ওই উঁচুতে উঠে আছে জনপদ। মক্কার অবকাঠামো অত্যন্ত গোছানো ও শক্তিশালী। এই যে নিযুত মানুষের ভিড়, তবুও অবকাঠামো ও ব্যবস্থাপনার কল্যাণে অনেক সহজেই চলাফেরা করা যায়। বাইতুল্লাহর ভেতরের ব্যবস্থাপনাও অনেক গোছানো। জায়গায় জায়গায় জমজম পানের সুব্যবস্থাপনা। বিপুল সংখ্যক ব্যবস্থাপনা ও পরিচ্ছন্নতাকর্মী নিয়মিত কাজ করে যাচ্ছেন। চারদিক ঝকঝকে পরিষ্কার। যদিও ঐতিহাসিক স্থাপত্য মোচনের অভিযোগ থেকে যায়, তবুও সৌদির অবকাঠামো ও ব্যবস্থাপনার প্রশংসা করতেই হবে।

সাত

মসজিদে হারামের আছে নিজস্ব সংস্কৃতি। মসজিদে হারাম শুধু ইবাদতের জায়গা নয়, শিক্ষা, চর্চা ও আলাপেরও জায়গা। মসজিদপ্রশাসনের নিয়ন্ত্রণে এখানে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আছে, যাকে মা'হাদ বলে। অনেক হালকায় পড়াশোনায় লিপ্ত থাকেন শত শত ছাত্র। মা'হাদের বাইরেও শায়েখদের দরস, ওয়াজ ও মাসায়েলের চর্চা আছে। অন্য সকল মসজিদে থাকে শুধু আমল ও ইবাদত,

বাইতুল্লায় এর পাশাপাশি আছে ইলম ও তাদরিস। বাইতুল্লাহর অভিজ্ঞতা থেকে মনে হলো, ইলমের চর্চাহীন মসজিদ অনেকটা নিষ্প্রাণ। আমি সুযোগমতো অনেকগুলো মা'হাদে বসেছি। ছাত্রদেও সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেছি। তাঁদের মেজাজ ও চিন্তা বোঝার চেষ্টা করেছি। কয়েকদিনের অভিজ্ঞতায় আমার মনে হয়েছে, দেশভেদে ছাত্রদের চরিত্র ও আচরণ ভিন্ন হয় না। তাঁদের দেখে আমার কৈশোরকালের কথা মনে হলো, দরস শেষ হলে আমরাও তো ওদের মতো দুষ্টামিতে লিপ্ত হতাম। একজন আরেকজনের জুব্বা ধরে টান দেওয়া, গোল গ্রুপ পাকিয়ে বসা বা দরসের পেছনে বসে ফিসফিসিয়ে কথা বলা–আমাদের সাথে ওদের পার্থক্য খুব বেশি নেই।

এর পাশাপাশি মসজিদুল হারামে আগত মুসাফিরদের সঙ্গেও আলাপ জমিয়েছি। একটু ক্লান্তি লাগলে বা ঘুম পেলে আমি পাশের জনের সঙ্গে কথা বলা শুরু করতাম। তার দেশ কোথায়, দেশের পরিস্থিতি ও অগ্রগতি কী, সংস্কৃতি ও উন্নতি কেমন–এমন অনেক খুচরা আলাপ। মোটামুটি আরবি জানার কারণে কথা বলতে কষ্ট হতো না। এই আলাপের অভিজ্ঞতায় আমি বুঝেছি, পত্রিকা ও ম্যাগাজিনের সাথে প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনার পার্থক্য অনেক। কয়েকজন ইয়ামানির সাথে কথা বলে জানতে পারলাম, জায়দিদের একটা বড় অংশ হুতি নয়, বরং অনেক বড় জায়দি আলেম তাদের বিরুদ্ধে ফতোয়া দিয়েছেন। হুতি বরং ইরান প্রভাবিত রাজনৈতিক গোষ্ঠী, যাতে কিছু সুন্নিও আছে। কিছুক্ষণ কথা চালাচালির পর জানলাম, সে নিজেও জায়দি, তবে সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে সুন্নিদের সাথে তাদের তেমন কোনো পার্থক্য নেই। তবে ইয়ামানিরা সবাই বললেন, সময় ভালো যাচ্ছে না। নিরাপত্তা ও নাগরিক সুবিধার বেহাল দশা, অনেক অঞ্চলে বিদ্যুৎ নেই, তবুও ইয়ামানির মুখে হাসি–'আলাহ ভালো রেখেছেন।'

সবার সাথে এমন 'প্রেমপূর্ণ' আলাপ হয়েছে ভাবলে ভুল করবেন। এক জুমার দিন আমার দুইপাশে দুইজন এসে বসলো। কথা বলার একপর্যায়ে জানতে পারলাম, বামেরজন ইবাদি (যাদেরকে আমরা ঐতিহাসিকভাবে খারেজি নামে চিনি) আর ডানেরজন সৌদি শিয়া। আমরা উম্মাহর ঐক্য, সংকট ও সমাধান বিষয়ে কথা বলছিলাম। আমরা তিনজনই উচ্চশিক্ষিত। শিয়াকে বললাম, 'আমি কিন্তু তোমাদের অনেক বই পড়েছি। তোমাদের বাকের সদরের অনেক লেখা আমার খুব পছন্দ।' সে খুব চমৎকৃত হলো। কথা চালাচালির এক পর্যায়ে আহলে বাইতের প্রামাণ্যতা প্রশ্নে শিয়া ও ইবাদির মধ্যে ঝগড়া লেগে গেল। আমি থামাতে চেষ্টা করেও সফল হলাম না। শিয়া লোকটি রেগে কয়েকটি কথা বলেই দ্রুত প্রস্থান করল। বুঝলাম, সে অত্যন্ত অন্ধচিন্তার মানুষ, পাশাপাশি সৌদি নাগরিক বলে নিরাপত্তা নিয়েও আশংকায় আছে। তাই দ্রুত কেটে পড়ল। ইবাদির বাড়ি ওমান। ব্যক্তিগতভাবে আমি ইবাদিদের সম্পর্কে তেমন কিছু জানতাম না। তার কাছে জিজ্ঞাসা করলাম সমস্ত বৃত্তান্ত। তার কথা শুনে আমার মনে হলো, ইবাদিদের সম্পর্কে বইয়ে যেসব লেখাজোখা আমরা পাই, তার অধিকাংশই অর্ধেক বা প্রান্তিক। তার কাছ থেকে কিছু ইবাদি কিতাব ও শায়েখের খোঁজ নিয়ে নিলাম। এবং একটা চমৎকার তথ্য হচ্ছে, এই ইবাদি ব্যক্তি ইখওয়ানুল মুসলিমিনের প্রতি বেশ দুর্বল।

তবে এর মধ্যে সবচেয়ে ভালো সম্পর্ক হয়েছে সুদানের ইবরাহিমের সাথে। সে পারিবারিকভাবে সালাফি। তার পূর্বপুরুষেরা ইরিত্রিয়ার অধিবাসী ছিলেন। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও যুদ্ধে টিকতে না পেরে হিজরত করে সুদানে এসেছেন। ইবরাহিম আফ্রিকার সেই অঞ্চলের ইতিহাসের বিবৃতি দিতে থাকল। আমি মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনছিলাম নাজানা ইতিহাস ও সংগ্রাম। ইবরাহিম খারতুম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রযুক্তি শাখায় অধ্যয়নরত। মাথা অনেক পরিষ্কার। বয়স কম হলেও অনেক কিছু জানে। পরিষ্কার যুক্তি দিতে পারে। তার সাথে বিকেল চারটা থেকে শুরু করে রাত সাড়ে নয়টা পর্যন্ত আড্ডা দিলাম। সুদান ও বাংলাদেশের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে নানামুখী আলাপচারিতা চলল। জিজ্ঞাসা

করলাম, 'ভবিষ্যতে কী করার ইচ্ছা?' সে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। বলল, 'সুদানের আন্দোলন সফল হলে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন হবে। নয়তো দেশত্যাগ করা ছাড়া কোনো উপায় নেই।' ইবরাহিমের সাথে কথা বলার কয়েকদিনের মধ্যেই সুদানের সরকারের পতন ঘটল। আমি ওকে ম্যাসেঞ্জারে লিখলাম, 'কাদ সাকাতান নিজাম!'

আট

দিনগুলো দ্রুত ফুরিয়ে আসছিল। দেখতে দেখতে মদিনা সফরের সময় চলে আসলো। মক্কায় থাকাকালীন আশপাশের এলাকা ছাড়াও জেদ্দা ও তায়েফে যাওয়ার সুযোগ হয়েছে। মক্কা থেকে জেদ্দা পৌনে এক ঘণ্টার দূরত্ব। ১০-১৫ রিয়ালের শেয়ারড ট্যাক্সিতে খুব সহজেই জেদ্দায় যাওয়া যায়। জেদ্দা স্বর্ণের শহর। বিকিকিনি ও সৈকতের শহর। শহরের পাশেই আছে লোহিত সাগরের অপূর্ব বিস্তৃতি। সৈকতে গেলেই চোখে পড়বে বিশ্বের সর্ববৃহৎ কৃত্রিম ঝর্ণা। তবে অস্বস্তির বিষয় হচ্ছে, স্থলভূমির মতো এখানকার সৈকতও পাথুরে। তাই সমুদ্রে নামার সংস্কৃতি চালু নেই। নামার পথ গ্রিল করে আটকে দেওয়া। বাঁধানো সৈকতে সমুদ্রের তীরকেও লেকের প্রাঙ্গণ বলে ভ্রম হয়। সন্ধ্যায় সেখানে হাঁটতে এসেছেন অনেকে। যুবক তার যুবতীকে নিয়ে এসেছেন। চল্লিশের কোটার দম্পত্তিদের সাথে অনেকগুলো শিশু চারদিকে মৌমাছির মতো দৌড়াদৌড়ি করছে। বৃদ্ধরা এসেছেন বৃদ্ধাদের হাতে হাত রেখে। চারদিকে আয়োজন করে সন্ধ্যা নামছিল। ইটপাথরের জঞ্জালে এই আয়োজনটা দেখা যায় না। খুব দ্রুত সূর্য ডুবে যাচ্ছিল। মোবাইল বের করে ছবি তুলতে তুলতে সূর্যটা ফাঁকি দিয়ে ডুবে গেল। তায়েফ পাহাড়ি এলাকা। আঁকাবাঁকা পথ বেয়ে বহু উঁচুতে যেতে হয়। আবহাওয়া অনেক সুন্দর। বাংলাদেশের কাছাকাছি। যেন নদীর পাশে হাঁটছি, এমন মৃদুমন্দ বাতাস। মক্কা থেকে অনেকটা দূরে। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এত দূরে এসেছিলেন ভাবতেও কেমন লাগে। মক্কা 'ত্যাগ' করে এসেছিলেন। তৎকালীন মক্কায় গোত্রব্যবস্থায় ''ত্যাগ' করার অর্থ ছিল চিরবিদায়। তায়েফের মসজিদে ইবনে আব্বাসে জোহরের নামাজ পড়লাম। অনেক সুন্দর ও গোছানো মসজিদ। আশপাশে কোথাও ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর কবর আছে। লোকজনকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কোথায় তাঁর কবর?' একেকজন একেকদিকের কথা বলল। শেষপর্যন্ত বুঝলাম, বিদআতের ভয়ে এখানেও ঐতিহাসিক চিহ্ন মুছে ফেলা হয়েছে। তায়েফ মূলত আত্মীয়ের বাড়িতে গিয়েছিলাম। এই প্রথম আরবের কোনো আবাসিক এলাকা দেখার সুযোগ হলো। বাড়ির প্রাঙ্গণে নানারকম গাছ লাগিয়ে রাখা হয়েছে। মরিচ গাছ। আম গাছ। এক কোণায় একটা বড়ই গাছে বড়ই ঝুলে আছে। খেয়ে দেখলাম আরবের মাটি ও আবহাওয়ায় স্বাদ পাল্টে গেছে। চারপাশে পাথরের পাহাড়। মাঝেমাঝে জনবসতি। যোগাযোগের অবকাঠামো অনেক ভালো। তবে নগরী থেকে দূরের বসতিগুলোতে নিজস্ব গাড়ি না থাকলে বেশ অসুবিধা।

সুযোগ পেয়ে পাশের এক পাথুরে টিলায় উঠলাম। শত শত পাথরের সংযুক্তিতে গড়ে উঠেছে একেকটা টিলা। একেক পাথর একেক রং ও বর্ণের। কোনো পাথর এমনভাবে কাঁত হয়ে আছে, দেখলে মনে হয়, বোধহয় এখনই পড়ে যাবে। টিলার ওপর দাঁড়ালে আশপাশের জনবসতি দেখা যায়। দেখা যায় সুশৃঙ্খলভাবে দাঁড়িয়ে থাকা হাজার বছরের ইতিহাসের সাক্ষী শত শত টিলা। গাড়িতে ফিরতে ফিরতে তায়েফে নবিজির দাওয়াত অভিযানের কথা ভাবছিলাম। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আক্রান্ত হলেন। ফেরার পথে প্রচণ্ড অসহায় বোধ করলেন। মক্কায় ফেরার পথ বন্ধ। পথিমধ্যে আকুল হয়ে দোয়া শুরু করলেন–'আল্লাহুম্মা আলাইকা আশকু দু'ফা কুওয়াতি ও কিল্লাতা হিলাতি ও হাওয়ানি আলান নাস...– আল্লাহ, আমি দুর্বল, সম্বলহীন, অপমানিত, আমাকে কার কাছে ছেড়ে দিলা? আল্লাহ, তুমিও কি আমার ওপর রাগ করে আছো?' মুফতি আমিনী রহমতুল্লাহি আলায়হি এই দোয়া বারবার পড়তেন এবং অঝোরে কান্না শুরু করতেন। এমন কত

সুনানের স্মৃতি জড়িয়ে আছে তায়েফের সাথে! মক্কা থেকে মদিনায় দূরত্ব অনেক। সাড়ে চারশো কিলোমিটার। গুগল ম্যাপ বলছে যেতে চার থেকে পাঁচ ঘণ্টা লাগবে। লাগল ছয় ঘণ্টার মতো। সারাক্ষণ বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। ওই অঞ্চলের অবকাঠামো ও প্রাকৃতিক পরিবেশে তেমন কোনো পার্থক্য নেই। চারদিকে পাথুরে চরাচর। অনেক দূরে দূরে ছোটখাটো জনবসতি এবং মসজিদ। বাসে কিছুক্ষণ ঘুমানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছি। আমার ঠিক পেছনে এক আফ্রিকান দম্পতি অপরিচিত ভাষায় জোরে জোরে কথা বলছেন। কখনো হাসিতে ভেঙে পড়ছেন। কিছু বলি বলি করে মদিনায় পৌঁছে গেলাম।

নয়

মক্কার সাথে মদিনার মূল পার্থক্য হচ্ছে, মসজিদে নববি মসজিদুল হারামের মতো বৃত্তাকার নয়। মসজিদুল হারামের মতো চতুর্দিকে এর কেবলা নয়। মক্কার তুলনায় মদিনায় ভিড়ভাট্টা কম। পরিবেশ বেশ শান্ত ও সুন্দর। গুগল ম্যাপ বলল, ঐতিহাসিক বিরে বুদাআর কাছেই হোটেল। বিরে বুদাআহ ফিকহ ও হাদিসে অনেক আলোচিত কূপ। হোটেল থেকে ওহুদ দেখা যায়; সেই ওহুদ, যেখানে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের রক্ত ঝরেছে। বিকেলে রওজা জিয়ারত করে মদিনার আন্তর্জাতিক বইমেলায় গেলাম। বইমেলা বসেছে মদিনা ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ে। মসজিদে নববি থেকে ১০-১৫ রিয়ালের বিনিময়ে ট্যাক্সিতে ২০ মিনিট-আধা ঘণ্টার দূরত্বে অবস্থিত বিশ্ববিদ্যালয়।
মেলায় রকমারি বই। বিপুল পরিমাণ অমুসলিম লেখকের বইও আছে। পরিমাণটা বাংলাদেশের বইমেলার 'ইসলামি' বইয়ের চাইতে বেশি। বাংলাদেশের সেকুলাররা কী পরিমাণ কট্টর, তার একটা চিত্র এখান থেকে পাওয়া যাবে। দর্শকদের মধ্যে বই কেনার প্রবণতাও অনেক বেশি।
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে, এখানে বইয়ের একটা চরিত্র দাঁড়িয়ে গেছে। গবেষণামূলক বইয়ের সংখ্যা বিপুল। প্রাচীন বইয়ের পরিমাণও কম নয়। এমন অনেক বই দেখলাম, যেগুলোর সাথে আমি পিডিএফের মাধ্যমে পরিচিত। ধরতে পেরে অদ্ভুত রকমের আনন্দ হলো। আবদুল্লাহ দাররাজের আদ-দীন ও দসতুরুল আখলাক আমার প্রিয় দুই বই। ধরতে পেরে মনে হলো, বিদেশের অদেখা আত্মীয়ের সাথে অবশেষে সামনাসামনি দেখা হলো। তবে খেয়াল করে দেখলাম, এখানে কোনো ইসলামপন্থী বা আশায়েরির বই স্থান পায়নি। যে যার এলাকায় যাকে হুমকি মনে করে, তার বই স্থান দেয় না।

আমার ভাই মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় ঘুরিয়ে দেখালেন। সাজানো-গোছানো শক্তিশালী অবকাঠামো। এখানেই বাংলাদেশের সাথে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পার্থক্য টের পাওয়া যায়।
বইমেলায় ঘুরে বেশ মজা পেলাম। একদিনে সব দেখে শেষ হলো না। এর পরদিন আমি একা গেলাম। আরেক দিক থেকে দেখা শুরু করলাম। আজকেও সব দেখে শেষ করতে পারলাম না। মেলার সেমিনারে বিগব্যাং থিউরি নিয়ে আলোচনা চলছিল। আমার মনে হলো, এটা তো বিশ্বায়নের যুগ। পৃথিবীর কোথাও কোনো তর্ক উঠলে সেটা সবখানে ছড়িয়ে যায়। কয়েকটা কিতাব কিনতেই টাকা সব শেষ হয়ে গেল। এর মধ্যে এক লাইব্রেরিতে ঢুকে পছন্দের একটা বই দীর্ঘক্ষণ দেখছিলাম। লাইব্রেরির মালিক বললেন, 'তোমার কি বইটা পছন্দ হয়েছে? আমি সংশয় নিয়ে বললাম, 'জি, পছন্দ হয়েছে।' তিনি বইটা হাদিয়া দিয়ে দিলেন। আমি না করলে তিনি জোর করে গছিয়ে দিলেন।
এবার ফিরতে হবে। ট্যাক্সিস্ট্যান্ডের দিকে হাঁটা শুরু করলাম। পথে এক বাঙালি শ্রমিকের সাথে দেখা হলো। তিনি ক্যান্টিনে কাজ করেন। গত বছর বাংলাদেশ থেকে ছয় লাখ টাকা খরচ করে এখানে এসে বিপদে পড়েছেন। বেতন মাত্র এক হাজার রিয়াল অর্থাৎ ২২ হাজার টাকা। এর মধ্যে টুকটাক নানারকম খরচ আছে। দেশে ঋণ করে এসেছেন। ফেরার সুযোগ নেই। আমি দেখলাম, তাঁর মুখে হতাশার চিহ্ন। তিনি জানালেন, তাঁর মতো এমন বাংলাদেশী

শ্রমিকের সংখ্যা মোটেই কম নয়। আমি অস্ফুট সুরে বললাম, একে কি ব্রোকেন আরব ড্রিম বলা যায়?

দশ

মদিনায় একদিন বিকেলে মসজিদে নববি থেকে ফিরছিলাম। থোকাথোকা বৃষ্টি পড়ছিল। হোটেলে ফিরে মনে হলো, আয়োজন করে জ্বর আসছে। আম্মুরা বাইরে ছিলেন। ইতিমধ্যে প্রচণ্ড জ্বর চলে এলো। প্রচণ্ড জ্বর বলতে যেমন জ্বরে সবকিছু কাল্পনিক লাগে। চারপাশ উলট-পালট মনে হতে থাকে। আমাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো। ডাক্তার ঝুঁকি নিতে চাইলেন না। ওষুধের পাশাপাশি স্যালাইন দিলেন। তবে এতেও জ্বর কমল না। এর পরদিন সকালে আবার হাসপাতালে যেতে হলো। মোবাইল হাসপাতালের নার্সদের দেখে নজিব কিলানির আমিরাতুল জাবাল উপন্যাসের কথা মনে পড়ল। আমিরাতুল জাবাল আমার পড়া অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। বেশ কয়েকবার পড়ার ফলে উপন্যাসটাকে মনে হয় আমার পরিচিত কারও জীবনের অংশ। নার্স নিশ্চয় উপন্যাসটা পড়েননি। পড়লেও বলাটা ধর্মীয়ভাবে ‘ভদ্রতা’ হবে না। ডাক্তার বলে দিলেন, দিনের বেলায় হোটেল থেকে বের হওয়া চলবে না। সকাল ও সন্ধ্যায় মসজিদে যেতে পারব। মদিনায় আরও বেশ কয়েকদিন থাকব, তবে ডাক্তারের নির্দেশের ফলে অনেকটাই হোটেলবন্দী হয়ে গেলাম। মক্কা-মদিনায় প্রধানত আমরা হোটেল থেকে কিনে আনা খাবার খেতাম। তবে এতে অনেক খরচ পড়ে যেত। খেয়েও তৃপ্তি মিলত না। একদিন আব্বু ইলিকট্রিক চুলা কিনে নিয়ে আসলেন। আগুনের চুলা সচরাচর পাওয়া যায় না। সাথে কাঁচাবাজার। আপু ও আম্মু আয়োজন করে রান্না-বান্না শুরু করলেন। ভাত, ডাল ও ছোটখাটো ভর্তাভাজি দিয়ে বেশ তৃপ্তিসহ খাওয়া শুরু করলাম। মদিনায় প্রথম দিন ভাই রুজ-বুখারি নামের খাবার আনলেন। পাকিস্তানি চাউলের সাথে মুরগির গ্রিল। স্থানীয়দের মতে এটি আফগানি খাবার। তবে



দীর্ঘদিনের চর্চায় এটি এখন সৌদির নিজস্ব সংস্কৃতির অংশ হয়ে গেছে। রুজ-বুখারির পাশাপাশি সৌদিতে আলবাইক নামে একটি ফাস্টফুডের ব্র্যান্ড আছে। বেশ জনপ্রিয়, সাশ্রয়ী ও সুস্বাদু। সৌদিতে গেলে কোনোভাবেই আলবাইক মিস করা যাবে না। মদিনায় আম্মু-আপুরা মক্কার মতো ইলিকট্রিক চুলায় রান্না শুরু করলেন। তবে এখানে তেমন সুবিধা করতে পারলেন না। দুয়েকদিন যেতেই বারবার তার পুড়ে যেতে লাগল। একবার একটু ধোঁয়াও বের হলো। তাই বাধ্য হয়ে রান্না-প্রকল্প বাদ দিতে হলো। কেটারিং বা বাসায় রান্না করা খাবার কিনে খাওয়া শুরু করলাম। অনেক বাংলাদেশি এই কেটারিংয়ের সাথে যুক্ত। তাঁরা বাসায় রান্না করে হোটেলে খাবার সরবরাহ করেন। এমনিতে

মক্কা-মদিনায় প্রশাসনিকভাবে মুসাফিরদের জন্য আগুনের চুলায় রান্না করা নিষিদ্ধ। তবে লুকিয়ে চুরিয়ে অনেকেই রান্না করেন। মক্কার মতো মদিনার দর্শনীয় স্থানগুলো ঘুরে দেখলাম। মসজিদে কুবা, মসজিদে কিবলাতাইন ও ওহুদ প্রান্তরে গেলাম। আশপাশে আরও কিছু জায়গায়ও ঘুরলাম। কুবা অঞ্চলটা খুব সুন্দর। গ্রামের মতো। একটু পর পর বিশাল বিশাল খেজুরবাগান। খেজুরবাগান দেখলে বাংলাদেশের ফলবাগানের কথা মনে পড়ে। অবশ্য খেজুরবাগান আরও গোছানো থাকে। ভেতরে থাকে মালিকের বিলাসবহুল আবাসস্থল। শ্রমিকরা মালিকের অনুমতি নিয়ে বাগানের পাশে তরিতরকারির ক্ষেত করে থাকেন। মসজিদে কুবা মাঝারি আকারের মসজিদ। মসজিদের ভেতরে নামাজের পাশাপাশি সেলফি তোলার অসুস্থ প্রতিযোগিতা চলছে। দেখে অত্যন্ত বিরক্তি লাগল। ওহুদ প্রান্তরে বেশিক্ষণ থাকতে পারলাম না। প্রচণ্ড রোদ উঠেছে। কিছুক্ষণ থেকে গাড়িতে ফিরে আসলাম। ফেরার পথে মদিনার পাইকারি মার্কেটে গেলাম। কী নেই এখানে! আম থেকে শুরু করে বড়ই–হরেক রকমের তরিতরকারিও। আমরা নিলাম তুতফল, ময়মনসিংহের গ্রামের ভাষায় বলে তিপফল। সৌদির তিপফলগুলো অনেক বড় ও মিষ্টি। একে তায়েফের বিশিষ্ট ফল হিসেবে ধরা হয়। তায়েফে ও মদিনার বাজারে প্যাকেটে বাঁধাই করা অনেক গোলাপ ফুলও দেখলাম। কিনতে খুব ইচ্ছা করছিল, কিন্তু দেবো কাকে? এখনো তো কোনো নারীর হাত আমার একান্ত হয়নি।

এগারো

শেষ করার আগে মদিনা ও আরবের সংস্কৃতি ও রাজনীতি নিয়ে কয়েকটি মন্তব্য করতে চাই। মক্কার তুলনায় মদিনায় মানুষের চাপ কম। মনে হয়েছে তুলনামূলক স্থানীয় অধিবাসীর সংখ্যা বেশি। মসজিদে হারামের মতো মসজিদে নববিতেও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আছে। সম্ভবত মদিনায় পড়ালেখার পরিধি একটু বড়। মসজিদে একটু পর পর জায়গায় জায়গায় দায়িত্বশীল মুয়াল্লিম। তাঁদের কাছে নির্দিষ্ট ছাত্ররা কোরআন শোনাচ্ছে। কেউ দেখে দেখে, কেউ মুখস্থ, কেউ অন্য রেওয়ায়েত ও কেরাআতে। মুসাফিররাও তেলাওত শোনাচ্ছেন। কাউকে আবার মুয়াল্লিমরা নিজেরাই ডেকে নিচ্ছেন। একদিন আমার পাশে বসে এক পাকিস্তানি তেলাওত শোনাচ্ছিলেন। তিনি ওলাজজাল্লিন পড়লে মুয়াল্লিম ভুল ধরলেন, পাকিস্তানি কোনোভাবেই তাঁর ভুল স্বীকার করতে রাজি ছিলেন না। বললেন, আমাদের ওইখানেও অনেক আলেম আছেন, আমি তাঁদের থেকেই শিখেছি। মসজিদুল হারাম ও নববিতে খাবারের কোনো অভাব নেই। একটু পর পর একেকটা খাবার আসছে। বিশেষত সোম ও বৃহস্পতিবার ইফতারের সময় প্রচুর খাবার আসে। কেউ যদি সারাদিন হোটেলে না গিয়ে মসজিদে বসে থাকে, তাহলে তার দিন চলে যাবে। বিলিকৃত খাবারে পূর্ণ হবে তার খাদ্যচাহিদা। সৌদির অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা এখন খুব একটা ভালো নয়। তেলের দাম পড়ে গেছে। সৌদি ইয়ামান-যুদ্ধে জড়িয়ে লুকসান গুণছে হাজার হাজার কোটি টাকা। তেলনির্ভর বলে সৌদির অর্থনীতি উৎপাদনশীল নয়। অলসতা ও বেকারত্বের হার অনেক বেশি। শিক্ষার অবকাঠামো ভালো হলেও নাগরিকদের মধ্যে শিক্ষার মান অনেক কম। তবে তুলনামূলকভাবে মানুষের মধ্যে ধর্মীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাব অনেক বেশি। যেহেতু রাজতন্ত্র, তাই নাগরিকদের মধ্যে গণপরিসরে অংশগ্রহণ অনেক কম। ফলে সৌদিতে রাজনৈতিক সম্মতি ও বৈধতার একটা বড় সংকট আছে। এখন কার্যত রাষ্ট্রক্ষমতায় আছেন মুহাম্মদ বিন সালমান, এমবিএস। তিনি পশ্চিমা শিক্ষায় শিক্ষিত। আগের শাসকদের মতো সাধারণ নন। অসাধারণ, তবে সেটা ভালো নাকি খারাপ অর্থে, সেটা দেখার জন্য অপেক্ষা করতে হবে অনেকদিন। তিনি অর্থনীতি ও রাজনীতিতে সংস্কার আনার চেষ্টা করছেন। তেলের উপর নির্ভরতা কমাচ্ছেন। ট্যাক্স ও ভ্যাট চালু করেছেন। পর্যটন ও উৎপাদনে জোর দিচ্ছেন। সাংস্কৃতিক প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে রাজনৈতিক সম্মতি ও বৈধতা লাভেরও চেষ্টা চালাচ্ছেন।

বিনোদনের ব্যাপক আয়োজন করছেন। ধর্মীয় ও মানবাধিকার সংশ্লিষ্টদের ওপর অনেক বিধিনিষেধ আরোপ করেছেন। তাতেও না থামানো গেলে পুরছেন জেলে। বিদেশিদের ওপর আরোপ করেছেন মোটাঅংকের ট্যাক্স। ট্যাক্সে গৃহীত টাকা আবার গরিব সৌদিদেরকে দিচ্ছেন। এই দ্বৈত চরিত্রের কারণে তিনি অনেক সৌদি তরুণের দৃষ্টিতে সংস্কারক, গরিবদের চোখে রবিনহুড।

সৌদিতে সবমিলিয়ে একটা উৎকট জাতীয়তাবাদী পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। সৌদিতে অভিবাসনের আইন থাকলেও কার্যত ভিনদেশি কেউ নাগরিকত্ব পাচ্ছেন না। ফলে অর্থনৈতিকভাবে উন্নত দেশগুলো যেভাবে বিদেশি মেধা ও বিনিয়োগকে আকর্ষণ করছে, সৌদি সেভাবে এগুতে পারছে না। তবে সৌদিতে আছে বিপুল সংখ্যক প্রবাসী। অবশ্যি সে আরেক দুর্ভাগ্যের গল্প। প্রবাসীদের স্বাধীনভাবে কোনো ব্যবসা বা উদ্যোগ নেবার সুযোগ নেই। মালিকানা গ্রহণের কার্যত অনুমতি নেই। কোনো স্থানীয় সৌদিকে স্পন্সর বা কাফিল বানিয়ে কার্যক্রম চালাতে হয়। তাকে দিতে হয় মোটাঅংকের টাকা। এতে একদিকে যেমন পণ্যের দাম বাড়ছে, অপরদিকে অনেক টাকা চলে যাচ্ছে অনুৎপাদনশীল খাতে। এই কাফালাতব্যবস্থা অনেকটা পুরান ঢাকার বাড়ির ব্যবসার মতো। আপনার বাড়ি আছে। আপনি পায়ের ওপর পা তুলে জীবন কাটিয়ে দিচ্ছেন। এই দুষ্টচক্রের ধাঁধাঁয় পড়ছে প্রজন্মের পর প্রজন্ম। অর্থনীতি দুর্বল হচ্ছে, সামাজিক ব্যবস্থা ও মূল্যবোধ সক্রিয় হতে পারছে না।

আগেই বলেছি, সৌদি মানুষের মধ্যে স্বভাবজাতভাবে অন্য যে কোনো দেশের চেয়ে ধর্মীয় প্রভাব অনেক বেশি। মসজিদে মসজিদে শিক্ষার আয়োজন থাকায় ধর্মীয় সচেতনতাও বেশি। তবে ছদ্মবেশী জাতীয়তাবাদ খেয়ে ফেলছে এই অর্জন। কাফালতব্যবস্থার ফলে বিদেশিদের প্রতিষ্ঠিত হবার সুযোগ কার্যত বন্ধ। এভাবে একরকম জাতীয়তাবাদী ঘৃণারও সৃষ্টি হচ্ছে। বিয়ের জন্য প্রচুর শর্ত-শারায়েত আছে। প্রচুর অবিবাহিত মেয়ে থাকা সত্ত্বেও কার্যত বিদেশিদের কেউ বিয়ে করে না। পাশাপাশি উগ্র সালাফিবাদের প্রসারের ফলে সাংস্কৃতিক চর্চা একদম নাই হয়ে গেছে। তবে কোনো কিছুই তো শূন্য থাকে না। এখানে ঢুকে যাচ্ছে পশ্চিমা সংস্কৃতি। সৌদিদের মধ্যে পশ্চিমাদের প্রতি মুগ্ধতা অনেক বেশি। মুহাম্মদ বিন সালমান এই শূন্যস্থান পূরণের চেষ্টাই করছেন, তবে সেটা কতটা ইসলামিক পন্থায় সে নিয়ে সংশয় থেকেই যাচ্ছে।

বারো

মদিনার অবস্থানের সময়ও শেষ হয়ে আসছে। ওমরার সফর মাত্র ২২ বা ২৪ দিনের হলেও সে স্বাভাবিক ২৪ দিন নয়। এই কয়েক দিনের আছে অনেক স্মৃতি ও গল্প। আমি গল্প শুনতে ও বলতে ভালোবাসি। ফলে এই কয়েক দিনের সফরের আছে অসংখ্য গল্প। তাই যত বড় ভ্রমণকথাই লিখি, আমার কাছে মনে হবে লিখছি অসমাপ্ত আখ্যান। এই লেখায় সৌদির সংস্কৃতি ও রাজনীতির অনেক সমালোচনা করেছি। তবে আবুল হাসান আলি নদভির মতো আমারও মনে হয়েছে, আরবরা সম্ভাবনার আঁধার। তাদের আবেগ, ইখলাস ও জজবা অনেক বেশি।

মসজিদুল হারামে একদিন বসে আছি। পাশের বৃদ্ধের সাথে কথা বললাম। তিনি রিয়াদ থেকে এসেছেন। মাঝেমাঝেই আসেন। এসে সপ্তাহ দুয়েক থেকে যান। তাঁর কাছে আমার সমালোচনাগুলো বললাম, তিনি মাথা নেড়ে একমত প্রকাশ করলেন। বললেন, 'জামিল, দ্যাখো, অনেক ত্রুটি হয়তো আছে। তবে আছে অনেক সম্ভাবনা। আসলে আমাদের সভ্যতার সংকট। উম্মাহের সামগ্রিক সংকট। শুধু রাষ্ট্রের দিকে তাকিয়ে পর্যালোচনা করলে সেটাও জাতীয়তাবাদী পর্যালোচনায় রূপান্তরিত হবে। এখনো এখানে আমার মতো অনেকে আছে, যারা নিজের চেষ্টায় ইলম শিখছে, চর্চা করছে ও জজবা ধরে রেখেছে। উম্মত যখন জাগবে, কোনো নেতা আমাদের ডাক দেবেন, তিনি পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুন, তাঁর পতাকাতলে ছুটে যাব।

ওমরার সফরটা ছিল অসাধারণ এক কালযাত্রা। অনেক ও অনেক স্মৃতি। আমি অনেক সময় মসজিদের চারপাশে পায়চারি করতে করতে



ভেবেছি নিজের কথা, দেশ ও উম্মাহের কথা। রমজানের আগে মদিনায় রওজা জিয়ারত করা ছিল বেশ সহজ। কখনো চার-পাঁচ মিনিটেই জিয়ারত শেষ করতে পেরেছি। একদিন রওজার পাশে দাঁড়িয়ে তরুণ কবি হাসান রোবায়েতের কবিতা পড়লাম। মনে হলো আমি কিছু কবিতা লিখলেও স্বভাবকবি তো নই, আমার ভাষিক অক্ষমতা অনেক, তবুও হাসান রোবায়েতের দোহাইয়ে ইকবালের অসমাপ্ত আরমুগানে হেজাজের আনুষ্ঠানিকতা তো সারতে পারি। আমি কবিতা পড়া শুরু করলাম–

'সাক্ষ্য দুপুরের মালিদও
সাক্ষ্য ঘুঘুভরা মেঠো তারা
সাক্ষ্য ভোরশীতে মায়ারোদ
নানির হাতে মাখা আস্বাদ
সাক্ষ্য কঞ্চিতে মাছরাঙা
সাক্ষ্য জেলেদের কালো গাও
সাক্ষ্য এক ডুবে ধরা মাছ
বাঁশের ফুলে ফোটা সন্ধ্যাও
সাক্ষ্য বেনেবউ পাখিটার
সাক্ষ্য হাতে বোনা ছোট ডালা
সাক্ষ্য বাতাসের রন্ধ্রতে
কাঁদছে হুসেনের কারবালা
সাক্ষ্য ভেড়াদের ঝুনঝুনি
সাক্ষ্য বন্ধুর কাছে ঋণ
মুহাম্মাদ, প্রিয় দরদিয়া
রাহমাতাল্লিল আলামিন'

লেখক : সম্পাদক, ফাতেহ টোয়েন্টি ফোর ডটকম



তর্কবাগীশের আন্দোলিত জীবন

সালমান সাদ

তখন রাত কি দিন, সন্ধ্যা, নাহয় সুবহে সাদিকের আলো ক্ষীণ, ঠিক এটা কোন প্রহর আমরা জানি না, কিন্তু আমরা এটা জানি যে, শতবর্ষের স্তব্ধতার এ রাজত্বে আজ আবার কোথাও বিকশিত হয়ে উঠতে চাচ্ছে মৃদু এক প্রাণ, শাহজালালের জ্বালিয়ে যাওয়া সেই টিমটিমে আলো পাচ্ছে একজন যোগ্য উত্তরাধিকার, মহাদ্রোহের অক্ত জানান দিচ্ছে তাঁর আগমনবার্তা, এ বাংলাদেশেরই কথা, উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ জেলায়।

তারুটিয়া গ্রামে বাস করে বাগদাদের আবদুল কাদির জিলানির বংশধারার যে পরিবার, তাঁরা এ দেশে আসা সেই সুফি-সাধকদের দল, আবহমান বাংলার পৌত্তলিকতার জড় বাতাসে যাঁরা ছড়িয়েছেন তওহিদের সৌরভ, সেই সৌরভের কাছে পাষাণ মূর্তির গন্ধময় অন্ধকার হয়েছে পরাজিত। ইতিহাসের ডামাডোলের বাইরে, যুগের ঘটনা ঘনঘটার আড়ালে থেকে নিভৃতে নীরবে যাঁরা এই শান্ত শীতল পাটির মতো মাটির দেশের জমিন নিসিক্ত করে গেছেন ইসলামের অক্লান্ত চাষে, সেই দরবেশের দলের সাথে মিশেই ১৩০৩ খ্রিষ্টাব্দে বড়পীরের দেশ বাগদাদ হতে এ দেশে আসেন শাহ সৈয়দ দরবেশ মাহমুদ। তাদের আলেখ্য বিস্মৃত হয়েছে ছিন্ন তালপত্রের সাথে।

বড়পীর জিলানির বংশপরম্পরায় দরবেশ মাহমুদের সেই স্নিগ্ধ রক্তধারায় আমাদের কালের কলসে জন্ম গ্রহণ করেন তিনি–আমাদের আলোচনায় আজকের নায়ক, জাগরণের ঘোষক, মওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ। শুধু আবদুর রশিদ, মওলানাও ঠিক, তর্কবাগীশ ব্যাপারটা কী? এই উপাধির গল্পটা আমরা জানব ধীরে ধীরে, আরেকটু পরে।

এটি উনিশ শূন্যে শূন্যে উনিশশো সাল, তাঁর জন্মবর্ষ, ব্রিটিশ ইন্ডিয়ায়, পরাধীন ভারতবর্ষে। সাতাইশে নভেম্বর, তখন কি শীত? কার্তিকের হিম জোৎস্নায় প্লাবিত হয় বাংলার মাঠঘাটবিহার? আর তাহাজ্জুদের পানির উষ্ণতায় প্রথম স্নান হয় এই নবজাতকের?

রক্তের মধ্যে তাঁর হার না-মানার অঙ্গীকার। আগামী দিনের বিপ্লবী নেতার নিদর্শন তাঁর প্রকাশ হয়ে পড়ছে সেই বাল্যেই, ঘুমিয়ে যেমন শিশুর পিতা সব শিশুরই অন্তরে।

জমিদার মহাজনদের তো দিন তখন। বিশাল জমিদারি, রাজবাড়ি, নানান ধরনের ব্যবসা তাদের, আর লোক ঠকানোর ফন্দি তবু। রুপালি পয়সার চকমকানি গদিতে বসে গরিবদের ছেঁড়া পকেট আরও নিংড়ানো। আবদুর রশিদ দেখেন সব। গ্রামের অভাবী গোয়ালাদের কাছ থেকে কম মূল্যে দুধ সংগ্রহ করে বাইরে তারা বিকোচ্ছে চড়া দামে। তেরো বছর বয়সী এই বালক গোয়ালাদেরকে সংগঠিত করে রুখে দাঁড়ালেন, জুলুমের বিরুদ্ধে, তারা পেলো সংহত হবার মন্ত্র, দুধের ন্যায্যমূল্য আদায় করে নেয়া হলো মহাজনের সিন্দুক থেকে।

ঊনিশ শো ঊনিশ সালে, তখন তাঁর ঊনিশ বয়েস, অঘ্রাণে নতুন আমের বোলের মতো প্রথম তারুণ্যের ঘ্রাণ মাতোয়ারা করে রেখেছে তাঁর জীবনের উদ্যান, তখন জাতির ক্রান্তিকাল। খেলাফত আন্দোলন এবং অসহযোগ আন্দোলনের ঝড়ে উত্তাল দেশ, বিপ্লবের সক্রিয়তায় জড়িয়ে পড়লেন তিনি, জওয়ানির উদ্যমে। এন্ট্রান্স পরীক্ষায় তাঁর আর বসা হলো না। সেই যে তুফান ভারি দিতে গিয়ে পারি ডুবন্ত নৌকার হালটি যে ধরলেন, জীবনভর তা বাইতে হলো।

পরবর্তীকালে তিনি ভারতের যুক্তপ্রদেশের বেরেলিতে ইশাআতুল উলুম মাদরাসা, মাজাহেরুল উলুম সাহারানপুর ও ইসলামি শিক্ষার পীঠস্থান দারুল উলুম দেওবন্দে অধ্যয়ন তপস্যা করেন। লাহোরের ইশাআতুল ইসলাম কলেজে অধ্যয়ন ও তর্কশাস্ত্রে ডিগ্রি অর্জন করে তর্বাগীশ উপাধিটি অর্জন করেন। তর্কবাগীশ উপাধিটি–আমরা তথ্যভাণ্ডার ঘেঁটে জানি–মৌলিক উপাধি তাঁর নয়। তর্কবাগীশ উপাধিটি আরেকজনেরও ছিল প্রথমে, রামধন তর্কবাগীশ নামে একজনের, যিনি ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধের একজন কিংবদন্তি পুরাণ কথাকার ও সংস্কৃত পদাবলিকার। তিনিই প্রথম উদ্ভাবক–বিধিবদ্ধ পণ্ডিতের ভাষা ছেড়ে সাধারণ মানুষের লৌকিক ভাষায় সুললিত ভঙ্গিতে যিনি পুরাণের ধর্মকথা শোনাতেন।

'মারবি? আয়, মার ব্যাটা, সাহসে কুলালে মার! তোর বাপেরও জন্মের আগে এই মাথা ব্রিটিশদের লাঠির আঘাতে ফেটে এসেছে!'
নব্বই দশকের উত্তাল সময়। সমগ্র বাংলাদেশের রাজপথ স্বৈরাচার-বিরোধী আন্দোলনের হল্কা বাতাসে ঘামছে। ঢাকায়, দুপুর রোদের সূর্যের তলে দাঁড়িয়ে আমরা অশীতিপর এক বৃদ্ধ তরুণকে দেখি গর্জন করছেন লাঠি হাতে তেড়ে আসা পুলিশ জওয়ানটির দিকে তাকিয়ে, চোখের আগুনে ঝলসে দিয়ে। সমবেত জনতা পুলিশি বাহিনীর ধাওয়ায় যখন ছত্রভঙ্গ, সকলে পিছু হটছে ঊর্ধ্বশ্বাসে, জীবন সায়াহ্নে এই নেতা শতবর্ষী বনস্পতির মতো সাহসের শেকড় ছাড়িয়ে রুখে দাঁড়ালেন একা। ধেয়ে আসা বিরাট পুলিশদলের নড়াচড়া স্থানু হয়ে গেল এক লহমায়, পলায়মান জনতা অভিভূত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, এক মুহূর্তে সব নিস্তব্ধ হয়ে পড়ল, এই ঢাকা, এই শহর, এই ইট কাঠ, এই রাজপথ, এই চত্বও, এই ফুটপাত, এই জড়ো হওয়া মানুষ, এই উদ্ধত রাইফেল, এই সমস্ত সময় এবং এই যা কিছু–সবিস্ময়ে দেখতে লাগল তাঁরা এক সফেদ শুভ্র বৃদ্ধের অমিত তেজ, শৌর্যবানের সাহস।
কার দিকে লাঠিয়াল এসেছে তেড়ে, তারা কি জানে কতটা বৈরি বাতাসে সাঁতার কেটে এখানে দাঁড়িয়ে কে এই? মওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ? তারা পাঠ্যবইয়ে পড়েনি এই নাম, তারা পাঠ্যবইয়ের বাইরে পড়ে না ইতিহাস, তারা জানে না তাঁর দীর্ঘ পথের গল্প–যা বিস্তারিত সেই ব্রিটিশ ইন্ডিয়া থেকে অধুনা বাংলাদেশের গণতন্ত্রবাদী আন্দোলন পর্যন্ত।
সাতচল্লিশের পাকিস্তান আন্দোলন, বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ থেকে নিয়ে আশির দশকের গণতন্ত্র মুক্তির আন্দোলন, প্রতিটি বৃহৎ জাতীয় আন্দোলনে, জাগরণে অগ্রগামী নায়ক, সক্রিয় নেতা। ইংরেজ শাসনামল থেকে নিয়ে স্বৈরাচার-বিরোধী আন্দোলন–বাঙালির সংগ্রামে সাধনায় প্রতিটি শ্বাস প্রবাহের সাক্ষী তিনি। কেবল ধর্ম, ধর্মীয় ইস্যু নয়, শুধু ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর স্বার্থে শ্রেণিসংগ্রামের সীমিত গণ্ডি ছেড়ে জাতীয় স্বার্থে সরব, জাতীয় সমস্ত ইস্যুতে আন্দোলনে মূলধারা থেকে মুখর এরকম আকাবের আলেম খুব কমই পেয়েছে বাংলাদেশের আলেম সমাজ। স্বাতন্ত্র্যের দোহাই নিয়ে জাতীয় স্রোতের বাইরে কোণঠাসা এ বিচ্ছিন্নতাবাদী যাত্রা আমাদের আর কতকাল...!
আরেক প্রান্তের গল্পে যাওয়া যাক। এ গল্প বিখ্যাত। ইতিহাসের গল্প। হিমালয় থেকে সুন্দরবন এবং বাংলাদেশ... সবখানে ছড়িয়ে যাওয়া বিদ্রোহের হাওয়া।
ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রাম। গোত্র জাতি ধর্ম দেশ প্রদেশ নির্বিশেষে আসমুদ্রহিমাচল ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত একটিই আওয়াজ, ভারত এবার ছাড়তে হবে।
উপমহাদেশের স্থবিরবুদ্ধি, দারিদ্র এবং অশিক্ষা-ক্লিষ্ট বিশাল জনগোষ্ঠীর রক্তে মগজে ঢুকে গেছে ততদিনে পরাধীনতার বোধ। দিকে দিকে দানা বাঁধছে বিদ্রোহ, নিরস্ত্র কি সশস্ত্র। খেলাফত আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন, স্বদেশী আন্দোলন। সমাজের প্রতিটি স্তরে বিলাতি পণ্য বয়কট করে ইংরেজ শক্তিকে ক্ষতিগ্রস্ত করা এবং দেশজ পণ্য উৎপাদন খাতকে শক্তিবান করাই ছিল এর উদ্দেশ্য। ইতিহাস-করা বিখ্যাত অনেক আলেম এই স্বদেশী আন্দোলনের সাথে ছিলেন। গল্প আছে, হজরত হুসাইন আহমদ মাদানি কুদ্দিসা সিররুহু নাকি দেশী খদ্দেরের পাঞ্জাবি পরিধান করতেন সবসময় এবং কারও গায়ে বিলাতি কাপড়ের পাঞ্জাবি দেখলে ক্রুদ্ধ হতেন, অনেক সময় হয়েছে, কারও বিলেতি কাপড়ের পাঞ্জাবি দেখলে রাগে কলারের ফাঁড়াটা মুষ্ঠিতে ধরে পাঞ্জাবি পুরাটা ছিঁড়ে দুই ভাগ করে ফেলতেন একটানে।
সেই মাদানির, সেই দেওবন্দেরই আরেক সন্তান মওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশের নাম ইতিহাসের পাতা থেকে কাটবার কোনো উপায় নেই যেইসব কারণে, তার অন্যতম সলঙ্গা বিদ্রোহ। মাত্র বাইশ বছর বয়সে তিনি এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়ে রাজরোষের কোপানলে পড়েন এবং উত্তুঙ্গ রাজনীতির সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে যান।
সাল ১৯২২, সাতাশে জানুয়ারি। লাল

শুক্রবার। সেদিনের পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ মহকুমার সলঙ্গা জনপদের ভোরের অধিবাসীরা, আজ শেষবিকেলের কান্না, তখনো তাদের অজানা।
সলঙ্গা হাট ছিল একটি ব্যবসায়িক জনপদ। বিরাট হাট জমত এখানে। সপ্তাহে দুই হাট। শুক্রবারে বড় হাট। দশদিক ছাপিয়ে লোকে ভিড় করত এ বাজারে। সহস্র সহস্র মানুষজন। নানাজাতের ব্যস্ততা।
সেইদিন সকাল থেকে একদল তরুণ-যুবা ছোট ছোট দলে সংঘবদ্ধ–তবলিগ জামাতের গাশতের মতো–দোকানে দোকানে গিয়ে জনে জনে দাঁড়িয়ে বোঝাতে চেষ্টা করছিল সমবেত জনতায়, তোমরা বিদেশি পণ্য বয়কট করো, বিলেতি দ্রব্য কেনাবেচা বন্ধ করো, দেশীয় পণ্য ক্রয়-বিক্রয় ও প্রচার-প্রসার করো। ক্ষেত্রবিশেষে বাধাপ্রদানও চলছিল।
এই খবর চলে গেল বড় থানার দারোগার কাছে। পাবনা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আরএন দাস, জেলা পুলিশ সুপার ও সিরাজগঞ্জ মহকুমা প্রসাশক এসকে সিংহসহ ৪০ জন সশস্ত্র লাল পাগড়িওয়ালা ব্রিটিশ পুলিশের একটি দল আক্রমণোদ্যত হিংস্র কুকুরদলের মতো হাট ঘিরে ফেলে তড়িঘড়ি। সলঙ্গার গরুর হাটের ওদিকটায় ছিল এই বিপ্লবী স্বদেশীদের অফিস, কংগ্রেসের অফিস। গ্রেপ্তার করা হয় হাজার হাজার স্বদেশী ও কংগ্রেসীদের নেতা তরুণ মওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশকে।
তারপর ঘটে অভাবিত কাণ্ড। অকস্মাৎ বাসা ভেঙে গেলে দলে দলে বের হয়ে আসা অভিভূত পিঁপড়ার মতো অসংখ্য লোক বের হয়ে আসতে লাগল সলঙ্গা জনপদের অন্তরণ থেকে।
থানা ঘেরাও করে ফেলল। দাবি একটাই, প্রাণপ্রিয় নেতার মুক্তি চাই। সমুদ্রের উচ্ছ্বাসের মতো ফুঁসে ওঠা দুর্বিনীত জনতার আক্রোশের ঢল রুখতে না পেরে শুরু হয় নির্বিচার অন্ধ গুলিবর্ষণ। লাশের ওপর লাশ, স্তুপ পড়তে থাকে, গলিত রক্তের কালিতে রচিত হতে থাকে ইতিহাসের পাতায় আরেকটি কালো অধ্যায়।
এ শান্ত শীতল মাটির দেশ, অঝোর কান্না তার বুক ভেঙে নামতে চায়।
সলঙ্গা বিদ্রোহ ও গণহত্যা দিবস নামে আজও যা মুক্তি ও সংগ্রামের আখ্যানে স্মরণীয়।
সরকারি নথিপত্র অনুযায়ী সেদিন মৃত্যুবরণ করে সাড়ে চারহাজার মানুষ, আর লোকমুখ বলে দশ হাজার মানুষ মারা যায়। ইংরেজ রাজার অস্ত্রাগারে এত বুলেট-বারুদ মজুত ছিল তার প্রজাদের বুকে বিদ্ধ হওয়ার জন্য!
রহমতগঞ্জে হয় গণকবর। অনেক আহত অর্ধমৃত মানুষকেও ফেলে সেখানে মাটিচাপা দেয়া হয়। এই সলঙ্গা বিদ্রোহকে বলা হয় ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের এক রক্তপিচ্ছিল সিঁড়ি।
বাংলায় গণতন্ত্রের মানসপুত্র যাকে বলা হয়, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ঘনিষ্ঠ সহযাত্রী ছিলেন মওলানা আবদুর রশিদ। তাঁরা একসঙ্গে দাপিয়ে বেড়িয়েছেন বাংলা বিহার উড়িষ্যা আসাম-সহ মহাভারতের নানান রাজ্য প্রদেশ, নিজেকে নিবেদন করে সাংগঠনিক ব্যস্ততায়। ১৯৪৬ সালে তাঁকে বঙ্গীয় আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত করা হয়। গবসনবৎ ড়ভ ঃযব খবমরংষধঃরাব অংংবসনষু-এর সদস্য হিসেবে অবিভক্ত বাংলার ব্যবস্থাপক পরিষদে তিনি বিনা বেতনে শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ, নিঃশর্তে জমিদারি প্রথার বিলুপ্তি, মহিলাদের পতিতাবৃত্তি রোধ ইত্যাদি আইন করার প্রস্তাব করেন। তারপর তো সাতচল্লিশের দেশভাগ, ইংরেজশাসন-পর্ব থেকে তাঁর জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা জড়িয়ে পড়ল পাকিস্তান যুগের লতায় পাতায়।

বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন

একটা প্রশ্ন জাগে যে, ভাষা আন্দোলনের সময়ে তৎকালীন মাদরাসাছাত্রদের ভূমিকা কী, কোনো সম্পৃক্ততা ছিল কি-না? সামগ্রিক অর্থে এই প্রশ্নটা করা যাবে না কারণ বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের একুশে ফেব্রুয়ারির দিনটা প্রধানত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-কেন্দ্রিক, সারা বাংলাদেশের সমস্ত স্কুল-কলেজ-ইউনিভার্সিটি এটার সাথে সঙ্গত ও একত্রে সংহত ছিল কিনা এবং এটা যেমন জিজ্ঞাসার নয়, তেমনই জরুরি নয় সমস্ত মাদরাসা।
ঢাকায় একুশে ফেব্রুয়ারির দুনিয়া-কাঁপানো

ত্রিশ মিনিটের এ মিছিলে তবু প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছিল মাদরাসার ছাত্রদের। ঢাকা আলিয়ার তৎকালীন অধ্যক্ষ, বাংলাভাষার সুসাহিত্যিক মওলানা মুস্তাফিজুর রহমানের সাহেবজাদা, সেই সময়ের ঢাকা আলিয়ার তুখোড় মেধাবী ছাত্র ও নেতা, বর্তমানে মাওলা ব্রাদার্সের প্রকাশক, আতিকুল মওলা, তাঁরা মাদরাসার ছাত্রদের কয়েকটি দল নিয়ে ১৪৪ ধারা ভঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সাথে গিয়ে যোগ দেন।

আমাদের হাতে কলম ছিল না, আমাদের হয়তো নিজেদেরই ইতিহাস নিয়ে বসার অবসরও ছিল না,

কুরআন-হাদিস-ফিকাহ-মানতেকের ইলম ছাড়া আরকিছুতে সওয়াবের আশাও হয়তো ছিল না, তাই আমরা আমাদের অনতি অতীতের হিরোকে চিত্রিত করতে পারিনি, তাঁর জীবন ও কর্মকে ধরতে পারিনি, অন্যেরাও গরজ অনুভব করেনি। তন্নতন্ন করে খুঁজেও পর্যাপ্ত আলেখ্য কোথাও পাওয়া যায় না।

আমাদের জানা উচিত, উর্দু চাপিয়ে দিতে চাওয়া পশ্চিম পাকিস্তানের মারি ও লাহোরের গণপরিষদে সর্বপ্রথম যিনি বাংলাভাষায় বক্তৃতা করে ভাষার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন, তিনি একজন সাহসী মওলানা, আবদুর রশিদ তর্কবাগিশ, ১৯৫২ সালের ১২ আগস্ট।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা একুশে ফেব্রুয়ারির দিন রাস্তায় নেমে আসে কারফিউ ভঙ্গ করে, প্রাণের মায়া সাঙ্গ করে, মেডিক্যাল হোস্টেলের প্রধান ফটকের কাছে সবাই জমায়েত হয়। মেডিক্যাল হোস্টেলের নিকটেই জগন্নাথ হলের অডিটোরিয়াম; যেখানে পূর্ববাংলা প্রাদেশিক পরিষদের সভা বসত। আন্দোলনকারী ছাত্রদের উদ্দেশ্য ছিল পূর্ববাংলা আইন পরিষদে যোগদানকারী সদস্যদের কাছে বাংলা ভাষার দাবির কথা পৌঁছে দেওয়া, যেন তাঁরা অধিবেশনে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার বিষয়ে সুপারিশ গ্রহণ করেন।

ছাত্রদের ওপর পুলিশি হামলার খবর শুনে নেতা তর্কবাগীশ লেজিসলেটিভ এসেম্বলিতে গর্জে উঠে বলেন, এই মুহূর্তে আমাদের বুকের মানিকদের রক্তে লাল হয়ে যাচ্ছে রাজপথ, শহিদের লাশ পড়ে থাকছে দুপুরের রোদে, সে সময়ে আবার কীসের এসেম্বলি!

এই ভাষাসৈনিক বেরিয়ে আসেন সদর্পে এবং ছাত্রদের মিছিলে প্রত্যক্ষভাবে যোগদান করেন ও একাত্মতা পোষণ করেন। সে-রাতেই তিনি মুসলিম লীগ ত্যাগ করেন। আপসহীন এই নেতা বলেন, 'যে দলের সরকার বাংলাভাষার দাবি ভূলুণ্ঠিত করেছে, যারা বাঙালির বুকে গুলি চালিয়েছে, তাদের সঙ্গে এই তর্কবাগীশ থাকতে পারে না।

এইসমস্ত ইতিহাস চর্চিত থাকলে ইসলাম সংশ্লিষ্ট ঘরানাকে এই যে ঢালাওভাবে বাংলা ও বাঙালির প্রতিকূলে দেখাতে চাওয়া, এতো সহজে এ সাহস কারও হতো না, একটা তবে/কিন্তু রাখতেই হতো।

১৯৫২ সালের বাইশে ফেব্রুয়ারি তিনি প্রতিবাদে মুসলিম লীগ ত্যাগ করেন এবং নুরুল আমিন সরকারের প্রতি অনাস্থা ঘোষণা করে প্রাদেশিক পরিষদে একটি বিরোধীদল গঠন করেন। তার পরের দিনই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর প্রয়াণের পর ১৯৫৬ থেকে ১৯৬৭ সনের ফেব্রুয়ারি–টানা এগারো বছর তিনি আওয়ামী লীগের সভাপতি ছিলেন। আওয়ামী লীগ তখন ছয়দফা-পন্থি ও পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক মুভমেন্টপন্থি এ দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ে। প্রথমে ছয়দফা-পন্থী নয়, ১৯৬৭ সালে তিনি পিডিএম-পন্থি আওয়ামী লীগের পূর্ব পাকিস্তান শাখার এডহক কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন। কিন্তু ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের পর তিনি ছয়দফা-পন্থি আওয়ামী লীগে প্রত্যাবর্তন করেন। সত্তরের ইলেকশনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হয়েই পাবনা-২ আসন থেকে পাকিস্তান সংসদের সদস্য নির্বাচিত হন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা-আন্দোলনের পটভূমি নির্মাণেও তাঁর কালজয়ী অবদান। মুজিবনগর সরকারের পক্ষে কাজ করেন এই নেতা। মহান মুক্তিযুদ্ধের ২৪৩ দিন আত্মগোপনে থেকে নেতৃত্ব দেন তিনি। বহু তরুণ যুবক মওলানার প্রেরণায় ট্রেনিং-ক্যাম্পে যান মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিতে। হানাদার বাহিনী

মওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশের বাড়িঘর সমস্ত পুড়িয়ে দেয়। সেখানে তাঁর সংগ্রহে থাকা অসংখ্য মূল্যবান ধর্মীয় কিতাব ও বইপত্র জ্বলে ছাই হয়ে যায়।

১৯৭২ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সংসদ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন মওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ।

স্বাধীনতার পর তথাকথিত সেক্যুলারদের প্রবল দৌরাত্ম্যের সময়টায়, যখন ক্ষমতা পেয়ে ইসলামের শেষ চিহ্নও এই মাটি থেকে মুছে দিতে কৌশলে বদ্ধপরিকর একটা গোষ্ঠী, শাসকদের কান ভারী করা হচ্ছে বাঙালি মুসলমানের আবহমান সংস্কৃতির বিরুদ্ধে, সেই শিকারী সময়ে প্রখর রৌদ্রে চেতনার ছায়া ধরে রাখেন জাতির এই ছায়ানিবিড় মহিরুহেরা, মাওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশেরা।

তাঁর প্রচেষ্টায় অবদমিত মাদরাসাশিক্ষা পুনরায় চালু হয়। বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে তিনি প্রথম মাদরাসাশিক্ষাকে আধুনিকীকরণ ও একে বিজ্ঞানসম্মত রূপ দেন।

তিনি ঋণ সালিশী বোর্ড প্রবর্তন করেন। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য তিনি। বেতার ও টেলিভিশনে কোরআন তেলাওতের নিয়মও তিনি চালু করিয়ে যান।

পঁচাত্তরের পর স্বৈরাচার ও সামরিক শাসন শুরু হলে ১৯৭৬ সালে তিনি গণ আজাদী লীগ নামে একটি নতুন দল গঠন করেন।

স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনের সূচনাকালে ছিল মওলানার প্রাগ্রসর ভূমিকা। তাঁর নেতৃত্বে গঠিত হয় পনেরো দলীয় ঐক্যজোট। এই পনেরো দলীয় ঐক্যজোটই ছিল আন্দোলনের মূলধারা ও চালিকাশক্তি। এর ব্যানার ধরেই পরে চূড়ান্ত ও সফল একটি গণতান্ত্রিক আন্দোলন হয় এবং এরশাদ সরকারের পতন অনিবার্য হয়।

এই শতাব্দীর শুরুতে, ২০০০ সালে এই নিরলস সংগ্রামী জাতীয় নেতাকে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধে স্বর্ণোজ্জ্বল অবদানের জন্য দেয়া হয় মরণোত্তর স্বাধীনতা পদক।

তিনি বাগ্মী ছিলেন, ছিলেন সুলেখকও। তাঁর রচনাগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো–শেষ প্রেরিত নবী, সত্যার্থে ভ্রমণে, ইসলামের স্বর্ণযুগের ছিন্ন পৃষ্ঠা, সমকালীন জীবনবোধ, স্মৃতির সৈকতে আমি, ইসমাইল হোসেন সিরাজী ইত্যাদি। দুঃখ অনুতাপ আফসোস, এর মধ্যে একটি বইও এখন বাজারে পাওয়া যায় না। জাতির বইপুস্তকসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ কি নাকের তৈলাক্ত তুলোর আরাম সরিয়ে জেগে এই দিকটায় অন্তত একটু দেখবেন? এবং লেখকেরাও।

তাঁর নামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বেশকিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সংগঠন ও জনকল্যাণমুখী সংস্থা।

১৯৮৬ সালের বাইশে আগস্ট শেষ রাতে তেজোময় প্রদীপটি নিভে যায় চিরতরে, মৃত্যু-ফেরেশতার সুশীতল ডানার স্নিগ্ধ বাতাসে। বয়স তখন পঁচাশি। ঢাকা পিজি হাসপাতালে। অনন্ত সময়ের একটি বিন্দু থেকে পূর্ণচ্ছেদ পড়ে মওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ অধ্যায়ে।

লেখক : নবীন গল্পসাহিত্যিক



(ছোটগল্প)

নস্টালজিয়া

হাসিব ইমতিয়াজ

রিকশায় বসা অবস্থায়ই চোখ পড়ে প্রকাণ্ড বটগাছটার দিকে। এখনও এই প্রচণ্ড রোদে ছায়া বিলাচ্ছে অবিরাম। বুকটা হঠাৎ করেই খালি হয়ে যায়। সেখানে হুড়মুড় ঢুকে পড়ে স্মৃতির হু হু বাতাস। অজস্র স্মৃতি এসে দাঁড়ায় সামনে–কোনটাকেই উপেক্ষা করা যায় না। কেউ কি চাইলে ফেলে আসা জীবনকে উপেক্ষা করতে পারে? পারে জীবনের কোনো অংশ ভুলে যেতে?

একটা সময় এমনিতেই ফেলা আসা জীবন খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। হয়ে ওঠে বর্তমানে বেঁচে থাকার অবলম্বন। শাহবাগ মোড়টা পেরোতে পেরোতে কতকিছু হাতছানি দিয়ে ডাকে। এই বটগাছ, ক্যাম্পাস,

তুমুল আড্ডার বিকেল আর সেই আড্ডার মধ্যমণি শাহেদ। এখানে দাঁড়িয়েই এক বৃষ্টিস্নাত দুপুরে আমার হাত ধরে আকুল কান্নায় ভেঙে পড়া শাহেদ।
কী এক আড়ষ্টতা সবসময় ওকে সবার থেকে দূরে সরিয়ে রাখত। মেয়েদের আসতে দেখলেই লজ্জায় রক্তিম হয়ে উঠত ওর চোখ-মুখ। খুব দ্রুত পার হয়ে যেত পথ। যেন চোখের আড়াল হতে পারলেই বাঁচে। একই ডিপার্টমেন্টে পড়লেও ওর সঙ্গে কখনো আমার কথা হয়নি। একটি সাহিত্য আড্ডায় আমাদের প্রথম আলাপ। লেখালেখি না করলেও প্রচুর পড়তাম আমি। তাই এসব আড্ডায় প্রায়ই ডাক পড়ত। সেখানে জানলাম শাহেদের বাড়িও আমাদের চট্টগ্রামে। জাতীয় দৈনিকে কবিতা লিখে নিয়মিত।
আড্ডায় খুব প্রাণবন্ত পেলাম তাকে। তারপর নানা সময়ে আরও অনেক কথা হয় আমাদের। কথায় কথায় বুঝতে পারি, ও খুব ধার্মিক। তারও অনেক পরে বুঝতে পারি, আসলে ধর্মই একটা মানুষকে ধীরে ধীরে মহৎ করে তোলে। পৌঁছে দেয়, সততা ও আদর্শের সুউচ্চ শিখরে। কিন্তু আমি এসব ধর্মকর্ম থেকে অনেক দূরে থাকতাম সবসময়।
সেই আড্ডার পর মাঝে-মধ্যে টুকটাক কথাবার্তা হতো। তারপর নানা ঘটনা পরম্পরার ভেতর দিয়ে আমরা পৌঁছে যাই সম্পর্কের গভীরে, মুগ্ধতার নিবিড় অরণ্যে। সেটা বুঝতে পারি অনার্সের শেষের দিকে, যখন আমাদের আলাদা হবার সময় ঘনিয়ে আসে। কিন্তু ততদিনে দু'জনের স্বপ্ন আর লক্ষ্য এক হয়ে গেছে–সাহিত্য করা। শাহেদ কবিতা, আমি গল্প। কল্পনার ভেলায় চড়ে আমরা উড়তে থাকি স্বপ্নের নিঃসীম আকাশে। তারপর আমাদের অনেক দূর হেঁটে যাওয়া–একসাথে, একই স্বপ্ন বুকে।
আমি বাসায় আর শাহেদ হোস্টেলে থাকলেও প্রতিদিনই আমাদের দেখা হওয়া, আড্ডা, ফুসকা খাওয়া সবই চলছিল। বিকেলের নরম রোদের আলোয় উদাসীন একটু বসে থাকা, সন্ধ্যার আগে বুকের ভেতর ঘনিয়ে আসা নতুন স্বপ্ন, নতুন পরিকল্পনা। দিন যত যায়, আমাদের ঘনিষ্ঠতা বাড়ে, সম্পর্ক আরও গভীর হয়।
এদিকে আমি আমূল বদলে যেতে থাকি। শাহেদের কথায় মাঝেমধ্যেই আমি নামাজ পড়ি। হিজাব পরেই ক্লাসে, ক্যাম্পাসে আসি। অনেকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে, কিন্তু আমি ওসব গায়ে মাখি না। তুমুল প্রশান্তির ঢেউ যেন সবখানে। কী এক দুর্বার আকর্ষণ আর ভালোলাগায় মধ্য দিয়ে বয়ে যায় সময়, আমি বুঝতেই পারি না।
একদিন বিকেলে ক্যাম্পাসের বাইরে দাঁড়িয়ে আছি আমি আর শাহেদ। নানা বিষয়ে কথা হচ্ছে, এর মধ্যে অকারণেই মনখারাপ হয়ে যায়। একটু দূরে শতবর্ষী দালানে রোদের করুণ আলো। বুকের ভেতরটা কেমন করে ওঠে। হঠাৎ আকাশ কাঁপিয়ে ডেকে ওঠে মেঘ। তারপর অঝোর ধারায় বৃষ্টি নামে। আমি আর শাহেদ দু'জন পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছি খোলা আকাশের নিচে। বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে হঠাৎ করেই শাহেদ আমার হাত ধরে আকুল কান্নায় ভেঙে পড়ে। আমি নিষ্পলক তাকিয়ে থাকি তার দিকে। আরও জোরে চেপে ধরি ওর হাত। কান্নাভেজা কণ্ঠে আমাকে বলে–'কখনো ভুলে যেয়ো না। জানো, জীবনে কারও সঙ্গে এতটা আপন হয়ে আমি মিশিনি, মিশতে পারিনি। তোমাকে খুব মিস করব জীবনে।' অজানা আশঙ্কায় কেঁপে ওঠে আমার সমগ্র সত্তা। কিংকর্তব্যবিমূঢ় আমি নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকি শুধু। গাল বেয়ে নেমে আসে বেদনার অশ্রুধারা। বৃষ্টির উন্মাতাল স্রোতে মিশে যায় ভালোবাসার বিনম্র জল।
অনার্সের শেষের দিকে হঠাৎ করেই আমার বিয়ে হয়ে যায়। পারিবারিক সম্মানের দিকে তাকিয়ে আমি কিছুই বলতে পারিনি। তিলে তিলে গড়ে তোলা আমার স্বপ্নের নির্মল পৃথিবীটা নিঃশব্দে ভেঙে যায়। কিছু বুঝে ওঠার আগেই চারপাশের সবকিছু কেমন এলোমেলো হয়ে যায়। আমার বিনিদ্র রাতের কান্না আর ফুরোয় না। কয়েকদিন ক্যাম্পাসে যাই না। কী করবো, শাহেদের সামনে কীভাবে দাঁড়াব–কিছুই বুঝতে পারি না। এভাবে নীরবে বয়ে যায় সময়। আমি নির্লিপ্ত জীবনের নির্মম ঘূর্ণন দেখি।
এমন কেন হয়, নিয়তি কেন আমাদের আছড়ে



ফেলে সময়ের নর্দমায়–করোটিতে অজস্র প্রশ্ন খেলা করে। এসব প্রশ্নের কোনো উত্তর নেই। নিজের চেনা পৃথিবীটা খুব সংকুচিত হয়ে আসে। দুর্বিষহ এক যন্ত্রণা-বুকে প্রতিনিয়ত মৃত্যুর কাছ থেকে ফিরি জীবনে। ভাবি, এতসব যাতনার ভেতর তো শাহেদ আছে পৃথিবীতে। ব্যস, এইটুকুই আমার।

একদিন সব আড়ষ্টতা ভেঙে ক্যাম্পাসে যাই। গিয়ে শুনি কয়েকদিন হলো শাহেদ ভার্সিটিতে নেই, কোথাও ওর খোঁজ নেই। আমার মাথায় যেন সমস্ত আকাশ ভেঙে পড়ে। চোখে অন্ধকার দেখি। বুকের ভেতর হাহাকার, চোখে-মুখে বিষণ্নতার প্রচ্ছন্ন ছায়া। কিছুই ভালো লাগে না আমার। এভাবে নিঃশব্দে বয়ে যায় সময়। শাহেদ আর ফিরে আসে না। আমিও আমার অঙ্গীকারের পথ থেকে ক্রমশ বহুদূর সরে পড়ি।

এর মধ্যেই একদিন শাহেদের স্মৃতি বুকে পাড়ি জমাই চট্টগ্রামে। শাহেদকে আর বলা হলো না–তোমাকেও খুব মিস করব জীবনে।

আজ চার বছর পর ঢাকা এসেছি। আমার স্মৃতির শহরে, ভালোবাসার নগরে। লাল ইট-সুরকির ক্যাম্পাস, সার্বক্ষণিক আড্ডার বটতলা, ফেরিঅলাদের হাঁক-ডাক–এসবের মধ্যেই আমি আমার অতীতকে খুঁজে ফিরি। ভেঙে যাওয়া স্বপ্ন, হারিয়ে ফেলা ভালোবাসা–এসবের কিছুই তো আর ফিরে পাব না। কোথায় আছে শাহেদ? জানতে খুব ইচ্ছে করে। গত চার বছরে সবগুলো জাতীয় দৈনিকের সাহিত্যপাতা আমি নিয়মিত সংগ্রহ করেছি শুধু এই একটি নাম দেখার প্রত্যাশায়। প্রতিবারই আমাকে হতাশ হতে হয়েছে। জীবনটাই এমন, চক্রের মতো ঘুরতে ঘুরতে কখন যে সুর হারিয়ে ফেলে। সেই হারিয়ে

প্রাচ্যের রানি নামে খ্যাত হাজার হাজার বছরের নানা ঐতিহ্য সমৃদ্ধ এই চট্টগ্রাম। নিসর্গতন্বী চট্টগ্রাম রূপে-রসে, প্রাচুর্যে, ঐশ্বর্যে ভরা। রূপলোক, অপূর্ব-অপরূপ রতনের আধার।

পাহাড়-সমুদ্র-নদী-হ্রদ-ঝর্ণা, মিথুন-ব্যাকুলিতা নদী, সুতল জলদল সমুদ্র, কচি ধান-পাটের কারুকার্য করা শ্যামল আঁচল-দোলানো দিগন্তবিস্তৃত মাঠ ও স্বচ্ছ-সতেজ, সবুজ তৃণদল-লতাগুল্ম অঢেল নন্দনশ্রীর উপচয়, উপাদান-উপকরণে ভরপুর এই রূপ-নিকুঞ্জ। বঙ্গোপসারের বিশালতা ও দিগন্তবিস্তৃত উত্তাল শৈলমালা, পাহাড়ের অনিন্দ্য মাধুর্য মৌনতা ও বহমান নদ-নদীর কলকাকলিতে মুখর এই রূপসী অনন্যা। স্রোত-জাগানিয়া সুন্দরের আবেশ-মোড়ানো এই উর্বশী, পল্লিবধূর মতো স্নিগ্ধ মমতাময়ী এই রূপবধূয়া। যাঁর বুকে মাথা রেখে কবি নজরুল দেখেছেন সর্পে ফুলের আঁচল বিছিয়ে উদাসিনী বালিকাকে নদীর ঢেউ খেলানো চুল এলিয়ে দিতে। বীর প্রসবিনী চট্টগ্রাম। রত্নগর্ভা এই ভূমি। প্রীতিলতা সূর্যসেনদের বীরত্বগাঁথা ইতিহাসের মূক সাক্ষী এই ভূমি। আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ, আহমদ শরীফ ও আহমদ ছফার মতো যুগশ্রেষ্ঠ অনন্য ইতিহাসবেত্তা, বিশ্লেষক ও সাহিত্যপ্রতিভার কলমে এই ভূমির বীর্যে ঐশ্বর্যমণ্ডিত।

শিক্ষা, সংস্কৃতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, রাজনীতি, অর্থনীতি, সামাজিক ও সম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সেতুবন্ধনে চট্টগ্রামের রয়েছে গর্বিত ইতিহাস। ভৌগলিক অবস্থানের দাপটে সমগ্র এশিয়া তথা প্রাচ্য-প্রতীচ্যের মেলবন্ধন হিসেবে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দুতেও চট্টগ্রাম। ব্রিটিশ উপনিবেশবিরোধী আন্দোলনের সূচনালগ্নে সিপাহি বিপ্লব থেকে শুরু করে বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, স্বাধীনতাসংগ্রাম, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধসহ সকল ঐতিহাসিক পটপরিবর্তন ও আন্দোলন-সংগ্রামের বীরত্বগাঁথা হাজার বছরের ঐতিহ্যময় চট্টগ্রামের ইতিহাস স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ কালের পটে। অগ্নিগর্ভ বীর চট্টগ্রাম এক সমৃদ্ধ সংগ্রামী অতীত, ধর্ম-কৃষ্টি, আঞ্চলিক ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির অপার ঐশ্বর্যের ধারক বাহক হয়ে গর্বের সঙ্গে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

চট্টগ্রাম নামের উৎপত্তি

বৈচিত্রময়ী চট্টগ্রামের নামও বৈচিত্রে ভরা। খ্রিষ্টীয় দশম শতকের আগে চট্টগ্রাম নামের অস্তিত্ব ছিল না। অর্থাৎ চট্টগ্রাম নামের কোনো উৎসের সন্ধান পাওয়াা যায় না। তাই দেখা যায়, সুপ্রাচীনকাল থেকে এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন পরিব্রাজক ও পণ্ডিতগণের লিখিত বিবরণে, অংকিত মানচিত্রে এবং এখানকার শাসক গৌড়ের সুলতান ও রাজাদের মুদ্রায় চট্টগ্রাম বহু নামে খ্যাত ছিল। এ পর্যন্ত চট্টগ্রামের ৪৮টি নাম পাওয়া গেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—সমন্দর, আদর্শ দেশ, সুহ্মদেশ, ক্লিং বা কালেন, রম্যভূমি, চিতাগাঁও, চিৎগাঁও, চট্টল, চৈত্যগ্রাম, সপ্তগ্রাম, চট্টলা, চট্টগ্রাম, চক্রশালা, চন্দ্রনাথ, চরতল, চিতাগঞ্জ, চাটিগাঁ, শ্রীচট্টল, সাতগাঁও, সীতাগঙ্গা, সীতাগাঙ্গ, সতের কাউন, পুষ্পপুর, রামেশ, কর্ণবুল, সহরেসবুজ, পার্ব্বতী, খোদ্দ-আবাদ, সোদকাওয়ান, ফতেয়াবাদ, আনক, রোশাং, ইসলামাবাদ, মগরাজ্য, কিরাত, যতরকুল, চক্রশা, শ্রীযুক্ত কেলিশহর ও পেন্টাপোলিস ইত্যাদি। কিন্তু কোনো নামের সঙ্গে গুটিকয়েক ব্যক্তি ছাড়া কেউ একমত হননি। সে-সব নাম থেকে চট্টগ্রামের নাম-উৎপত্তির সম্ভাব্য ও চট্টগ্রামের নামের সঙ্গে ধ্বনিমিলযুক্ত কিছু নামের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা হলো।

শ্যাৎগাঙ্গ : বার্ণোলী সাহেবের মতে আরবি শ্যাৎগাঙ্গ শব্দ বিবর্তিত হয়ে চট্টগ্রাম নামের উদ্ভব হয়েছে। শ্যাৎ অর্থ বদ্বীপ, গাঙ্গ অর্থ গঙ্গানদী। চট্টগ্রাম গঙ্গানদীর মোহনাস্থিত বদ্বীপ—প্রাচীন আরব বণিক-নাবিকদের এই ধারণা থেকে এর নামকরণ করা হয়েছিল শ্যাৎগাঙ্গ। পরবর্তীকালে শ্যাৎগাঙ্গ নাম বিবর্তিত হয়ে চট্টগ্রাম নামের উৎপত্তি।

সুদকাওয়ান : আফ্রিকা মহাদেশের অন্তর্গত মরক্কোর অধিবাসী ইবনে বতুতা ১৩৪৬ খ্রিষ্টাব্দে চট্টগ্রাম বন্দর হয়ে বঙ্গ ও আসাম পরিভ্রমণ করেন। তিনি তাঁর ভ্রমণকাহিনিতে চট্টগ্রামকে সুদকাওয়ান নামে উল্লেখ করেন।

চাটিগাঁ : চট্টগ্রামের মুসলমানদের মধ্যে

ফেলা সুর আর জোড়া স্বপ্নে মা। নতুন সুর উঠে মিলিয়ে যায় নতুন মোহনায়। জীবন বয়ে চলে আপন স্রোতে।

বিকেলের নরম আলো এসে পড়ে বটগাছের সবুজ পাতায়। আমি ধীরে ধীরে হেঁটে গিয়ে দাঁড়াই বটগাছের নিচে। অজস্র ছেলে-মেয়ের কোলাহলে মুখরিত। আমি সেই জায়গাটায় গিয়ে দাঁড়াই যেখানে আমি আর শাহেদ প্রতিদিন বসতাম। বুকের ভেতরটা হু হু করে কেঁদে ওঠে। নিজেকে সামলে রাখতে পারি না। গাল বেয়ে নেমে আসে অশ্রুর বাঁধভাঙা জোয়ার।

রক্তিম গোধূলির সৌন্দর্য আরেকটু বাড়িয়ে দিয়ে বৃষ্টি নামে আকস্মিক। আমি বিস্মিত চোখে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকি। আজও আমি চাই, এই তুমুল বৃষ্টিতে কেউ আমার হাত ধরে আকুল কান্নায় ভেঙে পড়ুক।

বৃষ্টি থেমে যায়, বেলা গড়িয়ে যায় সন্ধ্যার দিকে। কেউ এসে হাত ধরে না আমার। কান্নামিশ্রিত কণ্ঠে বলে না, আমাদের আবার দেখা হয়ে গেল, নওরীন। জীবনটা এমন, বুঝেছো! কত রঙ যে তার আকাশে ঝিলমিল।

কতদিন আমাদের আকাশে বৃষ্টি নেই জানো, শাহেদ? আজ আমি একা, বড় একলা। আমাদের স্মৃতিরা কি এভাবেই মিলিয়ে যাবে? কত গল্প, হাসি, আড্ডা, স্বপ্ন—সবই কি এমন নির্লপ্ত হারিয়ে যাবে—তোমার কি মনে পড়ে না সেইসব দিন, প্রহর?

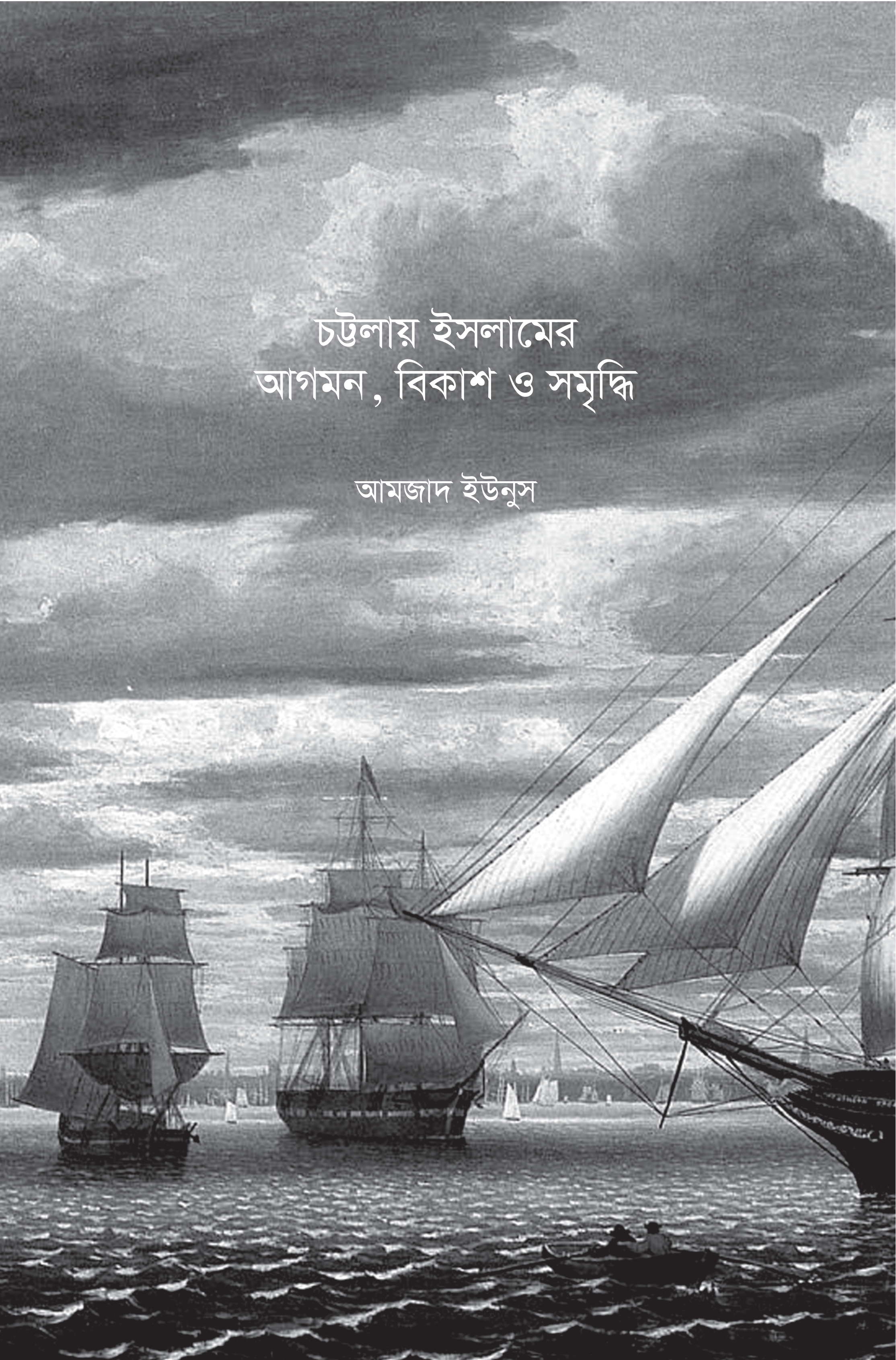
এভাবে জীবন আমাদের সম্মুখ থেকে আড়াল করে ফেলে কত কিছু—আমাদের প্রেম, মুগ্ধতা কিংবা উপেক্ষা। চেনা-পরিচিত দৃশ্যগুলো দূর আকাশের তারার মতো মিলিয়ে যায় দূরে কোথাও। স্মৃতির মরীচিকার দিকে তাকিয়ে আমরা পার করে দিই একটা মানবজনম। নিয়তির কাছে হেরে যায় আমাদের স্বপ্ন, সাধ, ভালোবাসা। হারিয়ে যাওয়া মানুষের জন্য বুকভর্তি আক্ষেপ নিয়ে পাড়ি দিতে হয় জীবন, বাস্তবতা। তবু মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে সন্ধ্যার নির্জনতা বুকে পুরে আমরা হেঁটে যাই নীলক্ষেতের পথে। তোমার কি একটুও ইচ্ছে করে না? হয়তো আগের মতোই নিশ্চল, নিশ্চুপ তোমার জীবন। যেখানে আমার এইসব ইচ্ছে মূল্যহীন।

এই বৃষ্টি, অন্ধকার বিকেল—মায়ার বর্ণিল রেখা টেনে টেনে ইষ্টিশনে পৌঁছার একটু আগে ছেড়ে যাওয়া ট্রেনের মতো মিলিয়ে যায় মহাকালের পথে। কেউ একজন প্রতীক্ষার প্রতিমূর্তি বুকে দাঁড়িয়ে থাকে নিশ্চল।

ফরিদাবাদ, ঢাকা

চট্টলায় ইসলামের আগমন, বিকাশ ও সমৃদ্ধি

আমজাদ ইউনুস



প্রচলিত জনশ্রুতি থেকে জানা যায়, প্রাচীনকালে চট্টগ্রাম ছিল জিন-পরি অধ্যুষিত দেশ। পীর বদর শাহ এখানে আগমন করে অলৌকিক চাটির (মৃৎ-প্রদীপ) আলোর তেজের সাহায্যে জিন-পরি বিতাড়িত করার ফলে এই স্থানের নাম হয় চাটিগাঁ।

চৈত্যগ্রাম : চট্টগ্রামের বাঙালি বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের অভিমত এই যে, প্রাচীনকালে এখানে অসংখ্য বৌদ্ধ চৈত্য অবস্থিত ছিল বলে এ স্থানের নাম হয় চৈত্যগ্রাম। চৈত্য অর্থ বৌদ্ধমন্দির কেয়াং বা বিহার। এই চৈত্যের সঙ্গে গ্রাম শব্দ যুক্ত হয় বলে চৈত্যগ্রাম নামের উদ্ভব ঘটে। পরবর্তীকালে চৈত্যগ্রাম নাম বিবর্তিত হয়ে চট্টগ্রাম রূপ প্রাপ্ত হয়।

চতুঃগ্রাম : ব্রিটিশ আমলের গেজেটিয়ার লেখক ওমলি সাহেবের মতে, সংস্কৃত চতুঃগ্রাম শব্দ থেকে চট্টগ্রাম নামের উৎপত্তি। চতুঃ অর্থ চার। চতুঃ শব্দের সঙ্গে গ্রাম শব্দ যুক্ত হয়ে চতুঃগ্রাম হয়। চতুঃগ্রাম বিবর্তিত হয়ে চট্টগ্রাম রূপ প্রাপ্ত হয়।

ইবনে বতুতার বিবরণীতে চট্টগ্রাম

মরক্কোর বিশ্ববিখ্যাত পরিব্রাজক ইবনে বতুতা। তাঁর পুরো নাম শেখ আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ। ২১ বছর বয়স থেকে শুরু করে জীবনের পরবর্তী ৩০ বছরে তিনি প্রায় ৭৫ হাজার মাইল পথ পরিভ্রমণ করেছেন। ঘুরে বেড়িয়েছেন এক স্থান থেকে অন্য স্থানে। জানার ও শেখার সুতীব্র বাসনা নিয়ে কখনো জলে কখনো ডাঙায় ভ্রমণ করেছেন দীর্ঘকাল। ইবনে বতুতা ১৩৪৬ খ্রিষ্টাব্দে বাংলায় সফর করেন। সর্বপ্রথম পা রাখেন চট্টগ্রামে। তাঁর ভ্রমণগ্রন্থে চট্টগ্রামকে তিনি চিত্রিত করেছেন এভাবে–'বাংলাদেশের যে শহরে আমরা প্রবেশ করলাম তা হলো সোদকাওয়াঙ (চট্টগ্রাম)। এটি মহাসমুদ্রের তীরে অবস্থিত একটি বিরাট শহর, এরই কাছে গঙ্গা নদী– যেখানে হিন্দুরা তীর্থ করেন–ও যমুনা নদী একসঙ্গে মিলেছে এবং সেখান থেকে প্রবাহিত হয়ে তারা সমুদ্রে পড়েছে। গঙ্গা নদীর তীরে অসংখ্য জাহাজ ছিল, সেইগুলি দিয়ে তারা লখনৌতির লোকেদের সঙ্গে যুদ্ধ করে। ...আমি সোদওয়াঙ ত্যাগ করে কামরু (কামরূপ) পর্বতমালার দিকে রওনা হলাম।'

ইবনে বতুতার ভ্রমণগ্রন্থে সেই সেময়ে এখানকার জলবায়ু ও প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনা মিলে। বাংলার সুদৃশ্য শ্যামল সবুজ প্রান্তর, পল্লির ছায়াসুনিবিড় সবুজের সমারোহ তাঁকে এতটাই মুগ্ধ করেছে যে, তিনি উচ্ছ্বসিত হয়ে মন্তব্য করেছেন, 'আমরা ১৫ দিন নদীর দুপাশে সবুজ গ্রাম ও ফলফলাদির বাগানের মধ্য দিয়ে নৌকায় পাল তুলে চলেছি, মনে হয়েছে যেন আমরা কোনো পণ্যসমৃদ্ধ বাজারের মধ্য দিয়ে চলছি। নদীর দুই কূলে জমিতে জলসেচের কল, সুদৃশ্য গ্রাম ও ফলের বাগান, যেমনটি রয়েছে মিশরের নীলনদের দুই তীরে।'

সেই সময় বাংলার সুলতান ছিলেন ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ। ইবনে বতুতা তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। লখনৌতির সুলতান আলাউদ্দিন আলি শাহ ও তাঁর মধ্যকার তীব্র সংঘর্ষের স্পষ্ট চিত্রও তুলে ধরেছেন। তৎকালীন মুসলিম শাসনামলে মানুষের আর্থিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত সচ্ছল। দেশে খাদ্যশস্যের প্রাচুর্য এবং দৈনন্দিন ব্যবহার্য পণ্যের সস্তা দর উল্লেখ করে তিনি লিখেছেন–'পণ্যের এমন প্রাচুর্য ও সস্তা দর আমি পৃথিবীর আর কোথাও দেখিনি।' তাঁর বর্ণনায় পাওয়া যায়, মাত্র এক দিরহাম দিয়ে তখন বাংলাদেশে আটটি স্বাস্থ্যবান মুরগি পাওয়া যেত। এ ছাড়াও এক দিরহামে ১৫টা কবুতর, দুই দিরহামে একটি ভেড়া এবং এক স্বর্ণমুদ্রারও কম মূল্যে দাস-দাসী কিনতে পাওয়া যেত।

ইবনে বতুতার বিবরণে ফুটে ওঠে তৎকালীন বাংলার কিছু সামাজিক বিষয়ের দুর্লভ চিত্র। হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের লোকের ওপর সুফি-দরবেশদের প্রভাব তিনি লক্ষ করেছেন সে-কালে।

সাধক-ফকিরদের জন্য ছিল বিশেষ সুযোগ-সুবিধা। সুলতানের আদেশ অনুসারে নদী পারাপারের জন্য সাধক-ফকিরদের কোনো অর্থ প্রদান করতে হতো না এবং স্থানীয় জনগণের কর্তব্য নির্ধারিত ছিল ফকির-দরবেশদের বিনামূল্যে খাদ্য সরবরাহ করা। রাষ্ট্রীয় নির্দেশ মতে এমন রেওয়াজ ছিল যে, কোনো ফকির-দরবেশ কোনো শহরে

পৌঁছুলে তাঁকে অর্ধ দিনার ভাতা প্রদান করতে হতো। এ-জাতীয় আরও অনেক সামাজিক দুর্লভ বিষয়ে নোঙর ফেলেন ইবনে বতুতা। ইবনে বতুতার বিবরণেই আমরা বাংলার অধিবাসীদের জীবন সম্পর্কে সর্বপ্রথম প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করি। তিনি তাঁর বিবরণের তথ্য সংগ্রহ করেছেন এদেশে তাঁর ভ্রমণের অভিজ্ঞতা থেকে এবং আপামর জনগণের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগাযোগের মাধ্যমে। তাঁর বিবরণ সংক্ষিপ্ত হলেও তাতে বাংলার মানুষের জীবনের প্রায় সকল দিক সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। প্রকৃতির সৌন্দর্য অবলোকনে তাঁর প্রাণবন্ত অনুভূতি, সুক্ষ্ম হৃদয়াবেগ এবং তাঁর সাবলীল প্রকাশভঙ্গি নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনাকে প্রাণবন্ত করে তুলেছে।

চট্টগ্রামে ইসলামের আগমন

চট্টগ্রাম বাংলার বাবুল ইসলাম বা ইসলামের প্রবেশ দ্বার হিসাবে খ্যাত। উপমহাদেশে সর্বপ্রথম চট্টগ্রামই ইসলামের দীপ্ত আভায় উদ্ভাসিত হয়েছিল। পরে আস্তে আস্তে তা পুরো বাংলায় ও উপমহাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। চট্টগ্রামে তিন পর্যায়ে ইসলামের আগমন ঘটে। প্রথমত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সাহাবিদের মাধ্যমে, দ্বিতীয়ত আরব বণিকদের মাধ্যমে, তৃতীয়ত সুফি-সাধকের মাধ্যমে। উল্লেখিত তিনটি বিষয়ে ইতিহাসের সোনালি অধ্যায় থেকে আসুন কিছু জানি।

চট্টগ্রামে সাহাবিদের আগমন

রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সাহাবিদের পদধূলিতে ধন্য এই চট্টলা। সাহাবিদের পবিত্র স্পর্শে এ মাটি সতেজ ও প্রাণবন্ত হয়। এ অঞ্চলের মাটি ও মানুষের অনন্ত তৃষ্ণা মেটে সাহাবাদের সংস্পর্শে। তাঁদের দীপ্ত জ্যোতি ঠিকরে পড়েছিল এ অঞ্চলের প্রতিটি কোণায়-কোণায়, এ মাটির প্রতিটি ধূলিকণায়। তাঁদের দীপশিখার স্নিগ্ধ ছোঁয়ায় জ্বলে উঠেছিল আরও শত সহস্র দীপমালা। একবার নয় একাধিক বার এ অঞ্চল সাহাবিদের পবিত্র পদভারে মুখরিত হয়েছে। এ অঞ্চলে কবে সাহাবিদের আগমন ঘটে, তা জানতে হলে আমাদের জানতে হবে ভারতের কেরালা ও চীনে ইসলাম আগমনের ইতিহাস।

কেরালায় ইসলামের আগমন

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে আরবে ইসলাম ধর্মের উদ্ভব ও বিস্তৃতির প্রাক্কালে আরব বণিকদের সঙ্গে মুসলিম ধর্মপ্রচারক কয়েকজন সাহাবি হজরত মালেক দিনার রাদিয়াল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে কেরালার 'কুডুংগালোর' এলাকায় আগমন করেন। তখন সেখানের 'চেরা' রাজ্যের শাসনকর্তা ছিলেন ব্রাহ্মণ-রাজা 'চেরামন পেরুমল'। তিনি ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে অবগত হয়ে এর প্রতি আকৃষ্ট হন। বিস্মিত রাজা ইসলাম ধর্ম গ্রহণের ইচ্ছে পোষণ করেন এবং তাঁর উত্তরসূরির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে আগত সাহাবায়ে কেরামদের নিয়ে আরব গমন করেন। সেখানে হজরত মুহম্মদ সাল্‌্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের হাতে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। মুসলিম হবার পর তাঁর নাম রাখা হয় 'তাজউদ্দিন'। অতঃপর সাহাবাদের সঙ্গে নিয়ে ভারতের ফেরার পথে চেরা রাজ তাজউদ্দিন ওমানের সালালায় ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুশয্যায় শায়িত রাজা তাঁর উত্তরসূরিদের উদ্দেশে একটি পত্র লিখে অনুরোধ জানান, যেন রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলাম প্রচারে সহায়তা করা হয় এবং তাঁর স্মৃতি রক্ষার্থে যেন একটি মসজিদ নির্মাণ করা হয়। সাহাবা হজরত মালেক দিনার, তাঁর পরিবারবর্গ, মালেক বিন হাবিবসহ বহু সাহাবা কেরালায় ফিরে আসেন। সরকারিভাবে মুসলমানদের মসজিদ নির্মাণ করার জন্য ভূমিদান করা হয়। ফলে সাহাবি হজরত মালেক দিনারের নেতৃত্বে ৬২৯ খ্রিষ্টাব্দে কেরালার 'কুডুংগালোর'-এ 'চেরামন পেরুমল জামে মসজিদ' নির্মিত হয়েছিল, যা এশিয়ার প্রথম মসজিদ হিসেবে পরিচিত।

চীনে ইসলামের আগমন

চীনে ইসলাম প্রচারের ইতিহাস সুপ্রাচীন। চীনা ভাষায় সে দেশে ইসলামের আগমন সম্পর্কিত যেসব তথ্যসূত্র পাওয়া যায়, তা থেকে জানা



যায়, খ্রিষ্টীয় ৬২২ সনের কাছাকাছি কোনো এক সময়ে (হিজরি ৩ সনে) চীন উপকূলে ইসলাম প্রচারকরা আগমন করেন। দলনেতা ছিলেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের মাতুল হজরত আবু ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু। তাঁর সঙ্গে ছিলেন সাহাবি হজরত কায়েস ইবনে হুজায়ফা, হজরত উরওয়াহ ইবনে আসাসা এবং হজরত আবু কায়েস ইবনুল হারেস রাদিয়াল্লাহু আনহুম। দলনেতা হজরত আবু ওয়াক্কাস এ সময় চীনের ক্যান্টন বন্দরে অবস্থান করেন। সে-স্থানে তাঁরই প্রতিষ্ঠিত কোয়াংটা মসজিদ আজও বিদ্যমান। মসজিদের অদূরেই তাঁর কবর ১৪০০ বছর ধরে চীনা মুসলমানদের সর্বাপেক্ষা পবিত্র ও প্রিয় জিয়ারতগাহ হিসেবে গণ্য করা হয়। অন্য দুইজন সাহাবি উপকূলীয় ফু-কিন প্রদেশের চুয়ান-চু বন্দরের নিকটবর্তী লিং নামক পাহাড়ের পাদদেশে সমাহিত রয়েছেন।

দি হিস্ট্রি অব ইসলাম-ইন চায়না এবং দি লার্জ মুসলিম পপুলেশান ইন ওয়েস্টার্ন চায়না গ্রন্থদ্বয় সূত্রে জানা যায়, চীনের বুদ্ধ-ধর্মাবলম্বী অধিবাসীরা সর্বপ্রথম ৬১৭-৬১৮ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে ইসলাম ধর্মের সংস্পর্শে আসেন। সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস তাঁর তিন সাথি হজরত সাঈদ, ওহাব বিন আবু কাফছা ও জাহাস রাদিয়াল্লাহু আনহু (অন্য সূত্রে জাফর ইবনে আবি তালিব)-কে নিয়ে ৬১৬ খ্রিষ্টাব্দে আবিসিনিয়া থেকে জাহাজযোগে চট্টগ্রাম বন্দরে পৌঁছেন। সেখান থেকে তাঁরা ৬১৭ বা ৬১৮ খ্রিষ্টাব্দে চট্টগ্রাম-কামরূপ-মণিপুর রুট দিয়ে ধর্ম প্রচারার্থে চীনে গমন করেন। দ্বিতীয়বার ওহাব বিন আবু কাফছা রাদিয়াল্লাহু আনহু ৬২৯ খ্রিষ্টাব্দে জাহাজযোগে চীনে গমন করেন। সুতরাং তিনিও নিঃসন্দেহে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার তৎকালীন গেইটওয়ে খ্যাত বন্দর চট্টগ্রামে খাদ্য, তেল ও সুপেয় পানির জন্য অবস্থান করেই গেছেন।

তৃতীয় দফায় ৬৩৭ খ্রিষ্টাব্দে সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর তিনজন প্রিয়সাথি হজরত সুহেলা আবু আরজা, ওয়ায়েস করনি ও হাসান ইবনে সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহুমকে নিয়ে চীনে পাড়ি জমান। ফিরতি পথে তাঁরা চীনের 'ইউনান-মণিপুর-চট্টগ্রাম' রুট হয়ে চট্টগ্রাম আসেন। পরে চট্টগ্রাম থেকে জাহাজযোগে আরবে ফিরে যান।

চতুর্থবার ইসলামি খেলাফতের তৃতীয় খলিফা হজরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু ৬৫০ খ্রিষ্টাব্দে তৎকালীন চীন সম্রাট (টেং সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা) জাও জোং-এর দরবারে একটি সরকারি মিশন প্রেরণ করেন। এই মিশনেরও প্রধান ছিলেন সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস। খলিফা এই মিশনের মাধ্যমে চীন সম্রাটকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ এবং চীনে ইসলাম প্রচারের দাওয়াত পাঠান। চীন সম্রাট সানন্দে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং ইসলাম প্রচারে সহযোগিতায় সম্মত হন। অতঃপর ৬৫১ খ্রিষ্টাব্দে চীনের ক্যান্টনে সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর তত্ত্বাবধানে প্রথম মসজিদ নির্মিত হয়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের স্মৃতি-স্মারক ওই মসজিদের নাম রাখা হয়, 'হুইসাং মসজিদ'। হুইসাং মসজিদের পাশেই হজরত আবু ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু ও আরও কয়েকজন সাহাবির সমাধি রয়েছে।

ভারতের কেরালা ও চীনে এই সব সাহাবির আগমনে আগে নবিজির মক্কিজীবনেই চট্টগ্রামে ইসলামপ্রচারকদের আগমন ঘটেছিল এবং ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহুর সময়ে (৬৩৪-৬৪৪ খ্রিষ্টাব্দ) এখানে ব্যাপকভাবে ইসলাম ধর্ম প্রচার শুরু হয়েছিল। চট্টগ্রামের পশ্চিম পাশে দক্ষিণ ভারতের কেরালায় যখন ৬২৯ খ্রিষ্টাব্দে (চিরামন পেরুমল জামে মসজিদ নির্মাণের কাল) এবং পূর্ব পাশের চীনে যখন ৬৫১ খ্রিষ্টাব্দে (হুইসাং জামে মসজিদ নির্মাণের কাল) ইসলামের দাওয়াত পৌঁছেছিল, তার পূর্বেই (৭ম শতাব্দীর প্রারম্ভে) যে চট্টগ্রামে ধর্মপ্রচারক সাহাবায়ে কেরামের আগমন ঘটেছিল তা আজ সুদৃঢ়ভাবে প্রমাণিত। কারণ, সাহাবায়ে কেরামদের চীন সফর চট্টগ্রাম-কামরূপ-মণিপুর-ইউনান রুট এবং ফিরতি পথের
ইউনান-আসাম-মণিপুর-চট্টগ্রাম রুট আবিষ্কার তৎকালীন চট্টগ্রামে ইসলাম ধর্মের প্রচার-প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মপ্রচারক আউলিয়া দরবেশ ও সাহাবায়ে কেরামদের মাঝে সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস, ওহাব বিন আবু কাফছা, সাঈদ, ওয়ায়েস করনি ও জাহাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমের অবস্থানেরও নিশ্চিত প্রমাণ। এই সাহাবিগণের ৬১৫-৬১৬ খ্রিষ্টাব্দে চট্টগ্রাম আগমন ও ৬১৭-৬১৮ খ্রিষ্টাব্দে চীন গমনে এও প্রমাণিত হয়েছে যে, তাঁরা অন্তত দুই বছর কাল চট্টগ্রামে অবস্থান করেছেন। এর প্রধান কারণ, তৎকালে নৌবাণিজ্যে একচ্ছত্র অধিকারী আরবদের কাছে বর্তমানের চট্টগ্রাম বন্দর প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে এশিয়ার অন্যতম প্রধান বন্দর রূপে সুপরিচিত ছিল। এ বন্দরে নোঙর ফেলা ছাড়া বিকল্প ব্যবস্থা ছিল না।

কেরালা ও চীনা-সূত্র ছাড়াও বাংলাদেশের বেশ কিছু ইতিহাসবিদ এবং গবেষকদের লেখায়ও সমসাময়িক কালে চট্টগ্রামে ধর্ম প্রচারার্থে আগত সাহাবায়ে কেরামদের আগমনের তথ্য পাওয়া যায়।

গৌরবময় ইতিহাস সাক্ষী দেয়, হিজরি-পূর্ব সময়ে ৬১৭ খ্রিষ্টাব্দে মরুর দেশের বাদশাহ নাজ্জাশির দেয়া জাহাজে করে ইসলাম প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের বিখ্যাত সাহাবি আবু ওয়াক্কাস মালিক ইবনে ওহাই ইবনে আবদে মানাফেরের নেতৃত্বে চার জন সাহাবি চট্টগ্রাম বন্দর হয়ে এ অঞ্চলে আগমন করেন। তাঁরা হলেন হজরত তামিম আনসারি, হজরত কায়েস ইবনে হুজাইফা, হজরত উরওয়াহ ইবনে আছাছা ও হজরত আবু কায়েস হারিস রাদিয়াল্লাহু আনহুম। তাঁরা চট্টগ্রাম বন্দরে জাহাজ ভিড়িয়ে চার-পাঁচ বছর চট্টগ্রামে অবস্থানের পর চীন গমন করেন।

৬১৭ খ্রিষ্টাব্দের পরে আমিরুল মুমিনিন হজরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সময়ে তাবেয়িদের একটি দলও চট্টগ্রাম সফর করেন। তাঁদের সময়কাল নির্দিষ্টভাবে পাওয়া যায়নি। তবে তাঁদের সাত জনের নাম পাওয়া যায়। তাঁরা হলেন মুহাম্মদ মামুন, মোহাইমিন, আবু তালেব, মুরতজা, আবদুল্লাহ, হামিদউদ্দিন এবং হোসাইন। সাত জনের এই প্রতিনিধিদলটি চট্টগ্রামে ইসলাম প্রচার ও প্রসারের কাজে ব্যাপক সময় দেন। তাঁরা চট্টগ্রাম অঞ্চলে নওমুসলিমদের নিয়ে প্রথম পবিত্র ঈদের নামাজ আদায় করেন দেয়াং পাহাড় নামক কোনো স্থানে। এর পরবর্তী সময়ে আর পাঁচটি দল খণ্ড খণ্ডভাবে চট্টগ্রাম

আগমন করেন।
আরাকানের ইতিহাস তলিয়ে দেখলে আমরা জানতে পারি, রাজা হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে (৬০৬-৬৪৩ খ্রিষ্টাব্দে) আরব দেশ থেকে একটি ছোট্ট প্রতিনিধিদল বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার করতে আসেন। তাঁদের কথাবার্তা ও চরিত্রমাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে এই অঞ্চলের অধিবাসীগণ ব্যাপকহারে ইসলাম গ্রহণ করেন।
এ ছাড়া ড. কেএন ভট্টশালী আরাকানি রাজাদের ইতিহাসগ্রন্থ 'রাত জা তু'-এ এর একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন এভাবে—'কানরা দজাগির বংশীয় রাজা সত্য ইঙ্গত চন্দয়ত-এর আমলে (৭৮৮-৮১০খ্রিষ্টাব্দ) আরাকান উপকূলের রণবী দ্বীপের সঙ্গে সংঘর্ষে কয়েকটি কুল বা বিদেশি জাহাজ বিধ্বস্ত হয়। রাজা জাহাজের মুসলিম আরোহীদের উদ্ধার করে বসবাসের ব্যবস্থা করেন।' এ বর্ণনা থেকেও প্রতীয়মান হয় যে, যারা আরাকানে গিয়েছিলেন তাঁরা নিশ্চয় চট্টগ্রাম হয়ে গিয়েছিলেন।
১৯৮৭ সালে লালমনির হাট জেলার মসতের পাড় মৌজায় একটি টিলা খননের সময় একটি মসজিদের ধ্বংসাবশেষ উদ্ধার হয়। যেখানে এর নির্মাণকাল উৎকীর্ণ ছিল ৬৯ হিজরি। যারা লালমনির হাটে এসেছিলেন নিশ্চয় তাঁরা বাংলার দক্ষিণাঞ্চলের সমুদ্র পথেই এসেছিলেন। আরবগণ দক্ষিণ চীন সাগর পাড়ি দিয়ে চীনের ক্যান্টন বন্দর, বর্তমান চট্টগ্রাম, প্রাচ্যের জাভা, সুমাত্রা প্রভৃতি বন্দরসমুহে বাণিজ্য করতেন। উপরোক্ত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে আল্লামা জয়নুদ্দিন তাঁর তুহফাতুল মুজাহিদিন গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, নবিজির যুগে চট্টগ্রামে ইসলাম আসে। শাহজালাল রহমতুল্লাহি আলায়হি সিলেট বিজয়ের সময় যে বুরহানুদ্দিনের আলোচনা পাওয়া যায়, তিনি এই আরবদেরই বংশধর। প্রখ্যাত গবেষক ড. হাসান জামান রচিত 'সমাজ, সংস্কৃতি, সাহিত্য' গ্রন্থে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের যুগে এই অঞ্চলে ইসলাম প্রচারের কথা প্রশ্নাতীতভাবে উল্লেখ আছে। মাওলানা আবদুল হাই লৌখনভি স্বীয় গ্রন্থ নুজহাতুল খাওয়াতের ও মাওলানা আশরাফ আলি থানভি-সহ উপমহাদেশের নামকরা ঐতিহাসিকগণ উপরোক্ত মতের সমর্থনে অনেক তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপন করেছেন। চট্টগ্রামের ঐতিহাসিকদের মাঝে যাঁরা চট্টগ্রামে সাহাবাগণের আগমনের স্বীকৃতি দেননি, তাঁরা আবার ঠিক কোন সময়ে এ দেশে ইসলাম এসেছে তার ব্যাপারেও সঠিক কোনো ধারণা দিতে পারেননি।

আরব বণিকগণ

ইসলামের সোনালি যুগের ও তার নিকটবর্তী যুগের মুসলমানগণ যেই উদ্দেশ্যে যেখানে গিয়েছেন, ইসলামের জীবনাদর্শের কথা মানুষের সামনে তুলে ধরতেন। আরব বণিকগণও তাঁদের কর্তব্য ও দায়িত্বের কথা ভোলেননি। ব্যবসার উদ্দেশ্যে তাঁরা বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করতেন। মানুষের সামনে তুলে ধরতেন ইসলামের মর্মবাণী।
আরব ভূ-খণ্ড ছিল একটি উপদ্বীপ। তার তিন দিকের স্থলভাগের অধিকারী ছিল তৎকালীন দুই বৃহৎ পরাশক্তি রোম ও পারস্য। এ দুই পরাশক্তিকে ডিঙিয়ে স্থলপথে বাণিজ্য পরিচালনা আরবদের জন্য ক্রমশ কঠিন হয়ে পড়ে। তাই বাধ্য হয়ে সামুদ্রিক পথকে বেছে নিতে হয় তাদের।
আরবদের এই নৌ-বাণিজ্যের সময় বঙ্গোপসাগরে চট্টগাম বন্দর ছিল খুবই সুবিধাজক প্রোতাশ্রয়। আরবরা এখান থেকে সুগন্ধি ও মসলাজাত দ্রব্যাদি আমদানি করে ইউরোপের বাজারে বিক্রি করতেন। আরবগণ যেমন তাঁদের বাণিজ্য-জাহাজ নিয়ে সমুদ্র চষে বেড়াতেন, ঠিক তেমনি চট্টগ্রামও তৎকালে জাহাজ নির্মাণশিল্পের জন্য বিশ্ব জুড়ে খ্যাতি সম্পন্ন ছিল। চট্টগ্রামের সেই যুগে নির্মিত জাহাজ অধ্যাবদি ব্রিটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে। চট্টগ্রামের নাবিকগণও তাঁদের জাহাজ নিয়ে বহিঃসমুদ্রে গমন করতেন। ফলে আরবদের সাথে সখ্য গড়ে ওঠে চট্টগ্রামের। তাই বলা হয় চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দরের কল্যাণে এ অঞ্চলে ইসলামের আবির্ভাব আদি যুগেই হয়েছে।
চট্টগ্রামের স্থানসমুহের অনেকগুলোই আরবি বিভিন্ন শব্দ থেকে এসেছে। যেমন বাকলিয়া,

আলকরণ, সুলক বহর ইত্যাদি। এমনকি বিখ্যাত কর্ণফুলী নদীর নামটিও আরবদের দেওয়া। আরবের বিখ্যাত কবি ইমরুল কায়েসের একটি বিখ্যাত কবিতায় ব্যবহৃত 'করণফোল' শব্দ থেকে এ কর্ণফুলী নামের উৎপত্তি। কবিতাটি এই–

অর্থ : চলার পথে যখন তারা মেশকের খুশবু ছড়ায়

পূর্বদেশের মিষ্টি হাওয়া লবঙ্গের সুবাস বিলায়

চট্টগ্রামি ভাষায় ব্যবহৃত প্রায় ৩৫ থেকে ৪০ ভাগ শব্দের শিকড় আরবি। চট্টগ্রামের ভাষা একান্তই আরবি নির্ভর ও আরবি-মিশ্রিত ভাষা।

ডক্টর শামসুল আলম সাঈদ লেখেন, 'আরাকানি শব্দ এ ভাষাতে অতিশয় কম, এমনকি মগ-চাকমা ভাষাতেও সে দশা।' সম্প্রতি চট্টগ্রামের আদি কথ্যভাষা নিয়ে (গাঁও-গেরামের ভাষা) গবেষণাকারী গবেষক মাওলানা ওসমান গনি প্রমাণ করেছেন যে, চট্টগ্রামের প্রচুর শব্দের উৎপত্তি হয়েছে মূল আরবি শব্দমালা থেকে। যার অনেকগুলো হুবহু আরবি এবং অনেকগুলো দেশি ভাষার সঙ্গে সংমিশ্রিত হয়ে বা অপভ্রংশ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভেই চট্টগ্রামে আরব-মুসলমানদের আগমন ঘটেছিল, তেমনি



সংস্কৃতের তৎসম ও তদ্ভবের মতো কখনো মৌলিক, কখনো যৌগিক। অথবা অপভ্রংশ। ডক্টর সুনীতি ভূষণ কানুনগো মহাশয় চট্টগ্রামী কথ্যভাষায় আরবির প্রচুর ব্যবহার, এ অঞ্চলে ব্যবহৃত বেশকিছু আরবি এবং আরবি-মিশ্রিত শব্দের উল্লেখ করেছেন।

এই জন্যই অন্য জেলার লোকেদের কাছে এই ভাষাটা দুর্বোধ্য টেকে। এখনো অনেক গবেষক চট্টগ্রামি ভাষার দুর্বোধ্য শব্দসমুহকে আরাকানি, সংস্কৃত ও নৃ-গোষ্ঠীদের শব্দ বলে অভিহিত করে থাকেন। যার সত্যতা বহুলাংশেই অতিশয় ক্ষীণ। এ প্রসঙ্গে গবেষক

এখানে তাদের সুদীর্ঘ কাল অবস্থানের ফলে স্থানীয় এবং ধর্মান্তরিত মুসলমানদের সহাবস্থানে আরবি-বাংলার মিশ্রণে চট্টগ্রামি ভাষার উৎপত্তি হয়েছে। পরবর্তী কালে ব্যাপকভাবে ফার্সি, পর্তুগিজ, ইংরেজিসহ বহু ভাষার শব্দাবলির এই ভাষায় অনুপ্রবেশ ঘটলেও এ অঞ্চলে আরবি ভাষার প্রাধান্যই ব্যাপকতম।

চট্টগ্রাম অধিবাসীদের অধিকাংশের শিরাঙ্ক, নাশাঙ্ক, মুখমণ্ডলে আরবীয় ছাপ, শেখ, সৈয়দ বংশীয়দের আধিক্য, আচার-আচরণ, তাহজিব-তমদ্দুন, সাহিত্য-সংস্কৃতিতে আরব-প্রভাব-সহ এ-জাতীয় বিষয়গুলো

নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে চট্টগ্রামের এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সপ্তম শতাব্দী থেকে একাদশ শতাব্দীর মধ্যে একটি আরব-রাজ্য স্থাপিত হয়েছিল এবং আরব বণিকগণ দীর্ঘ সময় এ অঞ্চলে অবস্থান করেছিলেন। এ দীর্ঘ সময়ে তাঁরা ইসলাম প্রচারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

সুফি-সাধক

প্রচলিত কিংবদন্তি মতে চট্টগ্রাম বারো আউলিয়ার দেশ। চট্টগ্রাম শহরে বা চট্টগ্রাম জেলার বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য সুফি-সাধকের সমাধি দৃষ্ট হয়। সুতরং চট্টগ্রামের সুফিদের বারো আউলিয়ায় সীমিত করা সমীচীন নয়। ইসলাম প্রচারের সুমহান লক্ষ্যে এ অঞ্চলে এসেছেন অসংখ্য সুফি-দরবেশ। শেষরাতের নৈশব্দিক প্রহরে তাঁদের জিকিরের ঝংকারে, বুকে বিক্ষুব্ধ ঊর্মিমালার উত্তাপ আর শ্মশ্রুসিক্ত অশ্রুপাতের ফলে এ জনশূন্য বিয়াবান আবাদ হয়েছে। তাঁরা এক হাতে শরিয়তের সুরাহি অপর হাতে খোদাপ্রেমের ঐশী পানপাত্র নিয়ে আগমন করেছিলেন। এ অঞ্চলে তাঁদের আগমন ছিল মহান সৃষ্টিকর্তার এক বিশেষ অনুগ্রহ, প্রপূর্ণ আশিস। তাঁরা হাজার বছর ধরে বাংলার মাটিতে ইসলামের বিশ্বাস, পবিত্রতা, সাম্য, মানবতা, নীতি-আদর্শ, উদারতা, প্রেম, ভালোবাসা, মুক্তি, স্বাধীনতা, সম্মান, আত্মমর্যাদা, ধৈর্য, সবর, শোকর, অল্পেতুষ্টি, ক্ষমা, বিনয়, নম্রতা ইত্যাদি গুণ চর্চা করেছেন এবং মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন। হয়তো এঁদের কারও নাম ইতিহাসের সোনালি পাতায় স্বর্ণালি অক্ষরে খুদিত হয়ে আছে আবার কারও নাম বিস্মৃতির ধুলোয় ধূসরিত হয়ে হারিয়ে গেছে কালের অতল গহ্বরে। আসুন, ওই সব সুফি-সাধক সম্পর্কে কিছু গল্প করি, যাঁদের অক্লান্ত চেষ্টায় ও নিরলস সাধনায় চট্টগ্রামে ইসলামের পিদিম দীপ্ত আভায় উদ ্ভাসিত হয়েছিল।

শাহ মোহছেন আউলিয়া রহ.

বারো আউলিয়ার মধ্যে শাহ মোহছেন একজন। চট্টগ্রামে প্রাপ্ত আরবি ভাষায় লিখিত পীর ও সুফি সম্পর্কিত বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে শাহ বদরে আলমের সাথে শাহ মোহছেনের নাম উল্লেখ রয়েছে। তিনি আরবীয় শেখ এবং জনশ্রুতিতে বদর শাহ-এর ভাগিনা ছিলেন। কথিত আছে যে, বদর শাহ রহ. সফরসঙ্গী শাহ মোহছেন আউলিয়া ও কাতালপীরকে নিয়ে কর্ণফুলী নদীর দক্ষিণ তীরে বর্তমান আনোয়ারা থানার গহিরা গ্রামের পশ্চিমে সমুদ্র উপকূলবর্তী ইছাখালী গ্রামের কডির হাটে খানকাহ তৈরি করে ধর্ম প্রচারে ব্রতী হন। কালের বিবর্তনে কডির হাট সমুদ্র গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। পরবর্তী কালে কাতালপীর চট্টগ্রামের কাতালগঞ্জে চলে যান এবং মোহছেন আউলিয়া শঙ্খ নদীর উপকূলে ঝিউরি গ্রামে অবস্থান করতে থাকেন। মোহছেন আউলিয়ার ঝিউরি গ্রামের খানকা ও মসজিদে প্রাপ্ত সুলতানি আমলের শিলালিপি ও মোগল আমলে দেয় মদদ-ই-মা-মাশ হিসেবে প্রাপ্ত জমি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত করে চতুর্দশ শতকের মধ্যবর্তী সময়ে চট্টগ্রামের অভিভাবক পীর বদর শাহ-এর অন্যতম ভ্রমণসঙ্গী শাহ মোহছেন আউলিয়া রহ. চট্টগ্রামে এবং পরবর্তী সময়ে দেয়াং এলাকায় ইসলাম প্রচার করেন। বর্তমানকার আনোয়ারা থানার বড়উঠান, ঝিউরী, বটতলীসহ কর্ণফুলী নদীর দক্ষিণ তীরের এক বিস্তীর্ণ এলাকা দেয়াং নামে পরিচিত ছিল। বদর শাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মোহছেন আউলিয়া দেয়াং এলাকার ঝিউরী গ্রামে তাঁর খানকা নির্মাণ করে ইসলাম প্রচারে ব্রতী হন। তাঁর ভক্তদের আগ্রহে সেখানে খানকা নির্মাণ করে তিনি আধ্যাত্মিক সাধনায় লিপ্ত হন। অগণিত ভক্ত তাঁর খানকায় ভিড় জমাতে শুরু করে। ঝিউরি গ্রামে তিনি অবস্থানকালে শঙ্খ নদী উপকূলে গড়ে উঠেছিল এক আধ্যাত্মিক সাধনালয়। তাঁর মানবপ্রেম ও বিভিন্ন অলৌকিক ঘটনা চারদিকে ছড়িয়ে পড়লে দলে দলে লোকজন তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ ও ইসলামের ছায়াতলে সমবেত হতে থাকেন। মোহছেন আউলিয়াকে কেন্দ্র করে ঝিউরি গ্রামসহ আনোয়ারার পার্শ্ববর্তী পটিয়া ও দক্ষিণে শঙ্খ নদী পর্যন্ত ইসলামের ব্যাপক প্রসার ঘটে এবং মুসলিম জনবসতি গড়ে ওঠে।

বায়েজিদ বোস্তামি রহ.

বাংলাদেশের চট্টগ্রামের নাসিরাবাদ সেনানিবাসের নিকটবর্তী একটি সমাধি 'বায়েজিদ বোস্তামির মাজার' হিসেবে প্রসিদ্ধ। এই সমাধির অবয়ব সর্বপ্রথম ১৮৩১ সালে পাহাড়ের উপরিভাগে একটি দেয়ালঘেরা আঙ্গিনার মাঝে আবিস্কার করা হয়। আঙ্গিনার ঠিক মাঝামাঝি সমাধিটি অবস্থিত। পরবর্তী সময়ে সমাধিস্থলটি আধুনিক কাঠামো দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়। সমাধি-পাহাড়ের পাদদেশে একটি তিন গম্বুজ বিশিষ্ট মোঘল-রীতির আয়তাকার মসজিদ রয়েছে। স্থাপত্যশৈলী থেকে ধারণা করা হয় মোঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের আমলে মসজিদটি নির্মিত। সমাধির সামনে সমতলে একটি বিশালাকার দীঘি আছে। সমাধিক্ষেত্র, মসজিদ এবং দীঘি নিয়ে দরগাহ কমপ্লেক্সটি গঠিত। দীঘিতে প্রচুর



পরিমাণে কালো নরম শেলযুক্ত 'বোস্তামি কাছিম' ও গজার মাছ রয়েছে। জনশ্রুতি অনুযায়ী মাজার প্রতিষ্ঠাকালে এই অঞ্চলে প্রচুর দুষ্ট জিন এবং পাপিষ্ঠ আত্মার পদচারণা ছিল। বায়েজিদ বোস্তামি এই অঞ্চল ভ্রমণকালে এইসব দুষ্ট আত্মাকে শাস্তিস্বরূপ কাছিমে পরিণত করেন এবং আজীবন পুকুরে বসবাসের দণ্ডাদেশ প্রদান করেন।

ঐতিহাসকদের মতে, বায়েজিদ বোস্তামি নামের কোনো ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব কখনো বাংলাদেশে এসেছেন, তার নির্ভরযোগ্য ও শক্তিশালী কোনো প্রমাণ নেই। চট্টগ্রামে তাঁর নামে পরিচিত মাজারটি হচ্ছে একটি প্রতিকৃতি বা অনুকৃতি মাত্র। চট্টগ্রামের ঐতিহাসিক হামিদউল্লাহ খান মনে করেন, বায়েজিদ বোস্তামি চট্টগ্রামে আসেননি। আবার কোনো ঐতিহাসিকের বর্ণনা থেকে জানা যায়, তিনি সিন্ধু দেশের আবু আলি সিন্ধি নামক এক সাধকের শিষ্য ছিলেন। এই সূত্রে তিনি যদি সিন্ধু এসেও থাকেন চট্টগ্রামে তাঁর আগমন অসম্ভব কিছু নয়।

তবে এ ব্যাপারে সকলে একমত যে, তিনি এখানে ইন্তেকাল করেননি। পারস্যের বিস্তাম নগরে ৮৭৪ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর ইন্তেকাল হয়।

শাহ বদর রহ.

বারো আউলিয়ার অন্যতম ছিলেন শাহ বদর আউলিয়া। তিনি অপর এগারোজন দরবেশের সঙ্গে চট্টগ্রাম এসেছিলেন বলে কথিত আছে। এ দরবেশগণ চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্থানে সমাহিত আছেন। বারোজন দরবেশের মধ্যে বদর আউলিয়াকেই প্রধান হিসেবে সম্মান দেখানো হয়। বদর আউলিয়া চট্টগ্রামে ইসলাম প্রচার করেন। ঐতিহ্য অনুসারে, চট্টগ্রাম জেলার মানব বসতির সাথে বদর আউলিয়ার নাম জড়িত। চট্টগ্রামের অধিবাসীরা তাঁকে তাদের অভিভাবক হিসেবে গভীর শ্রদ্ধা করে। বৌদ্ধ, হিন্দু ও চৈনিকগণ বদর আউলিয়াকে পরমেশ্বর অথবা আত্মার অধস্তন হিসেবে ভক্তি করে। অন্যদিকে মুসলিমগণ তাঁকে আউলিয়া বা দরবেশ হিসেবে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। চট্টগ্রামের পুরাতন দুর্গ-এলাকা আন্দরকিল্লার অন্তর্গত বর্তমানের বখশীর হাটের নিকটবর্তী বদরপট্টি বা বদরপটি নামে পরিচিত স্থানে বদর আউলিয়ার সমাধি অবস্থিত। প্রাচীরবেষ্টিত মাজার কমপ্লেক্সটির পূর্ব দিকে রয়েছে একটি প্রবেশপথ, সমাধিসৌধ ও একটি পাকা কুয়া। চতুর্ভুজাকার সমাধি-সৌধটি অত্যন্ত পুরু ও শক্ত প্রাচীর দিয়ে নির্মিত। ওপরের ছাদটি সামান্য ঢালু এবং একটি বড় গম্বুজ দ্বারা আচ্ছাদিত। মাজারের পশ্চিম প্রাসাদে বেলেপাথরের একটি শিলালিপি রয়েছে। শিলালিপিতে নাসখ রীতিতে পাঁচ লাইনের আরবি লিপি উৎকীর্ণ।

চট্টগ্রামে ইসলামের সমৃদ্ধি

খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতক হতে দশম শতাব্দীর মধ্যে এ অঞ্চলে ইসলামের 'উদয়' হয়। পরবর্তী কালে বখতিয়ার খিলজি কর্তৃক বাংলা বিজয়ের মাধ্যমে এ অঞ্চলে ইসলামের রবির স্নিগ্ধ কিরণ আস্তে আস্তে সম্প্রসারিত ও বিস্তৃত হতে থাকে। এখনও নানা মাধ্যমে এখানে ইসলামের দাওয়াত বিস্তৃত হচ্ছে। বর্তমানে এ অঞ্চলে ইসলাম প্রচার ও প্রসারে যে ধারাগুলো অগ্রণী ভূমিকা রেখে চলেছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো–

১. ইসলামি প্রতিষ্ঠান : বিভিন্ন ইসলামি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মুসলিম শিক্ষার্থীদের ইসলামের অনুশাসনের বাস্তবায়ন ও ইসলামি শিক্ষায় দীক্ষিত করার ফলে এ অঞ্চলে উত্তরোত্তরভাবে ইসলামের প্রচার ও প্রসার ঘটে চলছে।

২. সুফি-সাধক : ইতিহাসের অনুসরণে সুফি-সাধকগণ এ অঞ্চলে ইসলাম প্রচারে অগ্রণী ভূমিকা রেখে চলেছেন। বর্তমান কালেও অতীতের সোনালি ইতিহাস নিখুঁত ছবির মতো ভেসে ওঠে। এসব সুফি-সাধক জ্ঞান প্রচার, লিখনী, ওয়াজ-মাহফিল ইত্যাদির মাধ্যমে ইসলাম বিকাশে অনন্য অবদান রেখে চলেছেন।

৩. তাবলিগ জামাত : এ অঞ্চলে ইসলামের ক্রমবিকাশে তাবলিগ জামাতের ভূমিকা অবিস্মরণীয়। ইসলামের প্রাথমিক ধারণা ও বাস্তব জীবনে ইসলামি অনুশাসনের প্রয়োগ ও অনুশীলনের এঁদের ভূমিকাও অনন্য।

তথ্যসূত্র : চট্টগ্রামে ইসলাম, ড. আব্দুল করিম। আহাদিসুল খওয়ানিন, হামিদুল্লাহ খান বাহাদুর। নুজহাতুল খওয়াতির, আবদুল হাই লখনৌভি। ইতিহাস প্রসঙ্গ, সোহেল মো. ফখরুদ-দীন। চট্টগ্রামে মুসলমান আগমনের ইতিকথা, সোহেল মো. ফখরুদ-দীন। সুফিবাদের বিকাশ ও হজরত শাহ সুফি আমানত (র.), সৈয়দ ইসমাইল হোসেন। সমাজ, সংস্কৃতি, সাহিত্য, ড. হাসান জামান। চট্টগ্রামের ইতিহাস, আহমদ শরীফ। দি হিস্ট্রি অব ইসলাম ইন চায়না। দি লার্জ মুসলিম পপুলেশান ইন ওয়েস্টার্ন চায়না। সাহাবায়ে রসুল হিন্দুস্তান মেঁ, আকবর আলি খান কাদেরি। তুহফাতুল মুজাহিদিন, জয়নুল আবেদীন। মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস, মওলানা আকরম খাঁ। বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, আব্বাস আলী খান। বাংলাদেশে ইসলাম, আবদুল মান্নান তালিব। আরাকানের মুসলমানদের ইতিহাস, ড. মাহফুজুর রহমান আখন্দ। আরব নৌবহর, সৈয়দ সুলায়মান নদভি; অনুবাদক : হুমায়ুন খান। ইসলাম ইন কেরালা। উইকিপিডিয়া। বাংলাপিডিয়া।

লেখক : শিক্ষার্থী, জামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম

মোঘল হেরেমের জ্ঞানতাপসী

সুমাইয়া মারজান



'চিত্রল মুক্তা দুষ্প্রাপ্য।'

ইরানের এক শাহজাদা আনমনে বসে কী যেন ভাবছিলেন একদিন, হঠাৎ তাঁর মনে এমন ভাবার্থের একটি ফারসি পঙক্তির উদয় হলো। বিড়বিড় করে তিনি বার কয়েক আওড়ালেন পঙক্তিখানি। কিন্তু পরের পঙক্তি কী হবে, মেলাতে পারছিলেন না। বেশ কয়েকবার চেষ্টা করলেন; নাহ, পছন্দসই কোনো পঙক্তি তিনি তৈরি করতে পারলেন না।

শাহজাদা বলে কথা; দ্বিতীয় পঙক্তি তাঁকে মেলাতেই হবে যেকোনোভাবে। নিজে না পেরে অবশেষে ডাকলেন রাজ্যের বড় বড় সব কবিকে। কবিরা রাজদরবারে এসে নানা ধরনের পঙক্তি তৈরি করে দিলেন, কিন্তু প্রথম পঙক্তির সঙ্গে কোনোটাই মানানসই হচ্ছিল না।

শাহজাদা ঘোষণা দিলেন, যদি কেউ পূর্ণ অন্তমিলে দ্বিতীয় অংশ লিখতে পারে তাকে বড় ধরনের পুরস্কার দেওয়া হবে। ভূষিত করা হবে অনন্য সম্মানে।

তাঁর এ ঘোষণা ইরানের সীমানা পার হয়ে পৌঁছে যায় হিন্দুস্তানের রাজধানী দিল্লিতেও। এমনকি মোঘল শাহজাদির কান পর্যন্ত পৌঁছে এ ঘোষণা।

শাহজাদি একদিন গোসলের পর সাজগোজের সময় চুলে চিরুনি করে চোখে সুরমা ব্যবহার করছিলেন, হঠাৎ তাঁর চোখ থেকে দুফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। আয়নায় তিনি দেখতে পেলেন, সুশোভিত চোখের পালকে ঝলমল করছে অশ্রুর নক্ষত্র। তাতে অশ্রুর শুভ্রতা ও সুরমার দোসরতা মিলে তৈরি হয়েছে অনিন্দ্য সুন্দর এক মুক্তা। তাঁর মনে পড়ে গেলো ইরানের শাহজাদার কবিতার প্রথম পঙক্তি। আর তখনই এ পঙক্তির দ্বিতীয় অংশ হিসেবে তাঁর করোটিতে তৈরি হলো নতুন একটি পঙক্তি। ইরানের শাহজাদার পঙক্তির সঙ্গে মিলিয়ে তিনি বিড়বিড় করে আওড়ালেন–'চিত্রল মুক্তা দুষ্প্রাপ্য/ তবে অশ্রু মিশ্রিত সুরমায় তার প্রাচুর্য।'

মোঘল-শাহজাদি কবিতাখানি লিখে পাঠালেন ইরান-শাহজাদার ঠিকানায়। কিন্তু নিজের আসল পরিচয় গোপন রাখলেন। শাহজাদা কবিতা পেয়ে তো অবাক! এতো সুন্দর করে কেউ মেলাতে পারে? শাহজাদা যারপরনাই খুশি হলেন। তিনি এ কবির সঙ্গে সাক্ষাত করতে চাইলেন। সেই সঙ্গে ওয়াদা অনুযায়ী কবিকে পুরস্কৃত ও সম্মানিত করতে চাইলেন। মোঘল রাজপ্রাসাদে ইতিমধ্যে এ কান ও কান হয়ে মোটামুটি জানাজানি হয়ে গেছে যে, মোঘল শাহজাদিই লিখেছেন দ্বিতীয় ওই পঙক্তিখানি। জেনে গেছেন মোঘল সম্রাটও।

তখনকার মোঘল সম্রাট ছিলেন অত্যন্ত খোদাভীরু, পরহেজগার এবং পর্দার ব্যাপারে খুব সতর্ক। তিনি মেয়েকে ডেকে বললেন, 'আমি তোমাকে এ শিক্ষা দিইনি যে তুমি পরপুরুষের সাথে লেনদেনে ব্যস্ত হবে। তোমাকে নিষেধ করলাম, তুমি কোনো ধরনের লেনদেনে আগ্রহী হয়ো না।'

শাহজাদির ঠোঁটের কোণে দেখা দিলো মুচকি হাসির রেখা! পিতাকে নিশ্চিন্ত করতে তিনি বললেন, 'আপনি এই ব্যাপারে একদমই চিন্তা করবেন না। আমি তাঁকে এমন চিঠি লিখবো, আমার সাথে তাঁর সাক্ষাতের সাধ চিরদিনের জন্য উবে যাবে।'

হ্যাঁ, তিনি লিখলেন। কবিতার পঙক্তি দিয়েই লিখলেন সেই কথাগুলো–

'আমার মিষ্ট কথায় আমি এমনভাবে লুকিয়ে থাকি
ফুলের ঘ্রাণ যেমন থাকে তার পাপড়িতে,
আমার সাক্ষাতপ্রার্থীর প্রতি আমার আকাঙ্ক্ষা
তিনি এমন দূরদর্শিতা সম্পন্ন হবেন
যেন আমার কবিতা পড়েই বুঝে নিতে পারেন
আমি সবার মতো নই।'

ইরানের শাহজাদা এই পত্রকবিতা পড়ে বুঝে নিলেন, এ কবি নিশ্চয় কোনো পর্দানশীন নারী, খ্যাতি ও সম্মানের জন্য তিনি নিজেকে অনাবৃত করতে চান না। শাহজাদা তাঁকে আর ঘাটতে চাইলেন না।

দুই

মোঘল এই শাহজাদির নাম জেবুননেসা বিনতে বাদশাহ আলমগির। তিনি সম্রাট আওরঙ্গজেব আলমগির ও দিলরাস বানু দম্পতির বড় মেয়ে। শাহ নেওয়াজ খান ছিলেন দিলরাস বানুর পিতা। শাহ নেওয়াজ খানের মূল নাম বদিউজ্জামান। তিনি সম্রাট শাহজাহানের

শাসনামলে প্রশাসনের উচ্চপদে আসীন ছিলেন। পরে তাঁকে শাহ নেওয়াজ উপাধী দেয়া হয়। বংশগতভাবে শাহ নেওয়াজ ছিলেন উঁচু ঘরানার। শাহজাহানের শাসনামলের দশম বছর, ১০৪৭ হিজরিতে শাহ নেওয়াজ খানের কন্যার সাথে আলমগীরের বিয়ে হয়।

১০৪৮ হিজরির শাওয়াল মাসে ১৬৩৮ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ ফেব্রুয়ারি দিলরাস বানুর কোল আলোকিত করে জেবুননেসা জন্ম হয়। বাবা সম্রাট আলমগীর শখ করে কন্যার নাম রেখেছিলেন জেবুননেসা; যার অর্থ ললনাশ্রী।

প্রসবের পর মোঘল বাদশাহদের বেগমেরা সন্তান প্রতিপালন করতেন না, কোনো ধাত্রী নিজের দুধ পান করিয়ে সেই শিশুকে লালন পালন করতো। শাহজাদি জেবুননেসার জন্মের পর, মোঘল রাজপরিবারে চিরপ্রচলিত প্রথা অনুসারে 'মিয়াবাই' নামে একজন মহিলার উপর তাঁর প্রতিপালনের ভার অর্পণ করা হয়।

মিয়াবাই ধার্মিক মহিলা ছিলেন। প্রতি সকালে তিনি যখন কুরআন পাঠ করতেন, অল্পবয়স হলেও শাহজাদি জেবুননেসা সে সময়ে তাঁর কাছে বসে একাগ্রচিত্তে কুরআন পাঠ শুনতেন।

বাদশাহ আলমগীর তাঁর কন্যার কুরআন শোনার আগ্রহ ধাত্রীর নিকট থেকে জানতে পেরে কন্যার পাঁচ বছর বয়সে তাঁকে কুরআন পাঠ করানোর জন্য আমির এনায়েতুল্লাহ খানের আম্মা হাফেজা মরিয়মকে নিযুক্ত করেন। ফলে অল্পবয়সেই জেবুননেসা অক্লান্ত পরিশ্রম করে দুই বছর তিন মাসের মধ্যে সমস্ত কুরআন কণ্ঠস্থ করতে সক্ষম হন। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র সাত বছর। শৈশব থেকেই প্রচণ্ড ধীশক্তির অধিকারী ছিলেন জেবুননেসা।

এতো অল্প বয়সে তিরিশ পারা কুরআন হিফজ করে ফেলায় বাবা আওরঙ্গজেব আলমগির দারুণ খুশি হন। কন্যার এই কৃতিত্বের জন্য সমারোহে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন।

সেই উপলক্ষে অনেক গরিব-দুঃখীকে দান-খয়রাত এবং সর্বসাধারণকে ভোজ ও পারিভোষিক ইত্যাদি বিতরণ করা হয়েছিল। সম্রাট আলমগির খুশি হয়ে কন্যাকে ত্রিশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা উপহার দেন। জেবুননেসার শিক্ষিকা হাফেজা মরিয়মকেও দেওয়া হয় বড় অংকের ইনআম।

সম্রাট আলমগীর তাঁর কন্যাকে এইরকম প্রখর মেধার অধিকারিনী ও প্রতিভাশালিনী দেখে তাকে লেখাপড়া শেখানোর জন্য কয়েকজন শিক্ষক নিযুক্ত করেন। তাঁদের মধ্যে মোল্লা সাইদ আশরাফের নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি ইরান নিবাসী সুবিখ্যাত পণ্ডিত সৈয়দ তকি মজলিসির বংশের, এবং সেখান থেকেই ভারতবর্ষে এসেছিলেন।

জানা যায়, জেবুননেসা কুরআন পাঠ শেষ করেই মোল্লা সাইদ আশরাফের নিকট পড়তে আরম্ভ করেননি, পড়েছিলেন কয়েক বছর পর। তার আগে অন্য কয়েকজন শিক্ষক তাঁকে লেখাপড়া শিখিয়েছেন। এরকম প্রায় একুশ বছর বয়স পর্যন্ত শিক্ষা অর্জন করবার পরও তিনি জ্ঞানের চর্চায় জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করেছেন।

মোঘল রাজপরিবারের নারীদের মধ্যে কেবল শাহজাদি জেবুননেসাই যে পড়াশোনা করেছিলেন তা নয়, অন্যান্য শাহজাদি, বেগম এবং হেরেমের অনেক নারীও লেখাপড়া এবং নানারকম শিল্পকার্যের শিক্ষা নিতেন।

নুরজাহান, জাহানারা রওশন আরাসহ প্রায় সকল নারীই সুশিক্ষিতা ছিলেন। তবে তাঁদের মধ্যে কেউই শাহজাদি জেবুননেসার সমকক্ষ হতে পারেননি ।

শাহজাদি জেবুননেসা মোল্লা সাইদ আশরাফের কাছে কেবল আরবি ও ফারসি ভাষা শেখার পাশাপাশি ধর্মীয় জ্ঞান, কাব্য সাহিত্যসহ নানা বিষয়ের অনেক গ্রন্থও অধ্যয়ন করেছিলেন। তবে সবচেয়ে বেশি আগ্রহ তাঁর কবিতায়ই ছিল। কবিতা ছিল তাঁর মন ও মেজাজের সঙ্গে মেশানো। মোল্লা আশরাফও ছিলেন একজন সুকবি।

জেবুননেসা আরবি ভাষায়ও অর্জন করেছিলেন অগাধ পাণ্ডিত্য। একবার তিনি আরবিতে একটি কাসিদা (একশ্রেণীর কবিতা) লিখলেন।

বাদশাহ আলমগিরের দরবারে সে সময় মক্কা শরিফের একজন বিজ্ঞ সভাসদ ছিলেন। আরবি তাঁর মাতৃভাষা ছিল। আরবিতে বিশেষ জ্ঞানও রাখতেন তিনি। জেবুননেসার কাসিদাটি তাঁকে দেখানো হলো। দেখে তিনি মন্তব্য করেন, এটি কোনো আরবদেশীয় লোকের রচনা নয়। কারণ, এই কাসিদা অতি সুন্দর হলেও কোনো কোনো

স্থানে বাকপদ্ধতির অসম প্রয়োগ দেখা আছে। তবে কাসিদাটি যে ব্যক্তিই রচনা করুক না কেন, তাঁর যে আরবি জ্ঞানে পাণ্ডিত্য আছে, এ কথা স্বীকার করতে হবে।

আরবিভাষী সভাসদের এ মন্তব্যের পর জেবুননেসা আরবিতে আর কিছু লিখেননি কখনও, যত কবিতা তারপর তিনি লিখেছেন, সবই নিজের মাতৃভাষা ফারসিতে।

জেবুননেসার প্রধান শখ ছিল কাব্যচর্চা। কিন্তু তাঁর পিতা বাদশাহ আলমগির ঘোর কবিতাবিরোধী ছিলেন। তাঁর সামনে কেউ কবিতা আবৃত্তি করলে তিনি বিরক্ত হতেন। তাঁর দরবারে কোনো কবির আদর বা আশ্রয় ছিল না। পূর্বকালের রাজসভায় যেসব কবি ছিলেন, সম্রাট আলমগিরের এরকম ভাবগতি দেখে তারা আপনাআপনি দরবার হতে সরে যান।

সম্রাট আলমগির শুধু যে কবিতা অপছন্দ করতেন তা নয়, সংগীতও একদমই ভালবাসতেন না। তাঁর দরবারে যেমন কোনো কবির স্থান ছিল না, তেমনি কোনো সংগীতবিদ্যাবিৎ ব্যক্তিও স্থান পেতেন না। বাদশাহ আলমগিরের এই না-পছন্দির যুক্তিসঙ্গত কারণও ছিল। তাঁর আগেকার সম্রাটদের দরবারে যেসব কবি ও গায়েন থাকত, তারা সম্রাটের স্তুতি আর প্রশস্তিই করত কেবল। যার অধিকাংশই মিথ্যা ও তোষামোদিপূর্ণ। তাছাড়া সংগীত গাওয়া হতো বাদ্য-বাজনা সহকারে। সম্রাট আলমগির নেককার ও নিতান্ত ধর্মপরায়ণ একজন শাসক ছিলেন। ইসলাম-বিরোধী কোনোকিছুই তিনি সহ্য করতে পারতেন না। তাই সংগীত ও কবিতার নামে যে মিথ্যাচার ও তোষামোদি চলত রাজদরবারে, এর প্রতি তাঁর ছিল চরম বিরক্তি। নিজে শাসনভার গ্রহণ করার পর তাই এসব ঝেটিয়ে বিদেয় করেছেন রাজদরবার থেকে।

দুনিয়াবিমুখ সম্রাটের পরিবারের কেউ যে বাহারি রঙের পোষাক পরিধান করবে, সেটাও তিনি পছন্দ করতেন না। এ জন্য পিতৃভক্ত শাহজাদি জেবুননেসা প্রায় সবসময়ই সাদা কাপড় পরতেন, অলঙ্কারও বেশী একটা ব্যবহার করতেন না। এ ব্যাপারে তিনি একটি কবিতা লিখেছিলেন। কবিতাটি এমন–

‘বাদশাহর কন্যা আমি কিন্তু গরিবের রূপ ধরেছি।

বেশভূষা আমার এই–এই রূপের যে আমি, আমার নাম জেবুননেসা–স্ত্রী-ভূষণ।’

কবিতার প্রতি পিতার বিরক্তির কারণে জেবুননেসা প্রকাশ্যে কাব্যচর্চা করতে সাহস পেতেন না। গোপনে একটি পাণ্ডুলিপিতে কবিতা লিখে তা সাবধানে লুকিয়ে রাখতেন, পিতা যেন না দেখেন।

ঘটনাক্রমে একদিন সে পাণ্ডুলিপি মোল্লা সাইদ আশরাফের হাতে পড়ে। তাতে লিখিত কবিতাগুলি পাঠ করে কবিতার লালিত্যে তিনি বিমুগ্ধ হয়ে যান। একরাশ বিস্ময় নিয়ে কবিতাবোদ্ধা মোল্লা সাইদ জেবুননেসাকে জিজ্ঞেস করেন, ‘শাহজাদি, এসব কি তোমার লেখা?’

উত্তরে হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়লেন শাহজাদি। জেবুননেসাই এসব কবিতা রচনা করেছেন শুনে মোল্লা সাইদ আশরাফ খুশি হয়ে বললেন,‘সুবহানল্লাহ! তুমি তো একজন সুকবি, তোমার কাব্যপ্রতিভা অসাধারণ। যদি কোনো আপত্তি না থাকে, তবে তুমি যেসব কবিতা রচনা করো, তা আমাকে দেখিয়ো।’

নিজের ওস্তাদের মুখে এরকম প্রশংসা ও উৎসাহবাক্য শুনে জেবুননেসার কবিতা লিখবার উদ্যম বেড়ে যায়। এবং সেদিন থেকে তিনি যখন যে কবিতা রচনা করতেন তা-ই নিজ ওস্তাদকে দেখাতেন। বিভিন্ন পরামর্শের মাধ্যমে সংশোধন করিয়ে নিতেন।

মোল্লা সাইদের তত্ত্বাবধানেই জেবুননেসা কাব্যচর্চা করেন। প্রায় ১৩/১৪ বছর জেবুননেসা মোল্লা সাইদ আশরাফের কাছে নানা বিষয়ে পড়াশোনা করেন। ১০৮৩ হিজরিতে মোল্লা সাইদ আশরাফ ভারতবর্ষ ত্যাগ করে ইরান যাওয়ার ইচ্ছা করেন। সেসময় তিনি একটি কবিতার মাধ্যমে জেবুননেসার কাছ থেকে বিদায় নেন। কবিতাটির ভাষ্য ছিল এমন–

‘একটিবারের জন্যেও মন এ দেশের বিরহ সইতে রাজি হয় না,

যদিও এখন আমার প্রস্থান অতীব জরুরি।

আমাদের জন্য সম্মুখ, নৈকট্য ও দূরত্বে কোনো



ফারাক নেই
সম্পর্ক যখন দুই হৃদয়ের, তবে দিল্লি ও ইস্পাহানের দূরত্বে কী যায়-আসে?
হৃদয় সদা তোমার সম্মুখে, কাবুলে থাকি বা কান্দাহারে।'

সুকবি শাহজাদি জেবুননেসার কবিতার অনুরাগ ও চর্চার কথা যখন সবখানে প্রচার হতে শুরু হলো, তখন যেসব কবি নির্জীব অবস্থায় ছিলেন, তাঁদের দেহে যেন আবার জীবনের সঞ্চার হলো; এবং তাঁদের রচিত কবিতা যাতে শাহজাদির নিকট পৌঁছে, সেজন্য তাঁরা যথাসাধ্য চেষ্টা করতে লাগলেন। এমনকি অনেকেই প্রার্থনা-পত্রাদি পর্যন্ত কবিতাকারে লিখে পাঠাতেন।

এমনই একজন নিয়ামত খাঁ আলি। উঁচু মাপের কবি ছিলেন তিনি। অভাবে পড়ে একটা 'কলগি' (পাগড়ি বা টুপির অলংকার বিশেষ) বিক্রয়ের জন্য শাহজাদির নিকট প্রেরণ করেছিলেন। কিন্তু অনেক দিন অপেক্ষা করেও যখন তাঁর জিনিসের কোনো খবর জানতে পারলেন না, তখন তিনি শাহজাদিকে মনে করিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে ইঙ্গিতে একটা কবিতা লিখে তাঁর কাছে পাঠালেন। কবিতাটির ভাবার্থ এমন–

'আমার শুভগ্রহ, তোমাকে প্রণাম করি,
আমার অলংকার তোমার সেবায় নিয়োজিত আছে।
যদি ওই শব অর্থাৎ সামান্য দ্রব্য ক্রয়ে অভিপ্রায়
হয়, তবে এটাকে আমার অমূল্য রত্ন জ্ঞান করব।
যদি ক্রয় করতে না চাও তবে আমার
শিরোপরি আঘাত করো।'

কবিতাটি শাহজাদির কাছে পৌঁছলে তাঁর রচনা-কৌশল দেখে তিনি অবাক হন এবং সাথে সাথে পাঁচ হাজার মুদ্রা নিয়ামত খাঁ আলির কাছে পাঠিয়ে দেন।

তিন

কাব্যচর্চা জেবুননেসার রক্তমাংসের সঙ্গে মেশানো ছিল। কবিতা নিয়েই পড়ে থাকতেন দিনমান। সেই সঙ্গে করতেন নানা বিষয়ের ওপর বিপুল পড়াশোনা। রাজকুমারী হয়েও পিতার সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক অবস্থা থেকে তিনি নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতেন। কিন্তু ভাগ্যবিড়ম্বনায় তাঁকেও আটকা পড়তে হয় রাজনৈতিক কূটিলতার ফাঁদে।

১০৯১ হিজরিতে রাজপুতেরা বিদ্রোহ করলে তাদের দমন করতে সম্রাট আলমগির নিজ পুত্র আকবরকে সৈন্যবাহিনী দিয়ে যোধাপুর প্রেরণ করেন। সেখানে গিয়ে রাজপুতদের ছলাকলায় আকবরের মতিভ্রম হয়। সে তাদের প্ররোচনায়

পিতার বিরুদ্ধে নিজেই বিদ্রোহ করে বসে। ভাতৃস্নেহে বিগলিত জেবুননেসা সেসময় শাহজাদা আকবরের সঙ্গে পত্রযোগে যোগাযোগ করতেন। এইসব পত্রে রাজনৈতিক কোনো আলাপ ছিল না, ছিল ভাইবোনের ব্যক্তিগত একান্ত সম্পর্কের বাতচিত। পিতা সম্রাট আলমগিরের কানে পৌঁছে যায় এ পত্রচালাচালির খবর। ন্যায় ও সত্যের পক্ষে অবিচল সম্রাট পুত্র আকবরের বিশ্বাসঘাতকতায় যারপরনাই রুষ্ট ছিলেন তার ওপর। বিদ্রোহী ও বিশ্বাসঘাতক পুত্রের সঙ্গে কন্যা জেবুননেসার এ পত্রচালাচালি তিনি মেনে নিতে পারলেন না। তিনি ভাবলেন, মেয়ে হয়তো ভাইকে কোনো ধরনের সহযোগিতা করছে।

মেয়ের প্রতি বেশ রাগান্বিত হন বাদশাহ আলমগির। রাজনৈতিক চিন্তা থেকে জেবুননেসাকে তিনি সেলিমগড়ে নজরবন্দী করে রাখার নির্দেশ দেন। এবং বার্ষিক ভাতাস্বরূপ জেবুননেসা যে চার লাখ স্বর্ণমুদ্রা পেতেন তা-ও বন্ধ করে দিতে বলেন।

কিন্তু অতিদ্রুতই শাহজাদি নির্দোষ প্রমাণিত হন, বাদশাহ আলমগির বুঝতে পারেন, মেয়ে তাঁর সেরেফ ভাতৃস্নেহ থেকে এ কাজ করেছে। জেবুননেসাকে তিনি ক্ষমা করে দেন।

বাবা-মেয়ের সম্পর্ক আগের মতো, বরং তারচেয়ে আরও মধুর এবং সুগভীর হয়ে ওঠে। ১০৯২ হিজরিতে রুহুল্লাহ খানের আম্মা হামিদা বানু বেগম ইন্তেকাল করলে বাদশাহ আলমগির জেবুননেসাকে হামিদা বানুর ঘরে প্রেরণ করেন। এই বছরই জেবুননেসার ভাই, বাদশাহ আলমগিরের চতুর্থ শাহজাদা কাম বখশের বিয়ে উপলক্ষে জেবুননেসার মহলে কয়েকটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

শাহজাদি জেবুননেসা বাদশাহ আলমগিরের অত্যন্ত আদরের কন্যা ছিলেন। অন্যান্য শাহজাদির চেয়ে বাবার ওপর তাঁর অধিকার যেন একটু বেশিই ছিল। হেরেমের অন্য নারীদের তুলনায় জেবুননেসার স্বাধীনতাও ছিল বেশি। তাই তো তিনি কবিতা অপছন্দ করা বাবার কন্যা হয়েও কাব্যচর্চা করতে পেরেছিলেন।

কন্যা ও বাবার মধ্যে প্রায়ই বিভিন্ন বিষয়াদি নিয়ে আলাপ হতো। নিজ কন্যার জ্ঞানের গভীরতা দেখে বাদশাহ আলমগির অবাক হতেন। আদরের কন্যাকে বিভিন্ন সফরে তিনি নিজের সঙ্গে রাখতেন। কাশ্মীরের সফর ছিল অধিক কষ্টকর। সে সফরেও জেবুননেসা পিতার সাথে ছিলেন। শাহজাদি কোনো সফর থেকে ফিরলে বাদশাহ আলমগির শাহজাদাদের পাঠাতেন বোনকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য।

ঐতিহাসিকদের রচনা থেকে জানা যায়, জেবুননেসা আরবি, ফারসি ও উর্দু ভাষায় ছিলেন অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী। হাতের লেখাও ছিল অত্যন্ত সুন্দর। বিশেষত নসখ, নাস্তালিক ও শিকাস্তা লিপিতে ছিলেন পারদর্শী। অনেকে তার নাম বলেন জেবুননেসা মুখফি। দেওয়ান-ই-মুখফি নামের একটা কবিতা-সংকলনকেও বলা হয় জেবুননেসার রচনা। এই মুখফি বিষয়ক এই আলাপ ও ধারণা আসলে ভুল। কারণ, নির্ভরযোগ্য কোনো ইতিহাসগ্রন্থে জেবুননেসা সংকলিত এমন কোনো কবিতা-সংকলনের তথ্য পাওয়া যায় না। মাখজানুল গারায়েবের গ্রন্থকার আহমদ আলি সান্ধিলভি জেবুননেসার জীবনীর আলাপে লিখেন, জেবুননেসার নামে প্রচলিত কাব্যগুলোর অধিকাংশই তাঁর ওস্তাদ মোল্লা সাইদ আশরাফের রচিত।

তবে তিনি একজন সুকবি ছিলেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। জেবুননেসার রচনা ছিল জেবুন নাশাআত। তাঁর বিভিন্ন জীবনীগ্রন্থে এর উল্লেখ আছে। আহমদ আলি সান্ধিলভি বলেন, এটি তাঁর পত্র-সংকলন।

জেবুননেসা রচিত অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে। তবে তিনি কোনো গ্রন্থ রচনা করুন বা না করুন তাঁর তত্ত্বাবধানে অনেক গ্রন্থ রচনা করা হয়েছে। সেগুলোর নামলিপির শুরুতে জেব শব্দটি যোগ করা হতো।

এসব গ্রন্থের অন্যতম হল জেবুত তাফসির। এটি ইমাম রাজির তাফসিরে কাবিরের ফারসি অনুবাদ। কাশ্মীরের বাসিন্দা মোল্লা সফিউদ্দিন আরদবেলিকে দিয়ে জেবুননেসা এই তাফসিরের অনুবাদ করিয়ে ছিলেন।

জানা যায়, জেবুননেসা বিশাল এক লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত অ্যাকাডেমির প্রয়োজনে বহু মূল্যবান

গ্রন্থ এতে সংগৃহীত ছিল। মাআসিরে আলমগিরির লেখক জেবুননেসার এই লাইব্রেরির তুমুল প্রশংসা করেছেন।

চার



জেবুননেসা চিরকুমারী ছিলেন। নিজের জ্ঞানচর্চায় ব্যাঘাত ঘটবে, অধ্যয়নের স্বাধীনতার ডানায় শিকল লাগবে বলে বিয়ের প্রতি তিনি ছিলেন অনাগ্রহী। তাঁর এই অনাগ্রহ এবং চিরকুমারিত্ব–শুধু এই একটি কারণে হিংসুটে ইউরোপীয় লেখক, বিধর্মী ও মোঘল রাজপরিবারের নিন্দুকেরা তাঁর সুষমামণ্ডিত পবিত্র চরিত্রের ওপর কলঙ্কের কালি লেপনের অপচেষ্টা করেছে। তাঁর সাথে যুক্ত করেছে আকিল খানকে। বিধর্মী লেখক সমরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মণ রচিত 'জেবুননেসা' গ্রন্থ থেকে পাওয়া যায় তাঁর ওপর আরোপিত মিথ্যা অপবাদের বিস্তারিত তথ্য।

এই লেখকের ভাষ্যমতে আকিল খান ছিলেন জেবুননেসার প্রণয়পুরুষ। আকিল খানের সাথে নাকি তিনি পত্রযোগে কবিতার মাধ্যমে প্রেমালাপ করতেন। এ পত্রচালাচালিতে ধরা পড়ার পর বাদশাহ আলমগির নাকি আকিল খানকে নৃশংসভাবে হত্যা করেন। অথচ তা নিছকই অপবাদ বৈ আর কিছু নয়।

আকিল খান সেসময়কার কবি ছিলেন বলে তাঁর জীবনীর আলাপ আছে ইতিহাসের বিভিন্ন গ্রন্থে। আলমগিরনামা, মাআসিরুল উমারা, মাআসিরে আলমগিরি, খাজানায়ে আমেরা, তাজকিরায়ে সারখোশ, ইয়াদে বাইদা, সরদে আজাদ ইত্যাদি গ্রন্থে আকিল খানের জীবনীর আলাপে এসব ঘটনার বিন্দুমাত্র উল্লেখ নেই। অথচ মোঘল ইতিহাসগ্রন্থের মধ্যে এ কয়খানাই নির্ভরযোগ্য সূত্রে পুরো ইতিহাসকে তুলে ধরেছে।

তাছাড়া আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তকরূপে পঠিত রাজসিংহ বইটাতে বিদূষী, গুণবতী জেবুননেসাকে উপস্থাপন করা হয়েছে ভ্রষ্টা-পতিতা অপেক্ষাও চরিত্রহীনা রূপে। অথচ তাঁর চারিত্রিক বিশুদ্ধতা বর্ণনা করা হয়েছে উর্দুগ্রন্থ 'জেওয়ারে জেবুননেসা'-তে। সেখানে এক ঐতিহাসিক লেখেন, 'জেবুননেসা দিবানিশি কাব্যানুশীলন, পুস্তক অধ্যয়ন ও গবেষণায় রত থাকতেন। বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলে স্বামীসেবা অবশ্য কর্তব্য হয়ে যাবে। ফলে অধ্যয়ন, কাব্যচর্চা, ও স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হবার একটা ব্যাপার চলে আসে। এই ভয়ে নিজের সত্তাকে বিবাহের বর্তমান ঝঞ্ঝাটের মধ্যে তিনি জড়াতে চাননি।'

আবার কোনো কোনো লেখক নাসির খাঁ নামের একজনের সাথে জেবুননেসার অবৈধ প্রেম ছিল বলে অপবাদ আরোপের হীন চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তাঁদের কি মনে ছিল না যে, তাঁদের ভাষ্যমতেই বাদশাহ আলমগির ছিলেন একজন গোঁড়া মুসলমান? তাহলে গোঁড়া মুসলমানের কন্যা হেরেমের এত এত নিরাপত্তাব্যবস্থা বেদ করে কীভাবে আরেক পুরুষের সঙ্গে সম্পর্কে জড়াতে পারে?

পাঁচ

দুনিয়াবিমুখ পিতার কন্যা সবসময় সাদামাটা জীবনযাপন করতেন। রাজকীয় জীবনে নিজেকে জড়ানো অপছন্দ করলেও মেজাজে মননে তিনি ছিলেন শাহি রুচির অধিকারিণী। তাঁর উন্নত রুচি ও শৌখিনতার পরিচয় পাওয়া যায় কাশ্মীরে তাঁর তৈরি মহল ও বাগানে। ১০৭৩ হিজরিতে বাদশাহ আলমগির কাশ্মীর সফরে গেলে কন্যা পিতাকে নিজ মহলে দাওয়াত করে নিয়ে আসেন এবং প্রচুর উপহার দেন।

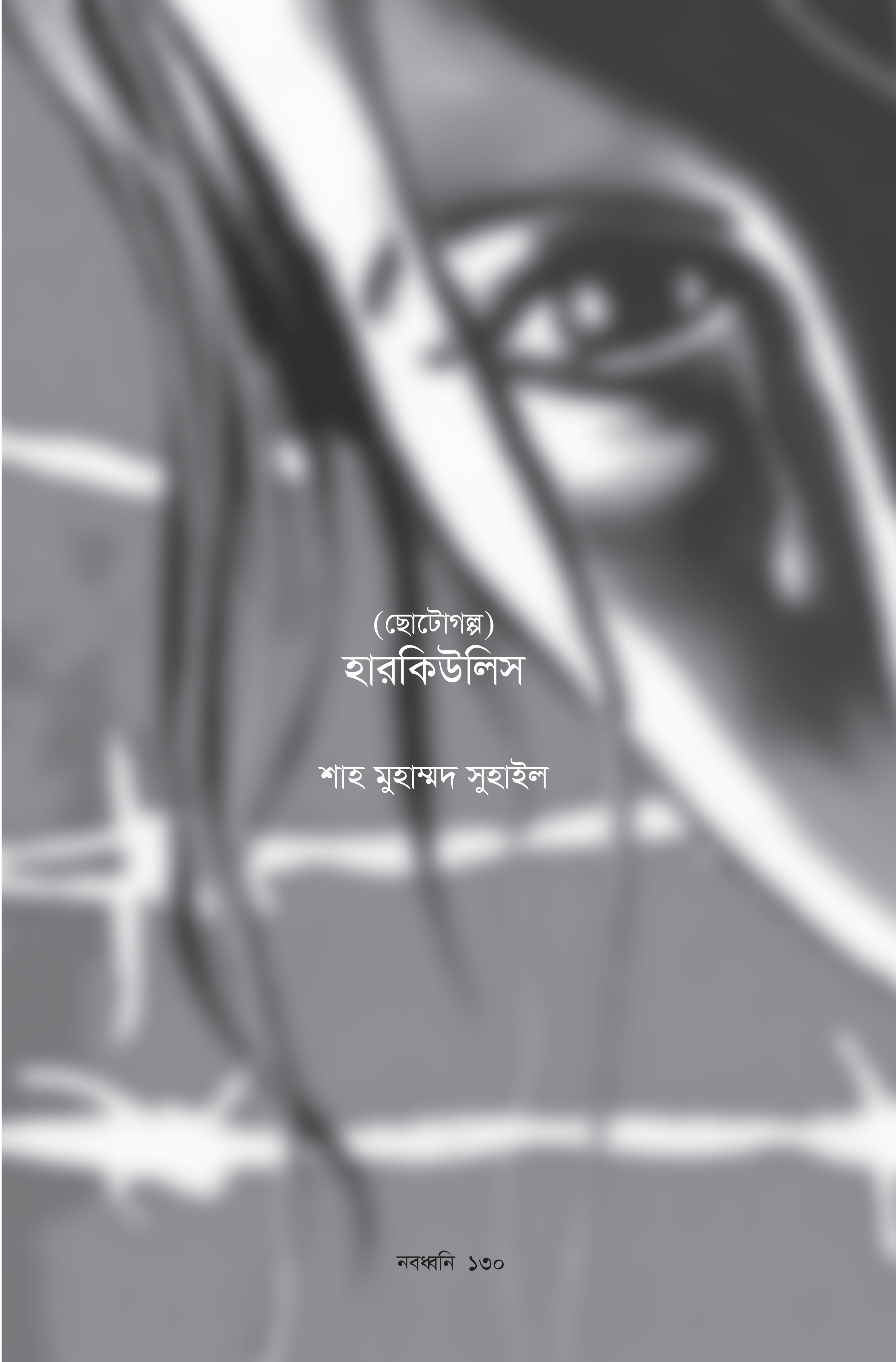
১১১৩ হিজরি। বাদশাহ আলমগিরের শাসনামলের বয়স ৪৮ বছর। আলমগির দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধের ব্যস্ততায় মশগুল। ঠিক সে সময়েই তাঁর কাছে পৌঁছে আদরের দুলালী জেবুননেসার মৃত্যুসংবাদ। তাঁর নয়নের মণি তাঁর আগেই দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছেন।

প্রিয় কন্যার মৃত্যুসংবাদে একদম ভেঙে পড়েন বাদশাহ আলমগির। থিরথির করে কাঁপে তাঁর চোখের পাতা। অশ্রুর বড় বড় ফোঁটা কপোল বেয়ে গড়িয়ে পড়ে। কলিজার টুকরো কন্যার আকস্মিক মৃত্যুতে নির্জন দুপুরে স্থির জলের মতো সম্রাটও নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হচ্ছিলেন। পরে শায়খ আতাউল্লাহ, সাইয়েদ আমজাদ খান ও হাফেজ খানের কাছে পত্র লিখে প্রিয় কন্যার ইসালে সওয়াবের জন্য দান-খয়রাতের নির্দেশ দেন।

১০৪৮ হিজরির শাওয়াল মাসে যে শাহজাদি সম্রাজ্ঞী দিলরাস বানু ও বাদশাহ আলমগির দম্পতির ঘর সুশোভিত করে ফুটেছিলেন ললনাশ্রী নামের ফুল হয়ে, ১১১৩ হিজরিতে তিনি ঝরে পড়েন পৃথিবীর বাগান থেকে। মোঘল হেরেমকে সুসজ্জিত করার নেপথ্যের অন্যতম নারী রূপকার শাহজাদী জেবুননেসার দূর্বাদলে ছেয়ে থাকা সেই পবিত্র স্মৃতিচিহ্নে প্রতি নিশীথে নির্মল নীল আকাশ থেকে সঞ্চিত হয় বিন্দু বিন্দু শিশির। প্রভাতে স্পর্শ করে তরুণ অরুণের প্রথম আলো। সন্ধ্যায় ছড়িয়ে পড়ে গোধূলির মায়াময় স্বর্ণাভা। মোঘল শাহজাদির শতবর্ষী প্রাচীন সমাধি থেকে আজও উৎসারিত হয় কাব্য ও সুকুমারবৃত্তির অনিন্দ্য লালিত্য। তাতে নিবেদিত হয় ভক্তিনত ত্যাগাকুল হৃদয়ের নম্র লাজুক ভালোবাসা।

তথ্যসূত্র : ১. খাওয়াতিমে ইসলাম কে কারনামে; লেখক : মাওলানা জুলফিকার আলি নকশবন্দি। ২. রাজমহলের নন্দিনী; মূল : আল্লামা শিবলি নোমানি; অনুবাদক : ইমরান রাইহান। ৩. চেপে রাখা ইতিহাস; লেখক : গোলাম আহমদ মোর্তজা। ৪. উইকিপিডিয়া

মিরপুর, বাহুবল, হবিগঞ্জ



(ছোটোগল্প)

হারকিউলিস

শাহ মুহাম্মদ সুহাইল

দূর থেকে ডাক দিলাম—'আফসিন'। সে আমার দিকে তাকায়নি। হয়তো ডাক তার কানে পৌঁছোয় নি। আমি কাছে গিয়ে তার পেছনে দাঁড়ালাম। সে একটি নতুন কবরের দিকে চেয়ে আছে। ওটা তার ছোটবোন আসলিহানের কবর। আফসিনের চোখে অশ্রু। মুখে বিন্দুবিন্দু ঘাম। যেন বুকের বিষাদ থেকে সৃষ্ট বাষ্পকণা। বুদ্বুদ ওঠার মতো আসলিহানের একেকটি স্মৃতি উঠছে আফসিনের মনের পটে, চোখের পাতায়।

আসলিহান আফসিনকে 'তুই' বলে সম্বোধন করত। এই সম্বোধনটি শোনার জন্য আফসিন প্রতীক্ষা করত দুটি কারণে। তাকে 'তুই' ডাকার অপরাধে মা আসলিহানকে বকাঝকা দিতেন। অন্যদিকে আসলিহান ঝগড়া করতে গিয়ে আস্তিন গুটিয়ে আঙুল তুলে 'তুই তুই' বললে আফসিন মন থেকে এটা উপভোগ করত। এর জন্য আফসিন ইচ্ছে করেই আসলিহানের সঙ্গে কাজে-অকাজে ঝগড়া বাঁধাতো। একদিন আসলিহানকে আফসিন বলেছিল, 'তোর মতো পাগলা ঝগড়াটে বোন আমার দরকার নেই। যত দ্রুত সম্ভব তোর বিয়ের ব্যবস্থা করা উচিত।'

কথাটা শুনে আসলিহান দৌড়ে গিয়ে রান্নাঘর থেকে বটি নিয়ে আসে। অবোধ শিশুর মতো বলে, 'তুই আমাকে বিয়ে দিয়ে দিবি! দাঁড়া তোকে আমি এই পৃথিবীতেই রাখব না।'

কী কাণ্ডটাই না ঘটিয়েছিল আসলিহান। সামান্য হলে আফসিনের গায়ে আঘাতটা লেগে যেত। এরপর কান ধরে এবং বিয়ে না দেওয়ার শর্তে মুক্তি পেয়েছিল আফসিন। ওই রাতে আসলিহান আফসিনের রুমে চুপিচুপি এসে কাচুমাচু করে বলেছিল, 'ভাইয়া, আমি ভুল করেছি, তুই আমাকে ক্ষমা করে দে। আমার বেশ রাগ হয়েছিল, তাই...। আমি তোকে আর মাকে ছেড়ে কোথাও যেতে চাই না। তুই কি আমাকে তোর কাছে রাখবি না?' আফসিন বলেছিল, 'ঠিকাছে! যদি আজকের মতো আর কোনোদিন এমন পাগলামি না করিস তবে রাখব। কিন্তু আফসিন তার কথা রাখতে পারেনি। আসলিহানকে তার কাছে রাখতে পারেনি। এই পৃথিবী যে শত বাধায় বাঁধা। শত কাঁটায় ঠাসা। তার অলিগলি বিষাক্ত ক্যাকটাসে ছাওয়া। এখানে কি সব কথা রাখা সম্ভব?

দেড়মাস আগে আসলিহান গুম হয়ে যায় তাদেও ব্যালকনি থেকে। পাঁচদিন পর তার লাশ পাওয়া যায় একটি ডোবার পাশে। দেহ ক্ষত-বিক্ষত। চুল এলোমেলো। ধর্ষণের আলামত স্পষ্ট।

গতরাতে আসলিহানকে স্বপ্নে দেখেছে আফসিন। তার গায়ে একটি সবুজ লেহেঙ্গা। আফসিনের কাছে এমনি একটি লেহেঙ্গার বায়না ধরেছিল আসলিহান। সামনের ঈদে কিনে দেবে বলে ওয়াদাও করেছিল আফসিন। কিন্তু তা আর কেনার প্রয়োজন হয়নি। ওপাওে নেয়ামত হিসেবে সবুজ লেহেঙ্গা পেয়ে গেছে আসলিহান।

আজ ঈদের জামাত শেষে আসলিহানের কবর জিয়ারতে এসেছে আফসিন।

'আসলিহান! আমি বিশ্বাস করি আল্লাহ তোকে শহিদ হিসেবে কবুল করেছেন। তুই মজলুম। পৃথিবীতে সর্বনিকৃষ্টতম আচরণ হয়েছে তোর সঙ্গে। পৃথিবীটা এমনই। এখানে যেমনি মানুষের প্রধান বন্ধু মানুষ, তেমনি মানুষের প্রধান শত্রুও মানুষ। তারচেয়ে বরং তুই ওখানেই ভালো আছিস। ওখানে কারও শত্রু কেউ নেই। আমি-আমরা সকলেই এই পথের যাত্রী। পার্থিব এ জীবনের পরে মাটিই যে আমাদের শেষ ঠিকানা।'

আমি আফসিনের কাঁধে হাত রাখলে সে আমার দিকে ফেরে। 'ওরা সকলে অপেক্ষা করছে। চল, যাওয়া যাক।' বললাম আফসিনকে।

'আমার একটি বিশেষ কাজ আছে। তাদেরকে বলে দিয়ো আমি আসছি না।' এই বলে আফসিন চলতে লাগে। যেতে থাকে দূর থেকে দূরে।

দুই

আমি চলে আসি রাশিদের বাড়ি। রাশিদ ইরানে একটি ইউনিভার্সিটিতে রসায়ন নিয়ে পড়ছে। ঈদ কাটাতে দেশে ফিরেছে রমজানের শুরুর দিকে। সালমান ও ফারহান আমার আগে সেখানে পৌঁছে গেছে। ফারহান আমাকে প্রশ্ন কওে, 'কী রে! আফসিন কোথায়?'

'তার বিশেষ কাজ আছে।'
'ঈদের দিনে কী এমন বিশেষ কাজ?'
'সেটা আমি জানি না। তবে আমি জানি আফসিন দিনদিন অন্যকিছু একটা হয়ে যাচ্ছে। আদালত থেকে সুষ্ঠু বিচার না পেলে কী করে বসে আল্লাহ মালুম।'
'সুষ্ঠু বিচার নেই বলেই তো ধর্ষণের তালিকায় বাংলাদেশ দিনদিন উপরে উঠছে।'
'ধর্ষণ বাড়ার পেছনে মেয়েদের হিজাবহীন চলাফেরাও দায়ী।' বলল সালমান।
ফারহান একটি তাচ্ছিল্যের হাসি দিয়ে বলল, 'বুঝি শুরু হলো তোর ওয়াজ। যদি পোশাকই ধর্ষণের কারণ হয় তাহলে আসলিহান কেন ধর্ষিতা হলো? সে তো হিজাব পরত। তাছাড়া তাকে তাদের ব্যালকনি থেকে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছিল।'
'তাহলে ধর্ষণের কারণটা কী?'
'সেটা নারীর স্বাধীনতা, ক্ষমতায়ন আর আইন প্রয়োগের অভাব।'
'আচ্ছা, তুই কী হ্যাশ-ট্যাগ মি-টু আন্দোলনের কথা জানিস?'
'হু।'
'সেখানে অ্যাঞ্জেলা জোলিসহ হলিউড-বলিউডের বিখ্যাত অভিনেত্রী ও বিশ্বের অনেক ক্ষমতাবান নারী নিজেদের সঙ্গে ঘটা যৌনহেনস্থার কথা শেয়ার করেছেন। এমনকি খোদ ইউরোপীয় ইউনিয়নের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছিল ওখানে নাকি যৌন আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থের লক্ষ্যেই চাকুরি দেওয়া হয় অল্পবয়সী মেয়েদের। যে ইউরোপীয় ইউনিয়নকে অনুসরণ করে পারিবারিক সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার ভীত গড়তে আমাদের বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠী এক পায়ে খাড়া। তোর দাবি সত্য হলে স্বাধীনতা আর ক্ষমতার শীর্ষচূড়ায় অবস্থানরত সেই সব নারী ধর্ষিতা হতো না। বিশ্বব্যাপী আইন সাপ্লাইকারী প্রতিষ্ঠান ইউরোপীয় ইউনিয়নের বিরুদ্ধেও অভিযোগ উঠত না।'
ফারহানের ক্রমশ রাগ বাড়ছিলো। এটা তার অভ্যাস। যখন তর্কে যুক্তিতে হেরে যেতে বসে তখন তার রাগ বাড়তে থাকে।
আমি আমাদের সামনে রাখা একটি ক্যালেন্ডারের দিকে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। যার নিচের অংশে দিন-তারিখ আর উপরের অংশে একটা মেয়ের ছবি। আমি বললাম, 'আজকাল ক্যালেন্ডার সাবান তেলসহ প্রায় সকল মুদিপণ্য এমনকি চকলেটের কাভারে নারীর ছবি ছাপা হচ্ছে। এসব পণ্যের সঙ্গে নারীর সৌন্দর্যটাও পণ্য হিসাবে বিক্রি হচ্ছে। আর এর বিনিময়ে ওই নারী মহানন্দে কিছু টাকা গ্রহণ করছেন। মডেল হচ্ছেন। 'স্বার্থক' ক্যারিয়ার গড়ছেন।'
ফারহান চোখ তুলে কিছু বলতে গিয়ে আটকে যায়। বুঝলাম সে এখানে আপত্তি করতে চায়। আমি বললাম, 'ফারহান, তুই সহজ করে ক্রয়-বিক্রয়ের একটা সংজ্ঞা দে।'
'ক্রয়-বিক্রয় হলো ক্রেতা-বিক্রেতার সম্মতিতে পণ্যের বিনিময়ে মালের আদান-প্রদান।'
'তাহলে দেহ ব্যবসার নামে যখন শরীর বিক্রি হয় সেখানে পণ্য হচ্ছে দেহ?'
'হুম।'
'দেহ যখন পণ্য হচ্ছে তাহলে যেভাবেই দেহের বিনিময়ে টাকা আসবে সেটা দেহব্যবসা হবে। চাই রূপ-সৌন্দর্য পরিবেশন করে হোক বা শরীর ভোগ করতে দিয়ে হোক। সুতরাং মডেল স্টার বেশ্যা ইত্যাদি নাম গিয়ে একটি নামে একত্রিত হচ্ছে। সেটা হলো দেহব্যবসায়ী? এই বিজ্ঞাপন ভিত্তিক দেহব্যবসা জনমানুষের মনে খুব সূক্ষ্মভাবে রোপণ করে দিচ্ছে নারীকে পণ্য বা ভোগ্যবস্তু ভাবার বিভৎস চেতনা।'
ফারহান হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়ল।
আমি আবারও বলতে শুরু করলাম, 'এভাবে সারাবিশ্বে সিনেমা নাটক গল্প উপন্যাস কবিতা–সবকিছুতে নারীকে উপস্থাপন করা হচ্ছে একটি ভোগ্যপণ্য হিসেবে। অতঃপর একটি শিশু এগুলো দেখে দেখে, এগুলো পড়ে পড়ে বড় হচ্ছে। তার সঙ্গে মনের মধ্যে বড় হচ্ছে নারীদেহ ভোগের বা ধর্ষণের একটি নিকৃষ্ট আকাঙ্ক্ষা।
'কাজেই তোমরা যদি ধর্ষণের কারণ চিহ্নিত করতে চাও তাহলে ভাবতে হবে একজন ধর্ষকের মন নিয়ে। কেন এবং কোথা থেকে তার মনে এই চেতনা এলো। একজন জলজ্যান্ত মানুষকে কেন সে ভোগবস্তু ভাবতে গেল। ভাবতে হবে অশালীন পোশাকসহ



যৌনতার প্রতি আকর্ষণ করে এমন সবকিছু নিয়ে। আইন ও শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে। ভাবতে হবে আরও বহুকিছু নিয়ে। বিশ্বের যেসব দেশ এই নীতিগুলো অনুসরণ করছে সেসব দেশ ধর্ষণের তালিকায় অনেক নিম্নে আছে।'

রাশেদ বলল, 'হ্যাঁ, ইরানে ধর্ষণের খবর আমি শেষ কবে শুনেছিলাম মনেই নেই।'

'নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশাকে কি ধর্ষণের জন্য দায়ী করা যায়?' প্রশ্ন করে সালমান।

ফারহান চোখ ঘুরিয়ে বলে, 'এটা হবে কেন? এর কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও নেই।'

'একটি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আছে।' বলল রাশেদ।

আমরা গুরুত্ব দিয়ে রাশেদের কথা শুনতে লাগলাম। '১৭৩৩ সালে চার্লস ফ্রাঁসোয়া দুফে নামে এক ফরাসি গবেষক দেখলেন আকর্ষণের শক্তি আছে দু'ধরনের। তিনি দেখলেন একটি কাঁচের দণ্ড আর একটি সিলমোহর করার গালারকে রেশম দিয়ে ঘষলে দুটিতেই বিদ্যুৎ জন্মায়। কাঁচের দণ্ড ছোট ছোট জিনিসকে আকর্ষণ করে আবার গালারও তেমনি আকর্ষণ করে।

'মনে করা যাক বিদ্যুতযুক্ত দুটি কাঁচের দণ্ড রেশম দিয়ে কাছাকাছি ঝুলিয়ে দেওয়া হলো। দেখা যাবে তারা পরস্পর দূরে সরে গেছে। অর্থাৎ তারা একে অন্যকে বিকর্ষণ করেছে। কিন্তু যদি একটি কাঁচের দণ্ড আর একটি গালারকে কাছাকাছি ঝুলিয়ে দেওয়া হয় দেখা যাবে তারা পরস্পর কাছে চলে এসেছে। অর্থাৎ তারা একে অন্যকে আকর্ষণ করেছে।

'এই তত্ত্বের নিরিখে আমরা দেখতে পাই পদার্থের মধ্যে তার সমজাতীয় জিনিসকে বিকর্ষণ এবং বিপরীত জাতের জিনিসকে আকর্ষণ করার জন্মগত ক্ষমতা রয়েছে। এভাবে মানুষ মৌলিকভাবে নারী ও পুরুষ দুটি বিপরীত জাতে বিভাজ্য। তাই বিজ্ঞানের এই

তত্ত্বমতে পুরুষ-নারী তারা একে অন্যকে আকর্ষণ করবে। যা হতে পারে ধর্ষণের কারণ।'

রাশিদের কথাগুলো সবাই নীরবে শুনছিলাম। নীরবতা ভেঙে ফারহান বলল, 'বুঝলাম, কিন্তু এখানে একটি প্রশ্ন হলো, পদার্থের ব্যপারে প্রতিষ্ঠিত একটি তত্ত্ব মানুষের ওপর প্রয়োগ করা কীভাবে শুদ্ধ হবে?'

রাশিদ জবাব দিল, 'পদার্থের রূপান্তরিত প্রক্রিয়া থেকেই এসেছে বর্তমান মানুষের রূপ। তাছাড়া প্রাকৃতিক নিয়মে মানুষসহ সকল জীব তার বিপরীত জাতকে আকর্ষণ করার ক্ষমতা খুবই প্রবলভাবে বিরাজমান।'

'আর বলতে হবে না। ধর্ষণের কারণ হিসেবে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশাকেও দায়ী করতে আমার কোনো আপত্তি নেই।' আত্মসমর্পণের সুরে বলল ফারহান।

রাশিদের মা আমাদের জন্য চা-নাস্তা পাঠিয়েছেন। আমরা চায়ের সঙ্গে দেশ-বিদেশের নানান কথাবার্তা চিবাচ্ছি। আমার মোবাইলে একটি ফোন আসে। ওপাশ থেকে কেউ একজন বলে আফসিনকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে। আমরা হুড়োহুড়ি করে বাইরে বের হই। দৌড়োই আফসিনের দিকে।

তিন

আমরা বাজার পয়েন্টে এসে দেখি মানুষের ভিড়ে আফসিনকে ধরে রেখেছে কয়েকজন পুলিশ। তার হাতে দণ্ড। শার্টে রক্তের দাগ। পাশে দুটি লাশ। উভয় লাশের গলায় ঝুলানো একটি করে চিরকুট। 'আমি একজন ধর্ষণকারী। একজন হত্যাকারী। এমন কাজের পরিণতি এটাই হওয়া উচিত।' (হারকিউলিস)।

আফসিন তার বোনের ধর্ষকদের বিচারের কাঠগড়ায় আনতে চেয়েছিল। কিন্তু সমস্যা ছিল তিনজন অভিযুক্ত আসামির মধ্যে একজন ছিল স্থানীয় এমপি সাহেবের দুঃসম্পর্কে ভাগিনা–রমিজ। ওই এমপি সাহেব নাকি থানায় বলে দিয়েছিলেন তাঁর ভাগিনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চলছে। মামলা দিয়ে মানহানি করার চেষ্টা করা হচ্ছে। তার ভাগিনার বিরুদ্ধে যেন কোনো অভিযোগ গ্রহণ করা না হয়। এ জন্য ওসি সাহেব প্রথমে আসলিহানের মামলা থেকে রমিজের নাম কেটে দিতে চাইলেন। পরে আফসিনের পিড়াপিড়িতে রমিজকেও আসামি করা হলো ঠিক কিন্তু মামলার কাজ থেমে গেল।

আফসিন থানায় যায়-আসে। ওসি সাহেব বলতে থাকেন কাজ হচ্ছে-হবে। শেষদিকে আফসিনের সঙ্গে থানার লোকেরা বাজে আচরণ করতে শুরু করে। আসলিহান হত্যার দেড়মাস কেটে যায়। একজন আসামিও গ্রেপ্তার হয়নি। বরং অভিযুক্ত আসামিরা বুক ফুলিয়ে হাঁটতে থাকে জনপদে। রমিজ আরও বেপরোয়া হয়ে ওঠে। পথঘাটে আফসিনকে পেলে চোখ টিপ্পনী দেয়।

একদিন রমিজ বলেই ফেলে, 'কীরে বেটা, বোনের মামলা কত দূর নিলি? তোর বোনকে তো আমি প্রপোজ করেছিলাম। ভালোবেসে বিয়ে করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তোর বোন আমাকে যে অপমান করেছিল তা আজও আমাকে পীড়া দেয়। এখন তুইও আমাকে মামলায় ঢুকিয়ে দিলি। আচ্ছা বল তো, যার জন্য মন থেকে ভালোবাসা জন্ম নেয় তাকে কি হত্যা করা যায়?'

আফসিনকে থানায় নেওয়া হয়। পরদিন রমিজ ও তার বন্ধুর হত্যামামলা দেখিয়ে পাঠানো হয় হাজতে।

আফসিনের পৃথিবীতে আসলিহান আর তার মা ছাড়া আপনজন বলতে কেবল আমরা কয়েক বন্ধু ছিলাম। শৈশবে বাবাহারানো ছেলেটি বড় হয়েছিল বহু ঘাত-প্রতিঘাত পেরিয়ে। কিন্তু এবারের ঘাত থেকে হয়তো তাকে আর রক্ষা করা গেল না।

আফসিনকে হাজতে পাঠানোর ২০ দিন পর আমাদের গ্রামে আরেকজন মেয়ে ধর্ষিতা হয়। তবে তাকে হত্যা করার আগেই তার পরিবার গিয়ে উদ্ধার করে নিয়ে আসে। অতঃপর ওই মেয়ের করা মামলায় আটক করা হয় একজন ধর্ষককে। রিমাণ্ডের পর জানা যায় সে আসলিহানকেও ধর্ষণ করে হত্যা করেছিল। এ কথা প্রকাশের পর এমপি সাহেব ও রমিজের আত্মীয়-স্বজনের ক্ষোভ আরও বাড়ে আফসিনের ওপর। তারা দ্রুত আফসিনের ফাঁসির ব্যবস্থা করতে মরিয়া হয়ে ওঠেন। নয়

মাসের মাথায় রমিজ ও তার বন্ধুকে হত্যার দায়ে আফসিনের ফাঁসির আদেশ হয়। এর কিছুদিন পর আদেশ কার্যকরের ব্যবস্থা নেওয়া হয়। জেলের ফটক থেকে তার লাশ গ্রহণ করতে নোটিশ পাঠানো হয়।

আফসিনের মা, আমি ও সালমান একটি অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে যাই কারাফটকে।

আফসিনের সঙ্গে শেষদেখা করতে আমরা প্রবেশ করি ভেতরে। সে দাঁড়িয়ে আছে গাছের মতো। তার স্তব্ধ চোখ-মুখ থেকে বেরুচ্ছে পৃথিবীর প্রতি নীরব ঘৃণা।

আফসিনেন মা বললেন, 'বাবা, তুই কি সত্যি রমিজ ও তার বন্ধুকে খুন করেছিলি?'

'মা, আমি ঈদের রাতে আসলিহানকে স্বপ্নে দেখার পর খুব অস্থির হয়ে উঠেছিলাম। পরদিন ঈদের নামাজের পর কোথা থেকে একটি চিরকুট আমার কোলে এসে পড়ে। সেখানে লেখা ছিল তোমার বোনের ধর্ষক ও হত্যাকারীকে আজ দুপুরে বাজারের পেছনে হত্যা করা হবে। তাই দুপুরের দিকে আমি ওখানে যাই। গিয়ে দেখি রমিজ ও তার বন্ধুর রক্তাক্ত লাশ পড়ে আছে। আমি ঘটনা কিছুই বুঝে উঠতে পারিনি। রমিজের শরীরে হাত দিই। এতে তার শরীর থেকে কিছু রক্ত আমার হাতে ও কাপড়ে লাগে যায় এবং ফিঙ্গার ছাপ মিশে যায় রমিজের শরীরে। ততক্ষণে মানুষ এসে আমাকে ঘিরে ধরে। ভাবতে থাকে আমিই খুনি।'

'বাবা, তুই এ কথা আদালতে বলিসনি কেন?'

'বলেছি, মা! কত বার বলেছি! কিন্তু এঁা তো সত্য, রমিজের শরীরে সর্বশেষ আমার ফিঙ্গার ছাপ মিশেছিল এবং তার রক্তও আমার গায়ে পাওয়া গিয়েছিল। দুনিয়ার আদালতে ফাঁসি হওয়ার জন্য এটুকুই যথেষ্ট।'

সালমান বলল, 'তাহলে ওদের আসল হত্যাকারী কে?'

'হারকিউলিস।' উদাস কণ্ঠে বলল আফসিন।

প্রহরী আমাদের বের হওয়ার ইঙ্গিত দেয়। আফসিন আমার হাত ধরে বলে, 'আমার মাকে তুই মা বলে ডাকিস। সকল পরিস্থিতিতে দেখে রাখিস।'

'কান্না দমিয়ে রেখে আমি কেনো মতে বললাম, 'ইনশাআল্লাহ।'

আমরা বের হয়ে আসি। আফসিন টলমল চোখে তাকিয়ে থাকে। দরজার ওপাশে আফসিনের কণ্ঠ আসে, 'মা আমি তোমাকে অনেক ভালোবাসি।'

ফটকের সামনে এসে আমরা অপেক্ষা করতে থাকি। সালমান বলে, 'হারকিউলিসটা আসলে কে, নিরপরাধ আফসিনকে যে ফাঁসির কাষ্ঠে পৌঁছে দিলো?'

আমি বললাম, 'মানুষ আইনের শাসন থেকে নিরাশ হয়ে গেলে নিজের হাতে আইন তুলে নিতে চায়। হারকিউলিস ওরকমই একটা কিছু হয়তো। কিন্তু ভুল পথে হেঁটে কখনই মেওয়া বাগানে পৌঁছা যায় না। ফলে তাদের নামও লিখিত হয় ইতিহাসের কলঙ্কময় পাতায়।'

ভোর ছয়টায় আফসিনের লাশ আমাদের হাতে দেওয়া হয়। আসলিহানের কবরের পাশে আমরা তাকে দাফন করি।

পৃথিবীর নিয়মে পৃথিবীতে আলো ফোটে। পাখি ডাকে। হাওয়া বয়। ঈদ আসে। ঈদ যায়। কেবল আসে না আসলিহান। আসে না আফসিন। কেনা হয় না ঈদের পোশাক সবুজ লেহেঙ্গা।

ইমাম আবু হানিফা ইনিস্টিটিউট, সাগর দিঘীরপার, সিলেট

রণাঙ্গনের বীরাঙ্গনা

অরিশা জান্নাত



নবধ্বনি ১৩৬

চেহারাটা নেকাবে ঢাকা। তবে একবার চোখের দিকে তাকালেই যে কেউ বুঝতে পারবে ভেতরে কী পরিমাণ আগুন পুষছে সবুজ রঙের পাগড়িবাঁধা মানুষটা। কালো কাপড়ে মোড়ানো দেহটাও কেমন হালকা-পাতলা। মনে হচ্ছে সদ্য দাড়িগোঁফ গজানো কোনো অল্পবয়সী কিশোর। ঘোড়দৌড়ে এদিকসেদিক হেলে পড়লেও এতটুকু গতি কমছে না তাঁর। বরং যতই তাঁকে পিছুডেকে সতর্ক করা হচ্ছে ততই সে বেপরোয়া হয়ে পড়ছে।

খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হয়রান হয়ে গেলেন এ যুবকের বীরত্ব দেখে। এদিকে রাফে বিন উমাইয়াও পেরেশান। ভাবছেন, খালিদ বিন ওয়ালিদ ব্যতীত এই বীরত্ব অন্য আর কার হতে পারে? মাত্র শত্রুবাহিনীর ওপর আক্রমণের আদেশ দিতে যাচ্ছেন সিপাহসালার, তার আগেই কোথা থেকে হাজির এই নেকাবধারী। যেন হঠাৎ বিস্ফোরিত হওয়া কোনো জ্বলন্ত অগ্নিগিরি।

এক হাতে লম্বা বর্শা আরেক হাতে ধারালো তলোয়ার। তারপরও ঘোড়াটাকে সামলে রেখেছে। দেখেই বোঝা যায়, লোকটা দক্ষ ঘোড়সওয়ার। খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু কয়েকবার ডাকলেন। কিন্তু কে শোনে কার কথা! অদ্ভুতুড়ে এক উন্মাদনায় মেতেছে লোকটা। একবার শত্রুবাহিনীর সামনে যায় আবার পেছনে ফিরে আসে। এরমধ্যে যে সামনে পড়ে তাকেই কচুকাটা করে।

রাফে বিন উমাইয়া খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে দেখে অবাক হয়ে গেলেন। 'আরে! আপনি এখানে? তাহলে এভাবে যুদ্ধ করছে কে?'

খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর উত্তর, 'আমিও তো তা-ই ভাবছি, এই বীর মুজাহিদটি কে, যে এমন পাগলের মতো লড়ছে!'

রাফে বিন উমাইয়া বললেন, 'এ তো মুসলমানদের রক্তে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। তাঁকে সাহায্য করা দরকার। তাছাড়া যেভাবে আত্মঘাতী লড়াই শুরু করেছে, যেকোনো সময় মারা পড়বে। আপনি অনুমতি দিন যুদ্ধ শুরু করার।'

সিপাহসালার খালিদ নির্দেশ দিলেন। শুরু হলো তুমুল যুদ্ধ। উপর্যপুরি আঘাতে রোমানরা পিছু হটতে বাধ্য হলো। মুজাহিদরাও ফিরে এলেন নিজ নিজ শিবিরে। সেই যোদ্ধার দেখা মিলল এবার। জামা-কাপড় রক্তে একাকার। তারবারি থেকেও ঝরছে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত। দীর্ঘ বর্শাটা লালে লাল। সিপাহসালার খালিদ রাদিয়াল্লাহু তাঁকে চিৎকার করে বললেন, 'আল্লাহ তাআলা তোমাকে উত্তম প্রতিদান দান করুক। তুমি প্রাণপণ যুদ্ধ করেছ। এবার নেকাব খোলো। কে তুমি, দেখি।'

নেকাবধারী মুজাহিদ নিশ্চুপ। নিশ্চল।

খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু এবার কঠোর হলেন তাঁর পরিচয় জানতে। গম্ভীর গলায় বললেন, 'কে তুমি? কী তোমার পরিচয়? চেহারা দেখাচ্ছ না কেন?'

এবার মিষ্টি কণ্ঠের ক্ষীণ আওয়াজ ভেসে এলো নেকাবধারীর কাছ থেকে—'মুহতারাম সিপাহসালার! আপনি আমার জন্য গায়রে মাহরাম। আমি কীভাবে আপনার সামনে আমার চেহারা খুলব?'

নারীকণ্ঠের আওয়াজ শুনে উপস্থিত সকলেই বিস্ময়ে হতবাক। তাহলে

কি এতক্ষণ একজন নারীই...?
বীরাঙ্গনা এই মুজাহিদার পরিচয় জানতে আগ্রহী সবাই। নেকাবধারীর ক্ষীণ স্বরের মিষ্টি কণ্ঠ আবারও বেজে উঠল–'আমিরে মুহতারাম! আমি খাওলা। উখতে দিরার বিন আজুর। ভাইকে শত্রুদের হাত থেকে মুক্ত করার জন্যই আমার এই লেবাস। আমি মহিলাদের সঙ্গে অবস্থান করছিলাম। এমন সময় একজন এসে বলল, আমার ভাই দিরার বিন আজুর কাফেরদের হাতে বন্দী হয়েছে। আমি তখনই ঘোড়ায় সওয়ার হলাম এবং যা করার করলাম।'
বিস্ময়ের ঘোর কেটে ওঠার পর খালিদ রাদিয়াল্লাহু তাঁকে স্বান্ত্বনা দিলেন। আশ্বাস দিয়ে বললেন, অচিরেই মুক্ত করে আনা হবে তাঁর ভাইকে।
আমের বিন তুফায়েল বলেন, 'খাওলা যখন সামনে থেকে হামলা করছিল, তখন আমি খালিদের পাশে ছিলাম। রোম সৈন্যরা বলছিল, সব মুসলিম সৈন্য যদি এই অশ্বারোহীর মতো হতো তাহলে আমরা কখনোই তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারতাম না।

দুই

সালার দিরার বিন অজুর রাদিয়াল্লাহু আনহু রোমানদের হাত থেকে মুক্ত হয়েছেন মাত্র একদিন হলো। কাফেরদের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়েছে। এবার তারা আরও জোরদারভাবে হামলা করল। আর তাদের নেতৃত্বে থাকল রোম রাজকন্যার স্বামীর ভাই বুট্রোস। কীভাবে কীভাবে যেন তারা মুসলিম মেয়েদের তাবু পর্যন্ত পৌঁছে গেল। অবলা মেয়েদের পাকড়াও করে নিল কোনোরকম বাধা ছাড়াই। পাকড়াওয়ের পর মুসলিম নারীদেরকে নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে নিল।
কিছু অবলা নারী অসহায় হয়ে শত্রুদের নির্দেশিত স্থানে যাওয়ার জন্য ঘোড়ায় চড়েছেন। এমন সময় গর্জে উঠলেন বীরাঙ্গনা খাওলা।
জ্বালাময়ী কণ্ঠে বললেন, 'হিময়ার ও তুববার গোত্রের মেয়েরা! তোমরা কি রোমানদের লালসার শিকার হবে? আর তোমাদের ছেলেদের মুশরিকদের পা-চাটা গোলাম বানাবে? কোথায় তোমাদের সে সাহসিকতা, যা আরবদের মধ্যে প্রাণসঞ্চার করত? এখন তোমাদের মধ্যে সেসব নেই কেন? রোমান কুকুরদের মনোরঞ্জন করার চেয়ে মৃত্যুই তো ঢের ভালো।'
খাওলার আগুনঝরা আ আহ্বান শুনে আরও একটি কণ্ঠ উচ্চকিত হলো। আফরা বিনতে গিফার আল-হিময়ারি বললেন, 'আল্লাহর কসম, হে বিনতে আজুর! তুমি সত্য বলেছ। তুমি যে সাহসিকতা ও বুদ্ধির কথা বলছ, আমরা এখনও ভুলিনি। আমাদের রয়েছে অনেক বড় বড় ভূমিকা ও কৃতিত্ব। আল্লাহর কসম, আমরা রাতের অন্ধকারে ওদিকে যাচ্ছি, এটা সত্য, তবে আরেকটি কথা, এ সময়ে তরবারির কাজ অন্যান্য সময়ের চেয়ে ভালো। আমরা চাইছি শত্রুদের অগোচরে তাদের ওপর হামলা করব। কারণ, আমরা তো এখন লাগাম মুখে দেয়া ছাগলের মতো।'
এবার খাওলা অন্যান্য মেয়েদেরকে তাবু ও খুঁটির কাঠ হাতে নেয়ার নির্দেশ দিলেন। যাতে এসব দিয়ে কাফেরদের ওপর আক্রমণ করা

যায়। তাঁর কথা ছিল এরকম, 'হয় মারব, নয়তো মরব। আল্লাহ আমাদের বিজয় দান করবেন অথবা আমরা শহিদ হয়ে যাব, কিন্তু কিছুতেই এসব নিকৃষ্ট লোকের হাতের খেলনায় পরিণত হব না।'

এর পরের দৃশ্যটা ছিল দেখার মতো। প্রথমে খাওলা রাদিয়াল্লাহু আনহা, তাঁর পিছুপিছু আফরা, উম্মে আবান, সালমা বিনতে জিরা, লুবনা বিনতে হাজেম, মাখরুমা বিনতে আমলুক, সালমা বিনতে লুমানসহ অন্যান্য মহিলারা। সবার কাঁধে ছিল একটি করে বড় খুঁটি। খাওলার পরামর্শে তাঁরা বৃত্তের মতো করে চলতে লাগলেন। এভাবে চলার পর একসময় রোমানরা তাঁদের ঘিরে ফেলল। তাঁরাও-বা কম যান কিসে? তাবুর খুঁটি নিয়েই শত্রুদের মোকাবেলায় নেমে পড়লেন। শত চেষ্টা করেও কেউ তাঁদের কাছে ভিড়তে পারল না। কেউ এগোতে চাইলেই তাবুর খুঁটি দিয়ে তার ঘোড়ার পায়ে আঘাত করে। আঘাত খেয়ে লাফিয়ে ওঠে ঘোড়া। আর আরোহী ছিটকে পড়ে মাটিতে। তারপর আর যায় কোথায়? ব্যস। দমাদম খুঁটির বাড়ি। একেবারে পটল না তোলা পর্যন্ত কোনো থামাথামি নেই।

এভাবেই বীরাঙ্গনা নারীরা কাফেরদের ৩০ জনকে হত্যা করে ফেলেন। এসব দেখে বুট্রোস প্রচণ্ড রেগে যায়। সে তার সৈন্যদের নিয়ে পায়দল এগিয়ে আসতে লাগল। এদিকে মেয়েরাও একে অপরকে উৎসাহিত করতে লাগলেন। খাওলা তখন সিংহের মতো নেতৃত্ব দিচ্ছেন। তিনি আবৃত্তি করছেন এক মর্মস্পর্শী কবিতা–

'আমরা হচ্ছি তুব্বা ও হিময়ারের বীরাঙ্গনা
আমাদের জন্য কঠিন নয় শত্রুদের ওপর আঘাত হানা
আমরা যুদ্ধে জ্বলন্ত অগ্নি
তোমরা আস্বাদন করবে মহাশাস্তি।'

বুট্রোস খাওলার কবিতা শুনে তাঁকে প্ররোচিত করতে বললো, 'হে আরব নারী! তুমি এমন করো না। তুমি কি চাও না, আমি তোমার স্বামী হই? আমার তো ধন-সম্পদের অভাব নেই। সম্রাট হিরাক্লিয়াসের কাছেও আমি মর্যাদাশীল। আমি তোমার পছন্দনীয় সব কিছু দিয়ে তোমাকে সম্মানিত করব। আমার সবকিছু তোমার জন্যই উৎসর্গিত। তুমি কি দামেস্কবাসীর নেত্রী হতে পছন্দ করবে না? তোমার কাছে আমার অনুরোধ, এভাবে নিজেকে ধ্বংস করো না।'

উত্তরে খাওলা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, 'হে অভিশপ্তের ছেলে অভিশপ্ত! শুধু একবার সুযোগ পাই, তোর ঘাড় থেকে মাথা আলাদা করব আমি। আল্লাহর কসম, আমি তো তোকে আমার উটের রাখাল হওয়ারও যোগ্য মনে করি না। তোকে কীভাবে সঙ্গী হিসেবে গ্রহণ করব?'

এ কথা শুনে বুট্রোস তার সৈন্যদেরকে নিয়ে আরও জোরালোভাবে আক্রমণ করল। এদিকে মহিলারাও প্রতিরোধে অত্যন্ত ধৈর্যের পরিচয় দিলেন। এমন সময় খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু মুজাহিদদের নিয়ে তাঁদের সাহায্যে এগিয়ে এলেন। রাফে বিন উমাইয়া এগিয়ে এসে মেয়েদের অবস্থা জেনে খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে অবহিত করলেন যে, আমালিকা ও তাবাবিআ বংশের নারীরা মরণপন লড়াই করছে। তখন খালিদ রা. বললেন, ওদের যুদ্ধ দেখে আমি অবাক হই না। ওরা তো তুব্বার বংশের নারী। যারা কিনা এক শতাব্দী পূর্ব থেকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রতীক্ষায় ছিল। খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু শত্রুদের চতুর্দিক থেকে আক্রমণ করে মেয়েদেরকে মুক্ত করলেন। মুক্তির মুহূর্তে খাওলা রাদিয়াল্লাহু আনহা চিৎকার করে বলছিলেন, 'তাবাবিআ বংশের মেয়েরা! কাবার প্রভুর শপথ! তোমাদের জন্য সাহায্য এসে গেছে।'

তুমুল যুদ্ধের পর রোমানদের তিন হাজার সৈন্য মারা পড়লো। হামেদ বিন আমের আল ইয়ারবুয়ি বলেন, 'আমি সেদিন খাওলাকে পাঁচজন কাফের সৈন্য হত্যা করতে দেখেছি।' দিরার বিন আজুর রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন বীর যোদ্ধা। তিনি মুজাহিদ বাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ একজন সালারও। কিন্তু তাঁর বোন খাওলাও যে একজন তেজস্বিনী বীরাঙ্গনা, এ যুদ্ধের আগে এ কথা অনেকেরই জানা ছিল না।

কামারগাড়ি, সদর, বগুড়া



(ছোটগল্প)

বিভ্রম

আহমাদ সাব্বির

সাইকিয়াট্রিস্ট নিশাত আলম অবাক হয়ে রোগীর দিকে তাকিয়ে আছেন। ১৫ বছরের ডাক্তারি জীবনে বহু মাথাখারাপ হওয়া রোগীর চিকিৎসা করেছেন তিনি, তাঁর মনে হচ্ছে এ জীবনের সবচেয়ে ভয়ংকর রোগীটি এখন তাঁর সামনে, চেয়ারে বসে আছেন।
আটপৌরে একজন মানুষ। জুলফিতে সামান্য পাক ধরেছে। মনে হয় এখানে আসার খানিক আগে দাড়ি শেভ করে এসেছেন। তেলতেলে মুখে সাদা বাতির আলো পড়ে কেমন জ্বলজ্বল করছে; যার ফলে বয়সটা অনুমান করা যাচ্ছে না। অথচ এসব রোগীর ক্ষেত্রে বয়সটা জানা ডাক্তারের জন্য খুবই জরুরি।
নিশাত আলম এতক্ষণ চেয়ারে হেলান দিয়ে ছিলেন। এবার কিছুটা

সামনে ঝুঁকে গলা খাকারি দিয়ে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'কী বললেন, আপনার মানুষ খুন করতে ইচ্ছে করছে?'
'জি, ডাক্তার! তবে সবাইকে না; শুধু আমার মেয়ে বনি সামনে এলেই মনে হয়–গলা টিপে মেরে ফেলি।'
'নিশাত আলম ভ্রু কুঁচকে তাকালেন। লোকটি খুন করার কথা এমনই অবলীলাক্রমে বলে ফেললেন যেন তাঁর কাছে লজেন্সের আবদার করছে একটা শিশু; নিতান্ত অপরিচিত বলে আবদারটা সেভাবে করতে পারছে না।
'আপনার নাম?'
'আলতাফ হোসেন।'
'করেন কী?'
'টঙ্গীতে একটা গার্মেন্টের সুপারভাইজার। চার-পাঁচ দিন হলো এই টেনশনে অফিসে যেতে পারি না। অফিস থেকে কিছুক্ষণ পর পর ফোন আসে তাই মোবাইলটাও বন্ধ করে রেখেছি। মনে হয় চাকরিটাও এ যাত্রায় টিকবে ন।'
'আপনার কখন থেকে মনে হলো যে মেয়েকে গলা-টিপে মেরে ফেলবেন।'
'গত ১৪ জুলাই আমার মেয়ের ১৮ বছর হলো। মা-মরা মেয়ে আনন্দ-অনুষ্ঠান সেভাবে করার সুযোগ পায় না। ভাবলাম এবার একটু বড় করে ওর জন্মদিনটা করি। কথা ছিল সন্ধ্যায় কেক নিয়ে ফিরব, কিন্তু ফিরতে দেরি হয়ে যায়। রাতে বাসায় ফিরে দেখি বনি নেই; ওর বিছানায় শিমু শুয়ে আছে। এরপর থেকেই গত চারদিন বনির বিছানায় শিমুকে জবুথবু হয়ে শুয়ে থাকতে দেখি। কিন্তু সকাল হলেই দেখি যে, না, আমার রাতের দেখা ভুল ছিল, ওটা শিমু না, বনিই ছিল।'
'এই শিমুটা আবার কে?
'শিমু, ডাক্তার সাহেব, আমাদের কারখানারই এক মেয়ে। দু বছর আগে আত্মহত্যা করে মারা যায়।'
'সত্যি করে বলুন তো, শিমুর আত্মহত্যার সঙ্গে আপনার কি কোনো সংশ্লিষ্টতা ছিল?
আলতাফ হোসেন চুপ মেরে যান। এতক্ষণ নিশাত আলমের চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বললেও হঠাৎই চোখ নামিয়ে ফেলেন। তাঁর দৃষ্টি এখন টেবিলের ওপর; যেন অতীব জরুরি কোনো জিনিস হারিয়ে ফেলেছেন। জিনিসটা টেবিলের ওপরেই আছে, খুঁজে পাচ্ছেন না। একটু ভালো করে খুঁজলেই পেয়ে যাবেন।
'চা দিতে বলি? চা খাবেন?' ডাক্তার বললেন।
'জি।'
'চা খেয়ে গলাটা পরিষ্কার করেন। আপনাকে ঝেড়ে কাশতে হবে। আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, বিস্তারিত না জানলে সমস্যার সমাধান করা আমার পক্ষে কঠিন হবে।'
বেল টিপে চা দিতে বললেন নিশাত আলম। বিরক্তি নিয়ে ঘড়ির দিকে তাকালেন একবার। ঘড়ি দেখে তাঁর কপাল আরও কুঁচকে গেল। রাত বাজে আটটা। আজ তাঁর মেয়ে শ্রাবণীর জন্মদিন। রাতে সবাই মিলে রেস্টুরেন্টে খাওয়া-দাওয়া করার পরিকল্পনা ছিল। ন'টার মধ্যেই তাঁর পৌঁছে যাওয়ার কথা। আলতাফ সাহেব কতটা সময় নেন তার ওপর নির্ভর করছে সময়মতো তাঁর ফেরা না ফেরা। পাগলের ডাক্তার হবার এই এক জ্বালা। হুটহাট রোগীর সামনে থেকে উঠে যাওয়া যায় না।
চা চলে এসেছে। আলতাফ সাহেব চায়ে ছোট্ট চুমুক দিয়ে ঝেড়ে কাশতে শুরু করলেন–'শিমু আমাদের গ্রামেরই মেয়ে ছিল। সাদামাটা, শ্যামল বর্ণেও মেয়ে, তবে দেখতে খারাপ ছিল না। কথাবার্তায়ও ছিল বেশ চটপটে। বাবা নেই। মা-মেয়ের সংসার। একবার আমি গ্রামে গেছি বেড়াতে। ওর মামা এসে বলল ওর জন্য একটা কাজের ব্যবস্থা করে দিতে। যেকোনো কাজ। শিমু লেখাপড়া যতদূর করেছে গার্মেন্ট ছাড়া অন্য কোথাও ওর কাজের কথা ভাবনায় এলো না। সঙ্গে করে ঢাকা নিয়ে এলাম। আমাদের ফ্যাক্টরিতেই ছোটোখাটো একটা কাজের জোগাড় করে দিলাম।
'আমার বাসায় আমাদের সঙ্গেই থাকতে লাগল মেয়েটা। নতুন মানুষ। ঢাকা শহরে পরিচিত বলতে আমিই; তাই আমাদের কাছে রেখে দিলাম। আমার মেয়ের সঙ্গে থাকত। শিমুর সঙ্গে বেশ সখ্যও তৈরি হয়ে যায় আমার মেয়ের। ওর মামা আমার ছোটবেলার বন্ধু ছিল। বন্ধুর ভাগ্নিকে তাই নিজের মেয়ের মতোই দেখতাম।
'একদিন হলো কী, বনি বাসায় নেই। ওর এক

খালাতো বোনের বিয়েত গেছে। রাতে বনি সেখানেই থেকে গেল। দুর্ঘটনাটা সেই রাতেই ঘটে। আমার মাথায় ভূত চেপেছিল, নইলে মেয়ের মতো যাকে দেখি তার সঙ্গে এমন নির্লজ্জ কাজ করতে পারি!

'পরদিন ঘুম থেকে উঠে দেখি শিমু নেআ। তার তিন-চার দিন পর খবর আসে শিমু গলায় ফাঁস দিয়ে কড়ুই গাছে ঝুলে পড়েছে। আমি অনেক বড় পাপ করে ফেলেছি ডাক্তার সাহেব! শিমুর মৃত্যুর জন্য আমিই দায়ী। এখন ওর আত্মা আমাকে ঘুমোতে দেয় না। খুব বিরক্ত করে। দেখেন, রাত জেগে জেগে চারদিনেই চোখ কেমন গর্তে ঢুকে গেছে।'

'আলতাফ সাহেব, আপনি শান্ত হোন। কারও আত্মা এভাবে ফিরে আসতে পারে না। এটা এক ধরনের হেলুসিনেশন। আপনার ভেতরের পাপবোধ আপনাকে কল্পনা করতে বাধ্য করছে যে শিমু আপনার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। ভাবছেন তার সঙ্গে যে অপরাধ আপনি করেছেন সে তার শাস্তি দেওয়ার জন্য সে ফিরে এসেছে। আমি কিছু ওষুধ লিখে দিচ্ছি, ওগুলো খান। আর অফিস থেকে কিছু দিনের জন্য ছুটি নেন। আপনার বিশ্রাম দরকার। বিশ্রামে থেকে ওষুধগুলো ঠিক মতো খান, আশা করি সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'কিছুই ঠিক হবে না ডাক্তার সাহেব! সব শেষ হয়ে যাবে।'

নিশাত আলম দেখলেন এই পাগলের সঙ্গে আর সময় নষ্ট করার কোনো মানে হয় না। এমনিতেই তিনি বেশ দেরি করে ফেলেছেন। কে জানে, আজ কী আছে কপালে! রোগীকে বসিয়ে রেখেই চেম্বার থেকে প্রায় ছুটে বের হয়ে গেলেন তিনি।

দুই

সাইকিয়াট্রিস্ট নিশাত আলম বিরস মুখে বসে আছেন। বারান্দার এ জায়গাটা তাঁর অসম্ভব প্রিয়। স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে দিনের প্রথম চা এখানে বসেই তিনি পান করেন। মেয়ে শ্রাবণী পাশে বসে পত্রিকা পড়ে শোনায়। আজ তিনি একাই তাঁর পছন্দের জায়গাটিতে বসে আছেন। খবরের কাগজ পড়ার কাজটিও অনিচ্ছাবশত তাঁকেই করতে হচ্ছে। গত রাতে দেরি করে ফেরায় মা-মেয়ে কর্তৃক এটা তাঁর জন্য নির্ধারিত শাস্তি। শাস্তিটা তাঁর জন্য একটু বেশিই দুঃখজাগানিয়া হয়েছে।

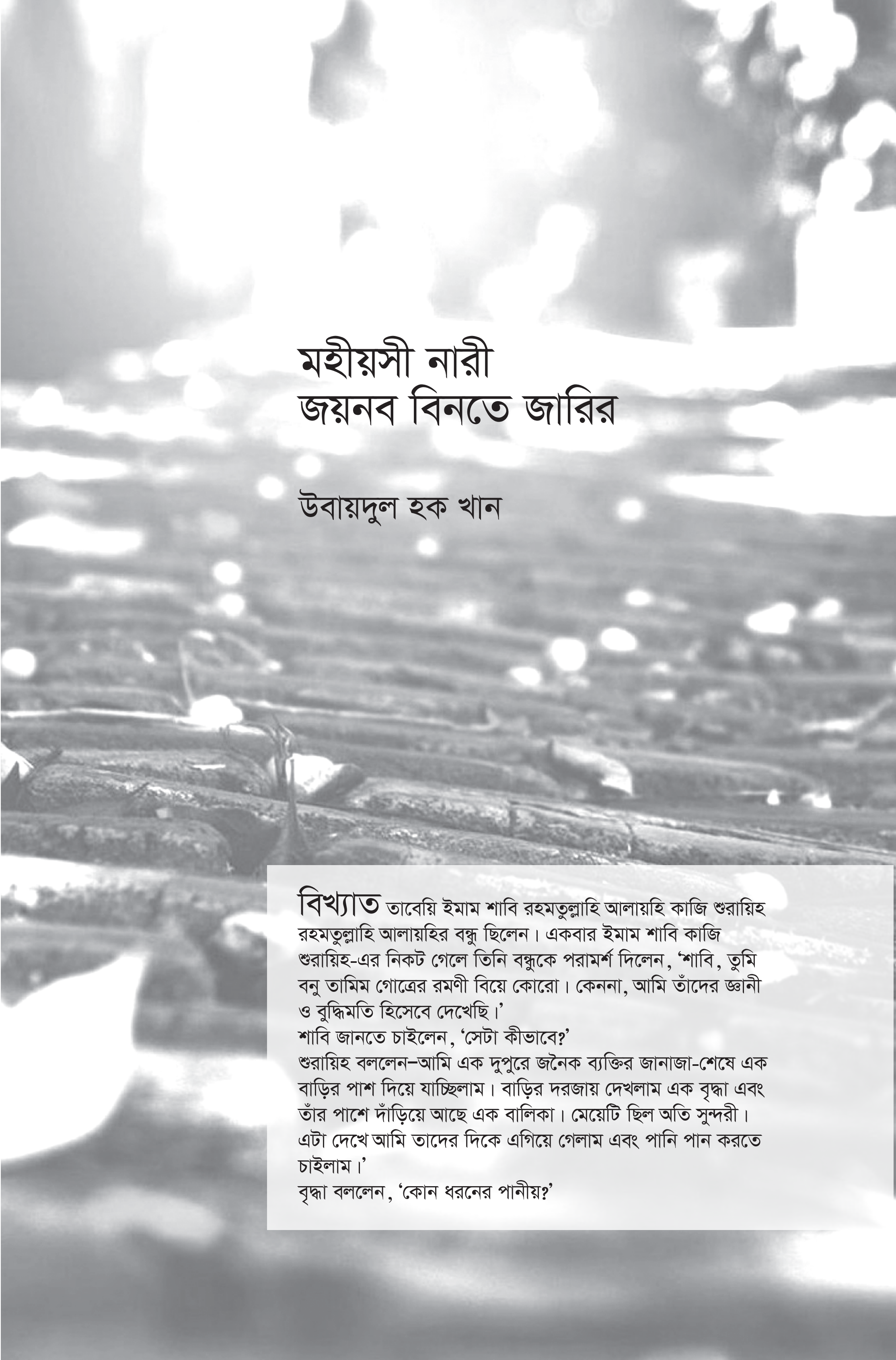
খবরের কাগজ পড়তে গিয়ে একটা সংবাদে তার চোখ আটকে গেল। একজন বিষাদগ্রস্ত পিতা তাঁর ১৮ বছর বয়সী কন্যাকে গলা টিপে হত্যা করেছেন। হত্যাকারীকে তৎক্ষণাত গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। হত্যাকারী পিতা নিশাত আলমের খুবই পরিচিত। গতরাতে এই লোকের সঙ্গে কথা বলতে গিয়েই তাঁর বাসায় ফিরতে দেরি হয়েছে।

নিশাত আলম অবশ্য এ কারণে উদ্বিগ্ন নন, এটা বরং ভালই হয়েছে; একজন খুনি ধরা পড়েছে। এমন একজন ভয়ংকর খুনি খোলামেলা ঘুরে বেড়াবে এটাই বরং উদ্বেগের কারণ হতো। তাও আবার এমন একজন খুনি যে এক সময় নিজের মেয়ের বয়সী এক কিশোরীকে ধর্ষণ করেছিল।

নিশাত আলমের চোখেমুখে এই যে একরাশ উদ্বেগ, হৃদয়জুড়ে বিষণ্নতার কালো মেঘ, তার কারণ ভিন্ন। গতকাল গভীর রাতে শ্রাবণীর ঘরে উঁকি দিয়ে দেখেন শ্রাবণী নেই, তার জায়গায় মালিহা শুয়ে আছে। তিনি খানিকটা চমকে উঠলেন। মালিহা এখানে আসবে কিভাবে? সে তো ২০ বছর আগেই গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। তবে কি তিনিও আলতাফ হোসেনের মতো আপন কন্যার স্থানে ধর্ষিতাকে দেখছেন? কিন্তু তিনি তো আর মালিহাকে ধর্ষণ করেননি! তাদের মধ্যে যে শারীরিক সম্পর্ক হয়েছিল তা তো মালিহার সম্মতিতেই হয়েছিল। দুজনার পারস্পরিক সম্মতির পরিণতিতে যে শারীরিক অন্তরঙ্গতা তৈরি হয় সেটা নিশ্চয়ই ধর্ষণ নয়। নাকি সেটাও ধর্ষণ?

ভাবনার অতলে তলিয়ে যেতে থাকেন সাইকিয়াট্রিস্ট নিশাত আলম।

ফরিদাবাদ, ঢাকা



মহীয়সী নারী
জয়নব বিনতে জারির

উবায়দুল হক খান

বিখ্যাত তাবেয়ি ইমাম শাবি রহমতুল্লাহি আলায়হি কাজি শুরায়িহ রহমতুল্লাহি আলায়হির বন্ধু ছিলেন। একবার ইমাম শাবি কাজি শুরায়িহ-এর নিকট গেলে তিনি বন্ধুকে পরামর্শ দিলেন, 'শাবি, তুমি বনু তামিম গোত্রের রমণী বিয়ে কোরো। কেননা, আমি তাঁদের জ্ঞানী ও বুদ্ধিমতি হিসেবে দেখেছি।'

শাবি জানতে চাইলেন, 'সেটা কীভাবে?'

শুরায়িহ বললেন—আমি এক দুপুরে জনৈক ব্যক্তির জানাজা-শেষে এক বাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। বাড়ির দরজায় দেখলাম এক বৃদ্ধা এবং তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে আছে এক বালিকা। মেয়েটি ছিল অতি সুন্দরী। এটা দেখে আমি তাদের দিকে এগিয়ে গেলাম এবং পানি পান করতে চাইলাম।'

বৃদ্ধা বললেন, 'কোন ধরনের পানীয়?'

আমি বললাম, 'সহজলভ্য যে কোনো পানীয়।' বৃদ্ধা মেয়েটিকে বললেন, 'এঁকে দুধ পান করাও।'
আমি বৃদ্ধাকে প্রশ্ন করলাম, 'মেয়েটি কে?'
তিনি বললেন, 'তার নাম জয়নাব বিনতে জারির। হানজালা পরিবারের এক মেয়ে।'
আমি বললাম, 'বিবাহিতা না কুমারী?'
তিনি বললেন, 'কুমারী।'
আমি বললাম, 'তার সাথে আমার বিয়ের ব্যবস্থা করে দিন।'
তিনি বললেন, 'তুমি যদি তার যোগ্য হও তবে হতে পারে।'
আমি এ কথা শুনে ঘরে ফিরলাম। জোহর আদায় করে আমার বন্ধু সম্মানিত কারি-সাহেবদের সাথে নিলাম। তাঁদের মধ্যে আলকামা, আসওয়াদ, মুসাইয়্যেব ও মুসা ইবনে আরফাতা প্রমুখ ছিলেন। আমরা মেয়েটির চাচার নিকট পৌঁছলাম। কুশল বিনিময়ের পর আমি বললাম, 'আপনার ভাতিজি জায়নাবকে বিয়ে করার প্রস্তাব নিয়ে এসেছি।'
তিনি জবাবে বললেন, 'সেও আপনার ব্যাপারে আগ্রহী।'
তারপর তিনি তার সাথে আমার বিয়ে দিয়ে দিলেন। বিয়ের পর তামিম গোত্রের মেয়েদের অন্তরের রূঢ়তার কথা আমার মনে পড়ল। তখন চিন্তা করলাম, যা হওয়ার হয়েছে। যদি মর্জিমতো চলে তবে ভালো, নতুবা পথ তো খোলাই রয়েছে। তারপর তামিম গোত্রের মেয়েরা তাকে আমার কামরায় প্রবেশ করিয়ে দিল।
আমি বাসরঘরে প্রবেশ করে দেখলাম আমার স্ত্রী অপূর্ব সুন্দরী। বয়স ১৮-১৯ হবে। যৌবন জোয়ার কানায় কানায় ভরা। শিশিরে নাওয়া ফুটন্ত গোলাপের মতো চেহারা। অর্ধফোটা রাঙা কুসুমের মতো তার পাতলা ঠোঁটে আঁধার রাতে বিদ্যুত চমকানোর মতো হাসি। কপাল জুড়ে আছড়ে পড়ে আছে লতার মতো সোনালি চুল। কাজল-কালো চোখ দেখে মনে হয় যেন মায়াবী হরিণীর নিকট থেকে চোখ দুটি ধার এনেছে। আমি মনে মনে ভাবলাম, এটি কোনো মানবী না বেহেশতের হুর। যাই হোক, কল্পনাতীত সুন্দরী স্ত্রী পেয়ে শোকরিয়াস্বরূপ সুন্নত অনুযায়ী দুই রাকাত সালাত আদায় করলাম। সালাম ফিরিয়ে দেখলাম, সেও আমার পেছনে সালাত আদায় করেছে। অতঃপর আমি তার নিকটবর্তী হলাম এবং তার দিকে হাত বাড়ালাম, কিন্তু সে আমাকে বাধা দিয়ে বলল, 'জনাব, একটু থামুন। প্রশান্তি ও ধৈর্যের সাথে নিজ স্থানে অবস্থান করুন। আমি তো আপনারই।' তারপর বলল, 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য নিবেদিত। আমি তাঁর প্রশংসা করছি এবং তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছি। দরূদ ও সালাম পেশ করছি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর পরিবারের প্রতি।
'হে আমার জান, নিঃসন্দেহে আমি আপনার নিকট একজন অপরিচিত অবলা নারী। আমি আপনার আচরণ, অভ্যাস ও রীতি-নীতি সম্পর্কে অবগত নই। দয়া করে বলুন, আপনি আমার কাছে কেমন আচরণ প্রত্যাশা করেন, যাতে করে আমি আপনার পছন্দমতো চলতে পারি। আর আপনি যা অপছন্দ করেন তা থেকে বিরত থাকতে পারি।'
সে আরো বলল, 'সন্দেহ নেই, আপনার গোত্রে আপনার উপযুক্ত মেয়ে ছিল। আর আমার গোত্রেও আমার জন্য উপযুক্ত পুরুষ ছিল, কিন্তু আল্লাহ যা ফয়সালা রেখেছিলেন তাই হয়েছে। আল্লাহর যা নির্দেশ হয় মানুষ সেটাই করে। অতএব আপনি যার মালিক হয়েছেন তার সাথে আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক আচরণ করবেন। অর্থাৎ সদ্ভাবে জীবন পরিচালনা করা অথবা ভালোভাবে পৃথক করে দেয়া। আমার কথা এটুকুই। আমি আল্লাহর কাছে আপনার জন্য ও আমার জন্য মাগফিরাত কামনা করছি।'
তার এ কথাগুলো শুনে আমিও একটি বক্তব্য দেয়ার প্রয়োজন অনুভব করলাম। আমি হামদ এবং দরূদ ও সালামের পর বললাম, 'নিঃসন্দেহে তুমি এমন কিছু কথা বলেছ, যদি তুমি তার ওপর দৃঢ়পদ থাকো তবে উপকৃত হবে, কিন্তু যদি এর বিপরীত হয় তবে এগুলো তোমার বিপক্ষে দলিল হবে। আমি অমুক অমুক জিনিস, কথা, কাজ ও খাদ্য পছন্দ করি। আর অমুক অমুক জিনিস, কথা, কাজ ও খাদ্য অপছন্দ করি। আমরা দুজন একই সূত্রে গাঁথা। তুমি আমাকে ছেড়ে যাবে না। ভালো

কিছু দেখলে তা প্রচার করবে। আর মন্দ কিছু দেখলে তা গোপন করবে।'

সে বলল, 'আরও কিছু কথা ছিল যা বলা হয়নি। আমার পরিবারের লোকদের বেড়াতে আসা আপনি কি পছন্দ করবেন?'

আমি বললাম, 'আমি চাই না আমার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা আমার পেরেশানি ও ক্লান্তির কারণ হোক।'

সে বলল, 'আপনার কোন কোন প্রতিবেশীকে আপনি পছন্দ করেন আর কাদের অপছন্দ করেন আমাকে বলুন, সে অনুযায়ী আমিও পছন্দ-অপছন্দ করব।'

আমি তাকে আমার প্রতিবেশীদের সম্পর্কে বলে দিলাম।'

তার সঙ্গে সে-রাতটি আনন্দের সাগরে ভেসে কাটালাম। তিন দিন তাঁর সঙ্গে থেকে তারপর কাজে গেলাম। এরপর থেকে এমন কোনো দিন পাইনি যে দিনটা আমার কাছে আগের দিনের চেয়ে উত্তম ছিল না। এভাবে একবছর অতিবাহিত হলো। এর মধ্যে আমার অপছন্দনীয় কোনো কিছু আমি তার মধ্যে পাইনি।

একদিন আমি বাড়ি ফিরে দেখি, এক ভদ্রমহিলা গৃহে তদারকি করছেন। আমি জানতে চাইলাম, 'তিনি কে?' উত্তর পেলাম, 'আপনার শাশুড়ি।' আমি তাঁকে দেখে আনন্দিত হলাম। তিনি আমার নিকট এলেন এবং বললেন, 'আসসালামু আলায়কুম, আবু উমাইয়া।'

আমি সালামের জবাব দিয়ে বললাম, 'আল্লাহ আপনাকে আমাদের আরও নিকটবর্তী করে দিন।'

তিনি আমার নিকট জানতে চাইলেন, 'আপনার স্ত্রীকে কেমন পেলেন?'

আমি বললাম, 'আলহামদুলিল্লাহ, আমি তাকে অত্যন্ত উত্তম স্ত্রীরূপে পেয়েছি। তাকে পেয়েছি জীবনের উত্তম সঙ্গিনী হিসেবে।'

তিনি আমাকে বললেন, 'আবু উমাইয়া, কোনো নারী শুধু দুটি অবস্থায় বাঁকা হয়। ১. পুত্র সন্তান প্রসব করলে। ২. অতিরিক্ত স্বামীসোহাগ লাভ করলে। কোনো কিছু আপনার অপছন্দনীয় হলে লাঠি ব্যবহার করবেন। আল্লাহর শপথ, পুরুষেরা খারাপ নারীর চাইতে নিকৃষ্ট কোনো জিনিস গৃহে রাখে না।'

আমি বললাম, 'আল্লাহর শপথ, আপনি তো তাকে শ্রেষ্ঠ আচরণ ও উত্তম ভদ্রতা শিখিয়েছেন।'

তিনি জানতে চাইলেন, 'আপনার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা আপনাদের কাছে বেড়াতে আসুক, আপনি কি তা পছন্দ করবেন?'

উত্তর দিলাম, 'তাঁরা যখন চাইবেন।'

তারপর থেকে তিনি প্রতিবছর একবার আমার গৃহে আসতেন এবং আমাকে একইরূপ নসিহত করতেন। আমার স্ত্রীকে নিয়ে আমি ২০ বছর সংসার করছি, এর মধ্যে অপ্রীতিকর কোনো কিছু তার কাছ থেকে পাইনি। তার কাছ থেকে আমি কখনও এমন কিছু পাইনি, যা আমার ক্রোধের কারণ হয়। ফলে আমি সর্বদাই তার ওপর খুশি থাকতে পেরেছি।

শুধু একদিন আমি তার ওপর রাগান্বিত হয়েছিলাম। তবে সেদিনকার পরিস্থিতির জন্য আমিই দোষী ছিলাম। আমিই তার ওপর জুলুম করেছি। বাস্তবে তার কোনো দোষ ছিল না। ঘটনাটা এরূপ–একদিন আমি ঘরে ফজরের সুন্নত আদায় করলাম। মুয়াজ্জিনের একামত শুনতে পেলাম। আমি ছিলাম ইমাম। এমন সময় একটি বিষধর বিচ্ছু ঘরে দেখলাম। আমি বিচ্ছুটিকে একটি পাত্র দিয়ে ঢেকে স্ত্রীকে এ কথা বলতে বলতে মসজিদের দিকে ধাবিত হলাম, 'জয়নাব, আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত তুমি নড়াচড়া করবে না।'

এ ফাঁকে বিচ্ছুটি বের হয়ে তাকে দংশন করল, কিন্তু সে আমার নির্দেশ লংঘন করে সে-স্থান ত্যাগ করল না। আমি এসে এরূপ দেখে তার ওপর রাগ করলাম, কেন সে সে স্থান ত্যাগ করল না। সে ছিল স্বামীর আদেশের আনুগত্যকারী। অথচ আমি তাকে এ আদেশ দিয়ে কত বড় ভুলই না করেছিলাম।

সূত্র : তাবায়েউন নেসা, ইবনে আবদে রাব্বেহি আন্দালুসি : ৪৪-৪৬

লেখক : শিক্ষাসচিব, জামিয়াতুর রহমাহ, গাজীপুর

(গল্প)

আমার কি পাপ হবে?

রাকিবুল হাসান

লংমার্চ

দরজায় ঠকঠক আওয়াজ হলো এই সকালে।
‘কী চাই?’
‘আমি সব নিই। মুড়ি, চিড়া, গুড়, কলা।’
‘ভাবসাব কী? হুজুরদের খাওয়াবেন নাকি?’
‘কী যে কন আপনারা! নিজেই খাইতে পাই না, আবার হুজুরদের!’
‘বলা যায় না।’
বৃদ্ধ ভিক্ষুক নাহিদের পাশে দাঁড়িয়ে তার মুড়ি-গুড় খাওয়া দেখছেন। বৃদ্ধের চোখে স্বর্গীয় আনন্দেও দ্যুতি খেলা করছে। সারা জীবন মানুষের কাছ থেকে খেয়ে এসেছেন, কিন্তু মানুষকে খাওয়ানো যে এত আনন্দ, তা কখনো টের পাননি। দীর্ঘ এই লংমার্চ না হলে হয়তো কখনো টেরই পেতেন না।
বৃদ্ধ বললেন, ‘আপনি ঢাকায় পড়েন?’
‘জি না, কুমিল্লায়। কুমিল্লা থেকে মেঘনা গাড়িতে আসছি। মেঘনা থেকে হেঁটে সাইনবোর্ড।’
‘আহারে!’
‘আপনাদের আপ্যায়ন দেখে চোখে জল এসে গেছে।’
বৃদ্ধ চোখ মুছে বললেন, ‘ওই ঘর থেকে মিথ্যা বলে মুড়ি-গুড় আনলাম নিজে খাবো বলে। এখন আপনাকে খাওয়াচ্ছি। আমার কি পাপ হবে?’

অবরোধ

ঢাকা অবরোধ। ফজরের পর থেকেই থমথমে অবস্থা। ঢাকায় কোনো গাড়ি ঢুকতেও পারছে না, ঢাকা থেকে বেরুতেও পারছে না। তবে অ্যাম্বুলেন্স দেখলেই ছাত্ররা সরে দাঁড়াচ্ছে। রাস্তা ফাঁকা করে দিচ্ছে। সুন্দর জীবনের জন্য অবরোধ। মানুষ হত্যার জন্য নয়। রোগীর গাড়িকে তাই কেউ আটকাচ্ছে না।
একটা অ্যাম্বুলেন্স ঢুকতে যাচ্ছিল কাঁচপুর দিয়ে। দু’-একজন ছাত্র এগিয়ে গেল দেখার জন্য। ড্রাইভারের পাশে দুজন ভদ্রলোক বসা। জানলার কাঁচ নামিয়ে বলল তাদের একজন, ‘মহিলা রোগী। দেখান যাইবো না।’
‘আমরা মহিলার চেহারা দেখব না, শুধু দেখব বেডে রোগী আছে কিনা।’
‘বিশ্বাস হয় না?’
‘দেখালেই বিশ্বাস হয়।’

অ্যাম্বুলেন্সে কোনো রোগী ছিল না। ছিল কিছু দাহ্য পদার্থ। ছাত্ররা অতসব বুঝে উঠতে পারেনি, দাহ্য পদার্থকে মশার ওষুধ বলে চালিয়ে দেওয়া হলো।
'গাড়ি নিয়ে যাওয়া যাবে না। হেঁটে যান।'
ভদ্রলোকটি লাল চোখে তাকালেন। এতো ছাত্র এই পয়েন্টে, মাথা গরম করা ঠিক হবে না। অ্যম্বুলেন্স নিয়ে আস্তে করে বেরিয়ে গেলেন।
পরদিন পত্রিকার প্রথম পাতায় শিরোনাম এলো–'নিষ্ঠুর হেফাজত : অবরোধের নাম করে শহরে অ্যাম্বুলেন্সও ঢুকতে দেয়নি।

কাফন

কয়েকজন ছেলে বেধড়ক পিটিয়ে যাচ্ছে লোকটাকে। তার নাক-মুখ দিয়ে রক্ত পড়ছে গলগল করে। হাতে শক্ত করে ধরে আছে কাফনের কাপড়ের পুটলিটা। ওটা কোনে-ক্রমেই হাতছাড়া করা যাবে না।
লোকটির চুল ধরে ঘাড়টা উপরে তুলে একটি ছেলে জিজ্ঞেস করল, 'সারাদিন অবরোধ কইরা আশ মেটেনি, এখন আইছোস সমাবেশ করতে, কাফনের কাপড় নিয়া, মরার খুব শখ?'
নাক থেকে গড়িয়ে রক্ত ঠোঁটে লেগেছে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও জিভে লেগে গেছে একটু। পুরো শরীর গুলিয়ে ওঠে। নিজের রক্তের স্বাদ এতো নোনতা! এত তিক্ত! নিজেকে সামলে নিয়ে লোকটি বলল, 'সমাবেশে আসি নাই আমি। ছাইড়া দেন।'
ছেলেগুলো একসঙ্গে খিলখিল করে ওঠে। হঠাৎ একজন বলল, 'তাড়াতাড়ি শেষ কর ওরে। আরও কাজ আছে।'
সঙ্গে সঙ্গে একটি ছেলে তার বুকের মধ্যখানে গুলি করে। লোকটা বসা থেকে পড়ে যায় চিত হয়ে। যন্ত্রণায় লাফাতে থাকে কাটা মুরগির মতো। শেষবারের মতো স্থির হতে হতে লোকটির গলা থেকে বেরোলো গোঙানির মতো, 'আমার বাবা মারা গেছে। তার জন্য কাফনের কাপড় কিনছিলাম।ৎ'
শাপলা চত্বরে লোকটিকে কাফন পরানো হলো বাবার জন্য কেনা কাফনের কাপড়ে। তার বাবার জন্য কাফনের কাপড় পরে কে কিনে দিয়েছিল?

গুলি

দুটো হসপিটালই যখন পায়ের গুলিটা খুলতে অস্বীকৃতি জানাল, গোঙাতে গোঙাতে ছেলেটি বলল, 'একটা প্লাস আর ছুরি দিন, আমার পায়ের গুলি আমিই খুলতে পারব। যন্ত্রণা আর সহ্য হচ্ছে না!'

লাস্ট ম্যাসেজ

দোকান খুলতে এসে শাটারের নিচে একটা মোবাইল পেলো দোকানওয়ালা। নিশ্চয়ই মোবাইলটা গতরাতে কেউ ফেলে গেছে। নিয়ে যাবার সুযোগ হয়নি। বাসায় বসে টিভিতে দেখেছিল–সমাবেশে আসা লোকেরা রাতে এখানে-সেখানে ঘুমিয়ে ছিল। আক্রমণের তীব্রতায় ঘুম ভেঙে গেলে মোবাইলের কথা হয়তো মনেই পড়েনি। বিপদ যত তীব্র হয়, সবার আগে নিজেকে বাঁচানোর কথাই মনে পড়ে মানুষের।
কী আছে মোবাইলে? স্মার্টফোনে?
দোকানওয়ালা সবার আগে চেক করে ম্যাসেজবক্স। রাত দুইটায় একটা ম্যাসেজ সেন্ড করা হয়েছে। যেই নম্বরে সেন্ড করেছে, সেই নাম্বারটি 'বড়আপা' লিখে সেভ করা।
পকেট থেকে চশমা বের করে দোকানওয়ালা ম্যাসেজটি পড়ল–'আপা, আমি মারা গেলে মাকে দেখে রাখিস। জাহান্নামে আটকা পড়েছি, কীভাবে বের হবো জানি না।'
দুপুর তখন ছুঁই ছুঁই। দোকানওয়ালা 'বড়আপা'র নম্বরে ফোন দিলো। জিজ্ঞেস করল, 'আপনার ভাই বাড়ি ফিরেছে?'
ঝড়ে ভেঙে যাওয়া ডালের মতো কাতরে উঠল বোন, 'নাহিদ, কই নাহিদ! আপনি পাইছেন তারে? তার নম্বর পাইছেন কই? আমরা তো তার খবর পাইতেছি না।'
দোকানওয়ালা বলল, 'মতিঝিলে আমার দোকান। দোকানের সামনে মোবাইলটা পেলাম। তাই জিজ্ঞেস করলাম।'
ওপাশে একটা চিৎকার শোনা গেল। মনে হলো আকাশটা বুঝি এখনই ফেটে যাবে মুহুর্মুহু করে।

বীরাঙ্গনা সাহাবিয়্যাহ

আবিদা সুলতানা উমামা



একটা সোনালি অতীত; আলোর পরশের, আলোকিত মানুষদের। সে অতীত ইসলামের স্বর্ণযুগের; যার পরতে পরতে ছড়িয়ে আছে মুসলিম নারীদের বীরত্বগাথা। যে অতীত গৌরবান্বিত মুসলিম বীরাঙ্গনার ঝলসে ওঠা তরবারির আঘাতে মুশরিকের 'জাহান্নাম-যাত্রা'র কাহিনিগাথায়। সোনালি সে অতীতের জন্য তৃষাতুর হৃদয়ের বড় দরদ, বড় মায়া। কল্পনার পিঠে চড়ে মন ফিরে যায় হাজার বছরের দূরত্বের আলোকিত সেই দিনগুলোতে।

আলোর ঝিলিকে যেন কী ভীষণ এক মায়া! আবেশিত করে দেয়। সে আবেশে চোখ বুঁজে আসে। আধো ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে ফিরে যাই চৌদ্দশ বছর আগের দৃশ্যপটে। যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি খন্দকের যুদ্ধ। আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে কুরাইশ ও তাদের মিত্রদের সম্মিলিত বাহিনী নবিজির পবিত্র শহর মদিনা ঘিরে রেখেছে। এমন পরিস্থিতিতে সালমান ফারসি রাদিয়াল্লাহু আনহুর পরামর্শে অরক্ষিত দিকগুলোতে পরিখা খনন করা হলো। যেহেতু মুসলমানগণ জনশক্তিতে কম, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নির্দেশে পরিখার তীরে হাজির হলেন সকল সাহাবি।

শহরের সবচেয়ে সুরক্ষিত দুর্গে মুসলিম নারী ও শিশুদেরকে জড়ো করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের পুণ্যবতী সহধর্মিণীগণ এবং আত্মীয়াগণও রয়েছেন। জনবলের অভাবে দুর্গের পাহারায় পুরুষ নিয়োজিত করা সম্ভব হয়নি।

যুদ্ধ চলাকালে একদিন নবিজি যখন সাহাবায়ে কেরামকে সাথে নিয়ে যুদ্ধে রত ছিলেন, তখন বনু কুরায়জার একদল ইহুদি আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে কৃত ওয়াদা ভেঙে বিশ্বাসঘাতকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়।

তখন ভোরের প্রথম প্রহর। চারদিকে আলো-আঁধারির মিশ্র পরিবেশ। বিশ্বাসঘাতক ইহুদিদল দুর্গের বাইরে কাতারবন্দি হয়ে একজনকে পাঠালো ভেতরের অবস্থা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্যে। সে ছোট্ট একটি সুড়ঙ্গ পেয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লো।

আবছা আলোয় একটি অস্পষ্ট ছায়ামূর্তিকে দুর্গের দিকে এগিয়ে আসতে দেখলেন দুর্গে অবস্থানকারিণী একজন নারী। ধীরে ধীরে ছায়ামূর্তিটি স্পষ্ট হলো। আগন্তুক সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করতেই বিচক্ষণ নারী বুঝতে পারলেন, আগন্তুক একজন ইহুদি, গুপ্তচর বৃত্তি করতে এসেছে নিশ্চয়।

আতঙ্কিত হলেও পরক্ষণেই সামলে নিলেন নিজেকে। মনে মনে ভাবলেন–এখন বিপদ প্রতিহত করার মতো কোনো পুরুষ আমাদের সাথে নেই; এই অবস্থায় আমি যদি আতঙ্কিত হয়ে চিৎকার করি এবং

জানিয়ে দিই, বিপদ বেড়ে যাবে। দুর্গে অবস্থানরত বাকি নারী-শিশুরা ঘাবড়ে যাবে। তাদের চিৎকারে ইহুদিটা বুঝে ফেলবে যে, দুর্গে কোনো পুরুষ নেই। এমনটা হতে দেয়া যাবে না।

তিনি মুহূর্তের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিলেন, কী করতে হবে। দ্রুত ওড়না মাথায় পেঁচিয়ে নিজের একটা কাপড় কোমরে জড়ালেন। একটি লোহার দণ্ড হাতে নিয়ে অতি সন্তর্পণে দুর্গের ফটকে নেমে এসে বিচক্ষণতার সাথে নিঃশব্দে দুর্গের ফটক খুললেন। ধীর পদক্ষেপে ইহুদিটার গতিবিধি লক্ষ করে এগিয়ে গেলেন। একেবারে কাছে, একটু আড়ালে থেকে অপেক্ষা করতে লাগলেন মোক্ষম সুযোগের।

সুযোগ মিলতেই হাতের লৌহদণ্ড দিয়ে সজোরে আঘাত করলেন মাথার ঠিক মধ্যখানে। একবার। দুবার। তৃতীয় ও চূড়ান্ত আঘাত লাগলো ঠিক মস্তক বরাবর উপরে। মুহূর্তেই আল্লাহর দুশমন জাহান্নামের দুয়ারে পৌঁছে গেলো।

ঠিক তখনই আধো ঘুমটুকু ছুটে গেল আমার। চোখ মেলেই বুঝতে পারলাম–কল্পলোকের বিশালতায় ডুবে পৌঁছে গিয়েছিলাম ইতিহাসের সোনালি অধ্যায়ে।

পাঠক, কে এই বুদ্ধিমতী ও বিচক্ষণ নারী, জানেন? জানেন কে এই সাহসী বীরাঙ্গনা–নারীদের মধ্য থেকে যিনি ইসলামের ইতিহাসে সর্বপ্রথম মুশরিক হত্যা করলেন? জানেন, কে এই বিস্ময়কর বীরত্বের নায়িকা, যিনি পৃথিবীর নারীদের জন্যে বীরত্বের মহিমা রেখে গেলেন?

তিনি সাফিয়্যাহ বিনতে আবদুল মুত্তালিব। আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সম্মানিত ফুপু।

***

সাফিয়্যাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা হলেন ঈমান আনয়নকারী নারীদের মধ্যে প্রথম সারির নারী সাহাবি। সৌভাগ্য তাঁর জীবনকে সবদিক থেকে সমৃদ্ধ করেছিল।

সাফিয়্যাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা হলেন সেই বিচক্ষণ মুসলিম নারী, যিনি মুসলমানদের জন্য সর্বপ্রথম এমন অশ্বারোহী প্রস্তুত করেছিলেন, যে অশ্বারোহী আল্লাহর রাস্তায় তরবারি কোষমুক্ত করেছিলেন।

তাঁর পিতা আবদুল মুত্তালিব ইবনে হাশিম। যিনি ছিলেন আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মানিত পিতামহ এবং কুরাইশ গোত্রের তত্ত্বাবধায়ক ও মান্যবর নেতা।

সায়্যিদুশ শুহাদা হামজা রাদিয়ল্লাহু আনহু তাঁর সহোদর ভাই, যিনি উহুদের যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেছেন।

তাঁর স্বামী আওয়াম ইবনে খুওয়াইলিদ উম্মুল মুমিনিন খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার ভাই।

পুত্র যুবাইর ইবনুল আওয়াম আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাওয়ারি বা বিশিষ্ট সহচর।

বংশগত এ গৌরব সমূহের সাথে ইসলামের গৌরবের সংযোজন তাঁকে দিয়েছে হাজার পুরুষের চেয়েও বেশি সম্মান, বেশি মর্যাদা।

***

গৌরবান্বিতা সাফিয়্যাহ নিজ পুত্র যুবাইর ইবনুল আওয়ামকে শৈশব হতেই এমনভাবে গড়ে তুলেছিলেন, যাতে বড় হয়ে এই শিশু দুঃসাহসী দৃঢ়সংকল্প এবং আত্মপ্রত্যয়ী মানুষ হন। পুত্রকে তিনি শিশুবয়সেই যুদ্ধ ও অশ্বারোহণ-বিদ্যার প্রশিক্ষণ দেন। খেলার ছলে শিখিয়ে দেন কীভাবে ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে তির দ্বারা লক্ষ্যভেদ করতে হয়। পুত্রকে সামরিক বিদ্যা প্রশিক্ষণকালে তিনি প্রায়ই কঠিনভাবে প্রহার করতেন কঠোরতায় অভ্যস্ত করানোর জন্য।

একদিন যুবাইর ইবনুল আওয়াম রাদিয়াল্লাহু আনহুর চাচা নওফিল ইবনে খুওয়াইলদ ভীষণ ক্ষেপে যান। সাফিয়্যাহ রাদিয়ল্লাহু আনহাকে ভর্ৎসনা করে বলেন, 'এভাবে প্রহার করে করে একদিন ছেলেটাকে মেরেই ফেলবে! তুমি নিশ্চয় বিদ্বেষের কারণেই এমন করছো। এ মোটেও মাতৃস্নেহের প্রহার নয়!'

প্রতিউত্তরে সাফিয়্যাহ বলেন, 'যে বলে আমি তার প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ, সে মিথ্যা বলে। আমি তাকে প্রহার করি, যেন সে বিচক্ষণ হয় এবং একাই শত্রুসেনাকে পরাজিত করে



যুদ্ধলব্ধ সম্পদ লাভে সক্ষম হয়।'
সাফিয়্যার এমন কঠোরতার প্রভাব পুত্রের জীবনে গভীরভাবে পড়েছিল।
যুবাইর ইবনুল আওয়াম রাদিয়াল্লাহু আনহু অল্প বয়সেই হয়ে উঠেছিলেন শক্তিশালী পাহলোয়ান। দৃঢ়তা ও জীবন বাজি রেখে ইসলামের জন্যে লড়তে পারার দিক থেকেও কারো থেকে পিছিয়ে ছিলেন না।
সন্তানকে যথাযোগ্য করে গড়ে তোলার জন্য সাফিয়্যাহ রাদিআয়াল্লহু আনহার পদক্ষেপ বিফলে যায়নি।
তিনি পেরেছেন নিজের বিচক্ষণতার প্রমাণ দিতে। তিনি সার্থক। সার্থক তাঁর প্রচেষ্টা।

***

ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ে অন্যান্য মুসলমানদের মতো সাফিয়্যাহ রাদিয়াল্লাহু আনহাও কাফির-মুশরিকদের অত্যাচারের কোপানলে পড়েন। তারপর যখন হিজরতের আদেশ আসে, আল্লাহ ও রাসুলের জন্য নিজের সর্বস্ব বিসর্জন দিয়ে রওনা হন মদিনাভিমুখে।
পেছনে পড়ে থাকে সাফিয়্যাহ'র জীবনের সুদীর্ঘ ষাটটি বছর। সমস্ত সুখস্মৃতি। জীবনের গৌরব আর শোক বিজড়িত অতীত। ইসলামের জন্য ত্যাগের এসব দৃষ্টান্ত কেবল সাফিয়্যারাই দেখাতে পারেন।
জীবনের ষাটটি বছর পেরিয়েও পিছপা হননি দীনের জন্য সবকিছু বিলিয়ে দিতে। ইসলামের প্রতি ভালোবাসার টানে বারবার ছুটে গিয়েছেন রণাঙ্গনে।
তবে কি তিনি জানতেন না, নারীর সাম্রাজ্য হলো তার 'গৃহকোণ'?
জানতেন। তিনি জানতেন নারী গৃহ-সম্রাজ্ঞী। এটাই চিরায়ত নিয়ম। কিন্তু মাঝে মাঝে এ নিয়মের 'লঙ্ঘন' বৈধ হয়, যখন তা হয় আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে। আর তাই যুদ্ধের ময়দানে তাঁর অবদান ও

অবস্থান মুসলিম উম্মাহ যুগ যুগ ধরে স্মরণ করে আসছে পরম শ্রদ্ধাভরে।
ইতিহাসের পাতা আমাদের নিয়ে যায় উহুদ যুদ্ধের দৃশ্যে। যেখানে সাফিয়্যাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা যোদ্ধাদের জন্য পানি বহন করে আনছেন। তৃষ্ণার্তদের পানি পান করাচ্ছেন। সৈন্যদের তির-ধনুক মেরামত করে দিচ্ছেন নিজ হাতে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করছেন রণাঙ্গনের সার্বিক অবস্থা।
সাতজন মুহাজির আর সাতজন আনসার সাহাবি ব্যতীত অন্য সবাই যখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন, সাফিয়্যাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা দেখলেন কয়েকজন মুশরিক নবিজির অতি নিকটে পৌঁছে গেছে এবং প্রায় হত্যা করতে উদ্যত হয়েছে। এ দৃশ্য দেখা মাত্রই তিনি নিজের পানপাত্রটি মাটিতে ছুঁড়ে ফেললেন। এক সৈন্যের হাত থেকে বর্শা ছিনিয়ে নিয়ে কাতার ভেদ করে সম্মুখে অগ্রসর হতে লাগলেন। বর্শার ফলা দিয়ে শত্রুপক্ষকে এমনভাবে আক্রমণ করতে লাগলেন, যেভাবে সিংহ-শাবককে আক্রমণ করতে দেখলে মা-সিংহ ঝাঁপিয়ে পড়ে।
যুদ্ধ সমাপ্ত হলো। সাফিয়্যাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা তাঁর ভাই হামজা রাদিআল্লাহু আনহুর দেহ দেখতে পেলেন, যাঁকে মুশরিকরা নির্মমভাবে শহিদ করেছে। কাছে এসে তিনি থমকে দাঁড়ালেন। ভাইয়ের উদর বিদীর্ণ করা হয়েছে। কলিজা বের করে আনা হয়েছে। কান, নাক কেটে নেয়া হয়েছে। উফ...! কী বীভৎসতা...!
কিন্তু সাফিয়্যাহ? কোনো মাতম করলেন না, শোর-চিৎকার করলেন না। নিভৃত মনে বলতে লাগলেন, 'নিশ্চয়ই এ মৃত্যু আল্লাহর পথে হয়েছে। আমি আল্লাহর সিদ্ধান্তের ওপর সন্তুষ্ট। কসম আল্লাহর! আমি অবশ্যই ধৈর্য্যধারণ করবো। সওয়াবের আশা করবো। ইনশাআল্লাহ।'
এমন অবিচল দৃঢ়তায়, বীরত্বপূর্ণ সহনশীলতায় বুক বাঁধতে পারে ক'জন? সাফিয়্যাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা পেরেছেন। নারী জাতির জন্যে রেখে গেছেন সবর ও শোকরের নাজরানা। প্রচণ্ড শোকের মুখেও সংযমের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন তিনি।

***

একজন বীরাঙ্গনার জীবনের গল্প আমাদের জন্য কেবল গল্প নয়; বরং আদর্শ আর শিক্ষার উৎস। ত্যাগ ও উৎসর্গের নমুনা। এ গল্প আমাদের সোনালি অতীতের। যে অতীতে আমাদের গর্বিত নারী জাতি অন্যায়-অনাচারের সাথে আপোষ করেননি কখনোই। শত নির্যাতন ভোগ করেও নতি স্বীকার করেননি। বরং জীবন বিলানোর ডাকে শোনা গেছে তাঁদের আনন্দ বিগলিত কণ্ঠ।
ইতিহাস থেকে চোখ তুলে, যখন বাস্তব জীবনের দিকে চোখ মেলে তাকাই তখন ভাবি–কোথায় আজ আমাদের নারীদের গৌরব? কোথায় সেই চিরগর্ব? আজ তো মুসলিম উম্মাহর নারীদের অতি নগণ্য এক অংশ ব্যতীত সবাইই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে দীনের জন্য জীবন উৎসর্গ করার মানসিকতা থেকে। বিস্মৃত হয়েছে সোনালি যুগের মহিয়সী নারীদের ইতিহাস। দুনিয়ার মিথ্যে মোহে হারাচ্ছে আখেরাতের অফুরান সুখ-প্রাসাদ। কেন নারীরা আজ আর বীরাঙ্গনা হতে চায় না? কেন তাঁরা ভুলে গেছে ইতিহাসের আলোকিত নারীদের কথা? কেন তারা সাফিয়্যাহকে চেনে না? নিজেদের গর্বকে বুকে লালন করে না কেন? শয়তানের দোসরদের প্ররোচনায় আজ নারী জাতি পিছিয়ে গেছে দীনের পথ থেকে, আলোর পথ থেকে। দূরে সরে এসেছে ত্যাগের পথ থেকে, রবের সন্তুষ্টির পথ থেকে। আজকের নারীরা জানুক, মহিয়সী নারী সাফিয়্যাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা সন্তুষ্ট করেছেন আপন রবকে। সন্তুষ্ট করেছেন রবের প্রেরিত রাসুলকে। বিনিময়ে দুনিয়াতে পেয়েছেন মুসলিম নারীদের অনন্য আদর্শ হওয়ার গৌরব। আর আখেরাতের প্রতিদান তো...। তারা জানুক সাফিয়্যাহর বীরত্বের ইতিহাস। নিজেদেরকে গড়ে তুলুক মহীয়সী বীরাঙ্গনার আদলে।

বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী



(ছোটগল্প)

ভালোবাসি

শাহাদাত রাজু

'মেয়েটা স্কুলে পড়ে। বেতন দেওয়া হয়নি কয়েক মাস হলো। কিস্তির টাকার জন্য বৌদি তাড়া দিয়ে গেল। ঘরে চাউল নেই। কী করে সংসার চালাই, বলো! কোনো চিন্তা আছে তোমার সংসার নিয়ে?'
কাজল সিগারেটে শেষ টানটা দিয়ে মুখে ধোঁয়া জমায়। শারমিনের চুলের মুঠি ধরে মুখটা নিজের মুখের সামনে এনে ধোঁয়া ছাড়ে। শারমিন নিজেকে ছাড়ানোর জন্য বৃথা চেষ্টা করে গেল কিছুক্ষণ। কাজলের শক্তির কাছে পরাস্ত হয়ে নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও সিগারেটের ধোঁয়া নাকে-মুখে ঢোকে। বমি হবার উপক্রম শারমিনের। মুখের মধ্যে জমানো ধোঁয়া শেষ হবার পর চুলের মুঠি ছাড়ে কাজল।
কাজল এবার আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। এলোমেলো উস্কু চুলে চিরুনি করে শারমিনের দিকে তাকায়। মুখে একটু হাসি দিয়ে বলে, 'দেখো তো, চুলের মাঝখানে সিঁথি করায় কেমন লাগছে আমায়?'
'লাগছে, তোকে শয়তানের মতো লাগছে। শয়তানের বাচ্চা! সংসার করতে মন না চাইলে আমাকে বিয়ে করলি কেন? কেন বিয়ে করলি, কেন সংসার বাঁধলি?'
কাজল উত্তেজিত না হয়ে শান্ত স্বরে বলে, 'শোন, তোর সঙ্গে আমি এখন বেশি কথা বলতে পারব না। আজকে আমি নতুন একটা কাজ শুরু করব। বাবার ব্যাবসা, বাবার। এটাকে আমরা মাল বলি। এ মালগুলো একবার বিক্রি করলে আমাদের কোনো কষ্ট থাকবে না আর। সবার পাওনা সবাইকে দিতে পারব। কিস্তির টাকা দিতে পারব। চাউল কিনতে পারব। আমি অনেক চিন্তা করেছি জানিস? এ ছাড়া আর কোনোভাবেই সংসাওে সচ্ছলতা আনতে পারব না। ঘরে বসে বসে দোয়া কর। প্রথম দিনেই পুলিশি কোনো ঝামেলায় যেন না পড়ি।'
শারমিন কাপড়ের আঁচল কোমরে গুজে দু হাত উপরে তুলে বলে, 'দোয়া করি, ঘর থেকে বেরুলেই যেন তোকে পুলিশে ধরে। পিটিয়ে হাত পা যেন ভেঙে দেয়। তাহলেই তোর উচিত শিক্ষা হবে। তা ছাড়া তুই ভালো হবি না।'

কাজল এবার রাগ সংবরণ করতে পারল না, মাথায় রক্ত উঠে গেল তার। হাতের কাছে ছিল পানির জগ। জগটা হাতে নিয়ে ছুড়ে মারল শারমিনের দিকে। শারমিন সরতে পারেনি। পড়ল কপালের ওপর। বাবা গো বলে চিৎকার দিয়ে মাথা ধরে কান্না শুরু করল। মেয়ে দোলা খেলা করছিল উঠোনে। মায়ের চিৎকার শুনে দৌড়ে এলো। দেখে বাবা জামার বোতাম লাগাতে লাগাতে দরজা দিয়ে বেরুচ্ছে। আর মা ঘরের মাঝখানে কপাল ধরে কাঁদছে। শরীর ভেজা। একটা জগ কাত হয়ে পড়ে আছে অদূরে।
হন হন করে কাজল বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে। যাবে দক্ষিণের মন্দির বাগানে। বাড়ি থেকে আধ কিলোমিটার দূরে। শওকতের সঙ্গে দেখা করবে। শওকত আসবে উখিয়া থেকে। সেখানে তার মুদি দোকান। সবাই তাকে মুদি দোকানি জানলেও সে দোকানি না। সে হলো ইয়াবা ব্যাবসায়ী। দীর্ঘ এক বছর ধরে এ ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। প্রতি মাসে একবার কুসুমপুর এলাকায় মাল দিয়ে যায়। শাহিন, রাসেল তা কিনে খুচরা বিক্রেতাদের হাতে তুলে দেয়।
এক পিস পঞ্চাশ টাকা কওে কেনে শওকত। বিক্রি করে একশ টাকায়। আর দুইশো টাকা দরে বিক্রি করে শাহিন, রাসেল। দুজনই কাজলের বন্ধু। কিছু দিন আগেও তারা কাজলের মতো ছিল অসচ্ছল। নুন আনতেই পানতা ফুরোতো। আজ তাদের সব জায়গায় সচ্ছলতার ছাপ। দিন দিন টাকার পাহাড় গড়ছে।
তাদের অগ্রগতি কাজলকে অনুপ্রেরণা দেয়। উদ্বুদ্ধ হয়ে নাম লেখাতে চায় তাদের দলে। প্রথমে রাজি না হলেও এক সময় কাজল ঠিকই রাজি করিয়ে ফেলে দুই বন্ধুকে। শাহিন, রাসেল টাকা নিয়ে মন্দির বাগানে যেতে বলে। সেখানে উখিয়া থেকে আসবে শওকত। শওকতের কাছ থেকেই কিনতে হবে প্রথমে। শওকতের সঙ্গে দেখা করতেই এখন যাচ্ছে।
কাজল আজকে এতো দিনের জমানো সব টাকা নিয়ে বেরিয়েছে। মুখে আর যাই বলুক পরিবার নিয়ে তারও একটা চিন্তা আছে।

শারমিনকে সে ভালোবাসে অনেক। কিন্তু মুখ ফুটে ভালোবাসার কথা কখনো বলতে পারেনি। কী করে বলবে ভালোবাসার কথা? যদি অন্তরঙ্গ সেই মুহূর্তে কিছু চেয়ে বসে, কিছুর আবদার করে বসে!
একবার কাজল বলতে চেয়েছিল। গোসল করে এসে ভেজাচুলে সেদিন শারমিন কাজলের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। কাজল একবার শুধু চোখ বুলিয়েছে। হৃদয় জুড়িয়ে গেছে ওর। ইচ্ছে করেছিল ওর ভেজা চুলগুলোর ওপর একবার হাত বোলায়। শারমিন বেশিক্ষণ দাঁড়ায়নি। সামনে থেকে সরে একটু দূরে দাঁড়িয়ে চুলের পানি নিচ্ছিলো। কাজলের সাধারণত এমন হয় না। শারমিনকে ঘিরে বাহ্যিক ভালোবাসার প্রকাশ খুবই কম। এগুলো বলতেও কেমন লজ্জা লজ্জা লাগে। কাজল বিছানা থেকে নামে। আজকে সব লজ্জা ঠেলে ভালোবাসার কথা বলবে। একেবারে পেছনে এসে দাঁড়ায়। পেছন থেকে ওকে জড়িয়ে ধরে কানে কানে ভালোবাসার কথা বলবে।
পেছনে আসতেই শারমিন পেছনে ফিরলো। চোখ বড় বড় করে বলল, 'কী, কোন মতলবে আজকে চেহারায় সাধুর ভাব নিয়ে আসলে? পকেট খালি নাকি? দেবো, এই নোলকটা তুলে?'
ওর যা মেজাজ এখন। এ অবস্থায় যদি ভালোবাসার কথা বলতে যায় নিশ্চিত জুতো খুলে পেটাবে।
কাজল ভালোবাসার কথা সেদিন আর বলেনি। শারমিনের এমন ব্যবহারে কাজলের তৎক্ষনাত রাগ উঠলেও জানে শারমিনের মনের কথা। শারমিন যে ওকে জান-প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে সেটা ভালো করেই জানে সে। যদি ভালোই না বাসত তাহলে কি এতো অসম্মান আর টানা পোড়নের মাঝেও সংসার চালিয়ে যায়?
কাজল জানে এগুলো খারাপ। রাগের মাথায় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। সচ্ছলতা থাকলে শারমিনকে মাথায় তুলে রাখতো। ওকে কোনো কাজেই হাত লাগাতে দিত না। প্রথম যেদিন শারমিন এ বাড়িতে আসে সেদিন ছিল বৃহস্পতিবার। পাশের গাঁয়ের করিমতের মেয়ে শারমিন। বাবা-মা পছন্দ করেছিল। তখন অবশ্য খারাপ কোনো ধান্দার সঙ্গে কাজল যুক্ত ছিল না। সন্ধ্যায় সব মেহমান চলে যাবার পর কাজল ঘরেও ঢোকে। ঘরের কোণে কেবল টিম টিম করে একটা প্রদীপ জ্বলছিল। খাটের মাঝখানে গুটিশুটি মেরে ঘোমটা দিয়ে বসেছিল শারমিন। কাজল আস্তে আস্তে নতুন বউয়ের কাছে যায়। খাটের ওপর বসে। ঘোমটা তুলে চেহারার দিকে তাকায়। অন্ধকার। কিছু দেখা যায় না। আবার ওঠে। প্রদীপটা হাতে নেয়। এবার এক হাতে ঘোমটা তুলে আরেক হাতে প্রদীপটা চেহারার সামনে নিয়ে আসে। একটা নিষ্পাপ চেহারা প্রদীপের আলোয় কাজলের সামনে প্রস্ফুটিত হয়। মাথা কাত করে কাজল হা করে তাকিয়ে থাকে। শারমিন লজ্জায় সেদিন মাথাটা আরো নিচু করে ফেলেছিল। কাজল মৃদু স্বরে জিজ্ঞেস করে, 'তোমার নাম কী?' কাজল জানে ওর নাম শারমিন। বাবা-মায়ের কাছ থেকে শুনেছে। কিন্তু নতুন বউয়ের মুখ থেকে শুনতেই তার এ জিজ্ঞাসা।
শারমিন নিচের দিকে মাথা নুইয়েই অস্ফুট স্বরে বলল, 'শারমিন।'
কাজল বলল, 'বেশ নাম, বেশ। আমার নাম কাজল। জানো তো?'
শারমিন উপর-নিচ মাথা নাড়ালো। জানালো সে জানে।
কাজল কথা বলার জন্য আর কোনো কথা খুঁজে পায় না। সেই কখন থেকে দুজনের মাঝখানে প্রদীপটা ধরে রেখেছে। প্রদীপটা এবার বিছানার ওপর রেখে বলল, 'আমার নাম কেন কাজল বলতে পার?'
শারমিন, মাথা নাড়ালো। জানালো, সে জানে না।
'কাজল কোথায় দেয় জানো?'
শারমিন মাথা নাড়িয়ে জানালো সে জানে।
'কোথায়?'
হাত দিয়ে চোখের দিকে ইশারা করল। হাত নাড়াতেই হাতের চুড়িগুলো ঝনঝন করে উঠলো। কাজলের পুরো শরীরে বিদ্যুৎ খেলে গেল। বিছানা থেকে নেমে প্রদীপটা আগের জায়গায় রেখে নিভিয়ে দেয়। সেদিনও ভালোবাসার কথা মুখ ফুটে বলতে পারেনি

সে।
সেদিনের সে লাজুক মেয়েটি সময়ের তালে তো আজকের শারমিন হয়ে গেল। কাজল জানে, এটা কাজলের জন্যই হয়েছে। আজকের ব্যবসায় যা লাভ হবে লাভের টাকা কোনোমতেই খরচ করবে না। এ টাকা শারমিনের জন্যে বরাদ্দ। আলতা ওর খুব পছন্দ। পায়ে আলতা পরে ঘুরতে ওর ভালো লাগে। বিয়ের আগে আলতা-পায়েই ঘুরত সবসময়। বিয়ের দিন আলতা লাগিয়ে আসার পর আর লাগানো হয়নি।
কাজল সিদ্ধান্ত নিল, আলতা নিলেই শারমিন বেশি খুশি হবে। জগ লাগায় মাথায় ব্যথা পেয়েছে। মনের মধ্যেও আছে নানান ক্ষোভ। সব একনিমিশে চলে যাবে ওই আলতা দেখলেই।
হাঁটতে হাঁটতে মন্দির বাগানে চলে আসে কাজল। বাগানটা অন্ধকার। গাছগাছালিতে ছাওয়া। তবে জায়গাটা নিরাপদ। পুলিশ আসার কোনো ভয় নেই। পুলিশ এলেও পালিয়ে যাওয়ার ঢের জায়গা আছে।
নির্দিষ্ট স্থানে না বসে একটু দূরে সরে বসে সে। যদি কোনো অঘটন ঘটে তাহলে যেন দৌড়ে পালাতে পারে। অনেক্ষণ হলো দাঁড়িয়ে আছে। বিরক্তি দূর করতে একটা সিগারেট ধরালো। লম্বা লম্বা টানে সাবাড় করে ফেলছে সেটা। টেনশন কাজ করলে কাজল এভাবেই সিগারেট খায়। দুটো শেষ করে যখন তৃতীয়টা ধরাতে লাইটারে আগুন ধরালো তখনই খেয়াল করে মানুষের পায়ের শব্দ। গাছের পাতা সরিয়ে খচখচ করে এ দিকেই আসছে। দু-চারজন লোক এক সাথে আসছে। লাইটার নামিয়ে সিগারেট মুঠির মধ্যে নিয়ে ভেঙে ফেলে। নিজেকে একটা গাছের পেছনে আড়াল করে নেয়। দৌড়ালেই পাতার শব্দে অবস্থানটা জেনে যাবে। তাই আপাতত চুপ করেই গাছের পিছে লুকিয়ে পড়লো।
লাল রংয়ের টিশার্ট পরা একজন। তার হাতে হাত কড়া। কাজল বুঝতে পারল ও-ই শওকত। সাথের দুজনের গায়ে সাদা শার্ট। সাদা শার্ট পরা লোক দুটো দুপাশে। তিন জন মিলে কাউকে খুঁজছে। চারপাশ ভালো করে পর্যবেক্ষণ করছে। এসময় শওকত শাহিন, রাসেল বলে ডাক দিলো। আড়াল থেকে বের হবে কি-না কাজল ভাবছে। সিদ্ধান্ত নিল এভাবেই দাঁড়িয়ে থাকবে। সামনেও যাবে না, পেছনেও না। একটু নড়লেই তো শুকনো পাতার শব্দ হবে। অবস্থান টের পেয়ে যাবে ওরা। তখন দুজনের সাথে দৌড়ে কূল পাওয়াও মুশকিল হবে। না, আর যাই হোক। শারমিনের সাথে আজকে এমন আচরণ করা মোটেই ঠিক হয়নি। ওর দোয়া হয়তো আল্লাহ শুনেছেন। এখান থেকে বাঁচতে পারলে আর কখনো শারমিনের সাথে এমন করবে না বলে প্রত্যয় নেয় কাজল।

এসময় কাজল একটা গুলির শব্দ শোনে। সাথে একটা মানুষের আর্তচিৎকার। অন্তরাত্মা কেঁপে উঠে ওর। আস্তে করে উঁকি দিয়ে সামনে তাকায়। সাদা শার্টপরা দুটো লোক কেবল দাঁড়িয়ে। লাল জামাপরা শওকত নেই ওদের পাশে। দু জনের পায়ের ফাঁক দিয়ে সামনে দৃষ্টি দিল। কাজলের চোখ ছানাবড়া। কলজে শুকিয়ে গেল। মাটিতে শওকত। ধড়পড় করছে। রক্তে ভেসে গেছে আশপাশ। দুজন লোক এবার সামনে থেকে পেছনে ফিরলো। কাজল মাথাটা সরিয়ে সটান দাঁড়িয়ে থাকল। নিজেকে লুকিয়ে ফেলল গাছের আড়ালে। বুক ধুক ধুক করছে ওর। জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে এখন সে। দু জনের চারটা চোখের কোনো একটায় পড়লেই শেষ। জীবনের সমাপ্তি ঘটবে। শ্বাস বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকল কাজল।
শুকনো পাতা মাড়ানোর শব্দ হচ্ছে। দূর থেকে আস্তে আস্তে আরও কাছে চলে আসছে শব্দ। দুটো মানুষ কাজলের দিকেই আসছে কোনো সন্দেহ নেই। ওরা কি তাহলে কাজলকে দেখে ফেলল?
কাজলের অদূরেই এসে থামল পায়ের শব্দ। এসময় এক জনের ফোন বেজে উঠল। রিসিভ করে বলল, 'আমি মন্দির বাগানে। ইয়াবা ব্যবসায়ী শওকত বন্দুক যুদ্ধে নিহত। ওর কাছে দুজন ক্রেতা আসার কথা। ওদের অপেক্ষায় আছি। ওরা এলে ওদের নিয়ে

আসবো। থানায় বলে দাও।' ফোন কেটে দিল। ও প্রান্তে কী বলল কাজল সেটা আর শুনল না।
চোখ বন্ধ করে আল্লাহর কাছে ওদের প্রস্থানের দোয়া করছে। চোখ খুলে দেখে সাদা পোষাকপরা লোকদুটো তার সামনে দাঁড়িয়ে। একজন ওর চুলের মুঠি ধওে জিজ্ঞেস করল, 'কী করছিস এখানে?'
কাজলের শরীর কাঁপে। আজরাইল ধরে ফেলেছে। আমতা আমতা করে বলে, 'আমি লাকড়ি টোকাতে এসেছি।'
'কীসের ব্যবসা?'
'সেটা তো জানি না।'
'তুই লাকরি টোকাতে এসেছিস না বাবা কিনতে আসছিস ঠিক করে বল!'
'তওবা, আসতাগফিরুল্লাহ! স্যার, আপনি কী বলছেন এসব?'
'হু, ঠিক কথাই বলছি। এবার তুই সঠিকটা বল।'
'আমি তো বললাম, আমি লাকড়ি টোকাতে এসেছি।'
'নজরুল, দেখো, ওর পকেটে টাকার বান্ডিল



একজন আরেক জনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'নাম কী তোর?'
'আমার নাম কা, কাজল!' কাজল ভয়ে ভয়ে বলে।
'শওকতকে চিনিস?'
'না, শওকত নামের কাউকে চিনি না।'
'শাহিন, রাসেলকে চিনিস?'
'হু, চিনি।'
'কীভাবে ওদের সাথে পরিচয়।'
'আমরা একই গ্রামের তো, ছোটবেলা থেকে ওদের সাথে পরিচয়।'
'ওরা বাড়িতে কী কাজ করে?'
'শুনেছি ওরা বড় ব্যবসা করে।'
আছে কিনা?' এ কথা বলে পকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে ধরালো। বড় করে একটা টান দিয়ে কাজলের দিকে তাকিয়ে থাকল।
পাশের জন বলল, 'জি স্যার, দেখছি।'
'থাকলে কী হবে স্যার?'
'থাকলেই বুঝতে হবে ও খরিদ্দার। শওকতের থেকে বাবা কিনতেই এখানে এসেছে। আমাদের দেখে আর সামনে আসেনি।'
কাজলের কলিজায় টুক করে একটা কামড় পড়ল। দুইয়ে দুইয়ে চার–এরা তো হিসাব মিলিয়ে ফেলল! প্রথমে বুকপকেটে হাত

দিলো ওই লোকটি। পকেট খালি। বলল, 'না স্যার, পকেটে কোনো কানাকড়িও নেই।'
এবার নিচের দিকে তাকিয়ে বলল, 'স্যার, ওর তো লুঙ্গি পরা। লুঙ্গি খুলে দেখব?'
কাজল মনে মনে বলছে, নাউজুবিল্লাহ! কী বলছে এসব?'
'জামা উল্টিয়ে দেখো, কোমরে খুঁচে রেখেছে কিনা।'
কাজলের পেটে আবার একটা কামড় পড়ল। শেষ। বাঁচার কোনো উপায় নেই। জামা উল্টিয়ে কোমরে তাকালেই এতো দিনের জমানো টাকার বান্ডিলটা চোখের সামনে চলে আসবে। আর এতেই সে সাব্যস্ত হয়ে যাবে খরিদ্দার হিসেবে।
জামা উল্টিয়ে লোকটা কোমরে তাকালো। কাজলকে ঘুরিয়ে পেছনেও তাকালো। বলল, 'না, কিছুই তো নেই স্যার!'
কথাটা কাজলের মনে ধরল না। কিছু নেই মানে? টাকার বান্ডিল কোথায় গেল তাহলে? নিজেই লুঙ্গি খুলে ঝাড়া দিল। নিচে পড়লো কি না তাকিয়ে দেখলো। কই, না তো! কিছুই পড়ল না।
'কী দেখছিস তুই?' একজন কাজলকে জিজ্ঞেস করল।
'না, আপনাদের বিশ্বাস করাচ্ছি। আমার কাছে যে কিছু নেই সেটা তো আপনারা বিশ্বাস করছেন না। তাই লুঙ্গি খুলে ঝেড়ে দেখাচ্ছি আপনাদের।'
ওদের কী বলবে, নিজের কাছেই বিশ্বাস হচ্ছে না কাজলের। টাকার বান্ডিলটা গেল কোথায়?
শারমিনের কথা মনে হলো। ঘর থেকে বেরুনোর সময় ঝগড়া করে বেরিয়েছে। মাথা ছিল গরম। জামাটা গায়ে চড়িয়ে কোনো মতে বোতাম লাগিয়ে বেরিয়েছে। তোষকের তলে যে জমানো টাকা ছিল, সাথে নিতে ভুলে গেছে। টাকা ছাড়াই চলে এসেছে। এ কথা মনে হতেই কাজলের প্রাণ ফিরে এলো। একটা প্রশান্তি ছেয়ে গেল পুরো সত্তা জুড়ে। চোখ বন্ধ করে বড় করে একটা শ্বাস ছাড়ল। আহ, শারমিনের সাথের ঝগড়াটাই আল্লাহর রহমত হয়ে গেল!
'লুঙ্গির ভেতর কিছু পরেছিস?' সাদা পোষাকধারী লোকের কথায় কাজল বাস্তবে আসে।
'ইয়ে না মানে, আমি কিছু পরি না।'
'স্যার, এ ধরনের লোক সব করতে পারে। কয়েক দিন আগে দেখলেন না, পেটের ভেতর থেকে দু পোটলা বের করেছিলো।'
'হু, সে তো ইয়াবা পাচারকারী। কিন্তু ওকে তো তেমন মনে হচ্ছে না।'
'ওই লোকটাকে দেখেও এমন নিষ্পাপ মনে হয়েছিল।'
'স্যার, একটা কথা বলবো?'
'বলো।'
'দেখেন, লোকটা আমাদের সাথে দেখা হবার পর থেকে কেমন চুপসে দাঁড়িয়ে আছে না?'
'কী বলতে চাও তুমি?'
'আমি বলতে চাই, ও বোধহয় দু'রানের চিপায় টাকা ধরে রেখেছে।'
কাজলের মন চাইলো ওর কানের তিন ইঞ্চি নিচে কষে একটা থাপ্পড় মারে। কী যা তা বলছে এসব? রানের চিপায় কেউ টাকা ধরে রাখে আবার?
সিগারেট ফুঁকতে থাকা লোকটা বলল, 'কীরে, ধরে রেখেছিস?'
'কাজল দুই পা দুই দিকে প্রসারিত করে বলল, 'এই যে দেখেন। কোনো কিছু নেই। আপনাদের সন্দেহ হচ্ছে আমি লুঙ্গির নিচে কিছু পরেছি, ইচ্ছে করলে আপনারা দেখতে পারেন।'
'না, দেখা লাগবে না। নজরুল! তুমি ওর কোমরে হাত দাও। তাহলেই বুঝবে।'
নজরুল কাজলের কোমরে হাত দিল। বলল, 'না স্যার। কিছু পরা নেই।'
এ সময় একটা পুলিশের গাড়ি এসে থামল। কাজলের একটা হাত ধরে দু জন সামনে আসলো। লাশ গাড়িতে উঠিয়ে ফেলেছে। কাজল ওসিকে চেনে। ওসিও মোটামুটি। কাজলকে দেখে বলল, 'কীরে, তুই এখানে কী করিস?'
'লাকড়ি কুড়াতে এসেছিলাম স্যার।'
'ও এগুলোর সাথে জড়িত?'
'না, ওর নাম তো নেই। তারপরও গাড়িতে তুলে দেন। জিজ্ঞাসাবাদ করি।'

কাজলকে পুলিশ থানায় নিয়ে গেছে। সন্দেহভাজন হিসেবে। এক দিন রেখে হয়তো ছেড়ে দেবে। অথবা নেওয়ার কিছুক্ষণ পরও ছেড়ে দিতে পারে। কাজলের সে বিষয়ে কোনো চিন্তা নেই। অপরাধ যখন নেই তখন ছাড়া পাবেই সে। আজ না হয় কাল। কিন্তু এ ছোট সময়ে শারমিন যে একবারও আসবে না দেখতে এ ব্যাপারে নিশ্চিত কাজল। এরকম দুর্ব্যবহার করার পরও কোনো মানুষ কি কাউকে ভালোবাসতে পারে?

কাজল ভেবে রাখল। থানা থেকে বেরিয়ে ঘরে যাবে। টাকা নিয়ে বাজারে আসবে। আলতা কিনে তবে শারমিনের সাথে কথা বলবে। ওর কাছে মাফ চাইবে।

কাজলের মনে ছোট একটা সংশয় কাজ করছে এখন। অপরাধ ধরা পড়েনি। পড়বেও না। কারণ এখনো সে অপরাধের সাথে যুক্ত হয়নি। তবে যদি কেউ তার নামে নালিশ করে বসে, সেখানে যাওয়ার উদ্দেশ্য বলে দেয়, তাহলেই কাম সারা। জেলে থেকে পঁচতে হবে। উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানে কেবল শারমিনই। শারমিনের যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে, সে ক্ষোভের বশবর্তী হয়ে যদি থানায় এসে অভিযোগ করে বসে?

এ একটা চিন্তায় উদ্বিগ্ন হয়ে আছে কাজল। শারমিনের যা সাহস, ওর দ্বারা এটা অসম্ভবও না। যেকোনো মুহূর্তে থানায় চলে আসতে পারে। এ চিন্তাটাই কাজলের মাথায় ঝট পাকিয়ে দিচ্ছে এখন।

গারদের ভেতর কাজল একা। দুই হাঁটু এক করে বসে আছে। চিবুক হাঁটুর মাঝখানে ঠেকানো। এখান থেকে সরাসরি দরজা দেখা যায়। কে এলো, কে গেল সব স্পষ্ট। সে দিকেই তাকিয়ে আছে কাজল।

দুজন আগন্তুককে দেখে কাজলের চোখ কপালে ওঠার অবস্থা। বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে থাকল সে। বসা থেকে উঠে দাঁড়াল। লোক দুটো কাজলের কাছে না এসে আগে অফিস রুমে গেল। যে আশঙ্কায় ছিল এতক্ষণ সেটাই হচ্ছে। শারমিন আর দোলা থানায় এসেছে। অফিসে ঢুকে নিশ্চিত এখন সব বলে দেবে। এত রাগ কেন মেয়েদেও, বুঝে আসে না কাজলের।

কিছুক্ষণ পর দেখে শারমিন আর দোলা গারদের দিকে আসছে। তাদের পেছনে একজন পুলিশ। কাজলের মন চায় ওদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে। বিশেষ করে শারমিনের থেকে। কিন্তু দোলার কারণে পারে না। দোলা কাজলকে দেখে একটা হাসি দিয়ে দু হাত বাড়ায়। কাজল গারদের ফাঁকে হাত বের করে দোলাকে জড়িয়ে ধরে।

কাজল বলে, 'কেন আসছো তোমরা?'

'তোমাকে নিতে আসছি, বাবা।'

'আমাকে নিতে?'

'হু, তোমাকে নিতে।' কাজল দোলাকে ছেড়ে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। শারমিনের চেহারা দিকে তাকায়। কপাল ফুলে কালো হয়ে আছে। জগটা বোধহয় ভালো করেই লেগেছে।

কাজল খুব নরম সুরে বলে, 'আমাকে ছাড়াতে এসেছ?'

শারমিন কোনো কথা বলে না। পায়ের বৃদ্ধাঙুল মেঝেতে ঘষতে থাকে। নত মুখে সেদিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ।

কাজলের নিজের ওপরই রাগ লাগে। কী সব বাজে চিন্তা কাজ করেছে শারমিনকে ঘিরে। এতদিনেও বুঝতে পারেনি সে শারমিনের ভালোবাসা। কাজল বুঝতে পারে, মেয়েদের ভালোবাসা। একবার কাউকে ভালোবাসলে সে ভালোবাসা আর কিছুতেই যে মলিন হয় না তার সাক্ষাৎ প্রমাণ তার বউ, শারমিন।

সাথে আসা পুলিশ গরাদের তালা খোলে। দরজা খুলে বলে, 'আসুন, আপনি বেরিয়ে আসুন। অফিসে একটা সাইন দিয়ে চলে যাবেন।'

কাজল মাথা নিচু করে হাজতখানা থেকে বের হয়। অফিসে একজন পুলিশ বসা। তার সামনে অনেক কাগজপত্র। সেখান থেকে একটা ডায়রি বের করে খুলে ধরল। বলল, 'এখানে একটা সাইন করে নিন।'

কাজল কলম হাতে নিয়ে খুব মেহনত করে তার নাম লিখলো। তার কসরৎ আর মেহনত দেখে পুলিশ বলল, 'এক পৃষ্ঠা লিখতে বললে তো বোধহয় কলমই ভেঙে ফেলতেন।'

কাজল কোনো উত্তর দেয় না। সামান্য মুচকি হাসে কেবল।

জেল থেকে বেরিয়ে কাজল মৃদু স্বরে বলে, 'তোমার কাছে টাকা হবে?'

শারমিনও আস্তে করে বলে, 'কত টাকা?'

'দেড়-দুইশ!'

কাপড়ের আঁচলের কোণ হাতে তুলে নেয় শারমিন। গিঁট খুলে কাজলকে দুশো টাকা দেয়।

কাজল টাকা পেয়ে বলল, 'তোমরা বাড়ি যাও। আমি বাজার থেকে আসছি।'

কাজল বাজারে চলে গেল। শারমিন মনে মনে বলল, বাঁদর কখনো ভালো হয় না। বাঁদর বাঁদরই থাকে।

বাজার থেকে ফিওে সোজা বাড়ি আসে কাজল। ঘরে ঢুকে নিজের বিছানার উপর বসে। চুপ করে। দোলা খেলতে চলে যায় পাড়ার ছেলে-মেয়েদের সাথে। শারমিন ঘরে আসতেই কাজল বিছানা থেকে উঠে দরজা বন্ধ করে দেয়।

শারমিন ভ্রু কুঁচকে বলে, 'দরজা বন্ধ করলে কেন?'

'কেন করলাম জানতে চাও?'

'চোখ বন্ধ করো। আমি না বলা পর্যন্ত চোখ খোলো না।'

শারমিন বিরক্তি নিয়ে বলল, 'উহ, ডং দেখলে আর বাঁচি না। বন্ধ করলাম চোখ।'

কাজল লুকিয়ে রাখা আলতার কৌটা বের করে। আঙুলে লাগিয়ে শারমিনের পা ছুঁতেই শারমিন লাফিয়ে উঠলো। 'এ মা, কী করছো তুমি?'

বাঁকা হয়ে পায়ের দিকে তাকিয়ে দেখে পায়ে আলতা লাগাচ্ছে কাজল। শারমিন খুব বিস্ময় নিয়ে বলল, 'তুমি আমার জন্যে আলতা আনলে?'

কাজল চুপ করে মাথা নাড়াল। শারমিন কাজলের সামনে মাটিতে বসলো। দুই হাতে ওর চেহারা উঁচিয়ে ধরে বুকে জড়িয়ে ধরলো। আবার বলল, 'আমার জন্যে আলতা আনলে?'

'কেন, বিশ্বাস হচ্ছে না তোমার?'

'এই নাও তোমার আলতা, আর এই নাও তোমার থেকে ধার করা দুইশো টাকা।'

কাজলের এমন পরিবর্তন শারমিন কখনো কল্পনাও হয়তো করেনি। কিন্তু সেটাই হলো। শারমিনের মনে আনন্দের হিল্লোল। আনন্দ উপচে পড়ছে তার পুরো অবয়ব থেকে। যেন খুশির নির্ঝরণী বয়ে যাচ্ছে তার মাথা থেকে পা অবধি। জড়িয়ে ধরলো সে স্বামীকে। দু হাত দিয়ে চেপে ধরে বলল, 'তুমি আমাকে ভালোবাসো?'

কাজল মাথা নাড়ায়।

'না, মাথা নাড়লে হবে না। মুখে বলতে হবে। বলো, ভালোবাসো আমাকে?'

কাজল কখনো ভালোবাসার কথা মুখে বলেনি। ইতস্তত করছে। শারমিন অভিমান করলো। গলা ছেড়ে দিয়ে বলল, 'ঠিক আছে। তোমার বলতে হবে না। আমার কাজ আছে। আমি যাই।'

এ বলে বাইরে চলে যেতে উদ্যত হলো সে। দরজার কাছে যেতেই কাজল পেছন থেকে জড়িয়ে ধরলো। কানের কাছে ফিসফিস করে বলল, 'আমি তোমাকে ভালোবাসি!'

শারমিন ঘুরে কাজলের বুকে একটা ধাক্কা দিল। ধাক্কাটা জোরে হয়ে গেছে। কাজলকে পেছনে পড়ে যেতে দেখে দু হাতে কাজলের জামা মুঠ করে ধরলো। তাতেও রক্ষে হয়নি। বরং জামার বোতাম ছিড়ে গেল। শেষ অবধি টেবিলের কোণা ধরে নিজেকে পড়া থেকে বাঁচালো কাজল। কিন্তু ততক্ষণে যা হবার হয়ে গেছে। টেবিলের ওপর রাখা জগটা আবার সশব্দে পড়ে গেল। কাজল, শারমিন দুজনই হাসছে।

এ সময় দরজায় করাঘাত হলো। দোলা আসছে। কাজল দরজা খুলে দিল। দরজা খুলে দিয়ে বোতাম ঠিক করতে করতে বেরিয়ে গেল।

বড় বড় চোখ করে দোলা বাবার দিকে তাকিয়ে আছে। বাবা বেরিয়ে গেছে। এবার বিস্ময় নিয়ে তাকাল সে মায়ের দিকে। সকালের মতো এখনো মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে মা। জগটা পড়া মাটিতেই। পুরোই সকালের চিত্র। পার্থক্য কেবল এটুকু, সকালে মা কপালে হাত দিয়ে কাঁদছিল, আর এখন হাসছে।



খলিফা সুলাইমান ও আবু হাজেম

সুবহে সাদিক

সুলাইমান ইবনে আবদুল মালিক ছিলেন উমাইয়া খলিফাদের একজন। তিনি একবার মদিনা মুনাওয়ারায় আগমন করলেন। সেখানে তিনি সভাসদদের ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, 'মদিনায় কি এমন কেউ আছেন, যিনি সাহাবিদের সাক্ষাত লাভ করেছেন?' তারা বলল, 'জি, আছেন। তাঁর নাম আবু হাজেম। তিনি সাহাবিদের শিষ্যত্ব লাভ করেছেন। খলিফা তাঁকে দরবারে ডেকে পাঠালেন। আবু হাজেম খলিফার দরবারে এলেন। খলিফা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমার সাথে কেন এ বিচ্ছেদ?' আবু হাজেম বললেন, 'আপনি আমার মধ্যে কীসের বিচ্ছেদ দেখলেন?'

'মদিনার সবাই আমার সাক্ষাতে এলো, অথচ আপনি এলেন না।'

'বিচ্ছেদ তো হয় বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে। আর আপরি তো আমাকে আগে থেকে চিনতেন না। আমিও আপনাকে কখনো দেখিনি।'

খলিফার পাশে ছিলেন মুহাম্মদ বিন শিহাব জুহরি। আবু হাজেমের জবাব শুনে খলিফা তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ইনিই ঠিক বলেছেন। ভুল আমি বলেছি। এরপর খলিফা বললেন, 'আবু হাজেম, মৃত্যুকে কেন আমরা অপছন্দ করি?'

'কারণ, আপনারা দুনিয়াকে সজ্জিত করেছেন আর আখেরাতকে বিরান

কও দিয়েছেন, তাই সাজানো দুনিয়া থেকে পরকালের বিরানভূমিতে যাওয়া আপনাদের অপছন্দ লাগে।'
'যথার্থই বলেছেন। তো, আল্লাহর সামনে আমরা কীভাবে উপস্থিত হবো?'
'নেককার ব্যক্তি উপস্থিত হবে যেভাবে মানুষ প্রিয়জনের সাথে মিলিত হয়। আর বদকার উপস্থিত হবে পালিয়ে যাওয়া গোলামের মতো।' খলিফা তখন কেঁদে ফেললেন। তারপর বললেন, 'হায় আফসোস! আল্লাহর কাছে আমাদের ভাগ্যে কী আছে?'
'কুরআনে তা বলা হয়েছে।'
'কী বলা হয়েছে?'
'বলা হয়েছে–"নিশ্চয় পূণ্যবানগণ থাকবেন নেয়ামতের স্বাচ্ছন্দ্যে আর পাপীরা জাহান্নামে।'
'আল্লাহর রহমত কাদের জন্য?'
'নেককারদের জন্য।'
'সর্বোত্তম আমল কোনটি?'
'আল্লাহর আদেশ পালন করা এবং নিষেধ থেকে বেঁচে থাকা।'
'সবচেয়ে সঠিক কথা কোনটি?'
'যাঁকে আপনি ভয় করেন অথবা যাঁর থেকে কিছু আশা করেন তাঁর সামনে হক কথা বলা।'
'মানুষের মধ্যে কে সবচেয়ে জ্ঞানী?'
'যে নিজে ভালো কাজ করে এবং মানুষকে করতে বলে।'
'আর কে বেশি মূর্খ?'
'যে মন্দকাজে অন্যকে সাহায্য করে। সে তো নিজের আখেরাতকে অন্যের দুনিয়ার বিনিময়ে বিক্রি করে দেয়।'
'ঠিক বলেছেন।'
'আমাদের বিষয়ে আপনার কী বক্তব্য?'
'আমিরুল মুমিনিন, আপনি আমাকে তাড়িয়ে দেবেন না তো?'
'না, আপনি কিছু উপদেশ দিন।'
'আপনার পূর্বপুরুষগণ মানুষকে তরবারি দিয়ে ভয় দেখিয়েছেন। তাঁরা কোনো পরামর্শ এবং মানুষের কোনো রায় ও সিদ্ধান্ত ছাড়াই খেলাফত ছিনিয়ে নিয়েছেন। তাঁরা যা বলেছেন এবং মানুষ তাঁদেরকে যা বলেছে তা শুনলে অবশ্যই আপনি বুঝতে পারতেন।' আবু হাজেমের এ কথা শেষ হতেই খলিফার সভাসদদের একজন বলে উঠলো, 'আবু হাজেম ঠিক বলেননি।' আবু হাজেম তখন বললেন, 'তুমি ভুল বলেছ। আল্লাহ ওলামাদের থেকে সত্য প্রকাশ করার এবং সত্য গোপন না করার প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন।' তখন খলিফা বললেন, 'তাহলে সংশোধনের উপায় কী?'
'অহংকার পরিত্যাগ করুন। নম্র আচরণ করুন, আর ইনসাফের সঙ্গে বণ্টন করুন।'
'খলিফা আবু হাজেমকে অনুরোধ করে বললেন, 'আপনি আমাদের সঙ্গ দেবেন কি? তাহলে আমরা আপনার কাছ থেকে অনেক কিছু শিখতাম আর আপনিও আমাদের থেকে কিছু লাভ করতেন।' আবু হাজেম বললেন, 'আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। আমি যদি আপনাদের সাথে থাকি তাহলে তো আল্লাহ জীবন এবং মৃত্যুর দ্বিগুণ সাঝ দেবেন।' এরপর খলিফা আবু হাজেমের কিছু চাওয়ার আছে কিনা জানতে চাইলেন। আবু হাজেম বললেন, 'আমাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিন এবং জান্নাতে প্রবেশ করান।'
'আমার তো সে ক্ষমতা নেই।'
'তাহলে এ ছাড়া আমার চাওয়ার আর কিছু নেই।'
সবশেষে খলিফা বললেন, 'আমার জন্য দুআ করুন।' আবু হাজেম দুআ করলেন, 'আয় আল্লাহ! সুলাইমান যদি তোমার ওলি হয়ে থাকে তাহলে তুমি দুনিয়া ও আখেরাতের সবকল্যাণ তাঁর অধীন করে দাও। আর যদি তোমার শত্রু হয় তাহলে তুমি তাকে যা ইচ্ছা করো।' এরপর আবু হাজেম চলে গেলেন। খলিফা তাঁর পিছু পিছু মূল্যবান উপঢৌকন পাঠালেন। আবু হাজেম তখন বললেন, 'এ উপঢৌকন যদি আমার নসিহতের বিনিময়ে হয় তাহলে তো বিপদের অবস্থায় মৃত পশু বা শুকরের গোশত আমার জন্য এর চেয়ে বেশি হালাল। আর যদি তা আমার জন্য বায়তুল মালের পক্ষ থেকে হয় তাহলে এর তো আরও অনেক অংশীদার আছে। তাদেরকেও যদি সমানভাবে দেয়া হয় তবে আমি নিতে রাজি আছি, অন্যথায় আমার এর কোনো প্রয়োজন নেই।'

(গল্প)

রৌদ্রস্নাত জীবন

মাহদী হাসানাত খান

রোদে পুড়ে যাচ্ছিলাম। রোদের প্রখরতায় একেবারে সিদ্ধ হয়ে যাবার জোগাড়। এত রোদে কারও অপেক্ষায় কি দাঁড়িয়ে থাকা যায়? ফোন করে করে বকাবাজি করছি আর রাস্তায় পায়চারি করছি। এই দুইটাই ছিল আমার তখনকার কাজ। মেজাজটা উঠেছিল চরমে। রাস্তার যে পাশে আমি পায়চারি করছিলাম, সে পাশে একজন পাঁপড়-ভাজা বিক্রেতা বসে আছেন বেশ গুটিসুটি হয়ে। মাথায় পুরানো টুপি। জীর্ণ কাপড়। শীর্ণ দেহ। শরীর-চেহারা ধুলোমলিন। গালে সুন্নতি দাড়ি। রোদে পুড়ে যেন কালো হয়ে গেছেন। রোদের তাপে উপর দিকে তাকানো দায়। কয়েকটি করে পাঁপড় ভাজা পলিথিনে প্যাকেট করা। রাস্তা দিয়ে তাঁর পাশ কেটে যে-ই যাচ্ছেন, তিনি তাঁর পা অথবা চেহারার দিকে তাকাচ্ছেন। যেন ভাবছেন, 'এই হয়তো তাঁর ক্রেতা।' আমার দিকে তাঁর চাহনি যেন বলছিল, 'কয়েকটা পাঁপড় ভাজা নেন না, ভাই!' হঠাৎ পাঁপড় ভাজা খেতে ইচ্ছে করল আমার। বাসায় ফোন করে অনুমতি নিয়ে পাঁপড় ভাজা বিক্রেতার কাছে গেলাম। বললাম, 'দুইটা পাঁপড় ভাজা দেন তো!'

শরীর, হাত, পা কাঁপতে কাঁপতে আধো আধো কণ্ঠে বললেন, 'না, ভাই! দুইটা দেওয়া যাবে না। পাঁচ পিস বিশ টাকা।'

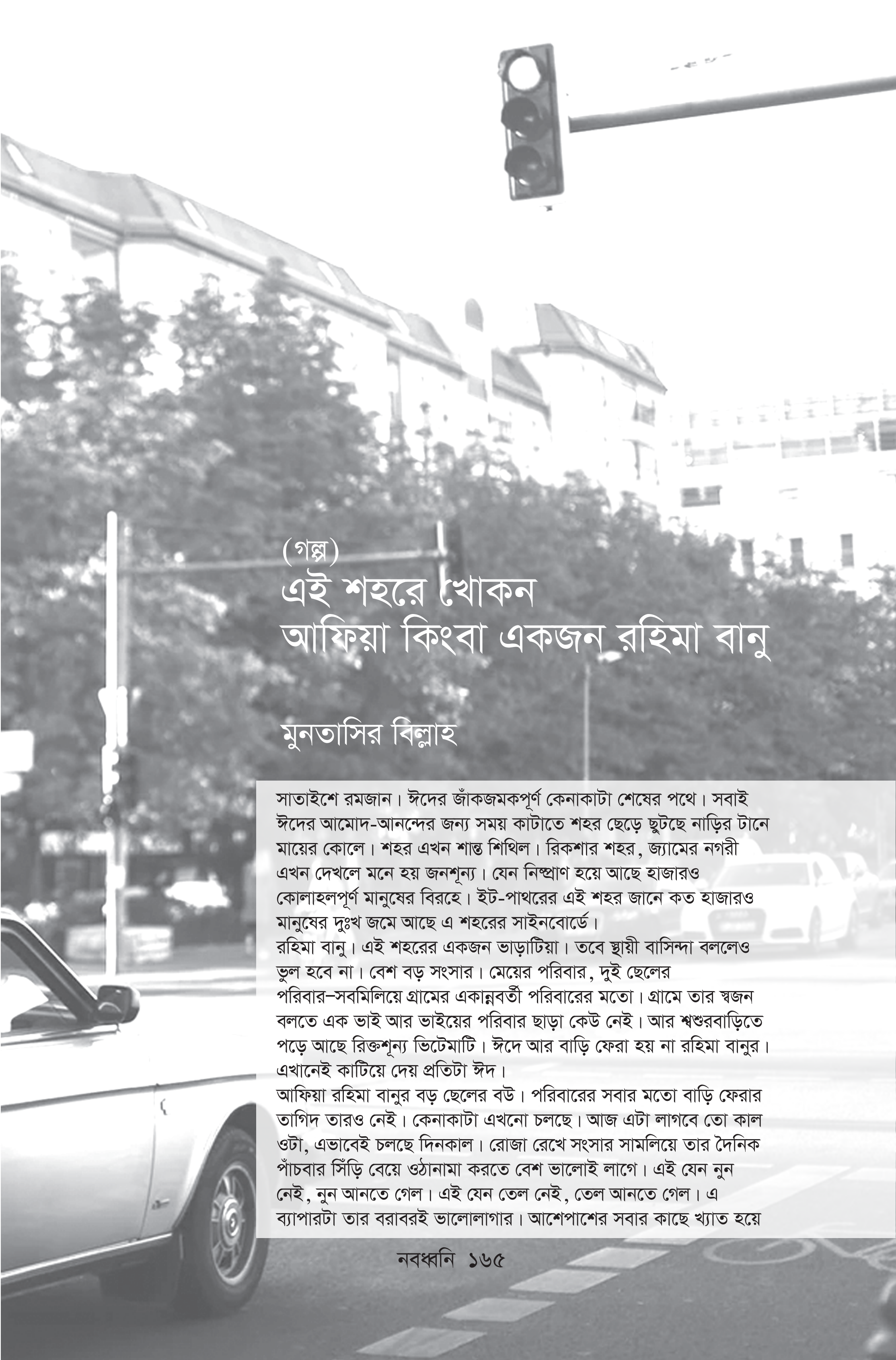
তাঁর করুণ অবস্থা আর চাহনি দেখে আমি অবাক হলাম। কেননা তাঁকে দেখে মোটেও বোঝার উপায় নেই যে, তিনি এতটা অসুস্থ। হতবিহ্বলতার আতিশয্যে তাঁকে কিছু জিজ্ঞেস না করেই বললাম, 'আচ্ছা দেন, পাঁচটাই দেন। এই নিন বিশ টাকা।'

পাঁপড় ভাজা হাতে নিয়ে মহাসড়ক পার হতেই মনে পড়ে গেল, বিশিষ্ট এক সাহাবির কথা। যিনি একজন সংকটাপন্ন দরিদ্রের কাছ থেকে কয়েকগুণ মূল্য বেশি দিয়ে একটি উট ক্রয় করেছিলেন।' আমি ফের রাস্তার ওপারে গেলাম পাঁপড়-বিক্রেতার কাছে। বললাম, 'ভাই, সাধারণ নিয়মানুযায়ী পাঁচটি পাঁপড় ভাজার দাম হয় পঁচিশ টাকা। যাইহোক, এই টাকাটা রাখুন। এমনিতেই দিলাম আপনাকে।' খুব হাস্যোজ্জ্বল হয়ে টাকা গ্রহণ করলেন সাদরে। মনে অজানা এক প্রশান্তি অনুভব করলাম। সুযোগে তাঁর সাথে কথা বলতে ইচ্ছে করল। তাঁকে জানতে মনটা উতলা হয়ে উঠেছে এতক্ষণে। জিজ্ঞেস করলাম, 'ভাই, নাম কী আপনার?'

'মুহাম্মদ রাকিবুল ইসলাম।'

'সুন্দর নাম। তো, আপনার কী হয়েছে? শারীরিক অবস্থা এতটা নাজুক কেন?'
'চার বছর আগে ব্রেইন স্টোক করেছিলাম। দুই মাস হাসপাতালে ছিলাম। এরপর বাড়ি এসে প্রায় তিন বছর ছিলাম শয্যাশায়ী। স্টোকের পর থেকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত আমি। সারাটা শরীর শুধু কাঁপে। অন্যজনের সাহায্য ছাড়া কিছুই করতে পারি না।'
'আপনি কি সম্পূর্ণ চিকিৎসা করিয়েছিলেন?'
'না রে, ভাই! ওই দুইমাস ঢাকা মেডিক্যালেই অনেক টাকা লেগেছিল। ডাক্তার বলেছিলেন সম্পূর্ণ চিকিৎসা করতে দুই-তিন লাখ টাকা লাগবে। এত সামর্থ্য যে নাই, ভাই। তাই আর চিকিৎসা করাতে পারিনি।'
"জানেন! আমার চাচাও স্টোক করেছিলেন। দীর্ঘ একটা বছর শয্যাশায়ী ছিলেন। হাতের দুইটা আঙুল ছাড়া কিছুই নাড়াতে পারতেন না। বিছানায় পড়ে থাকতেন নিথর হয়ে। প্রায়ই চোখ বেয়ে টপটপ করে পড়ত যন্ত্রণার অশ্রুজল। তিনটা সন্তান রেখে গেছেন। বড়ো ছেলেটার এখন মাত্র ১০ বছর।'
'আহ! কতটা কষ্ট করেছেন আপনার চাচা। আল্লাহ তাঁকে জান্নাতে দিক। ওনার তুলনায় অনেক অনেক ভালো আছি আমি, আলহামদু-লিল্লাহ।'
'বিয়ে-শাদি করেছেন নাকি?'
'জি, ভাই! তিনটা সন্তানও আছে।'
'বড় সন্তানের বয়স কত?'
'এই তো ১০-১২ বছর হবে।'
'আপনার বয়স কত?'
'৩৩-৩৪।'
'আগে কী করতেন?'
'আগে কাটিংমেশিন চালাতাম। ভালো বেতন পেতাম। স্টোকোর পর থেকে ওই কাজ শেষ। সামান্য ভারি কাজ করার জন্য এতটুকুও শক্তি নেই।'
'পাঁপড় ভাজা কি কিনে আনেন?'
'না, আমার স্ত্রী বানিয়ে দেয়। আর আমি বিক্রি করি।'
'থাকেন কই?'
'ডেমরা।'
'এতটা পথ, এতকিছু নিয়ে আসেন কী করে?'
'একা আসি না, এই রিকশাওয়ালারা দিয়ে যায় আমাকে। একা কিছু করার জো নেই।'
'এত রোদে, তপ্ত পিচঢালা পথে, ধুলাবালিতে এতটা সময় বসে থাকেন কী করে? একটা ছাতা কিনতেও তো পারেন।'
'না, ভাই! ছাতা কেনার সামর্থ্য নাই। ২০০ টাকা দামের ছাতা কী করে কিনব? তাহলে তো সারাদিনের আয়ই শেষ হয়ে যাবে। আর কষ্ট করে পাঁপড় ভাজা না বেচলে যে ছেলে-মেয়েগুলো না খেয়ে মরবে।'
'আপনি কি সবসময় এখানেই বসেন? আগে তো খেয়াল করিনি আপনাকে।'
'হুম, এখানেই বসি প্রতিদিন।'
'আচ্ছা ভাই! আপনাকে একটা ছাতা কিনে দেব আমি। এখন যাই। আবার দেখা হবে, ইনশাআল্লাহ।'
পরদিন ছাতা কিনতে গেলাম মার্কেটে। দামাদামি করে মধ্যম মানের একটা ছাতা কিনলাম। মনে মনে নিয়ত করে নিলাম, যতটা দিন তাওফিক হয়, ততটা দিন তাঁকে সাহায্য করে যাব সাধ্যমতো। আমাদের সমাজে তো এমন আরও কত রাকিব ভাই আছেন, তাঁদের কি কোনো খবর রাখি আমরা? তাঁদের দেখেও যেন আমরা না-দেখার ভান করে থাকি। মুখ ফিরিয়ে নিই অবজ্ঞাভরে। কেন এতটা স্বার্থপর আর নিষ্ঠুর আমরা? কেন মৃত আমাদের মানবতা? অথচ আমাদের সদিচ্ছা এবং সামর্থ্যানুযায়ী ছোট ছোট সহযোগিতাগুলোও পারে অসহায়-দুস্থদের বড় বড় মুসিবত ঘোচাতে। এত সব কষ্টের মাঝেও অন্যরকম এক প্রশান্তিময় হৃদয় নিয়ে রাকিব ভাইয়ের বসার স্থানটায় গেলাম। কিন্তু হায়, এ কী! তিনি যে নেই সেখানে! তারপরের দিনেও পেলাম না তাঁকে। হায়রে, কত কথা বলেছিলাম সেদিন, অথচ মোবাইল নম্বর রাখলাম না, নির্দিষ্ট করে ঠিকানাটাও নিলাম না। আমি একটা আস্ত বোকা। জানি না, কী হয়েছে তাঁর, কেন আসেন না তিনি। জানি না, আর কখনো রাকিব ভাইকে ছাতাটা দিতে পারব কি না।

তুষারধারা আবাসিক এলাকা, কদমতলী, ঢাকা



(গল্প)

এই শহরে খোকন আফিয়া কিংবা একজন রহিমা বানু

মুনতাসির বিল্লাহ

সাতাইশে রমজান। ঈদের জাঁকজমকপূর্ণ কেনাকাটা শেষের পথে। সবাই ঈদের আমোদ-আনন্দের জন্য সময় কাটাতে শহর ছেড়ে ছুটছে নাড়ির টানে মায়ের কোলে। শহর এখন শান্ত শিথিল। রিকশার শহর, জ্যামের নগরী এখন দেখলে মনে হয় জনশূন্য। যেন নিষ্প্রাণ হয়ে আছে হাজারও কোলাহলপূর্ণ মানুষের বিরহে। ইট-পাথরের এই শহর জানে কত হাজারও মানুষের দুঃখ জমে আছে এ শহরের সাইনবোর্ডে।

রহিমা বানু। এই শহরের একজন ভাড়াটিয়া। তবে স্থায়ী বাসিন্দা বললেও ভুল হবে না। বেশ বড় সংসার। মেয়ের পরিবার, দুই ছেলের পরিবার–সবমিলিয়ে গ্রামের একান্নবর্তী পরিবারের মতো। গ্রামে তার স্বজন বলতে এক ভাই আর ভাইয়ের পরিবার ছাড়া কেউ নেই। আর শ্বশুরবাড়িতে পড়ে আছে রিক্তশূন্য ভিটেমাটি। ঈদে আর বাড়ি ফেরা হয় না রহিমা বানুর। এখানেই কাটিয়ে দেয় প্রতিটা ঈদ।

আফিয়া রহিমা বানুর বড় ছেলের বউ। পরিবারের সবার মতো বাড়ি ফেরার তাগিদ তারও নেই। কেনাকাটা এখনো চলছে। আজ এটা লাগবে তো কাল ওটা, এভাবেই চলছে দিনকাল। রোজা রেখে সংসার সামলিয়ে তার দৈনিক পাঁচবার সিঁড়ি বেয়ে ওঠানামা করতে বেশ ভালোই লাগে। এই যেন নুন নেই, নুন আনতে গেল। এই যেন তেল নেই, তেল আনতে গেল। এ ব্যাপারটা তার বরাবরই ভালোলাগার। আশেপাশের সবার কাছে খ্যাত হয়ে

গেছে, এমনকি এই বাড়ির কাজের লোকগুলোর কাছেও। রহিমা বানু শীতল রক্তের মানুষ। কখনো গলা উঁচিয়ে কথা বলবে তা হয়ে ওঠে না। ছেলেবউয়ের আচরণ তাকে পীড়া দেয় তবুও বলার ক্ষমতা রাখে না।

আফিয়া দু' ছেলে নিয়ে নিচে নামছে। সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতেই গেটের দরজায় দেখা খোকনের সঙ্গে। মানুষের গুণের মধ্যে ভালো একটা গুণ হলো মানুষের মনকে উপলব্ধি করতে পারা। আফিয়ার এই গুণটা বরাবরই প্রশংসনীয়। খোকনকে কেমন যেন মনমরা লাগছে, আজ আফিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বুঝতে পারছে। বলেও দিলো, মনে হয় মানুষটাকে ছুটি দেয়নি। আর কবেই-বা ছুটি দেবে? আর তো বাকি দুদিন। রাত পোহালেই ঈদ।

'খোকন, বাড়ি যাবি না?'

কথাটা বলতেই দেখে খোকনের চোখ ছলছল করে উঠছে। নিচে তাকিয়েই উত্তর দেয়, 'না।' মনে হয় চোখের পানি লুকানোর জন্য মাথা নিচু করে সে।

'কেন, ছুটি দেয়নি ম্যানেজার?'

ছেলেটি নিশ্চুপ। আনমনা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কোনো উত্তর নেই। তার দীর্ঘশ্বাস, নিশ্চুপ থাকা নৈঃশব্দের বাণী শুনিয়ে যায়, 'না।'

অফিয়া বাসায় উঠে শাশুড়িকে বলে, 'মা! খোকনকে কেমন মনমরা মনমরা লাগছে। ছেলেটা কত উচ্ছ্বাস নিয়ে ছিল ছুটি পেলে বাড়ি যাবে। এখন মনে হয় ম্যানেজার ছুটি দেয়নি। সেদিন জিজ্ঞেস করলাম, "বাড়ি যাবি না?" বলল, ছুটি পেলে যাবে। আজ কেমন মনমরা হয়ে আছে।'

খোকন। সময় নষ্ট করে যে গল্পটা শুনবেন সেটা খোকনের। এই বাড়িতেই কাজ করে। বয়সের হিসেব করতে গেলে মনে হয় বয়সন্ধিকাল পেরিয়ে সবেমাত্র যৌবন ছুঁই ছুঁই। মুখে দু'চারটে দাড়ি উঁকি দিচ্ছে। লম্বা ছিপছিপে গড়নের। চিকন হওয়ার দরুণ মনে হয় শরীরের মাঝ বরাবর ভেঙে যাচ্ছে। চেহারায় সবসময়ই দুঃখের ছাপ। ঠিক কবে তার এই নিষ্পাপ চেহারাটায় শেষ হাসির রেখা ফুটেছিল, ছেলেটির হয়তো নিজেরও অজানা। এই বাড়িতে কাজ করে কয়েক বছর ধরে। ধরা যায় তার কৈশোরের স্মৃতিটা কেবল ইট-পাথরের দেয়াল ঘেঁষে ছ্যাতছেতে দালান-কোঠার বন্দীদশা জীবন। কেবলই ক্লেশের ছাপ। সিঁড়ি ঝাড়ু দেয়া, মোছা–এগুলো তার দৈনন্দিন কাজের রুটিন। সবসময়ই বিনম্রচিত্তে কাজ করে যায়। ভদ্রতাও মানুষকে ভালোবাসতে শেখায়, তার প্রমাণ খোকন নিজেই। খোকনকে একে একে বাড়ির ভাড়াটিয়াগুলো খুবই আদর করতে শুরু করেছে। কেউ দেখা হলেই ডাক দেয়, 'কী রে খোকন, আছিস কেমন?'

খোকন বরাবরই চুপচাপ। উত্তরে বলে, 'ভালো আছি।' ফের পাল্টা জবাবে যে বলতে হয় আপনি কেমন আছেন, এই কথাটাও যেন খোকনের নিরর্থক মনে হয়।

বাড়ির নিচতলাতে গ্যারেজ। গ্যারেজের পাশে ছোট্ট একটা রুম। সেখানেই রাত কাটায় খোকন। ছেঁড়া তোশক আর বালিশে রক্তের দাগ। দেখলেই মনে হয় কত শত ছারপোকা আর মশা এখানে ভিড় জমায়। পাশের দেয়ালে ঝুলছে কিছু কাপড়চোপড়, এগুলো খোকনের। তবে অগোছালো। আর রুম বলতে ওরকম রুম ধরা যায় না; থাকার জন্য ছোট্ট একটা বিছানা। যেখানে মশার আনাগোনা, ছারপোকা, ধুলোবালি, সবমিলিয়ে বেশ জরাজীর্ণ বললে চলে।

ঈদের আর দুদিন বাকি। বাড়ির কাজের লোক এখন খোকন ছাড়া কেউ নেই। দারোয়ান ছুটিতে গেছে। ম্যানেজার সপরিবারে এখানেই থাকে। তার পরিবার বলতে শুধু বউ। ছেলে-মেয়ে নেই। হওয়ার আশাও নেই। বয়স পঞ্চাশের গণ্ডি ছড়িয়ে। স্বামী-স্ত্রী দুজনেরই উসকোখুসকো মেজাজ। যেন বাঘে মহিষে এক ঘাটে পানি খাচ্ছে। ঈদের ছুটিতে দারোয়ান চলে যাওয়ার পর খোকনের ঝাড়ু দেয়া, মোছা, গ্যারেজ সংরক্ষণ–দারোয়ানের অনুপস্থিতিতে সমস্ত কাজ একারই সামলে নিতে হচ্ছে। খোকন প্রতিবাদ করতে অক্ষম। তার মন নিশ্চয়ই বলে বেড়ায়, দারোয়ান ছুটিতে গেছে আমাকে দিলে কী হতো। আমি দুর্বলচিত্ত বলে আমাকে দেওয়া হচ্ছে না? কিন্তু খোকন তা পারেনি। হয় চাকরি যাবে, নয়তো বেতন আটকাবে। আর খোকনের চাকরি চলে যাওয়া মানে তার পরিবার অনাহারে থাকা। গেটের দরজার কাছে প্রতিনিয়ত এখন খোকনের দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। খোকন দাঁড়িয়ে থাকে কাকতাড়ুয়া সদৃশ। সবাই উৎফুল্ল আর আমোদ নিয়ে একে একে তাদের পরিজনের কাছে যায়। খোকন অসহায়ের মতো তাকিয়ে দেখে। বুকের মাঝে কেমন যেন ছলাৎ করে

ওঠে। মনে মনে বলে ওঠে, মা নিশ্চয়ই আমার জন্য পথপানে তাকিয়ে আছে। ভাবতেই খোকনের চোখ ছলছল করে ঝাপসা হয়ে ওঠে নোনাজলে। ইদানীং খোকনের মনটা ভালো যাচ্ছে না। কাজ সেরে খোকন সিঁড়িতে নয়তো ছাদের এক কোণায় দাঁড়িয়ে আকাশ দেখে। আকাশের বিশালতা দেখে আর চারপাশের ইট-পাথরে ঘেরা সারে সারে দাঁড়িয়ে থাকা রঙ-বেরঙের দালান দেখে। আর ভাবে এই শহরে কত শত জানা-অজানা দুঃখ বয়ে বেড়ায়। কেউ কারোর দুঃখ দেখার সময় পায় না। পৃথিবী এতো নিষ্ঠুর কেন? খোকনকে ভাবায়, প্রতিনিয়ত ভাবায়।

আবার বলে, ছুটি পেলে ঈদে বাড়ি যাওয়ার আগে বেতনের টাকা দিয়ে মায়ের জন্য একটা শাড়ি কিনতাম। ছোট্ট বোনটার জন্য একটা লাল রংয়ের জামা। এটা বোনের আবদার। বাড়ি থেকে আসার পথে বলে দিয়েছিল, 'দাদা! ও দাদা! বাড়ি এলে আমার জন্য একটা লাল রংয়ের জামা আনবি। আর লাল লাল চুড়ি।' খোকন ভাবে কত শত বাহানাই না করে বোনটা। এখন নিশ্চয়ই আমার নেয়া জামার জন্য বসে আছে। আর মা। মা তো অপেক্ষা করছে ছন্নছাড়া ছেলেটির জন্য, তার সময়ই ফুরোয় না যেন।

খোকনের গ্রামে মা আর বোন ছাড়া কেউ নেই। বাবা মারা গেছে অসুখে পড়ে। সেই থেকে সংসারের হাল ধরতে হয় খোকনকে। খোকনের পড়াশোনা আর হলো না। সব কিছুর ইতি টেনে কাজে লেগে যায়। কিছুদিন পর এক শহুরে কাকার সাথে চলে আসে ঢাকা। সেই থেকেই ঢাকা থাকে। ছুটি পেলে বাড়ি যায়, মাইনে যা পায় সবটাই মাকে দিয়ে আসে। এটা দিয়েই মা টেনেটুনে দিন কাটায়। খোকন ভাবে, বোন তো জামার জন্য বসে থাকবে। কতই না কষ্ট পাবে জামা না পেলে। কিন্তু বেতন তো এখনো দেয়নি। চাকরিটা ছেড়ে দিলে মা-বোন–এদের কী হবে। এসব ভেবে খুব রাগ হয় খোকনের। বড্ড রাগ। বেতনের টাকাটাও আটকে রাখল ম্যানেজার। টাকা পেলে বোনের জামা নিয়ে বাড়ি গেলে বোন খুশি হতো। মা আমাকে কাছে পেয়ে স্বস্তি পেতো। এতোটুকু খোকন সবসময়ই মায়ের মুখে হাসির রেখা ফুটাতে ভালোবাসে। বোনের আবদার পূরণ করতে চায়।

রাত পোহালেই ঈদ। বিকাল থেকে আজ খোকন পুরোটা সময় ধরে ছাদে কাটিয়েছে। এখনো ছাদে দাঁড়িয়ে ড্যাব ড্যাব করে আকাশ দেখছে। মায়ের সাথে কথা হলো আজ। মাকে বলে দিলো, ঈদের ছুটি পাইনি। আসতে পারবো না। মা তো কেঁদে কেঁদে সারা। 'তুই আসবি না খোকন?'

খোকন বলে, 'বেতন দেয়নি মা। বেতন পেলে আসব। চাকরি গেলে যাক।' মা ফের বলে, 'তোর বোন লাল জামার জন্য অস্থির হয়ে আছে, আমি কোথা থেকে দেবো জামা।'

'আমি আনব মা, তুমি চিন্তা করো না।' খোকন ছটফটিয়ে ওঠে। ভাবে, ছোট্ট বোনটার সাথে যারা থাকে তারা নিশ্চয়ই ঈদের নতুন জামা বোনটাকে দেখাচ্ছে। বোনটা হয়তো খুব কষ্ট পাচ্ছে। দেয়াল ঘেঁষে বুকফাটা এক চিৎকার বেরিয়ে আসছে। কিন্তু খোকন? খোকন কান্না করতে পারে না। চাপাকান্নারা বুকের মধ্যখানে দলা পাকায়। খোকন নিস্তব্ধ হয়ে সুদূর আকাশপানে তাকিয়ে থাকে। কারণ, খোকন জানে, তাদের মতো খোকনদের কান্না মানা। সবার মুখে হাসি ফোটাতে হয় তাদের।

সন্ধ্যা নেমে এলো। এখনো খোকন ছাদে। আকাশে বাঁকা একটা চাঁদ উঁকি দিয়েছে। মনে হলো প্রথমেই পৃথিবীর বুকে চাঁদটা খোকনকে সম্ভাষণ জানাল। খোকনের মনে পড়ে সেই ছোট্ট বেলাকার কথা, বাবার হাত ধরে ঈদের নামাজ পড়তে যাওয়া, এসে মায়ের সাথে বসে সবাই মিলে ফিরেনি খাওয়া, বিকেলে বাবার সঙ্গে কোথাও ঘুরতে যাওয়া। কতই না ভালো ছিল সেই সময়টা। আর এখন ঈদ মানে মায়ের কষ্ট বোনের কান্না। তারপর দীর্ঘ একটা দীর্ঘশ্বাস। খোকন ভাবে, চাকরি যায় যাক, ম্যানেজার বেতনটা দিলে বোনকে খুশি করতে পারব, সবাই মিলে ঈদ করতে পারব, বাড়ি চলে গেলে মায়ের হাতের ডাল-ভাত খাব আর রোজগারে লেগে যাব। এই নিষ্ঠুর শহর ছেড়ে আমি চলে যাব। খুব দূরে। আজ ঈদের রাত। ম্যানেজারকে বললে বেতনটা পেতেও পারি। সেদিন তো বলল ঈদের দিন দেবে। আজ না হয় বলে দেখা যাক। খোকন দৃঢ়চিত্তে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলো। ম্যানেজারের বাসার সামনে দাঁড়িয়ে সে। দরজায় কড়া নাড়তে গিয়েও হাতটা নামিয়ে নিলো। দাঁড়িয়ে আছে। নিশ্বাসের শব্দটা ভারী হতে হতে দীর্ঘশ্বাস হয়ে বেরিয়ে আসছে। হাত দিতেই দরজা খোলার আওয়াজের সাথে রুক্ষ একটা

কণ্ঠস্বর শুনতে পেলো সে।
এটা ম্যানেজারের বউ। যে-কেউ দরজার সামনে কি দূরে থাকলেও সবসময় এভাবে কথা বলে সে। দরকারি কাজে বের হচ্ছে তা দেখেই বোঝা গেল।
'ও.. খোকন, তুমি? কোনো দরকার?
'ম্যানেজার সাবের কাছে এসেছিলাম...'
কথাটা শেষ না করতেই এগিয়ে আসলো ম্যানেজার। খোকন মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে। মনে হয় যেন আসামির সালিশ হচ্ছে। নিচু মুখে বলে, 'আমার বেতনটা দিতে পারবেন?'
ম্যানেজারের রুক্ষ উত্তর, 'তোরে না বললাম কাল দিবো! কাল সকালে নিস।' ম্যানেজারের বউ বলে ওঠে, 'ছেলেমানুষ, ঈদে বাড়ি যাবে না, বেতনটা চাচ্ছে তা এখন দিয়ে দিলে কী হয়? দিয়ে দাও।' ফের খোকনের দিকে তাকিয়ে বলে, 'কী রে খোকন, টাকা দিয়ে বুঝি মায়ের জন্য কেনাকাটা করবি?'
খোকন মাথা নাড়ল। বউয়ের কথায় ম্যানেজার নিশ্চুপ। তারপর বলে, 'তুই নিচে যা, আমি আসতেছি।' খোকন নিচে নামতেই ম্যানেজার বেতনটা হাতে দিলো। কাঠকণ্ঠে বলল, 'এই ধর টাকা। কী করবি কর।'
খোকন আস্তে আস্তে বলে, 'বোনের জামা কিনমু আর মায়ের লাগি একটা শাড়ি।'
ম্যানেজার বলে, 'ছুটি কিন্তু পাঁচদিন পরে, বুঝলি?'
খোকন নিশ্চুপ। চুপ থাকাটাই তার শোভা।
আজ ঈদের দিন। আফিয়া তার দুই ছেলে আর রান্না নিয়ে ব্যস্ত। বাবার সাথে ছেলেকে ঈদের নামাজে পাঠাবে তাই পাঞ্জাবি পরাচ্ছে। সকালে তৈরি করল কয়েক প্রকার খাবার। সবাই হাসিমাখা হৈ-হুল্লোড়ে মেতে উঠেছে। ছেলেদেরকে সালামি দিচ্ছে, পাশের বাসার ভাবির ছোট্ট দুটি মেয়ে, তাদের দিচ্ছে। এগুলো নিয়ে বেশ হাসিখুশি কাটছে সময়।
ছেলে দুটোকে বাবার সাথে পাঠিয়ে আফিয়া একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারল। ভারি দুষ্টু ছেলে দুটি, এই যেন মাথায় চেপে বসে।
আফিয়ার আবদারের সুর, 'মা, আজকে খোকনকে দাওয়াত করি? সবাই তো চায় ঈদের দিনটা ভালো কাটাতে।' শাশুড়ি দীর্ঘশ্বাস টেনে বলে, 'চাইলেই কি আর সবাই পারে? তুমি খোকনকে এখনই খাবার পাঠিয়ে দাও। আর বলে এসো দুপুরে আর রাতেও আমাদের সঙ্গে খাওয়ার জন্য।' ঘরে আপাতত বউ-শাশুড়ি। যেতে হলে আফিয়াকেই যেতে হবে। অবশ্য আফিয়ার স্বামীর এসবে কোনো খেয়াল নেই বললেই চলে। এই দিকটা বউ সামলে নিয়ে আছে।
সিঁড়ি ভেঙে নিচে নেমেই ডাক দিলো, 'খোকন... ও খোকন!'
কোনো সাড়া শব্দ না পেয়ে আফিয়া নিঃশব্দে সামনে এগোলো। এক পা দু'পা করে ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে। তাকিয়ে দেখে জরাজীর্ণ রুমটা ফাঁকা। একদমই ফাঁকা। এলোমেলো কাপড় আর টুকিটাকি জিনিসপত্রগুলোও নেই। সব শেষে আফিয়া চলে আসার সময় ময়লাক্ত বিছানার ওপর চোখ পড়ল। দেখে একটা কাগজ মোড়ানো। ইতস্ততভাবে হাতে নিলো। মেলে দেখে সাদা স্বচ্ছ একটা কাগজে গুটি গুটি অক্ষরে কাঁচা হাতের এলোপাতাড়িভাবে কয়েক লাইন লেখা। একটা চিঠি। ছোট্ট চিঠি।
'ম্যানোজার সাব,
আমি আর চাকরি করুম না। এই নিষ্ঠুর শহরে আমি আর থাকুম না। না বলে চলে যাওয়ার কারণে মাফ চাইছি। আমি বাড়ি চলে যাচ্ছি।
-খোকন'
চিরকুটটা পড়া শেষ। এখনো হাতে ধরে রাখা। আফিয়া তবুও ডাক দেয়, 'খোকন, ও খোকন...!' খোকন নেই বলে কোনো সাড়া শব্দ নেই। তারপর নিঃশব্দে কাগজটা রেখে দিয়ে আফিয়া ফিরে আসে।
একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে আফিয়ার ভেতর থেকে। মনে মনে বলে, এই শহরে কত হাজারও মানুষের বোবাকান্না চাপা পড়ে থাকে, শুধু এই শহরই জানে। আফিয়ার ঘরের জানালা দিয়ে ফিকে হওয়া আলোর রেখা ফুটে ওঠে। আফিয়া জানালার গ্রিল ধরে দূরের আকাশ দেখে। আকাশে পাখিরা ডানা ঝাপটিয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। মনে হয় তাদেরও আজ ঈদ। আফিয়া দেখছে আর ভাবছে, এরা তো মুক্ত। তবে আমরা কেউ কারও থেকে মুক্ত না, আবার সবাই সবার থেকে মুক্ত। তারপর নিজেকে নিজে প্রশ্ন করে, 'আচ্ছা আমি কি মুক্ত?'

লেখক : শিক্ষার্থী, জামিয়া ফরিদাবাদ, ঢাকা

প্রিয়বই প্রিয়লেখক

আহমাদুল্লাহ ফুআদ

বাস্তব জীবনের গল্প আর কাল্পনিক গল্প কখনো এক হয় না। কাল্পনিক গল্প গড়ে ওঠে হয়তো প্রেম-ভালোবাসার ওপর ভিত্তি করে অথবা কোনো রহস্যকে কেন্দ্র করে কিংবা বিশেষ কোনো চরিত্রকে ঘিরে। আর বাস্তব জীবনের গল্পে যেমন প্রেম-প্রীতি-ভালোবাসার ছোঁয়া থাকে তেমনি থাকে জীবনের উত্থান-পতন, জয়-পরাজয়, হাসি-কান্না, দুঃখ-বেদনা ও ভাঙা-গড়ার বাস্তব অভিজ্ঞতা। সবচেয়ে বড়কথা, বাস্তব জীবনের গল্প রচিত হয় জীবনের কঠিন বাস্তবতার আলোকে, যা মানুষকে বাস্তব জীবনে চলতে সাহায্য করে এবং সেটা তার জীবনের জন্য হয় প্রদীপ্ত মশাল। আর এজন্যই বাস্তব জীবনের গল্প সবসময়ই আমাকে বেশি টানে। আমাকে সাহস যোগায়, প্রাণিত করে। বাস্তব জীবনের গল্পসমৃদ্ধ যেসব বই আমাকে আলো দিয়েছে, মুগ্ধ

অন্যতম হলো উভয় বাংলার শ্রেষ্ঠ কবি আল মাহমুদের আত্মজীবনীগ্রন্থ 'যেভাবে বেড়ে উঠি'। আমার খুব প্রিয় এই বই

বইটিতে লেখক দক্ষ শিল্পীর মতো তাঁর জীবনের স্মৃতিগুলোর চিত্রাংকন করেছেন অত্যন্ত সুচারুরূপে মায়া-মমতা, প্রেম-ভালোবাসা মিশিয়ে। জীবনের ঘটনাগুলোকে সাজিয়েছন গল্পাকারে, সুখপাঠ্য করে। বাস্তব জীবনের চিত্রও যে এতো চমৎকারভাবে সুখপাঠ্য করে তুলে ধরা যায়, এই বই না পড়লে সেটা আমি বুঝতামই না।

লেখক তাঁর পূর্বপুরুষদের আলোচনা টেনে গ্রন্থের সূচনা করেছেন। এরপর একে একে বলে গেছেন তাঁর শৈশবজীবনের আনন্দময় গল্পগুচ্ছ। দাদির কোলে মাথা রেখে আকাশ দেখার গল্প। কৈশোরের শুরুতেই বোন হারানোর বেদনাদায়ক স্মৃতি। আরও বলেছেন, কায়দা-রেহেল হাতে প্রথম মক্তব পড়ার রোমাঞ্চকর অনুভূতিগুলো।

এইভাবে কৈশোর পেরিয়ে যৌবন এবং এর মাঝে ঘটা হাজারও ঘটনা বলে গেছেন সরলভাবে। স্কুলজীবনের সূচনাকথা। বই পড়ার অদম্য নেশার বর্ণনা এবং সর্বশেষে কবিতা লেখার শুরুর কথা এবং কবি হয়ে ওঠার গল্প।

কবি আল মাহমুদ আমার প্রিয় লেখকদের অন্যতম। তাঁর নাম ও লেখা–দুটোই আমাকে সমানভাবে টানে। যদিও তাঁর খুব বেশি লেখা পড়ার সৌভাগ্য আমার হয়নি তবুও যা পড়েছি তা-ই আমাকে মায়ার অদৃশ্য এক দড়িত বেঁধে রেখেছে। তাঁর লেখা আমাকে মুগ্ধ করে, আলোর মশাল হয়ে পথ দেখায়। তাই আমি আমার প্রিয় এই লেখকের প্রতি এবং তাঁর লেখার প্রতি অনিঃশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

প্রিয় লেখক কবি আল মাহমুদ ১৯৩৬ সালের ১১ জুলাই ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মৌড়াইল গ্রামের মোল্লাবাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মীর আবদুর রব ও মাতা রওশন আরা মীর-এর বড় সন্তান তিনি। সপ্তম শ্রেণিতে পড়ার সময় কিশোরগল্প 'তিতাস চরের ছেলে' দিয়ে তাঁর লেখালেখির সূচনা

কর্মজীবনে তিনি দৈনিক মিল্লাত, কাফেলা ও ইত্তেফাকে দীর্ঘকাল সাংবাদিকতা করেছেন। মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি অংশ নিয়েছেন। স্বাধীনতার পর গণকণ্ঠ পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে সাহসী ভূমিকা রাখেন। ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির প্রকাশনা বিভাগে নিযুক্ত হন এবং ১৯৯৩ সালে অবসর গ্রহণ করেন।

প্রিয় লেখক কবি আল মাহমুদ ছিলেন আধুনিক বাংলা কবিতার অন্যতম প্রধান কবি। কবিতা ছাড়াও তিনি গল্প-উপন্যাস ও প্রবন্ধ-নিবন্ধ রচনাতেও স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। তবে কবিতার ক্ষেত্রে তাঁর নিজস্ব বলয় সমগ্র বাংলা সাহিত্যের প্রেক্ষাপটেই গুরুত্বপূর্ণ।

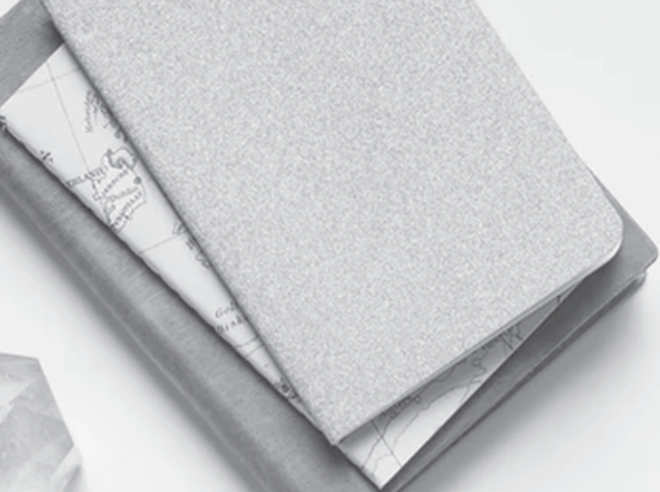
তাঁর কাব্যগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে, লোক লোকান্তর, সোনালী কাবিন, কালের কলস, উড়াল কাব্য ইত্যাদি। আর গল্পগ্রন্থের মধ্যে সৌরভের কাছে পরাজিত, গন্ধবণিক, ময়ূরীর মুখ ইত্যাদি। আর উপন্যাসের মধ্যে ডাহুকী, কবি ও কোলাহল, উপমহাদেশ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

আমার পরম প্রিয় এই লেখক ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯, শুক্রবারে তাঁর অগণিত ভক্তকে শোক-সাগরে ভাসিয়ে পরলোক গমন করেন। বড় সাধ ছিল প্রিয় লেখক, প্রিয় কবির সঙ্গে সাক্ষাত করব। সে-সাধ সাধ-ই রয়ে গেল! তাই ব্যথাতুর এই হৃদয়ে সান্ত্বনা দানের জন্য প্রিয় কবির দু'লাইন কবিতা উদ্ধৃত করতে চাই–

'কোনো এক ভোরবেলা, রাত্রিশেষে শুভ শুক্রবাওে
মৃত্যুর ফেরেস্তা এসে যদি দেয় যাওয়ার তাগিদ
অপ্রস্তুত এলোমেলো এ গৃহের আলো অন্ধকারে
ভালো মন্দ যা ঘটুক মেনে নেব এ আমার ঈদ'

আল্লাহ তাআলা প্রিয় লেখককে জান্নাতুল ফেরদাউস নসিব করুন।

শিক্ষার্থী, জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলুম মাদানিয়া, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা



(রোজনামচা)
হেডস্যারের সততা

শফিক খাবীর

২৬-৯-২০১৭
প্রায় তিন চার-দিন হলো রোজনামচায় কিছু লিখি না। আজকে যাইহোক একটু লিখতে বসেছি তাও আবার নিদারুণ আঘাতের বেদনায়। আজকের ঘটনাটি আমাদের ক্লাসের একজনকে নিয়ে। নামটা প্রকাশ করতে চাই না, বলার সুবিধার্থে ধরে নিলাম তার নাম ফাহিম। সে আমার থেকে বয়সে অনেক ছোট। সব সময় ভাই ভাই বলে ডাকত। সামনে পড়লেই সালাম-কালাম করত। নিদারুণ আঘাতটা পেয়েছি এই ছোটভাইয়ের ন্যাক্কারজনক একটা ঘটনা থেকে।
ক্লাস চলছে। প্রথম ঘন্টা প্রায় শেষের দিকে। মৌলভি স্যারের ক্লাস। ঈদুল আজহার বন্ধ দেবে আজ স্কুল। আমরা কীভাবে বন্ধটা কাটাবো, বন্ধের মাঝে কীভাবে পড়ালেখা করব, বার্ষিক পরীক্ষায় রেজাল্ট কীভাবে ভালো করব তা নিয়ে মৌলভি স্যার কথা বলছেন। এমন সময় স্যার ফাহিমের হাতের দিকে চেয়ে কথা বলা বন্ধ করে দিলেন এবং তাকে দাড়াতে বললেন।
স্যার বললেন, ‘তোমার হাতে এটা কী?’
ফাহিম বলল, ‘স্যার, একটা কাগজ।’
স্যার রাগের স্বরে বললেন, ‘কাগজটা আমার কাছে দাও।’ কিন্তু ফাহিম কিছুতেই দিতে চাচ্ছে না। অনেকক্ষণ জোরাজুরি করার পর স্যারের হাতে গেল কাগজটা। স্যার কাগজটা পড়লেন। একটি মেয়েকে লেখা প্রেমপত্র এটা। স্যার ফাহিমকে কিছু না বলে সরাসরি সহকারী প্রধান শিক্ষককে ডেকে আনলেন। তারপর তিনি হেডস্যারের কাছে নিয়ে গেলেন। স্যার তার হাতের লেখা যাচাই-বাছাই করে দেখলেন।
লেখাটা আসলে তার হাতেরই। অন্য ক্লাসের এক মেয়েকে লিখেছে। ওই মেয়েটা আবার স্কুলের অভিভাবক-সদস্যের মেয়ে। মেয়েটার কোনো অপরাধ নেই। ফাহিম রীতিমতো মেয়েটাকে বিরক্ত করে। ফাহিমক মেয়ে ভাই বলে ডাকে তারপরও...।

স্যার ফাহিমের মা-বাবাকে খবর দিয়ে আনলেন। ফাহিমের মা একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা আর বাবা কলেজের অধ্যাপক। স্যার সব কথা বের করে ফেললেন ফাহিমের কাছ থেকে। বিবরণটা হলো–ফাহিমের সাথে মেয়েটার কোনো সম্পর্ক নেই। ফাহিমই প্রতিদিন তাকে বিরক্ত করে। আচ্ছা যাই হোক, ফাহিমের বাবা-মা আসার পর স্যার তাদেরকে সরাসরি বলে দিলেন–'আপনার ছেলেকে নিয়ে যান। আমাদের স্কুলে আর রাখা হবে না।'
স্যার উনাদেরকে সব লেখা পড়ে শোনালেন এবং তার মায়ের কাছে দিলেন পড়ে শোনানোর জন্য। সাথে সাথে স্যার তাদেরকে কিছু কড়া কথাও বলে দিলেন। যেগুলো শুনে আমি দুঃখ পেলাম মানব বিবেকের স্পষ্ট বিচারে। দোষ করেছে ছেলে, বাবা-মা কেন তার ফল ভোগ করবেন? একমাত্র নৈতিক শিক্ষার কারণে। আপনারা দুজনেই শিক্ষিত কিন্তু আপনার ছেলেটাকে নৈতিকতা শেখাতে পারলেন না। ফাহিমের বাব-মা স্যারের কথার জবাবে একটা কথাও বললেন না। বিচারে এক পর্যায়ে সবাই উঠে চলে যাচ্ছেন। স্যারের এককথা, আমরা আপনার সন্তানকে রাখতে পারব না। নিয়ে যান।
ফাহিমের বাবা-মা স্যারের কাছে অনুরোধ জানানোর পরও কোনো লাভ হলো না। একসময় বাধ্য হয়ে ফাহিমকে নিয়ে চলে যাচ্ছেন তার বাবা। আমরাও যাচ্ছি তার পিছে পিছে। স্যারকে অনুরোধ করে তাকে ক্ষমা করানো যায় কি না। এমন সময় আবদুল হক সাহেবের সাথে দেখা। আমার অতি পরিচিত একজন ব্যক্তি। তিনি স্কুলপরিচালনা কমিটির সভাপতি। তাঁর কথায় হয় না এমন কোনো কাজ আমি দেখিনি। তাই ভাবলাম তিনি হয়তো কিছু করতে পারবেন। তাই তাঁকে সব খুলে বললাম।
তিনি বললেন, 'এক কাজ করো, আমি অফিসে গিয়ে বসি, তারপর তোমরা কয়েকজন মিলে আসো।'
আমরা সকলে গিয়ে হাজির হলাম অফিসে। স্যারের কাছে বললাম, 'ওকে ক্ষমা করে দিন। আর কোনোদিন করবে না।' স্যার বললেন, 'কিসের ক্ষমা? ওর কোনো ক্ষমা নাই। ওর স্বভাবের কারণে ওর বাবা-মা অপমানিত হয়েছেন তারপরও ওর চোখে একফোঁটা পানিও আসেনি। বেয়াদবি করে উল্টো আরও মুখের ওপরে কথা বলেছে, ওর কোনো ক্ষমা নাই। যাও, তোমরা যাও।'
অবশেষে আবদুল হক সাহেব বললেন, 'এবারের মতো ক্ষমা করে দিন, বাকি জীবনে আর করবে না।' হেডস্যার তাঁর কথার জবাবে বললেন, 'আপনি ভুলেও ওকে ক্ষমা করার জন্য অনুরোধ করবেন না। দেখবেন একদিন আপনি নিজেই আমাকে এসে বলবেন, আপনার মেয়ে অথবা ভাতিজিকে কেউ বিরক্ত করেছে আমি তার বিচার করিনি। না, না, না এই বিষয়ে ক্ষমার অনুরোধ জানিয়ে আমাকে লজ্জা দেবেন। তাছাড়া বরং এমন একটা ছেলে অথবা মেয়েকে নিয়ে আসেন, যে গরিব, টাকার কারণে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারছে না, স্কুলে পড়ার সামর্থ্য নেই, তখন দেখবেন আমি আপনার কোনো অনুরোধই ফিরিয়ে দেব না। আমি সর্বোচ্চ ক্ষমতা দিয়ে তাকে সাহায্য করব। কিন্তু এই অন্যায়কে ক্ষমা করার জন্য আমাকে অনুরোধ করবেন না দয়া করে।'
স্যারের কথায় সকলে চুপ। সবাই মাথা নিচু করে চলে আসলাম। ফাহিমকে তার শাস্তিস্বরূপ স্কুল থেকে বের করে দেওয়া হলো।
পুনশ্চ : রোজনামচার এই লেখাটি আমার স্মৃতির কলসিতে রয়ে যাবে আজীবন। মহান আল্লাহ তায়ালা ওইদিন সত্যবাদী, ন্যায়নিষ্ঠ আর সততার উচ্চতায় সমাসীন এক স্যারকে আমার মনে জায়গা করে দিয়েছিলেন। আমাদের সৌভাগ্য যে, তাঁকে আমরা হেডস্যার হিসেবে পেয়েছিলাম। যাঁকে হৃদয়ের গভীর থেকে সর্বদা জানাই শ্রদ্ধা আর সম্মান। যাঁর নৈতিকতার শিক্ষায় হৃদয়ের অপবিত্র ধুলাবালি সরাতে চেষ্টা করি এখনও, প্রতিনিয়ত।

কটিয়াদি, কিশোরগঞ্জ



গল্প বলি শোনো প্রিয় নবিজির

নাহিদা মুনতাসির

তিমির অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ। কোথাও আলোর দিশা নেই। একেবারেই অন্ধকার। নিকষ কালো আঁধার। চারপাশ ছেয়ে গেছে বর্বরতা আর হানাহানিতে, যুদ্ধ আর বিগ্রহে। মানুষ যেন মনুষ্যত্বহীন পশু।

ঠিক তখনই, আকাশের প্রাচীর ভেদ করে মক্কার মাটিতে দেখা দিলো এক আলোর রেখা। বলছি শোনো, প্রিয় নবিজির কথা। সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম। সর্বশেষ আর সর্বশ্রেষ্ঠ রাসুল তিনি। তিনি সমগ্র মানবজাতির জন্য উত্তম এবং সর্বোত্তম আদর্শ। তাঁর আচার-আচরণ, নিয়ম-নীতির মাঝে ছিল এতোটাই উদারতা, যে, বির্ধমী মানুষও তাঁকে খুব ভালোবাসতেন। তাঁর অনাড়ম্বর সহজ-সরল জীবনযাপন, তাঁর উদারতা,

দুস্থ অসহায় মানুষের প্রতি তাঁর ভালোবাসা এতটাই অকৃত্রিম ও আকর্ষণমণ্ডিত ছিল, জাহেলি যুগের সকল বর্বরতাকে কাটিয়ে তিনি তৈরি করেছিলেন এক সোনালি সময়। যেখানে ছিল না কোনো পাপাচার, কোনো অসার ক্রিয়াকলাপ। ছিল কেবলই উদারতা আর মহানুভবতা।

বিশিষ্ট ঐতিহাসিকদের মতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের মক্কা বিজয়ের পরের সময়টা ছিল ইসলামি ইতিহাসের জন্য মহাগৌরবের। যাকে বলে ইসলামের সোনালি যুগ।

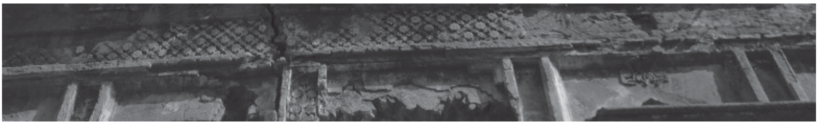
মহানবি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ছিলেন খুবই দয়ালু। কোনো দরিদ্র মানুষের দুঃখ-কষ্ট দেখলে তিনি কষ্টে জর্জরিত হতেন। তার কষ্ট দূর করার চেষ্টা করতেন। রাস্তায় কোনো কাটাবিদ্ধ বস্তু দেখলে বাচ্চাদের পায়ে বিঁধবে বলে তা সরিয়ে দিতেন। বৃদ্ধ-অসহায়দের সাহায্য করতেন। তাদের সম্মান করতেন। তাদের অসহায় জীবন-কষ্ট দেখে তিনি দুঃখে ভারাক্রান্ত হয়ে কেঁদে উঠতেন। তেমনি খুশির দিনেও সকল ধনী-গরিবের মাঝে ভেদাভেদ না রেখে আনন্দে কাটাতেন।

একবার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ঈদের নামাজের জন্য ঈদগাহে যাচ্ছিলেন। পথে এক শিশুকে দেখে তিনি থমকে দাঁড়ালেন। শিশুটি কাঁদছে। তার কাছে গিয়ে তিনি তাকে আদর করলেন। বুকে জড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কাঁদছ কেন?'

শিশুটি বলল, 'আমার বাবা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে মারা গেছেন। আমার মাও নেই। পৃথিবীতে আমার কেউ নেই।' শিশুটির কথা শুনে আমাদের প্রিয় নবি হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের মন দুঃখে ভারাক্রান্ত হয়ে হাহাকার করে উঠল। তিনি আর ঈদগাহে গেলেন না। শিশুটিকে নিয়ে বাড়ি ফিরে এলেন। আম্মাজান হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে বললেন, 'তোমার জন্য একটি পুত্র এনেছি। নাও, এবার তোমার ছেলেকে। তাকে ভালো জামা-কাপড় দাও, খাবার দাও।' হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা গভীর মমতায় ছেলেটিকে বুকে জড়িয়ে নিলেন, নিজের ছেলের মতো। তারপর তাকে গোসল করালেন। নতুন জামা-কাপড় পরিয়ে দিলেন তার গায়ে। নতুন জামা-কাপড় পেয়ে ছেলেটির মুখে হাসি ফুটে উঠল। সে তার মা-বাবা হারানোর দুঃখ ভুলে গেল। ঈদগাহে অন্যান্য শিশুরা তাকে দেখে অবাক হয়ে গেল। তারা বলল, 'এসব তুমি কোথায় পেলে?' ছেলেটি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের কথা বলল। তখন শিশুরা বলল, 'ইশ, আমরা যদি রাসুলুল্লাহর এমন আদর পেতাম আর এরকম সুন্দর জামা পেতাম!'

ঈদ মানেই আনন্দময় উৎসব। ঈদ মানে মুসলিম জাতির পবিত্র আনন্দধারার দিন। কিন্তু সবাই কি পারে সেই আনন্দ আর হাসিখুশি নিয়ে ঈদ কাটাতে? আমরা আমাদের চারপাশে তাকালে দেখি কত মানুষ অসহায়ভাবে কাটায় ঈদের দিন। অথচ আমাদের প্রিয়নবি হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম মানুষের মধ্যে ধনী-গরিবের কোনো ভেদাভেদ না রেখে সবার তরে আনন্দ বিলিয়ে দিতেন। তিনি বলেন, দরিদ্রকে যা দেয়া হয়, আল্লাহ তার চেয়ে অনেক বেশি দান করেন দাতাকে। ঈদের দিনে ধনীদের ওপর গরিবের একটা হক রয়েছে। তা হলো সাদাকাতুল ফিতর। আল্লাহ তাআলা এই কাজটিকে ওয়াজিব হিসেবে ঘোষণা করেছেন। ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সাদাকাতুল ফিতরকে অত্যাবশ্যক করেছেন। এবং সালাতের আগেই তা দিয়ে দিতে নির্দেশ করেছেন।'

দুস্থ-অসহায়ের পাশে দাঁড়ানো নবিজির অন্যতম আদর্শ। ঈদুল ফিতরকে সামনে রেখে চলুন না, আমরা নবিজির এই আদর্শকে আঁকড়ে ধরি, হাসি ফোটাই অনাহারী অর্ধাহারী আর দুস্থ মানুষের মুখে, তাদের নিয়েই যাপন করি এবারের ঈদ; বরং আগামীর প্রতিটা আনন্দময় দিন!



রঙিন শৈশব

ওমায়ের বিন ইসলাম

গ্রামেই আমার বেড়ে ওঠা। শৈশবের রঙিন দিনগুলো কেটেছে গ্রামের নির্মল আলো-বাতাসে। আমার শৈশবজুড়ে মিশে আছে পুকুর, গোল্লাছুট, হারিকেনের আলোয় নিভু নিভু রাতের বাজার, মৃদু বাতাসে আন্দোলিত সোনালি ধানক্ষেত আর মায়ের স্নেহের আঁচলে জড়ানো স্বপ্নীল রাত।

আমার শৈশব-স্মৃতিতে এখনো জ্বলজ্বল করে বিদ্যুৎহীন গ্রীষ্মের নির্ঘুম রাতগুলো। মায়ের গল্প শুনে ঘুমিয়ে পড়া আর মাঝরাতে জেগে উঠে বলা–'বাতাস করো মা, গরম লাগছে।' মা ঘুমাতেন না। তাঁর নকশা করা হাতপাখাটা সচল থাকতো। রাতে ঘুম ভেঙে গেলে মা বলতেন–'দেখো বাবা, আকাশে কত তারা! মায়ের সঙ্গে জানালা দিয়ে আকাশের দিকে তাকাতাম।

মায়ের হাত ধরে আকাশের তারা গুণতাম। মা বলতেন, 'ওই যে বড় তারাটা দেখছো বাবা, ওটা হবে তুমি।' অবাক বিস্ময়ে আমি বলতাম, 'তাহলে আমি তারার দেশে চলে যাব মা?' আমার অবুঝ প্রশ্ন শুনে মা হাসতেন। আমি নির্নিমেষ তাকিয়ে থাকতাম বড় তারাটার দিকে। বলতাম, 'তুমি ওটার চেয়েও সুন্দর মা!'

আমার কথা শুনে অপার্থিব কোনো আলোয় মায়ের মুখাবয়বটা উদ্ভাসিত হয়ে উঠত। মা বলতেন, তার আজীবন লালিত স্বপ্নের কথা–'যখন তুমি বড় হবে বাবা...' রাত ফুরিয়ে যেত, মায়ের স্বপ্নকথা শেষ হতো না।

জানো মা, আজও আমি গভীর রজনীতে ওই জ্বলজ্বল করা তারাটার দিকে তাকিয়ে থাকি। হৃদয়ের আঙিনায় ভেসে ওঠে তোমার মায়াবী মুখচ্ছবিটি। তোমার সেই সোনাঝরা হাসি! খুব মনে পড়ে তোমার কোলে মাথা রেখে ঘুমানো নির্ঘুম রাতগুলোর কথা। জানো মা, আজও যখন মেঘেঢাকা বর্ষার আকাশটা দ্রিম দ্রিম করে উঠে, পৃথিবীতে গাঢ় অন্ধকার নেমে আসে, ভয়ে আমি কুঁকড়ে যাই। কিন্তু মা, কারও আঁচলের নিচে লুকোতে পারি না। কিংবা যখন জোৎস্নারাতে চাঁদের অপার্থিব আলোয় পৃথিবীটা আলোঝলমলে হয়ে উঠে, আমি নিষ্পলক তাকিয়ে থাকি রূপার থালার মতো চাঁদটার দিকে আর দৌঁড়ে রুমে গিয়ে বলি–'দেখো মা, আকাশে কত বড় চাঁদ উঠেছে!'

পরম বেদনার সঙ্গে তখন অনুভব করি মা, এখানে তুমি নেই। আজ আমি তোমার থেকে অনেক দূরে মা; তোমার আজীবন লালিত স্বপ্নগুলোর পূর্ণতা দেবার জন্যে। মা, আজও রাতের আকাশের দিকে তাকালে উজ্জ্বল বড় তারাটা দেখতে পাই, কিন্তু তোমার কোলে শুয়ে গল্পশোনা রাতগুলো আর ফিরে আসে না।

মোহাম্মদপুর, ঢাকা

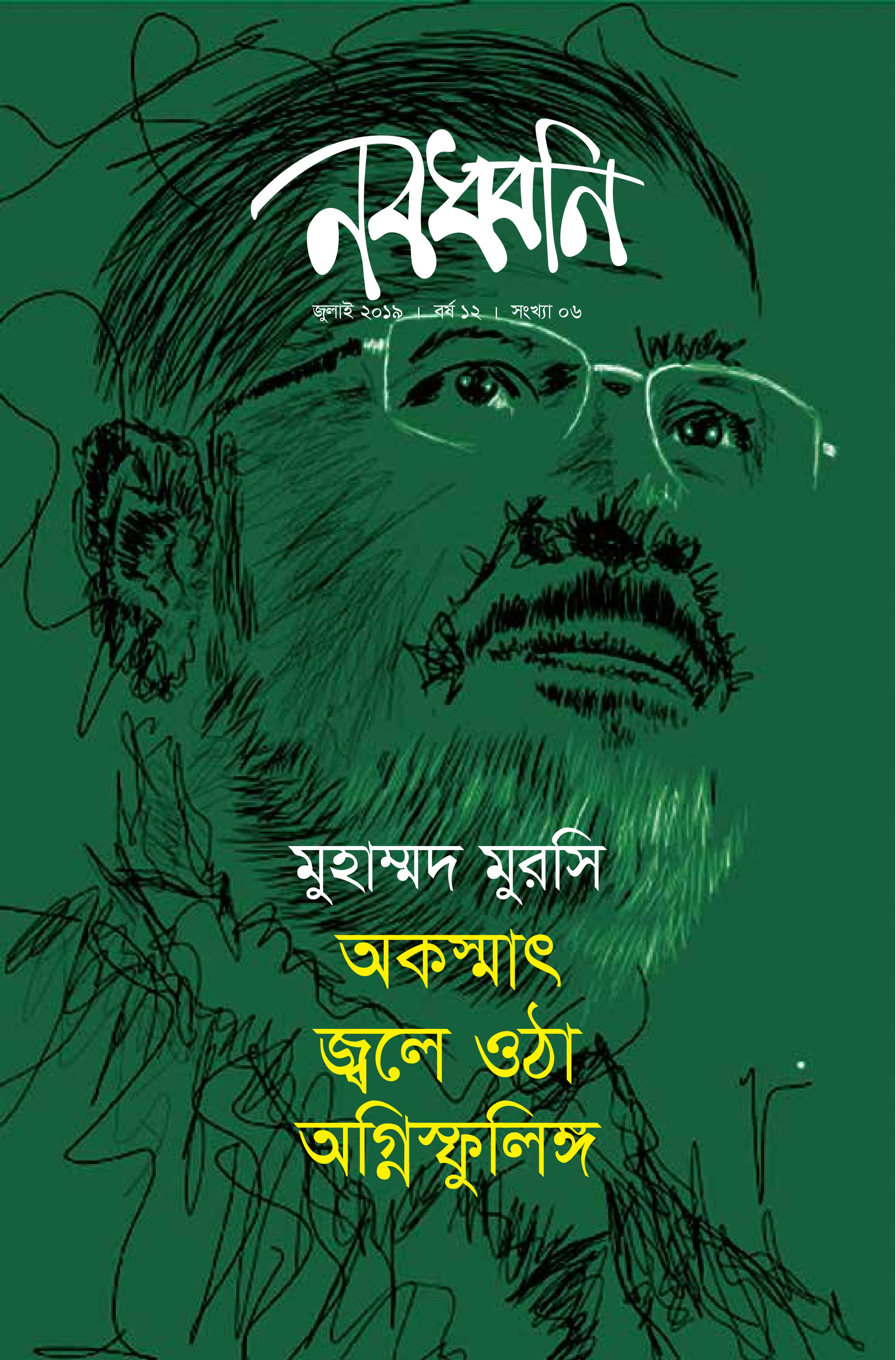


অবেলার ক্ষত

রাফিয়া জান্নাত রুহী

চুপসানো পালক নিয়ে জানালার গ্রিলে এসে বসল পাখিটা। একদম ভেজা। হাঁপাচ্ছে খুব। ওঠানামা করছে বুকটা।
বেচারা এ ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে কোথা থেকে যে জান হাতে নিয়ে উড়ে আসল, কে জানে! খাবার সংগ্রহ করতে নাকি বাসা বুননের কাঠ-খড়ি আনতেই গিয়েছিল। দেখে তো পাখিটাকে মেয়ে বলে মনে হচ্ছে। বাপের বাড়ি বেড়াতে গিয়েছিলো বুঝি! পেটটা ফুলে আছে কেমন। ক'দিনের মধ্যেই হয়তো ডিম দেবে। এলোমেলো চিন্তার জাল ছিঁড়ে আবারও মন দিলাম পাখিটার দিকে। কিছুক্ষণ বসে থাকল ওখানেই। দম নিলো হয়তো-বা। একটু সুস্থির হতেই উড়ে গেল নতুন বোনা ছোট্ট বাসাটায়। কিন্তু... তখনই বেড়িয়ে এলো লাফ দিয়ে। বিপদের গন্ধ পেলো নাকি!
ও মা, কেমন ওড়াউড়ি শুরু করল যে! ভাগ্যিস বিদ্যুৎ নেই, নইলে যেভাবে চরকিপাক খাওয়া শুরু করেছে পাখার বাড়ি খেয়ে নির্ঘাত মরত এতক্ষণে। ওহ, মনে পড়েছে, বুঝতে পারছি কেবল... এতো অস্থির পায়চারি কেন বেচারির! ভেতরটা মোচড় দিয়ে দিয়ে উঠল। ভাষাহীন নির্মম কষ্ট দানা বাঁধতে লাগল হৃদয়ের গহীনে। নিদারুণ মায়া ঝরতে লাগল পাখিটার জন্য। বেচারাকে হারিয়েছে ও। তাই তো এমন পাগলের মতো হণ্যে হয়ে খুঁজছে। কিন্তু তাকে পাবে কোথায়? সে তো নেই এ ধরায়। আয়ু তো ফুরিয়েছে ওর সেই সকালে। আর এখন সন্ধ্যার শেষ মুহূর্ত।
সকালে আমাদের ফ্যানের সাথে বাড়ি খেয়ে রঙিন এ জীবনের সমাপ্তি ঘটায় ছেলে পাখিটি। দেহ থেকে আলাদা হয়ে মাথাটা ছিটকে পড়েছিল দূরে। ছোট ছোট লাল ফোঁটার আল্পনা এঁকেছিল মেঝেতে। কাকের খাদ্য হিসেবে পাখিটা ফেলে দিয়েছি আমরা। রক্তের ফোঁটাগুলোও মুছে ফেলা হয়েছে তখনই। কিন্তু মুছে যায়নি এখনও নতুন ভাবাবেগের অতৃপ্ত ভালোবাসা, পাগলিনী পাখিটির মন থেকে।

বকচত্তর, মহাদেবপুর, নওগাঁ



নবধ্বনি

জুলাই ২০১৯ । বর্ষ ১২ । সংখ্যা ০৬

মুহাম্মদ মুরসি

অকস্মাৎ জ্বলে ওঠা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ

জুলাই ২০১৯ । বর্ষ ১২ । সংখ্যা ০৬

সম্পাদক
তামীম রায়হান

নির্বাহী সম্পাদক
সালাহউদ্দীন জাহাঙ্গীর

সহকারী সম্পাদক
হামমাদ রাগিব
নাজমুস সাকিব

প্রকাশনা ব্যবস্থাপক
আসাদুল্লাহ খান

সার্কুলেশন ব্যবস্থাপক
মুহাম্মদ ইসহাক খান

মূল্য ৫ টাকা মাত্র

নবধ্বনি । দোকান নং ২৭ । ২য় তলা । ইসলামী টাওয়ার ১১/১ বাংলাবাজার । ঢাকা
সার্কুলেশন : ০১৭৪৫ ১৩৯২১৫ । সম্পাদনা : ০১৭৪৫১৩৯২১৫

Email: nobodhoni@gmail.com web: noboprokash.com/nobodhoni

স্বাগত কলাম

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সর্বসাধারণের জন্য কর্মসংস্থান বেশ দুঃসাধ্য ব্যাপার। এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, কর্মসংস্থানের অভাবে ভুগছে দেশের প্রায় চার কোটি মানুষ। অর্থাৎ দেশের প্রায় চার কোটি মানুষ বেকার। এটা হেলাফেলার কথা নয়, অত্যন্ত দুশ্চিন্তার বিষয়।

আমরা প্রায়ই আমাদের দেশটাকে দরিদ্র বলে গালমন্দ করি। আমাদের এত সম্পদ ও সম্ভাবনা থাকার পরও কেন আমরা উন্নত দেশ হিসেবে বিশ্বের বুকে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারছি না–এমন দুশ্চিন্তা আমাদের প্রায়ই হতাশ করে তোলে। আমরা শাসকগোষ্ঠীকে নানা দোষারোপ করি, দেশের শাসনপদ্ধতি এবং রাজনীতি ও রাজনীতিবিদদের দোষারোপ করে মনের খেদ মেটাই।

কিন্তু সত্যিকারার্থে আমাদের ভাবা উচিত, কেন আমরা দরিদ্র! দেখুন, আমাদের দেশের মাটি পৃথিবীর সবচে উর্বর। এখানকার মাটিতে আপনি যা-ই রোপন করবেন সেটাই প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। আজ থেকে ২০ বছর আগে যেসব ফসলী জমিতে বিঘাপ্রতি পাঁচ মণ ধান হতো, এখন সে একই জমিতে ২০ মণ ধানের উৎপাদন হচ্ছে। কীভাবে হচ্ছে? বিজ্ঞানভিত্তিক কৃষি এবং ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট উদ্ভাবিত উন্নত জাতের ধানবীজের কারণে এই অসম্ভবকে সম্ভব করা গেছে। একই কথা বলা যায় আম উৎপাদনের ক্ষেত্রেও। ২০ বছর আগে উত্তরবঙ্গে যে পরিমাণ আম উৎপাদন হতো এখন তার চেয়ে দশ গুণ বেশি আম উৎপাদন হচ্ছে। ফসলের নতুন জাতের উ ড্ভাবন এবং পরিকল্পিত চাষের ফলে কৃষিতে দিনকে দিন আমরা উন্নতি করতে পারছি। এটা আশার কথা!

তো, এ ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত থাকতে পারি যে কৃষি এবং খাদ্যে আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণ।

আমাদের দেশে প্রাকৃতিক সম্পদেরও কমতি নেই। কিন্তু মনে রাখার মতো ব্যাপার হলো, আমাদের দেশে লোকসংখ্যার ঘনত্ব। অন্যান্য দেশে যেখানে এক বর্গমাইল এলাকায় ১০০ মানুষ বসবাস করে, আমাদের দেশে সেখানে ২ হাজার মানুষের বাস। যেমন, সৌদি আরব তার সোয়া ৮ লাখ বর্গমাইলের বিশাল মানচিত্র নিয়ে মাত্র সোয়া তিন কোটি নাগরিককে লালন-পালন করছে, অথচ তার চেয়ে দশ গুণ ছোট ভূমি নিয়ে বাংলাদেশকে পালতে হচ্ছে দশ গুণ বেশি নাগরিক! এই হিসাবটা আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন।

এই হিসাবের ফলে আমাদের দেশে লোকসংখ্যার ঘনত্ব বেশি এবং দিন দিন এই সংখ্যা বেড়েই চলেছে। কিন্তু আমাদের দেশের মানচিত্রের আকার কিন্তু বাড়ছে না। আবার উন্নয়নের নাম দিয়ে অধিক হারে কল-কারখানা নির্মাণের ফলে কমে আসছে আবাদী ও বসবাসের জমিও। মোটকথা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক যত উন্নয়ন হচ্ছে,

লোকসংখ্যা বাড়ছে সমানতালে। ফলে উন্নয়নের সুফল সঠিকভাবে আমরা ভোগ করতে পারছি না।

মড়ার ওপর খাড়ার ঘাঁয়ের মতো রয়েছে কর্মসংস্থানের অভাব, অর্থাৎ বেকারত্ব। চার কোটি মানুষ ঘরে, রাস্তা-ঘাটে, এখানে সেখানে বেকার অবস্থায় ঘুরছে। করার মতো কোনো কাজ নেই তাদের হাতে। হতে পারে সে শিক্ষিত আবার অশিক্ষিতও, দিনশেষে তাদের হাতে উপার্জিত কোনো অর্থ আসছে না। কিন্তু তাদের জন্য ঠিকই বরাদ্দ হচ্ছে প্রতিদিনকার প্রয়োজনীয় উপকরণ। যদি এই চার কোটি মানুষ দৈনিক ২০ হাজার টাকা করে উপার্জন করতে সক্ষম হতো তাহলে দেশের অর্থনীতি অন্যদিকে মোড় নিতো। কিন্তু বর্তমান কর্মসংস্থান পরিস্থিতিতে সেটা সম্ভব নয়। কেননা আমাদের কর্মসংস্থানের সংকট সর্বত্র বিরাজমান।

এখন কাজের কথা হলো, এই বিপুল সংখ্যক মানুষকে কীভাবে কাজের মধ্যে নিয়ে আসা যায়। যদি তাদের এমন কোনো কাজের মধ্যে নিয়ে আসা যায় যার ফলে মাসিক তারা ২০ থেকে ৪০ হাজার বা তদূর্ধ্ব টাকা আয় করতে পারবে, তাহলে খুব শিগগিরই সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ করা যাবে। বলছি, রাষ্ট্রের একটা লোকও যদি বেকার না থাকে, সবার জন্য সম্মানজনক জীবিকার ব্যবস্থা করা যায় তাহলে ছোট মানচিত্রের দেশ হওয়া সত্বেও আমরা উন্নয়নের পথে দ্রুত এগিয়ে যেতে পারবো।

সেটা কীভাবে সম্ভব? চলুন, ব্যাপারটা দেখে নেয়া যাক।

প্রথমত, দেশে আপনি নতুন করে খুব বেশি একটা কর্মসংস্থান তৈরি করতে পারবেন না। যদি কর্মসংস্থান বাড়াতে যান তাহলে নানামুখী সংকট তৈরি হবে। যেমন, নতুন কর্মসংস্থান তৈরি করতে গেলে দেশের আবাদী জমি নষ্ট হবে, কল-কারখানার ধোঁয়া, বর্জ্য, বিষাক্ত পদার্থ নিঃসরণের ফলে পরিবেশের মারাত্মক ক্ষতি সাধিত হবে, যা এর মধ্যেই হয়ে চলেছে। কারখানার বর্জ্য মিশে নদীর পানি বিষাক্ত হওয়ার ফলে নদীতে মাছ কমে গেছে, ইটভাটা কিংবা অন্যান্য ধোঁয়া উদ্গিরণকারী কারখানার ফলে গাছে ফল ধরছে কম এবং ফসলে অধিক হারে পোকার সংক্রমণ দেখা দিচ্ছে; ফলে ফসলের উৎপাদনে ঘাটতি দেখা দিচ্ছে। বাতাসে বিষাক্ত পদার্থ মিশে বাতাসও দূষিত হয়ে গেছে; ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্যান্সার, হৃদরোগ, দীর্ঘমেয়াদী নানা রোগ-বালাইয়ের প্রাদুর্ভাব দেখা দিচ্ছে। এ-সবই হচ্ছে ছোট দেশে অধিক হারে কল-কারখানা নির্মাণের ফলে। ঘনবসতিপূর্ণ দেশ হওয়ার কারণে পরিবেশ দূষণের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হচ্ছে এ দেশের সাধারণ মানুষের। নানা রোগ-ব্যাধি নিয়ে দৌড়াতে হচ্ছে হাসপাতালে।

সুতরাং নতুন করে কল-কারখানা নির্মাণের প্রবণতা হ্রাস করে এমন কোনো অর্থকরী উদ্যোগ নিতে হবে যে উদ্যোগের ফলে আমাদের আবাদী জমি যেমন কমবে না তেমনি বিষাক্ত বর্জ্য নিঃসরণের ফলে পরিবেশও দূষিত হবে না। আর সে উদ্যোগ হতে পারে একমাত্র তথ্য-প্রযুক্তি খাতে আমাদের কর্মসংস্থান বাড়ানোর দ্বারা। তথ্য-প্রযুক্তির জন্য আমাদের নতুন করে খুব বেশি কল-কারখানা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন নেই। ফলে আমাদের আবাদী জমি বেচে যাবে এবং প্রাযুক্তিক পণ্য ব্যবহারের ফলে পরিবেশও খুব একটা দূষিত হবে না। একটা উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটা খোলাসা করি। যেমন ধরুন, একজন উচ্চমাধ্যমিক পাশ ছেলে তার বাড়িতে বসে আউটসোর্-

র্সং করে। অর্থাৎ, সে ঘরে বসেই আমেরিকা বা অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন প্রাযুক্তিক প্রতিষ্ঠানের কাজের মাধ্যমে উপার্জন করতে পারে। তাহলে তাকে অফিসেও যেতে হবে না বা কোনো গার্মেন্টস বা কারখানায়ও কাজ করতে হবে না। যে চার কোটি লোক বেকার অবস্থায় রাস্তায় রাস্তায় চাকরির জন্য হন্যে হয়ে ঘুরছে, তাদের প্রত্যেকে যদি কম্পিউটার মাধ্যমের কোনো না কোনো কাজে দক্ষ হয় তাহলে সে নিজের ঘরে বসেই মাসকাবারি ২০ থেকে ৫০ হাজার টাকা অনায়াসে উপার্জন করতে পারবে। এ জন্য প্রয়োজন হলো অধিক হারে প্রযুক্তি শিক্ষা বাড়ানো এবং তথ্য-প্রযুক্তি ক্ষেত্রে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা। এর সুফল পেতে হলে দ্রুত তথ্য-প্রযুক্তিকে তৃণমূল পর্যায়ে পৌঁছে দিতে হবে। প্রতি বাড়িতে কম্পিউটার যেন থাকে–সে ব্যবস্থা করতে হবে। এ জন্য সরকারের উচিত হবে সব ধরনের প্রযুক্তিপণ্য থেকে কর প্রত্যাহার করা। প্রয়োজন হলে ভর্তুকি দিয়ে প্রযুক্তিপণ্য সহজলভ্য করা। উচ্চ মাধ্যমিক পাশ একজন শিক্ষার্থী যেন পড়াশোনার পাশাপাশি কম্পিউটার মাধ্যমের যে কোনো কাজে দক্ষতা অর্জন করতে পারে, সেটা নিশ্চিত করতে হবে।

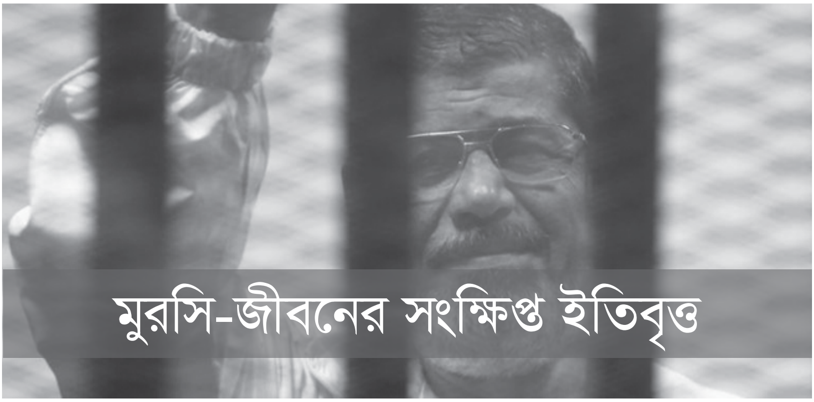
চীনকে দেখে আমরা শিক্ষা নিতে পারি। চীনের প্রতিটি শহরই শুধু নয়, প্রতিটি গ্রাম প্রযুক্তির 'সিলিকন ভ্যালি' হয়ে উঠেছে। তাদের দেশেও প্রায় দেড় শ কোটি জনসংখ্যা, কিন্তু তারা প্রত্যেক নাগরিককে প্রযুক্তিশিক্ষায় দক্ষ করে গড়ে তোলার ফলে প্রত্যেকে দেশের সম্পদ হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে। যেখানে আমাদের দেশে জনসংখ্যা আমাদের বড় বোঝা হয়ে দেখা দিয়েছে। কারণ আমাদের চাকরিপ্রত্যাশী লোকজন শিক্ষা সনদের দিকে যতটা আগ্রহী, দক্ষতা অর্জনের দিকে কেউই তেমন আগ্রহী নয়। অথচ দক্ষতা ছাড়া আগামী পৃথিবীতে কেউ টিকে থাকতে পারবে না।

আরেকটি প্রয়োজনীয় কথা হলো প্রযুক্তি খাতে বিনিয়োগ বাড়ানো। সরকারিভাবে বিনিয়োগের কথা আমরা বলছি না, আমরা বলছি ব্যক্তি পর্যায়ে বিনিয়োগ বাড়ানোর ব্যাপারে। প্রযুক্তিতে দক্ষ কেউ যদি প্রযুক্তিনির্ভর নতুন কোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে আগ্রহী হয় তাহলে তার জন্য সহজ শর্তে বিনিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে। উন্নত দেশগুলোতে এমন শত শত প্রতিষ্ঠান রয়েছে যারা নতুন উদ্যোক্তাদের জন্য বিনা শর্তে অর্থ বিনিয়োগ করে থাকে। শর্ত থাকে, যদি তোমার ব্যবসা লাভবান হয় তাহলে আমরা সেখান থেকে এত শতাংশ লভ্যাংশ নেবো, আর যদি তোমার ব্যবসায় লোকসান হয় তাহলে বিনিয়োগের অর্থ তোমাকে ফেরত দিতে হবে না।

এমন শর্তের ফলে দেখা যায়, যে কোনো ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা নতুন নতুন ব্যবসা শুরু করার দুঃসাহস দেখাতে পারে, ব্যবসার নতুন কোনো পদ্ধতি তারা অবিষ্কার করতে পারে। আমাদের দেশেও এ ধরনের বিনিয়োগ সহজসাধ্য করা প্রয়োজন। কেবল সম্ভাবনা থাকলেই হবে না, সে সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর জন্য সঠিক পরিচর্যাও বিশেষভাবে জরুরি।

মোটকথা, যারাই নতুন কিছু করার চিন্তা করছেন তারা হতাশ হবেন না। প্রযুক্তি আগামী পৃথিবীর সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করবে। প্রযুক্তির মাধ্যমেই নির্ধারিত হবে আগামী পৃথিবীর ভবিষ্যত। এ কারণে প্রাযুক্তিক দক্ষতা অর্জন আমাদের জন্য আবশ্যিক যেমন, তেমনি তৃণমূল পর্যায়ে প্রযুক্তি ছড়িয়ে দেবার উদ্যোগও আমাদের নিতে হবে।

সালাহউদ্দীন জাহাঙ্গীর, নির্বাহী সম্পাদক, নবধ্বনি



মুরসি-জীবনের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত

পুরো নাম মুহাম্মদ মুরসি ইসা আইয়াত। ১৯৫১ খ্রিষ্টাব্দের আগস্ট মাসে উত্তর মিশরের শারকিয়া জেলার আদওয়া গ্রামে জন্ম। গ্রামে থাকতেই কুরআন হিফজ শেষ করেন এবং সেখানেই প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। উচ্চশিক্ষার জন্য মিশরের রাজধানী কায়রোতে আসেন এবং কায়রো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৭৫ সালে প্রকৌশল বিষয়ে স্নাতক ও ১৯৭৮ সালে একই বিষয়ে সম্মান ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৭৮ সালে তিনি উচ্চ শিক্ষার্থে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যান। ১৯৮২ সালে ইউনিভার্সিটি অফ সাউথ ক্যালিফোর্নিয়াতে মুহাম্মাদ মুরসির প্রকৌশল বিষয়ে গবেষণা শেষ হয় এবং তিনি ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন।

কর্মজীবন

এর আগে স্নাতক শেষ করে মুহাম্মদ মুরসি কিছুদিন কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে পাঠদান করেন। ১৯৭৫-৭৬ সালে মিশর সেনাবাহিনীতে সেবা দান করেন। ১৯৮২ সালে ক্যালিফোর্নিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটি, নর্থরিজে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন এবং ১৯৮৫ সালে শারকিয়া প্রদেশের জাকাজিক বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেয়ার উদ্দেশ্যে ক্যালিফোর্নিয়ার অধ্যাপনার চাকরি ছেড়ে মিশরে ফিরে আসেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়েই তিনি ২০১০ সাল পর্যন্ত অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া লিবিয়ান ফাতেহ বিশ্ববিদ্যালয়েও তিনি খণ্ডকালীন অধ্যাপক হিসেবে পাঠদান করেন।

আদর্শিক ও রাজনৈতিক জীবন

ছাত্রজীবন থেকেই মুহাম্মদ মুরসি ইসলামি ধারা গ্রহণ করেন। ১৯৭৭ সালে ইখওয়ানুল মুসলিমিনে যোগ দেন। ইখওয়ানের সাংগঠনিক কাঠামোর সাথে জড়িত ছিলেন তিনি। ১৯৯২ সালে ইখওয়ান রাজনৈতিক শাখা গঠন করলে এর সদস্য হিসেবে কাজ করেন এবং পরবর্তী সময়ে সর্বোচ্চ কমিটির সদস্য হিসেবে নিযুক্ত হন। পাশাপাশি সবসময় সামাজিক ও সেবামূলক কাজে জড়িত থাকেন। ইসরাইলের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার বিরুদ্ধে সবসময় সোচ্চার ছিলেন।

মুহাম্মদ মুরসি ২০০০ সালে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। সাংগঠনিকভাবে তিনি ইখওয়ানুল মুসলিমিনের সদস্য হলেও নির্বাচনে তাঁকে ইখওয়ানের অন্যান্য নেতাদের মতো আইনের মারপ্যাঁচের কারণে স্বতন্ত্রভাবে লড়তে হয়। কারণ, হোসনি মুবারকের শাসনামলে ইখওয়ান মিশরের প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে নিষিদ্ধ ছিল। সংসদীয় মেয়াদে মুহাম্মদ মুরসি তাঁর ধারার নেতা হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হন এবং সংসদে ভূমিকার জন্য বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সাংসদ হিসেবে নির্বাচিত হন। এ সময় বেশ কয়েকবার গ্রেপ্তার হন তিনি। এর মধ্যে ২০০৬ সালে বিচারক নিয়োগে

অনিয়মের প্রতিবাদে ডাকা বিক্ষোভ থেকে তাঁকে আটক করা হয় এবং প্রায় সাত মাসের মতো তিনি বন্দী ছিলেন।

আরব বসন্ত

আরব বসন্ত শুরু হলে ২০১১ সালের ২৮ জানুয়ারি অপর ২৪ ইখওয়ান-নেতার সাথে মুরসিও গ্রেপ্তার হন। তবে দুই দিন পর তিনি কায়রোর জেল থেকে পালিয়ে যান। দুর্গম ওদিউন নাতরুন কারাগার থেকে পলায়নের ঘটনা ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়। মিশরের তৎকালীন বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে কারাপ্রহরীরা পলায়ন করলে স্থানীয় জনতা তাঁদেরকে মুক্ত করেন। সিসি ক্ষমতা দখলের পর মুরসিকে এই ঘটনায় মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়।

মিশরের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ২০১২

মূলত দলীয় উপনেতা ও রাজনৈতিক প্রধান খাইরাত আল-শাতেরই ছিলেন ইখওয়ানুল মুসলিমের মূল রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী। কিন্তু একটি আদালত প্রচারণা শুরুর আগে শাতের-সহ একাধিক প্রার্থীকে নির্বাচনে অযোগ্য ঘোষণা করলে ইখওয়ানের রাজনৈতিক শাখা থেকে প্রার্থী হিসেবে মুহাম্মদ মুরসির নাম উঠে আসে, যিনি মূলত সংগঠনটির দ্বিতীয় মনোনয়ন ছিলেন। পরে ইখওয়ানের রাজনৈতিক শাখা ফ্রিডম অ্যান্ড জাস্টিজ পার্টি মুরসিকে তাদের প্রার্থী হিসেবে চূড়ান্ত করে।
ইখওয়ানের এক দলত্যাগী জনপ্রিয় নেতার অংশগ্রহণ সত্ত্বেও মুহাম্মদ মুরসি ২৩ মে ২০১২-এর নির্বাচনে ২৫.৫ শতাংশ ভোট পান, যা ছিল সর্বোচ্চ। প্রথম পর্বের পর মুহাম্মদ মুরসি ও আহমেদ শফিক দ্বিতীয় পর্বের চূড়ান্ত ভোটাভুটির জন্য মনোনীত হন। দ্বিতীয় পর্বের নির্বাচনের আগে মুহাম্মদ মুরসি মিশরের সর্বস্তরের মানুষের প্রতি আহমেদ শফিকের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়ার আহ্বান জানান।
মুরসির রাজনৈতিক দল আহমেদ শফিককে, যিনি সাবেক বিমান বাহিনী প্রধান এবং হোসনি মুবারাকের অধীনের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাকে ক্ষমতাচ্যুত মুবারকের রক্ষাকর্তা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয় এবং বলা হয়, শফিক নির্বাচিত হলে মিশরের ক্ষমতাচ্যুত স্বৈরশাসন নতুন জীবন পাবে। ২৪ জুন ২০১২ তারিখে মুরসিকে দ্বিতীয় পর্বের নির্বাচনে জয়ী, অর্থাৎ রাষ্ট্রপতি হিসেবে নির্বাচিত ঘোষণা করা হয়। এর পরপরই মুরসি ইখওয়ান ও ফ্রিডম অ্যান্ড জাস্টিস পার্টি থেকে আনুষ্ঠানিক অব্যাহতি গ্রহণ করেন।

প্রতিবিপ্লব

এক বছর যেতে না যেতেই মুরসি-সরকারের প্রতিরক্ষামন্ত্রী আবদেল ফাত্তাহ সিসি মুরসির বিরুদ্ধে অনাস্থা জানান এবং সিসির নেতৃত্বে সাময়িকভাবে সংবিধান স্থগিত করা হয়। বিচারপতি আদলি মনসুর অন্তবর্তীকালীন প্রধান হিসেবে নিযুক্ত হন। জনবিক্ষোভের অজুহাতে সামরিক বাহিনী মুরসির সরকারকে বরখাস্ত করে।
মুরসিকে আটক করে অজানা স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। কয়েক মাস পর আদালতে হাজির করে বিভিন্ন ধরনের অভিযোগ আনা হয় তাঁর বিরুদ্ধে। যার মধ্যে কারাগার থেকে পলায়ন ও হামাসের সাথে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগ অন্যতম। এ দুটো অভিযোগে তাঁকে ২০1৫ সালে যথাক্রমে ফাঁসির রায় ও যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রদান করা হয়।

ইন্তেকাল

গত ১৭ জুন ২০১৯, সোমবার তাঁকে আদালতের সামনে হাজির করা হয়। তিনি আদালতের কাছে বক্তব্য দানের অনুমতি চান। তিনি বলেন, 'আমার কাছে গোপন কিছু তথ্য আছে, মিশরের নিরাপত্তার কথা ভেবে তা আমি প্রকাশ করছি না।' বক্তব্য দানের মাঝপথে তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বিরতিতে চলে যাওয়া হয়। বিরতির সময়েই তিনি জ্ঞান হারিয়ে ঢলে পড়েন। আসামি সেলে তিনি একাই ছিলেন। পাশের সেল থেকে চিৎকার চেচামেচি শুরু করা হয়। আধা ঘণ্টা পর উদ্ধার করে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ততক্ষণে তিনি পাড়ি জমিয়েছেন মহাকালের যাত্রায়।

ইন্টারনেট অবলম্বনে লিখেছেন হামমাদ রাগিব



প্রেসিডেন্ট মুরসির ক্ষমতারোহণ ও শাসনকাল

আমজাদ ইউনুস

যৌবনের সোনা-রোদ্দুর দুপুর থেকে ইখওয়ানের সংগ্রাম-সাধনার উদ্দীপ্ত মিছিলে নিজেকে যুক্ত করেন রাষ্ট্রনায়কসুলভ বিচক্ষণতার বৈশিষ্ট্যে অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্ব কুরআনে হাফেজ ড. মুহাম্মদ মুরসি রহমতুল্লাহি আলায়হি। ব্যক্তিগত জীবনাচরণে ছিলেন বিনয়ী, কোমল ও দরবেশ স্বভাবের। ভাড়া বাসায় থাকতেন। সরকারি ও প্রশাসনিক কাজগুলো রাষ্ট্রপতি প্রাসাদে করলেও রাষ্ট্রপতির জন্য নির্ধারিত কোনো প্রাসাদেই তিনি থাকেননি। ব্যক্তিগতজীবনে যতটা বিনয়ী ও কোমল, প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে ছিলেন ততোটা অতুল প্রতাপ ও অমিত প্রভাবশালী। দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে তিনি দুরন্ত ক্ষিপ্রতায় নিজের যোগ্যতা, দূরদর্শিতা ও অসাধারণ নেতৃত্বগুণে নিজেকে উদ্ভাসিত করেছেন। আধুনিক শিক্ষা ও ধর্মতত্ত্বেও সমান পারদর্শী ছিলেন এই নেতা। ধর্মপালনে ছিলেন বেশ তৎপর। জামাত-সহকারে নামাজ আদায় করতেন। মাঝে মাঝে জুমার নামাজে খুতবা দিতেন। আজানের সময় চাঙ্গা বক্তব্যও থামিয়ে দিতেন মুহূর্তে। নীরবে আজানের উত্তর দিতেন।

২০০০ সালে মিশরে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন মুরসি। সাংসদ হিসেবে ২০০৫ সাল পর্যন্ত মিশরের সংসদে বহাল ছিলেন। ২০১১ সালে আরব বসন্তের সময়ে প্রশংসনীয় ভূমিকা রাখার কারণে মুসলিম ব্রাদারহুডের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি হিসেবে জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। ২০১১ সালে মিশরে গণ-আন্দোলন শুরু হলে তা নস্যাৎ করতে মুরসিসহ

মুসলিম ব্রাদারহুডের ২৪ নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়। এতে আন্দোলন আরও তীব্র হয়। মুরসিকে মুক্ত করতে কারাগারে হামলা করে ক্ষুব্ধ জনতা। কারাগারের দেয়াল ভেঙে তাঁকে মুক্ত করে নিয়ে আসে তারা। এর আগেও স্বাধীন বিচারব্যবস্থার দাবিতে সংঘটিত আন্দোলনে জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেপ্তার হন মুরসি। এ সময় তাঁকে সাত মাস জেলে রাখা হয়।

২০১২ সালে ইখওয়ানের বিকল্প রাষ্ট্রপতি প্রার্থী হিসেবে মুরসির নাম ঘোষণা করা হয়। পরে মূল প্রার্থী বাদ পড়লে তিনি নির্বাচন করেন এবং ২০১২ সালের জুনে মিশরের প্রথম গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি হন। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য মনোনয়নে ড. মুরসি ছিলেন ফ্রিডম অ্যান্ড জাস্টিস পার্টির (ব্রাদারহুডের রাজনৈতিক শাখা) বিকল্প প্রার্থী বা দ্বিতীয় পছন্দ। দু'দফায় অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে অল্প ভোটের ব্যবধানে বিজয়ী হবার আগে মিশরে তাঁর আহামরি কোনো যশ-খ্যাতি ছিল না। ইখওয়ানের প্রধানও তিনি ছিলেন না।

প্রেসিডেন্ট মুরসির প্রথম ভাষণ

নির্বাচনে এক কোটি ৩২ লাখ একশ' ২১ ভোট প্রাপ্তির খবর প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাহরির স্কোয়ারে সমবেত জনতার উদ্দেশে ভাষণ দিলেন। যা বিশ্বের বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রচারিত হয়েছে। তাঁর সেই ভাষণ ছিল মৌলিক, সুচিন্তিত, সুগভীর প্রজ্ঞাপ্রসুত। দীপ্ত পায়ে মঞ্চে উঠে উদ্দীপ্ত কণ্ঠে সেদিন বলেছিলেন–'আমি কোনো দলের নই, মিশরীয়দের প্রেসিডেন্ট। জাস্টিস অ্যান্ড ফ্রিডম পার্টির পদ ও কেন্দ্রীয় দায়িত্ব থেকে এখনই ইস্তফা দিলাম। এ মিশর সকল মিশরীয় অধিবাসীর। অধিকারের প্রশ্নে সকলে সমান। আমার কোনো অধিকার নেই, আছে কেবল দায়িত্ব। মিশরের খ্রিস্টান, মুসলমান–সব মিশরীয়কে জাতীয় সংস্কৃতি ও উন্নয়নের অংশীদার হতে হবে। নাগরিক মর্যাদা, স্বাধীনতা, মানবাধিকারের সম্মান, নারী ও শিশুদের জন্য সকলকে কাজ করতে হবে। আমরা সারা বিশ্বকে শান্তির বার্তা শোনাতে চাই। বহির্বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে মিশরের সম্পাদিত সকল চুক্তি ও অঙ্গীকার আমরা রক্ষা করব। বাইরের কোনো রাষ্ট্রকে আমরা নিজেদের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার সুযোগ দেবো না। আমরাও কারও আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করব না। যদি আল্লাহর রহমত বর্ষিত না হতো, আমাদের সম্মানিত শহীদ ও আহত ভাইয়েরা যদি বুকের তাজা রক্ত না ঢেলে দিতেন তবে আমি মিশরের প্রেসিডেন্ট হিসেবে আপনাদের সম্মুখে এভাবে ভাষণ দেয়ার সুযোগ পেুাম না। সকল শহীদের উদ্দেশে বিনম্র সালাম জানাচ্ছি। তাঁদের উত্তরাধিকারী ও পরিবার-পরিজনকেও সালাম জানাই। তাঁদের প্রিয়জনেরা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। যেসব মহান লক্ষ্য সামনে রেখে বিপ্লব হয়েছে তা অর্জনে আমাদের যাত্রা অব্যাহত থাকবে...।'

ড. মুহাম্মদ মুরসি শপথ গ্রহণের পর প্রথম দিন যখন আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন তখন নিরাপত্তা বাহিনী মসজিদের দরোজায় একটি বৈদ্যুতিক দরোজা বসিয়েছিল যাতে প্রবেশকারী প্রত্যেক মুসল্লির স্বয়ংক্রিয় তল্লাশি হয়ে যায়। রাষ্ট্রপতি মুরসি এই পদক্ষেপের খবর পেয়ে তাৎক্ষণিকভাবে তা বাতিল করে দেন। জামিউল আজহারের খতিব ড. মুরসিকে ইসলামের উদ্দীপ্ত সোনালি ঐতিহ্য অনুসারে উপদেশ, ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা আমিরুল মুমিনিন হজরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রা.-এর কর্মনীতি ও সেবামূলক সুশাসনের বিবরণ এবং এর আলোকে ড. মুহাম্মদ মুরসির কাছে জাতির প্রত্যাশার কথা তুলে ধরে এমন জ্বালাময়ী ভাষণ দিলেন যে, মুরসি অঝোর ধারায় কাঁদলেন। নিজের ওপর অর্পিত দায়িত্ব এবং জাতীয় প্রত্যাশার ব্যাপারে তিনি যথেষ্ট ওয়াকিবহাল।

জনসাধারণের সাথে মুরসির উদারতা

'আমার এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না যে, আমার চিরচেনা মিশর এমনও হতে পারে! আমি তো স্বপ্নেও ভাবিনি যে, আমি মিশরের রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাত করতে পারব। যিনি মিসরের পঞ্চম রাষ্ট্রপতি, তবে মিশরীয় জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত প্রথম রাষ্ট্রপতি।

আমার সামনে একজন সহজ-সরল, বিনয়ী আর বিনম্রভঙ্গিতে আলাপরত ব্যক্তিকে দেখে আমি দ্বিগুণ বিস্ময়ে থ বনে গেলাম। তখন আমার বিস্ময়ের সীমা ছিল না যখন দেখি মিশরের রাষ্ট্রপতির জামার আস্তিন ধরে একটি ছাত্রী বলছেন–"আমাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করুন!" মিসরের প্রেসিডেন্ট বলছেন, "আমি হাজির হয়েছি।" তাঁর স্বর ছিল চাপা, অথচ তাঁর দুইপাশে তখন পূর্ণ ভাবগাম্ভীর্যের সঙ্গে উপবিষ্ট ছিলেন ঊর্ধ্বতন সামরিক কর্মকর্তাগণ। রাষ্ট্রপতি যখন আমার দিকে দৃষ্টি দিলেন, তখন আমি প্রায় অনুভূতিরহিত। তিনি জানতে চাইলেন, "আপনার কি আর্থিক সহায়তা দরকার না ব্যক্তিগত ভাতা? আপনার প্রয়োজন যাই হোক আমাকে নির্দ্বিধায় বলুন।" আমি বললাম, "আমার নিজের জন্য কিছু চাই না, আগুনে পুড়ে যাওয়া আমার ছেলেটিকে হাসপাতালে ভর্তি করাতে চাই, যে বিষয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ রাজি হচ্ছে না।" প্রেসিডেন্ট বললেন, "আমি রোগীকে দেখতে চাই। আমাকে তাঁর সঙ্গে দেখা করিয়ে দিন।" গাড়িতে শায়িত আমার ছেলেকে নিয়ে আসা হলে তিনি তার কপাল চুম্বন করলেন। তার জন্য পুনর্বার পানীয় আনালেন। অতঃপর হাসপাতাল পৌঁছানোর জন্য সরকারি গাড়ি আনতে নির্দেশ দিয়ে আমার সঙ্গে একজন সরকারি কর্মকর্তাও দিলেন। আমি এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না, আমাদের মিশর এমনও হতে পারে!'

এ ঘটনার পর লোকটি দুহাত তুলে হৃদয় উজাড় করে ড. মুহাম্মদ মুরসির জন্য দোয়া করলেন।

ঘটনাটি বার্ন ইউনিটের চিকিৎসক ডা. মুহাম্মদ সামির তাঁর ফেসবুকে বর্ণনা করেন। লোকটির যুবক ছেলের শরীরের ৪০%-এরও বেশি জ্বলে গিয়েছিল। ডা. সামির বলেন, 'রোগীর অবস্থা দেখে আমি তাকে ভালো চিকিৎসার জন্য বড় কোনো হাসপাতালে নিয়ে যাবার পরামর্শ দিয়েছিলাম, যেখানে তার প্রয়োজনীয় সুবিধাদি মিলবে এবং পর্যাপ্ত যন্ত্রপাতি সুলভ। আমি ভর্তি করতে অপারগতা প্রকাশের কারণে তারা হাসপাতাল প্রধানের কাছে ছুটে যায়। তিনি আমাকে ডেকে পাঠালে সেখানেও আমি রোগীর অবস্থা তুলে ধরতে গিয়ে একই কথা বলেছি। হাসপাতাল থেকে চলে যেতে যেতে রোগীর আত্মীয়-স্বজন ধমকের সুরে বলছিল, কেবল স্বাস্থ্যমন্ত্রণালয় নয়, মিশর সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ে তারা আমার ব্যাপারে অভিযোগ দেবেন। তাদের কথা শুনে আমি স্মিত হাসছিলাম কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই আমার হাসি হারিয়ে গেল। চোখের সামনে দেখলাম রাষ্ট্রপতির দফতর থেকে পাঠানো একটি গাড়ি বারান্দায় দাঁড়ানো। গাড়ি থেকে নেমে আসা একজন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা আগুনে পোড়া সেই রোগীকে দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি এবং সর্বোচ্চ সেবা নিশ্চিত করার রাষ্ট্রীয় নির্দেশনা শোনালেন। এখন আমার পক্ষে তাকে ভর্তি না করিয়ে আর কোনো উপায় থাকল না।'

ডা. সামির আরো লিখছেন, 'পুরোদমে গুরুত্বের সঙ্গে রোগীর চিকিৎসা আরম্ভ হয়েছে। এরই ফাঁকে একদিন আমাকে পুড়ে যাওয়া এই যুবকের পিতা মিশরের রাষ্ট্রপতির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের ইতিবৃত্ত শোনালেন। এবং পরে এটাও বলতে ভুললেন না যে, "আমার ছেলের যথাযথ চিকিৎসায় কোনো গাফলতি হলে আমিই প্রথম তাহরির স্কোয়ারে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভে নেমে পড়ব।"'

গুরুত্বপূর্ণ কোনো এক অনুষ্ঠানে যাচ্ছেন, গাড়িতে বসে আছেন মুরসি। একজন বয়স্ক বিধবা কায়রোর সড়কে শুয়ে আছেন। মুরসির তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তা এড়ায়নি। বিধবার পাশে এসে গাড়ি থামল। গাড়ি থেকে রাষ্ট্রপতি মুরসি নেমে এসে তাঁর কাছে বসলেন। তাঁকে প্রশ্ন করলেন, কেন তিনি রাস্তায় থাকেন? মহিলা জানান, তিনি বাড়িভাড়া পরিশোধ করতে না পারায় বাধ্য হয়ে বাসা ছেড়ে দিয়ে এখন রাস্তায় এসে আবাসন গড়েছেন। মুরসি জানান, তার নেতৃত্বাধীন মিশরের সড়কে কেউ এভাবে থাকতে পারবেন না। তিনি তাৎক্ষণিকভাবে প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের সেই মহিলার জন্য আবাসনের ব্যবস্থা করার নির্দেশ দেন। সেই সাথে সরকারের তরফ থেকে মহিলার জন্য একটি ভাতা সরবরাহ করার নির্দেশ দেন। এই সেই মুরসি। জনসাধারণের জন্য যাঁর উদারতা ছিল বিশাল আকাশের ন্যায়। অবাধে ও সহজে একজন সাধারণ মানুষ চাইলেই

পেয়ে যেত তাঁর আশ্চর্য স্নিগ্ধ সাক্ষাত। যেকোনো শ্রোতা মুহূর্তে বিমুগ্ধ হতো তাঁর অন্তরঙ্গ মধুর মজমায়।

মুরসির পতন

২০১৩ সালের জুলাই পর্যন্ত ১ বছর ক্ষমতায় থাকাকালে মুরসির বিরুদ্ধে মিশরকে ইসলামিকরণের 'অভিযোগ' ওঠে। সে সময় তাঁর ইসলামপন্থি সংবিধান প্রণয়নের চেষ্টা গ্রহণযোগ্য হয়নি ধর্মনিরপেক্ষ ও উদারপন্থীদের কাছে। তাঁর দ্রুত অর্থনৈতিক সংস্কারের উদ্যোগও সমালোচিত হয়।

এ সময় মুরসি ইরানের সঙ্গে মিশরের সম্পর্ক জোরদার করতে উদ্যোগ নেন। নির্যাতিত-নিপীড়িত ফিলিস্তিনিদের পাশে দাঁড়ান। দখলদার ইসরাইল কর্তৃক অবরুদ্ধ গাজাবাসীর জন্য মিশরের সীমান্ত খুলে দিয়ে জেরুজালেম ও আল-আকসা মসজিদের ওপর ফিলিস্তিনিদের নিয়ন্ত্রণের পক্ষে অবস্থান নেন। এসব পদক্ষেপ যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইলকে পীড়া দেয়। ফলে বৈশ্বিক রাজনীতির এক সূক্ষ্ম ষড়যন্ত্রের বেড়াজালে আটকা পড়েন মুরসি।

এরই মধ্যে তাঁর বিরুদ্ধে দেখা দেয় আভ্যন্তরীণ বিক্ষোভ। তাঁর এক বছরের শাসনকালে হোসনি মোবারক আমলের যেসব ঊর্ধ্বতন সেনা কর্মকর্তাদের রাষ্ট্রের গুরত্বপূর্ণ পদ থেকে সরিয়ে দেন তিনি, তারা তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়।

আরব বসন্তের সময় গণতন্ত্র-বিরোধী বেশ কিছু সেনাকর্মকর্তাকে বিচারের মুখোমুখি করতে চেষ্টা করেছিলেন মুরসি। আর এসব কারণে সেনাবাহিনীর শক্তিশালী অংশ মুরসির বিরুদ্ধে ফুঁসে ওঠে। আর এতে ইন্ধন যোগানো ও কলকাঠি নাড়ানোর কাজটি করে ইসরাইল ও আমেরিকা।

২০১৩ সালে মুরসির বিরুদ্ধে শুরু হয় ব্যাপক বিক্ষোভ। তাহরির স্কয়ারেই মুরসির বিরুদ্ধে জড়ো হয় মানুষ। এই সুযোগে সংবিধান স্থগিত করে মুরসিকে ক্ষমতা থেকে উৎখাত করে কারাগারে বন্দী করে দেশটির সেনাবাহিনী। আর এসবের পেছনের মূল হোতা ছিল মুরসির হাত ধরে দেশটির সেনাপ্রধান হওয়া আবদেল ফাত্তাহ সিসি। মুরসিকে কারাবন্দী করে মসনদ দখল করে সে। ক্ষমতায় থাকার সময় 'আদালত অবমাননা'র অভিযোগ আনা হয় মুরসির ওপর। এরপর ২০১৬ সালের জুন মাসে তথ্য পাচারের এক মামলায় তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করে মিশরের নিম্ন আদালত।

মুরসি ও তাঁর সহযোগী ইখওয়ানের কয়েকজন নেতা কাতারে রাষ্ট্রের গোপন তথ্য পাচার করে জাতীয় নিরাপত্তাকে ঝুঁকির মুখে ফেলেছিলেন—এমন অবান্তর অভিযোগে মুরসিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডাদেশ দেয় আদালত।

এভাবেই থেমে যায় মজলুম নেতা ড. মুহাম্মদ মুরসির রাজনৈতিক সংগ্রামী জীবনের বিক্ষুব্ধ স্রোতধারা। একটি সবুজ তীরে পৌঁছার আগে ডুবে যায় তাঁর জীবনতরী। ওমর রাদি.-এর সেই স্রোতবাহী নীলনদ ও নবি মুসা আলায়হিস সালামের মিশর ফিরে পেতে সংগ্রাম ও সাধনায় ব্রতী হয়েছিলেন যে রাষ্ট্রনায়ক, মাঝপথে তাঁকে থামিয়ে দেওয়া হয় গভীর ষড়যন্ত্রের মধ্য দিয়ে। কারা অন্তরীণে নীরবে চলে যান সংগ্রামী নেতা মুরসি, কিন্তু চিরকাল তাঁর চরিত্র-প্রভায়, জ্ঞান-গরিমায় ও বীর্য-মহিমায় সবাই মুগ্ধতার সরোবরে অবগাহন করে কুঁড়িয়ে নেবে অমূল্য জীবনের সওগাত।

লেখক : শিক্ষার্থী, জামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম



হাসানুল বান্না থেকে প্রেসিডেন্ট মুরসি জীবনের নজরানা আর কত?

রাসেল মাহফুজ

মদের বার, পতিতালয়, অশ্লীলতা আর পশ্চিমা সংস্কৃতির সয়লাবে আধুনিক মিশর যখন ফেরাউনি সভ্যতাকে সাদরে আমন্ত্রণ জানাচ্ছিল, ফেরাউনের প্রেতাত্মারা যখন ইসলামি সভ্যতার মহান স্তম্ভগুলো আঘাতের পর আঘাতের মাধ্যমে ঝাঁজরা করে দিচ্ছিল, আজান, নামাজ, তেলাওয়াত বন্ধ করার মধ্য দিয়ে ভূপৃষ্ঠ থেকে ইসলামের নাম-নিশানাটুকুও মুছে ফেলার সকল আয়োজন যখন সম্পন্ন করছিল তারা, তখনই উম্মাহর মুক্তি ও স্বাধীনতার বার্তা নিয়ে ২২ বছর বয়সে হাজির হয়েছিলেন ইমাম শহীদ হাসানুল বান্না রাহিমাহুল্লাহ। ১৯২৮ সালে মাত্র ছয়জন সঙ্গী নিয়ে তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ইখওয়ানুল মুসলিমিন বা মুসলিম ব্রাদারহুড। শায়েখ আল বান্না মানুষের বাড়িতে বাড়িতে, অফিসে, প্রতিষ্ঠানে, ফুটপাতে–এককথায় সবখানে দাওয়াতি অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলেন সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ। মাত্র পাঁচ বছরের মাথায়

এই সংগঠনটি মিশরের প্রভাবশালী একটি দলে পরিণত হয়। ইসমাইলিয়াতে প্রতিষ্ঠা করা হয় ইখওয়ানের কেন্দ্রীয় কার্যালয়। পাশাপাশি নির্মাণ করা হয় একটি মসজিদ। কিছুদিন পর কেন্দ্রীয় এই কার্যালয় ঘিরে গড়ে তোলা হয় বালক ও বালিকাদের জন্য ধর্ম ও কর্ম শিক্ষার সমন্বিত সিলেবাসের পৃথক দুটি স্কুল। আরও কিছুদিন পর শরীরচর্চা আর নির্মল বিনোদনের জন্য প্রতিষ্ঠা করা হয় একটি ক্লাবঘর। বেকার ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের জন্য গড়ে তোলা হয় কুটির শিল্পপ্রতিষ্ঠান। পর্যায়ক্রমে প্রতিষ্ঠা করা হয় হাসপাতাল ও বিভিন্ন ধরনের কারখানা। হাসানুল বান্নাহর নেতৃত্বে এভাবেই দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছিল ইখওয়ান। একপর্যায়ে দেশের গণ্ডি পেরিয়ে ফিলিস্তিন, বাহরাইন, ইরান, ইরাক, ইসরাইল, জর্ডান, সৌদিআরব, কুয়েত, লেবানন, সিরিয়া, ইয়েমেন, আলজেরিয়া, লিবিয়া, মরক্কো, সোমালিয়া, সুদান, তিউনিসিয়া, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, মালদ্বীপ, আফগানিস্তান, তাজাকিস্তান ইত্যাদি দেশেও ছড়িয়ে পড়ে ইখওয়ানের কমবেশি কার্যক্রম।

ইখওয়ানুল মুসলিমিনের এই অগ্রযাত্রাকে কোনোভাবেই মেনে নিতে পারেনি পশ্চিমা ও তাদের মদদপুষ্ট স্বৈরাচারী সরকার। প্রতিষ্ঠার মাত্র ২০ বছরে দুই হাজার সাংগঠনিক শাখা আর ২০ লাখ নেতাকর্মীর বিশাল জনশক্তি দেখে তাদের মাথা ঘুরছিল। উপায়ান্তর না দেখে শত্রুশক্তি আশ্রয় নিল অন্ধকার গলিপথে। ১৯৪৮ সালের ৮ ডিসেম্বর রাত এগারোটায় ইখওয়ানুল মুসলিমিনকে নিষিদ্ধের সংবাদ প্রচারিত হয় রেডিওতে। শায়েখ আল বান্না তখন সহকর্মীদের নিয়ে কায়রোতে অবস্থিত কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে বসে খবর শুনছিলেন। ঘোষণার পরপরই পুলিশ বাহিনী ইখওয়ানের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ছুটে আসে। গ্রেপ্তার করে উপস্থিত সবাইকে। তবে হাসান আল-বান্নাকে ছেড়ে দেয়। এখানেই শেষ নয়, ইখওয়ানের সকল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। তাদের পরিচালিত স্কুল, কলেজ, ক্লাবঘর, হাসপাতাল এবং কারখানাগুলোও বন্ধ করে দেয়া হয়। সেই থেকে ইখওয়ানের নেতাকর্মীরা আর শান্তিতে ঘুমোতে পারেনি। শহর থেকে শহরতলি এমনকি গ্রামাঞ্চল থেকেও তাদের ধরে ধরে নিয়ে এসে ভরা হতো কারাগার। কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে চালানো হতো অকথ্য অত্যাচার। তখনও ইখওয়ানের 'মুরশিদে আম' শায়েখ আল বান্নাকে গ্রেফতার করেনি সরকার। কেন গ্রেপ্তার করেনি? এর উত্তরে শায়েখ বলতেন, 'আমাকে গ্রেপ্তারর না করার অর্থ হচ্ছে যে আমার মৃত্যুপরোয়ানা জারি হয়েছে।' সত্যিই দেখা গেল, মাত্র কিছুদিন পরে তাঁকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়।

মিশর সরকার আল বান্নার মতো সিংহকে জ্যান্ত রাখতে ভয় পাচ্ছিল। দুর্ভেদ্য প্রাচীরঘেরা কারাগারেও তাঁকে আটকে রাখার সাহস করতে পারছিল না। তাঁকে হত্যার পরিকল্পনা করল তারা। ১৯৪৯ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি রক্তিম এক সন্ধ্যা। শুববানুল মুসলিমিনের কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে বের হয়ে ট্যাক্সিতে উঠতে যাবেন তিনি, অমনি অদৃশ্য থেকে গুলি এসে তাঁর বুক ঝাঁজরা করে দেয়। রক্তে রঞ্জিত হয়ে যায় পিচঢালা পথ। মুহূর্তেই ভারী হয়ে যায় মিশরের আকাশ-বাতাস। মুসলিম বিশ্বে নেমে আসে শোকের ছায়া। কুফফার বিশ্ব তখন ফেটে পড়ছিল উল্লাসে। সহকর্মীরা তাঁকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানেই তিনি শাহাদাতের অমিয় শরাব পান করে মাওলার সান্নিধ্যে পাড়ি জমান চিরকালের জন্য।

জ্যান্ত আল বান্নাকে যেমন ভয় করেছিল মিশরের তাগুত শাসকগোষ্ঠী, মৃত আল বান্নাকেও ভয় করেছিল তেমনি। বাসায় তাঁর লাশ পাঠিয়ে চারদিক ঘেরাও করে রেখেছিল পুলিশবাহিনী। নিকটাত্মীয় ছাড়া কাউকে তারা বাসায় প্রবেশ করে শেষবারের মতো দেখতেও দেয়নি। লক্ষ লক্ষ মানুষের বুক অশ্রুজলে ভেসে যাচ্ছিল, কিন্তু জানাজায় তাদের শরিক হতে দেয়নি। ট্যাংক আর সাঁজোয়া বাহিনীর কড়া নিরাপত্তা বেষ্টনীতে তাঁর লাশ নিয়ে দাফন করা হয় কবরস্থানে। এভাবেই তারা উম্মাহর এক জাগ্রত সিংহকে মাটিচাপা দিয়ে কিছুদিনের জন্য ক্ষ্যান্ত হয়।

শায়েখ আল বান্নার মৃত্যু হলেও তাঁর মিশনের

মৃত্যু হয়ে যায়নি। ইখওয়ানের হাজার হাজার কর্মী উম্মাহর মুক্তি ও স্বাধীনতার মিশনকে বুকে ধারণ করে আর খেলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেতনাকে লালন করে এগিয়ে যেতে থাকে। কেবল এজন্যই ইখওয়ান-নেতাকর্মীদের উপর নেমে আসে সীমাহীন জুলুম-অত্যাচার আর নির্যাতন-নিপীড়ন। যার পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা দেওয়া কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। অন্ধকার প্রকোষ্ঠে কী হচ্ছিল, কে জানে! কত হাজার ইখওয়ানিকে নির্মমভাবে জবাই করেছিল জেলের অভ্যন্তরে, তার ইয়ত্তা নেই।

শহীদ আল বান্নার পরে ইখওয়ানুল মুসলিমিনকে যিনি আগলে রেখে আন্তরিকভাবে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তিনি সাইয়েদ কুতুব রাহিমাহুল্লাহ। সাইয়েদ কুতুবের উপর যেভাবে নির্যাতন করা হয়, তা শুনে অবিশ্বাস্যই মনে হয়।

সাইয়েদ কুতুব দুবার গ্রেপ্তার হন। ১৯৫৪ সালে একবার, ১৯৬৫ সালে আরেকবার। ৫৪ থেকে ৬৫–এই ১১ বছরের মধ্যে তিনি মাত্র আট মাস ছিলেন জেলের বাইরে। সামান্য এই মুক্ত-জীবনে তিনি শুধু নির্মল হাওয়া খেয়ে কাটাননি। বিখ্যাত তাফসিরগ্রন্থ 'তাফসির ফি জিলালিল কুরআন'-সহ তাঁর বেশকিছু অসমাপ্ত কাজকে সমাপ্ত করেন। জেল-জীবনে তিনি অনুধাবন করেন, যেনতেন কাজ দিয়ে ইসলামি শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। তাঁর ভাষায়–'ইসলামি শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা নিয়ে সার্বিকভাবে প্রস্তুতিগ্রহণ করতে হবে। যেনতেন আন্দোলন দিয়ে কখনো ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়।' তাঁর অমর সৃষ্টিকর্ম তাফসিরগ্রন্থ এবং 'আগামী বিপ্লবের ঘোষণাপত্র' ইত্যাদি বইগুলো দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনারই একেকটি অংশ। এগুলো পড়ে অনুধাবন করা যায়, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন অলীক কল্পনামাত্র। ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামি পদ্ধতিরই অনুসরণ প্রয়োজন। আব্রাহামিজমের ইসলামাইজেশন করে কস্মিনকালেও 'খেলাফত আলা মিনহাজিন নবুওয়াহ' ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়।

সাইয়েদ কুতুব প্রথম যখন গ্রেপ্তার হন, তাঁকে প্রদান করা হয় ১৫ বছরের কারাদণ্ড। ১০ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর ইরাকের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী আবদুস সালামের সুপারিশে তাঁকে মুক্তি দেয়া হয়। ১৯৬৫ সালের ৩০ জুলাই ইখওয়ানের আরেক উচ্চপদস্থ নেতা, সাইয়েদ কুতুবের ভাই মুহাম্মদ কুতুব গ্রেপ্তার হন। প্রতিবাদস্বরূপ তিনি একটি বুকলেট প্রকাশ করে ছড়িয়ে দেন। মিশরের পরিস্থিতি আবারও হয়ে যায় উত্তপ্ত। ইসলামি বিপ্লব-প্রত্যাশীরা চারদিক থেকে গর্জে ওঠে। সেই অপরাধে আগস্টের ৯ তারিখ দ্বিতীয়বার গ্রেপ্তার হন সাইয়েদ কুতুব। শুধু সাইয়েদ কুতুবই নন, তাঁর সাথে গ্রেপ্তার করা হয় তাঁর আপন দুই বোন আমিনা কুতুব ও হামিদা কুতুব এবং ৭০০ মহিলাসহ ২০ হাজারেরও অধিক ইখওয়ান নেতাকর্মীকে।

অতঃপর ১৯৬৬ সালের ২১ আগস্ট জালিম শাহির মর্জিমাফিক ট্রাইব্যুনাল নামক নাট্যমঞ্চ থেকে রায় ঘোষিত হয়। এতে অভিযুক্ত দেখানো হয় ৪৩ জন নেতাকর্মীকে। তাঁদের মধ্যে সাতজনকে মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রদান করা হয় হয়। এঁরা হলেন–সাইয়েদ কুতুব, মুহাম্মদ ইউসুফ, আবদুল ফাত্তাহ ইসমাঈল, শবরি আরাফাহ, আহমদ আবদুল মজিদ, আবদুল আজিজ ও আলি উসমাভি।

তারপর ২৯ আগস্ট। গভীর রজনীতে উম্মাহর এই মহান সিংহকে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলানো হয়। রাব্বে কারিম তাঁকে শহীদ হিসেবে কবুল করুন। জান্নাতে দান করুন উচ্চ মর্যাদা।

ইখওয়ানুল মুসলিমিনের প্রতিষ্ঠা ছিল হারানো খেলাফত উদ্ধার করার জন্য। যদিও তাদের অনুসৃত কর্মপন্থায় তা উদ্ধার হবে কি না, তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দিহান অনেকের সাথে এই আমিও। এই বিষয়টি একটু পরেই পরিষ্কার করি। তার আগে ইখওয়ানের অনুসৃত পন্থায় এগিয়ে যাওয়ার ওপর খানিকটা আলোকপাত করা যাক।

ইখওয়ান সরাসরি ভোটের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে আহমদ মাহেরের সময়। হাসানুল বান্না তখন ইসমাইলিয়ার নির্বাচনী এলাকা থেকে অংশগ্রহণ করেন এবং বিজয়ও লাভ করেন। কিন্তু এই নির্বাচনকে ইংরেজরা মেনে নিতে পারেনি। তারা খুব নারাজ হয়। তাদের খুশি করতে মিশর সরকার সাজানো

একটা অভিযোগের ভিত্তিতে এই নির্বাচনকে বাতিল ঘোষণা করে। দ্বিতীয়বার যখন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তখন সেনাবাহিনীর মাধ্যমে এমন সব অপুৎপরতা চালানো হয় যে কারণে ইখওয়ানের একজন প্রার্থীও বিজয়ের মুখ দেখেননি।

জামাল আবদুন নাসের ছিলেন আরব জাতীয়তাবাদী নেতা। ইখওয়ান ছিল তাঁর প্রতি কিছুটা দুর্বল। সেজন্য নাসেরের বিপ্লবে ইখওয়ানের যথেষ্ট সমর্থন ছিল। নাসের যখন রাষ্ট্রপতি হন ইখওয়ান ছিল তাঁর পাশে। কিন্তু এই সম্পর্ক স্থায়ী হয়নি, অতি দ্রুত ভেঙে যায়। রাষ্ট্রপতি জামাল নাসের ইখওয়ানের ওপর ক্ষেপে যান। ধরপাকড় চালান সংগঠনের নেতাকর্মীদের ওপর। এরই মধ্যে জামাল নাসেরের ওপর কে বা কারা চালায় এক হত্যা-প্রচেষ্টা, দোষ চাপিয়ে দেওয়া হয় ইখওয়ানের ওপর। এই অভিযোগের ভিত্তিতে নিষিদ্ধ হয় ইখওয়ান। গ্রেপ্তার হয় হাজার হাজার নেতাকর্মী। গ্রেপ্তার অভিযান চলে প্রায় ১৫ বছর, ১৯৭০ সাল পর্যন্ত।

১৯৭১ সালে ক্ষমতায় আসেন আনোয়ার সাদাত। সাদাতের সাথে ইখওয়ানের সম্পর্ক ছিল বটে, তবে তা ছিল চরম উত্তেজনাপূর্ণ। রাষ্ট্রপতি সাদাত ইখওয়ান-নেতাকর্মীদের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন ঠিক, কিন্তু নিষিদ্ধ করে দেন ইখওয়ানুল মুসলিমিনকে। ইখওয়ান কিন্তু বসে থাকেনি। তারা তাদের কাজ নিজস্ব গতিতে চালিয়ে যায়। ১৯৭৯ সালে আনোয়ার সাদাতের সঙ্গে ইখওয়ানের ঝগড়া লাগে তুমুল। কারণ, সাদাত চরম পর্যায়ের গাদ্দারি করেন। ফিলিস্তিন ও আরব মুসলিমদের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে ইসরাইলের সঙ্গে ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি-স্বাক্ষর করেন। যে চুক্তির ফলশ্রুতিতে ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে জোরদখলের মাধ্যমে চেপে বসা ইহুদিরা মুক্তি-আনন্দে হেসে ওঠে। তারা তখন প্রথমবারের মতো একঘরে অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়। এই চুক্তির জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে মিশরের সেনাবাহিনী প্রতিবছরই পেু ১২০ কোটি ডলার ঘুষ।

তারপর ১৯৮১ সাল। চলছিল সামরিক কুচকাওয়াজ। টেলিভিশন ক্যামেরার চোখের সামনে প্রেসিডেন্ট সাদাতকে গুলি করে হত্যা করেন তরুণ সেনা কর্মকর্তা খালিদ ইস্তাম্বুলি। সেদিন থেকে অবসান ঘটে আনোওয়ার সাদাতের অত্যাচারময় যুগের। কিন্তু মোটামুটি এই শান্ত পরিবেশ খুব বেশিদিন থাকেনি। ১৯৮৪ সালে ক্ষমতায় আসেন হোসনি মুবারক। তিনি আবার ইখওয়ানুল মুসলিমিনকে একটি ধর্মীয় সংগঠন হিসেবে স্বীকৃতি দেন। কিন্তু রাজনৈতিক দল হিসেবে তালিকাভুক্ত করতে অস্বীকৃতি জানান। ইখওয়ানের নেতারা বসে থাকেননি। তাঁরা স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। ২০০৫ সালের সাধারণ নির্বাচনে ইখওয়ান মিসরের পার্লামেন্টের এক পঞ্চমাংশ আসন লাভ করতে সক্ষম হয়। এসময় প্রথমবারের মতো ইখওয়ান রাজনৈতিক সফলতা লাভ করে। ২০০৫ সালের ভোটব্যাংকে সঞ্চিত পুঁজি নিয়ে ২০১০ সালের পার্লামেন্ট নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে ইখওয়ান। প্রথম পর্যায়ে বিপুল ভোটে জয়ীও হন ইখওয়ানের প্রার্থীরা। কিন্তু ব্যাপক কারচুপির অভিযোগে দ্বিতীয় পর্যায়ের নির্বাচনে আর অংশ নেয়নি তারা।

২০১১ সালের ফেব্রুয়ারি। সহসাই শুরু হয় আরব বসন্তের গণআন্দোলন। আন্দোলনের একপর্যায়ে চাপের মুখে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন স্বৈরশাসক হোসনি মুবারক। তিনি সেনাবাহিনীর কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। ইখওয়ানুল মুসলিমিন তখন কৌশলী অবস্থান নেয়। তারা এবার ইখওয়ানের রাজনৈতিক শাখার নাম দেয় ফ্রিডম অ্যান্ড জাস্টিস পার্টি। এই ব্যানারে তারা চালিয়ে যায় রাজনৈতিক কার্যক্রম।

২০১২ সালের ৩০ জুন। মিশরের মাটিতে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হয় অবাধ ও গণতান্ত্রিক নির্বাচন। ইখওয়ান সে নির্বাচনে ৫১.৭ শতাংশ ভোট পেয়ে জয়ী হয়। মিশরের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন ইখওয়ান-নেতা প্রকৌশলী, প্রফেসর হাফিজ ড. মুহাম্মদ মুরসি।

মুরসি নির্বাচিত হয়ে এমন কিছু কাজ করতে লাগলেন, যা ছিল পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদীদের জন্য হুমকি। তিনি মিশরকে সুগঠিত করতে যেমন হয়েছিলেন মনোযোগী তেমনি তিনি

সোচ্চার হয়েছিলেন মুসলিম উম্মাহর পক্ষেও। তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন ফিলিস্তিনিদের একান্ত বন্ধু হিসেবে। 'হিজারাতুস সিজ্জিল' নামক ফিলিস্তিন-ইসরাইল যুদ্ধ শুরুর সপ্তাহান্তেই তিনি হুংকার ছুড়েছিলেন—'মনে রেখো, ফিলাস্তিনিরা আর একা নয়।' তিনি তাদের জন্য খুলে দিয়েছিলেন রাফাহ সুড়ঙ্গ-পথ। তেল আবিব থেকে প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন মিশরীয় দূতাবাস। গাজায় পাঠিয়েছিলেন তাঁর প্রধানমন্ত্রী কিনদিলকে। তিনি হামাসের মুজাহিদদের স্পষ্ট সমর্থন জানিয়ে এসেছিলেন।

তিনি যেমন ইসরাইলের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে ছিলেন সরব ঠিক সেভাবে নীরবেও চলছিল তাঁর কার্যক্রম। সিনাই মরুভূমির 'উন্নয়ন প্রকল্প' সেই নীরব যুদ্ধের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। পরিকল্পিত 'ফাইরুজ মিলিয়ন সিটি' এবং সিনাই উপ্যকার উত্তর ও দক্ষিণ দিকে দু'টি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে সিনাই মরুভূমি থেকে ইসরাইলের দখলদারিত্ব দুর্বল হয়ে যেত।

মুরসির নজর শুধু ফিলিস্তিনের দিকেই ছিল না, তিনি যুদ্ধ-বিধ্বস্ত সিরিয়ার দিকেও মনোযোগী হন। কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করেন সিরিয়ার সরকারের সাথে। সরিয়ে নিয়ে আসেন দামেস্ক থেকে মিশরীয় দূতাবাস। কায়রোস্থ সিরিয়ান দূতাবাসের কার্যক্রমও বন্ধ ঘোষণা করেন। সিরিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আমেরিকাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় উলামায়ে কেরামদের হস্তক্ষেপ কামনা করেন। এটা ছিল কথিত সুপার পাওয়ার আমেরিকার জন্য চরম লজ্জার।

পশ্চিমাদের চোখে মুরসির ছিল আরেকটি 'অপরাধ'। তিনি প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় হাত দিয়েছিলেন। যে শিক্ষাব্যবস্থা এতদিন চলছিল মিশরের শিক্ষায়তনগুলোতে আর ক্রমশ তৈরি হচ্ছিল পশ্চিমানুগত একটি শিক্ষিত কেরানি জাতি, এ কারণে পাশ্চাত্য কারিকুলামের বিকল্প আরেকটি কারিকুলাম তৈরির রাষ্ট্রীয় উদ্যোগকে কোনোভাবেই মেনে নিতে পারেনি কুফফার সম্প্রদায়।

তবে যাই হোক, মুরসির যেই 'অপরাধ'টি ছিল শয়তানি শক্তির চোখে সবচেয়ে বড়, তা হলো মিশরের সংবিধানের পরিবর্তন। শাসনতন্ত্রের পরিবর্তনে ফেরাউনের প্রেতাত্মাদের গায়ে জ্বালা শুরু হয়। তারা কামনা করেনি, মিশর থেকে ফেরাউনের প্রভাব দূরীভূত হয়ে যাক। তাই তারা মুরসি প্রণীত নতুন সংবিধান কোনোভাবেই মেনে নিতে পারেনি। কারণ, এই সংবিধান কুরআন-হাদিসের প্রতিবিম্ব ছিল।

এরূপ অপরাধ মেনে নিতে পারেনি আমেরিকা, ইসরাইলসহ সাম্রাজ্যবাদী ও মিশরের ফেরাউনি শক্তি। তারা শুরু করে 'মুরসি হটাও প্রচেষ্টা'। তাদের এই সম্মিলিত প্রচেষ্টার সাথে যুক্ত হয়েছিল সৌদির পেট্রোডলার আর দুবাইয়ের স্বর্ণভাণ্ডও। একপর্যায়ে ২০১৩ সালের ৩ জুলাই ন্যাক্কারজনক এক সামরিক অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। পদচ্যুত করা হয় প্রেসিডেন্ট মুহাম্মদ মুরসিকে। ক্ষমতায় আসেন জেনারেল আবদেল ফাত্তাহ আল সিসি। জেনারেল আবদেল ফাত্তাহ আল সিসি সেই বিশ্বাসঘাতক ঘৃণিত ব্যক্তি, যাঁকে এই মুরসিই প্রতিরক্ষামন্ত্রী বানিয়েছিলেন।

পদচ্যুত করার পর মুহাম্মদ মুরসিকে গৃহবন্দী করা হয়। শুরু হয় ইখওয়ানিদের ধরপাকড়। ফ্রিডম অ্যান্ড জাস্টিস পার্টির প্রধান সাদ আল-কাতাতনি ও ইখওয়ানের উপপ্রধান রাশাদ বাইউমিসহ নেতাকর্মীদের দলে দলে ভরা হয় জেলখানায়। এভাবে একপর্যায়ে বন্দীদের সংখ্যা ছাড়িয়ে যায় ৪১ হাজার। সামরিক জান্তা জেনারেল সিসি মুরসিকে এতই ভয় পে যে, সাউন্ডপ্রুফ কাঁচের খাঁচায় বন্দী করেও সবসময় থাকত উদ্বিগ্ন। সাউন্ডপ্রুফ আইডিয়াটি মিশরকে দিয়েছে ইহুদিরা। জার্মানির সেনাবাহিনীর কমান্ডার আইখম্যানকে পাকড়াওয়ের পর ইহুদিরা এভাবেই রেখেছিল।

মুরসির পদচ্যুতির মধ্য দিয়ে সমাপ্তি ঘটে ইখওয়ানি শাসনের। ফের মিশরে শুরু হয় সেই জুলুমের শাসনামল। তবে ইখওয়ানের এই দুঃখজনক পুনের মধ্য দিয়ে সেই সত্যটি আবারও ভাস্বর হয় যে, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ইসলামি খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন অলীক কল্পনামাত্র।

পরিশিষ্ট

হায়, মুসলিম বিশ্ব যদি মিশরের ইখওয়ান থেকে শিক্ষাগ্রহণ করতে পারত। পশ্চিমাদের বস্তাপচা গণতন্ত্রের গোলকধাঁধায় শতাব্দীকাল ধরে আটকে না থেকে তারা যদি আঁকড়ে ধরতে পারত নববি পদ্ধতিকে। শিক্ষাগ্রহণ করতে পারত যদি তুরস্কের প্রধানমন্ত্রী প্রফেসর ড. নাজমুদ্দিন আরবাকান থেকেও। যিনি ক্ষমতায় গিয়ে একবছরের মাথায় সেক্যুলার জেনারেলদের চাপের মুখে পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তারা যদি আলজেরিয়ার 'ইসলামিক সালভেশন পার্টি' থেকেও শিক্ষাগ্রহণ করতে পারত। ১৯৯২ সালে যে ইসলামিক সালভেশন বিজয়ী হয়েও ক্ষমতায় যেতে পারেনি। উপরন্তু সেনাবাহিনীর নির্মম অভিযানে প্রাণ হারাতে হয় এক লাখেরও বেশি আলজেরিয়ানকে। মুসলিম বিশ্ব যদি মরক্কোর জাস্টিস অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টি 'পিজেডি' থেকেও শিক্ষাগ্রহণ করতে পারত। যে পিজেডি দুইবার ক্ষমতায় গিয়েও উল্লেখযোগ্য কিছুই করতে পারেনি। ফিলিস্তিন থেকেও করতে পারত অনেক অনেক শিক্ষাগ্রহণ। ইসলামি প্রতিরোধ আন্দোলন 'হামাস' বিজয়লাভ করেও বের হয়ে আসতে পারেনি ইসরাইলি গোলকধাঁধা থেকে। তুরস্কের বর্তমান 'একে পার্টি' থেকেও শিক্ষাগ্রহণ করা যায়। দীর্ঘদিন দেশটির ক্ষমতায় থেকেও এরদোগান ইসলামি খিলাফাহর পথে এগোতে পারছেন না।
মুফতি তকি উসমানি হাফিজাহুল্লাহ বলেছেন, 'পশ্চিমা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় পৃথিবীর কোনো দেশে যদি ইসলামের বিধিবিধান বাস্তবায়ন হয়েও যায়, তবুও তাদের জন্য গণতন্ত্র বৈধ হয়ে যাবে না। কারণ, সেখানে ইসলামের বিধানাবলি এ জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি যে, আল্লাহ এবং তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের আদেশ শিরোধার্য; বরং এ জন্য হয়েছে যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ তা মেনে নিয়েছে। তাহলে বিধান প্রবর্তক আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলকে মানা হয়নি। মানা হয়েছে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণকে। এছাড়া তা কিন্তু টেকসইও নয়। সময়ের ব্যবধানে যখন জনগণের চিন্তাভাবনা পাল্টে যাবে তখন আর ইসলামি আইনগুলো বহাল থাকবে না।'
[হাকিমুল উম্মত কে সিয়াসি আফকার]
চরম এই সত্যটি আমরা দৃশ্যমান দেখতে পাই মিশরে। কুরআন-হাদিসের প্রতিবিম্ব সংবিধানটি রেফারেন্ডামে জনগণের বিপুল ভোটের মাধ্যমেই অনুমোদিত হয়েছিল। কিন্তু মুহাম্মদ মুরসির পুনের মধ্য দিয়ে সেই সংবিধানটি ডাস্টবিনের একেবারে গভীরে নিক্ষেপ করা হলো। কালবিলম্ব না করেই ভেঙে দেওয়া হলো ইসলামপন্থীদের সংসদ। দুঃখজনক হচ্ছে, পদচ্যুত প্রেসিডেন্ট হাফিজ ড. মুহাম্মদ মুরসি ইসা আল আয়াত রাহিমাহুল্লাহ দীর্ঘ ৬ বছর কারান্তরীণ অবস্থায় ছিলেন। গত ১৭ জুন মিশরের কোর্টে তাঁর বিরুদ্ধে আনা রাষ্ট্রদ্রোহ মামলার শুনানি চলাকালীন টানা ২৫ মিনিট ভাষণ দেন তিনি। আল্লাহর ইচ্ছায় একপর্যায়ে তিনি আদালতেই উল্টে পড়েন। কিছুক্ষণের মধ্যে তিনি পাড়ি জমান মাওলার দরবারে। অনুসন্ধানীরা ধারণা করেন, তাঁকে স্লো পয়জন দিয়ে মৃত্যুর দিকে ধাবিত করা হয়েছিল। যেভাবে করা হয়েছিল ইয়াসির আরাফাত আর সাদ্দাম হোসেনদের। ব্রিটিশ ডেলিগেশন ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকারবিষয়ক বিভিন্ন গ্রুপের দাবি–মুরসিকে ২৩ ঘণ্টা সেলে আটক করে রাখা হতো। এজন্য তিনি দুর্বল হয়ে গিয়েছিলেন এবং ভাষণদান কালেই উল্টে পড়ে ইন্তেকাল করেন। আল্লাহ মুসলিম বিশ্বের মজলুম এই নেতাকে শহীদ হিসেবে কবুল করুন।
ইচ্ছে ছিল, মিশরের ইসলামি রাজনীতির সাথে বাংলাদেশের ইসলামি রাজনীতির একটা বোঝাপড়া করব। হিসাব-নিকাশ করে বের করব অর্ধশতাব্দীকালের সফলতা-ব্যর্থতা। কিন্তু তা আর হলো না। বাংলাদেশ, পাকিস্তান, মিশর, আলজেরিয়া, মরোক্কো ও তুরস্কসহ আধুনিক মুসলিম বিশ্বের কাছে একটিমাত্র প্রশ্ন রেখেই ইতি টানছি–হাসানুল বান্না থেকে প্রেসিডেন্ট মুরসি : জীবনের নজরানা আর কত?

লেখক : বিভাগীয় সম্পাদক, সিলেটের দৈনিক শুভ প্রতিদিন



মুহাম্মদ মুরসি : বিপ্লব যেখানে মুখ্য

আহমাদ হাবীব শাকির

শৈশবের কুহেলি : যেভাবে গড়ে ওঠে অন্তরলোক

মুহাম্মদ ইসা আল-আইয়াত মুরসি দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। উত্তর মিশরের আশ-শারকিয়্যাহ আল-আদওয়া গ্রামে ৮ আগস্ট ১৯৫১ সালে তাঁর প্রথম চোখ-উন্মীলন। বাবা কৃষি কাজ করতেন। মা ছিলেন গৃহিণী। তিন ভাই দুই বোনের পরিবার। শৈশবে মুরসি ঘোড়ার পিঠে করে স্কুলে যেতেন। কিন্তু মুরসির শৈশব আর সকল শিশুর মতো খুব সুখের ছিল না। দারিদ্রের কষাঘাত তাঁকে ব্যথিত করত। সমাজের ধনাঢ্য লোকদের রূঢ় আচরণ শৈশবেই তাঁকে বিনীত করেছিল দরিদ্র মানুষদের মায়ায়। মুরসি সেই থেকে স্বপ্ন ও গৃহহারা মানুষদের মায়ার তাড়িত হয়েছিলেন। জীবন-সংগ্রামের পাঠ চুকিয়েছিলেন সেই দুধ-শৈশবেই। বীজ বুনছিলেন সমতা ও মমতার পৃথিবী গড়ে তোলার। মেধাবি মুরসির হৃদয়ে তখনই বেজে উঠেছিল মানুষের প্রেমের সিম্ফনি।

ঊর্মিমুখর বাদল-মুখর দিন

প্রাথমিক ও উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষা আল-আদওয়ার স্কুলে। সেখানকার গ্রামীণ

পরিবেশের রোমাঞ্চ মুরসিকে টেনে ধরতে পারেনি তাঁর বালকবয়সে। দেশপ্রেম আর মানবতার হাহাকারে মুরসি নিভৃতে পরাভূত হতে থাকতেন। একান্তে একাত্ম হতেন মানবতা ও ইসলাম কায়েমের স্বপ্নে। সেই মোহ তাঁকে পেছনে ফিরে তাকানোর সময় দেয়নি কোনো দিন, তাঁকে সময় দেয়নি জালেমের চোখ দেখে ভয় পাবার।

স্বপ্নের পথে নিভৃতে হেঁটে চলা

বিশ্ববিখ্যাত কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বার সুযোগ হয়ে যায় মুরসির। ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ভর্তি হন। প্রথম বর্ষেই ফার্স্ট হয়ে যান মুরসি। স্বপ্নের পথ যেন দীর্ঘ হয় শুধু। ব্যাচেলর ডিগ্রি লাভ হয়ে যায় তাঁর। স্বপ্ন বোনেন–এইবার তাহলে পথ আমাকে ছুড়বে না, পথ যেখানে যাও নিয়ে যাও তোমার নদী, তোমার আগত গন্তব্য। বিপ্লবের ঘ্রাণে ঘ্রাণে ছুটে চলেন মুরসি, ছুটে চলেন সূর্যের সাক্ষাতে। কথা হবে এইবার, মানুষের হাসি-বিষয়ক সূর্যালোকে আলাপানুষ্ঠান।

প্রেমের সতত দুয়ার

১৭ বছর বয়েসী চাচাতো বোন নাজলা মাহমুদকে বিয়ে করেন মুরসি। নাজলা মাহমুদ অদ্ভুতরকম ভালোবাসতেন আইয়াত মুরসিকে। মুরসির ব্যক্তিত্ব ও সদাচরণ নাজলাকে অনুরণিত করেছিল মুরসির প্রতি। মুরসির ভালোবাসার স্বপ্নভুবনে হারিয়ে যাবার আকাঙ্ক্ষা নাজলাকে সঞ্চার করত রোমাঞ্চ। তাঁরা ঘর বাঁধেন। গড়ে ওঠে তিলে তিলে মোমগলিত প্রেমের পৃথিবী। হারিয়ে যান নাজলা ও মুরসি, তা দিনে দিনে আরও প্রাণসঞ্চারী হয়ে ওঠে। নাজলা বলেন, 'মুরসির সবকিছুকে আমি ভালোবাসতাম। আমাদের ঝগড়া কয়েক মিনিটের বেশি স্থায়ী হতো না। ঘরের টুকিটাকি কাজ ও রান্নাবান্নায় মুরসি আমাকে সহায়তা করতেন।' মিসরের এক টেলিভিশন চ্যানেলের সাক্ষাৎকারে মুরসি বলেন, 'নাজলাকে বিয়ে করা ছিল আমার জীবনের সবচেয়ে বড় সাফল্য।' নাজলা ও মুরসির সফলতম সংসারে পাঁচ সন্তান জন্ম নেন, আহমাদ, শায়মা, উসামাহ, উমার ও আবদুল্লাহ।

উত্তাল হৃদয়ের হরতাল

স্বপ্নের নাকাড়া যেন বেজেই চলেছে। কিন্তু সব স্বপ্নই যে পথের জন্যে নয় তা বুঝেছিলেন জিনিয়াস মুরসি। এর জন্যেই সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে আবার ফিরে আসেন আপন চিন্তাযানে। মাস্টার্স সম্পন্ন করেন ইঞ্জিনিয়ারিং-এ। এরপর আবারও শৈশবের সমুদ্রে চোখ হারিয়ে যায় তাঁর। এখনই কি উঠে যাবেন রাজনীতির মঞ্চে, নাকি আরও পাহাড় দেখতে হবে তাঁর? হৃদয়ে তরঙ্গ দোলা দিয়ে যায়, ইনসাফের পৃথিবী গড়বার।

আরও এক কদম হাঁটা

ভর্তির সুযোগ হয়ে যায় বিশ্বখ্যাত ক্যালিফোর্নিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটিতে, তা সে বছরের সেরা স্কলারশিপ নিয়ে। আমেরিকার সাউথ ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটির সেরা ছাত্রদের তালিকায় স্থান পাওয়া মুরসি অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করে দেশে ফেরেন স্বপ্নের তাগাদায়, জনবিস্ফোরণের ফানুস হওয়ার চুম্বক-টানে।

যখন বিশ্বখ্যাত অধ্যাপক ও বিজ্ঞানী

কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন মুরসি। অধ্যাপনা-জীবনের শুরু হলো ঐতিহ্যবাহী এ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার মধ্য দিয়ে। পরে আরও বড় সুযোগ এসে যায়, অর্থাৎ শিক্ষক হয়ে যান বিশ্বনন্দিত ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের। এছাড়াও বিশেষত আমেরিকা এবং পৃথিবীর স্বনামধন্য একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন। অবশেষে মিশরের জাক্কাজিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ধাতু প্রকৌশল বিভাগের প্রধান হয়ে অধ্যাপনা-জীবনের ইতি টানেন। বিজ্ঞানী-জীবনে নাসায় কাজ করেছেন। 'স্পেস শ্যাটল ইঞ্জিন' উন্নয়নে সফলতম ভূমিকা রাখায় বিজ্ঞান-দুনিয়ায় দ্রুত তাঁর সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। সুযোগ পান বিভিন্ন বিজ্ঞান-সেমিনারে অংশগ্রহণের। বড় বড় বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকায় তাঁর প্রবন্ধ ছাপবার অনুরোধ আসতে থাকে। তাঁর রচিত প্রবন্ধ ও

তাঁর সুচিন্তক-বক্তব্য বিজ্ঞানী-দুনিয়ায় অনুকরণীয় হয়ে আছে এখনও।

নতুন দিগন্তের সন্ধান

ইখওয়ানুল মুসলিমিন আরব ও বিশ্ব-রাজনীতির আলোচিত একটি নাম। পশ্চিমামুখী মুরসি যখন পশ্চিমি ত্রাসের রাজনীতি বুঝে গেলেন, তখন তাঁর জন্য গুরুত্ববহ ছিল একটি বলয়। ইখওয়ানকেই তিনি সেই হকের ওপর দাঁড়ানো হিসেবে শনাক্ত করেছেন। যোগ দিলেন ১৯৭৭ সালে ইখওয়ানে। ইখওয়ানের আন্দোলন তাঁর সপ্রতিভ ও আন্তরিক প্রচেষ্টায় দ্রুতই আরববিশ্বে প্রভাব ফেলতে লাগল। আরবের বিভিন্ন দেশে ব্যাপক প্রভাবের মুখে ইখওয়ান নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়ল ইজরায়েল ও পশ্চিমাশক্তি। এরই ধারাবাহিকতায় ষড়যন্ত্রের একপর্যায়ে পশ্চিমা মিডিয়া ইখওয়ানকে সন্ত্রাসী সংগঠন আখ্যা দিয়ে ফেলল। কিন্তু আরববিশ্বে এখন পর্যন্ত অগোচরে ইখওয়ানের শক্তিশালী প্রভাব রয়েছে। ব্যাপক জনপ্রিয় মুরসি ২০০৫-এ সর্বোচ্চ ভোটপ্রাপ্ত সাংসদ নির্বাচিত হওয়ার পরও তাঁর বিরোধী প্রার্থীকে জয়ী দেখানো হয়। ১৯৯৫ ও ২০০০ সালেও ইখওয়ানের এমপি নির্বাচিত হয়ে সংসদে নেতৃত্ব দেন মুরসি।

মার্কিন শয়তানি যেভাবে প্রতিফলিত হয়

আরব বসন্ত মূলত মার্কিন প্রকল্প। বুআজিজি নামক তিউনিসীয় ফেরিওয়ালার নিজ গায়ে আগুন ধরিয়ে দেয়াকে কেন্দ্র করে যে ক্ষোভ আর দ্রোহের জন্ম নেয় আরব জন-মানসে, তারই সুযোগ নেয় পশ্চিমাগোষ্ঠী। পশ্চিমা-লালিত মিডিয়া এর নাম দেয় ‘আরব বসন্ত’। আরবের মানুষ আশায় উদ্বেলিত হয়েছিল, জাগরণের মশাল উদ্দীপ্ত করেছিল তাদের, কিন্তু পশ্চিমাশক্তি মূলত নিজস্ব দালালদের ক্ষমতায় বসাতেই আরব বসন্তের নামে উস্কে দিয়েছিল আরবের শান্তিকামী জনতাকে।

অবশেষে আরব-বসন্ত রূপ নিলতাদেরই পরিকল্পিত রূপে। অস্থির অশান্ত হয়ে উঠল আরবের ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট। তিউনিসিয়া, লিবিয়া, ইয়েমেন, বাহরাইন ও সিরিয়াও জ্বলতে লাগল রাষ্ট্রীয় অস্বস্তির দাবানলে। এরই ফলশ্রুতিতে মিশরেও ধাক্কা লাগল বড়সড়। অশান্তির আগুনে পুড়তে থাকল মিশরও। মুরসি তখন আরবভূমির দাবদাহ-মৃত্তিকায় পানি ঢাললেন যেন, মিশরকে নিয়ে আসলেন শান্ত নদীর ভূমিকায়। সর্বদলীয় মোর্চা ‘ফ্রিডম অ্যান্ড জাস্টিস’ গঠন করে ইখওয়ানকে নিয়ে আসেন সংসদে, আর এটাই ইখওয়ানের জয় হয়ে যায় বৈশ্বিকভাবে।

নতুন মিশর

২০১২ সালে অনেক ষড়যন্ত্রের পরও অবশেষে নির্বাচন কমিশন তাঁর বিজয় ঘোষণা করতে বাধ্য হলো। নিয়মানুযায়ী তিনি ব্রাদারহুড ও ফ্রিডম পার্টি থেকে পদত্যাগ করলেন। শুরু হলো নতুন মিশরের পথচলা। রাশিয়া, চীন, ইরান, তুরস্কসহ বিশ্বের শক্তিশালী দেশগুলোর সাথে পারস্পরিক সম্পর্ক বৃদ্ধির জন্যে পরামর্শ করলেন মুরসি, কিন্তু

আমেরিকায় গেলেন না। মিশরকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণসহ শিক্ষা ও সামগ্রিক উন্নয়নে ঈর্ষান্বিত স্থানে নিয়ে যান। বৈশ্বিক রাজনীতিতে প্রভাব ফেলেন শান্তিকামী নেতার ভূমিকায়। এরদোগানকে নিয়ে ফিলিস্তিন ও সিরিয়ার সমস্যা দূরীকরণে শক্ত হতে থাকেন। এতে ইসরায়েল ভয় পেয়ে গেল। ক্ষোভে দগ্ধ হতে লাগল আমেরিকা। সৌদ-পরিবার আরবের নেতৃত্ব হারাবার ভয়ে আঁটতে লাগল ফন্দি। তাঁরই নিয়োগকৃত সেনাপ্রধান দালাল আবদেল ফাত্তাহ সিসিই তাঁকে হটিয়ে ক্ষমতা দখল করল। শুরু হলো নব্য-ফেরাউনি-শাসন।

ভিন্নতা ও অনন্যতা

মুরসি তো পণ্ডিত মানুষ ছিলেন, চাইলেই সম্ভব ছিল বিপুল ঐশ্বর্য আর সৌখিন জীবনযাপন করার। দুনিয়ার আর সব বিজ্ঞানীদের মতো তাঁর জীবনও হতো রাষ্ট্রীয় মায়ায় প্লাবিত। সুখ আর ধনে আয়েশি মখমল দিন হতো তাঁর। চিরায়ত অগ্নিবিপক্ষ জীবনযাপন করে যেতে পারতেন তিনি। কিন্তু মুরসি পথ বেছে নিলেন সংগ্রামের। রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে ছড়িয়ে দিলেন ঈমানের সদা প্রোজ্জ্বল দাবানল, হাসানুল বান্নার ইশতিহার। মিছিলে মিছিলে রক্ত রঙে স্নাত হলো তাহরির স্কয়ার। মিশর দেখল সূর্যের রঙ তার মাথার ওপর ছড়িয়ে, সূর্য মিশরের আকাশ ছাপিয়ে আলো ফেলল সুদূর সিরিয়ায়। সিরিয়া চেয়ে আছে, মিশর হাসছে, জ্বলে শেষ ইসরাইল, জ্বলে শেষ বীভৎস দুনিয়ার সূতিকাগার আমেরিকা। শুরু হলো কুমন্ত্রণার ঢেউ, স্রোতপ্লাবনে জনজীবন ধোঁকা খেল। যে মানুষেরা স্বপ্নের মিশরের জনক দেখেছিল মুহাম্মদ মুরসিকে, তাদের একটি অংশকেই আবার ক্ষিপ্র করা হলো তাঁর ওপর। আর তারপরই মরল মিশর, আর অগ্রযাত্রা নাই তার।

বিপ্লব যেখামে নবোদ্যমে জেগে ওঠে

প্রায় ছয় বছর নির্জন কারাবাস শেষে ২০১৬ সালে তাঁকে কায়রোর কুখ্যাত তোরা কারাগারে স্থানান্তর করা হয়। গত ১৭ জুন আদালতে বিচার শুনানির ফাঁকে কারাকক্ষের খাঁচার চত্বরে পড়ে যান মুরসি। পরে হাসপাতালে নেয়া হলে মিসরের সর্বোচ্চ জনপ্রিয় ও গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত প্রথম প্রেসিডেন্ট মুহাম্মদ মুরসির মৃত্যু ঘটে। কিন্তু তাঁকে পূর্বেই অমানবিক নির্যাতন ও ওষুধ প্রয়োগের মাধ্যমে শেষ করে দেয়া হয়, শুধু আনুষ্ঠানিক মৃত্যু ঘটানো হয় আদালতে এনে। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয় রাষ্ট্রদ্রোহিতার। কিন্তু জনতার কাছে মুরসি নতুন করে জ্বলে উঠলেন। সারা বিশ্বে তাঁকে নিয়ে যে আলোড়ন, তাঁর প্রয়াণে যে শোকাবহ বিরাজ করছে তা তাঁর অসম্পাদিত নতুন বিপ্লব বাস্তবায়নেরই আগাম-বার্তা।

লেখক : শিক্ষার্থী, জামেয়া তাওয়াক্কুলিয়া রেঙ্গা, সিলেট





শাহাদাতের কোনো মৃত্যু নেই এখানে

হাসিব ইমতিয়াজ

আমাদের তখন কৈশোর, ওড়াউড়ির দিন। পত্রিকার পাতার নানান বিষয়ে তুমুল আগ্রহ, বিশেষ করে আন্তর্জাতিক বিষয়সমূহে। তখনই শুনি আপনার নাম–মুরসি, মুসলিম ব্রাদারহুড, ইখওয়ান, আরব-বসন্তের নানা আলাপ। আমাদের হাসিতে, আড্ডায়, চোখের চঞ্চল চাহনিতে তখন বিপ্লব। স্বপ্নের ভেতর বিজয়ের স্লোগান। কল্পনায় ভাসে শুদ্ধতার প্ল্যাকার্ড হাতে দাঁড়িয়ে থাকা ইখওয়ানি তরুণ। আমাদের সুবহে সাদিকের প্রার্থনায় শাহাদাতের বিনম্র অশ্রুজল। রাত জেগে জেগে নিই বান্না অথবা কুতুবের দ্রোহের পাঠ। আমাদের ডায়েরির পাতায় মিশরের গল্প, রক্তাক্ত সংগ্রাম। তাহরির স্কয়ারের অনবরত স্লোগান, শেষ সারিতে প্রতিবাদের ফেস্টুন হাতে দাঁড়িয়ে থাকা কিশোর, আমাদের প্রেরণা। মাথায় নানা পরিকল্পনা, সূর্য ওঠার পূর্বেই চোখের তারায় জমা করে রাখি অঙ্গীকার।

একদিন সন্ধ্যারাতে আমরা জানতে পারি আমাদের স্বপ্নরা এখন আকাশের ঠিকানায় প্রার্থনার মতো বৃষ্টিজল হয়ে আরশে আজিমে। আমরা ভুলে যাই আমাদের রাতজাগার কষ্ট, দেয়ালিকায় সাঁটানো রক্তের দাগ। আমাদের মুখে-মুখে মুরসি আর মিশরের গল্প, প্রত্যাশারা কায়রো হয়ে আকসার পথে। বাতাসের স্রোতে ভাসা আপনার দরাজ কণ্ঠের উচ্চারণ আমাদের স্বপ্নের বৃত্তটা আরেকটু বড় করে দেয় যেন। আমি নিশ্চুপ বিনিদ্র রাতের স্বপ্নগুলো জমা করে রাখি ডায়েরির পাতায়। ভাবি, একদিন আল-আজহারের ফটকে দাঁড়িয়ে সেসব তুলে দেবো আপনার হাতে। আপনি বিহ্বল পড়ে যাবেন আমাদের স্বপ্নমাখা দিন। দূর দেশের এক কিশোরের ভুলভাল উচ্ছ্বাস।

তারপর, নানা ঘটনা প্রবাহ রাবেয়া স্কয়ারের রক্তের স্রোতে মিলিত হয়ে প্রবাহিত হয়েছে নতুন এক মোহনায়। ততদিনে আমাদের প্রত্যাশাগুলো বহুদূর আটকে গেছে জালিমের কারাগারে।

দুই

কোনো এক রাতের আলাপে জানতে পারি স্বৈরাচারের বুটের তলায় নিষ্পেষিত আমাদের স্বপ্নের কথা। সবকিছু কেমন এলোমেলো হয়ে গেল আকস্মিক। বিপ্লব, দ্রোহ আর স্বপ্নরা যেন হঠাৎ থমকে দাঁড়াল কিছু সময়। বিহ্বল আমরা হারিয়ে ফেলেছিলাম কথা বলার ভাষা। হৃদয়ের অস্থিরতা তখন কাকে দেখাব? সবার

চোখই কেমন ঘোলাটে। আশাহত হৃদয় তখন আশা খুঁজে নিয়েছিল সান্ত্বনার ভাষা—একদিন সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। গত পাঁচ বছর আমি আমি ডায়েরির পাতায় তুলে রেখেছি আমার সমস্ত উচ্ছ্বাস। কোথায়, কিছুই তো ঠিক হয়ে যায়নি? সবকিছুই মিথ্যে ছিল। জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাতের ভেতরও হঠাৎ করে মনে হয়ে যেত—মুরসি কেমন আছেন? কেমন আছেন জিন্দানখানার ইখওয়ানি তরুণ, তাঁদের বিপ্লবের স্বপ্ন?

জালিমের আদালতে আপনার মৃত্যুদণ্ডের কথা শুনেও আমি হতাশ হইনি। ভেবেছি এখনো পৃথিবীর আলো-বাতাস নিয়ে আপনি একজন মানুষ, আমাদের স্বপ্নপুরুষ। আপনার তর্জনির শিল্পিত ইশারা বুকের ভেতর ডেকে আনত শান্ত-সুন্দর এক বিপ্লব। মুখের বিশুদ্ধ উচ্চরণ যেন বিপ্লবপ্রিয় লক্ষ তরুণের হৃদয়ের অনুবাদ। আজও সেসব মুহূর্ত লেপ্টে আছে ডায়েরির উদাসী পৃষ্ঠায়। আমার নানা ভাবনা, পত্রিকার কাটিং, বিপ্লবের খণ্ড-খণ্ড চিত্র পরম মমতায় আগলে রেখেছি বহুদিন। ডায়েরি খুললেই চোখের সম্মুখে বিপ্লব, রাজপথে নেমে আসা শাহাদাতের মিছিল খুব দ্রুত ছুটে যায় ধূসর স্মৃতিরেখায়। এখানে আসমা বেলতাগির ছবি কী হাস্যোজ্জ্বল! এমন হাসতে-হাসতেই হয়তো জীবনের নজরানা পেশ করে দিয়েছিল মেয়েটা। যার বাবা তাকে লিখতে চেয়েছিল, 'আসমা, বিপ্লব শেষ হয়নি। এটা তো শুরু মাত্র। আমরা হয়তো জিতবো অথবা তোমার মতো শহীদ হবো।' আসমা ওসব জানতে পারেনি, সে তো তখন জান্নাতের স্বপ্নীল পাখি। মনে পড়ে রাবেয়া স্কয়ারের শহিদ হাবিবার কথা। যে বলেছিল, 'মা, আমি চলে যাচ্ছি। তুমি ভালো থাকো।'

ডায়েরির পাতা উল্টালে এমন আরও কত মুখ সামনে আসবে কে জানে! হাতটা কেমন অসাড় হয়ে আসে ক্রমশ। সামনে এগুতে ইচ্ছে করে না। এসব তো আর আপনাকে দেখানো হলো না। এমনি আরও কত কত বিপ্লবের গল্প বুকে নিয়ে শান্তিতে ঘুমিয়ে গেছেন আপনি। আপনি জান্নাতের বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখে নেবেন স্বাধীনতার আকাশ, মুরসি।

তিন

আপনার লাশকেও ওরা বাইরে আনতে দেয়নি। নীরবে কায়রোর কোনো কবরে রেখে দিয়েছে রাতের অন্ধকারে। ক্ষমতাসীন জালেমেরা জানে আপনার লাশ বের হলে তাহরির স্কয়ারের পথ ধরে আবার হেঁটে যাবে বিপ্লবের মিছিল। শোকাহত জনতার অশ্রুজল হয়তো জলোচ্ছ্বাসের মতো আঘাত হানবে স্বৈরাচারের মসনদে। আসলে শহীদানের লাশকেও জালিম ভয় পায় খুব। সাদা কফিনের ভেতর প্রজ্বলিত বিপ্লব জালিমের নিদ্রার ভেতর তুফান নিয়ে আসে ক্রমশ। তবু তারা ভুলে যায় একদিন পরাজয়ের লজ্জিত ইতিহাস। ওরা কি জানে না শহীদরা মরে না কোনোদিন? রক্তের কাছে প্রতিনিয়ত নিতে থাকে মৃত্যুর পাঠ। শাহাদাতের তামান্না বুকে জালিমের রাজপথে ক্রমাগত ছড়িয়ে দিতে থাকে ভোরের আজান। আমাদের সুবহে সাদিকের অশ্রুজল জানে—শহীদরা মরে না, শাহাদাতের কোনো মৃত্যু নেই এখানে। আমরাও প্রস্তুত হতে থাকি। এভাবে তো একদিন সবাই চলে যায়, যাবে। কী বেদনাবিধুর একটা সময়ে দাঁড়িয়ে আমরা। শতাব্দীর স্বর্ণোজ্জ্বল দিনগুলো বুকে নিয়ে শান্তিতে ঘুমিয়ে যাচ্ছেন তাঁরা। তাঁদের ত্যাগ, লড়াই, রক্তাক্ত সংগ্রাম আমাদের পথ দেখাবে বহুদূর অথবা অতীতের অনেক বিপ্লবের মতো আমরা ভুলে যাবো সবকিছু। আমাদের সম্মুখে কত সংকট, লড়াই, বিচ্যুতি। এর উপর এই শূন্যতা। বুকের ভেতরটা ডুকরে ওঠে অজন্তেই। খাঁ খাঁ রোদে পথ হারিয়ে ফেলে একটা বটবৃক্ষের জন্য মনটা হু হু করে ওঠে। তৃষ্ণাতুর চোখে খুঁজি নদীর শান্ত-স্নিগ্ধ ঢেউ, সমুদ্রের উচ্ছ্বাস কিংবা একটা ছায়াদার বৃক্ষ। চারপাশে অন্ধকার। কোথাও কেউ নেই। জানি, এভাবেই একদিন ফুরোবে আমার বেলা। তবুও আমি বিপ্লব পুষি বুকেরভেতর, যার বীজ থেকে একদিন গজিয়ে উঠবে সুন্দরের চারাগাছ। আমি অপেক্ষা করি শুধু। আমাদের প্রার্থনার অশ্রুজলে মিলেমিশে ওপারে ভালো থাকুন আপনি, মুরসি।



আমার সাইয়িদ

যেখানে খুঁজে পাই আমার সংগ্রামের তারিফ

যিয়াদ বিন সাঈদ

মখমলে উষ্ণতার এক সাদাভ যৌবনে সদ্য ঢুকে পড়া এক বৈপ্লবিক সাবাহের কথা আমার খুব মনে পড়ছে আজ। আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে সেই যে পান করে গিয়েছি রোজ সন্ধ্যায়; এক সমুদ্র বিপ্লবের শরাব–সুমিষ্ট 'লাজজাত' আর সারি সারি রায়ট কারের সম্মুখে দাঁড়িয়ে আমার 'ইল্লাল্লাহ'র সমুচ্চারিত আবেগের তাড়না, সবই আমার মনে পড়ছে আজ। মনে পড়ছে বারেবার আমার সায়্যিদ–দূর থেকে অনেক দূরে দাঁড়িয়ে তাঁর সোনাঝরানো বক্তৃতার সেইসব শব্দমালা। শব্দের ভেতর শব্দে শব্দে তরঙ্গাভিঘাত। সন্তর্পণে নিজের অগোচরে বলছি শুধু–সায়্যিদির রাঈস, দেখা হবে জান্নাতে, আধোছেঁড়া হাত, রক্তাক্ত সদর আর প্রেমের মুলাকাতে একে অপরকে জড়িয়ে। অন্তঃস্থ 'শুউর'কে 'শুয়ারা'য় পরিণত করে এক অভিনব ছন্দের তালে।

আজকের এ সকালে সবুজ রঙের পুরোনো ক্যানভাসে আলতো করে বাঁকানো দুটো তরবারির একটু নিচেই দগদগে হলুদ কালিমায় অর্ধসমাপ্ত একটি স্লোগান–'ওয়া আয়িদ্দু'-এর কথা প্রাণভরে স্মরণ করতে ইচ্ছে করছে আমার। বিস্ময়ভরা চোখে একটু নত হয়ে সে শ্রদ্ধার অনুভূতি, আমি ভুলে যাইনি কিংবা যেতে পারিনি এতো এতো কাল পরেও। পৃথিবীভরা ক্রান্তির এ সময়ক্ষণে রীতিমতো আমাকে যে বলে গিয়েছে শক্তির সমস্তটা পুঁজি করে ছুটে চলো যুদ্ধের ওই ময়দানে, যেখানে তোমার ভাই অপেক্ষারত। অপেক্ষারত তোমার অপ্রতিরোধ্য রক্তের টগবগে তারুণ্য। সত্যি সত্যিই সে সময়গুলোর কথা ভেবে অনিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়ছি আমি, যে সময় আমাকে ভেঙে পড়া এক কওমের হাত টেনে সাহস জুগিয়েছিল বাড়িয়ে দিতে অদম্য 'আকদাম'। 'ইখওয়ান, ইখওয়ান' নামের ক্রমাগত 'আযকার', আমাকে বলছিল 'নাসরুম মিনাল্লাহি ওয়া ফাতহুন কারিব।' জাগতিক বাস্তবতাকে ব্যাখ্যার তত্ত্বগুলো আমি ভাঁজ করে রেখে দিয়েছিলাম ঠিক তখন থেকে। ভুলে যেতে চেয়েছি 'বাঁচতে হবে'র নির্মম অসত্য কথাকে। সশস্ত্র সংগ্রামের বিধ্বস্ত কলাকৌশল রপ্তের এক অভিনব এরাদা আমার মনে কেমন করে যেন জেগে জেগে উঠেছে ক্রমশ। আমার মনে কেবল বেজে গেছে সেই এক শব্দ–হাসান আল বান্নার চির অপ্রতিরোধ্য 'ইখওয়ানে'র 'ওয়া আয়িদ্দু'। কী অভূতপূর্ব আহ্বান। কালপরম্পরায় তা জ্বলে উঠেছে। নিভেছে। গভীর বিধ্বস্ততার ভেতরেও মুছে দিয়ে গেছে অসত্যের প্রলাপ। তবে কথা তো তাই–'ওয়া আয়িদ্দু'র পুাকাবাহী এ মুভমেন্ট, কী

অভূতপূর্ব তাসিরে তাসিরে ভরপুর করে দিয়ে গেছে আমার এ ক্ষুদ্র জীবন। কেননা আমি জানি এ ব্যানারটির ভেতরে লুকিয়ে আছে শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ সংগ্রামের ইতিহাস। উত্থান থেকে পুনের মধ্যবেলায় খুলুসিয়্যাতের নানাবিধ 'আমসিলা' আর 'শাওয়াহেদ' এখানে টইটম্বুর।

১৯৪৯-এর শুববানুল মুসলিমিনের সেই কার্যালয় সম্মুখে হাসান আল বান্নার রক্তের দাগ এখানে লেগে আছে। এখানে আছে আবদুল কাদের আওদাহ আর হামিদা কুতুবের ফাঁসির মঞ্চে ঝুলে থাকা নিথর দেহ। এবং আরও আছে সাইয়েদ কুতুবের ওপর কুকুর লেলিয়ে নির্যাতনের মতো নির্মমতা। বহু নির্মমতার পরও এখানে উজ্জ্বল হয়ে আছে সাইয়েদ কুতুবের হত্যার কিছু সময় পূর্ব পর্যন্ত 'আল্লাহু আকবর ওয়া লিল্লাহিল হামদ' বলে চিৎকার করে উঠবার মতো অবিচলতা। সাহস। আমৃত্যু সংগ্রাম। সবশেষে সায়্যিদি–প্রেসিডেন্ট মুহাম্মদ মুরসি; ইখওয়ানের এ তীব্র উত্থান-পুনের মাঝে পূর্বের মতোই নির্যাতনের যাতাকলে পিষ্ট আপনাকে এ রঙিন সকালবেলায় জানাই লাল সালাম, যখন এ ভূপৃষ্ঠে আপনার হৃদয়ের কোনো কম্পন, হৃদস্পন্দন আর হচ্ছে না। এবং অভিবাদন জানাই মৃত্যু-পূর্ব আপনার ওই কবিতা-পঙক্তিকে–'আমার এ পবিত্র শহর, যদি আমার প্রিয়জন প্রেমাস্পদের উপরও চালায় নির্মম অত্যাচার, আর জুলুমের পদভারে পিষ্ট হয়ে আমার পরিবার পরিজন জীর্ণতায় নুয়ে পড়ে; তবুও এ শহর আমার হৃদয়ের মেহরাবে আঁকা এক সম্মানের ছবি।'

ত্রিমুখী ষড়যন্ত্রের পদভারে ইহজাগতিক ক্ষমতার লড়াইয়ে হয়তো হেরে গিয়েছেন আমার সাইয়িদ। ইসরাইল মধ্যপ্রাচ্যের যে বিন্যাসের আকাঙ্ক্ষা করে, রাজনীতির যে ধরন ও চরিত্র চায়, আমেরিকার নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকার যে চিত্র আঁকে, তারা এ উত্থানকে কোনোভাবেই কবুল করতে পারছিল না হয়তো। আমার সাইয়িদ মধ্যপ্রাচ্যের আমেরিকান বিন্যাসের পথে হয়তো হয়ে উঠেছিলেন মস্ত বড় এক সমস্যার কারণ। কেননা তিনি তো একটি প্রেরণা হয়ে উঠছিলেন ক্রমশ দেশে দেশে স্বৈরাচারবিরোধী প্রতিরোধী জনতার সামনে। কেননা তিনি সব হাতড়ে ফিরে মানবমুক্তির একমাত্র আশ্রয় খুঁজে পেয়েছিলেন ইসলামের চিরশান্তিময় এ আলয়ে। যার ফলে স্পষ্ট কালিমায় বলে দিতে পারি, সাইয়িদ, তিনি অবশ্যই জিতে গেছেন আসল লড়াইয়ে। কেননা তিনি আমাদেরকে তো শেখাতে পেরেছিলেন–কীভাবে পশ্চিমা রাজনীতি ও বুদ্ধিবৃত্তির চির প্রতিদ্বন্দ্বী হয়েও কারাগারের অবরুদ্ধ শেকল ছিন্ন করে চিৎকার করে বলা যায় 'লা নাখশা ইল্লাল্লাহ'। অযাচিত হেকমতের শরণাপন্ন হয়ে চিরকাল ঘুমিয়ে না থাকার শিক্ষাটাও তিনি আমাদেরকে দিয়ে গেছেন। আজকের পৃথিবীটা আমাদের না জেনেও 'আল কুরআনু শারিয়াতুনা'র স্লোগান দিয়ে যাবার যে ছন্দ, অবশ্যই তিনি আমাদেরকে শিখিয়ে গেছেন। কারাগার প্রকোষ্ঠে তাঁর তিলে তিলে ক্ষয়ে যাওয়া রক্তের কসম, মুসলিম উম্মাহ এখানে পেতে পারে তাঁর হারিয়ে যাওয়া শক্তি, সাম্রাজ্য আর অধঃপুন থেকে বেরিয়ে আসার আকাঙ্ক্ষিত পথ।

সবশেষে আপনাকে আবার স্মরণ করি হে সাইয়িদ। দেখুন, আপনার অবর্তমানে ফিলিস্তিনকে আবার হাঁটতে হচ্ছে সেই সিনাই উপ্যুকার দিকে। হুব্বে ওয়াতানের সব স্মৃতির কথা ভুলে গিয়ে ছেড়ে দিতে হচ্ছে প্রাণময় 'ফিলিস্তিন'। ফিলিস্তিনের পথে পথে রোজকার যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা সে শিশুগুলো হয়তো এ জীবনের সব মোহ ছেড়ে বারেবার ভাবছে এ পৃথিবীতে কি সত্যিই সব 'মুরসি'রা হারিয়ে গেছে? সত্যি সত্যিই সবাই কি ভুলে গেছে তাদের আসল পরিচয়? হয়তো 'সফকাতুল কার্ন'-এর এ চুক্তি শেষে তারা গাট্টিবোচকা নিয়ে হেঁটে যাবে সিনাইয়ের দিকে। অভিমান করে একপলক আকাশের দিকে চেয়ে বলে ফেলবে আমার সাইয়িদ মুরসি তো আর নেই। ফিলিস্তিনের ওই শিশুদের মতোই আমি আজ এই বৃষ্টিমুখর সকালে নির্দ্বিধায় স্বীকার করে নিতে পারি হে আমার বিপ্লব-সংগ্রামের পথ দেখিয়ে দেয়ার শিক্ষক, আপনি তো আর নেই।

লেখক : শিক্ষার্থী, মাদরাসাতুল কাউসার, ঢাকা



মুরসির মৃত্যু ও মিশরের জনগণ

ইবনে সাবিল

ক্ষমতায় আসার পর প্রেসিডেন্ট মুরসি রাশিয়া, ভারত ও পাকিস্তান সফর করেছিলেন। তখন তিনি রাশিয়ার সাথে কিছু নিউক্লিয়ার চুক্তির ব্যাপারে সম্মত হন, যা মিশরের বিদ্যুৎ উৎপাদনে সহায়তা করবে। বিশেষজ্ঞরা বলেন, এই চুক্তি বাস্তবায়িত হলে মিশর বিদ্যুৎ সংকট থেকে মুক্তি পেু।

মুরসির আমলে মিশর দুটি জার্মান সাবমেরিনের মালিক হয়েছিল। এ ব্যাপারে ইসরাইল তখন জার্মানিকে খবরদারি করে বলেছিল, মিশরকে এমন কোনো সাবমেরিন যাতে না দেওয়া হয়, যা কোনো যুদ্ধবিমানকে আক্রমণ করতে সক্ষম। মুরসি রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিনকে বলেছিলেন মিশরের মিসাইল প্রয়োজন। রাশিয়া অফিসিয়ালি এই চুক্তিতে সাক্ষরও করেছিল, কিন্তু আমেরিকার হস্তক্ষেপের ফলে এই চুক্তি অসম্পাদিত থেকে যায়।

মুরসির আমলে মিসরের অগ্রগতি সংক্রান্ত এ তথ্যগুলো দিয়েছেন পাকিস্তানের বিখ্যাত নিউক্লিয়ার ফিজিসিস্ট ড. আবদুল কাদের খান। মিডল ইস্ট মনিটরকে তিনি বলেন, মিশরের স্বাধীনতা রক্ষায় এই পদক্ষেপগুলোর কারণে মুরসি সাম্রাজ্যবাদীদের বিরাগভাজনে পরিণত হয়েছিলেন।

ভৌগলিকভাবে মিশরের অবস্থান গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার ফলে আমেরিকা ও ইসরাইল তাদের আরব মিত্রদের মাধ্যমে মিশরকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে চায়। আরব রাজবংশের নেতারাও এ বাস্তবতা উপলব্ধি করতে পেরেছে যে যদি মধ্যপ্রাচ্যে গণতন্ত্রের মাধ্যমে স্বৈরাচার-বিরোধী স্লোগানকে সুযোগ দেওয়া হয় তাহলে তা রাজতন্ত্র ও আলে সাউদদের জন্য বিরাট হুমকি। যে কারণে আরবে পশ্চিমের মিত্ররা গণতন্ত্র ও জনগণের স্বাধীন মতপ্রকাশের মাধ্যমগুলোকে শত্রু ভাবতে শুরু করে। সাংবাদিক জামাল খাশোগজি হত্যার মোটিভও এই সূত্রেই গাঁথা। যার ফলে মুরসির সময়ও বৃহত্তর স্বার্থে আরবনেতাদের দূরত্ব কমিয়ে আনার প্রচেষ্টা আলোর

মুখ দেখেনি। কেননা বাস্তবতা ছিল পুরোপুরি এর বিপরীত।
মুরসি ক্ষমতায় আসার পর ইসরাইল ও আমেরিকার হীনস্বার্থ চরিতার্থ করার ক্ষেত্রে যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হচ্ছিল সে কারণেই তাঁকে হটানোর জন্য আরবের ক্ষমতালোভী এবং মুসলিমদের স্বাধীনতাবিরোধী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মধ্যে মধুর ঐক্য হয়ে গেল। আমেরিকা ও ইসরাইলের স্বার্থের বিপরীতে মুরসির আপোষহীন অবস্থান ছিল খুবই শক্তিশালী।

মুরসির ইন্তেকালের পর কাতারে তাঁর রুহের মাগফেরাতের জন্য আয়োজিত দোয়া মাহফিলে হামাস নেতা খালেদ মিশাল মুরসির বেশ কিছু কঠোর সিদ্ধান্তের কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন, যা তিনি দেশের স্বার্থ রক্ষায় গ্রহণ করেছিলেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, কোনোরকম পূর্বঘোষণা ও আলোচনা ছাড়াই ইসরাইলকে কম দামে দেয়া তেলের চুক্তি বাতিল করা, বিপরীতে ফিলিস্তিনিদের সহায়তা, মুসলিম উম্মাহর ঐক্য, ইসরাইলের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত বিভিন্ন গোষ্ঠীর ঐক্য ও সহায়তার কাজ শুরু করা।

যদিও কৌশলগত কারণে আমেরিকা ও ইসরাইল প্রকাশ্যে মুরসির বিরোধিতা করা থেকে বিরত থাকতো কিন্তু তাদের হীন স্বার্থ ক্ষুণ্ন হওয়ার ফলে পরোক্ষভাবে মদদ দিয়ে তারা মুরসিকে মিশরের রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেয়। ২০১৩ সালে সেনাপ্রধান আবদেল ফাত্তাহ সিসির মাধ্যমে সংঘটিত অভ্যুত্থান তাদের চক্রান্তেরই ফলাফল।
মুরসির ইন্তেকালের পর মিশর সরকারের আচরণে খুব একটা পরবর্তন দেখা যায়নি। মিডিয়াগুলোতে মুরসির পক্ষে বলা তো দূরে থাক, তাঁর বিরুদ্ধে যা-তা শব্দ ব্যবহার করেছে কিছু উপস্থাপক। মুরসিকে তারা সিআইএর এজেন্ট, দেশ ও জাতির শত্রু এবং উগ্র জঙ্গি হিসেবে উপস্থাপন করে। তাঁর মৃত্যুতে কোনো ধরনের শোক নয় বরং দেশ যে কলংকমুক্ত হয়েছে, এজন্য মিশরবাসীর আনন্দিত হওয়া উচিত–মিশরীয় মিডিয়া থেকে বারবার এ বার্তাই ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে দেওয়া হয়েছে।

মিশরের বাইরে জর্দান, তিউনিস ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে মুরসিকে হত্যার বিচার চেয়ে বিক্ষোভ হলেও মিশরে কোনো ধরনের বিক্ষোভের সুযোগ দেওয়া হয়নি। নিরাপত্তা বাহিনী তৎপরতা বাড়িয়ে দেয়। মুরসির গ্রামের লোকেরা তাঁর হত্যার বিচারের জন্য বিক্ষোভ মিছিল করলেও গণহারে গ্রেপ্তার ও মিছিল ছত্রভঙ্গ করে দিয়ে সেই গ্রামকে অবরুদ্ধ করে ফেলা হয়।

তবে মিশরের সাধারণ জনগণের ভেতরে এই বোধটুকু বেঁচে আছে যে মুরসির সাথে যা করা হয়েছে, এটা জুলুম ছাড়া আর কিছুই না। ইখওয়ানের রাজনৈতিক পলিসি কি কট্টরপন্থা না উদারপন্থা–এ নিয়ে বামপন্থী ও ডানপন্থীদের তর্ক অব্যাহত থাকলেও এক মুরসি জীবন দিয়ে অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে তাঁর আপোষহীন লড়াইয়ের নমুনা রেখে গেছেন। এভাবেই মুরসিরা যুগ যুগ ধরে বেঁচে থাকবেন প্রতিটি মানুষের হৃদয়ে।

লেখক : শিক্ষার্থী, আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়, মিশর



নবধ্বনি ঈদসংখ্যা

ড. আ ফ ম খালেদ হোসেনের মূল্যায়ন

নবধ্বনির সহকারী সম্পাদক ভাই হামমাদ রাগিবের সৌজন্যে নবধ্বনি ঈদসংখ্যা কুরিয়ার যোগে আমার কাছে আসে। হাতে নিয়ে পাতা ওল্টাতেই এর প্রতি আকর্ষণ অনুভব করি। নবধ্বনির প্রতিধ্বনি ধ্বনিত হলো হৃদয়ে। আমি নিজেও আত-তাওহীদ নামক ৪৯ বছরের পুরনো একটি মাসিক ম্যাগাজিনের সম্পাদক। প্রতিদিন আমার কাছে দেশ-বিদেশ থেকে বহু ম্যাগাজিন সৌজন্যসংখ্যা হিসেবে আসে। প্যাকেট খুলে সূচি দেখে রেখে দিই। তবে কিছু ম্যাগাজিন আমাকে কাছে টানে। পড়ার জন্যে হৃদয়ে তাগিদ অনুভব করি। নবধ্বনি ঈদসংখ্যার সূচি দেখেও আমি প্রচণ্ড আকর্ষিত হই।

নবধ্বনির প্রচ্ছদ, মুদ্রণ, গেটআপ-সেটআপ মানানসই। কনটেন্টস নিউজপ্রিন্টে না হয়ে হোয়াইট পেপার হলে আরও বেশি যুৎসই ও আকর্ষণীয় হতো, অবশ্য সেটা ব্যয়বহুল। সাদা নিউজপ্রিন্ট বাজারে পাওয়া যায়। এটা ব্যবহার করা যায় কি-না কর্তৃপক্ষ ভেবে দেখতে পারেন। কারণ, অতিমূল্যবান লেখা সাধারণ নিউজপ্রিন্টে মুদ্রিত হলে বেশি দিন সংরক্ষণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। তার স্থায়িত্ব কম। ১৭৬ পৃষ্ঠার নবধ্বনি বিষয়বৈচিত্র্য, বর্ণনাশৈলীর স্বাতন্ত্র্য ও ঐতিহ্যপ্রীতির অনুরাগ চোখে পড়ার মতো। গতানুগতিকতার বাইরে গিয়ে সম্পাদনা পরিষদ ভিন্ন স্বাদ ও আমেজে নবধ্বনিকে নবচেতনায় সাজাবার প্রয়াস পেয়েছেন। প্রতিটি পাতায় সম্পাদক তামীম রায়হান, নির্বাহী সম্পাদক সালাহদ্দীন জাহাঙ্গীর, সহকারী

সম্পাদক হাম্মাদ রাগিব ও নাজমুস সাকিব, প্রকাশনা ব্যবস্থাপক আসাদুল্লাহ খান ও সার্কুলেশন ব্যবস্থাপক মুহাম্মদ ইসহাক খানের দরদী মনের ছোঁয়া উপলব্ধি করা যায়। এটাকে বলা যায় টিমওয়ার্কের সফলতা।

নবধ্বনি ঈদসংখ্যায় বড়-ছোট ৩০টির মতো লেখা স্থান পেয়েছে। অধিকাংশ লেখাই মৌলিক। সিরাত সাহিত্য, ইতিহাস, ঐতিহ্য, সভ্যতা, সাক্ষাৎকার, ভ্রমণকাহিনি, প্রবাসজীবন, ছোটোগল্প, মহাজীবন–সব মিলিয়ে নবধ্বনির ঈদসংখ্যাটি সংগ্রহে রাখার মতো ও সযত্নে সংরক্ষণযোগ্য। ইতিহাস ও উত্তরাধিকার ঐতিহ্যের আবেদন বাসি ও পুরনো হওয়ার আশংকা থাকে না।

আমজাদ ইউনুস বিরচিত 'চট্টলায় ইসলামের আগমন, বিকাশ ও সমৃদ্ধি' শিরোনামের লেখাটি মানসম্মত ও তথ্যনির্ভর। হজরত বায়েজিদ বোস্তামি কোনোদিন চট্টগ্রামে আসেননি, এখানে তাঁর কোনো সমাধি নেই–একথাটি তিনি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন ইতিহাসবিদ হামিদুল্লাহ খানের উদ্ধৃতি দিয়ে। ইতিহাসবিদ ড. আবদুল করিম তাঁর রচিত বাংলার ইতিহাস (সুলতানী আমল) গ্রন্থে একই কথা উল্লেখ করেন (বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃ. ৬৫)। সাহাবি হজরত সাদ ইবন আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু আদৌ চীনে গিয়েছেন কি না, নাকি গিয়ে ফিরে এসেছেন, সমসাময়িক ইতিহাসগ্রন্থে এই তথ্য পাওয়া যাচ্ছে না। এটা ব্যাপক গবেষণার ব্যাপার ও প্রমাণ সাপেক্ষ। হজরত সাদ ইবন আবি ওয়াক্কাস রা.-এর কবর আছে মদিনার জান্নাতুল বাকিতে। চীনের ক্যান্টনে যে মসজিদ আছে সেটি তাঁর বাবা আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু নির্মাণ করেন। মসজিদের ওপরে লেখা আছে 'মসজিদ আবি ওয়াক্কাস'। ২০১৯ সালের এপ্রিলে আমি এই মসজিদ পরিদর্শন করি, নামাজ আদায় করি এবং কবর জিয়ারত করি। মসজিদ চত্বরে যে সমাধি তার প্রবেশ পথে লেখা আছে 'হজরত আবি ওয়াক্কাস রা.-এর কবর'। লেখক প্রবন্ধের শেষে তথ্যসূত্র দিয়েছেন ঢালাওভাবে। ইতিহাসনির্ভর নিবন্ধে ক্রমিক নম্বর দিয়ে তথ্যসূত্র উল্লেখ করতে হয়। সেটা দু'ভাবে করা যায়। প্রতিটি পৃষ্ঠার নিচে অথবা নিবন্ধের শেষে। খণ্ড, পৃষ্ঠা, মুদ্রণের সন, প্রকাশকের নাম থাকা জরুরি। এটা ইতিহাস বিষয়ক Research Methodology-এর অংশ।

সালাহউদ্দীন জাহাঙ্গীর লিখিত 'এখানে আমার প্রিয়া ঘুমায়', হাম্মাদ রাগিব রচিত 'আলেম সাংসদ ড. আবু রেজা নদভীর মুখোমুখি', নাবিলা আফরোজ লিখিত 'অটোমানের রাজকীয় হারেম : বিস্ময়ভরা এক অন্দর মহল', ফাহাদ আবদুল্লাহর 'সাইয়েদ কুতুব : মহাকালের ধ্রুবতারা', ইফতেখার জামিলের 'আরমোগানে হেজাজ : ওমরার অসমাপ্ত সফরনামা', সুমাইয়া মারজান রচিত 'মোঘল হেরেমের জ্ঞানতাপসী', অবিশা জান্নাত লিখিত 'রণাঙ্গনের বীরাঙ্গনা', আবিদা সুলতানা উমামা'র 'বীরাঙ্গনা সাহাবিয়্যাহ' বেশ সুখপাঠ্য এবং বারবার পড়তে ইচ্ছে করে।

নিবন্ধকারদের ধারণা স্বচ্ছ, মানস ঐতিহ্যসচেতন, বর্ণনারীতি অস্পষ্টতামুক্ত এবং উপস্থাপনায় মুন্সিয়ানার ছাপ লক্ষণীয়।

সালাহউদ্দীন জাহাঙ্গীরের আরেকটি গ্রন্থ আমার দেখার সুযোগ হয়েছে, 'হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল'। আমি তাঁর লেখার একজন অনুরক্ত পাঠক। হাম্মাদ রাগিব বিভিন্ন অনলাইন নিউজ পোর্টালের পক্ষে আমার বহু সাক্ষাৎকার নিয়েছেন। অনেক সময় সফরকালীন প্রাইভেট কারে, ওয়াজ মাহফিলের আগে পরে অথবা কলেজে ক্লাসের ফাঁকে তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি। ব্যস্ততাজনিত কারণে মাইণ্ডের কনসেন্ট্রেশন থাকে না অনেক সময়, কিন্তু সাক্ষাৎকার প্রচারিত হলে দেখি আমার বিক্ষিপ্ত বক্তব্যগুলো দিয়ে তিনি কথামালা সাজিয়েছেন। তাঁর চিন্তার স্বচ্ছতা, শব্দের গাঁথুনি, বাক্য বিন্যাস ও বাককুশলতা আমাকে মুগ্ধ করে।

নবধ্বনি আরও সমৃদ্ধ হয়ে সামনে এগিয়ে যাক, বাংলাভাষায় ইসলামি সাহিত্য আরও ঋদ্ধ হোক–এটাই আজকের কামনা। আমি নবধ্বনির ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তা কামনা করি।

–ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন
অধ্যাপক (অবসরপ্রাপ্ত), ওসমান গনি কলেজ, চট্টগ্রাম



নবধ্বনি ঈদসংখ্যা
চিন্তার জগতে নতুন এক বাতায়ন

আবুল কালাম আযাদ

অগোছালো ও এলোপাতাড়ি মন্তব্যে গোছানো এক অসাধারণ কাজের অনুভূতি প্রকাশের সাহস করায় প্রথমেই পাঠবিরক্তির জন্য পাঠকের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

একদম প্রথম কলামেই নতুনের বাতায়ন খোলা হয়েছে। বিষয়ে যেমন নতুনত্ব রয়েছে, শিরোনামেও তার প্রভাব পড়েছে। কেননা, সাধারণত প্রথম কলামে যা থাকে, তা হয় সম্পাদকের কলম থেকে। এজন্য এর শিরোনাম হয় সম্পাদকীয়-জাতীয় কোনো শব্দের দ্বারা। নবধ্বনির সম্পাদকীয় কলামের নাম দেয়া হয়েছে 'স্বাগত কলাম'। ম্যাগাজিন বা সাময়িকীতে এমন ধারা নতুনের মধ্যে পড়ে। সম্পাদকীয়ের বিষয়টি যদিও অনেক আগে থেকেই আলোচিত হয়ে আসছে কিন্তু যে অঙ্গনের দিকে নজর দিয়ে বিষয়টি আনা হয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে নতুনের পর্যায়েই পড়ে। কেননা, মহলটির কাছে বিজ্ঞানের কোনো ভেল্যু না থাকলেও অযাচিতভাবে সর্বত্র মিশে যাচ্ছে বিজ্ঞানের ফায়দা। যেহেতু পাত্তা না দিয়েই ফায়দা হাসিল করা হচ্ছে বিজ্ঞান থেকে, তাই অবজ্ঞা ও অবহেলা না করে বরং বিজ্ঞানকে অনুধাবন করে কাজে লাগানোর আহ্বান করা

হয়েছে। এ আহ্বানকে 'কোনো জাতির ভবিষ্যত পরিকল্পনার নবধ্বনি'ই বলা যায়। আসলে একটি ম্যাগাজিনকে পাঠোপযোগী করতে সব রুচির পাঠকের বিষয়টি প্রধান্য দেয়া হয়। যেহেতু সব পাঠক সমান নয়, তাই সব লেখায় সবার আগ্রহ থাকে না। তবে নবধ্বনির বেশিরভাগ লেখাই বহুপাঠের উপযোগী। আমি একজন সাধারণ পাঠক হিসেবে ম্যাগাজিনটির প্রতি আগ্রহী হয়েছিলাম 'তর্কবাগীশের আন্দোলিত জীবন' শিরোনামে লেখাটির জন্য। বছর পাঁচেক আগে আমার এক উস্তাদের লেখা 'স্বাধীনতা যুদ্ধে আলেমদের অবদান' নামক বইয়ের বলতে গেলে আদ্যোপান্ত কাজ আমার হাতেই হয়েছিল। সেখানে মাওলানা তর্কবাগীশের অবদানের বিষয়টি আমাকে মাওলানার প্রতি মারাত্মক দুর্বল করেছিল। মাঝে মাঝে মনে হতো মাওলানাকে বিষদভাবে জানতে চাই। পরে আবার অবহেলার চাদর ঢেকে দেয় সে খাহিশ। এই ম্যাগাজিনে তাঁর যে পরিচয় দেয়া হয়েছে, এবং যেভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে তাতে আমার দুর্বলতা কয়েকগুণ বেড়ে মাওলানার প্রতি শ্রদ্ধায় আমি কাতর হয়ে গেছি। যতটা ছিল বিষয়ের আগ্রহ তার কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে লেখকরে শৈল্পিক উপস্থাপনা। সবচেয়ে উপভোগের ব্যাপার হচ্ছে পুরো ম্যাগাজিনটির প্রতিটি লেখায় শব্দচয়ন ও উপস্থাপন যে-কোনো পাঠককে আকৃষ্ট করবে। ম্যাগাজিনের বেশিরভাগ লেখক পরিচিত হওয়া সত্ত্বেও প্রতিটি লেখায় অন্যরকম নতুনত্ব পেয়েছি।

বলছিলাম মাওলানা তর্কবাগীশের কথা। বৃটিশ-খেদাও থেকে বায়ান্ন হয়ে একাত্তর বলুন, কোথায় নেই আলেমদের অবদান? কেবল অবদান নয়, অনেক ক্ষেত্রে আলেমরাই ছিলেন মূল নায়ক। কিন্তু সময়মতো আমাদের ইতিহাস ঘাঁটাঘাঁটির অবসর ছিল না বা সময় থাকলেও লেখার মতো ভালো কলম ছিল না কিংবা দীনিয়াতের মোকাবেলায় এদিকে গুরুত্ব দেয়া হয়নি। অন্যরাও তা করেনি, অনেকে বরং কুকৌশলে আলোচনায় আনতে দেয়নি। কিছু বুদ্ধিপ্রতিবন্ধীর আড় চোখে তাকানো এবং আলোচনাহীন হতে হতে অনেকে ভাবতে শুরু করেছি যে, হয়তো এই অঙ্গনে আমাদের কোনো অবদান নেই। অথচ একজন শায়খুল হিন্দ, একজন মওলানা আবুল কালাম আযাদ, মাওলানা আব্দুর রশিদ তর্কবাগীশ, মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, মাওলানা আকরম খাঁ, মাওলানা মুহিউদ্দীন খান এবং এমন আরও অগণিত আলেমের অবদান অস্বীকার করলে ইতিহাস অপূর্ণই থেকে যেত। লেখক সালমান সাদ এ ব্যাপারে একটি ছোট্ট নুকতাও উল্লেখ করেছেন এভাবে–'ভাষা আন্দোলনের সময়ে তৎকালীন মাদরাসাছাত্রদের ভূমিকা কী, কোনো সম্পৃক্ততা ছিল কি-না–সামগ্রিক অর্থে এই প্রশ্নটা করা যাবে না, কারণ বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের একুশে ফেব্রুয়ারির দিনটা প্রধানত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-কেন্দ্রিক, সারা বাংলাদেশের সমস্ত স্কুল-কলেজ-ইউনিভার্সিটি এটার সাথে সঙ্গত ও একত্রে সংহত ছিল কিনা এটা যেমন জিজ্ঞাসার নয়, তেমনই জরুরি নয় সমস্ত মাদরাসা।' এমনি অগণিত প্রশ্নের সমুচিত জবাব পুরো ম্যাগাজিনটিকে আলাদাভাবে বিশেষায়িত করছে। আমার কাছে ম্যাগাজিনটির ঈর্ষণীয় বিষয়টি হলো তরুণ লেখকদের ভাষাশৈলী আর শব্দের খই-ফোটা আলোচনা যে কোনো পাঠকের জন্য সুখপাঠ্য। 'এখানে আমার পিতারা ঘুমায়' শিরোনামে লেখক বাঙালিদের জন্য বিশ্বাসের মাটি খুঁড়ে ঐতিহ্যের স্বর্ণখনি উদ্ধারের সুড়ঙ্গ পথ দেখিয়েছেন। প্রকৃত ইতিহাস চর্চার আহ্বান করেছেন, ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনার পাথেয় যুগিয়েছেন। 'সিরাতচর্চার সূচনা বিকাশ ও সমৃদ্ধি' শিরোনামে উঠে এসেছে একজন সিরাতচর্চাকারীর আসল সম্বল। সিরাত পাঠকদের মাইলফলক হিসেবে কাজ দেবে লেখাটি। 'শাহ জালালের সিলেট' শিরোনামে বাংলাদেশে ইসলাম প্রসারে শাহ জালাল রহ. ও সিলেট অঞ্চলের ভূমিকা ভাস্বর হয়ে থাকবে ইতিহাসে। 'প্রবাসযাত্রার গল্প ও আরবের দিনলিপি' শিরোনামে কথাসাহিত্যের দ্বারা প্রবাসীদের জীবনযাত্রা সুন্দরভবে ফুটে উঠেছে। 'আলেম সাংসদ ড. আবু রেজা নদভীর মুখোমুখি' শিরোনামে এজন গুণী মানুষের পরিচয় উঠে এসেছে। ক্ষমতাসীন দল থেকে জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হওয়ায়

বহুপ্রতিভার অধিকারী একজন আলেম ও প্রফেসরের প্রতি যে হীনদৃষ্টির তীর ধেয়ে আসছিল তা অনেকটা ঘুচিয়ে গেছে এই সাক্ষাৎকারে। 'অটোমানের রাজকীয় হারেম : বিস্ময়ভরা এক অন্দরমহল' শিরোনামে উসমানি খেলাফতে নারীদের অবদান এবং ইতিহাসে বহুল চর্চিত 'হেরেম'-এর পরিচয় ফুটে উঠেছে। 'পাত্রী নুরুন্নাহার ও তার মা হাফসা বেগম' শিরোনামে কথা সাহিত্যের ফুলঝুরিতে সমাজের এক ধ্রুবসত্য বাস্তবতা ভেসে উঠেছে। ইউরোপ থেকে আমদানিকৃত লিভটুগেদার বা বিয়ের আগের অভিসার কিংবা দৈহিক সম্পর্কের কুফলে অগণিত কোমলমতির জীবন অমানিশায় বিলীন হয়ে যাওয়ার এক চরম বাস্তবতা এ লেখাটি। 'সেন্ট মার্টিন : নীল জলের হাতছানি' শিরোনামে বিশ্ব পর্যটকদের আগ্রহের স্থান কক্সবাজার ও বাংলাদেশে ইসলামি ইতিহাসের স্বাক্ষী জাযিরায়ে নারাজিল বা নারকেল জিঞ্জিরা–যা বর্তমানে সেন্ট মার্টিন দ্বীপ নামে পরিচিত, তার শিক্ষনীয় ভ্রমণকাহিনি বিবৃত হয়েছে। 'প্রতীক্ষাকাল' শিরোনামে বাংলাদেশের নোংরা রাজনীতির কুফল ক্ষমতার অপব্যবহারে বলির পাঠা হওয়া স্বজনহারা মানুষের বিয়োজনব্যথার এক করুণ কাহিনি উঠে এসেছে। 'সাইয়েদ কুতুব শহিদ : মহাকালের ইতিহাসে এক ধ্রুবতারা' শিরোনামে একজন সমাজ-পরিবর্তশীল বিপ্লবী মানুষের আলোকিত জীবনধারা ফুটে উঠেছে। 'আরমুগানে হেজাজ : ওমরার অসমাপ্ত সফরনামা' শিরোনামের লেখাটির লেখক সহপাঠী ইফতেখার জামিল। একজন তরুণ শিকড়ের গবেষক। হেজাজ নিয়ে আমার আগ্রহ অনেক। তাই হেজাজ, মক্কা-মদিনা শিরোনাম দেখলেই আলাদা একটা অনুভূতি কাজ করে ভেতরে। এই লেখায় লেখকের রুচির বাইরে না গিয়েও সাড়া জাগানোর মতো একটি সফরনামা তৈরি হয়েছে। কেননা, লেখকের দার্শনিক গবেষণার রুচির কথা সহপাঠী হিসেবে আগে থেকেই জানা ছিল। এই লেখায়ও তিনি আল্লামা ইকবাল, শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভি, ইমাম রাজিদের মতো দার্শনিকদের রেফারেন্সই বেশি টেনেছেন। তারপরও হেজাজ-প্রেমীদের জন্য প্রাণবন্ত একটি সফরনামা এটি। 'নস্টালজিয়া' শিরোনামে ক্যাম্পাসের গল্পটিও সুন্দর। 'মোঘল হেরেমের জ্ঞানতাপসী' শিরোনামে আলোচিত হয়েছে এক মহিয়সী নারীর জীবনবৃত্তান্ত। মোঘল সম্রাট বাদশাহ আওরঙ্গজেবের মহিয়সী কন্যা জ্ঞানতাপসী জেবুন্নেনসার বর্ণিল জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করা হয়েছে এই লেখাটিতে। 'রণাঙ্গনের বীরাঙ্গনা' শিরোনামে আলোচিত হয়েছে মহিয়সী নারীযোদ্ধা সাহাবিয়া খাওলা বিনতে আজুর রা.-এর বীরত্বগাঁথা। 'বীরাঙ্গনা সাহাবিয়্যাহ' শিরোনামেও তেমনি ঈমানদ্বীপ্ত আরেক নারীযোদ্ধা সাফিয়্যাহ বিনতে আব্দুল মুত্তালিব রা.-এর বীরত্বগাঁথা বিবৃত হয়েছে।

এভাবে আরও বেশকটি হৃদয়কাড়া শিরোনাম একজন উৎসুক পাঠককে বাধ্য করবে ম্যাগাজিনটি সংগ্রহ করতে। সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং বিষয় হলো নবীন এবং তরুণ লেখকদের এ গোছালো আয়োজন অনেক প্রবীনকেও ঈর্ষান্বিত করবে। আরও এগিয়ে বললে কওমি ঘরানার এমন আয়োজন বাংলা সাহিত্য ও বাঙালি পাঠকদের জন্য বিস্ময়করও বলা যেতে পারে। কেননা, যেখানে কওমিদের বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে আড়চোখে দেখা হয়, সেখান থেকে এমন পাকা আয়োজন তথাকথিত দাদাবাবুদের উচ্ছিষ্টভোগী সাহিত্যের ঠিকাদারদের গাত্রদাহেরও কারণ এ ম্যাগাজিনটি।

লেখক : মুহাদ্দিস, জামিয়া ইসলামিয়া বুধবারী বাজার, গোলাপগঞ্জ, সিলেট



কিছু স্মৃতি কিছু অভিমান

ফাহিম আবরার

আসরের পর মাদরাসা ছুটি হতেই এক দৌড়ে বাড়ি এলাম। তালিম-ঘরে তালিম হচ্ছে। পেটে প্রচণ্ড ক্ষুধা। ফলের ঝুড়ি হাতড়ে বড়সড় একটা আপেল নিলাম। একটা কামড় বসিয়ে ঘর থেকে বের হলাম, উদ্দেশ্য পুকুরপাড়ের বেল গাছ। গ্রামের ছেলেরা নাকি অতি দ্রুত গাছে চড়া শিখে ফেলে। আমি গ্রামের না হলেও গ্রামে আছি প্রায় দুই বছর। এতদিনে কম-বেশি সব গাছই চষে বেড়ানোর কথা। কিন্তু বহু চেষ্টা করেও এই কম্মো আমার দ্বারা হাসিল হয়নি। এই বেল গাছটা ব্যতিক্রম। প্রথম চেষ্টাতেই আমি গাছে চড়তে সফল। গাছটাও যেন আপন করে নিল আমাকে।

এরপর থেকে প্রতিদিন আসরের পর আমার একটাই কাজ, খাবার-দাবার নিয়ে গাছে ওঠা। সূর্যের আলো আস্তে আস্তে নিস্তেজ হয়, শুরু হয় হাজারও পাখির কলরব। পাখির কিচিরমিচিরের সাথেই যেন হয় আমার মিতালী। স্তব্ধ পৃথিবী, পড়ন্ত বিকেলের শীতল হাওয়া, আরামে চোখ বুজে আসে। গাছের সবচেয়ে নিচু ডালটি মোটা হয়ে বেঁকে গেছে অনেকটা, যেন কারও বসার জন্য বানানো হয়েছে ওটাকে। ডালে বসে পা দুলাই আর হাতে থাকা আপেলটাতে কচ করে কামড় দিই। মাঝে মাঝে ও বাড়ির ছোটো নানা আসেন পুকুর থেকে পানি নিতে, আমাকে দেখলে জিজ্ঞেস করেন, 'কী রে? সন্ধ্যেবেলা গাছে উঠে বসে আছিস কেন?'

'এমনি।'

'এই সময় গাছে জিন-ভূত থাকে জানিস না?'

আমি কোনো উত্তর দিই না। নানা তাড়া দেন, 'শিগগিরই নেমে আয়।'

আমি নির্বিকার জবাব দিই, 'পরে নামব।'

নানা বিড়বিড় করতে করতে বাড়ির পথ ধরেন। গাছের উপরের ডালগুলোতে আমি ওঠার চেষ্টা করি না; একবার করেছিলাম, ফলাফল ভালো হয়নি। পড়তে পড়তে বেঁচে গেছি। পড়ে গেলে হয়তো হাত-পা ভাঙত, তখন দোষ দেওয়া হতো গাছটাকে। গ্রামে-গঞ্জে কোনো কথা রটে যায় খুব সহজেই। দেখা গেল কিছুদিন পর মা তার ছেলে মেয়েদের বলছে, 'এই, তোরা কিন্তু পুকুর পাড়ে কখনোই যাবি না, ঐখানে বেল গাছে জিনের বাস আছে।' এই সুবাদে হিন্দুরাও হয়তো এসে পুজো দিতো। যাক বাবা, বড় বাঁচা বেঁচে গেছি। সেদিনের পর থেকে এই নিচু ডালটাই আমার আস্তানা।

পড়ন্ত বিকেলের নরম আলো, উদাস দৃষ্টি, আমি হারিয়ে যাই কল্পনার রাজ্যে। মাঝে মাঝে খুবই ইচ্ছে হয় কারও সাথে কথা বলতে, তখন কথা বলি তার সাথে। সে অবশ্যি বলে না, কথা যা বলার আমিই বলি, সে শুধু শুনে যায়।

আমার চোখদুটো অস্থির হয়ে খুঁজছে বেল গাছটাকে। এই তো এখানেই ছিল।কিন্তু কোথায় বেল গাছ! সমস্ত জায়গা জুড়ে মস্ত বড় এক পাকা-ঘর। আমি অযথাই ঘোরাঘুরি করতে লাগলাম। মনকে প্রবোধ দিলাম, হয়তো ভুল জায়গায় এসে গেছি। মন এই মিথ্যাপ্রবোধ গ্রহণ করে নিল।

নিয়তির নির্মম সত্যকে সে মেনে নিতে চাইল না। ছোটো নানাকে দেখলাম বাড়ি থেকে বের হচ্ছেন, আমাকে দেখেই বললেন, 'কী খবর নাতি! কখন আসলা? এবার তো বহুদিন পরে আসছ।'

'জি নানাভাই, ভালো আছি।' আঙুল দিয়ে ইশারা করে বললাম, 'এখানে একটা বেল গাছ ছিল...'

'ও, ওটা তো কেটে ফেলেছি। দেখো না কত সুন্দর একটা ঘর উঠিয়েছি।' নানার চোখ-মুখ খুশিতে চকচক করছে, নানা আরও কী কী যেন বললেন তারপর, আমার কান দিয়ে ওসব ঢুকলেও খেয়াল তখন ওই ঘরের দিকে। শূন্য দৃষ্টিতে ঘরটার দিকে তাকিয়ে রইলাম শুকনো একটা হাসি ধরে রাখার বৃথা চেষ্টা চালিয়ে।

কথা বলতে বলতে নানা ফিরে গেলেন ততক্ষণে; নিজের অজান্তেই চশমার ফাঁক গলে গড়িয়ে পড়া দুফোঁটা অশ্রু তাঁর নজর এড়িয়ে গেল।

লেখক : শিক্ষার্থী: মাদ্রাসা বাইতুল উলুম, ঢালকানগর

নবধ্বনি

আগস্ট ২০১৯ । বর্ষ ১২ । সংখ্যা ০৭

বইয়ের সঙ্গে
বেঁধেছি আমার প্রাণ



আগস্ট ২০১৯ । বর্ষ ১২ । সংখ্যা ০৭

সম্পাদক
তামীম রায়হান

নির্বাহী সম্পাদক
সালাহউদ্দীন জাহাঙ্গীর

সহকারী সম্পাদক
হামমাদ রাগিব
নাজমুস সাকিব

প্রকাশনা ব্যবস্থাপক
আসাদুল্লাহ খান

সার্কুলেশন ব্যবস্থাপক
মুহাম্মদ ইসহাক খান

মূল্য ৫ টাকা মাত্র

নবধ্বনি । দোকান নং ২৭ । ২য় তলা । ইসলামী টাওয়ার ১১/১ বাংলাবাজার । ঢাকা
সার্কুলেশন : ০১৩১৮ ৬৩৪৪১২ । সম্পাদনা : ০১৭৪৫ ১৩৯২১৫

Email: nobodhoni@gmail.com   web: noboprokash.com/nobodhoni

স্বাগত কলাম

ভাবছিলাম যে, আমাদের সমস্যাটা আসলে কোন জায়গায়? কেন বাংলাদেশের উন্নয়ন হচ্ছে না? প্রথমত এর জন্য আমরা আমাদের বিশাল জনসংখ্যার দোষ দেই, দ্বিতীয়ত শিক্ষার অভাব, তৃতীয়ত...এভাবে আমরা নানা কিছুর দোষ দিয়ে হাজারটা অজুহাত দাঁড় করিয়ে ফেলি। কিন্তু গভীরভাবে ভাবতে গেলে, বা একটু অন্যভাবে ভাবতে গেলে আমরা অন্য একটা সমীকরণের চিত্র দেখতে পাই। সেই সমীকরণটা আপনাদের কাছে খুলে বলি। গলতটা আমাদের গোড়ায়, মানে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায়। দেখুন, মেনে নিলাম আমাদের দেশে স্বাক্ষরতার হার কম, সমাজের ৩০ শতাংশ মানুষ এখনও অশিক্ষিত; কিন্তু তাই বলে কি আমাদের দেশে শিক্ষিত মানুষের সংখ্যা কম? আমাদের দেশের যে আয়তন, আমাদের যে পরিমাণ কর্মসংস্থান এবং যে পরিমাণ সম্পদ রয়েছে, হিসাব করলে দেখা যাবে সে অনুপাতে শিক্ষিত মানুষের হার অনেক বেশি। আমরা যদি জনসংখ্যার অনুপাতে শিক্ষিত মানুষের শতকরা হার হিসাব না করে, কত সংখ্যক শিক্ষিত মানুষ আমাদের দেশে রয়েছে–সেটা যদি হিসাব করি তাহলে এর সঠিক চিত্র আমাদের সামনে চলে আসবে। সে হিসেবে আমাদের দেশে শিক্ষিত জনসংখ্যা বিপুল।

তাহলে সমস্যাটা কোথায়? সমস্যা হলো আমাদের শিক্ষায়। আমাদের স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, মাদরাসা বা অপ্রাতিষ্ঠানিক যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে, এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাব্যবস্থা বা শিক্ষা কারিকুলাম উপনিবেশী সময়ে প্রণয়ন করা হয়েছে। অর্থাৎ কীভাবে পড়ানো হবে, কী কী পড়ানো হবে, কোন সময় পড়ানো হবে, পাঠ্যপুস্তকের মূল ভাবনা কেমন হবে, শিক্ষার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য কী হবে–এমন যাবতীয় সকল কারিকুলাম প্রণয়ন করা হয়েছিল ব্রিটিশ শাসনামলে, যাকে আমরা উপনিবেশ সময় বলে থাকি। তো, সেই সময়ে এ দেশে শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল লেখাপড়া শিখে কিছু লোক ইংরেজদের বশংবদ হিসেবে তৈরি হবে, তাদের অধীনে চাকরি-নোকরি করবে–এই। এর বাইরে মহৎ কোনো উদ্দেশ্য এ শিক্ষাব্যবস্থায় রাখা হয়নি। এই শিক্ষা কারিকুলাম সম্পূর্ণভাবে চাকরি ও জীবিকার উদ্দেশে প্রণীত হয়েছিল।

ইংরেজদের থেকে ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে ৭০ বছর হয়ে গেল, বাংলাদেশের স্বাধীনতারও ৫০ বছর পূর্তি হবে বছর দুয়েক পর। কিন্তু আমরা কি সেই উপনিবেশী শিক্ষাধারা থেকে নিজেদের মুক্ত করতে পেরেছি? শিক্ষা মানেই আমাদের কাছে এখনও চাকরিরই অন্য নাম। কারণ দীর্ঘ দুইশ বছরের ব্রিটিশ উপনিবেশ আমাদের এটাই শিক্ষা দিয়ে গেছে। কিন্তু শিক্ষার অপর নাম হওয়ার কথা ছিল সৃজনশীলতা, জ্ঞানের বিস্তার, বিজ্ঞানের উন্নয়ন। দুঃখজনকভাবেই সেটা হয়নি। আমরা সেই কারিকুলাম থেকে বের হতে পারিনি। ফলে আমরা যতই শিক্ষিত হই বা আমাদের স্বাক্ষরতার হার যতই বাড়ুক, আমাদের মানসিকতা এখনও বশংবদ হওয়ার শিক্ষা নিয়েই বড় হচ্ছে। চাকর হওয়ার নানা ধরনের কথামালা দিয়ে সাজানো আমাদের সিলেবাস আর পাঠ্যপুস্তক। এই শিক্ষাব্যবস্থা কখনোই আমাদের উন্নয়নের সবক শেখাতে পারবে না।

আমাদের নবীজির ইতিহাস দেখুন। তিনি কিন্তু নিরক্ষর ছিলেন, তাঁর চার খলিফার সবাই সামান্য অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন মাত্র। তবু মাত্র ৩৭ বছরে তারা অর্ধেক পৃথিবী জয় করেছিলেন। এবং জ্ঞান ও বিজ্ঞানে মাত্র একশ বছরের মাথায় মুসলিম সাম্রাজ্য পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্যের স্বীকৃতি পেয়েছিল। কারণ, মুসলিমরা যেখানেই গিয়েছেন সেখানেই উন্নয়ন ও উদ্ভাবনী পড়াশোনাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছেন।

ব্যাপারটা হলো, আপনি কতটুকু শিক্ষিত–সেটা দেখার বিষয় নয়; আপনি কী শিক্ষা পেয়েছেন–সেটাই হলো আপনার আগামী পৃথিবী নির্মাণের হিরন্ময় হাতিয়ার।



আমার বই পড়া

তামীম রায়হান

প্রতিদিন সকালে আমি নিয়ম করে বই পড়ি। সপ্তাহে পাঁচদিন কাতারে আমার সরকারি কর্মদিবস শুরু হয় ভোর ছয়টায়। আমি হাজির হই পৌনে ছয়টায়। এরপর সামনে চা পরিবেশিত হয়, চায়ে চুমুক দেওয়ার আগে কম্পিউটারে বই পড়তে শুরু করি। খুব সকালে চায়ের কাপে চুমুক আর সামনে থাকা ডেস্কটপ মনিটরের বেশ বড় স্ক্রিনে বাংলা বই পড়া–এই দুয়ে মিলে যে আনন্দ অনুভূত হয়, তা শুক্র ও শনিবারের ঘুমে ডোবা সকালের চেয়েও বেশি আনন্দময়। আমাদের সরকারি কম্পিউটারে সব ধরনের সংযোগ বন্ধ করা থাকে। পেনড্রাইভ, সিডি, ইন্টারনেট–নিরাপত্তার খাতিরে সব অচল করা। তারপরও একদিন এক 'টেকনিশিয়ান'কে পেয়ে হাতে পায়ে ধরে আমার একগাদা পিডিএফ ফাইল কম্পিউটারে স্থানান্তর করিয়ে নিয়েছিলাম, তখন থেকে প্রতিদিন সকালে এই শ শ পিডিএফ থেকে আমার বই পড়ার আনন্দময় সকালের শুরু।

আমি কী পড়ি? এই প্রশ্নের উত্তর এক কথায় কিংবা অল্প কথায় দেওয়া সহজ নয়, সম্ভব নয়, উচিতও নয়। তবে বাংলাভাষায় সাধারণ ধারার অন্তত দুজন লেখকের বই আমি পড়ে বারবার বিমোহিত ও

আনন্দিত হই। সৈয়দ মুজতবা আলী এবং হুমায়ুন আহমেদ। অন্য কোনো লেখকের লেখা পড়ে আমি এমন গভীর আনন্দে আপ্লুত হইনি। প্রতিদিন সকালে তাই এ দুজনের সঙ্গে আমার সকাল শুরু হয় এই সময়ে। মাঝে মাঝে আরব লেখকদের লেখাও পড়ি, তবে সেগুলো বলবার ইচ্ছা আপাতত নেই। বাংলাভাষায় বেশ কয়েকজন লেখক আছেন, যাদের সবগুলো বই আমি পড়েছি। কিন্তু বড়াই করে তাদের নামও বলার মতো ইচ্ছা নেই।

আরও প্রায় এক দশক আগে, আমি গভীর মনোযোগ দিয়ে যে বইটি পড়েছিলাম, সেটি ছিল সংগ্রামী সাধকদের ইতিহাস। ভারতের প্রখ্যাত পন্ডিত সাইয়েদ আবুল হাসান আলি নদভির লেখা 'তারিখে দাওয়াত ও আযিমত' বইয়ের অনুবাদ ছিল সেটি। কয়েক খন্ডে প্রকাশিত এই বইটি আমার খুব প্রিয় ছিল। আমি একাধিকবার তা পড়েছি, চেনাজানা প্রিয়জনদেরকে পড়তে বলেছি এবং এখনও বলি।

এরও আগে আমার ভালো লেগেছিল 'আলোর মিছিল' নামে প্রকাশিত একটি বই। এটি ছিল আব্দুর রহমান রাফাত পাশার 'ছুওয়ারুম মিন হায়াতিস সাহাবাহ' বইয়ের অনুবাদ। তবে আলোর মিছিলের প্রথম দু খন্ড যেভাবে আমাকে মুগ্ধ করেছিল, পরের খন্ডগুলো সেরকম আর ভালো লাগেনি।

কৈশোর ও তারুণ্যের যে বয়সে আমার আশেপাশের অন্যরা যখন খেলাধুলা, প্রেম-ভালোবাসা কিংবা তৃতীয় কোনো নেশায় বিভোর, আমি তখন ডুবে ছিলাম বইয়ের রাজ্যে। আমার ফেলে আসা দিনগুলোয় এটি এক পরম অর্জন। ভারত-পাকিস্তানের সাইয়েদ আবুল হাসান আলি নদভি, মুফতি তকি উসমানি থেকে শুরু করে বাংলার কাজী নজরুল ইসলাম, ফররুখ আহমদ, শামসুল হক ফরিদপুরীসহ ইসলামি এবং সাধারণ ধারার প্রচুর লেখকের বই আমি প্রায় সবটুকু পড়েছি। আমার জানাশোনার জগতকে সমৃদ্ধ করতে এই লেখকদের প্রতি আমার তাই কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। সে সময় ইন্টারনেট-ফেসবুকের এই নেশাকর ছড়াছড়ি ছিল না, সেজন্য আমি মহান দয়াময়ের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। থাকলে এই এত এত বই আমার পড়া হতো কি-না, বলা যায় না।

বই পড়ার নিমগ্নতা দেখেছি, এমন দুজনের কথা আমার মনে পড়ে। একজন আমার সহপাঠী ও বন্ধু জাবের, সম্বোধনের ভাষায় 'জাবের ভাই'। এখন সে সুদূর জাপানে। আমাকে উপহার হিসেবে দেওয়া তাঁর বইগুলো আমাকে বইপড়ার জগতে অনেক দূর এগিয়ে দিয়েছে, এই ঋণ স্বীকারে লজ্জা নেই, বরং গৌরব অনুভব করি। শৈশব থেকে তাকে দেখেছি বইয়ের পাতায় ডুবে থাকতে। মাসুদ রানা থেকে শুরু করে কত রকমের বই যে তাঁর পড়া, সেটা বলে শেষ করা যাবে না। আরেকজন ব্যক্তিত্ব হলেন মুফতি ফজলুল হক আমিনী রহ.। বইয়ের এমন মনোযোগী ও নিবেদিতপ্রাণ পাঠক আমি এই জীবনে আর দেখবো বলে মনে হয় না। তাঁর দিবস ও রজনী ছিল বই নিয়ে। ঘরে বাইরে বই ছিল তাঁর একমাত্র নিত্যসঙ্গী। চেয়ার-টেবিলে বা গাড়ির আসনে, বই হাতে তাঁর নিমগ্নতার সেই মধুর ছবি এখনো আমার চোখে চোখে ভাসে।

বই পড়ার জন্য আমি অনেককে উৎসাহ দিয়েছি। বই কিনে উপহার হিসেবে দিয়েছি, নিজের পক্ষ থেকে ধারও দিয়েছি, চেয়েছি বইয়ের মাদকতায় আটকে দিতে। কিন্তু কখনো সফল হয়েছি, কখনো ব্যর্থ। খুব সম্প্রতি যাদের কথা এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে, তাদের মধ্যে রানা উল্লেখযোগ্য। এখন সে নিয়মিত বই পড়ে, তাঁর মুখে নানা বইয়ের গল্প শুনতে আমারও ভালো লাগে।

আমার বন্ধুদের মধ্যে শাকিল এককালে বেশ বই পড়ত, এখন আগের মতো পড়ে কি-না, তা নিয়ে আমি সন্দিহান। তবুও প্রতিবার দেশে গেলে শাকিলের বাসা থেকে দুয়েকটি বই আমি নিয়ে কাতারে চলে আসি। ফলে সেগুলো ফেরত দেওয়ার সুযোগ আর হয়ে ওঠে না। পরেরবার দেশে গিয়ে আমি খুঁজে দেখি, আমার নিয়ে আসা বইগুলোর খালি জায়গায় সে নতুন কোনো বই কিনে রেখেছে কি-না। কখনো পাই, কখনো না।

গত দু বছরে মাস্টার্সের পড়ালেখা থাকায় প্রচুর একাডেমিক বই পড়তে হয়েছে।

এসবের মধ্যে নানা ধর্মের ধর্মতত্ত্ব ছিল প্রধান বিষয়। এই ধর্মতত্ত্বের বই খুঁজতে গিয়ে চোখে পড়েছে আরও অনেক অনেক বিষয়ের চমৎকার বই। সেগুলোর কিছু কিছু তখনই পড়েছি, বাকিগুলো এখন পড়ছি। আবার নবপ্রকাশের জন্য বই বাছাই করতে গিয়েও অনেক বই পড়তে হয়, এটিও আমার জন্য আনন্দদায়ক। কারণে-অকারণে কিংবা সময়ে-অসময়ে বই নিয়ে কেটে যাক আমার এই জীবন, এতে আমার হারানোর কিছু নেই। একজন মানুষের জীবনে বই পড়তে পারার চেয়ে বড় প্রাপ্তি ও প্রশান্তি আর কী হতে পারে!

লেখাটি শেষ করার আগে অতীতকালে মনীষীদের বই পড়া ও বই নিয়ে তাদের অভিজ্ঞতার কিছু কথা তুলে ধরছি। ইবনে শিহাব জুহরি ছিলেন একজন প্রখ্যাত আলেম। বইপত্রের প্রতি তার আসক্তি ছিল প্রবাদতুল্য। সারাক্ষণ বই পড়ায় ডুবে থাকতেন তিনি। মাঝেমধ্যে ভুলে যেতেন সংসার-দুনিয়ার কথা। তার স্ত্রী প্রায়ই বলতেন, আল্লাহর কসম, এই বইপত্র আমার কাছে তিন সতীনের চেয়েও অসহনীয়।

ইবনে জাওজি নিজের সম্পর্কে লিখেছেন, আমি এ পর্যন্ত প্রায় বিশ হাজার বই পড়ে শেষ করেছি, কিন্তু আমি এখনও নতুন নতুন বইয়ের সন্ধানে অস্থির হয়ে থাকি। নিজেকে আমি এখনও ছাত্র মনে করি। আমি যখন এমন কোনো নতুন বই দেখি, যা আমি আগে দেখিনি, মনে হয় আমি অমূল্য রত্নভান্ডার পেয়েছি।

ইমাম ইবনে তাইমিয়ার নাম জানে না, এমন জ্ঞানী মানুষ হয়তো হাতেগোনা। তার বাবা যখন প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে শৌচাগারে যেতেন, তখন তার ছেলে কিংবা নাতিদের কাউকে ডেকে বলতেন, তুমি অমুক বইটির পাতা থেকে জোরে জোরে পড়ো, আমি শৌচাগারে বসে শুনছি।

কেউ একজন হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারককে এসে বললো, আপনি এত দীর্ঘ সময় বাড়িতে একা একা বসে থেকে কী করেন? তার চেয়ে বরং আমাদের সঙ্গে বসুন, সময় দিন। ইবনে মুবারক বললেন, কোথায় একা! আমি তো রাসুল সা. এবং তাঁর সম্মানিত সাহাবিগণের সঙ্গে সময় কাটাই। আর তোমরা তো এখানে বসে বসে মানুষের গিবত বলে বলে সময় পার করো।' তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, আমার ঘরে যে হাদিসের বইপত্র আছে, আমি সেসব অধ্যয়নে ডুবে থাকি। যেহেতু এগুলো হাদিসের অধ্যয়ন, আমি তখন নিজেকে নবী সা. এবং সাহাবিদের সান্নিধ্যে মনে করি।

হাসান আললুলুই নিজের প্রসঙ্গে বলেছেন, গত চল্লিশ বছর ধরে আমি যখন ঘুমিয়েছি কিংবা ঘুম থেকে জেগে উঠেছি, আমার বুকে তখনও বই রাখা ছিল। আমি পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে যেতাম, ঘুম ভেঙে গেলে আবার পড়া শুরু করতাম। বই হাতে নেই অথচ আমি ঘুমিয়ে পড়েছি–গত চল্লিশ বছরে এমন ঘটেনি আমার বেলায়।

প্রসিদ্ধ আলেম ফিরোজাবাদী তার জীবনে বইপত্র কেনার জন্য যে অর্থ ব্যয় করেছিলেন, তার পরিমাণ ছিল পঞ্চাশ হাজার মিসকাল স্বর্ণমুদ্রা। তিনি যেখানে যেতেন, সঙ্গে বইয়ের সুবিশাল স্তূপ নিয়ে যেতেন।

লেখক: সম্পাদক, মাসিক নবধ্বনি



আমার প্রিয় বই

নাজমুস সাকিব

প্রিয় বই কোনটি, এই প্রশ্ন একজন সত্যিকারের পাঠকের কাছে অনেক জটিল। জ্ঞানান্বেষী পাঠক যিনি, তাঁর কাছে পাঠযোগ্য বইমাত্রই প্রিয়। জ্ঞানের সমুদ্রে যে-কোনো বইয়েই কোনো না কোনো জ্ঞানমুক্তা পাওয়া যায়। এরপরও কিছু কিছু বই প্রিয় মনে হতে পারে। এই প্রিয় হওয়া কোনো সূত্র মেনে চলে না। প্রিয় বই হতে পারে নানা ধরনের। কোনো বই শুধু একবার পড়েই প্রিয়। কোনো বই এতই প্রিয় যে বারবার পড়েও শখ মেটে না। আবার কত বই তো বারবার পড়লেও অপ্রিয় থেকে যায়। আমাদের টেবিলে থাকা পাঠ্য বইয়ের স্তূপের বেশিরভাগ বইই তো এমন, তাই না?

প্রিয় বই নিয়ে লিখতে গিয়ে অনেক ভেবেছি। মনে হয়েছে কিছু বইকে যদি প্রিয়ের তালিকায় রাখি তাহলে অন্য অনেক বইয়ের প্রতি অবিচার করা হবে। তবু স্মৃতি থেকে কিছু প্রিয় বইয়ের নাম বলি।

ছোটবেলায় আমাদের বাসায় থাকা বহু বইয়ের স্তূপ থেকে ছোটদের ইসলাম নামে একটি বই পেয়েছিলাম। ছবিসহ এই বইটি দাগ কেটেছিল মনে। এছাড়া ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ছোটদের অনেক বই ছিল প্রিয়ের তালিকায়। নাম মনে নেই, তবে বইগুলোর গল্প এখনো মনে উজ্জ্বল।

'চাঁদ হলো দু টুকরো' নামে একটি বই আছে। লেখক মাওলানা আবু তাহের মিসবাহ। তাঁর শেষজীবনে লেখা বইয়ের অনেক পাঠকই জানেন না এই নামে তিনি একটি বই লিখেছিলেন। কী অদ্ভুত সুন্দর শৈলী ছিল বইটির। ছয় বছর

বয়সে এক দিনেই পড়ে ফেলেছিলাম। একটুও বুঝতে অসুবিধা হয়নি। এছাড়া এই লেখকের আকিদা সিরিজ ও সিরাত সিরিজ পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলাম। বই দুটি আমাদের সামনে খুলে দিয়েছিল অবারিত জ্ঞানের দ্বার। সেই শৈশবেই তাজা ঈমানের বীজ বুনে দিয়েছিল আমাদের কচি হৃদয়ে। বইদুটি বাংলাভাষী মুসলিম শিশুর অবশ্যপাঠ্য হওয়া উচিত।

এই সময়ে আরেকটি বই প্রিয় হয়েছিল আমার। নাম 'সোনালি শাহজাদা'। মনকাড়া প্রচ্ছদের এই বইটি পড়ে কত যে দুপুর কেটেছে। কতবার পড়েছি হিসাব নেই। বইটির লেখক সাজজাদ হোসাইন খান। তাঁর আরও কিছু বই চোখে পড়েছে। পড়া হয়নি। তবে এই একবই দিয়েই তিনি গভীর দাগ কেটেছিলেন আমার কচিমনে।

মাঝে দীর্ঘ সময় বইপড়া হতো অনেক কম। মাদরাসার পাঠাগারই ছিল একমাত্র ভরসা। মালিবাগ মাদরাসায় পেয়েছিলাম বিরাট এক পাঠাগার। সাধ্যমতো কিছু বই পড়েছিলাম সেখান থেকে।

অধ্যাপক একিউ এম বদরুদ্দোজার দুটি বই পড়েছি। তাঁর লিখনশৈলী অনেক আকর্ষিত করেছে আমাকে। প্রথম পড়া বইটি ছিল ইন্দোনেশিয়ার ভ্রমণকাহিনি। বইটির নাম স্মৃতিতে নেই। দ্বিতীয় বইটির নাম বলা নিষেধ।

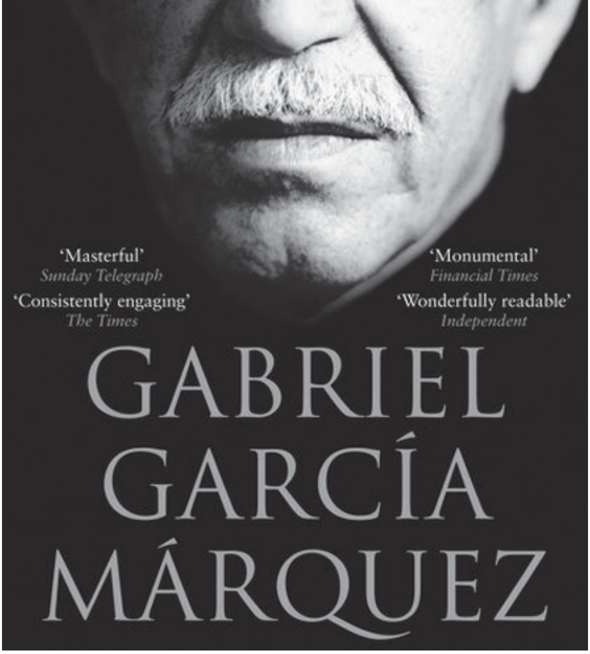
একজন রাজনীতিক এত সুন্দর লিখতে পারেন তাঁর লেখা না পড়লে বুঝতাম না। তাঁর রাজনৈতিক পরিচয়ের কাছে লেখক পরিচয় যদিও ফিকে তবু তাঁর লেখক সত্ত্বা স্বমহিমায় ভাস্বর।

বাংলাদেশের কোটি পাঠকের মতো আমিও হুমায়ূন আহমেদের একজন ভক্ত পাঠক। তাঁর বই অল্প অল্প করে পড়ি। কারণ তিনি তো আর লিখবেন না। খুব সাধারণ বিষয় দিয়ে তিনি যে ঘোরলাগা আবহ তৈরি করতে পারেন তা শুধু বাংলাভাষার লেখক কেন বিশ্বের অনেক বিখ্যাত লেখকের লেখায়ও অনুপস্থিত।

হুমায়ূন আহমেদের 'অন্ধকারের গান' বইটি কেন যেন অনেক ভালো লেগেছিল। 'মধ্যাহ্ন' আর 'বাদশাহ নামদার' তো কয়েকবার পড়েছি, আর প্রতিবার মুগ্ধ হয়েছি নতুন করে।

শুধু বাংলা বইয়ের কথা বললাম। সামান্য যা কিছু আরবি আর ইংরেজি বই পড়া হয়েছে তার তালিকায়ও কিছু প্রিয় বই আছে। আজ থাক, আরবি ও ইংরেজির কথা অন্যদিন না-হয় বলব।

লেখক : সহকারী সম্পাদক, মাসিক নবধ্বনি



বই লেখকের দুর্ভাগ্যগুলো

গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেস

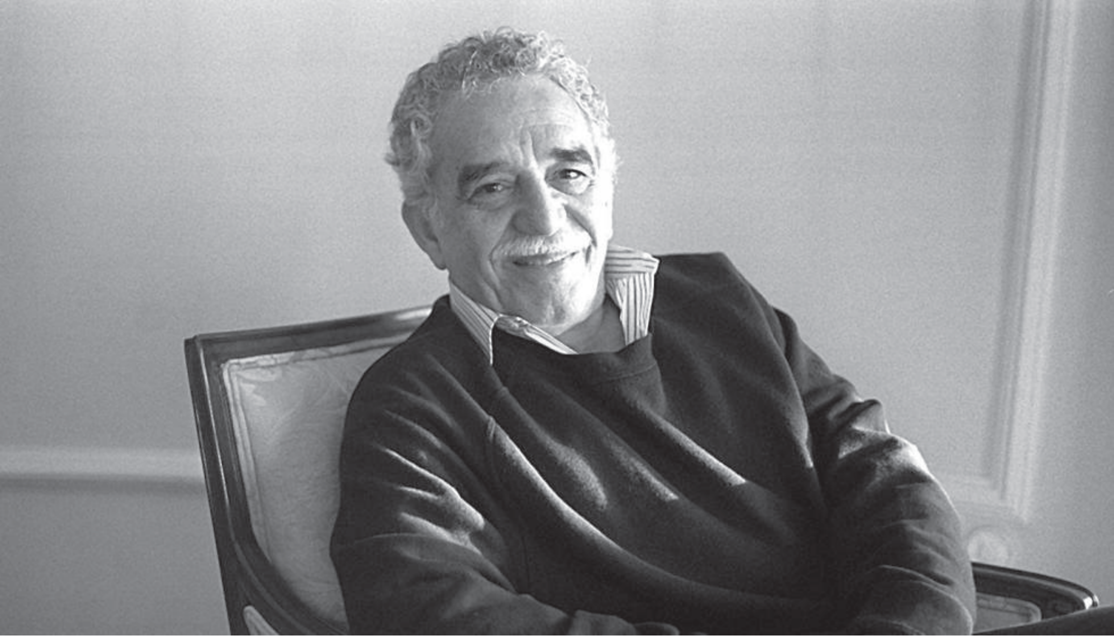
পাঠকের দৃষ্টিতে লেখক যেমন, এর বাইরেও নানা বাস্তবতা থাকে লেখকের, থাকে বিচিত্র দুর্বিপাক। আবার বস্তুগত দিক দিয়ে তাঁর প্রাপ্তির পরিমাণও প্রায় নেই বললেই চলে। তারপরও কেন লেখেন একজন লেখক? ১৯৬৬ সালে 'মিস অ্যাডভেঞ্চারস অব আ রাইটার অব বুকস' শিরোনামের এক লেখায় প্রশ্নটির উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছিলেন মার্কেস। তাঁর সাংবাদিকজীবনের বিভিন্ন লেখা নিয়ে প্রকাশিত 'দ্য স্ক্যান্ডাল অব দ্য সেঞ্চুরি অ্যান্ড আদার রাইটিংস' বইয়ে সংকলিত হয়েছে এ লেখাটি। অনুবাদ করেছেন নুসরৎ নওরিন।

বই লেখা একটা আত্মঘাতী কাজ। তাৎক্ষণিক সুবিধাপ্রাপ্তির বিচারে আর কোনো কাজই এত সময়, শ্রম আর নিষ্ঠার দাবি করে না। ওই ২০০ পৃষ্ঠা কতগুলো ঘণ্টার মানসিক যন্ত্রণা এবং গার্হস্থ্য দুর্দশার বিনিময়ে তাঁদের লেখক লিখেছেন, আর সে জন্য তিনি কতটুকুই-বা পেয়েছেন–এসব ভেবে বিস্মিত হওয়ার মতো অনেক পাঠক রয়েছেন বলে আমি বিশ্বাস করি না। যাঁরা জানেন না, তাঁদের অবগতির জন্য সংক্ষেপে বলা যায়, ক্রেতা যে মূল্যে দোকান থেকে বইটি কেনেন, লেখক তার মাত্র ১০ শতাংশ পেয়ে থাকেন। সুতরাং যে পাঠক ২০ পেসোতে (কলম্বিয়ার মুদ্রা) একটি বই কিনেছেন, লেখকের জীবিকায় তাঁর অবদান সাকল্যে ২ পেসো। ঝুঁকি নিয়ে যে প্রকাশক বইটি বের

করেছেন, বাকি অংশটুকু তাঁর এবং বিক্রেতা-পরিবেশকদের। ব্যাপারটাকে আরও অন্যায় লাগে যখন আপনি ভাবেন যে শ্রেষ্ঠ লেখক তাঁরাই, যাঁদের লেখালেখিতে ঝোঁক অল্প কিন্তু ধূমপানে ঝোঁক বেশি, আর তাই এটা স্বাভাবিক যে ২০০ পৃষ্ঠার একটি বই লিখতে তাঁদের কমপক্ষে দুই বছর আর ২৯ হাজার সিগারেট খরচ হয়েছে। সোজা অঙ্কের হিসাবে বইটা থেকে যুটা তাঁদের আয় হবে, তাঁর চেয়েও বেশি তাঁরা ধূমপানেই ব্যয় করে ফেলেন।এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে আমার এক লেখক বন্ধু বলেছিল, 'ওই প্রকাশক, পরিবেশক, বই-বিক্রেতারা সবাই বড়লোক আর আমরা সব লেখকই গরিব।' অনুন্নত দেশগুলোতে সমস্যাটা ঘোরতর, যেখানে বই ব্যবসাটা অণ জোরদার নয়, কিন্তু ব্যবসাটা তাদের একচেটিয়াও নয়। সফল লেখকদের জন্য স্বর্গভূমি যুক্তরাষ্ট্রেও সুলভ সংস্করণের দৌলতে রাতারাতি ধনী বনে যাওয়া প্রতিটি লেখকের বিপরীতে কয়েক শ মানসম্পন্ন লেখক রয়েছেন, যাঁরা ওই ফোঁটা ফোঁটা বরফচোয়ানো ১০ শতাংশের আমৃত্যু দণ্ডে দণ্ডিত। যুক্তরাষ্ট্রে ন্যায়সংগত বৈভব বৃদ্ধির সাম্প্রতিক দর্শনীয় ঘটনাটি ঘটেছে 'ট্রুমান কাপোটির ইন কোল্ড ব্লাড' উপন্যাসের ক্ষেত্রে। প্রকাশের প্রথম কয়েক সপ্তাহেই এটি গ্রন্থাকারের জন্য ৫ লাখ ডলার আয় নিয়ে এসেছে, একই পরিমাণ এসেছে এর চলচ্চিত্র স্বত্ব থেকেও। বিপরীত দিকে, আলবেয়ার কামু, যিনি তখনো বইয়ের তাকে রয়ে যাবেন, যখন অবিশ্বাস্য ট্রুমান কাপোটিকে কেউ মনেও রাখবে না, তাঁকে বই লেখা চালিয়ে যাওয়ার জন্য ছদ্মনামে সিনেমার চিত্রনাট্য লিখে জীবিকা নির্বাহ করতে হয়েছে। নোবেল পুরস্কার–যেটি তিনি পেয়েছিলেন মৃত্যুর খুব বেশি একটা আগে নয়–তাঁকে পারিবারিক দুঃখ-দুর্দশা থেকে খুব সামান্যই ক্ষণিকের স্বস্তি দিতে পেরেছিল। এটা সঙ্গে করে এনেছিল হাজার চল্লিশেক ডলার, যা দিয়ে সেই সময় একটা বাড়ি কেনা যেত, যে ধরনের বাড়ির পেছনে বাচ্চাদের জন্যখেলার উঠোন থাকে। এর চেয়ে ভালো ছিল, যদিও অনিচ্ছাকৃত, পুরস্কারটি প্রত্যাখ্যানের মধ্য দিয়ে জাঁ পল সাত্রের ব্যবসাটাকে বাড়িয়ে নেওয়া, কারণ তাঁর এই মনোভাব স্বাধীনতার জন্য তাঁকে একটি ন্যায়সংগণ ও প্রাপ্য খ্যাতি এনে দেয়–এটা তাঁর বইয়ের চাহিদা বাড়িয়ে দিয়েছিল।

অনেক লেখক পুরোনো ধাঁচের একজন পৃষ্ঠপোষকের আশায় আকুল হয়ে যান। এমন পৃষ্ঠপোষক যিনি একজন ধনী, উদার ভদ্রলোক ও শিল্পীদের সহায়তা করবেন, যাতে তাঁরা স্বস্তির সঙ্গে কাজ করতে পারেন। শিল্পের জন্য পৃষ্ঠপোষক আজও রয়েছে, যদিও তা অন্য রূপে। বড় আকারের ব্যবসা সমিতিগুলো, যেগুলো কখনো কখনো রাজস্ব কমানোর জন্য, অথবা তাদের সম্পর্কে জনমানসে যে রাক্ষুসে রূপটি থাকে, তা বদলাতে এবং কালেভদ্রে নিজেদের অপরাধী বিবেককে স্বস্তি দিতে, শিল্পীদের কাজকে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে যথেষ্ট পরিমাণ টাকা বরাদ্দ দেয়। কিন্তু আমরা লেখকেরা আমাদের মন যেমনটা চায়, তা-ই করতে পছন্দ করি এবং আমরা সন্দেহ করি, সম্ভবত ভিত্তিহীনভাবেই, পৃষ্ঠপোষকতা চিন্তা ও প্রকাশের স্বাধীনতাকে ব্যাহত করে এবং অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয় মেনে নিতে হয়। আমার নিজের ক্ষেত্রে, আমি কোনোরকম ভর্তুকি ছাড়াই লিখতে পছন্দ করি–তা শুধু এ কারণে নয় যে আমি অদ্ভুত একটি নিপীড়ন-জটিলতায় ভুগি, এবং এই কারণেও যে, লেখার শুরুতে আমার কোনো ধারণাই থাকে না এটা শেষ হলে আমি কার সঙ্গে চুক্তিতে যাব। লেখা শেষে যদি আমি পৃষ্ঠপোষকের মতাদর্শের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করি, তবে সেটা অন্যায় হবে–বেশির ভাগ লেখকের ক্ষেত্রেই পরস্পরবিরোধী অসংগতিপূর্ণ মেজাজের কারণে যেটা হওয়া খুবই সম্ভব। একইভাবে এটি হতো সম্পূর্ণ অনৈতিকও, যদি আমি ভাগ্যক্রমে চুক্তিবদ্ধ হতাম।

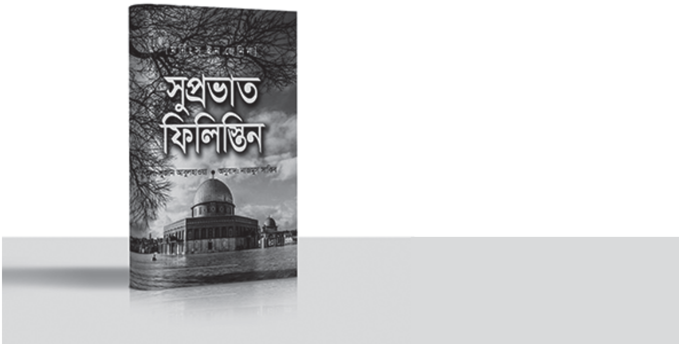
পৃষ্ঠপোষক ব্যবস্থা, পুঁজিবাদের পিতৃত্বসুলভ সাধারণ বৃত্তি, লেখককে রাষ্ট্রের বেতনভোগী কর্মচারী বলে বিবেচনা করার সমাজতান্ত্রিক প্রস্তাবের একটি প্রতিরূপ মনে হয়। নীতিগতভাবে সমাজতান্ত্রিক সমাধানটি সঠিক, কারণ লেখককে এটি মধ্যবর্তীদের শোষণ



থেকে মুক্ত করে। কিন্তু এযাবৎ বাস্তবে এবং কে জানে কত দিন ধরে, এই ব্যবস্থার যেসব অন্যায়কে শোধরানোর কথা ছিল, তার চেয়ে অনেক বেশি গুরুতর অন্যায়ের জন্ম সে দিয়েছে। সম্প্রতি সোভিয়েতের দুজন দুর্ভাগা লেখক সাইবেরিয়ায় সশ্রম দণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন, লেখা খারাপ হওয়ার জন্য নয় বরং পৃষ্ঠপোষকদের সঙ্গে দ্বিমত করার কারণে। আমরা লেখকেরা যে একদল দুর্বৃত্ত, যারা জুতোর বাড়ির চেয়েও অন্ধবিশ্বাসী তাত্ত্বিকের স্ট্রেটজ্যাকেট (ভয়ানক অপরাধী কিংবা মানসিক রোগীকে অন্যকে আঘাত করা থেকে বিরত রাখার জন্য বিশেষ পোশাক) এবং এমনকি আইনগত ব্যবস্থাসমূহে, বেশি আঘাত পাই–যে শাসনব্যবস্থা এটা স্বীকার করার মতো যথেষ্ট পরিপক্বতা দেখাতে ব্যর্থ হয়, সেখানে লেখালেখি কতটা বিপজ্জনক এ ঘটনায় সেটা দেখিয়েছি।

আমি বিশ্বাস করি, একজন লেখকের জন্য ভালো লেখা ছাড়া অন্য আর কোনো বিপ্লবী দায়িত্বনেই। প্রথাবিরোধিতা, যেকোনো শাসনব্যবস্থায়, একটি অপরিহার্য শর্ত, যার ব্যত্যয় হওয়া চলে না। কারণ, একজন প্রথানুগত লেখক একজন ডাকাতের মতো এবং অতি অবশ্যই তিনি একজন বাজে লেখক। এই বিমর্ষ পর্যালোচনার পর, আমরা লেখকেরা কেন লিখি, তা ভেবে বিস্মিত হওয়াটা স্বাভাবিক। জবাবটি, অনিবার্যভাবেই, যতখানি না অকপট তার চেয়ে বেশি অতিনাটকীয়। আপনি একজন লেখক–ঠিক যেভাবে আপনি হয়তো একজন ইহুদি অথবা কৃষ্ণাঙ্গ। সাফল্য অনুপ্রেরণাদায়ী, পাঠকের সমর্থন সঞ্জীবনী, কিন্তু এগুলো সম্পূরক পুরস্কার–কারণ একজন ভালো লেখক ছেঁড়া জুতো নিয়ে এবং বই বিক্রি না হলেও লিখেই যাবেন। এটা একটা পেশাগত বিপত্তি, যেটা সামাজিক সেই বাতুলতার ব্যাখ্যা দেয় যে, কেন অসংখ্য নারী ও পুরুষ না খেয়ে মৃত্যুকে বরণ করেছে, এমন কিছুর জন্য, যেটা মোটের ওপর এবং সত্যি বলতে কোনো উদ্দেশ্যই সাধন করে না।

রচনাকাল : জুলাই, ১৯৬৬



‘সুপ্রভাত ফিলিস্তিন’
ইতিহাস ও উপন্যাসের মিশেল অনুভব

আনাস হামজাহ

আগে যেমন শুধু কাব্যই ছিল সাহিত্যের বাহন; কিন্তু মানুষ তার ভাব ও ভাবনাগুলো আরও ছড়িয়ে দিতে চায়, গল্প বলতে চায় বিস্তৃত পরিসরে, উপন্যাসের জন্ম ভাবপ্রকাশের এই তাড়না থেকেই। এরপর থেকে অবিরাম লেখা হয়ে চলেছে উপন্যাস। যেখানে উঠে এসেছে লেখকের সমসাময়িক পরিস্থিতির কথা, তা হোক ব্যক্তিক, সামাজিক, জাতীয় বা বৈশ্বিক। দূরদ্রষ্টা কেউ আবার ভবিষ্যতও দেখেছেন তার উপন্যাসে সমকালীন চোখ দিয়ে। উপন্যাস তাই হয়ে উঠেছে চলমান সাংবাদিকতা; যার লেখক হলেন সময়ের সাংবাদিক, বিশ্বকে যিনি দেখেন অবাধে নিজের চোখে, উপলব্ধি করেন এবং প্রচার করেন নিজের মতাদর্শ। বলাবাহুল্য, এই কাজটা যিনি গভীরভাবে করতে পারেন, তাঁর উপন্যাস ভৌগোলিক সীমানা ছাড়িয়ে বৈশ্বিক হয়ে ওঠে এবং শুধু রচয়িতার ভাষার নয়, বরং পুরো বিশ্বের সম্পদ হয়ে যায়। সুজান আবুলহাওয়া রচিত ‘মর্নিংস ইন জেনিন’উপন্যাসটিও এমনি একটি বৈশ্বিক উপন্যাস।

কোনো উপন্যাস, কখন তাকে আমরা সফল রচনা বলি? যার কাহিনিতে থাকে রোমাঞ্চ? পাঠককে যা ধরে রেখে পৌঁছে দেয় তার শেষ শব্দটির কাছে? নাকি এমন, যার কাহিনিতে তেমন রোমাঞ্চ নেই, কেবলই জীবনের হয়ে বলে চলা, জীবন যেমন সবসময় নয় রোমাঞ্চকর, বরং এর বড় একটি অংশজুড়ে থাকে সহজ ও স্বাভাবিকতা এবং মাঝেমাঝে হঠাৎ ও আকস্মিকতা; এমনও উপন্যাস হতেই পারে। সমারসেট মম যেমন বলেছেন–‘প্রত্যেকেই অন্তত একটি উপন্যাস লেখার সামর্থ রাখেন, তাঁর নিজের জীবন নিয়ে উপন্যাস।’সত্য এই যে, সফল উপন্যাস হতে জমজমাট কাহিনির প্রয়োজনীয়তা খুবই সীমিত।

আমার দেখা ‘সুপ্রভাত ফিলিস্তিন’ও (মর্নিংস ইন জেনিন) এমনই একটি উপন্যাস। এর চরিত্রগুলোতে নায়কোচিত কেউ নেই ঠিক; এবং নেই কাহিনির জমজমাট বিন্যাস, চরিত্র ও সময়ের লুকোচুরি; কিন্তু আছে আমাদেরই মতো রক্ত-মাংসের গড়া মানুষেরা, যারা এমনই জীবন্ত যে, তাদের স্রেফ গল্পের ‘চরিত্র’ বললে আর মানায় না; তারা সবাই, একসাথে, দাঁড়িয়ে গেছে একটি সময় ও পরিস্থিতির ভেতরে; উপন্যাসটির কাহিনি ও তার বর্ণনাভঙ্গিও এমন যে, তা পাঠ করতে করতে পাঠকও একসময় নিজেই গিয়ে দাঁড়ান উপন্যাসটির সময় ও

পরিস্থিতির ভেতরে; উপলব্ধি করেন রচয়িতারই মতো করে; কারণ তিনি তখন নিজের নন, সম্পূর্ণই উপন্যাসটির হয়ে যান।

কেন এমন হয়? আমার মতে এর কারণ হলো লেখিকার অভিনব বর্ণনাশৈলী। উপন্যাসটির কাহিনি তিনি বলিয়েছেন চরিত্রগুলোরই জবানে এবং প্রয়োজনে সরেও এসেছেন এই মূল ধারা থেকে। উত্তম পুরুষের এই বলে চলা পাঠককে আন্দোলিত করে; যেখানে নামপুরুষ, যার ব্যথা ও আবেগ পাঠককে তেমন করে নাড়িয়ে দেয় না; কারণ, পাঠককে তা শুনতে হয়ে লেখকের মুখ থেকে।

এই সেদিন লেখক মাসরুর আরেফিন-এর মুখে তাঁর উপন্যাসের মূল্যায়ন শুনছিলাম। তিনি বলছিলেন উপন্যাস লেখার প্রকরণ ভেঙে যাওয়ার কথা। কোথায় এসে যেন উপন্যাসগুলো এখন এমন হয়ে উঠেছে, পড়ে মনে হয় আত্মজীবনী, প্রবন্ধ কিংবা ইতিহাসের বই। এবং এটিই আধুনিক সাহিত্যে উপন্যাসের সবচেয়ে প্রচলিত প্রকরণ। কারণ, দেখা যায়, এ ধরনের উপন্যাসে ঐতিহাসিক সত্যতা বিশ্বাসযোগ্যভাবে এঁকে দেওয়া যায়।'সুপ্রভাত ফিলিস্তিন' পড়ে মনে হয়েছে, এটি এই ধরনের উপন্যাসের আদর্শ উদাহরণ। লেখিকা শুরুতেই স্বীকারোক্তি টেনেছেন–'এই বইয়ের সব চরিত্র কাল্পনিক। তবে ফিলিস্তিন এবং এই বইয়ে বর্ণিত ঘটনাগুলো, ইতিহাস ও উল্লিখিত ব্যক্তিত্ব–এসব কিছু বাস্তব'। এদিকে এটিও সত্যযে, চরিত্রগুলো কাল্পনিক হলেও এগুলো প্রতিনিধি হয়ে উঠেছে লেখিকারই পরিচিত বহু ফিলিস্তিনির। এই ধারণার সত্যতা পাই, যখন তিনি তাঁর উপন্যাসের অঙ্কুরোদ্গম সম্পর্কে বলেন, '২০০১ সালে ডক্টর হানান আশরাওয়ি আমার একটি লেখা পড়ে আমাকে ইমেইল করেন। লেখাটি ছিল কুদসে কাটানো আমার শৈশব নিয়ে। তিনি লেখাটি পড়ে বলেন, মনে হচ্ছে তুমি উচ্চমার্গের একটি আত্মজীবনী লিখতে পারবে।'

প্রকৃতই উপন্যাসটি শুধুই আত্মজীবনী, লেখিকার, বরং প্রতিটি ফিলিস্তিনির এবং সময়েরও;যার পাতাজুড়ে ছাপিয়ে উঠেছে কয়েকটি প্রজন্মের দীর্ঘশ্বাস। এই যে দীর্ঘ সময়ের কয়েকটি প্রজন্মের ইতিহাস, সময় ও চরিত্রের বিশ্বাসযোগ্যতা ধরে রেখে বলে চলা, এখানেও দেখেছি উপন্যাসটির সার্থকতা।

অনুবাদ হিসেবে 'সুপ্রভাত ফিলিস্তিন' বেশ সহজ ও সুখপাঠ্য হয়েছে; যদিও কিছু জায়গায় থেকে গেছে অনুবাদের ছাপ এবং মূলানুগ অনুবাদে এমনটা হওয়া স্বাভাবিকই মনে হয়। অনুবাদক চাইলেই সামান্য সময় ব্যয়ে সেগুলো মুছে দিতে পারেন। চাইলে কাজ করতে পারেন ক্রিয়াপদের কালরূপ নিয়েও; যা বাংলাভাষার অন্যতম শক্তি ও সৌন্দর্য। ইংরেজি ক্রিয়াপদের সাধারণ অতীতের তরজমা বাংলায় 'আসল' এবং'আসে' উভয়টাই হতে পারে। কিন্তু 'আমি তাকিয়ে থাকলাম' এবং 'আমি তাকিয়ে থাকি' একই অর্থ প্রকাশ করলেও দ্বিতীয়টি বিশেষ একটি আবহ ধারণে সক্ষম; প্রথমটিকে যার তুলনায় রিক্তই মনে হয়। সুখের কথা হলো, অনুবাদক বিশেষভাবে দ্বিতীয়টিকে অর্থাৎ নিত্যবৃত্ত বর্তমানকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। ফলে আবেগঘন মুহূর্তগুলো চিত্রিত হয়েছে দারুণভাবে। উদাহরণত, পাঠক উপন্যাসটির 'অন্তহীন শুরু' এবং 'ইউসুফ, ফিলিস্তিনের পথে' শিরোনামের রচনাটুকু পড়ে দেখতে পারেন। কিছু ক্ষেত্রে ক্রিয়াপদের কালরূপের অস্থির ওঠানামা লক্ষ্য করেছি; তবে বর্ণনার সাবলীলতা ধরে রাখবার কৃতিত্ব সমস্তই অনুবাদকের; যখন এই কাজটিই মূলানুগ অনুবাদের সবচেয়ে জটিল কাজ।

বলা হয়ে থাকে, এমন কোনো অনুচ্ছেদ নেই, যা সমালোচনাযোগ্য নয়। সে সূত্রে বলা যায়, এখনও প্রচুর সম্পাদনার সুযোগ রয়েছে বইটিকে বাংলা অনুবাদ-সাহিত্যের অনন্য সংযোজন হিসেবে প্রস্তুত করতে। আশা করি অনুবাদক এর গুরুত্ব অনুধাবনে সক্ষম হবেন। অনেকেই আছেন, যাঁরা গৎবাঁধা ইতিহাস পড়ে যেতে চান না, তবে ইতিহাস-আশ্রিত কোনো উপন্যাস পেলে সাগ্রহে হাতে নেন; যদিও সকল ঐতিহাসিক উপন্যাসের ইতিহাস সঠিক নয়, কিন্তু এই উপন্যাসের লেখিকা এই নিশ্চয়তাও যখন দিচ্ছেন, তখন সে সকল পাঠক নিশ্চিন্তে বইটি হাতে নিতে পারেন, যার প্রতিটি পাতায় রয়েছে ইতিহাস ও উপন্যাসের এক মিশেল অনুভব।

বই সম্পর্কে কিছু সুন্দর বাণী

আজিজ মুনতাসির

বই এবং বই পড়া নিয়ে কিছু সুন্দর কথা খুঁজে পেলাম হঠাৎ করে। কে বলেছেন তা উল্লেখ নেই। তবে কথাগুলো সত্যি মনে ধরার মতো। বইপ্রেমীরা বইয়ের প্রেমে আরও বুঁদ হবেন এই আশায় সেগুলো তুলে দিলাম এখানে।

'বই এই পৃথিবীতে মানুষের মুখের বিকল্প। তাই যা পড়ো তার সব বিশ্বাস করো না।'

'বইকে ভালোবাসি, এজন্য নয় যে আমি দুনিয়াত্যাগী, বরং এক জীবনে সন্তুষ্ট নই আমি, বই পড়া আমাকে বহু জীবনের স্বাদ দেয়।'

'যদি কোনো বইয়ের শেষ পাতা ওল্টানোর সময় মনে হয় যে একজন প্রিয় বন্ধুকে হারাচ্ছ তাহলে বুঝবে সত্যিই চমৎকার একটি বই পড়েছ।'

'ভালো বইয়ের অভাব নেই, তবে ভাল পাঠকের বড় অভাব।'

'বইয়ের মতো জাহাজ কি আর আছে? এক জগত থেকে আরেক জগতে ঘুরে বেড়াই আমরা বইয়ের মধ্য দিয়ে।'

'বইই আসল বন্ধু। তোমার সব রাগ যদি বইয়ের ওপর ঝাড়ো তবু বই তোমাকে কাছে টেনে নেবে। কখনো ছেড়ে যাবে না।'

'প্রতিটি বইয়ের পেছনে একটি চিন্তা থাকে, আর প্রতিটি চিন্তা উন্নতির ধাপ।'

'বই এমন বন্ধু যা কখনো বিশ্বাসঘাতকতা করে না।'

'বই এই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গচ্ছিত সম্পদ, নানা জাতির সবচেয়ে মূল্যবান ত্যাজ্যসম্পত্তি।'

'বইপ্রেম হলো বিরক্তির সময়গুলোকে আনন্দের সময়ে পরিবর্তনের মাধ্যম।'

'পৃথিবীতে বইই শ্রেষ্ঠ প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদ।'

'টাকার ভণ্ডার গড়ে তোলার চেয়ে বইয়ের ভাণ্ডার গড়ে তোলা অনেক সহজ।'

'আমরা যখন বই জমাই তখন বই না বরং সুখ জমাই।'

'বই ছাড়া বাড়ি প্রাণ ছাড়া দেহেরমতো।'

'বই পড়া মনের ব্যয়াম।'

'বইই পথ দেখায় সভ্যতার।'

'বাড়ির নানা আসবাবপত্রের মতো যখন আমরা একটি লাইব্রেরির প্রয়োজন অনুধাবন করব তখন বোঝা যাবে আমরা সভ্য হয়েছি।'

'খাদ্য ছাড়া যেমন দেহের বৃদ্ধি ঘটে না তেমনি বই পড়া ছাড়া বুদ্ধি বাড়ে না।'

'বই এমন বন্ধু যাকে কখনো বিরক্ত লাগে না।'

'কম পড়ো। তবে প্রতিটি শব্দ অনুধাবন করে পড়ো।'

'বেশি পড়ায় কোনো কৃতিত্ব নেই, বরং বুঝে পড়াই আসল।'

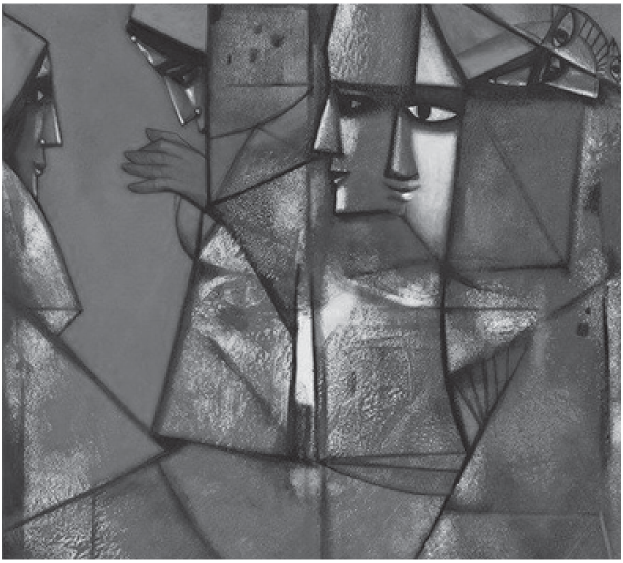
'যখন আমি কোনো নতুন বই পড়ি তখন মনে হয় আমি নতুন কোনো বন্ধুর সাথে পরিচিত হলাম। যখন দ্বিতীয়বার কোনো বই পড়ি তখন মনে হয় আমি কোনো পুরনো বন্ধুর সাথে কথা বলছি।'

'বইয়ের চেয়ে ভালো সঙ্গী আর হয় না।'

'বই ছোটবেলায় শিক্ষক, বার্ধক্যে সান্ত্বনা আর একাকিত্বে বন্ধু।'

'তুমি কী পড়ো আমাকে বলো, আমি বলে দেবো তুমি কেমন।'

'যারা বই লিখে সবাই সাধুবাদ পাওয়ার আশা করে। কিন্তু ইয়া বড় অভিধান রচয়িতা শুধুমাত্র নিন্দা থেকে বাঁচার আশাই করতে পারেন।'



(অনুবাদগল্প)

বিসমিল্লাহ

মূল : সাদত হাসান মান্টো
অনুবাদ : কাউসার মাহমুদ

ফিল্ম বানাতে গিয়ে জহিরের সঙ্গে সায়িদের পরিচয়। এবং পরিচয়ের অল্পদিনের ভেতর সায়িদ গভীরভাবে জহির দ্বারা প্রভাবিত হয়। বোম্বে সেন্ট্রাল স্টুডিওতে ইতিপূর্বে জহিরকে সে দু'একবার দেখেছিল এবং খুব সম্ভব কথাও হয়েছিল কিন্তু বিস্তারিত আলাপটি প্রথমবার লাহোরেই। এমনিতে লাহোর তো অসংখ্য ফিল্ম কোম্পানির ডেরা। কিন্তু এ কথা সর্বোতভাবেই সত্য ও সায়িদ জানতো যে, এদের অধিকাংশের অস্তিত্ব কেবল ও সাইনবোর্ড পর্যন্তই। এই ধান্ধার শহরে জহির যখন তাকে আকরামের মারফতে ডাকে, তখন সে ধরেই নিয়েছিল এ লোকও বোধ করি সেসব আঁতেল প্রডিউসরদের মতোই বাচাল হবে, যারা শুধু শুধু হাজার রকমের কথা বলে। অফিস বানায়, ফার্নিচার ভরে এবং শেষাবধি পাশের হোটেলগুলোর পয়সা মেরে ভেগে যায়।
সাক্ষাতে তাকে অবাক করে দিয়ে জহির খুব শান্ত ও সহজভাবে বলে, এই শীতেই ছবির কাজটি শুরু করতে চায় সে। বোম্বেতে সে স্টান্ট সিনেমা পরিচালকের এসিস্ট্যান্ট ছিল। টানা পাঁচ বছর তার অধীনে থেকে কাজ শিখেছে। পরে তার নিজেরই সিনেমা বানানোর সুযোগ আসে, কিন্তু ভারত বিভাগ হলে তাকে পাকিস্তান চলে আসতে হয়। এখানে সে প্রায়

আড়াই বছর বেকার। কিন্তু এরমাঝে সে এমন কিছু লোক জোগাড় করেছে যারা টাকা বিনিয়োগ করতে প্রস্তুত। সে সায়িদকে সোজা বলে, 'দেখুন জনাব! আমি কোনো ফার্স্টক্লাস সিনেমা বানাতে চাই না। অল্প বিদ্যের কম জানা মানুষ। স্ট্যান্ট ফিল্ম বানাতে পারবো। আশা করি ভালো স্টান্ট সিনেমাই বানাবো। আর তাতে সব খরচ বাদে পুরো পঞ্চাশ হাজার তো লাভ হবেই। আপনার কী মত?'
সায়িদ কিছুসময় ভেবে বলে, 'হ্যাঁ। এটুকু লাভ তো হতেই হয়।'
জহির বলে, 'যিনি বিনিয়োগ করছেন তাঁকে সোজাসাপ্টা বলে দিয়েছি, পয়সাপাতির হিসেবনিকেশে আমি নেই। ও আপনার কাজ। অন্য সবকিছু আমি সামলে নেব।'
'তা আমি আপনার কী খেদমত করতে পারি?'–সায়িদ জিজ্ঞেস করে।
জহির অত্যন্ত সরলতার সঙ্গে বলে, 'পাকিস্তানের প্রায় সব ডিস্ট্রিবিউটর আপনাকে চেনে। আমার এখানে তেমন চিন-পেহচান নেই। বড় মেহেরবানি হয়, যদি আপনি আমার সিনেমাটা ডিস্ট্রিবিউশনের বন্দোবস্ত করে দেন।'
সায়িদ ততোধিক ভদ্রস্থ হয়েই জানায়, 'আপনি সিনেমা তৈরি করুন, আশা করি ব্যবস্থা হয়ে যাবে।'
'আপনার বড় দয়া।' এই বলে টেবিলে পড়ে থাকা প্যাডে জহির একটি ফুল আঁকে–'সায়িদ সাহেব! আমার শতভাগ বিশ্বাস যে আমি সফল হবোই। নায়িকা আমার স্ত্রী হবে।'
সায়িদ কিছুটা আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করে- 'আপনার স্ত্রী?'
'জি, হ্যাঁ।'
'আগে কোনো সিনেমায় কাজ করেছে?'
'জি না।'–জহির নিচে তাকিয়ে ফুলের সাথে কতক লতাপাতা-শাখা-বিশাখা বানাতে বানাতে বলে–'আমি এখানে লাহোরে এসেই বিবাহ করেছি। তা আমার তো কোনো ইচ্ছেই ছিল না তাকে এই ফিল্মি লাইনে আনি, কিন্তু তার বড় শখ। বলতে গেলে একেবারে অতিমাত্রায় আগ্রহ। রোজ একটা না একটা সিনেমা দেখবেই। আমি আপনাকে তার ফটো দেখাচ্ছি।'
ড্রয়ার খুলে একটি খাম বের করে সে। খামের ভেতর স্ত্রীর ছবি ভরে সায়িদের দিকে এগিয়ে দেয়।
সায়িদ ছবি দেখে। অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য-বর্জিত সাধারণ গোছের এক যুবতী নারী। আঁটো মাথা। পাতলা নাসিকা, পুরু ঠোঁট এবং বড় বড় চোখের উদাস দৃষ্টি।
ছবিতে তার এ চোখ জোড়াই ছিল চেহারার অন্যান্য অঙ্গের বিপরীতে সবচেয়ে সুস্পষ্ট ও উদগত। সায়িদ আরেকটু গভীরভাবে তাকে দেখতে চায়, কিন্তু তা কেমন দোষণীয় ভেবে সেসময় তড়িৎ তা টেবিলে রেখে দেয়।
'আপনার কীমত?'–জহির জিজ্ঞেস করে।
সায়িদের কাছে এ প্রশ্নের কোনো উত্তর তৈরি ছিল না। মূলত তার হৃদয়ে ও চেতনে সেসময় ওই বড় বড় উদাসী চোখ দুটোই বিস্তারিত ছিল। অনিচ্ছাতেই একটি ঘোরের ভেতর টেবিল থেকে ছবিটা উঠিয়ে আবার একপলক দেখে ঠিক সেখানেই রেখে দিয়ে বলে, 'আপনার যা ভালো মনে হয়।'
জহির প্যাডের উপর আরেকটি ফুল আঁকা শুরু করে এবং নিচের দিকে তাকিয়ে বলে- 'এ ছবিটা সুন্দর। কিছুটা হেলে আছে কেমন।'
বলতেই পেছনে দরজার পর্দা দুলে ওঠে এবং জহিরের স্ত্রী রুমে প্রবেশ করে। সেই টানা-টানা, বড়-বড় উদাসী চোখ। জহির তার দিকে চেয়ে মুচকি হাসে, 'কী অদ্ভুত নাম তার, "বিসমিল্লাহ"।' তারপরই সায়িদকে দেখিয়ে বলে, 'ইনি আমার বন্ধু, সায়িদ সাহেব।'
বিসমিল্লাহ ঝুঁকে বলে, 'আদাব আরাজ।'
সায়িদ উঠে দাঁড়িয়ে কৃতজ্ঞতা জানায়, 'তশরিফ রাখুন।'
বিসমিল্লাহ ওড়না ঠিক করতে করতে সায়িদের পাশের চেয়ারে বসে। হালকা পেঁয়াজো রঙের মখমলি মিহি ওড়নার নিচে তার বুকের ধবধবে আভা যেন চোখ মেলে তাকিয়ে আছে। সায়িদ অন্যত্র তার দৃষ্টি স্থির করে।
জহির ছবিটি খামে ভরে রাখে এবং সায়িদকে বলে,'আমি নিশ্চিত, বিসমিল্লাহ তার প্রথম সিনেমাতেই সফল হবে। কিন্তু একটা জায়গায় দ্বন্দ্বে আছি যে, তার ফিল্মি নাম কী রাখবো! বিসমিল্লাহ ঠিক হিরোইনের জন্য মানানসই

নয়। কী বলেন আপনি?'
সায়িদ বিসমিল্লাহর দিকে তাকায়। আর তার গোটা গোটা চোখের ভেতর সে যেন মুহূর্তের জন্য ডুবে যায়। তক্ষুণি দৃষ্টি অন্যথা সরিয়ে সে জহিরকে বলে, 'জি, হ্যাঁ! বিসমিল্লাহ ঠিক যুতসই নয়, অন্য কোনো নাম হওয়াই শ্রেয়।'
কিছুক্ষণ এদিক সেদিকের কথা চলে।
বিসমিল্লাহ নিশ্চুপ এবং তার বড় বড় উদাস চোখ দুটোও কথাহীন। এরমাঝেই সায়িদ কয়েকবার তার সে চোখের ভেতর ডুব দিয়েছে। এবং একনাগাড়ে জহিরের সঙ্গে কথা চালিয়ে গিয়েছি। ওদিকে বিসমিল্লাহ স্থির; তার ডাগর চোখের পুতুলি নাচিয়ে শুধু কেবল তাদের কথা শোনে। সায়িদ ওদিক দেখতেই প্রবল এক ধাক্কায় বারবার তার দৃষ্টি অন্যত্র গুটিয়ে যায়।
বিসমিল্লাহর গায়ের রঙ গাঢ় সোনালি। অথচ ছবিতে ও রঙের কোনো চিহ্ন নেই। বোঝাই যায় না একদম। গাঢ় ওই সোনালি রঙের উপর তার ডাগর ডাগর কালো চোখ আরও বেশি উদাসী ছিল যেন। সায়িদ বার কয়েক ভেবেছেও যে, আসলে এ অদ্ভুত উদাসীনতার কারণ কী? আসলে; প্রকৃত তার শারীরিক গঠনই কিছু এমন ঢঙে যে, এমনিতেই উদাস মনে হয়। অথবা অন্য কোনো কারণও থাকতে পারে। মোটকথা, সঠিক যৌক্তিক কিছু সায়িদের মাথায় আসছিল না।
জহির বোম্বের কথা পাড়তেই বিসমিল্লাহ উঠে চলে যায়। তার হাঁটায় কিছুটা অনভ্যস্ততা পরিলক্ষিত। যেন সে উঁচু হিল জুতো নতুন পায়ে দেয়া শুরু করেছে। উপবেশনেও ঠিক ছিল না। অভ্যর্থনায় সালামের তরিকাও কেমন বোকাবোকা। এসব ছাড়াও সবকিছু মিলিয়ে সায়িদের মনে হয়েছে বিসমিল্লাহ নেহাৎই অপক্ক। কিন্তু তার সে গভীর সোনালি আভাদীপ্ত মুখের উপর একজোড়া ডাগর ডাগর কালো চক্ষু উদাসী হওয়ার পরও কেমন উত্তেজিত।
কয়েক সাক্ষাতে জহিরের সঙ্গে সায়িদের গভীর সম্পর্ক হয়ে যায়।জহির নেহাতই অসম্ভব স্বচ্ছ মনের মানুষ। তার এ বিশেষ গুণটি সায়িদকে দারুণ প্রভাবিত করেছে। খুব খেয়াল করে দেখেছে, তার কোনো কথাতেই যেন ভণিতা বা বানোয়াট কিছু নেই। মনে যা আসে, তাই বুঝি শব্দে তৈরি হয়ে গড়বড় করে তার মুখে চলে আসে। খাবারদাবার ও জীবনযাপনেও সে বেহদ সাদামাটা।
যখনই সায়িদ তার ওখানে যায়, জহির তার যথোপযুক্ত সমাদর করে। সায়িদ তাকে কয়েকবার বলেছেও, 'আওে,এত কষ্ট করার কী আছে?' কিন্তু জহির তার মানা শোনে না; বরং স্বগোতক্তি করে বলে, 'এতে কষ্টের কী! এ তো আপনার নিজেরই ঘর।'
এভাবে সায়িদ যখন প্রায় রোজই জহিরের ওখানে যাওয়া শুরু করে, তখন সে ভাবে, 'না, এ বড় মন্দ কথা। সে আমাকে এত সম্মান কওে, আপন বন্ধু ভেবে কত খাতির-আত্তি করে, আর আমি কিনা কেবল তার স্ত্রীর ভালোলাগায় তার ওখানে যাই। এ ভীষণ মন্দ কাজ।'
মনে মনে কয়েকবার নিজেকে সে ধিক্কার দিয়েছে। কিন্তু তবু সে প্রত্যহ জহিরের ওখানে যাওয়া অব্যাহত রাখে।
সে গেলে বিসমিল্লাহ আসতো, এবং প্রথম প্রথম ঠায় নিশ্চুপ বসে থাকত। তারপর ধীরে ধীরে সেও তাদের কথায় অংশ নিতে শুরু করে। কিন্তু গল্প-আলাপসালাপে সে বরাবরই অপরিপক্ক। এতে সায়িদের কী দুঃখ–ইশ! সে কেন অমন কথক না! কেন ভালো বলতে পারে না!
কয়েকবার এমনও হয়েছে যে জহির বাড়ি নেই। সায়িদ ডাকলে ভেতর থেকে বিসমিল্লাহ বলত, 'বাইরে গিয়েছেন।' এই শুনে সায়িদ খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতো যে, হয়তো বলবে–'ভেতরে আসুন, উনি এক্ষুণি এসে যাবে।' কিন্তু না, এমনটা হতো না।
এদিকে জহিরের সিনেমার চক্কর চলছিলই। প্রায় রোজ রোজই জহির বলত, 'আমার অতো তাড়া নেই। প্রত্যেকটা জিনিসই তার নিজ সময়ে, স্বাচ্ছন্দ্যে হবে।'
ওদিকে জহিরের সিনেমার প্রতি সায়িদের কোনো আগ্রহই নেই। তার যত আগ্রহ তাতো বিসমিলল্লাহর প্রতি। যার গোটা গোটা ডাগর চোখের ভেতর হাজার বার সে ডুবে জেগেছে। এদিকে তার এ ডোবার আগ্রহ দিনদিন যে বেড়েই চলছিল, ভাবতে গেলেই তার

নিদারুণ কষ্ট হতো। লজ্জায় মরে যেত। কেননা, এ একদম স্পষ্ট কথাই যে, সে তার বন্ধু জহিরের স্ত্রীর সঙ্গে দৈহিক সম্পর্ক তৈরি করতে ইচ্ছুক।

দিন যায়। জহিরের সিনেমার কাজ যেমন ছিল তেমনই। সায়িদ একদিন তার সাক্ষাতে গিয়ে দেখে সে ঘরে নেই। অগত্যা চলে আসবে এমন সময় বিসমিল্লাহ বলে, 'ভেতরে আসুন। উনি দূরে কোথাও যাননি।'

সায়িদের বুক ধড়ফড় করে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে ঘরে ঢুকে সে। এবং চেয়ারে বসে। বিসমিল্লাহ টেবিলের পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। সায়িদ কিছুটা ধাতস্থ হয়ে বলে, 'বসুন।'

বিসমিল্লাহ তার মুখোমুখি চেয়ারটিতে বসে। উভয়ই চুপচাপ। খানিক বাদে নীরবতা ভেঙে সায়িদ তার চোখের দিকে তাকিয়ে বলে, 'জহির এখনো এলো না যে?'

বিসমিল্লাহ ছোট্ট করে জানায়, 'এসে পড়বে।'

তারপর আবার সেই নীরবতা। এসময় সায়িদ বারকয়েক বিসমিল্লাহর চোখের দিকে তাকায়; ইচ্ছের মধ্যে তার অনেক কিছু জাগে। এতো ইচ্ছে যে তার সমস্ত উদাসীনতা যাতে সে ইচ্ছেগুলোর সঙ্গে মিশে যায়। কিন্তু সায়িদ নিজের ইচ্ছেগুলোকে দমিয়ে রেখে বলে, 'আপনার বুঝি সিনেমায় কাজ করার খুব শখ!'

বিসমিল্লাহ হাই তুলে বলে, 'শখই তো।'

সায়িদ স্তম্ভিত হয়ে যায়। কিছুটা গুছিয়ে বলে- 'শুনুন, এ লাইন ভালো না। অর্থাৎ বলতে চাচ্ছি, এতে ভীষণ বদনাম রটে আর কি।' এরপর সে সিনেমা জগতের নানা ধরনের অশ্লীলতা ও অসভ্যতার কথা বলতে শুরু করে। মাঝে জহিরের কথা মনে হতে সুর পাল্টে অন্যদিকে কথা ঘুরিয়ে নেয়। 'আচ্ছা, আপনার তো এ শখ! তাহলে ভিন্ন কথা। ক্যারেক্টার ভালো হলে মানুষ যেকোনো ক্ষেত্রেই সফলতার ছাপ রাখতে পারে। তাছাড়া জহির নিজে এ সিনেমা বানাচ্ছে। তা আপনি কিন্তু কখনোই অন্য কারও সিনেমায় কাজ করবেন না।'

বিসমিল্লাহ আগের মতোই নিশ্চুপ। এদিকে বিসমিল্লাহর এমন নিশ্চুপতা সায়িদের বড্ড অসহ্য ঠেকছে। প্রথমবার সে তার সঙ্গে একাকী বসার সুযোগ পেয়েছে, অথচ সে কিনা কথাই বলছে না। সায়িদ ভয়ে ভয়ে এক-দু'বার অনুসন্ধানী চোখে তার দিকে তাকিয়েছে ঠিক, অথচ অবস্থার কোনো পরিবর্তন নেই। যেই সেই। তাই কিছুক্ষণ চুপ থেকে সে বলে, 'আচ্ছা, এক খিলি পানই তবে খাওয়ান।'

বিসমিলল্লাহ উঠে দাঁড়ায়। সাথে রেশমি জামার নিচে তার শরীর দুলে ওঠে বুঝি। অমনি সায়িদের চোখ প্রবল এক ধাক্কায় ভূপাতিত হয়। বিসমিল্লাহ অন্য ঘরে যেতেই সে ভয়ে ভয়ে নানারকম উত্তেজকসূলভ সুক্ষ্ম কথা ভাবে।

একটু পর পান নিয়ে এসে সায়িদের পাশে দাঁড়িয়ে বলে, 'নিন!' সায়িদ কৃতজ্ঞতা জানিয়ে পান নিতে গেলে তার আঙুল বিসমিল্লাহর আঙুল ছুঁয়ে আসে। আর তখনই সায়িদের সারা শরীরে বিদ্যুৎ খেলে যায়। সেইসাথে গুপ্ত ইঙ্গিতের কাটাটা বুঝি তার মনে ছেয়ে রয়।

পান দিয়ে আগের মতোই তার সামনের চেয়ারটিতে বসে বিসমিল্লাহ। তার গাঢ় সোনালি রঙের মুখ দেখে সায়িদ কিচ্ছুটিই বুঝতে পারছিল না। সায়িদ ভাবে অন্য কোনো মেয়ে হলে এতক্ষণে ঠিক বুঝে যেত আমি তাকে কী চোখে দেখছি! কিন্তু এমনও তো হতে পারে, সে বুঝেছে; আবার তা নাও হতে পারে।

সায়িদ ক্রমশ প্রবল এক দ্বিধায় আটকে যায়। একদিকে বিসমিল্লাহর উত্তেজিত বিদ্যমানতা, তার ডাগর ডাগর চোখ, অন্যদিকে জহিরের চিন্তা, আবার তার সুক্ষ্ম ইঙ্গিত ভাবনা–সবকিছু মিলিয়ে কেমন এক অদ্ভুত দ্বন্দ্বে ফেঁসে গেছে সে। বিসমিল্লাহর পক্ষ থেকে কোনোরূপ প্রতিউত্তর বা ইংগিতও নেই। তার ভাবনা একদমই পরিস্কার যে, সায়িদ যা ভাবছে তা অসম্ভব। কিন্তু তবুও সে আবারও তাকে সেই দৃষ্টিতে স্থির দেখতে থাকে। কিছুক্ষণ চুপ থেকে সে তাকে বলে, 'মনে হয় জহির আসবে না। আমি চললাম।'

বিসমিল্লাহ রোধ করে বলে, 'না না, বসুন।'

'আপনি তো কোনো কথাই বলছেন না।'–এই বলে সায়িদ উঠে দাঁড়ায়।

বিসমিল্লাহ জিজ্ঞেস করে, 'যাচ্ছেন তাহলে?' সায়িদ তার দিকে অনুসন্ধিৎসু হয়ে বলে, 'জি না, বসছি। তবে আপনার যদি অসম্মতি না হয়।'

বিসমিল্লাহ আবারও হাই তুলে বলে, 'আমার আর অসুবিধা কী!' বিসমিলল্লাহর চোখে বুঝি ঘুমের পর্দা পড়েছে। ঢুলুঢুলু চোখ।

'আপনার হয়তো ঘুম আসছে।'–সায়িদ বলে।

'জি হ্যাঁ, রাতে জাগতে হয় তো, তাই।'

সায়িদ কিছুটা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, 'কেন?'

বিসমিলল্লাহ আরও একবার হাই তুলে বলে, 'এই বাইরে যেতে হয় যে!'

সায়িদ বসে থাকে। তার একটু পরই বিসমিলল্লাহ শুয়ে পড়ে। তার ডাগর চোখজোড়া মুদে আছে। ডান বাহু ঢলে গেছে একদিকে। আস্তিন উপরে ওঠে গেছে। সায়িদ দেখে, তার গাঢ় সোনালি রঙের কব্জির উপর হিন্দি বর্ণাক্ষর খোদাই করা। এসময় জহির চলে আসে।

সায়িদ তার চিন্তায় বিভোর। জহির তার দিকে হাত বাড়িয়ে, স্বীয় স্ত্রী বিসমিল্লাহর দিকে তাকিয়ে বলে, 'এ কী শুয়ে আছে?'

সায়িদ বলে, 'আমি চলে যাচ্ছিলাম, সে বলল, সাহেব চলে আসবে। আপনি বসুন। আমি বসলাম আর উনি ঘুমিয়ে পড়লেন।'

জহির হাসে। সায়িদও হেসে দেয়।

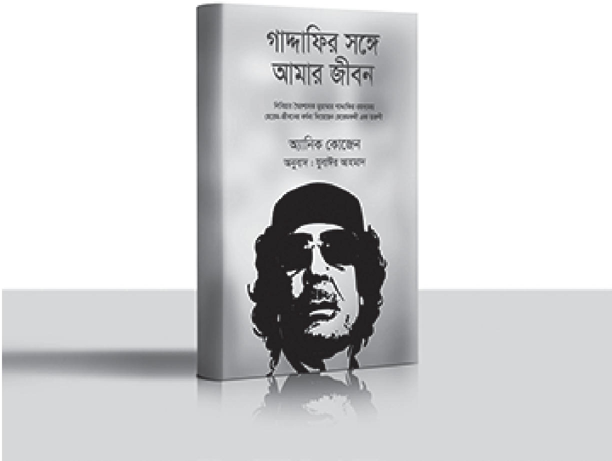
'হ্যাঁ গো, ওঠো, ওঠো!' জহির বিসমিল্লাহর মাথায় হাত র‍্যাখে।

বিসমিল্লাহ দীর্ঘস্বরে 'উহ' বলে তার বড় বড় চোখদুটো খোলে। উদাসীনতার সাথে সাথে এখন তাতে একটি নির্জন বিধ্বস্ততাও প্রস্ফুটিত।

'চলো, চলো, জরুরি একটা কাজ আছে।' তারপর সে সায়িদের দিকে ফিরে বলে, 'মাফ করবেন, সায়িদ সাহেব। হঠাৎ জরুরি এক কাজে যাচ্ছি। কাল দেখা হবে ইনশাআল্লাহ।'

সায়িদ চলে যায়। পরদিন সে জহিরের ওখানে আসার আগে করুণ প্রার্থনা করে, সে যেন ঘরে না থাকে। এবং যথারীতি সেখানে পৌঁছে দেখে বাড়ির বাইরে কিছু লোক জটলা পাকিয়ে আছে। লোকদের জিজ্ঞেস করে সায়িদ জানতে পারে বিসমিল্লাহ জহিরের ঘরণী নয়। সে এক হিন্দু তরুণী। দাঙ্গার সময় এখানে রয়ে গিয়েছিল। জহির তাকে দিয়ে ব্যবসা করাতো। একটু আগেই পুলিশ তাকে নিয়ে গেছে।

তারপর এখনও সেই ডাগর ডাগর কালো চোখ দুটো সায়িদের পিছু তাড়া করে।



‘গাদ্দাফির সঙ্গে আমার জীবন’ নির্মল প্রতিশোধের ঠাস-বুনট

রবিউল ইসলাম

আমার মনে আছে, দুই হাজার এগারো’র পৃথিবীব্যাপী উত্তাল ওই ক্রান্তির মুহূর্তে আমাদের ছোট্ট ভাইটির যখন জন্ম হলো, বাবা আমাদেরকে সুন্দর একটি নাম ঠিক করবার তাগাদা দিলেন। প্রবল আগ্রহে আমরা বইপত্তর খুলে বসলাম। খুঁজতে থাকলাম সে সুন্দর নামটি। সব বেছে আমাদের সবচাইতে পছন্দ হলো সুন্দর মলাটে আবৃত একটি নাম; মুয়াম্মার। কিন্তু হৃদয়ে চূর্ণন তৈরি করবার মতো যে ঘটনাটি ঘটল, আব্বু এ নাম শুনে রীতিমতো ক্ষেপে উঠলেন। এক ঝটকায় নাকচ করে দিলেন আমাদের প্রস্তাব। বিড়বিড় করে একগাদা গালমন্দও ছুড়ে দিলেন কোথাও। চূড়ান্ত বিস্ময় নিয়ে আমরা সেদিন থেকেই খুঁজতে থাকলাম মুয়াম্মারের পেছনে লুকিয়ে থাকা রহস্যটি। সন্ধানী চিন্তায় লব্ধ হলো আমাদের মন-মগজ। গণমাধ্যমের বিচিত্র দৃশ্যের মুখোমুখি হয়ে পূর্বসময় থেকেই আমাদের ধারণা মুয়াম্মার হলেন চতুর্মাত্রিক মহাবিশ্বে এক নতুন বিপ্লবের জন্মদাতা। গ্রিন বুকের পাতায় পাতায় যিনি স্বচ্ছ এক পৃথিবী তৈরির ইশতেহার দিয়ে গেছেন। যিনি ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’র চির প্রতিশ্রুত শপথে অনড় থেকে গেছেন আমৃত্যু। ভাবনার তর্জমা করতে গেলে আরও বলা যায় আমাদের চিন্তার এ পরিসরে মুয়াম্মার আল-গাদ্দাফিপৃথিবীব্যাপী আগ্রাসী শক্তির বিরুদ্ধে এক মহান কায়েদ, যাঁর বক্তৃতার সেইসব শব্দমালায় বারবার কেঁপে কেঁপে উঠেছে ইসলাম ও মুসলমানের

চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী সব শক্তি।
ইসলামি চেতনায় বিশ্বাসী সাম্রাজ্যবাদী পশ্চিমের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্যান-আরব গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে সামনে এগিয়ে যেতে থাকা এ গাদ্দাফিকে আমরা সত্যিই শ্রদ্ধার চোখে দেখতে শুরু করেছিলাম। দীর্ঘ ৪২টি বছর ক্ষমতার মসনদে থাকা আফ্রিকান এই লৌহমানব যেভাবে দারিদ্র্যের পদভারে পিষ্ট লিবিয়াকে তুলে এনেছিলেন সফলতার চূড়ান্ত পর্যায়ে, এজন্যই কিনা আমাদের মগজে কেবলই এ চিন্তার উদয় হয়েছিল; শৈশবে ছাগল চড়ানো এ গাদ্দাফির চতুর্মুখী সফলতার কারণ অবশ্যই তাঁর সুস্থ মানসিকতা এবং সর্বোচ্চ 'খুলুসিয়্যাত'।
কিন্তু পর্দার আড়ালে ঘাপটি মেরে বসে থাকা কর্নেল গাদ্দাফির ছবিটি এতটা যে পবিত্র নয় তা কীভাবে বিশ্বাস করা যায়। আব্বুর তড়িঘড়ি ক্ষিপ্ততার বিস্ময়কর ওই কারণটাও চোখ থেকে কীভাবে আড়াল হয়ে থাকে, তাও জানা দুষ্কর হয়ে পড়তে চায় বারেবার। ভেতরের সেই গাদ্দাফিকে পাঠ করবার উদগ্র বাসনার বিপুল সম্মিলনে আমার হৃদয় হয়ে ওঠে তরঙ্গের অস্থির সাফিনা। অপ্রতিরোধ্য সেই ঢেউগুলো ভেদ করে সামনে এগিয়ে যাবার কালে সব জাল ছিন্ন হবার সেই যে সূত্র, তা নিয়েই আজকের আলাপ–যা চনমনে গন্ধের রঙিন মলাটে আবৃত; 'গাদ্দাফির সঙ্গে আমার জীবন।'
'গাদ্দাফির সঙ্গে আমার জীবন' ইতিহাসের পাঠে সত্য-অসত্যের মাঝে বিস্তর ফারাক তৈরি করার সক্ষমতা নিয়ে তৈরি হওয়া একটি জীবনঘনিষ্ঠ গ্রন্থ। ফরাসি সাংবাদিক অ্যানিক কোজেনের বাঙময় বর্ণনায় সদ্য মুক্তির বার্তা পাওয়া সুরাইয়ার জবানিতে বর্ণিত এ গ্রন্থ আশ্চর্যজনকভাবে আমার মননে মস্তিষ্কে প্রচণ্ড প্রভাব সৃষ্টি করে ফেলে। বাংলায় অনুবাদের সহযোগিতাও পাঠ আমন্ত্রণে যুক্ত করে নতুন মাত্রা। অনুবাদক যুবাঈর মাহমুদের এটি প্রথম অনুবাদগ্রন্থ হলেও আমার ভেতর যে বোধের সৃষ্টি হয়েছে, তরতরে সাবলীল গদ্যের এ ঝকমকে শৈলী অবশ্যই প্রশংসার দাবিদার। পাশাপাশি এও বলে রাখা ভালো, অনুবাদকমূল গ্রন্থের লেখকের সঙ্গে আদর্শিকভাবে একই ঘরানার হতে হবে, এমন শর্তের বেড়াজাল আমাদের এই সময়ে থাকলেও আমি এর চরম বিরোধী। কেননা যখন আদর্শ ও তথ্যসমৃদ্ধ করার প্রসঙ্গ প্রশ্ন উঠে আসবে, তখন অবশ্যই এর দায় মূল লেখকের ঘাড়েই বর্তায়। যার ফলে 'গাদ্দাফির সঙ্গে আমার জীবন' গ্রন্থের মৌলিক নীতিগত সিদ্ধান্তে আমার নানাক্ষেত্রে প্রশ্ন এবং অভিযোগের সৃষ্টি হলেও আমি এর দায় অনুবাদক, প্রকাশক এবং সম্পাদকের সঙ্গে মেলাতে চাইনা। বরং এর সামান্য প্রশংসা এ জন্যেও করতে চাই যে আদর্শিক মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও মূল লেখা থেকে তা সাবলীল বর্ণনায় অনূদিত এবং সামান্য সংযোজন-বিয়োজন থেকেও বিরত থেকে বাংলায় তার পাঠ সহজলভ্য করা হয়েছে। সঠিক তথ্য-উপাত্ত বর্ণনায় এটি অকল্পনীয় ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ।
কিন্তু প্রশ্ন হলো,ইতিহাসের সঠিক তথ্য যাচাইয়ে কেন এ গ্রন্থ এতটা গুরুত্বপূর্ণ? সভ্যতার মানদণ্ডে বিচার করা সে সময়ের গাদ্দাফি কি কেবলই একনায়কতন্ত্রের নৈরাজ্য সৃষ্টি করে গিয়েছেন, নাকি এর পেছনে নানা শ্রেণীর অধিকার হরণের গল্পটাও তাঁর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে? সবকিছুই যেন ঘোলাটে, অজানা এবং গণমানুষের কাছে এই লৌহমানব এক ধোয়া তুলসীপাতা।
বিশ্বব্যাপী প্রচারিত নারীমুক্তির প্রবাদপুরুষ মুয়াম্মার আল-গাদ্দাফি অবশ্যই তাঁর বাহ্যিক অবয়বে সমীহ-জাগানিয়া এক আফ্রিকান ঘোড়া হয়ে থাকলেও তাঁর ভেতরের গল্পটা যে এতোটাই নোংরা এবং অসুস্থ মানসিকতা দিয়ে ভরপুর, তা 'গাদ্দাফির সঙ্গে আমার জীবন' পাঠ করবার আগে একটু-আধটুও অনুভব করা যাবে না বলে আমার ধারণা। পৃথিবীখ্যাত বাব আল-আজিজিয়ার মতো রোমহষর্ক প্রাসাদ যে এ যুগেও ঠায় দাঁড়িয়ে থাকার দুঃসাহস নিয়ে অপকর্মের দীর্ঘ ফিরিস্তি রচনা করে গেছে, তা হয়তো আমাদের কল্পনারও অতীত। সভ্যতার বুলি আওড়ানোর আড়ালে সময়কে মধ্যযুগের প্রবল বর্বরতার দিকে টেনে নিয়ে সেখানে সত্যিই কায়েম হয়েছিল একনায়কতন্ত্র কিংবা স্বৈরতন্ত্র–যেখানে অনিরাপদ ছিল প্রতিটি নারী, পুরুষ এবং সুরাইয়ার মতো কোমলপ্রাণ

কিশোরীরাও। গোপন হেরেমে আবদ্ধ শত শত শিশু গাদ্দাফির দানবীয় আক্রমণের কাছে ছিল নিতান্ত অসহায়। ক্ষুদ্র যৌবনলালসা আর নিতান্ত ভোগের উৎসবে তাঁর রোজকার মদের আসর আর ক্ষুধা মেটানোর এইসব উপকরণ সত্যিই কেমন অবিশ্বাস্য লাগে। এও কি ভাবা যায় চৌদ্দ'র গণ্ডি না পেরুনো কোনো শিশু–রোজ বিকেলে বন্ধুদের সাথে যার কৈশোরের সেই উচ্ছল দুরন্তপনার স্বাক্ষী হয়ে থাকবার কথা–সে কিনা আবদ্ধ হেরেমে যৌন ক্ষুধায় কাতর গাদ্দাফির অমানুষিক নির্যাতনের কবলে গুজরান করছে প্রতিটি মুহূর্ত!না রাত না দিন, সময়ে অসময়ে এমনকি রমজানের পবিত্র দিনগুলোতেও মিটতে চাচ্ছে না তাঁর পশুত্বসুলভ ক্ষুধা–আরও চাই আরও চাই।

পৃথিবীর মানুষের কাছে পবিত্রতম এ মহান কায়েদের হেরেমখানায় যখন আমি সুরাইয়ার হাত ধরে প্রবেশ করতে থাকি, অসংখ্য সুরাইয়ার ধর্ষিত হবার আর্তচিৎকার আমার চোখে অশ্রুর বন্যা বইয়ে দেয়। কুৎসিত সত্যের এই জলজ্যান্ত বর্ণনা আমাকে নিয়ে যেতে চায় পাপাচারে টালমাটাল প্রাচীন মিশরের ফারাও যুগে। চার হাজার বছর আগের ক্রীতদাস বনে গিয়ে ষড়যন্ত্র, যৌনতা ও নিষ্ঠুরতার কাছে যারা ছিল একেবারে ক্ষমতাহীন, তাদের খুব কাছেই যেন আমাকে চলে যেতে হয়েছে বাব-আল-আজিজিয়ার পথটি ধরে। ক্রুদ্ধতার সকল মাংসল পিণ্ড উথলে উথলে ওঠে যখন আমার, দেখি দু'সন্তানের পিতাও এই নরপিশাচের খাদ্যে পরিণত হয়ে বলাৎকারের শিকার। কী কুরুচিপূর্ণ মানসিকতা, ছিহ!

এরপরও কি বলা সম্ভব পশুসুলভ চরিত্রের পোষাকধারী এ ব্যক্তিটিই প্রতিনিধিত্ব করতে এসেছিল ইসলাম ও মুসলমানের? এর উত্তরটা সহজ করে দিতে চাইলে নির্দ্বিধায় বলে দিতে পারি, গাদ্দাফির মৃত্যুপরবর্তী সময়ে কোটি প্রাণে যে বেজে উঠেছিল 'আলহামদুলিল্লাহ' আর হাতে সূচিত হয়েছিল বিজয়ের চিহ্ন, এই তার উপযুক্ত জবাব। সবশেষে এই পিশাচসুলভ মানুষটির অনুপস্থিতি আর ক্রোধের আগুনে ঠাসা সুরাইয়ার সুচারু প্রতিশোধের ঠাস-বুনটের আনন্দ আমি অবশ্যই উপভোগ করতে চাই। এবং বিস্মৃত হতে থাকা এক সময়ের গল্পকে আমি সম্বোধিত করতে চাই এ বলে–এ তো এক রাজভোজ। একসময়ের দুর্বল কণ্ঠস্বরগুলো সুরাইয়ার মতোই জেগে উঠুক সময়ে সময়ে।

লেখক : শিক্ষার্থী, মাদরাসাতুল কাউসার আল-ইসলামিয়া, ঢাকা



‘দাদু একটা গল্প বলো’
সুদূরপ্রসারী আন্দোলনের ইফতিতাহ

যিয়াদ বিন সাঈদ

চান্নি-পসর এক রাতে জোছনা-ধোয়া আলোকবৃষ্টিতে আমাদের উঠোনে বসেছে তুমুল গল্পের আসর–গল্পের দীপ জলসা। কিচিরমিচির অভিনবে খোকাখুকিদের শক্ত আবদার–‘দাদু একটা গল্প বলো’র সামনে দেখা যাচ্ছে দাদুর অসহায় আত্মসমর্পণ। নিরুপায় তিনি চশমার ফোঁকর দিয়ে একবার এদিকে অন্যবার ওদিকে তাকিয়ে চললেন গল্পের সুবিস্তীর্ণ দৃশ্যপথ ধরে, নানান ভঙ্গিমায়, সুচারু ব্যঞ্জনায়। ঘুমঘুম চোখে সোনামনিরা অপলক তাকিয়ে আছে দাদুর সোনাঝরানো ওই আলোকবৃত্তে। গল্পের তালে তালে অভিনব ছন্দের মিশেলে কৃষ্ণবর্ণা এই রাত কেবলই হয়ে উঠছে ঝলমলে ও সাড়ম্বর।

হ্যাঁ, এমনই এক সুচিত্রিত আসরের পসরা সাজিয়ে দিয়েছেন আমাদের উস্তাযে মুকাউয়িম ইয়াহইয়া ইউসুফ নদভী। তিনটি শব্দের এ নামের ভেতর দিয়ে বয়ে যাওয়া অজস্র প্রসবণ, আর জুড়ে থাকা বিচিত্র যত অভিধা; তার আলাপ আরেকদিন না হয় করা যাবে। আজকের আলাপ ভঙ্গুর শিল্পের আবরণে রচিত এই ‘দাদু একটা গল্প বলো’ নিয়েই হোক। আলাপের বিষয়বস্তু সীমাবদ্ধ থাকুক সমকালে তার আনন্দের বার্তা বয়ে আনার নানা দিক নিয়ে এবং একটিমাত্র গ্রন্থ প্রয়োজনের মাপকাঠিতে কী অপরিসীম গুরুত্বের দাবিদার, সে বয়ানের মধ্য দিয়ে।

বনে-বাদাড়ে ঘুরে ঘুরে কিংবা গাছের ডালে পাখির ছোট্ট বাসাটির ফোঁকর দিয়ে যে গল্পগুলো চিত্রিত, তারই নাম ‘দাদু একটা গল্প বলো’। সুপ্রসন্ন অরণ্যের প্রতিটি জীব যেখানে গল্পের নায়ক, ডালে ডালে কিচিরমিচির শব্দের রিনিঝিনি অভিনবে বসে থাকা পাখিগুলো যেখানে স্বতন্ত্র একেকটি চরিত্র, রোজ

বিকেলের উঠোনে গালগল্পের মহিমায় উদ্বেলিত যখন তারা অথবা বিশাল এ বনের ভেতর দিন গুজরানো যত সকাল-সন্ধ্যা, তারই অঙ্কন 'দাদু একটা গল্প বলো'র ভেতরে। কিন্তু শুধুই কি গল্পের তাগিদে রসালো আলাপের পসরা এখানে? নাজ্জুর সালহান আর আবুল ফিদা'দের ওই যে গোছালো কেসসার বয়ান, তা কি কেবল দরদ তড়পানো গদ্যের ঝকমকে শৈলীর বহিঃপ্রকাশ? একদম না। অরণ্যের নানারকম জীবের জবানিতে বর্ণিত এইসব গল্পের ভেতরে আছে উপদেশ, শিক্ষা, চেতনা ও আদর্শের মজার পাঠ। পাঠকের শিশুমন বই শুরু করার আগে যেমন চিন্তার ধারক ছিল, নিশ্চিতভাবে গল্পপরবর্তী সময়ে তার চিন্তার মাঝে সৃষ্টি হবে বিস্তর ফারাক। অজান্তেই এখান থেকে শিশুমনে প্রোথিত হয়ে যাবে ব্যক্তি, সমাজ ও বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে কীভাবে শক্ত হাতে জুলুমের পদভারকে পিষ্ট করা যায়। কীভাবে প্রতিরোধের দুর্দমনীয় যোগ্যতা অর্জন করে আজান দেয়া যায় এক মহাবিপ্লবের।

একটি সুন্দর আগামীর স্বপ্ন যদি আমাদেরকে দেখতে হয় তবে অবশ্যই শিশুদের মনন এবং চিন্তার জগতটা নিয়ে আমাদের ভাবতে হবে প্রথমেই। আমাদেরকে ভাবতে হবে অন্যায়ের এই পৃথিবীতে যখন শিশুমনকে নোংরামো আর অসুস্থ চিন্তা দিয়ে ভরপুর করে দেয়া হচ্ছে তখন এর বিরুদ্ধে পরিশুদ্ধ একটি অঙ্গন কীভাবে নির্মাণ করা যায়। কেননা সময়ের এই ক্রান্তিকালে প্রায় ৪২ শতাংশ শিশু যখন ভিডিও গেইম আর অন্তর্জালের ভয়াল আক্রমণের শিকার, তখন এই শিশুদেরকে শুদ্ধতার শিক্ষা দিয়ে পরিশীলিত করবার দায়িত্বটা আমাদের ছাড়া আর কার? এমনই এক সুচিন্তিত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের স্বপ্ন নিয়ে হয়তো এই ময়দানে হাজির হয়েছেন ইয়াহইয়া ইউসুফ নদভী। কিন্তু অবশ্যই তাঁর এই উপস্থিতি সবার থেকে একটু ভিন্ন এবং উন্নত। কেননা তিনি জানেন অপশক্তির মোকাবেলায় তাঁর উপস্থাপন গতানুগতিক গণ্ডিতে পড়ে রইলে আরও দশটি শিশুসাহিত্যের সঙ্গে এটিও দেখা যাবে হারিয়ে গেছে কোথায়–কেউ জানে না।

ভিন্নতার বয়ানে আমি বলি প্রথমে তার বাহ্যিক অবয়বের কথা। কাজী যুবাইর মাহমুদের ঝকমকে প্রচ্ছদ আর নামলিপিই যেন কাফি এ বেলায়। তার সঙ্গে যখন যুক্ত হয় একশো গ্রাম অফসেট পেপারে করা আবদুর রহমান রুমির গল্পের আন্দাজে নানারকম অদ্ভুত সব ছবি, তখন এটা প্রশংসার উর্ধ্বে চলে যায়। শিশুদের উৎসুক মন গল্পের ছলে ছবির ভেতর দিয়ে যখন ঘুরতে থাকবে বনেবাদাড়ে, নতুন পুরোনো সব জীব-জন্তুর হাত ধরে, মস্তিষ্কে তখন গল্পের পেছনে থাকা লেখকের প্রয়াস স্পন্দিত হতে থাকবে। শিশুমন উন্নত চিন্তার ধারক হয়ে এখান থেকে বেরিয়ে আসবে নতুন এক অস্তিত্ব ধারণ করে। আর লেখক তো এটাই চান। লেখক তো চান পৃথিবীব্যাপী বয়ে যাক শান্তির স্বচ্ছ এক বাতাস। আগামীর আলয় হোক বসবাসের উপযোগী এবং আল্লাহপ্রদত্ত বিধানের অনুগামী।

সর্বোপরি এ যেন সুদূরপ্রসারী এক বিপ্লবের আহ্বানকারী প্রচেষ্টা। সর্বমহলে সিদ্ধির চিন্তাকে উপজীব্য করে যার চলন–এবং যে চলন একেবারে নির্মেদ, নিখুঁত। ইফরাত নয়, নয় তাফরিতও, মধ্যমপন্থাকে মাধ্যম বানিয়ে সকল স্তরের পাঠকের উপযোগী করে নির্মিত এক শিশুসাহিত্য 'দাদু একটা গল্প বলো'। আধুনিক যুগের বামঘেঁষা সেই শিশুসাহিত্য পাঠে নিমজ্জিত একজন পাঠকও অজান্তে তা গিলে গিলে খাবে। নিছক 'ইসলামি সাহিত্য' বলে উড়িয়ে দেবার কোশেশ থাকলেও দিনশেষে ফুটে উঠবে হেরে যাবার একটি কৃত্রিম হাসি। অথচ বাহ্যত দৃষ্টিতে ইসলামি চিন্তার প্রয়োগ এখানে না হলেও তার সবটা জুড়ে কিন্তু ইসলামের মৌলিক শিক্ষাটাই দিয়ে দেয়া হয়েছে। অত্যন্ত চতুরতার পরিচয় দিয়ে লেখক এসব সামাল দিয়ে গেছেন–যা বিস্ময়কর ক্ষমতার অধিকারী একজন মানুষ বৈ সম্ভব নয়। আখেরে অপেক্ষার আক্ষেপ না ঝাড়লেই নয়। 'দাদু আরেকটা গল্প বলো' তবে আসছে কবে? এ অপেক্ষার সময়ক্ষণ অতিদীর্ঘ না হোক। খুব তাড়াতাড়িই খুলে বসুক দাদুর আরেকটি গল্পের দীপ জলসা।

লেখক : শিক্ষার্থী, মাদরাসাতুল কাউসার আল-ইসলামিয়া, ঢাকা



‘সুলতান কাহিনি’
উসমানি সালতানাতের নির্মোহ ধারাবর্ণনা

জাহিদুর রহমান

মংগোলদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে যখন জনাকয়েক ঘোড়সওয়ার মাতৃভূমি ছেড়ে অজানার উদ্দেশ্যে পাড়ি জমায় তখনও কি তারা ভাবতে পেরেছিল তাদের বংশধরেরা একটা সময় পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ ভূমি শাসন করবে, তা-ও প্রবল প্রতাপে? সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা হয়, উসমানি সালতানাত, ধীরে ধীরে বাড়ে তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি আর বিস্তার। জন্ম-মৃত্যুকে কেউ এড়াতে পারে না, এক সুলতান যান, আসেন আরেক সুলতান... সালতানাতের মেয়াদ দীর্ঘায়িত হয়, বাড়ে সালতানাতের পরিধিও। তরতর করে এগিয়ে চলে উসমানীয় সাম্রাজ্যের অগ্রযাত্রা। কিন্তু সব কিছুরই শেষ আছে। একটা সময় সমাপ্তি ঘটে তাদের সুদীর্ঘ কালের শাসনের, এবং অতি অবশ্যই সমাপ্তিটা ছিল নিদারুণ দুঃখজনক। ততদিনে কালের গর্বে হারিয়ে গেছে ৬২৪টি সৌরবর্ষ। কিন্তু হারিয়ে যায়নি ৬২৪ বছর জুড়ে ব্যাপৃত উসমানি সালতানাতের উত্থান-পতন আর অবদানের গল্প, প্রবল প্রতাপে পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ শাসনকারী সুলতানদের উদারতাকিংবা উদাসীনতার কাহিনি। ইতিহাসের পাতায় নানা আঙ্গিকে নানা বর্ণনায় গেঁথে আছে তাঁদের কাহিনি ও গল্পগাঁথা। সেই সব কাহিনি নতুন বিন্যাসে বাংলা ভাষায় নতুনভাবে উপস্থাপিত হয়েছে ‘সুলতান কাহিনি’ গ্রন্থে ।

উসমানি সালতানাতের সমাপ্তি হয়েছে ১০০ বছরও হয়নি, কিন্তু এর গৌরবময় ইতিহাস বাংলা ভাষা-ভাষী মানুষের অনেকেরই অজানা। তুর্কি ব্যতীত ভিন্ন ভাষায় উসমানি সাম্রাজ্য বা উসমানি সুলতানদের ইতিহাস যা লেখা হয়েছে তা অনেকটাই পক্ষপাত দুষ্ট। মুসলিমরা যেমন গুণকীর্তন করেছেন একচেটিয়াভাবে, অপরদিকে এ ইতিহাসে বির্ধমীরা বিদ্ধ করেছে সমালোচনার তির। আর বাংলা ভাষায় তারই গুটি কয়েক অনুবাদ হয়েছে।

এসব পক্ষপাতদুষ্টতা ও সমালোচনার বাইরে এসে সুলতান কাহিনি বইটিতে লেখক তামীম রায়হান চেষ্টা করেছেন উসমানি সাম্রাজ্যের প্রকৃত ইতিহাস তুলে ধরতে। সৎ ও প্রজাবৎসল সুলতানদের ইসলামপ্রীতি, মানুষকে ন্যায় শাসন প্রদান, ইসলামের খেদমত এবং ইসলাম রক্ষার্থে জিহাদের ময়দানে ছুটে বেড়ানোর ইতিহাস যেমন এনেছেন, পাশাপাশি নারীর মোহে আটকে থাকা সুলতানদের ইতিহাসও পাশ কাটিয়ে যাননি তিনি। পাঠক খুব অল্পতেই উসমানি সাম্রাজ্য সম্পর্কে সাম্যক ধারনা লাভ করতে পারেন বইটি পড়ে। উসমানি সুলতানদের জীবন-কর্ম, বৈচিত্রময় চরিত্র, সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন, ভৌগলিক সীমানা পরিধি ও প্রভাব প্রতিপত্তির ইতিহাস সম্পর্কে এক চুমুকে জেনে নেওয়া যায় বইটির সাহায্যে। কখনো আনন্দে উজ্জীবিত হবেন আবার কিছু ঘটনায় কষ্টে মুষড়ে

পড়বেন পাঠক। পীড়া দেবে ক্ষমতার পালাবদলের রক্তাক্ত ইতিহাস। ভাইয়ের হাতে ভাই, বাবার হাতে পুত্র. পুত্রের হাতে বাবা, মায়ের হাতে পুত্র আবার পুত্রের হাতে মায়ের হত্যা ও নির্বাসনের ঘটনা নিদারুণ দুঃখজনক। উসমানি সাম্রাজ্যের সূচনা হয় সুলতান প্রথম উসমান বিন আরতুগরুলের হাতে। ১২৯৯ সালের ২৭ জুলাই তিনি স্বাধীন রাজ্যে নিজেকে বাদশাহ ঘোষণা করেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত ছিলেন উসমানি সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা সুলতান। তারপর সাম্রাজ্য বিস্তার ও বিজয়ের ধারা অব্যহত রাখেনসুলতান উরখান বিন উসমান ও তাঁর পুত্র প্রথম মুরাদ বিন উরখান বিন উসমান। যুদ্ধ ক্ষেত্রে বিজয়ী হয়েও প্রতারনার দরুণ শহিদ হন তিনি।

তাঁরপর ক্ষমতা গ্রহণ করেন তাঁর পুত্র সুলতান প্রথম বায়েজিদ বিন মুরাদ। এবং তাঁর হাতেই প্রথম রক্তারক্তি প্রথা চালু হয়। ক্ষমতায় বসেই ভাইকে হত্যার আদেশ দেন তিনি। এরই ধারাবাহিকতা যুগে যুগে প্রাণ কেড়ে নিয়েছে অনেক নিরপরাধ শাহাজাদার। তার ইতিহাসও সুখকর হয়নি। বীরত্বের সাথে রাজ্য পরিচালনা করলেও তৈমুর লঙের কাছে পরাজিত হয়ে বন্দী হন প্রথম বায়েজিদ এবং বন্দী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। এ সময় তাতার নেতা বিজিত অনেক সাম্রাজ্য পূর্বের ক্ষমতাসীনদের কাছে ফেরত দিলে ছোট হয়ে আসে সাম্রাজ্য। আর এ অবস্থায় বিবাদে লিপ্ত হন প্রথম বায়েজিদের চার পুত্র। ক্ষমতার নেশায় একে অপরের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতেও পিছপা হননি।

এই দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়ে সুলতান হন প্রথম মুহাম্মদ। তাঁর মৃত্যুর পর পিতার স্থলাভিষিক্ত হন সন্তান দ্বিতীয় মুরাদ। ৪০ বছর বয়সে তিনিই প্রথম ১৪ বছরের শিশুপুত্র দ্বিতীয় মুহাম্মদের কাছে ক্ষমতা ছেড়ে দেন নিজ ইচ্ছায়। যদিও পুনরায় তাঁকে আবারও ক্ষমতায় বসতে হয় ইউরোপিয়ানদের হামলা মোকাবেলায়।

তারপর সপ্তম শাসক হিসেবে আবারও ক্ষমতায় বসেন পুত্র দ্বিতীয় মুহাম্মদ। এবং তিনিই ইতিহাসের মহানায়ক সুলতান মুহাম্মাদ আল-ফাতেহ। তাঁর হাতে জয় হয় কনস্টান্টিনোপল। বাস্তবায়িত হয় শত শত বছর আগের নবিজির হাদিস।

এরপর ক্রমধারা অব্যাহত রেখে ক্ষমতায় আসেন সুলতান প্রথম সেলিম। উসমানি সালতানাতে তিনিই প্রথম সুলতান, যাঁর নামের আগে আমিরুল মুমিনিন উপাধী ব্যবহার করা হয়। আট বছরের শাসনামলে তিনি অসংখ্য নতুন রাষ্ট্র জয় করে উসমানি শাসনের আওতায় এনেছেন।

তারপর ক্ষমতায় আসেন সুলতান সুলায়মান। তিনিও প্রতাপের সাথে শাসন করেন এবং উসমানি সাম্রাজ্য বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। সুদীর্ঘ ৪৮ বছর তিনি উসমানি সাম্রাজ্যের প্রভাবশালী সুলতান হিসাবে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর হাতেই পুত্র হত্যার মতো ঘটনা ঘটে। যদিও তাঁর শাসনকালে তিনি শায়খুল হাদিসের ফতোয়ার বাইরে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেননি। সকল ফতোয়ার কাগজ তাঁর মৃত্যুর সময় বাক্সবন্দী করে তাঁর সাথে কবর দেয়া হয়। তাঁর মৃত্যুর পরেইমূলত উসমানি শাসনের পতনের ধারা শুরু হয় এবং শেষ পেরেকটি বিদ্ধ হয় সুলতান দ্বিতীয় আবদুল মজিদ বিন আবদুল আজিজের সময়।

এর ভেতর ঘটতে থাকে নানা উত্থান-পতন। কিন্তু কোনো শাসকই আর পূর্বপুরুষের ধারা বজায় রাখতে পারেননি। অন্দর মহলের নারীদের ক্ষমতা পরিচালনা, সৈন্যদেও ভেতর বিশৃঙ্খলা, সদরে আজম, শায়খুল হাদিসদের ক্ষমতার অপব্যবহারসহ প্রশাসনিক দুর্নীতি বৃদ্ধি এবং বৈদেশিক ষড়যন্ত্রের কারণেএক সময় ধ্বংস হয়ে যায় উসমানি শাসনব্যবস্থা। সাথে মুসলিম বিশ্ব হারায় মুসলমানদের একক নেতৃত্ব–খেলাফত। আর এ সবই ধারাবাহিকভাবে সংক্ষিপ্ত কিন্তু চমৎকার ও পর্যাপ্ত বর্ণনাধারায় বিবৃত হয়েছে অনুসন্ধানী লেখক-সাংবাদিক তামীম রায়হানের ‘সুলতান কাহিনি’ গ্রন্থে। বিবৃতি হয়েছে কামাল আতাতুর্কের ইসলাম-বিদ্বেষী কার্যকলাপসহ ইংরেজদের যাবতীয় ষড়যন্ত্রের কাহিনিও। গ্রন্থটি পাঠ করতে করতে পাঠক একই সঙ্গে আনন্দিত ও দুঃখিতবোধ করবেন উসমানি সাম্রাজ্যের বিজয় ও পরাজয়ের আখ্যানের সঙ্গে পরিচিত হয়ে।



প্রিয় বই, প্রিয় লেখক

হুসাইন আল হাফিজ

শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ড কী? মানুষের মনের ভালোলাগাটাই হয়তো একটা বস্তুর শ্রেষ্ঠ হবার মানদণ্ড। আমার চোখে একটা তুচ্ছ বস্তু অন্যজনের চোখে শ্রেষ্ঠত্বের আসন দখল করতেই পারে। প্রাণীকুলের বিচারে মানুষ শ্রেষ্ঠ হলেও পশু-পাখিদের শ্রেষ্ঠত্বকে অস্বীকার করা যায় না। তুচ্ছ বলে কোনো বস্তু শ্রেষ্ঠ হতে পারবে না, কথাটা আমার কাছে সম্পূর্ণ ভুল মনে হয়। অন্যভাবে বলা যায়, মানুষের চিন্তাধারা এবং রুচির ওপর শ্রেষ্ঠ হওয়া না-হওয়ার বিষয়টা নির্ভর করে।

ঝিঙেফুল এবং কাজী নজরুল

আমার বয়স যখন তেরো–ক্যালেন্ডারের পাতাজুড়ে তখন দু'হাজার বারোর শোরগোল। সন্ধ্যা পোহালো, এলো রাত। একটু পর চারদিকে বইবে উতালপাতাল ঝড়ের তাণ্ডবলীলা। এ তাণ্ডব সম্বন্ধে আমরা তখনো অজ্ঞাত। ফাহিম আমার সহপাঠি। আমাদের লজিং পাশাপাশি। একই হোস্টেলে থাকতাম বিধায় আমাদের চলাফেরাও একসাথে। ফাহিমের লেখার হাত দুর্দান্ত। বইপোকা। সারাক্ষণ বইয়ের মধ্যে ডুবে থাকত। আমরা লজিংয়ে পৌঁছুলাম। আমার হাতে ফাহিমের দেয়া কাজী নজরুল ইসলামের কাব্যগ্রন্থ 'ঝিঙেফুল'। জীবনের প্রথম পাঠ। বইটার প্রতি অদ্ভুত রকমের আগ্রহ ছিল, আছে। সকাল থেকে বইটার সাথে সখ্য হওয়ায় ক্লাসে বসেই পড়ে ফেলি টানা আঠারো পৃষ্ঠা। বইটি পাঠ করে আমি যেভাবে শিহরিত হয়েছিলাম, সে অনুভবটি আমার মনে

এখনো তাজা হয়ে আছে। কয়েক পৃষ্ঠা পড়েই বোধ করেছিলাম, আকাশ, বাতাস, পাখপাখালি, তরুলতা আর চরাচরের একটি অংশ আমিও। মনের মধ্যে অদ্ভুত রকমের ছন্দ কাজ করছিল। আমার এবং সাহিত্যের প্রথম যোগসূত্র কাজীর এই 'ঝিঙেফুল'। সেদিন লজিংয়ে বসেও বইটা খানিক পড়লাম। খাবার এলো। ভাতের প্রথম লুকমা মুখে দিতেই টের পাই আকাশে গুড়ুম গুড়ুম বজ্রধ্বনি। আতঙ্কে বুকটা কেঁপে ওঠে। আকাশে তিলমাত্র সাদা মেঘের জায়গা অবশিষ্ট নেই। কালো মেঘে ঘোমটা দেয়া আকাশ। এই বুঝি আছড়ে পড়বে তুমুল বৃষ্টি নিয়ে।

লজিং থেকে আমাদের হোস্টেল আরও ২০ মিনিটের দূরত্ব। গাছ-গাছড়ায় ঘেরা পাহাড়ি পথঘাট। নীরব, নিস্তব্ধ একলা একা রাত। চাঁদ নেই, তারা নেই। কারও কোনো সাড়া নেই। আশপাশে একটা পোঁকার নড়াচড়া পর্যন্ত আমাদের কানে বাজল না। ফাহিমের খাবার শেষ হলে আমরা বেরিয়ে পড়ি হোস্টেলের উদ্দেশে। বাইরে প্রবল দমকা বাতাস, সামনে এগোবার ফুরসত নেই। যতোই ঝড় আসুক 'বইটা ভিজতে দেয়া যায় না'। বগলে চেপে ধরি বইটা। বাতাসের গতি বেড়েই চলে। সাথে ঝিরঝিরে বৃষ্টি। পাঞ্জাবি-পাজামা ভিজে একেবারে জবুথবু।

দৌড়াচ্ছি তো দৌড়াচ্ছি। রাস্তার পাশে হঠাৎ খড়কুটোর চালঅলা একটা ঘর চোখে পড়ে। কাঁচামাটির বেড়া। ঘরটির দরজা খোলা দেখে বারান্দায় উঠলাম। ঘরের মালিক নিঃসঙ্কোচে আমাদের আশ্রয় দিলেন। চৌকিতে বসালেন। ঘরটির চাল বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা পানি ঝরছে। গায়ে চ্যাপচ্যাপা পানির ছিটা লাগছে। ঝড়ের তাণ্ডবে মনে হচ্ছে পাশের কোটার গোয়ালের গরুগুলো বেদিক হয়ে ছুটে এইমাত্র অদৃশ্য হয়ে যাবে। সাঁই সাঁই আওয়াজ। গাছের ডালপালার মড়াৎ মড়াৎ শব্দ। অনেকগুলো গাছ শিকড়সুদ্ধ উঠে মাটিতে গা এলিয়ে দিলো। সচকিত শংকায়, মৃদুমৃদু কম্পনে তোলপাড় এ ধ্বংসের স্তূপ বেড়েই চলছে। বৃষ্টিতে বইয়ের অবস্থা আশঙ্কাজনক। পাঞ্জাবির মুড়ি দিয়ে মুছে আবার বগলে রাখি। ধীরে ধীরে প্রকৃতির ডানা ঝাপটানো স্তব্ধ হয়। ঝড় থামে, বাতাসও থামে। আকাশ কিছুটা ফর্সা হয়। চাঁদের দেখা মেলে। আমরা সাহস জমিয়ে এগোই। ১০ মিনিটের মাথায় হোস্টেলে পৌঁছোই। রুমে ঢুকে কিছুটা হালকা বোধ হলেও বৃষ্টিতে ভিজে বইয়ের লেখাগুলো ঝাপসা হয়ে পড়াতে, কিছুটা বিষণ্নতা কাজ করছিল মনে। মনটা অসম্ভবরকমের দুর্বল হয়ে পড়ে। জীবনের প্রথম পাওয়া প্রিয় মানুষের উপহার। প্রিয় বই। যা হোক, স্মৃতিচারণ করতে করতে অতঃপর দু'হাজার চৌদ্দ সালের শেষদিকে এক বসায় পুরোটা পড়ে ফেললাম। আজও আমার মনে পড়ে সেই দিনটি, ঝিঙেফুল এবং কাজী নজরুল, তোমাকে।

শাহাদুজ্জামানের কালো হরফ

আকাশের দিকেহা করে তাকিয়ে বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে থাকতাম ছোটবেলা; একফোঁটা বৃষ্টি যেন পড়ে মুখে। কদাচিৎ ফোঁটা দুয়েক বৃষ্টি পড়তো যখন টুপ কওে, আনকোরা উত্তেজনায় ঢেঁকুর উঠত মনের করিডোরে। অদ্ভুতরকম একটা অনুভূতি আগলে ধরতো হৃদয়ের পাচিল। লুফে নিতে ব্যস্ত থাকতাম তখন বৃষ্টির ফোঁটাগুলো। মন যেন এক পাতানো কচুপাতা, ধরি ধরি করে জমিয়ে রেখেছি জলফোঁটার স্মৃতিময়তা, মনের বেতারে। বাদল দিনে রোদ যেন-বা হঠাৎ উঁকি মারে–এ কেমন অনুভূতি? প্রচণ্ড তৃষ্ণায় একজগ পানি ঢক ঢক করে গিলে খাবার তৃপ্তি এ অনুভূতির কাছে এক সমুদ্র পানি খাবে যেন।

হ্যাঁ, শাহাদুজ্জামানের কালো হরফগুলোই শৈশবের সে বৃষ্টি আমার। ওই ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টির পানি, তার একেকটি শব্দ। অপেক্ষায় যার হা করে তাকিয়ে থাকতে হয়। গল্পের মহাকাশ এ শাহাদুজ্জামান; যাঁর থেকে ঝরুক-না মাত্র এক ফোঁটা বৃষ্টি, বিশালতা এক সমুদ্র সমান তো। অসীমতা সীমাহীন। দীর্ঘতর এক বাক্যসমান অর্থদায়ক একেকটি শব্দ তাঁর। শব্দানুরাগী এক মনীষা তিনি। শব্দের গলায় তাবিজ গাঁথার নিখুঁত মুন্সিয়ানা জানেন। অনুভবের মধ্যবর্তী চুম্বকটা তাঁর চিরচেনা, হাতের মুয়া যেন; যেখানে স্বয়ং

আকর্ষণ তিনি। আছে অবাকপ্রসূত দৃষ্টিভঙ্গি। রঙধনুর মতো আছে এক নিখাঁদ গদ্যশৈলী। ঝরঝরে তাঁর কথনরীতি। আছে শিল্প, আছে শিল্পের স্বাতন্ত্রিকতা। তাঁর গল্প মানেই যেন ফকফকা রোদের আলো চিন্তার উঠোনে। আর বা যেন, ধারা তাঁর অবিরল স্ফটিকস্বচ্ছ জলের মতোন। বয়ে যায়, যাবে অবিরত।
হাঁটুজলে হেঁটে যেতে পানির চপ চপ শব্দের মতো ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয় তাঁর কলমে। কালিতে তাঁর বেজে চলেন স্বয়ং তিনি এবং তিনি-ই। রসালো শব্দের জোড়াতালি দিতে পারেন বহু কর্মকার, সবার থেকে টসটসে জীবনবোধ তেমন আভা ছড়ায় না, শাহাদুজ্জামানের জানলার কাঁচ বেয়ে উঁকি দেয় যেমন জীবনবোধ। গল্প কতটা সাবলীল, হৃদয়গ্রাহী আর মনোঃপুত হবার ক্ষমতা রাখে, 'কয়েকটি বিহ্বল গল্প' তার প্রমাণ। 'কয়েকটি বিহ্বল গল্প' আমার পড়া শ্রেষ্ঠ বইয়ের একটি।

পাওলো কোয়েলহো, দ্য অ্যালকেমিস্ট

ব্রাজিলিয়ান লেখক পাওলো কোয়েলহো'র যুগান্তকারী উপন্যাস 'দ্য অ্যালকেমিস্ট'-এর কথা বলতে গেলে যুবাইর ভাই মানে যুবাইর ইসহাকের কথা বলতেই হয়। যে ক'জন মানুষের সাথে ওঠাবসার ক্ষেত্রে অবাক হবার মতো দুয়েকটা পরিস্থিতির সম্মুখীন হই, যুবাইর ভাই তাদের একজন। গেলবছর মাস তিনেকের মতো আমাদের এক হোস্টেলে থাকা পড়ে। সে সুবাদে প্রায় ভোরেই উপশহরের আশপাশ ধরে হাঁটাহাঁটি করতাম। প্রকৃতির আশ্চর্য লীলায় আমরা মজে থাকতাম। সকালের কোমল হাওয়ায় মুগ্ধ হতে হতে আবার ফিরতাম ক্যাম্পাসে। চলার পথে জমে উঠত আমাদের আলাপচারিতা। পর্যায়ক্রমে বইয়ের প্রসঙ্গ উঠলে যুবাইর ভাই জিজ্ঞেস করত, এই বইটা পড়েছো, অইটা পড়েছো? এই জিজ্ঞাসার ধারাবাহিকতায় যুবাইর ভাইয়ের বলাতে সংগ্রহ করি বিদেশি সাহিত্যে আমার পড়া তৃতীয় বই 'দ্য অ্যালকেমিস্ট'। অনুবাদগ্রন্থের ক্ষেত্রে অনুবাদকের অনুবাদের উপর পুরো বইয়ের মান নির্ভর করে। সেক্ষেত্রে দেখা যায়, অনেক অনুবাদক শুধু শব্দের অনুবাদটাই করে গেছেন, লেখকের মূল ভাবটা হারিয়ে গেছে অতলে। মূল বই পড়লে অন্তত এই বিভ্রান্তি থেকে বাঁচা যায়। আমার যখন মূল বই হাতের নাগালে নেই, তদুপরি লিও তলস্তয়, শেক্সপিওর-সহ বিদেশি অনেকের লেখা পড়লেও পাওলো কোয়েলহো'র 'দ্য অ্যালকেমিস্ট'ই আমার কাছে শ্রেষ্ঠ মনে হলো। বিশেষত কাহিনির দিকটা উল্লেখযোগ্য। বইটা পড়তে গিয়ে বোধ হলো, বইয়ের প্রতিটা লাইনই যেন আমাকে ঘিরে লেখা। উপন্যাসটি ঊনিশ শতকের পটভূমি অবলম্বনে, সান্তিয়াগো নামের আন্দালুসিয়ান এক রাখালকে কেন্দ্র করে লিখিত। লেখক চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন, একজন মানুষ কীভাবে পৌঁছাতে পারে তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে। রয়েছে ঘটনার ঘনঘটা, উত্তেজনা এবং পলে পলে জীবনের নিগূঢ় তথ্যাবলি। আর এটাই একজন লেখকের সফলতা ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ। মাকসুদুজ্জামান খানের অনুবাদকৃত এই বইটি টানা দুবারে শেষ করেছিলাম, মনে পড়ে।

লেখক : শিক্ষার্থী, জামিয়া গহরপুর, সিলেট



‘প্রিয়তমা’
নবিজির ঘরোয়া জীবনের নান্দনিক গল্পভাষ্য

ইসরাত জাহান

আম্মাজান আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহা তখন নিতান্ত কিশোরী। বউ হয়ে সবে এসেছেন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের ঘরে। উম্মাহাতুল মুমিনিন, নবিজির অন্যান্য পূণ্যবতী স্ত্রীগণের ব্যাপারে কিশোরী আয়েশার মনে প্রায়ই একটা প্রশ্ন উঁকি দেয়, অকারণ কৌতূহল জাগে তাঁর মনে–রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম স্ত্রীদের মধ্যে কাকে অধিক ভালোবাসেন? তাঁকে, নাকি অন্য কোনো স্ত্রীকে?

একদিন রাসুলকে তিনি জিজ্ঞেস করেই ফেললেন। তবে বুদ্ধিমতী আয়েশা প্রশ্নটা একটু ঘুরিয়ে করলেন, বললেন, ‘হে আল্লাহর রাসুল, আমাকে আপনি কতটা ভালোবাসেন?’

নবিজি খানিক ভেবে উত্তর দিলেন, ‘তোমার এবং আমার মধ্যে ভালবাসার বন্ধনটা এতটা শক্ত, যেমন একটা রশির মধ্যে সুতাগুলো শক্তভাবে জড়িয়ে থাকে, একই বাঁধনে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা থাকে।’

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা ভীষণ খুশি হলেন নবিজির এ উত্তর শুনে। আর কথা বাড়ালেন না তিনি, তাঁর উত্তর ইতিমধ্যে পেয়ে গেছেন, মন থেকে মুছে গেছে কৌতূহলের কালো মেঘ।

তারপর প্রায়ই তিনি নবিজিকে দুষ্টুমিভরা স্বরে জিজ্ঞেস করতেন, ‘হে আল্লাহর রাসুল, বন্ধন কি আগের মতোই আছে, না ঢিল হয়ে গেছে?’

নবিজিও তাঁর দুষ্টুমির জবাবে মুচকি হেসে বলতেন,‘বন্ধন আগের মতোই দৃঢ় আছে। বাঁধনে কোনোদুর্বলতা বা পরিবর্তন আসেনি।’

এমনই গল্পধারায় এগিয়ে গেছে সালাহউদ্দীন জাহাঙ্গীর রচিত নবিজির ঘরোয়া জীবনের নান্দনিক গল্পভাষ্য 'প্রিয়তমা'র বর্ণনা।

'প্রিয়তমা'য় বিবৃত হয়েছে নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের এগারোজন পূণ্যবতী স্ত্রীর জীবন ও সংসারের প্রেমময় আখ্যান। কিন্তু এটা তাঁদের জীবনীগ্রন্থ নয়, বরং তাঁদের জীবনের সুরম্য গল্পভাষ্য। জীবনের গল্পগুলো জীবনীর মতো গৎবাঁধা ধারায় বর্ণনা না করে গল্পের আদলে সাজানো হয়েছে গ্রন্থটি।

জীবনের গল্প বলতে গিয়ে উঠে এসেছে তাঁদের সঙ্গে রাসুলের দাম্পত্য ভালোবাসা, সাংসারিক প্রেম, পারস্পরিক সৌহার্দ্য, জীবনযুদ্ধে লড়ে যাওয়ার সঞ্জীবনী, নারী অধিকার, নারীশিক্ষাসহ আরও অনেক অজানা কাহিনি।

একবার আম্মাজান হজরত মায়মুনা বিনতে হারিস রাদিয়াল্লাহু আনহা গিরগিটির গোশত রান্না করেন। নবিজি তা দেখে বললেন, 'আমি তা খেতে পছন্দ করি না।' তবে সাহাবিদের বললেন,'তোমরা খেতে পারো।' মায়মুনা রাদিয়াল্লাহু আনহা হয়তো আগে এ মাংস খেতেন, কিন্তু রাসুলের অপছন্দ দেখে তিনি নিজের অপছন্দের তালিকায় যুক্ত করে নিলেন এ মাংসকে।

এ কেবল দু'জনের মাঝে অপরিসীম ভালোবাসা থাকলেই সম্ভব। একজন সঙ্গী যখন তার অপর সঙ্গীর পছন্দ-অপছন্দকে নিজের ললাটলিখন বানিয়ে নেয় তখন এ ভালোবাসা জাগতিক সকল ক্ষুদ্রতা ও পরিসীমা ছাড়িয়ে যায়। এমন ভালোবাসার জন্যই যুগে যুগে রচিত হয়েছে অসংখ্য মহাকাব্য।

রাসুলের ভালোবাসার ছায়ায় থেকে সকল উম্মুল মুমিনিনই নিজেদেরকে কোনো না কোনো মহত্ত্বে বিশেষায়িত করেছিলেন। কেউ ছিলেন হাদিসবিশারদ, কেউ জ্ঞানের আধার, কেউ খোদাভীতিতে অতুলনীয়, কারও ছিলো কোরআন পাঠের মুগ্ধকর চরিত্র, তেমনি কেউ ছিলেন দানশীলতায় এগিয়ে।

আমরা সাধারণত দুই থেকে তিনজন উম্মুল মুমিনিনের জীবনীসহ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সাথে বিবাহ-পরবর্তী ও পারিবারিক কিছু ঘটনা মোটামুটি জানি। বাকি আট থেকে নয়জনের ব্যাপারে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া পর্যন্তই আমাদের জ্ঞান সীমিত।

'প্রিয়তমা' বইটিতে এগারোজন উম্মুল মুমিনিনের জীবনী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার আগ থেকে বিবাহ পরবর্তী জীবন, রাসুলের সাথে কেমন করে দিন অতিবাহিত করেছেন তাঁরা, আর তাঁর সাংসারিক জীবন কেমন ভালবাসাপূর্ণ ছিল তা খুব যত্নের সাথে লেখক আমাদের জানিয়েছেন।

কোনো একজন আম্মাজান রান্নায় পারদর্শী ছিলেন, রাসুলুল্লাহ তাঁর রান্নার প্রশংসা করতেন। কেউ তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারী ছিলেন, রাসুল তাঁর বুদ্ধির তারিফ করতেন।

নারীদের বিষয়গুলোতে (যেমন অন্য স্ত্রীদের একটু অন্য চোখে দেখা) তিনি অন্য স্ত্রীদের সতর্ক করে দিতেন। কেউ ভুল করলে শুধরে দিতেন। আবার তিনি স্ত্রীদের কাছে নিজের প্রবল ব্যক্তিত্বের বাহাদুরি প্রকাশ করতেন না, নিজেকে স্ত্রীদের কাছে সমর্পণ করে দিতেন তাঁদের ভালোবাসার আঙিনায়।

মোটকথা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের পবিত্র জীবনের টুকরো টুকরো আয়না ছিলেন তাঁরা। যে আয়নায় তাকালে রাসুলের জীবনের ছায়াচিত্র স্বচ্ছ হয়ে ভেসে উঠবে। তাঁরা তাঁর আলোকেই নিজেদের জীবনকে সাজিয়ে তুলেছেন এবং মুসলিম উম্মাহর জন্য উৎসর্গ করেছেন তাঁদের লব্ধ জ্ঞানের ডালি।

আমাদের লৌকিক সমাজের প্রায় প্রতিটি পরিবারেই শোনা যায় স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্যকলহ, মানসিক টানাপোড়েন, পরস্পরের বিশ্বাসহীনতা, সংসার ভাঙার করুণ সুর। আমরা কখনো কি নবি-সংসারকে সামনে রেখে আমাদের পারিবারিক সমস্যাগুলো দূর করার চেষ্টা করেছি? হয়তো করা হয়নি। অথচ উম্মাহাতুল মুমিনিনদের জীবনে রয়েছে প্রেম আর ভালোবাসায় পূর্ণ এক সংসারের ছায়াচিত্র, যা সমগ্র পৃথিবীর জন্য শিক্ষণীয়। যে গ্রহণ করবে তার জীবন আলোকিত হবে। 'প্রিয়তমা' গ্রন্থটিতে সেই সুখী আর প্রেমময় জীবনের গল্পই বলা হয়েছে।

কিছু স্মৃতি, কিছু অগোছালো আলাপন

ফাহিম আবরার

অবশেষে অবিশ্বাস্যভাবে বেঁচে গেল ১২ জন থাই শিশু ও তাদের ২৫ বছর বয়সী কোচ। বেরিয়ে এল থাম লুয়াং নামক মরণ গুহার মরণ কামড় থেকে। ১০ কিলোমিটার দীর্ঘ বিশাল এই গুহায় একরকম খোদায়ি কুদরতেই বেঁচে ছিল তারা। বিভিন্ন দেশের অন্তত ৪০ জন দক্ষ ডুবুরির অক্লান্ত প্রচেষ্টায়তাদেরকে উদ্ধার করা হয়।

টানা বেশ কদিন বিশ্বমিডিয়ায় তুমুল আলোচিত সংবাদ ছিল এটা। আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলোর ব্যপক প্রচারণায় শক্তিশালী দেশগুলো নড়ে চড়ে বসে। এবং এ কাজে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেয়। শেষ পর্যন্ত তারা সফল হয়।

অবশ্যই মিডিয়া এতে প্রশংসার দাবি রাখে। কিন্তু একই বিষয়ে এবং পরিস্থিতিতে এই মিডিয়া যখন মুসলমানের বেলায় এর বিপরীতমুখী আচরণ আমাদের হতবুদ্ধি করে দেয়। বিবেক-বুদ্ধি লোপ পেয়ে যায়। অবাক হয়ে ভাবি, কেন এই বৈরিতা? কেন এই স্বার্থপরতা?

কী অপরাধ করেছিল কুন্দুজের প্রায় ১০০ জন ক্ষুদে কুরআনে হাফেজ! কেন এভাবে তাদের শহিদ করে দেওয়া হলো! তারাও তো ছিল শিশু, এক একটি কলি, যে কলিগুলোর জন্য সারাদিন অঝোরে কাঁদল আকাশটা। দীর্ঘক্ষণ কাঁদারপর একটা শিশু যেমন আচমকা নীরব হয়ে পড়ে ঠিক তেমনি আকাশটাও শান্ত, নিশ্চুপ হয়ে আছে। শীতল হাওয়া বইছে।

এই ক'দিনের তীব্র গরম কিছুটা হলেও কমছে। ঢাকার অলি-গলিগুলো থিকথিকে কাদায় মাখামাখি। কয়েকটা পিচ্চি মনের আনন্দে দৌড়াদৌড়ি করছে। খালি পায়ে কাদার উপর দৌড়ানোর মজা বড়রা বুঝবে না, তাদের কাছে এটা একটি ঘৃণার বিষয় বৈ কিছু না।

মানুষজন হেঁটে যাচ্ছে, একেক হাঁটার একেক ভঙ্গি। কেউ হাঁটছে হন হন করে, কেউ ধীরে, কেউ আবার হাঁটছে আলসে হাঁটা।

নিশুতি রাতের মতো নিস্তব্ধতা ভেঙে কোথাও তারস্বরে কা.. কা... করছে একটা কাক।

ছোট ভাইটিকে নিয়ে বের হলাম। মাগরিবের আজান পড়ল বলে। আশপাশের দোকানগুলোতে একটা দুটো বাতি জ্বলতে শুরু করেছে। সদ্য ব্যস্ত নগরী হঠাৎই যেন থমকে আছে।

'ভাইয়া তাড়াতাড়ি আসো।' হাতটা ধরে তাড়া দিল আমাকে। জোরে হাঁটা দিলাম। মাদরাসার কাছে আসতেই হাত ছেড়ে দিয়ে কোন দিকে যেন দৌড়ে গেল। লক্ষ করলাম, একটা ফুচকার দোকান, ফুচকাওয়ালা একজন মুরুব্বী। আধা-পাকা পাতলা দাঁড়ি, মাথায় টুপি।

কাছে গিয়ে পকেট থেকে পাঁচ টাকার একটা নোট বাড়িয়ে দিলাম ছোটভাইটিকে। ঘাড় কাত করে বলল, 'পাঁচ টাকার ফুচকা দেন!' ফুচকাওয়ালার দুই হাত তখন মহাব্যস্ত। ওর কাঁধে হাত রেখে বললাম, 'দিচ্ছে, দাঁড়াও।' অস্থিরতার কারণটা অবশ্য টের পাচ্ছি। আজানের পর মাদরাসায় ঢুকলে শাস্তি পেতে হবে।

ও বললো, 'ভাইয়া! এখন খেতে গেলে আজান দিয়ে দেবে, মাদরাসায় নিয়ে খাব।'

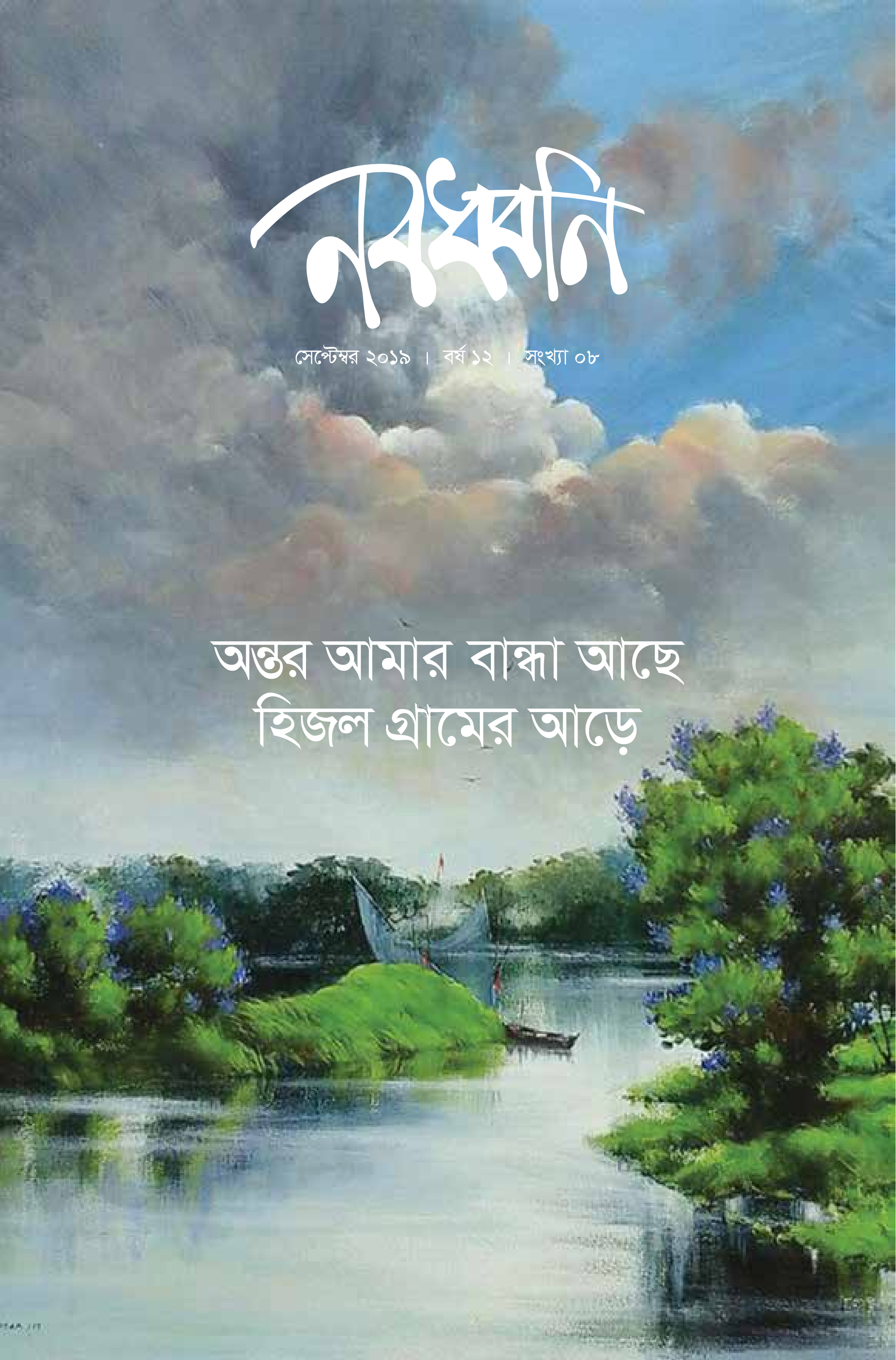
একথা শুনে রেগে মেগে আগুন হয়ে গেল মুরুব্বী। 'কোনো নেওয়া-নেওয়ি নাই! খাইলে এহানেই খাইতে হইবো, বুঝছো? না খাইলে যাউগা।'
আমি অবাক হলাম, মানুষের সাথে মানুষ এভাবে কথা বলে! পার্সেল দিলে কি খুব বেশি ক্ষতি হয়ে যেত! চার আনার একটা পলিথিন দিতে হতো, তাই?
আমার মাথায় তখন আগুন। পারতাম দু-একটা কথা শুনিয়ে দিতে। জিজ্ঞেস করতাম, 'কাকা, আপনার সন্তানাদি নেই? বাচ্চাদের সাথে কি এভাবেই কথা বলেন?'
আরও অনেক কিছুই মাথায় নয়, একেবারে মুখের আগায় চলে এসেছিল, কিন্তু কেন যেন কথাগুলো শব্দ হয়ে বেরোতে পারেনি।
আমার ধৈর্য শক্তি অনেক কম, কিন্তু কেন যেন সেদিন ওপরওয়ালা আমার ধৈর্যের পারসেন্টিজটা ১০ থেকে এক লাফে ১০০-তে উন্নীত করে দিলেন। ফলে একটা কথাও উচ্চারণ করতে পারলাম না। শুধু ঠাণ্ডা, শীতল একটা দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলাম কিছুক্ষণ।
ঝাড়ি খেয়ে বেচারার মুখ একেবারে পাংশু হয়ে গেল। আমি বললাম, 'কী করবি, এখানেই খেয়ে যা। আজানের দেরি আছে।' ও কোনো রকমে গিলে মাদরাসায় ঢুকে পড়ল।
ফিরে যাওয়ার সময় ভাবলাম কিছু কথা বলেই যাই, পরক্ষণে মনে হলো কী দরকার! পৃথিবীর তাবৎ অসভ্য মানুষকে সভ্যতা শেখানোর দায়িত্ব আমার উপর বর্তায় না।
এখন রাত দশটা বেজে ১৬ মিনিট। একটু আগেই ক্ষুধার তাড়নায় পেটের ভেতর চো চো করতে থাকা ইঁদুরটা মারা পড়েছে। আধ-ছটাক অতি সাধারণ আলু ভাজির সাথে প্রায় এক প্লেট সাদা ভাতের স্বাদ কী অপূর্ব হতে পারে সেটা আজই বোধগম্য হলো।
চারদিকে পড়ালেখার ধুম চলছে। এবং আশ্চর্যের ব্যাপার যে, যে ছেলেটার পড়ালেখায় মোটেও মনোযোগ নেই সেও দেখি ৪২৪ ভোল্টের পাওয়ার নিয়ে মেহনত করছে! অবশ্য পড়াশোনা না করেও উপায় নেই। পরীক্ষার বাকি আছে মাত্র ২০ দিন। ইতিমধ্যেই সবকটা কিতাব কোনটা কত দিনে শেষ করতে হবে এই তালিকা তৈরি করে দেয়ালে সেঁটে দেওয়া হয়েছে।
স্বাভাবিকভাবেই আমার এখন কিতাবের মাঝে ডুবে থাকা উচিত, কিন্তু কেন যেন কিছুতেই মনটাকে পড়ায় বসাতে পারছি না। ভাবলাম, কিছু না-হোক অন্তত কলমটাকে সঙ্গ দিই।
(আধঘন্টা পর)
(সঙ্গ দেওয়ার সমাপ্তি ঘটেছে, এবার আবার পড়ায় ফিরে যাই।)
আমাকে নতুন একটা রোগে ধরেছে। এই রোগের নাম 'অসম্পূর্ণতা' রোগ। কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজ একেবারেই না করা যতটা খারাপ, কাজ আংশিক করে বাকিটা ফেলে রাখা তার চেয়ে বেশি খারাপ হওয়ার কথা। এই কাজটাই আমি অবললীয় করে যাচ্ছি। আমার ডায়েরির প্রতিটি লেখা ইদানীং অসম্পূর্ণ থেকে যাচ্ছে। ভাবছি পরে পূরণ করে নেব, কিন্তু সেটাও সময় হচ্ছে না এবং ইসরাফিলের দ্বিতীয় বার শিঙ্গায় ফুঁৎকার দেওয়ার আগ পর্যন্ত হবে কিনা সেটা নিয়েও আছে যথেষ্ট সংশয়।
আচ্ছা আমার কি এখন ছোটগল্প লেখা উচিত? অনেকেই আমাকে পরামর্শ দিচ্ছেন ছোটগল্প লেখার। একজন ভালো লেখকের হাতেখড়ি হওয়া উচিত গদ্যের মাধ্যমে। এবং অবশ্যই সংক্ষিপ্ত পরিসরে।
প্রশ্ন : অসম্ভব প্রতিভাধর ব্যক্তিরা পৃথিবীতে কেন জন্মায়?
উত্তরঃ বিধাতা অসম্ভব প্রতিভাধর ব্যক্তিদের পৃথিবীতে পাঠান প্রতিভাবানদের মূর্খতা ও অযোগ্যতাকে চিহ্নিত করার জন্য। অসম্ভব প্রতিভাধর আজ যদি না থাকতেন তাহলে প্রতিভাবানরা প্রত্যেকেই নিজেদের পরিপূর্ণ মনে করতেন।
আমি নিয়মিত লিখছি না। তবে আমার নিয়মিত না লেখার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ যেটা সেটা হলো আমি এই মুহূর্তেই লিখছি, কারণ পরীক্ষা একেবারেই নাকের ডগায়, এক চোখ বন্ধ করলে দেখা যায়। অবশ্য লেখার আরও একটা লাভ হচ্ছে এখন। আশপাশের সবাই ছানাবড়া চোখে তাকাচ্ছে। তবে তাদের দৃষ্টিটা কি সমীহের না তাচ্ছিল্যের তা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। বিস্তর চিন্তা-ভাবনা করে লেখার সময় নেই এখন। কোনো রকম কলমের প্রবাহ জারি রাখাটাই উদ্দেশ্য। সুতরাং লেখা পড়ে বাঁকা চোখে তাকানোর কোনো কারণ নেই।
ইদানীং অনেক বেশি চিন্তাগ্রস্থ হয়ে পড়েছি। চিন্তার পোকাগুলো মাথাটা কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে। অবাক হই, ভীষণ অবাক। চিন্তার এই পোকাগুলো আগে কোথায় ছিল? এই দংশনটা অনেক আগেই হওয়ার কথা ছিল না?
হবেই বা কীভাবে, আমি তো আগে কখনো ওদের দাওয়াত করিনি।

লেখক : শিক্ষার্থী, মাদরাসা বাইতুল উলুম, ঢালকানগর ঢাকা

নবধ্বনি

সেপ্টেম্বর ২০১৯ । বর্ষ ১২ । সংখ্যা ০৮

অন্তর আমার বান্ধা আছে হিজল গ্রামের আড়ে



সেপ্টেম্বর ২০১৯ । বর্ষ ১২ । সংখ্যা ০৮

সম্পাদক
তামীম রায়হান

নির্বাহী সম্পাদক
সালাহউদ্দীন জাহাঙ্গীর

সহকারী সম্পাদক
হামমাদ রাগিব
নাজমুস সাকিব

প্রকাশনা ব্যবস্থাপক
আসাদুল্লাহ খান

সার্কুলেশন ব্যবস্থাপক
মুহাম্মদ ইসহাক খান

মূল্য ৫ টাকা মাত্র

নবধ্বনি । দোকান নং ২৭ । ২য় তলা । ইসলামী টাওয়ার ১১/১ বাংলাবাজার । ঢাকা
সার্কুলেশন : ০১৩১৮ ৬৩৪৪১২ । সম্পাদনা : ০১৭৪৫ ১৩৯২১৫

Email: nobodhoni@gmail.com web: noboprokash.com/nobodhoni

স্বাগত কলাম

কাশ্মির নিয়ে ভারতীয় সরকারের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্ত আহত করেছে সারা বিশ্বের সাধারণ মুসলিমকে। 'সাধারণ মুসলিম' বলে বিশ্বের সকল মুসলিমকে অঙ্গীভূত করাটা মনে হয় ঠিক হলো না। কেননা, ভারতের এমন সিদ্ধান্তের পর সে দেশের প্রধানমন্ত্রী মধ্যপ্রাচ্যের একটি মুসলিম দেশে রাষ্ট্রীয় সফরে গেলে দেশটির আমির তাকে ফুলমাল্য পরিয়ে নিজ বাসভবনে বরণ করে নেন। কাশ্মিরের মুসলিমদের রক্তে যার হাত লাল, তার গলায় লাল গোলাপের মালা দিয়ে যারা বরণ করে নেন, তারা কতটা মুসলিম—এটা চিন্তার বিষয়। সুতরাং 'সকল মুসলিম' বলে এমন মুসলিমদের এক কাতারে নিয়ে আসাটা কাশ্মিরিদের সঙ্গে অন্যায় বৈ কিছুই নয়।

এখন কথা হলো, কাশ্মির নিয়ে এই ঘনীভূত এই সংকট কি সহসা কাটবে? কিংবা কাশ্মিরের ভবিষ্যত বিষয়ে আমরা কীভাবে চিন্তা করতে পারি?

দুটো প্রশ্নই বেশ খতরনাক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। দেখুন, পৃথিবীর ভূরাজনৈতিক পরিস্থিতি দিন দিন জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠছে। প্রতিটা দেশ নিজ নিজ দেশের অর্থনীতি ও অভ্যন্তরীণ রাজনীতিকে চাঙ্গা রাখতে এমন সব সিদ্ধান্তের দিকে এগুতে দ্বিধা করছে না, যেগুলো তাদের জন্য ভবিষ্যতে বিপদজনক হতে পারে। কাশ্মিরের বিষয়টাই ধরা যাক। কাশ্মির বিষয়ে স্বার্থ আছে ভারত, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, চীন বা আরও দু-একটা পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রের। এই স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীকে যদি হাত করা যায় তাহলে কাশ্মির বিষয়ে উচ্চবাচ্য করার মতো কেউ আর থাকবে না। বিভিন্ন মুসলিম দেশে গোটা দশেক মিছিল হবে, সামাজিক মাধ্যমে উত্তেজিত ছবি-ভিডিও-লেখাজোখা প্রকাশ পাবে, কেউ কেউ সহমর্মিতার বিবৃতি দেবে—এই। এর চেয়ে বেশি কিছু না হওয়ার সম্ভাবনাই প্রবল। যেহেতু স্থানীয় সকল পক্ষই পর্দার আড়ালে যার যার স্বার্থের ব্যাপারে তুষ্ট, সুতরাং ধীরে ধীরে উত্তেজনা কমে আসবে। এসব কারণে আমেরিকা বা পশ্চিমা বিশ্ব এখানকার এই ভূরাজনৈতিক খেলায় হাত ঢুকাবে না। এর আরও বড় কারণ হলো, বিগত কয়েক বছরে নানা সময় কাশ্মিরে ব্যাপক সহিংসতার খবর এসেছে গণমাধ্যমে। কাশ্মিরিদের সেখানে ব্যাপক হারে যেমন হত্যা করা হয়েছে, তেমনি কাশ্মিরি স্বাধীনতাকামীদের হাতে নিহত হয়েছে বহুসংখ্যক ভারতীয় সেনা। এমন সংবাদের ফলে কাশ্মির যে একটা যুদ্ধকবলিত অঞ্চল—এমন সত্য আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। তো, এ অঞ্চলকে বশে আনতে সবচেয়ে যোগ্য কে? পশ্চিমাদের দৃষ্টিতে যোগ্যতার দাবিদার একমাত্র ভারত। কাজেই কাশ্মিরের দলিল তার হাতেই তুলে দেয়া হোক। ফলে, ভবিষ্যতে কাশ্মির বিষয়ে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে খুব বেশি কিছু যে আর শুনবেন না, এটা ধরে নেয়া যায়।

সত্য কথা বলতে, আমরা খুবই আবেগপ্রবণ জাতি। কিন্তু বিশ্ব তো আবেগ দিয়ে চলছে না। এখানে নানা ব্যবসায়িক তত্ত্ব এবং অর্থ ও রাজনীতির স্বার্থ দিয়ে মাপা হয় মানুষের মাথা। আপনার আমার আবেগ, ধর্ম, জাতিসত্তা, ভাষা, ভালোবাসা সবই রাষ্ট্রযন্ত্রের কাছে কেবলই ব্যবসা ও রাজনীতির হাতিয়ার। এ কারণে আবেগী না হয়ে যথাসম্ভব বুঝতে চেষ্টা করুন পৃথিবী কোন দিকে যাচ্ছে এবং ভূরাজনীতিতে কে কাকে টেক্কা দিয়ে হাতিয়ে নিচ্ছে নিষ্পাপ ভূখণ্ড। হিসাব অনেকটাই সহজ হয়ে যাবে।



যে গ্রামে মিশে আছে আমার শৈশব

তামীম রায়হান

আমাকে যদি কোনো গ্রামের ছবি আঁকতে বলা হয়, অথবা কোনো গ্রাম নিয়ে দু কথা লিখতে হয়, তবে আমার স্মৃতিপটে যে গ্রামের সুন্দর সমুজ্জ্বল ছবি ভেসে ওঠে, সেটি চাঁদপুর জেলার অন্তর্গত সদর থানার শাহতলী বাজারের দক্ষিণে অবস্থিত মুমিনপুর গ্রাম। এই গ্রামে কেটেছে আমার শৈশবের সাত বসন্ত। গ্রামের নরম মেঠোপথ, আকাবাঁকা শান্ত নদী, সকাল-সন্ধ্যায় সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের ছবি, বছরজুড়ে বৈচিত্রময় ঋতুর প্রকৃতি–এ সবকিছু আমি এই গ্রামে দেখেছি। এই গ্রাম ছাড়া অন্য কোনো গ্রামে আমি এতো দীর্ঘ সময় আর থাকিনি, ফলে অন্য কোনো গ্রামের সবুজ শ্যামল ছবি এতোটা কাছ থেকেও আর দেখিনি।

মুমিনপুর মাদরাসার গ্রামীণ পরিবেশে আমি পড়াশোনা করেছি দীর্ঘ সাত বছর। আমার বয়স যখন সাত, সেখানে আমি তখন ভর্তি হয়েছিলাম। যখন আমি চৌদ্দতে, তখন বিদায় নিয়েছি শৈশবের স্মৃতিমাখা সেই আঙিনা থেকে। আজ গ্রাম নিয়ে কিছু কথা লিখতে বসে কত কথাই না মনে পড়ছে সেই ফেলে আসা দিনগুলোর।

এর পর আজ অবধি পেরিয়ে গেল অনেক বছর। বিশেষ করে গত এক দশকে কোনো গ্রামে দুদিনও থাকার সুযোগ ও সময় হয়ে ওঠেনি। গ্রাম ও গ্রামীণ পরিবেশে কিছুটা সময় কাটানোর জন্য আমার ভেতরে সুপ্ত হাহাকার জেগে ওঠে বারবার।

মুমিনপুর মাদ্রাসার সামনে দিয়ে একেবেঁকে বয়ে গেছে ডাকাতিয়া নদী। জোয়ার-ভাটা বলতে যা বুঝায়, সেটা আমি প্রথম এই নদীর বুকে দেখেছি। ঝাঁকে ঝাঁকে কচুরিপানা ছড়িয়ে থাকার দৃশ্য দেখলে মনে হতো, এখানে নদী নয়, বরং জেগে উঠেছে কচুরিপানার ক্ষেত। এত কচুরিপানা কোথা থেকে আসে, কোথায় চলে যায়, সেটা ছিল আমার এক বিস্ময়।

আমি এই নদীতে সাঁতার শিখেছি। সাঁতার কেটে মাঝনদী পর্যন্ত গিয়েছি। আমার সহপাঠীরা নদীর ওপার পর্যন্ত সাঁতার কেটে চলে যেত, আমার কখনো সেই সাহস হয়নি। শীতকালে কুয়াশায় ঢাকা নদীর দৃশ্য ছিল বড় সুন্দর। নদীর পানি এবং আকাশ থেকে নেমে আসা ধবধবে কুয়ার কী গভীর মিতালি। এই কুয়াশা ভেদ করে ধীরগতিতে চলত ছোট বড় মালবাহী ইঞ্জিনচালিত নৌকা, যেগুলো তখন

আমাদের কাছে পরিচিত ছিল ট্রলার নামে। প্রতিদিনের সকাল, দুপর, বিকেল ও সন্ধ্যা এবং রাতের পাঁচ সময়ে প্রকৃতি ও পরিবেশের যে রূপ, তা আমি অবাক বিস্ময়ে দু চোখ মেলে উপভোগ করেছি মুমিনপুরে। ভোরের সুবহেসাদিক এবং এরপর সকালে যখন সূর্য ওঠে, তখন কী সুন্দর আলোয় ভরে ওঠে গ্রামের পরিবেশ। এর মধ্যদুপুরের গ্রাম আরেকরকম সুন্দর, বিকেলের গ্রাম হতো চাঞ্চল্যে ভরা, এরপর সন্ধ্যার বিষণ্নতা এবং রাতের নিস্তব্ধতা। রাতে হালকা আলোর হলুদ রঙের বাল্ব জ্বলতে থাকা গ্রামের ছবি এক রকম, আবার বিদ্যুৎবিহীন মোমবাতি, হারিকেন ও টর্চলাইটের আলোয় গ্রামের ছবি আরেকরকম। এরপর অমাবস্যার রাত এবং পূর্ণিমার রাত, কতো রকমের রাত বিরাজ করে গ্রামের গ্রামীণ পরিবেশে, সেসব বলে এই অল্প কথায় শেষ করি কীভাবে!

জীবনে প্রথমবারের মতো বাঁশঝাড়, নারিকেল বাগান, সুপারি বাগানসহ অনেক বাগান প্রথম দেখেছি সেই গ্রামে। ডাকাতিয়া নদীটির এক পারে ছিল মাদরাসা, অন্যপারে ছিল চর। শুকনো মৌসুমে এই চরে চাষ হতো ধান। সে ছিল এক অপূর্ব দৃশ্য। আবার বর্ষামৌসুমে থই থই নদীর পানিতে তলিয়ে যেত চর, যেন এখানে কোনোকালে দৃশ্যমান সমতল বলতে কিছুই ছিল না।

শহরে বৃষ্টি হলে কেউ বলে শান্তির বৃষ্টি, কারণ তাতে পরিবেশের তাপ কিছুটা কমে আসে। আবার কেউ বলে বিরক্তকর, কারণ বৃষ্টিতে জনজীবনে ব্যাঘাত ঘটে। কিন্তু গ্রামের ওই পরিবেশে বৃষ্টি ছিল কেবলই সুন্দর উপভোগের। বৃষ্টি কখন থামবে, এই নিয়ে কোনো উদ্বেগ বা বিরক্তিকর অপেক্ষা আমি কোনোদিন দেখিনি সেখানে। প্রচন্ড ঝড় হলেও তাতে আপত্তি ছিল না কারোর। বৃষ্টির এই সৌন্দর্য অবগাহনের জন্য যে প্রশান্ত ও সুস্থির চিত্ত লাগে, তা শহরবাসীর নেই বললে চলে।

শহরের বৃষ্টিভেজা কাদা-ময়লা বিরক্তিকর, কারণ তা নোংরা এবং বর্জ্য মেশানো থাকে। কিন্তু গ্রামের পিচ্ছিল পথ কিংবা বৃষ্টির পানি জমে থাকা মেঠোপথ নিয়ে আমরা কখনো বিরক্ত হইনি। বরং এসব ছিল প্রকৃতির দানে নানা রূপের সৌন্দর্য, তা নিয়ে কারোর বিরক্তি ছিল না। প্রকৃতির প্রতি এই গভীর প্রেম ও মমতা গ্রামের মানুষের মনে লেপ্টে থাকে জীবনভর।

টিনের চালে বৃষ্টির শব্দ ছিল আমাদের মনে আনন্দের সূচক। এই শব্দ যত প্রবল হয়, আনন্দ তত লাফিয়ে উপরের দিকে বাড়ে। এই বৃষ্টিধ্বনি শুনে আমরা বুঝে নিতাম বর্ষণের ঘনত্ব এবং শক্তিমাত্রা, এটির জন্য কোনো আবহাওয়া সমীক্ষার জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হতো না। টিনের চালে গাছ থেকে আম ঝরে পড়ার শব্দ আমি আজো ভুলিনি। শব্দ হওয়া মাত্র আমার সহপাঠীরা দৌড়ে যেত আম টোকাতে, এরপর এই নিয়ে চলত তাদের বড়াই এবং লড়াই।

এভাবে প্রকৃতির কোলে কেটেছে আমার শৈশবের দুরন্ত দিনগুলো। গ্রামে থাকাকালে আমি যেভাবে চাঁদ এবং সূর্যের উদয়-অস্ত এবং যেসব ভিন্ন ভিন্ন রূপ দেখেছি, এখনকার শহুরে শিশু-কিশোররা তা থেকে বঞ্চিত দেখে আমার করুণা হয়। বিশেষ করে পুরো মাসজুড়ে চাঁদের যে বদলে যেতে থাকা রূপ, তা গ্রামে না থাকলে কেউ দেখার সুযোগ পাবে কোথায়!

আমি সবসময় আমার জীবন নিয়ে ভীষণ তৃপ্ত। আর এই তৃপ্তির শেকড়ে জড়িয়ে আছে গ্রামে কাটানো প্রকৃতির মমতা মেশানো আমার শৈশব। এখন যখন আমি বিশ্বের প্রাচুর্যঘেরা আধুনিকতম দেশগুলোর একটিতে থাকছি, তখনও আমার মধ্যে প্রকৃতি এবং পরিবেশ নিয়ে কোনো অতৃপ্তি বা অভিযোগ নেই। কারণ, এই প্রকৃতির মনভোলানো রূপ দেখে দেখে কেটেছে আমার ছেলেবেলার দিনগুলো। আর তাই ভীষণ গরমে এখানকার প্রকৃতি ও পরিবেশ যখন অসহনীয়, তখনও এর প্রতি আমি এক ভিন্ন রকমের মায়া অনুভব করি। দিনে দিনে আমার বন্ধুরা এখন শহুরে। কোনো বন্ধু আর এমন নেই, যার বাড়িতে গিয়ে আমি গ্রামের প্রকৃতি ও সৌন্দর্যে হারিয়ে যেতে পারি কিছুদিনের জন্য, বাকি জীবনে এই দুঃখ আমার রয়ে গেল।



গ্রামের ভেতর-বাহির এবং একজন মুগ্ধ দর্শকের বয়ান

সাবের চৌধুরী

পড়ালেখা শেষ করে আমি নিয়মিত গ্রামে বসবাস করছি আজ পাঁচ বছর, কিন্তু গ্রামের প্রতি আমার মুগ্ধতাটা কমছে না। দিন দিন বাড়ছে কেবল। আমি এখনো সীমাহীন আনন্দ নিয়ে গাছপালার দিকে তাকিয়ে থাকি। গ্রামীণ প্রকৃতির ছোট ছোট ব্যাপারগুলোও আমাকে টান দিয়ে ধরে রাখে। আমাদের বাড়ির দক্ষিণ দিকে একটা বাঁশঝাড় আছে, ওখানে আগে ঘন জঙ্গল ছিল। কিছু জায়গা এমন ছিল, সূর্যের দিনেও সেখানে রোদ ঢুকতো না। বাঁশঝাড়, বুনো গাছপালা, কবরস্তান, আলোছায়া, উঁচুনিচু ঢেউ খেলানো ছোট্ট ভূমি।
বেশ কয়েক বছর আগে আমি জায়গাটাতে মাঝে মাঝে পিচ্চিদেরকে নিয়ে ক্যাম্পিং করতাম। খোলামেলা একটা জায়গায় পাটি বিছিয়ে রাখতাম। চেয়ার-টেবিল থাকতো। টিফিন বাটিতে করে খাবার নিয়ে যেতাম। তখন তো আজকালের মতো মোবাইল ছিল না, টেপরেকর্ডার নিতাম। খাতা-কলম, বই, ছবি আঁকার জন্য জলরঙ, ক্যানভাস ইত্যাদি নানাবিধ আয়োজন। একদম পিচ্চিদেরকে পাটিতে বসিয়ে রাখতাম। একটু বড় যারা, তারা থাকতো একদম স্বাধীন। কেউ জঙ্গলের ভেতর ঢুকে আনন্দ আর ভয় নিয়ে এদিক-সেদিক হাঁটতো। কেউ কেউ পাখি, পিপীলিকা, মাকড়সার জাল বোনা ইত্যাদির দিকে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকতো। আর আমি একটু ছবি আঁকতাম, একটু বই পড়তাম, সংগীত শুনতাম, কখনো গাছপালা মাঠ আর শিশুদের দিকে তাকিয়ে থাকতাম।
আমাদের একটা এয়ারগান ছিল। আমার নিশানা ভালো ছিল না কোনোকালে। সারা জীবনে আমি পাখি মারতে পেরেছি মাত্র দুইটা। তবু, মাঝে মাঝে ঠুশঠাশ করতাম। এটা মূলত আমার ক্ষুদ্র অ্যাডভেঞ্চারের অংশ ছিল। আরেকটা ব্যাপার ছিল বেশ মজার। চারকোণা একটা ছোট্ট জায়গা ছিল। ছোট ছোট লতাগুল্ম ছিল পুরো জায়গাটা জুড়ে। ওখানে অনেক প্রজাপতি থাকতো। বলতে পারেন, প্রজাপতির হাট বসতো সেখানে। আমি পিচ্চিদেরকে নিয়ে এর ভিতরে ছেড়ে দিতাম। শিশুদের সাড়া পেয়ে প্রজাপতির রাজ্যে একটা হইচই পড়ে যেত। কয়েকটা শিশু রঙবেরঙের অসংখ্য প্রজাপতির মাঝখানে ঢুকে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে আছে, উচ্ছ্বল হাসিতে মুখ ভরে আছে, এবং এগুলোকে ধরার জন্য প্রাণপণ দৌড়াচ্ছে—এসবের চেয়ে সুন্দর দৃশ্য আর কী হতে পারে!
মাঝে মাঝে আমি একাও যেতাম। গ্রামের ঝিম ধরা দুপুরে নিঃসঙ্গ হয়ে বেতবনের পাশে বসে থাকতাম লম্বা সময় ধরে। সে সময় আমার মনে একটা গোপন ইচ্ছাও

কাজ করতো। আমি মনে মনে সাপ দেখতে চাইতাম। সাপকে আসলে আমি অনেক ভয় পাই। কিন্তু সাপের শারীরিক সৌন্দর্য অসাধারণ। এবং নিরাপদ দূরত্ব থেকে তাদের মসৃণ পথচলা, আচরণ গতিবিধি–ব্যাপারগুলো দেখতে আমার খুব ভালো লাগে।

শুধু গাছপালাই নয়, একটা জিনিসে যখন আপনি মুগ্ধ হয়ে থাকবেন, তখন এর ছোটখাটো ব্যাপারগুলোও আপনার মধ্যে আনন্দ ছড়াবে। একদিন আমি পথ দিয়ে হেঁটে আসছিলাম, হঠাৎ দেখলাম দুটো মোরগ এতো ভীষণভাবে ঝগড়া করছে, আমি শিশুদের মতো দাঁড়িয়ে থেকে দীর্ঘ সময় এদের ঝগড়া দেখলাম। পথের পাশে যখন ভাঁটফুল ফুটে, অন্ধকারে ফুলের থোকাগুলো ধবধবে আলোর মতো লাগে। আমি দেখি আর জীবনানন্দের কথা মনে পড়ে।

আরেকটা ব্যাপার বলি। ঘর থেকে বের হয়েই আপনি গ্রামজুড়ে নানা রকমের শিশুদের দেখা পাবেন। কেউ পাতাকুড়োনি, কেউ স্কুল যাচ্ছে। টুকটুক করে মাত্র হাঁটতে শিখেছে, এরকম পিচ্চিদেরকেও দেখবেন এখানে-সেখানে অযথাই ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমি ওদের জীবনধারাটা বোঝার চেষ্টা করি। এরকম একটা শিশুকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করার মতো আনন্দের আর কিছু হয় না। গ্রামের মানুষগুলোও বিচিত্র রকমের। ওদের জীবনের দিকে তাকিয়ে অনেক কিছু অনুভব করার আছে।

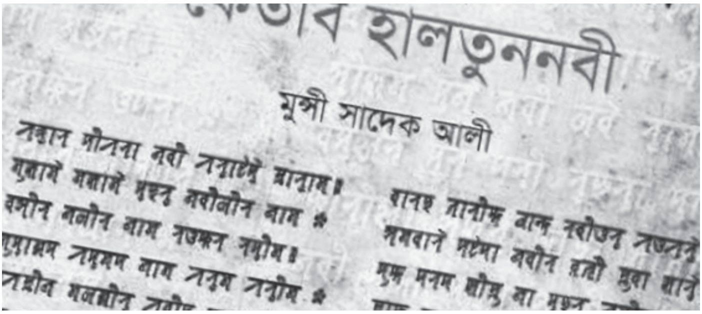
গ্রামে খুব ঘন হয়ে অন্ধকার নামে। আমি মাঝে মাঝে অন্ধকার দেখতে বের হই। অন্ধকার রাতে একা একা নক্ষত্র দেখার আনন্দ অন্যরকম। এই বয়সেও তুমুল বৃষ্টির দিনে চুপচাপ বেরিয়ে পড়ি। বেশ লজ্জা লজ্জা লাগে। এতো বড় একজন মানুষ অযথাই বৃষ্টিতে ভিজছে, ব্যাপারটা একটু হাস্যকরই তো।

গ্রামের আরেকটা বিশেষ দিক আমার কাছে মনে হয় এর নীরবতা ও প্রশস্ততা। আপনি ঘরে-বাইরে চতুর্দিকে একটা উন্মুক্ততা ও অনাবদ্ধতার আনন্দ পাবেন। এই উন্মুক্ততায় অভ্যস্ত হয়ে যাবার কারণে শহরে গিয়ে আমার হাঁসফাঁস লাগে।

গ্রামের প্রতি আমার যে মুগ্ধতা এর নানাবিধ দীর্ঘ এবং বিশ্লেষণপূর্ণ বিবরণ আছে। এতে লেখা অনেক লম্বা হয়ে যাবে। কিন্তু চোরাস্রোতের মতো গ্রামীণ জীবনের কিছু দুঃখও আছে। আমার দেখামতে গ্রামের নারীগণ অনেক বেশি নির্যাতিত। ঘরে ঘরে একেকজন নারী যেন একটা দুঃখনদী। বিশেষ করে গ্রামের নারীদের নিয়ে আমাদের একান্ত হয়ে ভাবা উচিত। অশিক্ষিত একটা পরিবারে একটা নারী কতভাবে যে নির্যাতিত হতে পারে আপনি ভাবতেও পারবেন না। গ্রামের যে শালিসপদ্ধতি, মৌলিকভাবে এটি খুবই সুন্দর একটি ব্যাপার। কিন্তু এই সালিশকে ঘিরে যে মাতব্বর শ্রেণীটির উদ্ভব হয়েছে, এর অন্তরালে আছে জুলুমের উৎস। গ্রামের প্রচলিত পঞ্চায়েত প্রথাকেও আমি নিন্দা করতে চাই। পঞ্চায়েতের সূত্রে মহল্লাকেন্দ্রিক যে সংঘবদ্ধতা, এর উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই মহৎ, কিন্তু আমার দেখামতে এই প্রথা মানুষের মধ্যে একটা ক্ষুদ্র জাতীয়তাবাদকে গড়ে তুলেছে এবং মানুষের হৃদয়ের ভেতর 'পর'-অনুভূতির বাঁধ নির্মাণ করে দিয়েছে। একটা গ্রামে এই পঞ্চায়েতের মতো আরো নানাবিধ সীমানা আছে। ফ্যামিলি, গোষ্ঠী, পাড়া-মহল্লা, দিক, এবং গ্রামের সীমানা। কোনো এক সীমানার কেউ একজন যখন কোথাও ঝগড়ায় লিপ্ত হয়, তখন সে সীমানার সবাই তার পক্ষে দাঁড়িয়ে যায়। এখানে ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্নটি তখন খুবই হাস্যকর লাগবে। এ প্রশ্নটি শুধু আসতে পারবে হানাহানি শেষে সবাই মিলে শালিসে বসার পর। গ্রামে গ্রামে মারামারির ব্যাপারটি তো বাংলাদেশের বিখ্যাত একটি বিষয় এবং আমাদের সমাজের এক গভীর ক্ষত। এর বাইরে আছে 'আশরাফ'-'আতরাফ'-এর বিভাজন। হিংস্র গ্রামীণ রাজনীতি, গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে যুগ যুগ ধরে চলে আসা হানাহানি। এই সমস্যাগুলো শহরে যে নেই এমন না। কিন্তু গ্রামে এগুলোর প্রকাশ হয় বেশি এবং প্রকটতরভাবে। শহরে পরিবারগুলো যার যার মতো থাকে। একে অপরের সাতে-পাঁচে নেই। ফলে, শহরের জীবন অনেকটা বিচ্ছিন্ন এবং বিক্ষিপ্ত। যে যার মতো থাকে। এ কারণে গ্রামীন আপনত্বটা তারা না পেলেও এই আপনত্বের ক্ষতির দিকটি থেকেও তারা বেঁচে থাকতে পারে।

আমাদের সমাজটি এখন পর্যন্ত গ্রামপ্রধান। ফলে, গ্রামের বৈষয়িক উন্নতির বাইরে ভেতরগত এই সমস্যাগুলো নিয়ে সিরিয়াস রকমের কাজ হওয়া দরকার বলে মনে হয়। কিন্তু করবেটা কে?

লেখক : সমালোচক আলেম ও মাদরাসাশিক্ষক, হবিগঞ্জ



পুঁথি সাহিত্য ও বাংলার গ্রামীণ জীবন

বাশিরুল আমিন

বড় হয়ে পুঁথি-পাঠক হবো–এরকম একটা স্বপ্ন লালন করেছি বহুদিন। স্বপ্নটা একদমই অল্প বয়সে ভেতরে গেঁথে বসে; যখন কিনা বাংলা হরফ চেনা শুরু করেছি মাত্র। বানান করে পত্রিকার শিরোনাম পড়ে ফেলার মতো সাংঘাতিক আনন্দের বিষয়টি আবিষ্কার করে ফেলার পর আমার ছোট্ট জীবনের লক্ষ্য স্থির করে বসি যে, আমি বিখ্যাত পুঁথি-পাঠক নিয়াজুদ্দির মতো হবো। লোকে আমাকে খুব চিনবে, চায়ের মজলিশে, ধানের খোলায়, আর মাহিলা নদীর ঘাটে আমার নাম বলে প্রশংসায় ভাসিয়ে দেবে। যেমনটি হয় মৃত নিয়াজুদ্দির ক্ষেত্রে। আহা! লোকে কী তাজিম করে তাঁর নাম মুখে নেয়, তাঁর ভারী গলার খুব তারিফ করে। কেউ কেউ তার নাম শুনে কাঁদেও বটে। বেচারা আর দুনিয়াতে নেই, আর তারাও পুঁথি শোনার মতো মহা-আনন্দ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। শিশুমনে আমি ভাবি, পুঁথি শুনতে না পারার কষ্ট তাহলে বড়ই নিদারুণ।

সেই বিখ্যাত পুঁথিপাঠক নিয়াজুদ্দিন ছিলেন আমার দাদা। আমি দুনিয়ায় আসার আগেই বুড়ো দুনিয়া ছেড়ে পালিয়ে যায়। কিছুটা বড় হয়ে যখন হাটে-ঘাটে যেতে শুরু করি, লোকজন আমাকে জিজ্ঞেস করত–'তুমি কার ছেলে? তোমার দাদার নাম কী?' গ্রামের লোকজন এমনই, প্রথম দেখায় কখনোই তারা আপনার নাম-ঠিকানা জিজ্ঞেস করবে না। জিজ্ঞেস করবে বাপ-দাদার নাম। আখেরে ঠিকানা। যখন দাদার নাম বলতাম, চোখ বড় বড় করে লোকজন বলতেন, 'দাদার মতো কালো বর্ণের হয়েছ ঠিক, তবে দাদার মতো সুরেলা কণ্ঠের অধিকারী হতে পারবা কি না কে জানে!' তারপর শুরু হতো দাদাকে নিয়ে তাঁদের স্মৃতি রোমন্থন–কে কবে তাঁর কণ্ঠে 'গাজী কালু চম্পাবতী' শুনেছে, কে তাঁর মজলিশে 'বিষাদ সিন্ধু' শুনেছে ইত্যাদি আলাপে।

অগ্রহায়ণ মাসের ধান কাটা শেষে অথবা যখন গ্রামের কৃষক-মজুরদের আর কিছুই করার থাকত না তখন তাদের রুটিনে পুঁথি শোনা ছিল বিশেষ এক কর্ম। দিনের আলো নিভে গেলেই কুপি জ্বালিয়ে শুরু হতো পুঁথি-পাঠ। সন্ধ্যার পর প্রায় প্রতিটি অবস্থাসম্পন্ন বাড়ির উঠানে বা দহলিজে কুপি-বাতি আর হারিকেন জ্বালিয়ে বসত পুঁথিপাঠের আসর। হালকা জলখাবারের সাথে অধিক রাত পর্যন্ত চলত এ আসর। পাঠকের জন্য থাকত বিশেষ ধরনের ধুমপানের ব্যবস্থা–হুক্কা বা ওক্কা। গড়গড় করে হুক্কা টেনে শুরু করতেন ইউসুফ-জুলেখার জীবনী কিংবা কারবালার করুণ কাহিনি।

লাইলি-মজনু, শিরি-ফরহাদ, সয়ফুলমুলক বদিউজ্জামাল ও গুল বকাওলীর মতো কাহিনি পড়তেন তিনি; আমির হামজা, হাতেম তাই, সোহরাব-রুস্তম ইত্যাদি ছিল তাঁর প্রিয়। তবে সবচে বেশি পড়তেন গাজী-কালু আর চম্পাবতীর পুঁথি। পুঁথিটি মুখস্থ থাকায় তাঁর কপিটি তিনি আমার ফুফুকে দিয়েছেলেন। যা এখনো আমাদের বাড়িতে বিদ্যমান আছে। পুঁথিপাঠ-শ্রোতারা এতো তন্ময় হয়ে শুনতেন যে প্রতিটি বাক্য তাঁদের আবেগ-অনুভূতিকে নাড়া দিত। যেন পুরো আসরটি একটিই মাত্র মন-ধ্যান দিয়ে পরিচালিত। পাঠকের কণ্ঠের ওঠানামার সাথে বদলে যেত শ্রোতাদের চেহারা। এই তাঁরা প্রফুল্ল এই বিষাদাচ্ছন্ন। কখনো কখনো কাহিনির ক্লাইমেক্সে নারী শ্রোতারা হু হু করে করে কান্নায় মাটিতে লুটিয়ে পড়তেন। এসব আসরে রাজত্ব করে বেড়াতেন আমার দাদা নিয়াজুদ্দি সরদার। দাদার খাতিরে লোকজন মাঝে মাঝে আমাকে লজেন্সও খাওয়াত। সমীহ করত। দোয়া দিত। পুঁথি-পাঠকের নাতি হিসেবে আমার সে কি গর্ব। বেজায় আফসোস, উপযুক্ত গুরু আর যথেষ্ট পরিমাণের পুঁথি সংগ্রহ করতে না পারার দুঃখে আর বিখ্যাত পুঁথি-পাঠক হতে পারলাম না। আশপাশের গ্রামগুলোতে আমার দাদা নিয়াজুদ্দিই বিখ্যাত হয়ে রইলেন। তাঁর পৌত্র আর বিখ্যাত হতে পারল না।

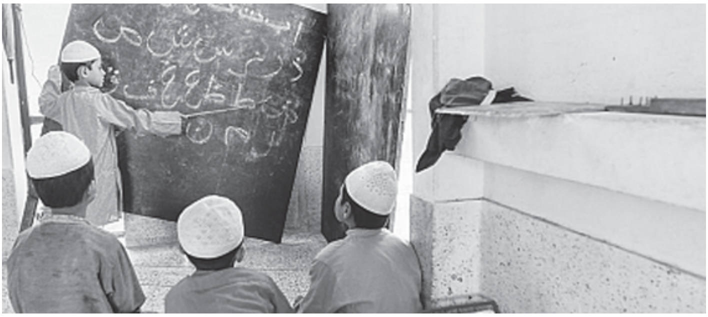
যদিও এসব বকওয়াস একান্তই ব্যক্তিগত, তবে এ হতে কিছুটা হলেও অনুমেয় যে, আর্থ-সামাজিকভাবে প্রান্তিক মুসলমানদের কাছে পুঁথি কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এ সময়ে এসে পুঁথি নিয়ে বাজারে ঢের কথা চলছে। কেউ তার শান-শওকত নিয়ে কথা বলছেন কেউ-বা নিন্দাবাক্যে হেয় করার চেষ্টা করছেন। পুঁথিকে 'বটতলার সাহিত্য' হিসেবে কলকাতার শ্রীমান সাহিত্যিকরা অনেক আগেই অচ্ছুৎ করে রেখেছেন। তাঁদের কাছে ইহা নিতান্তই মুসলমানি সাহিত্য। বাজারে তা মূল্যায়নের যোগ্য নহে। অপরদিকে হরপ্রাসাদ-শাস্ত্রী থেকে নিয়ে দীনেশচন্দ্র সেন, আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ থেকে নিয়ে আহমদ শরীফ; তারা সকলেই পুঁথি উদ্ধার আর তার মূল্যায়নে ব্রতী হয়েছিলেন পুরোটা জীবন খরচ করে। হুমায়ুন আজাদ আর আহমদ ছফা অবশ্য পুঁথি সাহিত্যকে দেখেছেন বাঙালি মুসলমানের পশ্চাদপদতার কারণ হিসেবে। পুঁথির অসংগতি, কুসংস্কারাচ্ছন্নতা ও তার নেতিবাচকতা নিয়ে আহমদ ছফা তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'বাঙালি মুসলমানের মন'-এ দীর্ঘ আলাপ তুলেছেন। অনেকটা নেতিবাচকতা থাকলেও গঠনমূলক কথাও আছে বেশ। পুঁথি নিয়ে আলাপ তুলতে গেলে বইটিকে প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় রাখতে হয়।

এসব আলাপ আপাতত মূলতবি রেখে পুঁথির পরিচয় আর শান-শওকত নিয়ে কিছু বলা যাক। অবশ্যই অন্যের দোহাই দিয়ে বলব। পুঁথির শাব্দিক অর্থ পুস্তিকা বা বই। যে বই হস্তলিখিত তা-ই পুঁথি। সরল অর্থে পাণ্ডুলিপিকে পুঁথি বলা যেতে পারে। তবে এখন আমরা পুঁথি বলতে বুঝি বিশেষ কিছু। সাহিত্য-সমালোচক শান্তনু কায়সারের জবানীতে—'পুঁথি যে অর্থে পুস্তক বা পুস্তিকা সে অর্থে এখানে আমরা তার ব্যবহার করছি না। বাংলা সাহিত্যের এক বিশেষ ধরনের সাহিত্যের কথাই এখানে বলা হচ্ছে। আরবি-ফার্সি-হিন্দির মিশ্রণে রচিত সাহিত্য, ভারতচন্দ্রের ভাষায় যা 'যাবনী মিশাল' তা-ই পুঁথি সাহিত্য। এক সময় বাংলার ঘরে ঘরে পুঁথি পাঠের চল ছিল। জামাইয়ের পুঁথি পাঠ ছিল শ্যালিকাদের অন্যতম প্রধান আনন্দ ও বিনোদন। কিন্তু তাতে 'জ্ঞানে'র কথাও থাকত। থাকত যুদ্ধবিগ্রহ ও প্রণয়ের কথা।' কী থাকতো এসব পুঁথিতে? বিখ্যাত পুঁথির প্রায় সবক'টির বিষয়ই ছিল—প্রেম, যুদ্ধ আর ধর্মীয় কথা। এসবে মিশে থাকত অতীতের গৌরব, ক্ল্যাসিকাল প্রেমকাহিনি আর অনন্ত বিষাদের কথা। ঘুরে ফিরে ইউসুফ-জুলেখা, লাইলি-মজনু, শিরি-ফরহাদের প্রেম কাহিনি। উহুদ ও কারবালার নির্মমতার কথা। ইরান-তুরানের বীর-বাদশাদের কথাও থাকত।

পুঁথির শুরুটা মধ্যযুগে, অর্থাৎ ১২০০ শতকের পরে। যখন আরব-ইরানি-তুরানিরা আমাদের দেশে আসতে শুরু করে তখন তাদের লোক-কাহিনিকে ঘিরেই আমাদের অঞ্চলে পুঁথি সাহিত্যের মূল স্রোতটা শুরু হয়। তবে ১৭৬০ থেকে ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে বাংলা, হিন্দি, আরবি, ফার্সি ভাষা মিশ্রিতধরনের সাহিত্য যা ছন্দের মাধ্যমে প্রকাশ করা হতো তাই বিদ্যমান পুঁথির

জনপ্রিয় ধারা। এ সময়ের পুঁথি নিয়ে জয়নুল আবেদিনের মন্তব্যটা উল্লেখ্য–'১৭৫৭ সালে প্রহসনমূলক যুদ্ধে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার পতন ঘটে। এই পতনের মধ্য দিয়ে মুসলিম সমাজের উপর শুরু হয় মহাবিপর্যয়। ইংরেজ কোম্পানি আমলে বাংলার মুসলমানেরা পরাজিত জাতি হিসেবে পীড়ন ও বঞ্চনার শিকার হয়ে গভীর হতাশায় নিমজ্জিত হয়। ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা, চাকরি, রাজনীতি–সব দিক থেকে ছিটকে পড়ে মুসলিম সম্প্রদায়। তারা ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেনি। তা না করে ইংরেজের সবকিছু বর্জনের মাধ্যমে নিজের তৈরি খোলসে নিজেই প্রবেশ করেছিল। এ অবস্থায় কবি বা শায়েররা ইসলামের অতীত-গৌরব, শৌর্যবীর্য, মহত্ত্ব ও ঐশ্বর্যের কাহিনি নিয়ে আরবি, ফারসি ও উর্দু ভাষার মিশ্রণে রচনা করেন পুঁথিসাহিত্য। ওই সময় মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেও পুঁথি অন্ধকারে নিমজ্জিত জাতির মনে যথেষ্ট আশ্বাস, আনন্দ ও সান্ত্বনা দিয়েছিল। শ্বাসরুদ্ধকর ১০০ বছরে মুসলিম শায়েরদের রচিত পুঁথিসম্ভার সাহিত্যের অধ্যায় থেকে বাদ দিলে বাকির খাতায় শূন্য যোগ করতে হবে।' সাধারণত দুই ধরনের পুঁথি পাওয়া যেত, প্রথম প্রকার হলো আরবি-ফার্সি থেকে অনুবাদ। যেমন, সোহরাব-রোস্তম, লাইলি-মজনু কিংবা শিরি-ফরহাদ ইত্যাদি। আর দ্বিতীয় প্রকার ছিল, লোককাহিনির অনুকূলে বাঙালিদের দ্বারা রচিত বীরত্বগাঁথা। যেমন, গাজী-কালু-চম্পাবতীর পুঁথি। এসব ছিল নিজস্ব সৃষ্টি। তবে অনেক ক্ষেত্রেই হিন্দু বা বৌদ্ধ লোককাহিনির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। ফলে এসবে অনেক অসঙ্গতিও পরিলক্ষিত হতো। কেননা তারা এসব লিখত হিন্দু মিথকে বিপরীতে রেখে। আহমদ ছফা বিষয়টির সমালোচনা করে বলেন, 'হিন্দু সমাজের বীরেরা যদি পাতাল বিজয় করে বহাল তবিয়তে ফিরে আসতে পারেন, আমির হামজা দৈত্যের দেশে গমন করে তাদের শায়েস্তা করে আসতে পারবেন না কেন? হিন্দুদের দেবতা শ্রীকৃষ্ণ যদি বৃন্দাবনে ষোলশত গোপীবালা নিয়ে লীলা করতে পারেন, মুহম্মদ হানিফার কি এতোই দুর্বল হাওয়া উচিত যে মাত্র একটা ব্রাহ্মণ-কন্যাকে সামলাতে পারবেন না?' আহমদ ছফা তাঁর লেখায় বলতে চেয়েছেন–মুসলমানরা তাঁদের গৌরবগাঁথা লিখতে গিয়ে অনেক হিন্দু চরিত্র বা ঘটনাকেও আরব ভূ-খণ্ডে পৌঁছে দিয়েছেন। যা নিতান্তই অসচেতনতা।
যেহেতু এসব পুঁথির অধিকাংশই লেখা হতো অল্পশিক্ষিত কিংবা ইতিহাসের জ্ঞান না-জানা মানুষদের হাতে ফলে কিছুটা অসংগতি থেকেই যেত। পুঁথির বিখ্যাত দুটি বাক্য এখনো প্রচলিত আছে অসংগতির উদাহারণ হিসেবে। ক. লাখে লাখে সৈন্য মরে কাতারে কাতার/শুমার করিয়া দেখি, পঞ্চাশ হাজার। খ. ঘোড়ায় চড়িয়া মর্দ হাঁটিয়া চলিল। অধিকাংশ পুঁথিরই একটা ঐতিহাসিক ভিত্তি ছিল। যা থেকে ডালপালা গজিয়ে, সরস অত্যুক্তির সাথে তা আখ্যান হিসেবে জনপ্রিয়তা লাভ করত।
প্রথমদিকে পুঁথি ছিল হাতের লেখা এবং হাতেই কপি করা হতো। ছাপাখানা আসার অনেক পরে পুঁথিসাহিত্য ছাপার অক্ষরে আসে। কাজেই, এসব লেখা হতো বাংলা হরফে, কখনো আরবিতে আবার কখনো ফার্সি খতে।
সিলেটি নাগরি ভাষা ও হরফে প্রচুর পরিমাণে পুঁথি লেখা হয়েছে। এসব পুঁথিতে মুসলমানদের যুদ্ধ-বিজয়, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের জীবনী, কারবালার শহীদদের কথা বর্ণিত হয়েছে। নাগরী লিপির সবচেয়ে জনপ্রিয় পুঁথি-কেতাব 'হালতুন্নবী'। মুন্সী সাদেক আলী প্রণীত এ পুঁথিটি ১৮৬০ সালে মুদ্রিত হয়। এটির প্রকাশক ছিলেন নাগরী লিপির পথিকৃৎ প্রকাশক মুন্সী আবদুল করিম। 'হালতুন্নবী' নামের বিখ্যাত পুঁথিটি অতি সম্প্রতি অনূদিত ও মুদ্রিত হয়েছে আধুনিক অবয়বে।
বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসকে পুঁথি ছাড়া কল্পনা করা অসম্ভব। কেবল বাংলা সাহিত্য না, বাঙালিদের ইতিহাস-ঐতিহ্যের সাথেও পুঁথির সম্পর্ক ওতপ্রোতোভাবে জড়িত। এখনো পুঁথি নিয়ে অনেক কিছুই অজানা, বহু পুঁথি অনাবিষ্কৃত। বিলুপ্ত এ লোক-সাহিত্যের ধারাটিকে নিয়ে কাজ করার জন্য পুঁথি সাধক আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদের মতো আরও অনেককেই এগিয়ে আসা দরকার।

লেখক : তরুণ কথাসাহিত্যিক ও গল্পকার



গ্রামীণ জীবনের জন্য হাহাকার

হামমাদ রাগিব

গ্রামে যাঁরা শৈশব-কৈশোর কাটিয়েছেন এবং পরবর্তী সময়ে গ্রাম ছেড়েছেন জীবনের নানান তাগিদে, তাঁদের কাছে গ্রাম শব্দটা একটা হাহাকারের মতো। গ্রামের আলাপ কিংবা গ্রামীণ যেকোনো দৃশ্য বা গল্পের বর্ণনায় গেলে নিদারুণ নস্টালজিয়া তাঁদেরকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে। বুক ফুঁড়ে বের হয় হাহাকার-ভরা দীর্ঘশ্বাস। শৈশব-কৈশোরের উচ্ছল স্মৃতি জীবন্ত হয়ে জ্বলজ্বল করে চোখের তারায়। ব্যক্তিগত কাসুন্দি দিয়েই আলাপ টানি। পাকাপাকিভাবে গ্রাম ছেড়ে এসেছি অনেকদিন। জীবন-সংসারের নানা ব্যস্ততায় চাইলেই এখন আর গ্রামে যেতে পারি না। কিন্তু গ্রামের জন্য একটা হাহাকার সারাক্ষণ তাড়া করে ফেরে। গ্রামীণ পরিবেশে যারা বেড়ে ওঠে, তারা বোধহয় নাগরিক মানুষের চেয়ে অনেকগুণ বেশি স্মৃতিকাতরতায় ভোগে। অন্তত আমার বেলায় এটাই বাস্তবতা।

জীবনের নিষ্পাপ অধ্যায় শৈশব-কৈশোরের মধুর আর দুরন্তময় দিনগুলো ফেলে এসেছি গ্রামে। যুগ দেড়েকের ব্যবধানে গ্রামের চরিত্র ও পরিবেশে এখন অনেকখানি, বলা ভালো আমূল পরিবর্তন এসেছে। আমাদের বেড়ে ওঠার দিনগুলোতে যে আনন্দ, হৈ-হল্লা কিংবা উচ্ছলতা ছিল, আজকের শিশু-কিশোরদের বেড়ে ওঠার দিনে সে-সবের অনেকখানি দখল করে নিয়েছে স্মার্টফোন কিংবা প্রযুক্তি।

গ্রামীণ জীবনে শিশু-কিশোরদের জন্য সকালবেলার মক্তব-যাতায়াত ছিল আবশ্যকীয় একটা বিষয়। পরিবার ধনী হোক কিংবা গরিব, ভোরবেলা দিনের আলো ফুটবার আগে আগেই গ্রামের প্রতিটা ঘরের মায়েরা নিজেদের শিশু সন্তানদের ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলেন। ফজরের নামাজ পড়ে মুসল্লিরা যখন বাড়িমুখো হন, গ্রামের ছেলেমেয়েরা তখন একহাতে রেহাল-কুরআন বুকে জড়িয়ে আরেক হাতে চোখ কচলাতে কচলাতে মক্তবের উদ্দেশে হাঁটে।

গ্রামের চিরায়ত এই দৃশ্যেও এখন অনেক পরিবর্তন এসেছে। অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন ঘরের ছেলে-মেয়েরা মক্তব-গমন থেকে বিমুখ হচ্ছে। চলতি ও বিগত দশকে গ্রামাঞ্চলে কেজি স্কুল বা কিন্ডার গার্টেন নামে বাচ্চাদের জন্য বিশেষায়িত একধরনের বিদ্যালয় গড়ে উঠেছে। মোটামুটি ভালো অংকের বেতনের বিনিময়ে গ্রামের সম্পন্ন ঘরের ছেলে-মেয়েরা এসব বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে। এ ধরনের

বিদ্যালয়ে ক্লাস শুরু হয় খুব ভোরে, মক্তবের সময়ে। ফলে বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার্থীরা ঘুম থেকে উঠে বিদ্যালয়ে যাবার প্রস্তুতিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, মক্তবগমনের আর সুযোগ হয় না তাদের।

বাংলার মুসলিম শিশু-কিশোরদের ধর্মীয় শিক্ষার ভিত হচ্ছে সকালের মক্তব শিক্ষা। মক্তবের এ শিক্ষার বাইরে ধর্ম সম্পর্কে পড়াশোনার খুব একটা সুযোগ ঘটে না অধিকাংশ ছেলে-মেয়ের। কেজি বা কিন্ডার গার্টেন ধারার স্কুলগুলো গত দুই দশকে মক্তব শিক্ষা থেকে অনেকটা কৌশলে দূরে সরিয়ে এনেছে তাদের উল্লেখযোগ্য একটা অংশকে। ফলে গ্রামের সাবাহি মক্তবগুলো যেমন জৌলুস হারাচ্ছে দিন দিন, তেমনি প্রাইমারি বিদ্যালয়গুলোও হয়ে উঠছে কেবল নিম্নবিত্ত ও গরিব ঘরের ছেলেমেয়েদের পাঠশালা।

গ্রামীণ জীবনে নাগরিক ছোঁয়া লেগেছে। এই ছোঁয়ায় মানুষের জীবনমানের উন্নতি হয়েছে নিঃসন্দেহে, কিন্তু গ্রাম্য সেই সৌন্দর্য আর ধর্মীয় আবহ নাগরিক 'উন্নতি'র নিচে চাপা পড়ে পিষ্ট হচ্ছে দিন দিন। আমার নিজের গ্রামের কথাই বলি। একসময় বিদ্যুত ছিল না। সন্ধে রাত পেরোতে না পেরোতেই গ্রামজুড়ে নেমে আসত সুনসান নীরবতা। গ্রামের বাসিন্দাদের প্রায় সকলেই দিনমানের হাড়ভাঙা পরিশ্রমের পর সন্ধ্যার পরপর রাতের খাওয়া-দাওয়া শেষ করে ঘুমিয়ে যেতেন। স্কুল-মাদরাসায় পড়ুয়া ছেলে-মেয়ে যে ঘরে আছে, সেসব ঘরে কেবল সন্ধ্যারাত পেরিয়ে একটু সময় গড়াতো। ছেলে-মেয়েদের পরদিনের বিদ্যালয়ের পড়া তৈরি হওয়া অবধি খাবার-দাবারে বিলম্ব করা হতো। মা-বাবা বা ঘরের অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত সদস্যের তদারকিতে হারিকেন কিংবা কুপি বাতির লালচে আলোয় জলদি জলদি তাদেরকে পড়া তৈরি করে নিতে হতো। তারপর খাওয়া-দাওয়া করে ঘুম।

ফজরে বা ভোরের আলো ফুটবার সাথে সাথেই আবার প্রাণ-চঞ্চল হয়ে উঠত প্রতিটা ঘর। ছেলেমেয়েরা তড়িঘড়ি করে মক্তব-গমনের প্রস্তুতি নিচ্ছে, ঘরের পুরুষ লোকটি লাঙল-জোয়াল কাঁধে নিয়ে গরু হাঁকিয়ে ক্ষেতের উদ্দেশে চলে যাচ্ছে, আর বউ-ঝিরা ব্যস্ত হয়ে পড়ছে রান্না-বান্নার কাজে। সূর্য তখন সবে উঁকি দিতে শুরু করেছে।

এই ছিল গ্রামের সাধারণ নিয়ম। গ্রামজুড়ে কেবল চৌধুরী বাড়ির লোকেরাই গভীর রাত করে ঘুমোতো, আর সকালে ঘুম থেকে উঠত ঘড়ির কাঁটা নয়টা সাড়ে নয়টার ঘর পেরোলে। এর কারণ ছিল চৌধুরী বাড়িতে ব্যাটারি-চালিত একটি সাদাকালো টেলিভিশন ছিল। ছিল সিডি প্লেয়ারও। বাড়ির লোকজন গভীর রাত অবধি টিভিতে মগ্ন থাকত, রাত গভীর হলে পরে টিভি বন্ধ করে ঘুমোতে যেতো। এ নিয়ে গ্রামের সাধারণ মানুষের মধ্যে একটা কানা-ঘুঁষাও ছিল। মসজিদের ইমাম সাহেব থেকে নিয়ে ধর্মপ্রাণ মানুষ নাখোশ থাকতেন এবং আড়ালে আবডালে চৌধুরী বাড়ির 'বদদীনি' নিয়ে ব্যাপক গোস্বাও প্রকাশ করতেন। কিন্তু চৌধুরীদের প্রতিপত্তির কারণে সামনে কিছু বলার সাহস পেতেন না।

তারপর গ্রামে বিদ্যুত এলো। আলোর বন্যায় ভেসে গেল পুরো গ্রাম। প্রায় ঘরে ঘরে, একসময় যারা চৌধুরী বাড়ির সাদাকালো টিভি নিয়ে বদনাম করত তাদের ঘরেও, শোভা পেতে লাগল রঙিন টিভি। গভীর রাত অবধি সচল থাকে ঝলমলে রঙিন পর্দা। ফলে জৌলুশ হারায় ভোরের চঞ্চল-মুখর গ্রামীণ পরিবেশ। বিদ্যুতের কল্যাণে গ্রামে জন্ম নেয় অনেকগুলো 'চৌধুরী বাড়ি'।

তারপর আরও সময় গড়ায়। প্রযুক্তির কল্যাণে স্মার্টফোন সহজলভ্য হয়ে ওঠে। এখন আর টেলিভিশনের জরুরত পড়ে না। গ্রামে টেলিভিশনের ব্যাপকতা লাভের পরও ধর্মের দোহাইয়ে যারা এসবের সমালোচনা করত, আর মানুষের মধ্যে 'বদদীনি'র সয়লাব দেখে আফসোস ও হাহাকার করত, তাদের হাতেও এখন একেকটা 'মিনি টেলিভিশন'।

প্রযুক্তির কল্যাণে গ্রামীণ জীবনে অনেক পরিবর্তন এসেছে, পরিবর্তন আসাটা কাম্যও, কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে এতটাই পরিবর্তন এসেছে যে বাঙালি গ্রামীণ জীবনের চিরায়ত যে জৌলুশ, তা হারিয়ে গেছে কালের গহীনে।



কোথায় তোমার বাঁশের বাঁশি, নারকেল পাতার চশমা-ঘড়ি

জীম হামযাহ

ঘুম-ভাঙা রাতের শেষ প্রহরে কানে এলো নতুন দিনের আজান। দুয়ারে উঁকি দিলো পল্লী বাংলার নতুন ভোর। দু চোখে অপার মুগ্ধতায় একে একে সবাই প্রবেশ করলো গ্লোবাল ভিলেজ নামে নতুন এক জগতে। পৃথিবী চলে এলো হাতের মুঠোয়। মুহূর্তে পৌঁছে যায় প্রান্ত থেকে প্রান্তে। কত সহজ হয়েছে জীবন। কত কিছু আজ হাতের নাগালে যা এক সময় কল্পনা করাও ছিল দুষ্কর! সেকাল-একাল ভেবে আজ হয়তো তুমি নিজেও বিস্মিত। তুমি এবং তোমার পূর্বপুরুষেরা যা চেয়েছে তা পেয়েছে। যা চায়নি, ভাবেনি তাও এখন তোমার দোরগোড়ায়। এই মুহূর্তে তুমি আদৌও কী চাও তা হয়তো স্থির করতে পারছ না। তবে তোমার আকাঙ্ক্ষার কোনো শেষ নাই। আজ তুমি এতোকিছু পেয়ে এতো উপকরণের ভীড়ে কতোটা সুখী হয়েছ? কৃত্রিমতা দিয়ে পারছ কি তোমার মনের হাহাকার ঘুচাতে? তোমার ভেতরে আজ কেন শূন্যতার খা খা আর সীমাহীন হাহাকার? মনে আনমনে কোন সুখস্মৃতি খুঁজে ফেরো বারবার? জীবনের কোন প্রাণবন্ত ছবির দিকে তাকিয়ে তুমি হারিয়ে যাও নির্বিকার ভাবনায়? কোথায় তোমার বাঁশের বাঁশি আর সবুজ পাতার 'পুতপুতি', নারকেল পাতার চশমা আর হাত ঘড়ি? নিজের অজান্তেও কখনো কেন তোমার ঠোঁট নড়ে ওঠে ভাটির বাউলের উদার সুর আর দারাজ কণ্ঠে–আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম!

তুমি হারিয়ে এসেছ এক বিস্ময়কর অতীত। যেখানে পারস্পরিক ভাবাবেগ ছিল। ছিল হৃদ্যতা, আন্তরিকতা। সহযোগিতা, সহমর্মিতা ও সদ্ভাব। সহজ এবং সাবলীল জীবনের সুর ও ছন্দ। ঘরে যদিও অভাব ছিল কিন্তু মন ছিল অঢেল প্রাচুর্য্যে ভরপুর। কোথায় আজ হারিয়ে ফেললে তোমার সোনারগাঁয়ের সোনার মানুষ? আজ তুমি নিজেকে যতই আড়াল করো, যতই তুমি রঙচঙ বাহারি পোশাকের তলে লুকিয়ে রাখো, তোমার উদাম গা শুঁকে দেখো এখনো লেগে আছে পলিমাটির সৌরভ। তুমি গেরামের ধূলি-ওড়া মেঠোপথে, কাদামাখা নরম আইলে রেখে এসেছ তোমার পদচিহ্ন। দূর্বা বিছানো পথে শিশির ধুয়েছে তোমার পদযুগল। তুমার হৈ-হুল্লোড় আর বাঁশির সুরে ভেঙে খান খান হয়েছে উদাস দুপুরের নীরবতা। ডুব

আর সাঁতারে ভেঙেছে পদ্মপুকুরের মৌনতা। আছে বৃষ্টিতে ভেজা আর রোদে পুড়ার অভিজ্ঞতা। মার্বেল, ডাঙ্গুলি, গোল্লাছুট আর বউ-বউ কানামাছির স্মৃতি। মক্তব কামানো আর স্কুল পালানোর দুষ্টুমি। আম, জাম আর লিচু, পেয়ারার শাখে ঢিল ছুঁড়েছো কত। মনে আছে তোমার পৌষের বিকেলে নাড়ার আগুনে আলুপোড়ানোর সুখ? পুরো গেরাম ছিল তোমার নিজস্ব একখণ্ড উঠান। না ছিল বাধা-ভেদাভেদ ,না ছিল কোনো প্রাচীর। দু হাত ভরে লুটে এনেছিলে স্নেহ আর প্রীতি। রাতের আকাশে তোমারও ছিল নিজস্ব একটা চাঁদ! তাকে নিয়ে তুমি কত দৌড়েছো। ছায়া সুনিবিড় গাছগাছালি, ঘন পত্র-পল্লব আর বন-বাদাড়ে এখনো লুকানো আছে তোমার শৈশব। তুমি চাষাভুষার সন্তান। তোমার চোখে আজও ভাসে লাঙ্গল- জোয়াল, গরু আর গোয়ালের ছবি।

কথায় কথায় এমন অনেক কথা আজ বলতে পারি। আউলাইয়া বের করতে পারি অনেক অনেক স্মৃতি। আর হ্যাঁ, তোমাকে আজ এতো কথা আরও বলছি এ জন্য যে, তুমি হয়তো সেই প্রজন্মের একজন, যে এককালের মানুষের হারিয়ে যাওয়া জীবন-সংস্কৃতি ও অনুষঙ্গের শেষ সাক্ষী!

এসো, হাত ধরে তোমাকে নিয়ে দেখে আসি সেকালের গেরামের কিছু ছবি!

গ্রীষ্মের তাপদাহ। খাঁ খাঁ রোদ্দুর। জমিন ফেটে চৌচির প্রায়। আকাশে নেই মেঘের দেখা। তাতানো মাঠ-ঘাট। জনজীবনে অস্বস্তি। কৃষক তাকায় আকাশের দিকে, রোদের তীব্রতায় চোখ নেমে আসে আবার জমিনের ওপর। গাছতলায় গরুগুলো অলস জাবর কাটে। লাঙলে ধরেছে মরিচা। আউশের দিন যায় যায়। জমিনে নেই পানি। মেঘ মাঙ্গে আল্লাহর কাছে। ছেলে-মেয়েরা দেয় ব্যঙের বিয়ে। কুলা-পানি নিয়ে গান গেয়ে গেয়ে বাড়ি বাড়ি যায়, চাল তোলে। তেমন তাতানো দুপুরে পুকুরের পাড়ে শীতল ছায়ার নিচে কেউ কেউ বসে বসে গুটি বা লুডু খেলে। কেউ-বা ব্যস্ত বেতের কাজ নিয়ে। কেউ-বা ঠিক করছে তার লাঙ্গল-জোয়াল, কোদালের হাতল। আবার কেউ দেখো গাছের নিচে শীতলপাটি পেতে গড়াগড়িতে জুড়াচ্ছে দেহ-প্রাণ।

ঘরের ভেতরে বউ-ঝিয়েরা বসে নেই। কেউ বুনছে শীতলপাটি, কেউ-বা পাখা, কেউ বানাচ্ছে সিঁকা কেউ দেখো ঠিক করছে লাউ-কদুর মাচা। দহলিজে একসাথে কয়েকজন বসে উঁকুন বাছতে বাছতে করছে বারো বাজার আর তেরো গল্লির গল্প। আর ওদিকে ঐ ঘরে সদ্য বিবাহিত পল্লী বধূ স্বামীর গায়ে হাতপাখা ঘুরাতে ঘুরাতে চলছে গুনগুন প্রীতিলাপ। দেখলে লাজে মরে যাবে, চুপিচুপি তাকাও পল্লীবালার দিকে–জানালার পাশে রুমালে ফুল তুলতে তুলতে কান পেতে আছে দূর থেকে ভেসে আসা বাঁশির সুরে। ক্ষণে ক্ষণে চোখ তুলে তাকায় সে কোন সুদূরের পথে। না জানি কখন সুঁই ফুটে যায় তার কোমল আঙুলে।

আবার ওদিকে কোনো এক বাড়ির পাশে গাছগাছালির আড়ালে আকুপাকু মনে ইতস্তত পদে খুব সন্তর্পণে বারবার তাকায় কোনো এক প্রেমিক। পকেটে তার কাগজের ভাঁজে জমে আছে কত কথা, কত প্রেম। চিঠি কেমনে পৌঁছায় প্রিয়তমার কাছে এ ভেবে সে ব্যাকুল। দক্ষিণ পাড়ার রহমত আলি এসেছেন আবির মাস্টারের খোঁজে। পুত্র তার বহুদিন পর চিঠি পাঠিয়েছে বিদেশ থেকে। কত কথা নিঃশব্দ পড়ে আছে কালো কালো অক্ষরে। পত্র পড়ে শোনার জন্য বাড়িতে সবাই অপেক্ষার সময় গুনছে। আবির মাস্টারকে এই চিঠে পড়ে দিতে হবে। কিন্তু আবির মাস্টার কই গেছে, কখন ফিরবে কেউ জানে না। রহমত আলি এবার চিঠি পড়ার জন্য কাকে খুঁজবে?

দুপুর কাত হয়ে সূর্য ঢলে ঢলে বেলা যায় যায়। গাঁয়ের রাস্তায় ধূলি উড়িয়ে গরুর পাল হাঁকিয়ে রাখালরা ফিরছে গৃহপানে।

সারাদিনের খেলা শেষে গাঁয়ের পথের শিশুরা ফিরছে নিজ নিজ নীড়ে। ঘনালো সন্ধ্যায় কুপিবাতিগুলো জ্বলে উঠেছে প্রতিটি ঘরে ঘরে। উঠানে বসেছে শীলতপাটির আসর। মহিলারা জড়ো হয়ে বসেছেন শিশুদের নিয়ে। দাদি খুলেছেন কিচ্ছার ঝাঁপি। কিচ্ছার সুতায় বেঁধে হাজির করছেন দেও-দানব, পরি। গল্প বলছেন রাজা-বাদশাদের। উজির-কোটালের। গল্পে গল্পে কখনো নিয়ে যাচ্ছেন পাতালপুরীর

অতল রহস্যে। কখনো ভয় ভয়, কখনো আনন্দ, কখনো-বা বিষাদ-বেদনা। এরই ফাঁকে শোনা যায় হুকা টানার শব্দ, নাকে আসে তামাকের গন্ধ। বাড়ির পুরুষেরা একে একে বাজার-সদাই নিয়ে ফিরছেন। কেউ কেউ সদাই রেখে চলে যাচ্ছেন মনাই শেখের বাড়ি রেডিও শোনার জন্য। একটা মাত্র রেডিও, সেটা শোনার জন্য কত ভীড়! জোয়ান পোলার মন ঘরে টিকে না। সেও বেরিয়ে গেছে বাঁশি হাতে। যে বাঁশির সুরে গভীর রাত অবধি ঘুম আসে না পল্লীবালার চোখে।
শেষ রাতে বৃষ্টি নামে। বহুল প্রতীক্ষিত বৃষ্টি। কালিঞ্জা বেলা উঠে লাঙল-জোয়াল কাঁধে নিয়ে গরু হাঁকিয়ে কৃষক ছুটে যায় মাঠ পানে। হিরহির, ইতিইতি ডাকে জেগে ওঠে পুরো মাঠ। কঠিন শক্ত মাটি আজ গলে গলে পড়ে লাঙ্গলের ফালে ফালে।
বাড়ির কৃষাণীর নিস্তার নাই। ঘুম থেকে জেগে তার ঘরে-বাইরে, গোয়াল ঘরে, পাকঘরে বিস্তর কাজ। 'বন্দে' পাঠাতে হবে নাস্তা। দিতে হবে তামাক সাজিয়ে।
বেলা বাড়ে। রোদ চড়ে। চাষি বারংবার তাকায় বাড়ির দিকে। কোনো এক কৃষাণী, বালক কিংবা কিশোরী আলপথে পা ফেলে ফেলে এগিয়ে আসছে হালের কাছে। আর ঐদিকে চেয়ে দেখো পল্লীবালার দিকে। এক হাতে ধরেছে জগ অন্য হাতে কাপড়ের পোটলা। আলতা পায়ে নূপুর বাজিয়ে এগিয়ে আসছে তার বাপজানের কাছে। বাপজানের কাছে আসতে এতোটুকুন পথ, তবুও যেন সে পথ ফুরায় না। রাখাল চোখ ফিরে ফিরে তাকায়। সে লাজে মরি মরি। লাজে তার পা আটকে যায়। কখন যে পিছলে পড়ে নরম আইলে। আর তার লজ্জার ভারে গলে যায় পায়ের তলের মাটিও...। ওগো পল্লীবালা, ও আমার খাঁটি সোনা, লক্ষ্মী ময়না। তোমার পদচিহ্নের খুঁজে আজও আমার রাখাল মন ঘুরে বেড়ায় বাংলার আইলে আইলে!
আকাশে ঘন কালো মেঘ আর বৃষ্টির মাতম। পানিতে থৈ-থৈ চারপাশ। এখন ঘোর বারিষা। ঝমঝম বৃষ্টির দিনে ঘরের চিপায়-চাপায় শিশুরা মেতেছে লুকুচুরি খেলায়। মেয়েরা গল্পে গল্পে হস্তশিল্প বুনে। কখনো একে অন্যের প্রতি ধাঁধাঁ ছুড়ে–'তিন কুনা মাঝে গাত, না ভাংগাইলে খাইবে লাথ।' কিশোরীর হাত নাচে ফুলঘুটির ছন্দ–'ফুল ফুল ফুলটি, কুসুম কুসুম কুসুমটি...।'
বৃষ্টি একটু ধরালে ছেলেরা বের হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে থৈ-থৈ পানিতে। ভেলা ভাসিয়ে দেয় জলের বুকে। মায়েদের বকা আর বারণ পড়ে যায় তাদের গা পিছলে পিছলে। কে পারে বেঁধে রাখতে এমন দূরন্ত শৈশবকে?
গরিব কৃষকের মন ভালো নেই এমন দিনে। ঘরে তার হানা দিয়েছে আষাঢ়ের নিদান। পেট করে ছুঁ ছুঁ। আর বৃষ্টিতে ভিজে পচে খসে খসে পড়ে শনের চাল। বৃষ্টির পানি গড়াগড়ি খায় তার 'খাটাল' জুড়ে। কলাপাতা, তালপাতা এনে চালে দেয়। কিন্তু তা কতোটুক পারে বৃষ্টি রুধিতে? বাচ্চারা কেঁদে জারে জার। পেটের ক্ষুধা মানে না আল্লাহরও দোহাই। ঋণের জন্য কৃষক দৌড়ায় সুদিমহাজনদের দুয়ারে দুয়ারে!
ও আমার সোনা ফলানো মানুষ। গায়ের রক্ত পানি করে ঘামে নেয়ে সারা বছর তোমার কী পরিশ্রম আর খাঁটুনি। অন্ন যোগাও জাতির জন্য। অথচ তোমার ঘরে আজ ভাত নেই। কোন ডাকাতের নাও এসে লুটে নিয়ে যায় তোমার সমস্ত অর্জন? তোমাকে ঠকিয়ে যারা সম্পদের পাহাড় গড়ে তাদের ওপর খোদার লানত পড়ুক!
নিদানে নিদানে বারিষা যায়। আসে ভাদ্রের তাল-পাকা গরম। একটু জিরাম নেই কিষাণ-কিষাণীর। ঘাম ঝরে দরদর। আউশের ধান ঘরে তুললে পেটে দু মুঠো ভাত হয়। খড়, ন্যাড়া দিয়ে গরুগুলোরও একটু উপায় হয়। সাথে সাথে আবার জমিনকে প্রস্তুত করতে হয় আমনের জন্য। দম নেবার সুযোগ নেই। ব্যস্ত কৃষক। ব্যস্ত কৃষাণী।
আকাশে উড়ছে শারদীয় মেঘ। কাশবনে শুভ্র ঢেউ। বাতাস লুটিপুটি খায় ধানের ক্ষেতে। গায়ের রাস্তার ছেলেরা দল বেঁধে দৌড়ায়। আলতা রাঙ্গা নুপুর পায়ে আঁচলে ঢেউ তুলে যায় পল্লী বালিকা। শিউলি ঝরে পড়ে গাছ তলায়। ভোর-বিহানে পল্লীবালা এসে ফুল নিয়ে যায় কুঁড়িয়ে। কার জন্য এতো মালা

গাঁথে তা ভেবে সেও হয়তো কুল-কিনারা পায় না! তবুও সে কোনো একজনের তরে আঙুলে সুই ফুটিয়ে গেঁথে যায় শিউলি ফুলের মালা। এদিকে ছোপ ছোপ সোনা-রঙ লেগেছে ধানক্ষেতে। কৃষক তাকায় বারবার ফিরে ফিরে। দেখতে না দেখতে পুরো মাঠ ছেয়ে যায় সোনালি রঙয়ে। মাঠ জুড়ে কাস্তের ঘ্যাচ-ঘ্যাচ, কৃষকের হাঁক-ডাক। কখনো গলা ছেড়ে গান গায়–রূপের মাইয়া, একবার চাইয়া গো, ভাব লাগাইয়া পরাণ কাড়িলে...।
উঠানে ধানের স্তুপ। কৃষাণী বিছায় মাড়া। দুপুর থেকে রাত অবধি গরু হাঁকিয়ে ধান মাড়ায়। হেলতে-দুলতে থাকা কুপি বাতির আলোয় রাত ঘনায়। বউ-ঝিয়েরা খড় ঝেড়ে ধান আলাদা করে। তারপর সেই ধান ঘওে তোলে। আবার নিয়ে যায় রোদে শুকাতে। কুলা দিয়ে বাতাস করে পরিস্কার করতে হয় খড়কুটো। উঠানে উঠানে আজ ধানের স্তুপ। বাড়িতে বাড়িতে মাথা উঁচু করে দাঁড়াচ্ছে খড়ের গম্বুজ। বহুদিন পর অচল ঢেঁকি আবার সচল হয়েছে। পাড়াজুড়ের ধান-ভাঙা ঢেঁকির আওয়াজ। গভীর রাতে ঢেঁকির তালে তালে শোনা যায় ও বাড়ির কুলসুমের গলা–
'বলি, ও ননদি, আর দু মুঠো চাল ফেলে দে হাঁড়িতে
ঠাকুর জামাই এলো বাড়িতে–
লো ননদি, ঠাকুর জামাই এলো বাড়িতে...'
সকাল হতে না হতে শোনা যায় গ্রামজুড়ে ফেরিওয়ালাদের হাঁকডাক। কেউ নিয়ে আসে হাঁড়ি-পাতিল, কেউ কুলা, টাইল, চালনী–এসব, কেউবা চোঙ্গা পিঠার বাঁশ। বাচ্চারা দৌড়ায় লাড্ডুওয়ালার পিছে। বধূ-বালিকারা ঘিরে বসে আলতা, স্নো, চুড়িওয়ালাকে নিয়ে। বিনিময়-মূল্য ধান। ফেরিওয়ালার বেতের পাত্রে মেপে মেপে দিতে হয়।
চারদিকে ধানের মৌ মৌ গন্ধ। নতুন চালের ঘ্রাণ। পিঠাপুলির আয়োজন। গ্রামজুড়ে চলছে আমনের মহোৎসব। রাতে বসছে পুঁথির আসর। জারি কিংবা পালা গানের মজমা। মসজিদে মসজিদে চলছে ওয়াজের এলান। গোল্লাছুটের দৌড়ে জমিনের খাড়া ন্যাড়া হয় ধরাশায়ী। 'নুনতা বলোরে– এক হলো-রে...ইচিংবিচিং চিচিং চা...সুলতানা বিবিয়ানা– সাহেব বাবুর বৈঠকখানা...।' কিংবা কানামাছি, ডাংগুলি, দাড়িয়াবান্ধা, কাবাডি–আরও কত কত খেলায় মেতে আছে পুরো মাঠ।
এদিকে কুঁয়াশার চাদর গায়ে জড়িয়ে কাঁপা কাঁপা পায়ে ঠকঠক করে গ্রামে ঢুকেছে শীতের বুড়ি। বউ-ঝিয়েরাও কম যায় না। তাকে দেখে আগে থেকেই বসেছে কাঁথা সেলাইয়ে। কেউ-বা সুই-সুতা দিয়ে মনের মাধুরী মিশিয়ে ফুল, লতাপাতা, আল্পনা আঁকছে নক্সিঁকাঁথার মাঠে!
পুরো গ্রামে বয়ে চলছে হাসি-খুশি আর আনন্দের বন্যা। মেতেছে নবান্নের উৎসবে। ও পাড়ার মতিন মিয়ার বাড়ি মেয়ের বিয়ে লেগেছে। টেপ রেকর্ডারে উচ্চ ভলিয়মে গান বাজছে। সই-ভাবিরা মেহেদি তুলছে। পাড়ার মেয়েরা নেচে নেচে গাইছে বিয়ের গান-
'আইলারে নয়া দামান, আসমানেরও তেরা
বিছানা বিছাইয়া দিলাম শাইল ধানের নেরা
ও দামান বও, দামান বও।
বও দামান কওরে কথা, খাওরে বাটার পান
যাইবার কথা কও যদি কাইট্যা রাখমু কান
ও দামান বও, দামান বও...'
এতো আনন্দ-উৎসবের ভীড়ে কে-বা খোঁজ রাখে ও বাড়ির বালিকা বধূর মনের খবর। বহুদিন হয় সে বাপের বাড়ি যায় নাই। কথা ছিল অঘ্রানে এসে নিয়ে যাবেন বাবা। এ পাড়ার মেয়েরা সব একে একে 'নাইয়র' এসেছে। এখানের বধূদেরকে তাদের বাপ-ভাই এসে নিয়ে গেছে। কিন্তু তার বাড়ি থেকে এখনো কেউ যে আসে না। ক্ষেতের কাজ কি এখনো শেষ হয়নি? প্রতিদিন সে ফিরে ফিরে তাকায় মেঠোপথের কিনারে। দূরে কোনো পথিককে আসতে দেখলে সে মনে করে এই বুঝি তার বাপ-ভাই কেউ আসছেন তাকে নাইয়র নিতে। সে অপলক তাকিয়ে থাকে। যখন দেখে সেই গেঁয়ো পথিক কিছুদূর এগিয়ে আবার অন্য পথে চলে যাচ্ছে, তার বুক ভেঙে যায়। নিরাশ হয়ে ফিরে গিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে বালিশ ভিজায়। কেউ বুঝতে চায় না তার মনের ব্যথা!

লেখক : তরুণ গল্পকার, মৌলভীবাজার



একটি না হয়ে ওঠা রহস্য গল্প

সালমান সাদ

প্রথম পোষাক

ঝিঝিক ঝিক ঝিক ঝিক..ঝিক...

যেন-বা নীল কোনো নক্ষত্রের পুঞ্জিভূত মেঘপাড় থেকে ট্রেন বের হয়ে এলো, দুপুর দেড়টায়, ময়মনসিংহ রেলজংশনে, দরবারি কানাড়ার ধীর তাল সমাপ্তির ছন্দে সে এসে দাঁড়াল ২ নম্বর প্ল্যাটফর্মে।

যেন-বা বৈচিত্রের সৌরভে মাতাল অভিজ্ঞতার একটি মহাদেশ থেকে নামলাম, ট্রেনের তৃতীয় শ্রেণির কামরাঙা থেকে সিঁড়িটা বেয়ে পা রাখলাম খণ্ড খণ্ড পাথরের গায়ে, ওরা না না করে উঠল ভয়ে, ময়মনসিংহের মাটি, বিমোহিতের চোখে ওদিকে চেয়ে দেখি আমাকে দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছে প্রমিথিউস রাফি।

খাদ্যের ঘ্রাণে নাড়ি মোচড়াচ্ছে। তখন পূর্ণ দুপুর বিদীর্ণ জনপদে শ্বাস ছাড়ছে চোতমাসের সূর্য। জামবাটি ভরা দুধের সরপড়া মালাই চায়ে তাজা পাউরুটি ভেজালে যেরকম মিঠা একটা গন্ধ ছড়ায়, বাতাস ম ম করছে সেই সুগন্ধে।

গতকাল টিউশনির বেতন পাওয়া হাজার দেড়েক পয়সা ঝনঝন করে উঠল পকেটে, নিজেদের অস্তিত্বের ভরসময় জানান দিচ্ছে।

আমরা ঢুকে পড়ি একটা হোটেলে। জ্যোৎস্নার মতো সাদারঙ একথাল ভাত আসে, তার ওপর দেশি কইমাছের লাল-ঝাল সুরুয়া ছড়ানো গোলআলু অনুপাতে। লেবুর টুকরা পেঁয়াজের কুচি মরিচে ঝোলে ভাত মেখে পরিশ্রান্ত কৃষকের মতো তৃপ্তিদায়ক ভঙ্গিতে ভাতের নলা মুখে তুলতে তুলতে প্রমিথিউস রাফি আহ্লাদ জানালেন–'ফাইনালি আমরা তাইলে তেপান্তর যাইতেছি!'

যেকোনো প্রকার খাওয়ার সময়েই 'কথাবলা' নাপছন্দ। কচ করে পেয়াজে একটা কামড় পড়েছে আমার, আমি ভাবছি অন্য। জায়গাটার বাস্তব অস্তিত্ব আদৌ প্রমাণিত নয় আমাদের কাছে। প্রফি কোথায় যেন পড়েছে বাড়িটার কথা, এখন আনুমানিক একটা ম্যাপ এঁকে বনজংলা ঠেলে স্থানটা আবিষ্কার করতে যাওয়া। একটা ছোট্ট তপ্তশ্বাস উঁকি দিলো আমার বুক থেকে, 'হুহ, অবশেষে!'

রেলস্টেশনের পাশে একটা টংঘর। রঙ চা দুধ চা বিক্রি হয়। লাল ডিসপ্লে বক্সে পুরু কাঁচের ভেতরে সাজানো সারিতে সারিতে সিগারেটের সুসজ্জিত নকশাদার প্যাকেট। তার ওপরে একটা বড় ডালায় পান সুপোরি চুন-জর্দার আয়োজন আগলে যিনি অধিষ্ঠিত আছেন, এক প্রবীণ পুরুষ। ফকির-সাধুর মতোই বেশভূষা। চুল ছাড়িয়েছে কাঁধ, দাঁড়ি, সমস্তই সফেদ, সাদা।

প্রফি (প্রমিথিউস রাফি) তার সেখান থেকে একটা সিগারেট মুখে ধরিয়ে পার্স বের করার মধ্যে যেন-বা কিছুটা আনমনেই জিজ্ঞাস করল, যেহেতু পুরানা কালের লোক, চেহারায় ওই ধরনের একরূপী আধ্যাত্মিক জেল্লাই, তেপান্তর বাড়ি যাওয়ার পথঘাট জানা থাকলে

আমাদেরকে তিনি তা নির্দেশ করতে পারেন কিনা।
লোকটার চোখদুটি কোটরের মধ্যে অবস্থিত ছিল, দারুণ সৌম্যবান, পরিত্যক্ত চুলার ছাই দিয়ে যেন লেপা। তেপান্তর বাড়ির কথা কানে কানে পশতেই তাঁর চোখের জ্যোতিতে যেন বনপোড়ানো তীব্র আগুন দপ করে জ্বলে উঠল। সে দৃশ্যের উত্তাপে আমাদের ঘোর অস্বস্তি শুরু হলো।
কী হলো, কেন লোকটি আচমকা অকারণে ফুঁসল, কিছুই বুঝতে না পেরে হতভম্বের মতো সেখান থেকে দূরে সরে এলাম আমরা, যেন-বা মাইল মাইল শূন্য মাঠের ওপারে শাসাচ্ছে কোনো আগ্নেয়গিরি, তার আওয়াজে ভেসে এলো গর্জনশীল শব্দ– 'মরবে, খান্নাসের হাতে সব!' কালোপর্দায় সিন ক্লোজড হয়ে যেতে যেতে ব্যাকগ্রাউন্ডে শোনা গেল বুড়োকে উদ্দেশ্য করে আমাদের তাচ্ছিল্যের হাসি।

দ্বিতীয় পোষাক

প্রমিথিউস রাফি। যাপনে মননে পুরোদস্তুর কবি, পার্টটাইম গল্পকার। গদ্যের হাত সচেতন। আছে আরো যা যা থাকে, গুণাগুণ।
শহরের বাইরে কোথাও গড়িয়ে না পড়লে গল্পের পোকা নড়ে না মগজে। রাতের নিরালা পুরনো রাজবাড়ি ধরনে তার একটি স্থাপনা দরকার, থিম হিসেবে। একটা হন্টেড প্লেস।
একটু ভৌতিক কিন্তু ভৌতিক নয় শৈল্পিক, রবি ঠাকুরের মতো একটা ছমছম ঘোরের কাহিনি সে লিখবে। আমাদের তেপান্তর যাত্রা সেই মতলবে।
রাজা হেমকান্ত চৌধুরী। এই অঞ্চলের জমিদার, কতকাল আগের বিগত সেসব দিন শ্যাওলাজমা দেয়ালের মতো মলিন।
বিশ বিঘে জমির মধ্যবিন্দুতে বটগাছের মতো প্রকাণ্ড নাকি সেই বাড়ি।
গল্পে বর্ণিত ইতিহাসের সব জমিদারের মতো এই বিলীন রাজাটিও অত্যাচারের উপাধি থেকে মুক্তি পাননি।
এক নিরীহ প্রজা সেই প্রাসাদের দূর দূর এক সীমানাজ্ঞাপক দেয়ালের পাশ দিয়ে জুতো পরে হেঁটে যাচ্ছিল। কোনোক্রমে হেমকান্তও তখন পায়চারি করছিলেন ওদিকটায়। দৃশ্যটা চোখে খট করে পড়ল তার। জল্লাদ ডেকে প্রজা গোবেচারার পায়ের গোড়ালি দুটি কাটিয়ে জুতাজোড়া রেখে দেন। পরিষ্কার জলে পোনামাছের সাঁতারের মতো বাড়িটির চতুর্দিকে সেইসব আর্তচিৎকার আজও হামেশা সন্তরণ করছে, যুগের পর যুগ বেয়ে।
সন্ধ্যা পড়ে এসেছে। পৌঁছুতে পৌঁছুতে। এক নির্জন হাইওয়েতে বাস আমাদেরকে নামিয়ে দিয়ে সাঁই সাঁই বাতাস হয়ে গেল। বৃহস্পতিবারের শূন্যতা আমাদেরকে জাঁকিয়ে ধরল, যেন।
এখান থেকে হাঁটতে হবে তিন মাইল। হাঁটা আমাদের ধরে না। কাঁচা রাস্তা। জংলার মাঝ দিয়ে, নদীর ওপর চরের পথ ধরে।
একসময়ের রাজধামকে অনস্তিত্ব করেছে কালের র‍্যাঁদা, পথঘাট প্রতিবেশ সবকিছুকে অধিকার করেছে বন, হিজল শাল বৃক্ষ তমাল।
আমরা নেমে পড়ি, হাঁটি। ঝিঁঝিঁ আর কোলা ব্যাঙের গুঞ্জনে সমস্ত বনপথ ঝিমঝিম করছে। বেশ কিছুক্ষণ আগেই বৃষ্টি ঝরে গেছে। পায়ের তলায় পেলব মাটি ক্ষীরের মতো সৌরভ ছড়াচ্ছে। কতক্ষণ হাঁটলাম?
ছ' কিলোমিটার অনেক দূর। মনে হচ্ছে অনন্তকাল ধরে সময়ের রেখাপথ ছুঁয়ে আমরা শুধু হেঁটেই চলছি–যাদের কোনো গন্তব্য নেই, পথই লক্ষ্য।
পায়ের গোড়ালিতে চিনচিন একটা ব্যথা হঠাৎ জেগে উঠে না না করল। মাথার ভেতর প্রচণ্ড শব্দে যেন পাহাড়ের পাথরপ্রপাত ঘটল, ধপ করে বসিয়ে দিলো। 'প্রমিথিউস, এইখানে একটু থামেন।' তিনি দাঁড়ালেন। দীর্ঘ পথচলার বিরতিতে মস্তিষ্ক খানিক আলস্য পেয়ে হয়তো-বা চারপাশটা সুস্থির পর্যবেক্ষণের অবকাশ পেলো। হঠাৎ রাফি কী ভেবে চমকে উঠলেন, ভাবনাটা আমার মধ্যেও দুলছিল। 'আচ্ছা আমরা কি পথ হারালাম? কোনো গোলকধাঁধায় পড়ে ঘুরছি না তো?'
তড়িন্ময় উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে পড়লাম দুইজনেই। আমি চাপাস্বরে ফিসফিস করে বললাম, 'রাফি দা, জামাটা খুলে উল্টিয়ে পড়তে হবে আরেকবার। অন্ধকারের আলেয়াতে ভর করেছে আমাদের।'
অবিশ্বাসী প্রমিথিউস রাফি বনের নিঝুম পরিবেশের অবিচ্ছিন্ন নৈঃশব্দ্যের জাল ফাটিয়ে হা হা করে উঠলেন। 'আজেবাজে কথা ঝাড়েন। গান শুনতে শুনতে হাঁটতে থাকি আসেন। ব্রেনরে এইসব ভাবতে ছাড় দিলে সে এসবই দেখাবে।'
দুটোই হাঁটছি পাগল। তরলীভূত আঁধারের আঠায় জমাট বেঁধে আছে পথপাশের গাছের জঙ্গল।

হয়তো কোন এক ঝোঁপ পাতার ফাঁক দিয়ে দেখি, একটা টিমটিমে আলো জ্বলছে অদূর নিচে। আলোটাই শুধু, তার ওপাশ অস্পষ্ট। কুঁজো হয়ে কেউ কি বসে আছে ওখানে?
সোজা পথটা থেকে নেমে পড়লাম, গাছগাছড়ার ঝোঁপ ছাড়িয়ে প্রাচীন গাছের শেকড় মাড়িয়ে মোটামুটি প্রশস্ত পরিসরের একটা জায়গায় এসে পড়লাম আমরা।
বড় উঠান, বুনোঘাস আর জংলায় ছাওয়া। বেড়ার ওপর একটা পুরনো ডাকবাক্সের কংকাল। একপাশে একটা মরা দীঘি। লতায় পাতায় ধুলো ময়লায় ক্লিষ্ট। মাঠের ওপারে একটা সেরকমই প্রাচীন রাজকীয় বাড়ি। আমরা হয়তো এসে গেছি। এটাই কি সেই তেপান্তর বাড়ি? কিন্তু এতো ঝাঁ চকচকে নুনের মতো কেন? সভ্য নগরজীবন থেকে বহুদূরের এক পরিবেশে এমন একটা বাড়ি, যেন কেউ আঙুলের মাথায় ধরে তুলে এনে বসিয়ে গেছে।
মোলায়েম আলোয় মৌচাক প্রতীম ম্লান রহস্যময়তায় জ্বলছে সুন্দরতম বাড়িটা। সর্বত্র বাতি। এমন দৃশ্য বিক্ষিপ্ত মনে স্বস্তি এনে দেয়। কড়া নাড়তে কাঠের দরোজার হাতলে স্পর্শ করব যেই–তার কাঁচের একটা অংশ খুলে গিয়ে ওপাশ থেকে উঁকি দিলো কেউ–মোমের আলোয় প্রতিভাত হলো বয়সরেখায় আজীর্ণ একটি মুখ।

তৃতীয় পোষাক

তিন ইঞ্চি পুরু পশমের কার্পেটের আরাম পায়ের তলায়। চোখ ধাঁ ধাঁ করছে সুরম্য ঝাড়বাতির সোনালি জৌলুসে। কোথাও এসি নেই, কিন্তু তেমনই প্রশান্ত মহাসাগরীয় হাওয়ায় বিশালাকার হল কক্ষটা ঘুম ঘুম নীল। একটাপাশের দেয়ালে পুরোটা জুড়ে আছে পেইন্টিং। বিখ্যাত। সালভাদর দালির দ্য টেম্পটেশন অফ সেইন্ট এন্থনি।
রাতের খাবারে যেন ডালা নেমে এলো আসমান বেয়ে। রুপোর পাত্র বের হলো পুরনো কাঠের আলমিরা থেকে। সত্তর পদে ঝলমল করছে দস্তরখানা-ভরা সোনার বাটি।
দারোয়ানজি, আমি, রাফি। আহারান্তে বারান্দায় এসে বসেছি। শীত নেমে এসেছে এই পূর্ণিমাপ্লাবিত চরাচরে। টিনের চালায় বেঠোফেনের মুনলাইট সোনাটার মতো ছন্দে ঝরছে টুপটাপ শিশিরবিন্দু।
দিব্যি পরিবেশ-প্রতিবেশ। বুড়ো ভদ্রলোকটি একটা সিগারেট চেয়ে নিয়ে আগুনের চিমটি ধরাতে ধরাতে রহস্য ঘনীভূত স্বরে বললেন, 'রাতে এ ঘর ও ঘর অদৃশ্য কারো খড়মের খটখট পায়চারির আওয়াজ শুনলে ভয় পাবেন না যেন!'
আমরা বুঝলাম, রাতের আতিথেয়তা উপভোগ্য করতে এও আরেকটি চমৎকার অংশ।
কোত্থেকে ছুটে এলো এক পাগলামতো দমকা হাওয়া, পাতায় পাতা লেগে তইয়ার হলো অদ্ভুত সিম্ফনি।
সমন্বিত তিনটি স্বরে মৃদু হাসির শব্দ, তারপর নাটকীয় নীরবতা কিছুক্ষণ–হঠাৎ কোথাও ঘণ্টা বেজে উঠল ঢং... রাত্রি বাজল একটা।
খরগোশের শরীরের মতো মসৃণ সোফার কুশন বালিশ করে আমরা গা ছাড়লাম পৃথিবীর সবচেয়ে দামি কার্পেটে।
চোখের পাতায় ঘুমের মেঘ নেমে আসতে আসতে শুনলাম প্রমিথিউস রাফির ঘুমজড়ানো গলার স্বগতোক্তি, জংলা হন্টেড প্লেসে বসে রহস্যগল্পটা লেখা বুঝি এই যাত্রায় আর হলো না।

শেষ পোষাক

ক্লান্তির ঘুমে কোনো স্বপ্ন হয় না।
দীর্ঘ একটি অবচেতনার অনুভূতিহীন মৃত অন্ধকারের পর হঠাৎ বোধ হলো, মুখের ওপর বুঝি ঘনিয়েছে আগুনের হল্কার উত্তাপ।
চোখ খুলল, বিস্ময়ে পিলে চমকালো, দেখি সূর্যের দিকে চেয়ে আছি। তার বিকিরণ আমার মুখপর্যন্ত পথ করেছে।
কাঁধের তলায় বালিশের বদলে পাথরশক্ত এটা কী? ধড়ফড় করে উঠে বসি। চারপাশের সেই রাজকীয় দেয়াল, মাথার ওপরের ছাদ কই গেল? কোথায় সে রাজপ্রাসাদ? একটা রুক্ষপ্রকৃতি টিলার ওপর নিজের অস্তিত্ব আবিষ্কার করি। দৃষ্টিসীমার ভেতর শুধু বিরান মাঠ আর ঝোঁপঝাড়। খোলা আকাশ, বিরান নির্জন এ কোন অঞ্চল?
এ যে একটু নিচেই পাশঘেঁষে রাতের সেই জঙ্গলপূর্ণ পথটা।
ব্যাপারটা কী ঘটলো, কিছুক্ষণ ভাবতেই শিরদাঁড়া বেয়ে ঠাণ্ডা একটা সাপ নেমে যায়। ডানদিকে চেয়ে দেখি অদূরেই আরেকটি টিলার ওপর বসে বিস্ময়ে চোখমুখ ডলছে, গায়ে চিমটি কাটছে উদ্ভ্রান্তের মতো, প্রমিথিউস রাফি। তার কপাল ঘামছে। সে কি নতুন আরেকটি গল্প পাবে?

লেখক : নবীন গল্পকার, ঢাকা



নদীমাতৃক গ্রামীণ জীবন

রাকিবুল হাসান

তিতাসের পাড়ে যখন দাঁড়াই, আমার মনে পড়ে যায় আল মাহমুদের কবিতা। বাড়িতে যাবার সময় তিতাসের জলে বৈঠার চপচপ শব্দ, আল মাহমুদের কবিতার জলধ্বনিই কেবল মনে করিয়ে দেয়। মনে মনে, খানিকটা নিজেকে শুনিয়ে আবৃত্তি করে ওঠি–

‘এ আমার শৈশবের নদী, এই জলের প্রহার
সারাদিন তীর ভাঙে, পাক খায়, ঘোলা স্রোত টানে
যৌবনের প্রতীকের মতো অসংখ্য নৌকার পালে।’

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগরে যে গ্রামে আমার বাড়ি, তিতাসের সঙ্গে প্রতিদিন দেখা হওয়াটাই নিয়ম। সওদা কিনতে বাজারে যেতে, মাদরাসায় ক্লাস করতে যেতে, ঘুরতে যেতে, ব্যাংকে টাকা তুলতে যেতে, অষুধ আনতে যেতে ওই তিতাসের জল ভেঙেই যেতে হয়। এই এখন ভরা বর্ষা, তিতাসের বুকে যৌবনের দাপাদাপি, কূল ছাপিয়ে জল ডুবিয়ে দিয়েছে বিল, খেলার মাঠ, ধানের জমি। কদিন পরই জল নেমে যাবে। তিতাসের বুকে কমে যাবে দাপাদাপি, স্রোত, বাতাসের প্ররোচনায় উথলে ওঠা ঢেউ। তিতাসের এই জলের ওঠা-নামার সঙ্গে ওঠানামা করে আমাদের গ্রামের সাধারণ মানুষের জীবন। নদীর জোয়ার-ভাটার সঙ্গে রঙ বদল হয় মানুষের জীবিকার, জীবনের।

যখন বর্ষা–এপার থেকে ওপার পারাবারের জন্য নৌকা নামে। শুকনো দিনে যারা কৃষি ক্ষেতে কামলা দেয়, এই বর্ষায় তাদের জীবিকার প্রধান মাধ্যম হয়ে ওঠে তিতাসের বুকে নৌকা। তিন-চারমাস নৌকা বেয়ে ভালো একটা রোজগার হয় তাদের। নিশ্চিন্ত স্বাধীন এই পেশা। কাউকে চাঁদা দিতে হয় না, ঘুষ দিতে হয় না। ঘামে ভিজে একটাকা রোজগার করলে, একটাকাই নিজের।

নদী ও নৌকা গ্রামীণ জীবনের একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ। বিশেষ করে নদীর পাড়ে বসবাস যাদের। অদ্বৈত মলবর্মনের 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে নদীকে ঘিরে যে প্রাণচাঞ্চল্য দেখতে পেয়েছি আমরা, এখন তা পুরোপুরি নেই। এজন্যই আল মাহমুদ তার কবিতায় রঙ চড়াননি, সাধারণভাবে বলেছেন–

'জনপদে কী অধীর কোলাহল মায়াবী এ নদী
এনেছে স্রোতের মতো, আমি তার খুঁজিনি কিছুই।
কিছুই খুঁজিনি আমি, যতোবার এসেছি এ তীরে
নীরব তৃপ্তির জন্যে আনমনে বসে থেকে ঘাসে
নির্মল বাতাস টেনে বহুক্ষণ ভরেছি এ বুক।'

নদীর বুকে জেলেদের মাছ ধরার উৎসব বলতে গেলে এখন নেই-ই। এর দুটি কারণ থাকতে পারে–এক. নদীতে মাছ কমে গেছে। আগের মতো এখন মাছ পাওয়া যায় না। তাই একসময় যেই মাছ ছিল জীবিকা নির্বাহের মাধ্যম, এখন তা আর জীবন চালাচ্ছে না। জাল বানাতে, কিনতে যতটুকু লগ্নি তারা করছে, ততটুকু ফিরে আসছে না। তাই অনেকে নদী নির্ভর পেশা ছেড়ে দিচ্ছে। দুই. গ্রামীণ জীবনেও এখন লেগেছে শহুরে হাওয়া। একসময় যারা ছিল আমাদের খুব পরিচিত জেলে, যাদের হাতে ধরা মাছ না পেলে আমাদের পাত সুস্বাদু হতো না, সেই তারা এখন জলের কাছেও যায় না। জিজ্ঞেস করলে আলতো করে হাসবে, কাঁধে হাত রেখে বলবে–'বাপ-দাদার পেশা আমি ইচ্ছা কইরা ছাইড়া দিসি বাজান? এই তোমাদের বাড়িতে কত মাছ দিসি আমি! তোমার বাবা ছিল আমার বান্ধা কাস্টমার। আগের মতো মাছও নাই, জীবনও নাই। ছোট ছেলেটাকে বিদেশ পাঠাইছি। চলতাসে সব ভালোই।'

আমাদের গ্রামীণ জীবনে নদীর ওপর নির্ভরতা কমছে, তা নয়। বরং মানুষ বোধহয় বিকল্প কোনো নির্ভরতার জায়গা খুঁজছে। কিন্তু যেখানে কৃষি জমি আছে, সেখানে তো নদীকে বাদ দিয়ে বিকল্প খোঁজা সম্ভব নয়। বর্ষার পানি নেমে গেলে ইরি ধানের মৌসুম। চৈত্রের রোদে ফেটে চৌচির হয়ে যায় মাঠ-ঘাট। ইরি চাষের জন্য নদীর পানি দিয়েই তখন সেচ দিতে হয়। নদীর পানির স্পর্শ না পেলে সবুজাভ হয়ে ওঠে না ফসলি জমি। তাজা হয়ে ওঠে না মাটির বুক।

নদী গ্রামীণ মানুষদের জীবিকা দিচ্ছে, ফসলের জমি উর্বর করে তুলছে এতটুকুই নয়, গ্রামীণ জীবনকে এক নতুন রূপ দিচ্ছে। নদী থেকে তুলে আনা বালু দিয়ে গড়ে উঠছে গ্রামের এক অনিন্দ্য সুন্দর রূপ। ঘিঞ্জি-ঘুপচি থেকে বেরিয়ে মানুষ এখন বিস্তৃত করছে গ্রাম। খালি জমি, আঙিনা, ডোবা ভরাট করে তৈরি করছে বেঁচে থাকার কমফোর্ট জোন, স্বস্তিদায়ক আবাস। মানুষ যেমন বাড়ছে, বাড়ছে চাহিদাও। সেই চাহিদা মেটাতে মানুষ এখন নদীর কাছেই দ্বারস্থ।

নদী থেকে তুলে আনা বালু দিয়ে সভ্যতা যেমন গড়ে উঠছে, তেমনি কমে যাচ্ছে নদীর নাব্যতা হারানোর আশংকা। আমি যখন ছোট ছিলাম, আমাদের গ্রাম ছুঁয়ে বয়ে যাওয়া তিতাস শুকিয়ে যেত। হাঁটুজল নয়, নৌকায়-ই পার হতে হতো, কিন্তু পানি থাকতো কম। এখন যত বালু তোলা হচ্ছে, গ্রামের বিস্তৃতি বাড়ছে, নদীর গভীরতা বাড়ছে, বাড়ছে পানির স্বচ্ছতা ও গতি।

নদী ছাড়া তাই গ্রামীণ জীবন হাহাকারের মতো। গভীর এবং অতলস্পর্শী তৃষ্ণার মতো। সেই তৃষ্ণা মেটাতে নদী চাই-ই চাই।

নবীনগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া



শপথ সেই সোনাঝরা এন্তেজারের

যিয়াদ বিন সাঈদ

একদা প্রত্যুষে পৃথিবীর টলোমলো এ বক্ষে দাঁড়িয়ে আমি অপেক্ষমাণ এক প্রেমাস্পদ। আমার সমস্ত অস্তিত্বে খেলা করছে প্রেম। দুলছে সে প্রেম প্রতিক্ষণে এক অদ্ভুত মাদকতা নিয়ে। মাঝেমাঝে সে প্রেম জাগরুক। আবার কখনোসখনো এ প্রেম ভগ্নপ্রায় শরাব-পেয়ালার প্রণয়ভোজন। হৃদয়ে নীরবে ঘুম পাড়িয়ে রাখা এ প্রেম এখন চাইছে কী আসলে? পৃথিবীর এ মাস্তুল দহলিজে দাঁড়িয়ে থেকে তার প্রতীক্ষার এ ক্রমবৃদ্ধি, কোত্থেকে আসা তীব্র আকাঙ্ক্ষা কিবা স্বপ্ন তাকে আরো প্রতীক্ষিত করে তুলছে? সবকিছুর সঙ্গেই যেন জুড়ে দেওয়া যাচ্ছে বিস্মিতপ্রায় শব্দগুলো। মিলিয়ে দেওয়া যাচ্ছে শব্দের সে রিনিঝিনি অভিনব।
প্রতীক্ষা। সে তো কখনো সুললিত সুশ্রাব্য। আবার কোনো অবেলায় অশ্রাব্য আর মর্মভেদীও। এ বেলার প্রতীক্ষাটা কেমন তাহলে? ওই যে ভোরের একদম প্রারম্ভে জেগে ওঠা চড়ুই ছানাটি, সে যেমন করে করে যাচ্ছে কিচিরমিচির, আজকের প্রতীক্ষাটি কি অনেকটা এমন? এতটাই নরম আর চিত্তগ্রাহী? না। একদম না। বহু কোটি বছর তো প্রেমিকার শব্দহীন চলে যাওয়ার মতোই কেটে গেল। কেটে গেল সহস্র বসন্ত। কদমগুলো ফুটে উঠে মরে যাওয়ার আগেই থেমে গেল বাসন্তীপূজা। সব কিছু কেমন কেমন রূঢ় আর অসহ্য। কিন্তু তবুও কাটল না প্রতীক্ষা। প্রতীক্ষার এ গুঞ্জরণ আর জাগরণ মনের ভেতর সকাল-সন্ধ্যা, সবকিছুকে নীরব আক্রোশে দূরে ঠেলে দিল। অথচ কাটল না এন্তেজারের এ আবদ্ধতা। পাষণ্ডতা।
প্রতিদিন ভোরেই আমি এখানে দাঁড়াই। ঠিক যে দিকটি দিয়ে প্রতিভাত হয় সোনা রঙের সূর্যটি, সে দিকেই বুক মেলে দিয়ে আমি দাঁড়িয়ে থাকি। পৃথিবীর এ নাট্যমঞ্চে কত বিমূর্ত অভিনেতা করে যাচ্ছে অভিনয়, আমি সবই দেখি। আমি আরও দেখি, ওই যে উড়ে যাওয়া কাকটি, তার মুখে চিন্তার ঢেউ, কাকে সে খোঁজে? কাক যাকে খুঁজে, আমিও কি তাকে?
আমি তো খুঁজি সূর্যের ভেতরও এক অনন্য সূর্যকে। যে সূর্যটি সোনাঝরানো। যে সূর্যটি শান্তির রিসালা পাঠ করতে উদ্যত। ঝড়ের প্রকোপণ যার কাছে দৃঢ় করে স্থিরতার বার্তা। শুধুই বলে সে 'সালাম, সালাম'।
যে প্রভাতের বক্ষ হতে ছড়িয়ে পড়বে ফুটন্ত গোলাপ আর পুষ্পিত সবুজ, আমি খুঁজি সেরকমই এক সূর্য। অমনোযোগী শিশির টকটকে লালফুলকে যেভাবে

জড়িয়ে ধরে, সে সূর্যকে আমি এমনই ভাবি, সে জড়িয়ে ধরছে শিশিরধৌত এক মানবফুল হয়ে আমাকে আর সমগ্র পৃথিবীর প্রতিটি অস্থিকোষকে।

চন্দ্রনাথ যেদিন প্রণাম করে এলাম, ধূপ ধূনার গন্ধে ভরা সে মন্দির থেকেও শোনা গেল সেদিন সোয়ালোর কিচিরমিচির। বাঁশির বিস্মিত স্পন্দন একবার খেলে গেল আমার সমস্ত অস্তিত্বে। আমি নড়ে বসে ভাবতে থাকলাম–এই বুঝি প্রতীক্ষিত সে সূর্যটি উঠে যাবে। এই এখনই চোখ মেলে ছড়িয়ে দেবে স্বর্গীয় আলো। বিশুদ্ধ বর্ণচ্ছটার মণিমুক্তারাজিদের দেখা গেল, তাদের লকলকে চোখ আরো উদগ্রীব। বাসনার সরু ফরাশ পেতে তারা এপাশ-ওপাশ করছে প্রতীক্ষার যন্ত্রণায়। কিন্তু সেদিনও দেখা গেল আলোহীন সে সূর্য। তবে কি ভস্মাধার পারে না পুনরায় প্রাণ সঞ্চার করতে? অবিসংবাদিত গণপিত্তবাদের করাল গ্রাসে আমাদের এ সূর্যটিও কি চুপসে গেছে?

যুগপৎ গণযুদ্ধের মহাক্রন্দন আমাদের বুকজুড়ে। আমাদের বুকজুড়ে হুতাশন। রক্তস্রোতের মস্তিষ্ক মজ্জার কুজ্ঝটিকায় এখন পৃথিবীতে প্রলয় প্রলয় ধ্বনি। যেন খুবলে খাচ্ছে প্রতিনিয়ত একটি কুকুর। দুইটি কুকুর। তিনটি কুকুর।

মানচিত্রের ওপর ভর করে দাঁড়িয়ে থাকা সে কুকুরগুলোর চোখে এক অজানা লালসা। রক্তজয়ের জয়ধ্বনি আর বৈশ্বিক চিহ্নে অসভ্য উলঙ্গতা।

কোত্থেকে কোথায় দৌড়ে পালাব? ওই যে দেখা যায় বন্দী শিশু, করোটিতে যে রক্ততান্ত্রিক স্বৈরাচারের আঘাতে পিষ্ট। তাকে রেখে কি আমি দৌড়ে পালাব? কোথায়? কোন প্রান্তে? যেখানে আমি তাকাই, শুধু রক্তের স্রোত। চলছে ক্রমাগত। প্রবীণ প্রাবল্যতা নিয়ে সে রক্ত শুধু বয়েই যাচ্ছে। কাশ্মীর থেকে দেখো আজাদির চিৎকার ভেসে আসলেও দেখা যায় সে চিৎকারে রক্তের গন্ধ। বাবার ক্ষয়ে যাওয়া হাতটি নিয়ে এখনও দেখো প্যালেস্টাইনের ধু ধু পারাবারের মাঝে দাঁড়িয়ে আছে সুরাইয়া। সূর্য, তুমি কি হারিয়ে ফেলেছ তোমার দৃষ্টির সব সঞ্চিত শক্তি? এমনতর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের দুর্গত নিয়তির আষ্টেপৃষ্ঠে যে মনুষ্যত্ব আমার মিশে গেছে, সে অস্তিত্ব কখনোই রক্তসূর্য ছাড়া আর কিছুই চোখে দেখে না। দেখে না রক্ত জলপ্রপাত কিংবা বিকৃত কৃতদাসত্বের সংগীতে কাফনের কঙ্কাল-জয়ন্ত ছাড়া আর কিছুই। উচ্ছৃঙ্খল গণরক্তস্রোতে নিঃসীম দাঙ্গার অষ্টপ্রহর ছাড়া আর কিছুই তো দেখে না সে। বিবর্ণ দাসত্বই এ জীবনে আমার সবচাইতে বড় অর্জন। মহা অর্জন।

দিনশেষে ক্লান্ত গতরে বিমোচিত যখন শব্দের স্রোত, তখন এমনই এক সূর্যের প্রতীক্ষা করা ছাড়া আমার বুকে আর ইচ্ছেটি নেই কোনো। দ্রোহের অনল বেয়ে প্রতি ভোরে সূর্যের এ রক্তচক্ষু যেন অন্তর্নিহিত কুলাঙ্গার। এই এখনই তেড়ে আসবে। তাই তো দাঁড়িয়ে আছি পৃথিবীর বুকে একটি নতুন সূর্যের প্রতীক্ষায়। বিদ্রোহের লালকোট পরে চিতাজ্বলা অন্ধকারের নিপাট শূন্যতা তাড়িয়ে দিয়ে আমি একবার চিৎকার করে বলতে চাই–'জাগো জাগো মনুষ্যত্ব, আমাকে অন্ন দাও।'

শান্তির জন্য আমি বুকে পোষা ঘোড়ার পিঠে উঠে পড়ব প্রয়োজনে। দাঙ্গা-হাঙ্গামার বিরুদ্ধে আমি শেখাব সভ্যতার শির ঘ্রাণ কীভাবে শুঁকতে হয়। জ্ঞান-দুর্ভিক্ষের ওপর এ অপদাঙ্গার আগুন কীভাবে নিভিয়ে দিতে হয়। কীভাবে ফিরে যেতে হয় পুরনো আজাদির সিংহাসনে। রণডঙ্কা বাজাতে বাজাতে কীভাবে ছুটে যেতে হয় হারানো সূর্যের কাছে।

প্রতাহত কৃতদাসত্বের এ জীবনে তুমি হুট করে জেগে ওঠো হে হারানো সূর্য। ছড়াও তোমার চঞ্চল নৃত্যরত ফুলের পাপড়িগুলি। ঝিরঝিরে বাতাসে, সমুদ্রতটে ঝকমকে ঢেউয়ের ফোঁকর দিয়ে হঠাৎ তুমি জেগে ওঠো। উচ্ছল এ ফুলদল মাঝে তোমার শান্তির সে বিচ্ছুরণ কতটা প্রতীক্ষিত, তা কি জানো? ওঠো তাহলে, ওঠো। উপত্যকা আর পাহাড়ের সবুজগুচ্ছের ঠিক মাঝখান দিয়ে মেলে ধরো বক্ষ। অজস্র অশান্ত বুকে নামিয়ে আনো প্রশান্তির এক অদম্য কোলাহল।

লেখক : শিক্ষার্থী, মাদরাসাতুল কাউসার আল ইসলামিয়া, ঢাকা



(গল্প)

আমাদের নুরু ভাই

আবরার ফাহিম

নুরু ভাইয়ের সাথে আমার প্রথম দেখা হয় মাদরাসার ক্যান্টিনে। ক্লাস বিরতির এই সময়টাতে সবাই যখন কোক, বিস্কুট নিয়ে ব্যস্ত, নুরু ভাই তখন হাতদুটো পেছনে বেঁধে মুখ ভার করে পায়চারি করছেন। ভয়ে ভয়ে সামনে এসে দাঁড়ালাম। ঘন কালো দাড়িতে ঢাকা ভরাট মুখ, বড় বড় চোখ আর পেশীবহুল শরীরের মানুষটাকে পাহলোয়ান বললে অতিশয়োক্তি হবে না কোনোক্রমেই।

'তুই এবার প্রথম বর্ষে, তাই না?'

আকস্মিক 'তুই' সম্বোধন শুনে খানিক হকচকিয়ে গেলাম। কোনওরকমে সামলে নিয়ে বললাম, 'জি।'

নুরু ভাই গম্ভীর ভঙ্গিতে ঠোঁট ওল্টালেন। আমাদের মাঝে নুরু ভাইয়ের জনপ্রিয়তা ছিল অনেক। সবাইকে চমকে দিয়ে তিনি মজা পেতেন। অদ্ভুত সব কাণ্ডকারখানা ছিল তাঁর প্রিয়। খেলার মাঠে তিনি ছিলেন 'দ্য গেইল'। ওভার-প্রতি তিনটা করে ছক্কা হাঁকানো তাঁর জন্য ডাল-ভাত। চোখ ধাঁধানো পুল, ব্যাকফুট পাঞ্চগুলো ছিল সত্যিই উপভোগ্য।

নুরু ভাই প্রায়ই একটা পাঞ্জাবি গায়ে দিতেন। গাঢ় হলুদ রঙের। কোনও এক সময় উজ্জ্বল ছিল রঙটা। বহু বছরে ময়লার হালকা একটা আস্তর জমে গিয়ে মেটে বর্ণ ধারণ করেছে। একদিন পাঞ্জাবিটার কথা জিজ্ঞেস করতেই গর্বে নুরু ভাইয়ের বুক দুইঞ্চি ফুলে উঠল। খুক করে একটা কাশি দিয়ে ভরাট গলায় বললেন, 'এটা আমার পারিবারিক ঐতিহ্য। আমার বয়স যখন দশ তখন আমার দাদা মুনশি আব্দুর রউফ এটা গিফট করেছিলেন।'

আমি আহত স্বরে বললাম, 'তা কী করে হয়? দশ বছরের পর আপনি একটুও লম্বা হননি?'

'আরে হাঁদারাম, এটাতো ছিল জুব্বা। বছর কয়েক আগে কেটে পাঞ্জাবি বানিয়েছি।'

আমি তখন হাসব না কাঁদব বুঝে উঠতে পারছি না। নুরু ভাই গলায় খুশি খুশি ভাবটা ধরে রেখে বললেন, 'তুই তো নিয়মিত লেখালেখি করিস, আমার এই গল্পটাও লিখে রাখবি। শিরোনাম হবে "দশ বছরের জুব্বা পঁচিশ বছরে ফাড়া পাঞ্জাবি।"'

আমি সম্মতির মতো মাথা নাড়লাম। নুরু ভাই অদ্ভুত ভঙ্গিমায় হাসতে লাগলেন। যেন এই মাত্র বিরাট কিছু আবিষ্কার করে ফেলেছেন। এই জন্য তাঁকে নোবেল প্রাইজ দেয়া উচিত।

একদিন, বসন্তের বিকেলে নুরু ভাইসহ আমরা বের হলাম। আমীন ভাইয়ের দোকানে নাকি মিসওয়াক খুব ভালো পাওয়া যায়। দোকানে পা রাখতেই মিসওয়াকের ডালাটা ধপাস করে আমাদের সামনে রাখলেন আমীন ভাই। মুহূর্তেই নির্দোষ ডালাটার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়লাম আমরা। মিসওয়াক করার বিশেষ পদ্ধতি আছে। সে অনুযায়ী উপযুক্ত মিসওয়াকটা সবার চাই। সামান্য চওড়া, মাথার দিকটা ঈষৎ বাঁকা, বাকিটা সটান। সবাই তখন মিসওয়াক বাছাইয়ে ব্যস্ত, আমি আড়চোখে নুরু ভাইয়ের দিকে তাকালাম। ঠাঁই দাঁড়িয়ে আছেন। মাঝে-মাঝে বিশেষ পদ্ধতিতে দাঁত দিয়ে নখ কাটছেন।

সবার পছন্দসই মিসওয়াক কেনা শেষ হলো। এবার নুরু ভাই ধীর পায়ে এগিয়ে এলেন।

এলোমেলো ডালাটায় যেগুলো পড়ে আছে সেগুলো একেকটা ধনুকের মতো ত্যাড়া। এগুলো ব্যবহার করা দাঁতের বিরুদ্ধে সিপাহি যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার মতো। নুরু ভাই শান্ত গলায় বললেন, 'এসব এখন কী করবেন?'
দোকানি হতাশার ভঙ্গিতে ঠোঁট উল্টে বলল, 'কী আর করুম। লস খাইলাম আরকি।'
তারপর নুরু ভাই যেটা করলেন আমাদের জন্য সেটা ছিল এক অপার বিস্ময়। প্রায় অব্যবহারযে-াগ্য চারটা মিসওয়াক কিনলেন দ্বিগুণ দামে। টাকাটা দোকানির কাঁপা হাতে ধরিয়ে দিয়ে বেচারার হা করা মুখটা বন্ধ হবার আগেই দোকান ছেড়ে বেরিয়ে এলেন।
ক্লাসে একটা পরিবর্তন ঘটেছে। বড়সড় পরিবর্তন। নুরু ভাই পড়ছেন। শুধু পড়ছেনই না, রীতিমতো ডুব মেরেছেন। যেন অনন্তকাল এভাবেই কাটিয়ে দেয়ার ইচ্ছে। তবে আশ্চর্যের বিষয়টা হলো, তিনি ক্লাসের কোনো বই পড়ছেন না। চোখ-মুখ কঠিন করে দিনরাত কোরআন তেলাওয়াত করছেন। কাতার প্রতিযোগিতার ঠিক আগে ইমাম-হাফেজরা যেরকম পড়া দেন, ঠিক সেরকম। যদিও নুরু ভাইয়ের কাতার প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সম্ভাবনা শূন্যের কোঠায়। কৌতূহলী প্রশ্নটা তাই অনেকের কাছ থেকেই এসেছিল। কিন্তু নুরু ভাই নির্বিকার। হঠাৎ একদিন আমাদেরকে জড়ো করলেন। ছোটখাটো প্রস্তুতি পর্ব সেরে ঠান্ডা গলায় বললেন, 'তোরা তো জানিস, যে ব্যক্তি পুরা কোরান মুখস্ত করবে সে বিনা বাধায় জান্নাতে যাবে। আর যে মুখস্ত করে ভুলে যাবে তার ঠিকানা নির্ঘাত জাহান্নাম। এখন আমায় বল, তোরা কয়জন পুরো কোরআন এক বসায় শুনাতে পারবি। পরকালে আল্লাহ যখন আদেশ করবেন, পড় দেখি। কোথাও যদি আটকে যাস, অবস্থাটা তখন কী দাঁড়াবে?'
চিলেকোঠার মতো ছোট্ট কামড়াটায় রাজ্যের নীরবতা নেমে এল। সবার মুখ থমথমে। সবাই যেন স্ট্যাচু। খাঁ খাঁ করা ক্লাসরুমটায় হঠাৎ গর্জে উঠল আমার কণ্ঠস্বর–'তাই বলে সব কাজকর্ম ফেলে কোরআন নিয়ে বসে থাকার কোনো অর্থ নেই। যথাসাধ্য চেষ্টা করলে, কোরআনের বিধিনিষেধ মেনে চললে কল্যাণ তার জন্যই।'
এক নিশ্বাসে কথাগুলো বললাম। গলার কাছটায় দলা পাকিয়ে যাচ্ছে। অনেক কষ্টে ঢোক গিললাম। নুরু ভাই স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। আমার কাছ থেকে এই উত্তর হয়তো তিনি আশা করেননি। আমি ঝট করে চোখ নামিয়ে ফেললাম। অতল সেই দৃষ্টি ভেদ করে মনের ভাষা পড়ে ফেলার সাহস আমার হয়নি। কোনোদিন ছিলও না।
শ্রাবণের ভেজা হাওয়া বইছে। বৃষ্টিস্নাত পরিবেশ। জানালাঘেঁষা অতিকায় আম গাছটা বৃষ্টিস্নানে মজেছে। কালচে সবুজ পাতাগুলো মৃদু বাতাসের ঝাপটায় তিরতির করে কাঁপছে। সন্ধ্যা থেকে নুরু ভাইয়ের পাত্তা নেই। আধভেজা পাঞ্জাবিটা নিয়ে যখন রুমে ঢুকলেন ঘড়ির কাঁটা তখন দশটা পেরিয়েছে। একটু যেন অস্বাভাবিক মনে হলো নুরু ভাইকে। চোখ-মুখ ভীষণরকম ফোলা। প্রচুর কেঁদেছেন বোঝা যায়। ঠিক এই পর থেকে আমরা আবিষ্কার করলাম সম্পূর্ণ অন্য জগতের এক নুরু ভাইকে। যে নুরু ভাই সারাদিন ঘরকুণো হয়ে বসে থাকেন। ক্লাসে শূন্য দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকেন। মনে হয়, কোনো এক অসহনীয় যন্ত্রণা বুকে চেপে রেখে বেঁচে চলেছেন।
নুরু ভাই ছিলেন মাঝারি মানের ছাত্র। ক্লাসের পড়া কোনওরকম শেষ করে পরীক্ষায় টেনেটুনে পাশ করার ক্ষমতা তার ছিল না। স্বাভাবিকভাবেই বার্ষিক পরীক্ষায় ফেল করলেন। তার বিদায় ঘণ্টা বেজে উঠল। শিক্ষাবর্ষের শেষদিন সহসা একটু নির্জনতায় তাকে পেয়ে গেলাম। আমূল পরিবর্তনের রহস্যটা জেনে নেয়ার মোক্ষম সুযোগ। পরক্ষণেই ভেতর থেকে প্রবল বাধার সামনে পড়লাম। পৃথিবীর তাবৎ রহস্য জেনে ফেলার অধিকার আমার নেই।

তিনটি বসন্ত কেটে গেল। সময়ের গতি অতি তীব্র। সময়ের স্রোত ভাসিয়ে নিয়ে যায় সুখ-দুখ আর হাসি-কান্নার গল্পগুলো। স্মৃতির ক্যানভাসে ধুলো জমতে থাকে। একেক সময় উজ্জ্বল হয়ে উঠে ফেলে আসা দিনগুলোর নির্মল প্রতিচ্ছবি। ভেতরটা তখন হু হু করে ওঠে।
অনাকাঙ্ক্ষিতভাবেই একদিন পেয়ে যাই নুরু ভাইয়ের খবর। শহরের অদূরে একটি মাদরাসায় অধ্যয়নরত। নুরু ভাই এখন আর হলদে জামা পরেন না। পেছনের বেঞ্চে বসে আশ্চর্য ভঙ্গিতে ঝিমান না। নুরু ভাই এখন ক্লাসের সবাইকে তাকরার করান। তিনি এখন সকলের মধ্যমণি। ছাত্র-শিক্ষক সবার গর্বের পাত্র।
আমার কেন যেন শূন্য শূন্য লাগে। ভেতরটা দুমড়ে-মুচড়ে যায়। মাঝে মাঝে চিৎকার করতে ইচ্ছে হয়। গলা ফাটিয়ে বলতে ইচ্ছে হয়–'নুরু ভাই, ভাল থাকুন আপনি। ভাল থাকুক আপনার আশপাশের মানুষগুলো।'

লেখক : শিক্ষার্থী, ঢালকানগর মাদরাসা, ঢাকা



ঘুড্ডি ওড়ানো
গ্রামীণ শৈশবের জন্য আক্ষেপ

রবিউল ইসলাম

সদ্য কৈশোর পেরুনো টিংটিঙে একটি বালক, শিক্ষার তাগিদে রোজকার সাইকেল দাবিয়ে বেড়ানো পথঘাট পেরিয়ে হুট করে ছুটে চলল যখন শহরের যান্ত্রিক কোলাহলের দিকে, সে ভোরবেলার স্মৃতিমাখা ওই গল্পের আলাপ আমার ভেতর প্রায়ই দুলে দুলে ওঠে যেন। আমার আধোভাঙা মনে চিত্রিত একটি ছবি রোজই আমার ভেতর চূর্ণন সৃষ্টি করে, আম্মাজান অর্ধেক ভেজানো ওই দুয়ারে একলা দাঁড়িয়ে দেখছেন পুত্রের চলে যাওয়া। আব্বার হাত ধরে বৃষ্টিমুখর সকালটিতে পুত্র হাঁটছে এবং বারেবারে ফিরে তাকাচ্ছে। দৃষ্টির দৌড় যতখানি, ততটুকু জুড়েই মিশে আছে সুদূরে দাঁড়িয়ে থাকা আম্মাজান এবং তাঁর জল-ছলছল দু'টি চোখ। চলে আসবার কালে আমার বুকপকেটে যখন তিনি পুড়ে দিচ্ছিলেন বিশেষ এক আবদার–'ভালো থেকো বাবা'–আমার খুব করে মনে চেয়েছিল আম্মার স্ফিত সবুজ ওই সুতি শাড়িটির কোণে আমার শত অনুরাগের মিশেলে কেঁদে ওঠা কান্নাগুলো মুছে দিয়ে আসি। যাতনার আবডালে কেমন সব ভুলে যাচ্ছিলাম আমি। যেন ভুলেই যাচ্ছিলাম এই একটু পর, আমাকে ছেড়ে যেতে হবে আমার রঙিন শৈশবের প্রতিটি পথঘাট, শানবাঁধানো পুকুরের ঘাট আর ডাংগুলি খেলবার সুবিস্তৃত মাঠ। ক্লাবঘরের পেছনের ওই জঙলামতন জায়গায় আমাদের নির্মিত খেলাঘরের কথাও আমাকে ভুলে যেতে হবে একটু সময় পেরুলেই, তাও যেন আমার বড় অজানা ছিল। গ্রামীণ শৈশবের বহুরঙা সব গালগল্প হুট করেই কেমন স্মৃতি স্মৃতি রূপ ধারণ করতে থাকল একেবারে অজান্তেই। যেন-বা অবিশ্বাস্য মন জানতই না সত্যিই ছেড়ে চলে আসছি আমি আমার অপূর্ব গ্রামীণ জীবন।

সেদিনের পর থেকে ইটপাথরের এই শহুরে জীবনযাপনে ছাত্রাবাসের

নির্ঘুম রজনীগুলোতে আমি এখনও মনে করে পুলক অনুভব করি, আমারও ছিল একটি ছবির মতো গ্রাম। ছিল ঘুঘুর ডাক আর শীতের রাতে আম্মার গলা জাপটে ধরে শুয়ে শুনতে থাকা শেয়ালের শব্দ। মাঝেমাঝে জোছনাধরা মনোরম রাতে ভূত দেখবার কোশেশে ঘর থেকে পালিয়ে এপাড়া ওপাড়া চষে বেড়ানো আর ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে ঘরে ফিরবার মতো গল্পও তো আমার আছে। স্কুল ফাঁকি দিয়ে প্রচণ্ড দাবদাহে সবান্ধব নদীতে বেলা পার করে ঘরে ফিরে আসবার কালে আম্মার ওই যে বেত হাতে রাগে গড়গড় চোখে তাকিয়ে থাকার দৃশ্য, এতোটা মধুর স্মৃতিই-বা আছে ক'জনের! মধ্যবিত্ত পরিবারের লাগাম ধরে রাখা আমার আব্বা সাইকেলের পিঠে চড়ে সারাবেলা পিওনের কাজ সেরে বাসায় আসতেন যখন, অস্থির মনে আব্বার বুকপকেট থেকে দু'টাকা তিনটাকা চুরি করে আতাউরের লাল সন্দেশ আর মতিচুরের লাড্ডু খাবার যে ব্যগ্রতা ছিল আমার গ্রামীণ শৈশব ঘিরে, এসব এখন স্মৃতির আলাপ বনে হয়ে আছে কাঙ্ক্ষিত এক ঝালমুড়ির ঠোঙা। সে ঠোঙা প্রত্যাশিত মনেই ফিরে পাবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা পুষে পুষে করছি রোজকার দিনগুজরান।

আমাদের মধ্যপাড়ার প্রাইমারি স্কুলটিতে ক্লাস শেষে যেভাবে বেজে উঠত ঘণ্টাধ্বনি এবং অপেক্ষিত আমাদের মনে সে ধ্বনি হতো এক ভীষণ মায়াময় আবহের স্রষ্টা, আমার ভেতরও আমার ওই শৈশব সেভাবেই অনুরণিত এখন। ওই নয়নপুর গ্রামটিতে কী সব সুন্দর সকাল তৈরি হতো, গ্রামের দস্যি ছেলেমেয়েরা দলবেঁধে ঘুরে বেড়াত সারা গ্রাম, গেয়ে উঠত পাখি, আর নেচে উঠত তাদের মধ্য থেকে আমার মতোই কোনো একজন। উঁচু পাচিল দিয়ে ঘেরা মর্ত্যের মতো দেখা যেতো আমাদের বাড়িটি। এর মাঝে সুবিশাল উঠোনে রোজ সন্ধ্যায় বসত আমাদের গল্পের আসর। দাদি থাকতেন সে আসরের মধ্যমণি। সারাদিন তালপাখা নিয়ে ঘুরতে থাকা আমাদের দাদি নাতিনাতকুর সবাইকে কাছে টেনে এক হাতে পাখাটি ঘোরাতেন বিরামহীন আর চলতেন গল্পের ভেতর দিয়ে। ঘুমঘুম চোখে আমরা শুনতেই থাকতাম। একটা শেষ হলে আমাদের আরেকটা শোনাবার শক্ত আবদার আমাদের দাদিকে ক্লান্ত করে ফেলত। তবুও তিনি চলতেন আর চলতেন। আর যেদিন দাদী ক্ষান্ত দিতেন, আমরা ছুটতাম বাড়ির পেছনের ওই গন্ধলেবুর ঝোঁপে। সেখানে ছিল জোনাকির বিশাল পসরা। দাদার অষুধের দোকান থেকে চুরি করে আনা ছোট্ট কাঁচের শিশি নিয়ে জোনাকি ধরার প্রতিযোগিতায় নামতাম সবে মিলে। লেবুর কাঁটায় গা ছিড়েখুঁড়ে যেতো। তবুও জোনাকি ধরে এনে রাতের বেলা অন্ধকারের বন্ধ ঘরে সেগুলো ছেড়ে দেবার সে যে এক আনন্দ, তার কাছে এসব কাঁটাবন ম্লান হয়ে যেতো একেবারে। ফেলে আসা ওই গ্রামীণ সময়ের বিস্তৃতি স্বল্প হলেও তার ভেতর ঘটে যাওয়া কেসসার বয়ান মোটেও কম নয়। আজ তা থাকুক, হবে অন্য কোনোদিন, কোনো সময়।

লেখক : শিক্ষার্থী, মাদরাসাতুল কাউসার আল ইসলামিয়া, ঢাকা



হিজলের বনে
কদম্বফুল যেখানে দুলতে জানে

আশরাফ মালেক

আধো আধো ভেঙে পড়া একটি মেঠোপথের দুপাশে দাঁড়িয়ে থাকা অজস্র কড়ই গাছ আর তার মাঝে শৈল্পিক কারুকাজে নির্মিত অসংখ্য পাখির বাসা থেকে ভেসে আসা কিচিরমিচির শব্দের অভিনব কোলাহলের মধ্য দিয়ে স্কুলের পথটি পেরোবার সেই যে এক সুরম্য ছবি আমি ধারণ করেছিলাম আমার শৈশবমুখর গ্রামীণ জীবনে, তা ভেবে আজকাল উথলে উঠতে চায় আমার সমগ্র দেহ-মন। আমার মনে হতে থাকে বাবার হাতটি ধরে প্রথমবার স্কুলে যাবার সেই মনোরম চিত্রটি। সফেদ বিস্ময়ের প্রাচুর্য ঠেলে যেন ডুবে যাচ্ছিলাম প্রকাণ্ড এক মহাসাগরে। প্রথম দিনেই পিটিতে অনুপস্থিত থেকে লজ্জিত মুখে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবার সকরুণ স্মৃতিটুকুও আমার কাছে এখন মনে হচ্ছে এ যেন এক মধু মধু গ্রামীণ অতীত। সাঁই-সাঁই করে উড়তে থাকা একটি মস্ত বড় বাংলাদেশের পতাকার সম্মুখে দাঁড়িয়ে সকলের লেফটরাইট লেফটরাইট চিৎকার, যেন এক আনন্দঘন মুহূর্ত–ভাবনার অতীত।

ছয় বছর বয়সের লাট্টু ঘুরানো গ্রামীণ শৈশবে রহিম চাচার ধারালো লৌহশলাকার লাটিমগুলোর প্রতিটি শিরা-উপশিরায় যেন-বা মিশে আছে সে সময়কাল। ঘরকোপ, ঘুরতি কোপ আর বেল্লাপার করার ধুন্ধুমার লড়াইয়ের মুক্ত প্রতিযোগিতার কাছে নিজেকে সঁপে দিয়ে আমার কাছে তখন মনে হতো ঘূর্ণায়মান এ লাটিমের অক্ষশীর্ষ থেকে ক্রমশ গোলকটির নিম্নার্ধ পর্যন্ত সুষমভাবে পেঁচিয়ে থাকা দু-তিন হাত দৈর্ঘের সুতলিটির মতোই যদি জড়িয়ে থাকা যেত আজীবন! মাঝে মাঝে এও তো মনে হতো যেভাবে আগুন পাখি, মাছরাঙা, জেমিনি আর চরকি লেজ ঘুড়িরা উড়ে বেড়াচ্ছে আমাদের হাতে থাকে নাটাইয়ের সুতোয়, কখনো উড়ে যাচ্ছে কোথাও, কেউ জানে না–হতো যদি শৈশবটি আমার তেমনই!

আমার ওই গ্রাম্যজীবনের বিচ্ছেদ্য শৈশবটি যদি আটকে যেত স্কুলের প্রতি ক্লাসে কিংবা পথে থাকা কড়ইয়ের ডালে পাখির বাসা আছে

কতগুলো–এ নিয়ে বৃথা তর্কের মাঝেই। আক্ষেপ এবং 'ইয়া আসাফা'র জিগিরেই রত আমার মনকে তখন শান্ত করে তোলে আমার স্মৃতিকাতর শৈশব। আমাকে মনে করিয়ে দেয় বসন্তের কোকিল যখন সুরের মূর্ছনায় পাড়াগাঁয়ে রইরই মাতম তুলত আমরা তখন পসরা সাজাতাম কদমের। হুল্লোড় চেচামেচিতে ভরে উঠত আমাদের কদমের হাট বাজার।
কাঠালের পাতা দিয়ে মিছামিছি কেনা-বেচার খেলায় আমরা দিনশেষে হয়ে উঠতাম সবাই সবার চাইতে লাভবান। হিজলের তলে আমরা ভাই-বোন মিলে সেই সকাল সকাল কুড়িয়ে আনা ফুলগুলো যত্নভরে মালায় গাঁথতাম। কদম আর হিজলের সাজে ভরে উঠত আমাদের পাঁচিলঘেরা ঘরদুয়ার।
কাঠের উইন্ডোতে মুখ গুঁজে টানাবাদাম আর কটকটিওয়ালার অপেক্ষায় কেটে যেত আমাদের অনেকটা সময়। স্টোরে জমানো বিশেষ ভাঙাচোরা নিয়ে আমরা দৌড়ে ছুটতাম হকার আঙ্কেলের পেছনে। মা বকে দিতেন মাঝে মাঝে–ওসব ভালো না, খাওয়া যাবে না। কিন্তু পেটে অসুখ বাঁধিয়েও আমরা দিনরাত এসবের জন্য অপেক্ষায় অপেক্ষায় দিন-গুজরান করতাম।
সাত বছর বয়সে বাবা সাঁতার শেখাতে পুকুরে নিলেন। প্রথমে তো আঁটোসাটো করে বোতল বেঁধে নিতাম দুপাশে। কিন্তু দিন ফুরালে বাবা এও নিতে দিলেন না। এবার হবে আসল খেলা–এরকম বলে আমাকে ছেড়ে দিতেন। হাপুস নয়নে কেঁদে কেঁদে উঠতাম ভয়ে। পানি দিয়ে ভরে যেত পুরোটা পেট। তলিয়ে যেতে যেতে বাবার অস্তিত্ব টের পেয়ে যেন পুনরায় জীবন ফিরে পেতাম। কী অপূর্ব সুখের সময়। সাঁতার শেখা হয়ে গেলে তখন কে দেখে কার খেলা। স্কুল ফাঁকি দিয়ে আম্মার চোখ থেকে পালিয়ে ভরদুপুরে সন্ধ্যা তক ভিজে জ্বর বাঁধিয়ে ফেলতাম। তবুও তো মেটে না সাধ, মানে না বিপত্তির অবিচ্ছেদ্য বাধা।
বড়চাচার কবুতরের বিশাল পসরাতেও আমাদের সময় কাটত। আয়েশ করে উঠোনের মাঝে ছড়িয়ে দেয়া ধান আর হাল্কা শিস দেয়াতেই কাঁধে চাপা দিয়ে বসে পড়ার দৃশ্য দেখতাম। কিন্তু একবার হলো কী, গ্রামে শুরু হলো তিনডোরা নোঙরের প্রকোপ। কবুতর-হাঁস-মুরগী খেয়ে বেড়াতে লাগল এই পিশাচসুলভ প্রাণীটি। কিন্তু ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকা এই তিনডোরা নোঙরকে কেউই ধরাশায়ী করতে পারছে না। এইরকম যাতনায় প্রতি রাতেই আমাদের কান্না পেতো। একদিন দেখা গেল একে একে সব কবুতর কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে গেল। হাঁস-মুরগীও কমে যেতে থাকল ক্রমশ।
এমনই ছিলো আমার লাট্টু ঘুরানো আর ধান কাটবার দিনে বিশাল মাঠে ছড়িয়ে পড়ে গোল্লাছুট খেলবার গ্রামীণ শৈশব। টিনের চালে বৃষ্টির দিনে টুপটাপ ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টির মাধুকরী সৌন্দর্যে আমাদের জড়সড়ভাবে বসা গল্প-আসরের অনন্য গল্প হয়েই যেন হারিয়ে গেছে আমার গ্রাম, আমার শৈশব। হারিয়ে গেছে স্কুলঘরের মেরামতহীন ল্যাবরেটরিতে ঝুলে থাকা কঙ্কাল এবং চলে গেছে কোথায় সেসব বন্ধুবান্ধব, কোন অদূরে।

লেখক : শিক্ষার্থী, মাদরাসাতুল কাউসার আল ইসলামিয়া ঢাকা



পরী ও পেত্নী হবার গল্প

জিনান

প্রতিদিন সকালে লেকের মাঝ দিয়ে হেঁটে কলেজে পৌঁছি। আবার ক্লান্ত দুপুরে হেঁটে হেঁটে বাসায় ফিরি। ফেরার পথে আমার একটু বিশ্রাম নিতে ইচ্ছে করে পার্কের বেঞ্চিতে। আমার নিঃসঙ্গতায় তখন সঙ্গী হয় লেকে সাঁতার কাটতে থাকা হাঁসগুলো। আমি যেন তাদের চেনা অতি আপন। আমি লেকের পাড়ে বসলে তারা সাঁতার কেটে আমার সামনে এসে হাজির হয়।

আমার ব্যাগে থাকা টিফিনের অবশিষ্ট অংশ, রুটি বা বিস্কুটের টুকরো আমি পরম আদরে তুলে দিই তাদের মুখে। কৃতজ্ঞতায় তারা শব্দ করে ওঠে। আমার জন্মভূমি থেকে সাত সমুদ্র তেরো নদী দূরে এই দেশে এই আমার আনন্দের জায়গা। এখানে এলে এক অদ্ভূত মায়া খুঁজে পাই। লেকের মনোরম দৃশ্য আমাকে স্মৃতিকাতর করে দেয়। অতীত হাতড়ানোর মতো নিয়ে যায় আজ থেকে এক যুগেরও বেশি সময় আগে, আমার নানুবাড়ির গ্রামে।

বিস্তীর্ণ ফসলের মাঠ, বাড়ির কাছে সুবিশাল পুকুর। গাছের ছায়ায় তার পানির রঙ গাঢ় সবুজ। আমার চোখে সুন্দর ভয়ংকর তার টলমলে জল। মনে হয় সেই পুকুরের প্রতিবিম্ব আমার চোখের সামনে থাকা এই লেক। আমার শৈশবের অজস্র সুখময় স্মৃতির বেশির ভাগই এই গ্রামে কিংবা এই পুকুর পাড়ে। ছোটবেলার কত খেলাধুলা দাপাদাপি মিশে আছে পুকুরের জলে। মনে পড়ে এক সন্ধ্যাবেলার কথা। আমরা দুই কেশবতী বোন পুকুরের পাড়ে এক গাছে ওঠে বসেছিলাম। দস্যিপনায় অনেক ছেলেদের চেয়ে আমরা এগিয়ে। আঁধার ঘনিয়ে এসেছিল। গাছের ডালে বসে দেখছিলাম দুরন্ত ছেলেদের খেলা। আমাদের চেয়ে বয়সে তারা ছোট বলে ভয় দেখাতে লাগলাম তাদের। সন্ধ্যা হঁয়ে এঁসেছে, এঁখনো তোঁরা বাড়ি যাঁসনি? কিছুটা নাঁকি সুরে ডাক দিলাম আমরা তাদের। আবছা অন্ধকারে আমাদের ভালো করে দেখতে পায়নি দুষ্টু ছেলের দল। বিরাট গাছের ছায়া আর সন্ধ্যার অন্ধকার ভূতুড়ে পরিবেশ তৈরি করেছিল। আধো অন্ধকারে আমার ও আমার বোনের লম্বা চুল আর ফর্সা মুখ দেখে তাদের কাছে মনে হয়েছিল পেত্নী। আমাদের ধমক শুনে ভোঁ দৌড় দিয়ে পালিয়ে যায় তারা। পরদিন গ্রামে খবর রটে যায়, দুটো পেত্নী দেখা গিয়েছিল গতকাল সন্ধ্যায়, পুকুর পাড়ে এই গাছের ডালে।

পেত্নী যেমন হয়েছিলাম তেমনি পরীও হয়েছিলাম একবার। কোনো এক ঈদে বাবা হলুদ একটা জামা কিনে দিয়েছিলেন আমাকে। জামাটি পরলে পরীর মতো লাগত আমাকে। পরীর মতোই তো ছিলাম দেখতে আমি ছোটবেলায়। একদিন দুপুরবেলা পাখির মতো দু হাত মেলে হেঁটে যাচ্ছিলাম সরিষা ক্ষেতের মাঝ দিয়ে। আকাশের উজ্জ্বল রোদ, হলুদ সরিষা ক্ষেত আর আমার হলুদ জামা–সব মিলিয়ে আমাকে সত্যি যেন পরী বানিয়ে দিয়েছিল। হঠাৎ দেখি দূর থেকে এক মহিলা বিস্ফারিত নয়নে চেয়ে আছেন আমার দিকে। তার চাহনিতে প্রশ্ন, ওই কে হেঁটে যায়? মানুষ না পরী?

যুক্তরাজ্য থেকে



শ্রাবণে গদ্য

মাহবুবুর রহমান

শ্রাবণের শেষাশেষি। বৃষ্টি পড়ছে ঝমঝমিয়ে মুষলধারে। জং ধরা জানালা বেয়ে ছাট আসছে এন্তার। ঘরের সামনে কাঁচা মাটি। বৃষ্টির পানি তার উপর দিয়েই বয়ে যায়। উদাসীন চোখের সামনে দিয়ে ভাসিয়ে নিয়ে যায় খড়কুটো, গাছের লতাপাতা। যেন শৈশবের খালে উপচেপড়া পানিতে ভেসে চলা কচুরি পানা। অজ্ঞাত স্থান থেকে ভেসে আসা সবুজ পাতার দুএকটা কলা গাছ।

পানি যেদিকেই মুখ ফেরায় সেদিকেই মাটি সরিয়ে তৈরি করে নিজের নালা পথ। মাটি আর পানির মিশেলে জন্ম নেয় ঘোলাটে কাদাময় একটা তরল পদার্থ। তারপর কলকলিয়ে গড়িয়ে পড়ে নিম্নভূমিতে, খালে, ডোবায়। এই দেখার স্বাদ সবসময় পাওয়া যায় না। বৃষ্টি বিঘ্নিত দিনে তাই বিরক্তি না লেগে, লাগছে মধুর। মন বলছে যাক না সব আবিলতা ধুয়ে-মুছে সাফ হয়ে।

দিগন্তের সব আবিলতা মুছে গেলেই তো দেখা মিলে সচ্ছ নীলাভ আকাশের। ছোপ ছোপ পানি জমছে কয়েক জায়গায়। কোত্থেকে যেন এলো নরম তুলতুলে দুটো পাতি হাঁস-ছানা। অল্প পানিতেই মাথা নুইয়ে পানি পানি খেলা করছে। নিস্ফল চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে মাথা ডোবানোর। কিন্তু কোনো কাজ হচ্ছে না। শিমুল তুলোর মতো পাখনা দুটি তাই উঁচু করে প্যাক প্যাক ডাক। তারপর চঞ্চু দিয়ে সারা গায়ে পানির স্পর্শ বিলিয়ে দেওয়া। এ তবে অবোধ প্রাণীর বাঁধভাঙা উল্লাস! নাকি বহুদিন পর স্বজন ফিরে পাওয়ার উচ্ছাস?

ঘনঘোর বরষায় এমন ছবি দেখি না কতদিন। কতদিন চোখে পড়ে না চির আপন এ রিমঝিম বৃষ্টি-বাদল। বেশ উপভোগ্য, বরং এমন দৃশ্য থেকে চোখ ফেরানোই দায়।

আজ সর্বত্র যেখানে নগর জীবনের জয়জয়কার, প্রতিনিয়ত গ্রামীণ ঐতিহ্য যেখানে নাগরিক সভ্যতায় বিলীন হয়ে যাচ্ছে, সেখানে আবহমান বাংলার এ দৃশ্যটি অত্যন্ত সুখকর বৈকি। ক্যামেরা-লাইট সেট করে এমন মধুর মুহূর্ত দৃশ্যায়ন করতে কাঠখড় পোড়াতে হবে অনেক। কিন্তু এটা কেবলই আল্লাহর দান। না চাইতেই স্রষ্টার অপূর্ব করুণা।



অরণ্যে পেতেছি সংসার

ওবায়দুর রহমান তারেক

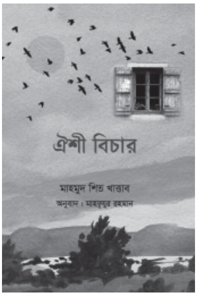
জীবনানন্দের 'আবার আসিব ফিরে'র সঙ্গে আদর্শিকভাবে আমার মতপার্থক্য থাকলেও কেন যেন মনে হয় বাংলাদেশের এই আশ্চর্য সুন্দর গ্রামগুলো নিয়ে আমার ভাবনার তরজমা তারই মতো। শিক্ষা অথবা কর্মের তাগিদে আমরা কখনো হয়তো ছেড়ে আসতে চেয়েছি গ্রামবাংলার মাটি ও মানুষের হৃদয়-দূর থেকে আকস্মিক আকর্ষণে আবার ফিরে আসার ঘটনাও ঘটে গেছে প্রতিনিয়ত। তবে আমি জানি না এরকম আকর্ষণ কি পৃথিবীর এ সুবিশাল মানচিত্রের মাঝে আধশোয়া একটি ছোট্ট আঙিনায় ভর করে থাকা গ্রামীণ পরিবেশ ছাড়া আর কোথাও আছে কিনা। থাকার সম্ভাবনাই হয়তো বেশী। তবে সন্দেহাতীতভাবে বলা যায়, আমি এবং আমাদের চারপাশে থাকা জনজীবনের গ্রাম নিয়ে যে অনুভূতির প্রকাশ, এরকম আবেগমাখা দরদ হয়তো আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। পাওয়া যাবে না সকালে শহরে আসা আলম কাকাদের দুপুর পেরোতেই গ্রামে ফিরে যাবার উদ্যত মুখখানির সচিত্র আবেদন। তারা বনবাদাড় আর মাঠ পেরিয়ে আসবে শহরে। তাদের দমবন্ধ মুগ্ধতা আবার অসুর কণ্ঠে ডাকতে থাকবে পেছন থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে। তাঁরা বোচকাবুচকি নিয়ে ফিরে যেতে থাকবেন তাদের সবচাইতে পরিচিত সৌম্যসুন্দর গ্রামের কাছে। সত্যিই অপূর্ব সুখ-সংসারের স্রষ্টা এবং প্রাকৃতিক শিক্ষায় উজ্জীবিত করে তোলা এক মহান পরিসরের নামই গ্রামীণ জীবন।

বুক ভরে নিঃশ্বাস নেবার উদগ্র রসবোধ যখন আমাদের মনে সঞ্চার হয় তখনই আমরা অনুভব করি আমাদের চারপাশ জুড়ে দগদগে এসিড-পঁচা গন্ধ। হর্ণ-সাইরেন, দমবন্ধের মতো উড়তে থাকা ধোয়াশার মধ্য দিয়ে আমাদের চলন্ত বাস-ট্রাক এবং ঘর্মাক্ত দেহে দৌড়তে থাকা জীবিকার অন্বেষী আমরা যখন চলতে থাকি এই মহারাস্তার বুক দিয়ে, সব দিক থেকে তেড়ে আসে আক্রোশ, ক্রুদ্ধতা, আফসোসের বহুরৈখিক তাড়না-প্রকৃতির এ কেমন অবিচার! তা-ই হয় আমাদের বিড়বিড় করবার প্রতিপাদ্য। এখানকার মানুষও কেমন অপ্রাকৃত দেহধারণার বিজ্ঞাপন দিয়ে চলতে থাকে দিনেরাতে। প্রকৃতির সাথে তাদের তৈরি হওয়া দূরত্বের কারণেই হয়তো বিগড়ে ওঠে শত অস্থিরতা কিংবা সহিংস আচরণ। হিংসাত্মক নৈরাজ্য গিলে খায় আমাদের সমগ্র জাতিসত্তাকে।

লেখক : শিক্ষার্থী, মাদরাসাতুল কাউসার আল ইসলামিয়া ঢাকা

বই পরিচিতি

ঐশী বিচারের কাঠগড়ায়



গল্প পৃথিবীর প্রাচীনতম বিনোদনের একটি মাধ্যম। হাজার বছর আগে যখন কবিতা মানুষকে তৃপ্ত করতে পারেনি তখন গল্প জায়গা করে নেয় মানুষের সংস্কৃতিতে। চাঁদনী রাতে খোলা আকাশের নিচে বসে গল্প বলতেন কোনো গল্পকথক। তার চারপাশে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনত মানুষ। গল্পের মধ্য দিয়ে সে সময়ের মানুষের হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনা ও মনের কথাগুলো প্রকাশ পেত।

গল্পের এই ধারা এতদিনে অনেক অনেক দূর এগিয়েছে। গল্পকে নানা নামে অভিহিত করতে শুরু করেছে মানুষ। ছোটগল্প, বড়গল্প, অণুগল্প, রসগল্প, রূপকথার গল্প, রহস্যগল্প ইত্যাদি। সাহিত্যের যারা পাঠক তাদের কাছে সব ধরনের গল্পেরই কদর আছে। তবে হৃদয় যাদের আলোকিত তাদের এসব গল্পে মন ভরে না। তারা গল্পের মধ্যে আলাদা কিছু চান। গল্প তাদের শুধু ঘটনাপ্রবাহ আর নানা চরিত্রের বেড়াজালে আটকে রাখে না। গল্প তাদের মুগ্ধ করার পাশাপাশি হৃদয়কে আলোকিত করার মতো কোনো শিক্ষা দিয়ে যায়। এতেই যেন তার গল্পের সার্থকতা।

এমন পাঠকদের জন্য নবপ্রকাশ নিয়ে এসেছে নতুন গল্পের ডালি 'ঐশী বিচার'। গল্পকার নবপ্রকাশের পাঠকদের কাছে পুরোনো নন। 'আসমানি আদালত' নামে তাঁর লেখা আরও একটি গল্পের বই ইতোপূর্বে অনুবাদ করে প্রকাশ করেছে নবপ্রকাশ।

গল্পকার মাহমুদ শিত খাত্তাবের জন্ম ইরাকে। তাঁর জীবন বর্ণাঢ্যময়। সেনাবাহিনীর চাকরির পাশাপাশি মন্ত্রিত্ব পেয়েছেন একাধিকবার। ১৯৪৮ সালে ফিলিস্তিনের হয়ে যুদ্ধ করেছেন। ১৯৯৮ সালে তার মৃত্যু হয়।

মাহমুদ শিত খাত্তাবের গল্পগুলো আলাদা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। জীবনের সাধারণ ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে তিনি অসাধারণ এবং চমৎকার গল্প নির্মাণ করতে পারেন। সেই গল্পের মধ্য দিয়ে জীবনের চরম সত্য তুলে ধরেন পাঠকের সামনে। পাঠক গল্পের মধ্যে আদর্শের পাঠ পায়। গল্পের মাধ্যমে আলকিত হয় পাঠকের হৃদয়। ছোট-বড় মিলিয়ে মোট সাতটি গল্প স্থান পেয়েছে ঐশী বিচার বইতে। এর মধ্যে প্রথম গল্পটি স্বপ্নের পেখমমেলা ময়ূর। চমৎকার এই গল্পে লেখক তাঁর দেখা একটি গল্প বলেছেন। একজন আর্মি অফিসারের জীবনের নানা চড়াই-উৎরাই পেরোবার গল্প। মানুষের জীবন যে কত বিচিত্র হতে পারে এই গল্পে তা দেখিয়েছেন লেখক। এমন নানা রঙের আরও ছয়টি গল্প পাবেন পাঠকরা এই বইয়ে। পাঠকদের পিপাসা মেটাবে এসব গল্প।

গল্পের বইয়ের নামটি যথার্থ। আরবি নাম তাদাবিরুল কদর। বাংলায় বইটির নাম রাখা হয়েছে ঐশী বিচার। সবগুলো গল্পের সাথে ভাগ্যের একটা যোগসূত্র খুঁজে পাবেন পাঠক। নবাগত অনুবাদক মাহফুযুর রহমান ঝরঝরে বাংলা গদ্যে অনুবাদ করেছেন বইটি। প্রায় একশ পৃষ্ঠার বইটি পাঠকরা এক নিমিষেই শেষ করে ফেলতে পারবেন আশা করি। নবপ্রকাশের পাঠকরা আরও একবার চমৎকৃত হবেন বইটি পেয়ে।

ঐশী বিচার
লেখক: মাহমুদ শিত খাত্তাব
অনুবাদক: মাহফুযুর রহমান
প্রকাশক: নবপ্রকাশ
মূল্য: ৯৬ টাকা

নবধ্বনি

অক্টোবর ২০১৯ । বর্ষ ১২ । সংখ্যা ০৯



রাত পোহাবার কত দেরি পাঞ্জেরী

অক্টোবর ২০১৯ । বর্ষ ১২ । সংখ্যা ০৯

সম্পাদক
তামীম রায়হান

নির্বাহী সম্পাদক
সালাহউদ্দীন জাহাঙ্গীর

সহকারী সম্পাদক
হামমাদ রাগিব
নাজমুস সাকিব

প্রকাশনা ব্যবস্থাপক
আসাদুল্লাহ খান

সার্কুলেশন ব্যবস্থাপক
মুহাম্মদ ইসহাক খান

মূল্য ৫ টাকা মাত্র

নবধ্বনি । দোকান নং ২৭ । ২য় তলা । ইসলামী টাওয়ার ১১/১ বাংলাবাজার । ঢাকা
সার্কুলেশন : ০১৩১৮ ৬৩৪৪১২ । সম্পাদনা : ০১৭৪৫ ১৩৯২১৫

Email: nobodhoni@gmail.com web: noboprokash.com/nobodhoni

স্বাগত কলাম

সৌজন্যতা খুব সামান্য বিষয় দিয়ে আদায় করা যায়। যেমন 'ধন্যবাদ' 'শোকরিয়া' বা 'থ্যাংক ইউ' বলা। ধন্যবাদ বলার জন্য তেমন কোনো উপলক্ষের অপেক্ষা করা বোকামি। ধরুন, রিকশা দিয়ে কোথাও গেলেন, রিকশাওয়ালাকে ভাড়াটা দেয়ার পর একটা ধন্যবাদ বলে দিতে পারেন। এতে আপনার তেমন কোনো ক্ষতি হলো না, কিন্তু রিকশাওয়ালার মনটা খুশি হয়ে যাবে। দোকান থেকে কিছু কিনলেন, কেনাকাটা শেষ হওয়ার পর দোকানিকে হাসিমুখে একটা ধন্যবাদ দিয়ে দিন। সামান্য কারণে ধন্যবাদ দিতে শিখুন, ব্যাপকহারে সালাম দেয়ার সাহস করুন।

কিছুদিন আগের কথা। কোনো একটা নবীন পত্রিকার জন্য এক তরুণ লেখা চেয়ে ফোন দিলেন। এর আগে তিনি ফেসবুকে আমার নাম্বার চেয়েছেন। নাম্বার পেয়ে ফোন দিলেন। ফোনে তাদের পত্রিকার জন্য একটি লেখা কামনা করলেন। কিন্তু ব্যস্ততা থাকার কারণে আমি সবিনয়ে নিজের অপারগতা প্রকাশ করলাম, আমার পক্ষে লেখা সম্ভব হবে না। তরুণ 'ও আচ্ছা' বলে ফোন রেখে দিলেন। না কোনো সৌজন্যমূলক বাক্য–আল্লাহ হাফেজ বা সালাম, নিদেনপক্ষে 'আচ্ছা রাখি তাহলে' বলারও প্রয়োজন বোধ করলেন না। আমি অবাক হয়ে ফোনের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলাম।

একটা জাতির উন্নতির অন্যতম নিদর্শন হলো তারা কতটা বিনয়ী ও সৌজন্যতাপ্রিয়। এ কারণে ইসলাম সৌজন্যতার জন্য ব্যাপকহারে সালামের প্রচলন করতে বলেছে। কথার শুরুতে এবং শেষে সালাম, দেখা হওয়ার শুরুতে সালাম, শেষেও। আমাদের রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সালামকে মানুষের আত্মিক উন্নতির অন্যতম পথ্য নির্বাচন করেছেন। এটা কেবল সৌজন্যতার শব্দ নয়, এটা মানুষের মানসিক প্রশান্তির এক দাওয়াই বলে গেছেন তিনি। মানুষের সঙ্গে মানুষের ভালোবাসা বৃদ্ধির অব্যর্থ নিয়ামক।

ইসলাম সৌজন্যতাকে কেবল মুখের বুলিতে সীমাবদ্ধ রাখেনি, এটার জন্য ইসলামি আইনশাস্ত্রে (ফিকহ) স্বতন্ত্র অধ্যায় রচনা করা হয়েছে। বিখ্যাত হাদিসগ্রন্থ থেকে শুরু করে সকল ইসলামি আইনবিষয়ক গ্রন্থে সালাম বিষয়ে বিস্তর আলোচনা রয়েছে। সালাম কীভাবে দেয়া হবে, কাকে দেয়া হবে, কখন দিতে হবে, ছোট বড়কে দেবে নাকি স্ত্রী স্বামীকে দেবে, আরোহী উপবিষ্ট ব্যক্তিকে দেবে নাকি শিক্ষক ছাত্রকে দেবে–এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা এসেছে আমাদের রাসুলের হাদিসের আলোকে। রাসুল নিজ জীবনে এমন সৌজন্যতার আতিশয্য আমাদের দেখিয়ে গিয়েছেন।

আমাদের সালামের মধ্যেও কৃপণতা আছে। আমরা সাধারণত পরিচিত মানুষদের সালাম দিয়ে থাকি, অপরিচিতদের সালাম দিতে আমাদের কিছুটা কুণ্ঠাবোধ হয়। না, সালাম বা ধন্যবাদ দেয়ার জন্য পরিচয়ের প্রয়োজন নেই। মানুষ হিসেবে যে পৃথিবীতে বিরাজমান, তার আর নতুন করে পরিচয় দেবার কিছু নেই। প্রত্যেক মানুষ সৌজন্যতার হকদার। তাকে তার সঠিক সম্মান দিতে শিখুন।



পৃথিবী ধ্বংসের মহোৎসবে স্বাগতম

সালাহউদ্দীন জাহাঙ্গীর

কবে যেন রাতে ঘুম ভেঙে মনে হয়েছিল, হতাশ্বাসে ভুগছি কি-না। কিংবা ঘুমুতে যাওয়ার আগে যখন শুয়ে স্মার্টফোনে এটা সেটা গুঁতোগুঁতি করছিলাম, হতাশার চিন্তাটা তখনও আসতে পারে। সঠিক মনে নেই আমার। ঘুমের আগে যতক্ষণ চোখ বুঁজে থাকি, তখন কি জীবন ও জীবনযাপন নিয়ে কিছুক্ষণ ভেবেছিলাম? সমাজ ও পৃথিবী নিয়ে কি কিছু ভাবনা এসেছিল সেদিন? আসা তো উচিত।
এই যে বৃষ্টি হচ্ছে প্রত্যেকদিন, আকাশ মেঘলা বেশ ক'দিন। সূর্য দিনে দু-তিনবার উঠে, মুক্তোর মতো সাদা মেঘ ছড়িয়ে থাকে তখন আকাশে। ঝলমলে রোদ জানান দেয়–শরৎ চলছে। বিলজোড়া হাঁটুডোবা জল। সেই জলে সবুজ ধান, কলমি শাঁকের ডগা, কখনো বেগুনী ফুল উদোম হয়ে ফুটে থাকে। খলবল করে ছোট কাচকি মাছ চিড়িক করে দৌড়ে যায়। স্বচ্ছ খয়েরি জলে একটা কম্পন হয়। মনের ভেতরেও একটা কম্পন থর থর করে। করে না?
বিলে যতটুকু জল আসে, বৃষ্টির জল। খালগুলো দিয়ে এখন আর নদীর জল গড়ায় না। বন্যা হলে কেবল নদী যখন উপচে উঠে, তখন বানের জল আসে বিলের আইল ভেঙে। এ তল্লাটে এখন আর বন্যাও হয় না। বানের জল আসবে কোত্থেকে? উচিত ছিল, নদীতে যখন ভরা যৌবন

আসবে তখন খাল দিয়ে টই টই করে গড়ানো জল নামবে বিলে। নদীর গচ্ছিত মাছ খাল গড়িয়ে ঘোলা জল সাঁতরিয়ে বিলে এসে লুটোপুটি করবে। বিলে মাছের আধারের বাড়-বাড়ন্ত। কচুরিপানা, ধানের গোড়া, সোঁদা শ্যাওলা, ফসলের অবশিষ্টাংশ যেটা কৃষকের অলক্ষ্যে পড়ে রয়েছিল জমির আস্তরে, আগাছা, তর তর করে বেড়ে ওঠা বর্ষাতি ঘাস–এসব খেয়ে মাছগুলো দিনান্তে বেড়ে উঠবে।
দশ-পনেরো দিনে ডাগর হয়ে যাবে তারা। তারপর গ্রামের মাছুরে লোকজন মাছ ধরবে ধর্ম জাল, কারেন্ট জাল, বড়শি, ট্যাটা, জুতি দিয়ে। ছোট মাছের জন্য উঁচি, ঠ্যালাজাল, চাই বানিয়ে পাতবে খেতের বাতরে বাতরে। সকাল হলেই ও পাড়ার কালু, চান্দু, ফটিক, খোকন, পাঞ্জু, জুলহাস পাতিলভরা মাছ নিয়ে ছুটবে বাজারে। সকাল সকাল টাটাকা মাছের গাহাগ ভালো।
কিন্তু বর্ষাতি নদীর জল আর আসে না বিলে। খালগুলো ভরে গেছে অযত্নে, আমাদের লোভের তোড়ে। কলা গাছ, শ্যাঁওড়া গাছ, রাজ্যের আগাছা জন্মে বরাভব সেগুলো। কেউ কেউ খাল কেটে কুমির না এনে বানিয়েছে রাস্তা, বাড়ির পাগাড়। শুকনো মৌসুমে চাষ করে সবজির। পাড়গুলো ভেঙে ভেঙে ভরাট হয়ে গেছে তলানীর স্তর। যেখানটায় নদীর সঙ্গে খালের গাঁটছড়া বাঁধা, যেখান থেকে মিলে মিশে দুজনে একাকার, খালের সরু মুখটা ছুঁয়েছে যৌবনবতী নদীর পেট, সেখানটায় তো রাস্তা এখন। ব্রিজ আছে বটে, কিন্তু তলানীটা বালিভরা, ভরাট মাটি।
বিলে বিলে গড়ে উঠেছে ইটের ভাটা। শক্ত চোয়াল দিয়ে পোড়া মাটিতে আঘাত করে মাছেরা দেখে, আরও বেশি শক্ত ইট দিয়ে থেঁতলে দেয়া হয়েছে তাদের সাঁতার কাটার স্বাধীনতা। ইটভাটার চিমনি দিয়ে উড়ে ধোঁয়া, নিচে পোড়ে গাছের গোড়া। মেটেরঙা পেলব মাটি পুড়তে পুড়তে লাল হয়। সেই ইটে হয় দালানকোঠা, ঘরবাড়ি হয়, শপিং মল-মার্কেট, বিদ্যালয়-মাদরাসা, হয় মসজিদ-মন্দির। বিল থেকে কে বা কারা যেন প্রতি শুকনো মৌসুমে মাটি কেটে নিয়ে যায়। বড় বড় মাটিখোদক ভেকু মেশিন গুম গুম শব্দে দিনভর রাক্ষসের মতো খাবলা দিয়ে মাটির বুক থেকে তুলে নেয় মাটির মাংস, তুলে দেয় পাঁচ টনী ট্রাকে। সেই মাটি নিয়ে ফেলে অন্য কোনো বিলে। বিলের ওপর গড়ে উঠছে আস্ত আস্ত পোশাক কারখানা। একটা নয় দুটো নয়, শত শত কারখানা গড়ে উঠছে চোখের পলকে। কাল যেখানে ডানকিনা মাছ ঝাঁক বেঁধে ভাসান দিতো, আজ সেখানে স্লোটেক্স নামের বিরাট পোশাক কারখানা। কাল যে বিলে হল্লা করে বাইচ নামতো, আজ সেখানে বিসিক শিল্প নগরীর ঢং ঢং কলের শব্দে কান পাতা দায়।
প্রতিটি কারখানা থেকে প্রতিদিন টনকে টন বর্জ্য নামছে বিলের জলে। বিল থেকে চুইয়ে যাচ্ছে নদীতে। নদীর জল এখন কুচকুচে কালো, গন্ধে টেকা দায়। কিন্তু এই সেদিন এ নদীতে আমার কৈশোর কেটেছে। আমি এক জেলেকন্যাকে দেখার জন্য সাঁতরে পার হয়েছি বহুবার শেষ আষাঢ়ের দিনগুলিতে। ট্রলারে উঠার প্রতিযোগিতায় পাগলের মতো হাত-পা নেড়ে কেটেছি ডুবসাঁতার। আজ সেই নদী আমার নেই। সেই নদী এখন কারোরই নেই। না মাছেদের, না শুশকের, না কচ্ছপ বা মানুষের। সেই নদী এখন ডলারের খা খা লোভের বলি হয়ে অভিশাপ দেয় হররোজ।
এক বিলের সঙ্গে আরেক বিলের যোগাযোগ নেই। প্রতিটা বিল আরেকটা বিলের সঙ্গে মেশার জন্য, এক জল আরেক জলের সঙ্গ পাওয়ার জন্য, এক মাছ আরেক মাছের সান্নিধ্য কামনায় কেমন ছটফটানি করে, দূরান্তে সাঁতার কেটে কালভার্টের নিচে গিয়ে দেখে মাটির শেকল। সকল বিল আলাদা। ভিন্ন ভিন্ন দেয়ালের ভেতরে যেন কারাগারে দণ্ডিত মাছের দল। সেই কারাগারের মধ্যে

হাঁসফাঁস করে দলছুট মাছেরা। খাবি খায় বারে বার। লোভী মানুষ আরও ফসলের জন্য, আরও বেশি উৎপাদনের জন্য, আরও বেশি খাবারের জন্য ফসলের ক্ষেতে দিচ্ছে সার–ইউরিয়া, পটাশ, ফসফরাস, ফুরাডান বিষ। সেই বিষে মরে গেছে শত শত মাছের প্রজাতি। এখন কেবল টিকে আছে অফুরন্ত প্রাণবাহী দীর্ঘজীবী মাছেরা। ক্যাকলা, গুতুম, বাইন, মেনি, টাটকিনি, বাইলা, বাটা, ভেদি, চান্দা, তিতাপুঁটি, ডানকিনা মাছেরা আর ডাকবে না রাত-বিরেতে। হারিয়ে যাওয়া খালের নামে আর কখনো বাইচ নামবে না বিলের ঘেরে।
এখন বিকেল হলে দেখি, হাজার হাজার পোশাককন্যা বেরিয়ে আসে বিলের আঙিনায় গড়ে ওঠা পোশাক কারখানা থেকে। তাদের দেহে ক্লান্তি, কিন্তু বিজয়ের হাসি চোখে-মুখে। মাস শেষে মিলবে হাজার দশেক টাকার মাইনে। বিল উজাড় হচ্ছে, নদী উজাড় হচ্ছে, মাছেরা উজাড় হচ্ছে, জীববৈচিত্র্য হারিয়ে যাচ্ছে, জলবায়ু পরিবর্তন হচ্ছে; কিন্তু এসবের বিনিময়ে দেশের কোটি মানুষের কর্মসংস্থান হচ্ছে। আমি দোষ দেবো কাকে? কাকেই বা পিঠ চাপড়ে বলবো, ‘বাহ, বেশ হচ্ছে!’
জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে খুব হাঁকডাক হচ্ছে। বহুদিন থেকেই হচ্ছে। এর অন্তর্নিহিত কারণ আছে। কারণগুলো নিয়ে আমরা খুব একটা ভাবি না কখনো। আমাদের পৃথিবীর সভ্যতা দ্রুত উন্নত হচ্ছে। আমরা আধুনিক বিজ্ঞানের আশীর্বাদে প্রতিদিন নতুন নতুন আবিষ্কারে মত্ত হচ্ছি। নিত্যনতুন কারখানা তৈরি হচ্ছে, নতুন কারখানায় উৎপাদিত হচ্ছে নতুন পণ্য। কারখানা চালানোর জন্য প্রয়োজন হচ্ছে বিদ্যুত, গ্যাস বা জ্বালানি তেলের। যত বেশি আমরা জ্বালানি খরচ করছি তত বেশি আমরা পোড়াচ্ছি ভূপৃষ্ঠের ও-জোন স্তর। কল-কারখানার ধোঁয়া, গাড়ির ধোঁয়া, রান্নার কাজে ব্যবহৃত গ্যাসপোড়ানো ধোঁয়া, পৃথিবীর যত স্থানে তেল-গ্যাস পুড়ছে সকল ধোঁয়া মিশে যাচ্ছে এ গ্রহের বাতাসে। এই ধোঁয়া কার্বন ডাই অক্সাইডে ভরা। বাতাসের সঙ্গে বেশি করে মিশে যাচ্ছে এই কার্বন ডাই অক্সাইড। ফলে দিন দিন বাতাস উত্তপ্ত হচ্ছে, পৃথিবীর সব দেশের আবহাওয়ায় বৃদ্ধি পাচ্ছে উষ্ণতা। গরমের মৌসুমে প্রচণ্ড গরম পড়ছে, শীতের মৌসুমে কমে যাচ্ছে শীতের তীব্রতা। জলবায়ুর এমন উষ্ণতার ফলে উত্তর ও দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে শত সহস্র বছর ধরে জমে থাকা বরফ গত কয়েক বছর ধরে গলতে শুরু করেছে। সহস্র কোটি টন বরফের পাহাড় প্রতিদিন ভেঙে পড়ছে সেখানে। বরফগলা সেই জল এসে মিশে যাচ্ছে আটলান্টিক মহাসাগরে। ফলে দুই দিক থেকে উঁচু হয়ে উঠছে সাগর।
আমাদের প্রতিদিনের বর্জ্যগুলো কোথায় যাচ্ছে? এই যে একটা শহর থেকে প্রতিদিন লাখ লাখ টন মানববর্জ্য পানির সঙ্গে মিশে স্যুয়ারেজ ড্রেনে বয়ে যাচ্ছে, কোথায় যাচ্ছে এগুলো? প্রথমে যায় নদীতে, নদী থেকে ভাসতে ভাসতে সাগরে। তাতে কী হচ্ছে? সব বর্জ্য পচনশীল নয়। যেমন পলিথিন, প্লাস্টিক, অপচনশীল ধাতু। এগুলো গিয়ে সাগরের তলদেশে জমা হচ্ছে। ১০ বছর, ২০ বছর এমনকি ৫০ বছরেও এসব পদার্থ না পচে সাগরের তলদেশে পড়ে থাকছে। ফলে ধীরে ধীরে ফুলে উঠছে সাগরের তলদেশ। আমাদের বঙ্গোপসাগরের কথাই ধরা যাক। প্রতিদিন আমরা যে বর্জ্য সাগরে ফেলছি তার কারণে প্রতিদিনই সাগরের তলদেশ একটু একটু করে উঁচু হচ্ছে। এক গবেষণায় দেখা গেছে, ২০৫০ সালের মধ্যে সাগর এভাবে ভরাটের ফলে বাংলাদেশের উপকূলীয় অনেকগুলো জেলা সাগরের জলের নিচে তলিয়ে যাবে। শুধু বাংলাদেশ নয়, আমাদের বর্জ্যের ফলে এভাবে ভরাট হয়ে যাবে সাগরের তীরবর্তী পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অনেক অঞ্চল।
ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, চিলি, কলম্বিয়া,

পেরু এমন আরও কয়েকটি দেশজুড়ে বিস্তৃত পৃথিবীর সবচে বড় বনাঞ্চল অ্যামাজন। এই তো মাসখানেক আগে মানুষের লাগানো আগুনে পুড়ে গেল অ্যামাজন বনের অনেকাংশ। পৃথিবীর কত বড় ক্ষতি হয়ে গেল সেটা পৃথিবীবাসী ধারণাও করতে পারছে না। অ্যামাজন বনকে বলা হয় পৃথিবীর ফুসফুস। আমাদের শরীরের ফুসফুস যেমন বাতাস থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করে কার্বন নিঃসরণ করে, তেমনি পৃথিবীর গাছপালাও আমাদের পোড়ানো কার্বন ডাই অক্সাইড শোষণ করে আমাদের জন্য অক্সিজেনের যোগান দেয়। এই অ্যামাজন বন পৃথিবীর নিঃসরিত ২৫% কার্বন শোষণ করতো। কিন্তু ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা এবং এসব অঞ্চলের লোভী মানুষেরা কাঠের জন্য, গবাদিপশু চরানোর জন্য, ভূমিদস্যুতার জন্য প্রতিদিন উজাড় করে দিচ্ছে এই বনাঞ্চল। প্রতিদিন হাজার হাজার গাছ কেটে ফেলছে স্বার্থলোভী একদল মানুষ। তারাই বৃহদাকারে ভূমি দখলের জন্য আগুন দিয়েছিল এই বনে। লাখ লাখ শুধু নয়, কোটি কোটি গাছ পুড়ে গেছে মানুষরূপী জানোয়ারদের আগুনে। সেই আগুনে পুড়েছে বনে থাকা অসংখ্য পশু ও পাখি।

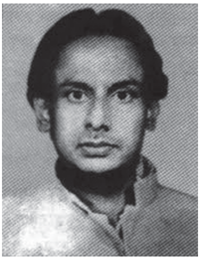
শুধু অ্যামাজন কেন, আমাদের দেশেও প্রতিদিন শত শত একর জমির গাছ কেটে নতুন নতুন কল-কারখানা গড়ে তোলা হচ্ছে। একটা কারখানা তৈরি হচ্ছে মানে সেখান থেকে প্রতিদিন আরও তেল-গ্যাস পোড়া ধোঁয়া উড়ছে, কার্বন নিঃসরণ হয়ে মিশে যাচ্ছে আমাদের পৃথিবীর বাতাসে। সে বাতাসে আরও উষ্ণ হবে জলবায়ু। উষ্ণতার কারণে গলে পড়বে এন্টার্টিকার হিমবাহ। আফ্রিকার মরু অঞ্চল আরও শুষ্ক হবে। অনাবৃষ্টির কারণে ফসল উৎপাদন কমে গিয়ে দেখা দেবে দুর্ভিক্ষ। ক্ষুধায় মারা পড়বে লাখ লাখ বনি আদম।

এই ভয়াবহ অশনি ভবিষ্যত রোধ করার ক্ষমতা মানুষ আগেই হয়তো হারিয়ে ফেলেছে। কিন্তু এখনও সবটুকু সম্ভাবনা শেষ হয়ে যায়নি। ধেয়ে আসা ধ্বংসের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মানুষের হাতে এখনও রয়ে গেছে তুরুপের তাস। খুব সাধারণ কিন্তু প্রয়োজনীয় বন্ধু–গাছ। আমাদের সভ্যতা যত উন্নত হচ্ছে, গাছের সঙ্গে আমাদের দূরত্ব ততই বেড়ে যাচ্ছে। চারদিকে কেবল দালানকোঠা, থরে থরে সাজানো ইট আর পাথরের জগদ্দল। তার মাঝে কোথাও বৃক্ষের দেখা নেই। যত ইট বাড়ছে, যত দালান বাড়ছে, যত সভ্যতা উঁচুয় উঠছে তত আমরা বৃক্ষহীন হয়ে পড়ছি। অথচ এই বৃক্ষই আমাদের ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে প্রবল প্রতাপে। পৃথিবী থেকে কার্বন শোষণ করতে একমাত্র বৃক্ষই সবচে বেশি কার্যকর।

বৃক্ষের চেয়ে নিঃস্বার্থ বন্ধু এ মুহূর্তে আর নেই। এ কারণে যত বেশি সম্ভব গাছ লাগাতে হবে। অধিক সংখ্যায় গাছ বড় করতে হবে। গাছের পরিচর্যা করতে হবে। একটা গাছ কাটলে তিনটা গাছ রোপন করতে হবে।

পৃথিবীতে কার্বন নিঃসরণ সবচে বেশি করে উন্নত দেশগুলো। আমেরিকা, ইউরোপ এবং মধ্যপ্রাচ্যের ধনী দেশগুলো অধিক হারে কার্বন নিঃসরণের জন্য দায়ী। কিন্তু কার্বনের কারণে সবচে বেশি ক্ষতি হচ্ছে আমাদের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর। বিশেষত দক্ষিণ এশিয়া এবং আফ্রিকার দেশগুলোর। এ কারণে আমাদের ক্ষতি আমাদেরই পুষিয়ে নিতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তন এবং বৈশ্বিক উষ্ণতা বিষয়ে জোরালো আওয়াজ তুলতে হবে। মানুষকে সচেতন করতে হবে এবং নিজে সচেতন হতে হবে।

আল্লাহর যে অশেষ নেয়ামত আমরা ভোগ করছি, সেটা রক্ষা করার দায়িত্বও আমাদের। আমরা শুধু মাখলুক থেকে গ্রহণই করবো কিন্তু মাখলুক যখন ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যাবে তখন তা রক্ষার দায়িত্ব আমাদের নয়–এমন অবিবেচক এবং অকৃতজ্ঞ বান্দাকে আল্লাহ কখনোই পছন্দ করবেন না।



ফররুখ-জীবনের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত

মাগুরা জেলার শ্রীপুর উপজেলার মাঝআইল গ্রামে তাঁর জন্ম ১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দের ১০ জুন। পিতা খান সাহেব সৈয়দ হাতেম আলী ছিলেন পুলিশ ইন্সপেক্টর। ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দে খুলনা জেলা স্কুল থেকে মেট্রিক পাশ করেন। ১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতার রিপন কলেজ থেকে সম্পন্ন করেন ইন্টার মিডিয়েট। তারপর স্কটিশ চার্চ কলেজে দর্শন ও ইংরেজি সাহিত্যে ভর্তি হলেও পড়াশোনা আর সম্পন্ন করেননি।

কিশোর বয়স থেকে কাব্য-চর্চার শুরু। স্কুলে পড়া অবস্থায়ই বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লেখা প্রকাশিত হতে থাকে। এবং একজন নবীন কবি হিসেবে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হন। তাঁর উন্মেষের ওই সময়টা ছিল গেল শতাব্দীর চল্লিশের দশক, তাই তাঁকে চল্লিশের দশকের কবি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ১৯৪৪ খ্রিষ্টাব্দে ২৬ বছর বয়সে প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'সাত সাগরের মাঝি' প্রকাশিত হয় এবং ব্যাপক আলোড়ন তোলে। তাঁর কবিতা ও কাব্যপ্রতিভা নিয়ে পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি শুরু হয়, এমনকি কলকাতা রেডিওতে তাঁর ওপর আলোচনা সম্প্রচারিত হয়। স্বল্পকালের মধ্যেই তিনি একজন অসাধারণ প্রতিভাবান কবি হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন।

কলকাতার আই জি প্রিজন অফিস এবং সিভিল সাপ্লাই অফিসে চাকরির মাধ্যমে কর্মজীবনের সূচনা। পরে ১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দে সাংবাদিকতা পেশায় যুক্ত হন এবং বেশ কয়েক বছর মাসিক মোহাম্মদী পত্রিকা সম্পাদনা করেন। ভারত বিভাগের পর ঢাকায় এসে রেডিও পাকিস্তানের ঢাকা কেন্দ্রে স্টাফ আর্টিস্ট হিসেবে যোগ দেন। রেডিও পাকিস্তানে ছোটদের খেলাঘর অনুষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব ছিল তাঁর ওপর।

ছাত্রাবস্থায় এম এন রায়ের র‍্যাডিক্যাল মানবতাবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে প্রথম জীবনে বামপন্থী রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করলেও ৪৭-এর দেশ বিভাগের সময়ে এই মোহ তাঁর ভেঙে যায়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সময়কালে ইসলামি আদর্শ ও মুসলিম জাগরণের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং পাকিস্তান প্রতিষ্টার পক্ষে কাজ করেন। ইংরেজ-বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলন অর্থাৎ পাকিস্তান আন্দোলন যখন প্রবল হয়, সে-সময়ে স্বাধীনতার পক্ষে গণজাগরণমূলক কবিতা লিখে তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কাঠামো ও আদর্শের প্রতি অবিচল থাকলেও ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের প্রতি তাঁর অকুণ্ঠ সমর্থন ছিল। ধর্মীয় কুসংস্কার ও পাকিস্তানের অপরিণামদর্শী রাজনীতিবিদদের বিরুদ্ধে সেসময়ে জোরদার লেখনী পরিচালনা করেন। তিনি ধর্মকে কখনো রাজনীতির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিলেন না।

'সাত সাগরের মাঝি' তাঁর প্রথম এবং সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ। এ গ্রন্থে মূলত তাঁর স্বাধীনতা-প্রীতি ও মানবতাবোধের সুস্পষ্ট বিকাশ ঘটেছে। গীতি কবিতা, মহাকাব্য, সনেট, গল্প, উপন্যাস, নাটক, সঙ্গীত, প্রবন্ধ, বেতার কথিকা, গীতি-নকশা প্রভৃতি সৃষ্টিশীল রচনায় তিনি নৈপূণ্য প্রদর্শন করেন। তবে কবিতা রচনায় তিনি অধিক

স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেছেন।
প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা ১৫। ১. সাত সাগরের মাঝি (১৯৪৪)। ২. আজাদ কর পাকিস্তান (১৯৪৬)। ৩. সিরাজম মুনীরা (১৯৫২)। ৪. নৌফেল ও হাতেম (১৯৬১)। ৫. মুহূর্তের কবিতা (১৯৬৩)। ৬. হাতেম তা'য়ী (১৯৬৬)। ৭. হে বন্য স্বপ্নেরা (১৯৭৬)। ৮. ইকবালের নির্বাচিত কবিতা (১৯৮০)। ৯. কাফেলা (১৯৮০)। ১০. হাবেদা মরুর কাহিনী (১৯৮১)। ১১. তসবির নামা (১৯৮৬)। ১২. দিলরুবা (১৯৯৪)। ১৩. ঐতিহাসিক অনৈতিকহাসিক কাব্য (১৯৯৪)। ১৪. অনুস্বার। ১৫. ধোলাই কাব্য।
কাব্য নাটক রচনার ক্ষেত্রে মুসলিম কবিদের মধ্যে তিনিই পথিকৃৎ। তাঁর 'নৌফেল ও হাতেম' একটি সফল কাব্য নাটক। সনেট রচনায়ও তিনি সবচেয়ে বেশি সাফল্য অর্জন করেছেন। সম্ভবত, বাংলা সাহিত্যে মাইকেলের পর সংখ্যায় এত বেশি সনেট হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে আজ পর্যন্ত আর কেউ রচনা করতে পারেননি। ফররুখের পূর্ণাঙ্গ সনেট গ্রন্থের মধ্যে 'মুহূতের কবিতা', 'দিলরুবা', ও 'অনুস্বার' প্রধান। মুহূর্তের কবিতায় ৯৪টি, দিলরুবায় ৪৯টি, অনুস্বারে ৮৫টি, সিরাজম মুনিরায় ১০টি, সাত সাগরের মাঝিতে ৭টি, আজাদ করো পাকিস্তানে ১টি এবং হাতেমতা'য়ীতে বেশ কিছু সনেট রয়েছে। তাঁর সমগ্র রচনা প্রকাশিত হলে হয়তো সমগ্র সনেট সংখ্যার হিসাব পাওয়া যাবে। 'রাত্রি' নামে একটি সনেট রচনার মধ্যদিয়ে তাঁর কাব্য জীবনের সূত্রপাত হয়েছিল এবং ১৯৭৪-এ 'একটি আলেখ্য' সনেটটি রচনার মধ্যদিয়ে সে জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটেছিল।
ব্যঙ্গ কবিতা রচনার ক্ষেত্রেও বেশ সফলতা দেখিয়েছেন তিনি। প্রায় ১৫টি ছদ্মনামে এসব ব্যঙ্গ কবিতা রচিত হয়েছে। স্বনামেও লিখেছেন প্রচুর। ব্যঙ্গ কবিতা গ্রন্থের মধ্যে অনুস্বার (ব্যঙ্গ সনেট), ঐতিহাসিক অনৈতিহাসিক কাব্য, তসবির নামা এবং ধোলাই কাব্য উল্লেখযোগ্য। 'হাবেদা মরুর কাহিনী' গদ্য কবিতা গ্রন্থ। গদ্য কবিতা রচনায় তিনি যে সিদ্ধহস্ত ছিলেন এটা তার স্বাক্ষর বহন করে। শিশু-কিশোরদের জন্যও প্রচুর ছড়া-কবিতা লিখেছেন। এসব ছড়া-কবিতা খুব জনপ্রিয়তাও পেয়েছিল। এ ছাড়া নয়া জামাত (১ম ভাগ, ২য় ভাগ, ৩য় ভাগ, ৪র্থ ভাগ) নামে শিশু-কিশোরদের উপযোগী চারটি পাঠ্য পুস্তক রচনা করেন, যা ১৯৫০ সালে প্রকাশিত হয়।
মূলত কবি হলেও বেশ কিছু স্বার্থক গল্পও লিখেছেন তিনি। এর মধ্যে 'প্রচ্ছন্ন নায়িকা', 'মৃত বসুধা', 'বিবর্ণ' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তাঁর এসব গল্প 'ফররুখ আহমদের গল্প' নামে আবদুল মান্নান সৈয়দের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে। সিকান্দার শা'র ঘোড়া নামে একটি উপন্যাস রচনায়ও তিনি হাত দিয়েছিলেন কিন্তু শেষ করে যেতে পারেননি।
ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বেশকিছু প্রবন্ধও আছে তাঁর। আছে ভাষা বিষয়ক কিছু কবিতাও, যা রেডিওতে নিয়মিতভাবে প্রচার হতো। কবিতা রচনার পাশাপাশি অসংখ্য হামদ, নাত, দেশাত্মবোধক সংগীত, প্রেম ও ভক্তিমূলক গান এবং আধুনিক বাংলা সংগীত রচনা করেন। মানের দিক থেকে এ গানগুলো প্রশংসনীয় ও জনপ্রিয় ছিল। এক সময় বেতার ও টিভিতে খ্যাতনামা শিল্পীদের কণ্ঠে এগুলো নিয়মিত প্রচার হতো।
সাহিত্যকর্মের স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯৬০ সালে বাংলা একাডেমী পুরস্কার, ১৯৬১ সালে প্রেসিডেন্ট পুরস্কার 'প্রাইড অব পারফরমেন্স', ১৯৬৬ সালে আদমজী পুরস্কার এবং একই বছরে ইউনেস্কো পুরস্কার লাভ করেন। ভাষা আন্দোলনে তাঁর অবদানের যথার্থ স্বীকৃতি দেয়া হয়নি। উপরন্তু বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর ঢাকা বেতারের চাকরি থেকে তাঁকে বরখাস্ত করা হয় এবং সরকারি বাসা ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়। অবশ্য বিভিন্ন মহল থেকে এর প্রতিবাদ করার ফলে শেষ পর্যন্ত তাঁকে বাসা ছাড়তে হয়নি। ইস্কাটন গার্ডেনের সে সরকারি বাসাতেই অনাহারে অর্ধাহারে এবং বিনা চিকিৎসায় ১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে মুসলিম জাগরণের এ মহাকবি একবুক কষ্ট আর বঞ্চিতি ও অবমূল্যায়নের সীমাহীন যাতনা নিয়ে পৃথিবীকে শেষ বিদায় জানান। ১৯ অক্টোবর কবির ৪৫তম মৃত্যুবার্ষিকী। তাঁর প্রতি সশ্রদ্ধ সালাম।

ইন্টারনেটে অবলম্বনে সাজিয়েছেন হামমাদ রাগিব



ফররুখ কেন প্রাসঙ্গিক

সালেহ ফুয়াদ

মানবজীবনে কবিতা যে কারণে প্রাসঙ্গিক, সাহিত্য যে কারণে জীবনের অংশ, বলতে গেলে একই কারণে ফররুখ আহমদও বাংলাসাহিত্যে প্রাসঙ্গিক। মানুষ উদ্দেশ্যহীনভাবে কিছুই করে না। শুধু মানুষ কেন, অবুঝ প্রাণীও বোধহয় লক্ষ্যহীন নয়। তবে ফারাক আছে। সব কাজের মতো সাহিত্য সৃষ্টিরও লক্ষ্য থাকা চাই। চাই আদর্শবোধ। আদর্শবাদী লেখক ছাড়া আরেক প্রকার সাহিত্যিক প্রাণী আছে, যারা স্বার্থবাদী, সুবিধাবাদী। আদর্শহীনতার কারণে আমাদের উদীয়মান সাহিত্যকর্মীদের প্রবীণদের বিরুদ্ধে নীতিহীনতার অভিযোগ তুলতে দেখি। দুঃখজনক হলো, এই অভিযোগকারীরাই আবার প্রতিষ্ঠা লাভের পর ফেলে যাওয়া সাপের খোলসে গা ডুবিয়ে বসে পড়েন। কারণ একটাই; আদর্শবোধ নেই, নেই বিশ্বাস।

বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্র-নজরুল অধ্যায়টা মোটেও এমন ছিলো না। আরো আগে, বঙ্কিমও বিশ্বাস স্থির করার কথা বলে গেছেন। আর তাঁর এ কথার বিরুদ্ধে শক্তি যুগিয়েছেন যিনি তিনি প্রমথ চৌধুরী। প্রমথ চৌধুরীকে সফলতার সাথে অনুসরণ করেছেন বুদ্ধদেব বসু। এঁদের কাছে সাহিত্য স্রেফ রসের নাম। প্রমথ চৌধুরী সাহিত্যকে দেখেছেন 'খেলা' হিসেবে। এ খেলায় যদি নীতিকথা, বিশ্বাস বা সমাজচেতন আসে, তাহলে খেলা হয়ে যায় জুয়াখেলা। খেলোয়াড় হোন জুচ্চোর। বাংলা কবিতায় তিরিশি কবিদের কেউ কেউ কোনো রকম আদর্শবোধ ছাড়াই, শুধু রোমান্টিকতায় ভর করে বাংলা কবিতায় বিপ্লব ঘটিয়ে গেছেন। আমার আলোচনা পরের দশকের একজন কবিকে নিয়ে।

চল্লিশের দশকটাই এমন যে, এখানে কবিকে সমাজ জীবনে যুক্ত না হয়ে উপায় ছিল না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা আর দেশভাগ কবিদের আদর্শবাদী বা বিশ্বাসী করে তুলেছিল। রোমান্টিকতার পাশাপাশি সমাজচেতন আর স্বতন্ত্র সংস্কৃতিচেতনমূলক কবিতাও তাঁরা উপহার দিয়েছেন।

চল্লিশের দশকে কবিতার প্রধান তিনটি ধারার সৃষ্টি হয়েছিল। রোমান্টিক কবিদের মধ্যমণি ছিলেন বুদ্ধদেব বসু ও তাঁর প্রবাদপ্রতিম কবিতা পত্রিকা। সমাজচেতন কবিদের অগ্রজ ছিলেন বিষ্ণু দে। দূর-অগ্রজ ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। এঁদের প্রধান মুখপত্র ছিল সুধীন্দ্রনাথ পরিত্যক্ত নবভূত পরিচয় ও সাহিত্যপত্র। এ ধারার কবিদের মধ্যে ছিলেনড় সুকান্ত ভট্টাচার্য, বিমলচন্দ্র ঘোষ, সমর সেন, সিকান্দর আবু জাফর, সানাউল হক, আবুল হোসেন ও আহসান হাবীবসহ অনেকে। অন্যদিকে স্বতন্ত্র সংস্কৃতিচেতন কবিতার ধারাটির কেন্দ্রীয় উৎসে ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম।

সওগাত ও মোহাম্মদী ছিল এঁদের প্রধান পত্রিকা। এ কবিগোষ্ঠীতে ছিলেন সৈয়দ আলী আশরাফ, তালিম হোসেন, মুফাখখারুল ইসলাম ও সৈয়দ আলী আহসান প্রমুখ।
এ সকল কবির সবাই একেক ধারায় থাকলেও একা তিন ধারাতেই লিখেছিলেন যিনি, তিনি এ দশকের সবচেয়ে সফল ও প্রধানতম কবি ফররুখ আহমদ। তিনটি ধারাতেই তিনি ছিলেন সামর্থবান সাহসী শক্তিশালী ও ফসলী। তাঁর হাতে সমাজচেতনার সঙ্গে মিশেছিল অমর রোমান্টিকতা। তবে স্বতন্ত্র সংস্কৃতিচেতন ধারার কবিতায় তাঁর আগ্রহ ছিল বেশি। ইসলামের ঐতিহ্য ও বহিরাঙ্গ তাঁকে দারুণ মুগ্ধ করেছিল। ইসলামিচেতন ধারায় তাঁকে আধ্যাত্মিকতা ভর করতে পারেনি। মার্কসবাদে বিশ্বাসী একসময়ের ফররুখ আহমদ নানা বোঝাপড়া, তর্কাতর্কি আর নিজের সঙ্গে রক্তপাত ঘটিয়ে জাহাজ ভেড়ান ইসলামের বন্দরে। শুধু কবিতায় নয়, জীবনে চলার প্রতিটি মুহূর্তের জন্যও ইসলামকে গ্রহণ করেছিলেন।
অনমনীয়, নিরাপোষ, স্পষ্টবাদী এ কবি বাঙালি মুসলমানদের পুনর্জাগরণের ডাক দিয়েছিলেন। স্বাপ্নিক কবি ইসলামি রাষ্ট্রের স্বপ্ন ভঙ্গের উপর ক্ষোভ নিয়ে তীব্রভাবে ব্যঙ্গ করে লিখেছিলেন রাজ-রাজড়া নাটকটি। সমাজের অসঙ্গতি, ধর্মের নামে দাঙ্গা সৃষ্টির পর বন্ধু, নিজের রক্ত কবিতা লিখেছেন আর্তকবি। এক সময়ের মার্কসবাদী কবি সমাজচেতনার পাত্র বদল করে একটি আদর্শে শিখায়িত হন নিজের বহু কবিতায়। বিশেষত নৌফেল ও হাতেম (১৯৬১) কাব্যনাট্যে। আরব্যোপন্যাস থেকে ফররুখ যে উপকরণ দু'হাত ভরে নিয়েছিলেনড়তাঁর লক্ষ্য ছিল বিপর্যস্ত মানবতার পুনঃনির্মাণ।
হাতেম তায়ী মুসলমান ছিলেন না অথচ সে হাতেমই হলেন নৌফেল ও হাতেম কাব্যনাট্যের নায়ক। পুঁথি ঘেঁটে, সমালোচিত হয়ে হাতেমকেড়একজন অমুসলিমকে তুলে এনেছেন শুধুই মানবতার পুণনির্মাণের জন্য। মানবতার; মানে শুধু মুসলমানদের জন্যই নাড়হিন্দুসহ সকল মানুষের জন্য। তবে অধঃপতিত বাঙালি মুসলমানেরা তাঁর কবিতার সবচে' কাছের সম্বোধিত ছিল। সবাইকে আহ্বান করেছেন; বাঙালি মুসলমানের কানে করেছেন বজ্রপাত। ঘুম ভাঙাবার জন্য, খুন করার জন্য নয়।
চল্লিশের দশকে ফররুখ চারপাশে যে পঁচন দেখেছিলেন সে পঁচন এখনো জারি আছে। পঁচন থেকে সমাজ ও মানবতাকে বাঁচানোর জন্য ফররুখ চির প্রাসঙ্গিক। যদি কেউ চায় এ পথে তাঁর কবিতায় মুক্তি পেতে, তাহলে তো মুক্তি পাবেই; বাংলাসাহিত্যে এই একমাত্র ব্যক্তি, যদি কেউ চায় তাঁর জীবন সামনে নিয়ে বুজুর্গ হতেড়নিঃসন্দেহে এতেও কেউ কানাগলিতে পা দেবে না। অতি আলোয় উদ ৬াসিতড়চোখ খোলা যায় না, এমন পথ না পেলেও সূর্যসকালবিধৌত সরল পথটি তাঁর জীবন থেকে যে কেউ পেতে পারে। অন্য কোনো বাঙালি কবির এ গুণ নেই হলফ করে বলা যায়।
ফররুখের কাব্যবিশ্বাস কবিতার মূল্যে উত্তীর্ণ হয়েছিল। যদিও বিশ্বাস কবিতা নয়, তবে বিশ্বাসহীন কবিতা সোনার পাথরবাটির মতো। তাঁর এ বিশ্বাস শিল্পমূল্যে উত্তীর্ণ। প্রথম কাব্য সাত সাগরের মাঝিতেই সে মূল্য তিনি অর্জন করেছিলেন।
ফররুখগবেষক কবি আবদুল মান্নান সৈয়দ লিখছেনড়'বিস্ময়কর চিত্রকল্প, অক্ষরবৃত্ত ও ছয়মাত্রার মাত্রাবৃত্ত ছন্দ, ধ্বনিময় আরবি-ফারসি শব্দ, আরব্যোপন্যাসের আশ্চর্য জগতের পুনর্নির্মাণ ও তার নতুন অন্তরাখ্যান বাঙালি-মুসলমানের জাতিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রকাশড়সমস্ত মিলিয়ে সাত সাগরের মাঝি শুধু ফররুখের নয়, চল্লিশের কবিদেরই এককভাবে শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ।' (ফররুখ আহমদ : জীবন ও সাহিত্য, আবদুল মান্নান সৈয়দ।)
প্রাথমিক ফররুখকে অগ্রজ কবি শামসুর রাহমান পূর্ববাংলার সাম্প্রতিক কবিতা নামক প্রবন্ধে মূল্যায়ন করেন এভাবেড়'ফররুখ আহমদ সেসব বিরল কবিদের অন্যতম যাঁরা খুব অল্প দিনেই অনুকারকের দল সৃষ্টি করেন।'

লেখক : তরুণ গল্পকার ও অনুবাদক। ছাত্র, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া



ফররুখের সিরাতসাহিত্য

যিয়াদ বিন সাঈদ

বাংলা সাহিত্যের আধুনিক কাব্যধারায় ইসলামের গৌরব মহিমা পুনরুদ্ধার এবং মুসলিম পুনর্জাগরণের স্বপ্ন বাস্তবায়নের শ্রেষ্ঠ রূপকার বলা যায় কবি ফররুখ আহমদকে। মুসলিম রেঁনেসার এই কবি সকল জড়তা পায়ে দলে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত মানুষের অনাহার ক্লিষ্টের জরাগ্রস্ত বাস্তবতা এবং সাম্প্রদায়িকতার ভয়াবহ হিংস্রতা দেখে জেগে উঠবার অনন্য ইশতেহার দিয়ে গেছেন যেমন করে, তেমনই খোদাপ্রীতি আর ইশকে রাসুলের অসামান্য দৃষ্টান্তও এঁকে গেছেন না'ত কিংবা কবিতার পাতায় পাতায়। উল্লেখযোগ্য উপষঙ্গগুলোর সাথে সাথে চর্চায় এসেছে সিরাতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম। এমনকি তাঁর কবিতায় সিরাতের উপস্থিতি এতটা বিস্তৃত পরিসরে দেখা গিয়েছে, চলমান সময়ে নানাবিধ বিচারে অবশ্যই তা তুলনাহীন নজির। আদর্শিক লড়াইয়ের প্রশ্নে একেবারে সুসংহত থেকে হাতেগোনা যে কলমগুলো পরিচালিু হতে পেরেছে সেসবও ফররুখ আহমদের এসব কর্মের কাছে পরাজিতমুখ। 'সিরাজাম মুনিরা' আর 'সাত সাগরের মাঝি'র সঙ্গে কুলিয়ে ওঠার সাহসিকতাও কি কারো ছিলো কোনো কালে? বয়ে গেছে ছন্দের তালে নবিপ্রেমের অজস্র ঝিরিপথ। দেখিয়েছেন কবিতায় কীভাবে চর্চিত হতে পারে সিরাতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম। জন্ম থেকে শুরু করে জীবনের খণ্ড খণ্ড অধ্যায় ফুটে এসেছে অপরূপ সৌন্দর্যে।
নবিজি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের জন্মের কিছু আগে দুলে ওঠা তাবৎ পৃথিবীর আগমনী বার্তা দিয়ে হুল্লোড় খেলে যাওয়ার প্রসঙ্গে লিখেছেন তিনি–'কে আসে কে আসে সাড়া পড়ে যায়, কে আসে কে আসে নতুন সাড়া/ জাগে সুষুপ্ত মৃত জনপদ জাগে শতাব্দী ঘুমের পাড়া/ হারা সম্বিত ফিরে দিতে বুকে তুমি আনো প্রিয় আবহায়াত/ জানি 'সিরাজাম মুনিরা' তোমার রশ্মিতে জাগে কোটি প্রভাত।'
তারপর যখন এ পৃথিবীতে উদ্ভাসিত হলো নতুন এক সূর্য, এলেন নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম, কবি সে সময়ের শান্তির জয়গানের সঙ্গে মুখ মিলিয়ে লিখলেন–'তুমি না আসিলে মধুভাণ্ডার ধরায় কখনো হতো না লুট/ তুমি না আসিলে নার্গিস কভু খুলতো না তার

পত্রপুট।'
সিরাতের ক্রমধারায় তারপর চর্চায় এলো জীবনের নানাদিক। যে লক্ষ্য নিয়ে মহান রাব্বে কারিম প্রেরণ করেছিলেন তাঁর এই মহান দূতকে, সে মহাবাণী আল কোরআন নাজিল হবার প্রসঙ্গেও কবি ফররুখ লিখলেন। ধ্যানমগ্ন হেরাগুহার উজ্জ্বল নুরের বিচ্ছুরণ এবং কোরআনের মোজেযায় উদ্ভাসিত নবিজিকে নিয়ে পাঠ করলেন–'প্রবল বাহুতে টেনে নিয়ে ঐ বিরাট নিখিল ভরানো দিল/ বলে, 'পাঠ করে' ফুকারে বিশাল দীপ্ত বক্ষ জিবরাইল।'
কিন্তু নবীজির এই আগমন মেনে নিতে পারলো না লাত মানাত আর উযযার পূজায় মত্ত মক্কার মুশরিক কুরাইশ। অন্যায়ের সীমা পেরিয়ে গেলো যখন, নবিজি চললেন দূর মদিনার পথে। সেখানকার আনসারেরা অভূতপূর্ব সাড়া দিয়ে বরণ করলেন নবিজিকে। এ প্রসঙ্গেও কবি লিখছেন–'সেদিন পূর্ণ মাটির মানুষ আনলে যে দান পূর্ণতার/ আরব ঊষার নিখিল চিত্তে আজও সে জাগায় গুলে আনার/ মক্কার মরু নিল না তোমার প্রাণ রসে ভরা, আবহায়াত/ দূর ওয়েসিস পারে, মদিনার দরদি আকাশ বাড়ালো হাত।
অপরদিকে সাহাবিদের নিঃস্বার্থ সাড়াদানের ঘটনাও তাঁর কবিতায় এসেছে যথাযথ মর্যাদায়। কেননা সাহাবায়ে কেরাম হিজরতের এই আদেশ মেনে সম্পদ, সন্তানসন্ততি আর ঘর সংসারের মোহ ছেড়ে হুট করে মদিনার পথে যেভাবে ছুটে চলেছিলেন তা অবশ্যই নবিপ্রেমের তাগিদে ত্যাগ ও বিসর্জনের মহাদৃষ্টান্ত। ফররুখ এ কারণেই লিখেছেন সে মানুষদের নিয়ে–'গলেছে পাহাড়, জ্বলেছে আকাশ, জেগেছে মানুষ তোমার সাথে/ তোমার পথের যাত্রীরা কভু থামেনি চরম ব্যর্থতাতে/ তাই সিদ্দিক পেয়েছে বক্ষে অমন সত্য সিন্ধু দোল/ তাই উমরের পাতার ডেরায় নিখিল জনেরও কলরোল।
সর্বোপরি নবিজীবনের নানা ঘটনা-উপঘটনাকে কেন্দ্র করেই ফররুখের সিরাত-সাহিত্য ভরপুর সমৃদ্ধি অর্জন করতে পেরেছিল। নবিজির আগমন, নবুওয়তের ঘোষণা, কোরআন নাজিল আর এসবকে কেন্দ্র করে নিজ বংশ-গোত্রের আক্রোশ, এমনকি হত্যার অপচেষ্টা–সবই খণ্ড খণ্ডভাবে উল্লেখ আছে। এ ছাড়া মদিনায় হিজরত-পরবর্তী বদর-ওহুদ যুদ্ধ এবং শান্তিকামী এ জনগোষ্ঠীকে মুছে দেয়ার জন্য আবু জাহেলদের কূটকর্ম-সহ মদীনার দিনরাত, বিলালের দিকদিগন্ত বিস্তৃত আজানের ধ্বনিও ফররুখের কবিতায় প্রতিধ্বনিত হয়েছে।
এসেছে নবিজীবনের সবচাইতে বেশি সান্নিধ্য লাভ করা খুলাফায়ে রাশেদদিনের অমোঘ বর্ণনা। নবিজির সুখ কিংবা দুঃখে, সবখানে যে ছায়ামূর্তিটি ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থাকতেন, সে আবু বকরকে (রাদিয়াল্লাহু আনহু) নিয়ে কবি দিয়ে গেছেন সওর পর্বতের অন্ধকার রজনীতে নবিপ্রেমের সুনিপুণ বর্ণনা। লিখেছেন–'দরদির বুকে প্রেম সমুদ্র বিরাট, স্নেহের সেকি পাহাড়/ নিল সে তনুতে সাপের ছোবল, নিল সে আঘাত অত্যাচার/ সেই সমব্যথী হেসে নেয় দেহে বিষদংশন বিষের চুম/ তার বিশ্বাসী কোলে বিশ্রান্ত নবিজির যেন ভাঙে না ঘুম।'
চারিত্রিক ঐশ্বযের বয়ানে হজরত আবু বকরকে খেতাব করে বলেছেন–'নিজ সত্তার পরিচয় তুমি জেনেছ কি নিভৃতে/ তাই কি পেয়েছ নিজের চিত্তে অমনি বিলায়ে দিতে?/ তাই কি মাটিতে মিশায়েছ অহমিকা?/ তাই কি পেয়েছ ওই দুর্লভ মানুষের জয়টিকা?'
অপরদিকে হজরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে নিয়ে বর্ণিত 'উমর দরাজ দিল'ও যেন ইশকের এক দরিয়া। সমাত্রিক আল্পনায় কী মায়ার খেলা এখানে। মানবতার জন্য নিবেদিত অর্ধজাহানের এ খলিফাকে নিয়ে লিখেছেন কবি–'দেখি সে চলেছে মরু মুসাফির কোথায় কে জানে/ পিঠে বোঝা নিয়ে মৃত বিয়াবান ছাড়ায়ে কী টানে।/ চলেছে সে দূরে ভৃত্যের সাথে মরু পথে/ চলেছে সে দূরে ভৃত্যের সাথে মরু পথে।'
সেই সাথে কবি কলুষতায় ভরপুর এ সমাজকে বিনির্মাণের প্রত্যাশায় কামনা করেছেন উমরের মতো কোনো মহান সত্ত্বার আগমন। কেননা এ রাষ্ট্র, সমাজ এবং বিশ্ব পালটে যেতে পারে এমন কোনো আবির্ভাবের মধ্য দিয়েই। বলেছেন–'আজকে উমরপন্থী পথীর

দিকে দিকে প্রয়োজন/ পিঠে বোঝা নিয়ে পাড়ি দেবে যারা প্রান্তর প্রাণপণ/ বন্ধু তোমার দারাজ হস্তে শিলাদৃঢ় যে আইন/ তার সম্মুখে সমান কাতারে খলিফা ও মিসকিন/ সূর্য প্রখর ন্যায় রশ্মিতে নাই তিল অন্যায়/ সকলে সমান নবিজির দেওয়া সে বিধান বন্যায়।'

তেমনি হজরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু'র মতো মহার্ঘ্য ব্যক্তি যিনি ভূষিত ছিলেন 'যিননুরাইন' উপাধিতে, তাঁকে নিয়েও কবি রচনা করেছেন 'ওসমান গনি'। অকাতরে সম্পদ ব্যয় আর নবীর জন্য ত্যাগের যুদ্ধে অপরাজিত এ মহান মানুষকে নিয়ে বলেছেন–'সত্যের পতাকা দেখ ওড়ে নভে বিপুল সম্মানে/ শাহি বালাখানা কার মুক্ত হলো অকৃপণ দানে?/ ওগো শ্রেষ্ঠ ধনী/ সে তোমারি ওসমান গনি!/ যার অফুরন্ত দানে জনপদে বেড়েছে সুষমা/ জীবনের শেষে কড়ি প্রয়োজনে রাখো যে জমা।'

হজরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু'র পরিচয়ও তাঁর কবিতায় চিরভাস্মর। মহান এ খলিফার অনন্য সাহসের তারিফ কে না জানে! ফররুখও লিখছেন তাই–'পাহাড়ে পাহাড়ে তাহার গর্জন জাগে মরু প্রান্তর/ আলী হায়দর আলী হায়দর আসে আলী হায়দর।/ শামাদানে জ্বলে প্রেমের শিখায় বেদনায় অবগাহি/ কোটি মুসলিম পেয়েছে ফিরিয়া চিত্তের বাদশাহী!'

সেইসাথে তাঁর কবিতায় নবিপ্রেম ও সিরাত চর্চার প্রধানতম ক্ষেত্র তৈরি করে নিয়েছে নবিজির সৌভাগ্যবান আত্মীয়দের দিকে ছুড়ে দেয়া কবিতার অসংখ্য পঙক্তি। সাইয়িদা শাবাবি আহলিল জান্নাহ হজরত হাসান ও হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুমাকে নিয়ে তাঁর কবিতার ভাষা ও রাগ অনুরাগের ফিরিস্তি এটা নিশ্চিত সাব্যস্ত করতে সক্ষম হবে যে কী পরিমাণ ভালোবাসা তাঁর ভেতরে কাজ করেছে। কারবালার রক্তক্ষয়ী ঘটনা তাঁর ভেতর কী জ্বলুনি তৈরি করেছে তাও একেবারে স্পষ্ট হয়ে আছে। যেমন লিখেছেন হজরত হোসাইনকে নিয়ে–'হোক দুশমন অগণন তবু হে সেনানী, আজ দাও হুকুম/ মৃত্যু সাগরে ঝাঁপ দিয়ে মোরা ভাঙব ক্লান্ত প্রাণের ঘুম।'

কিন্তু আশ্চর্যজনক সত্য হলো সিরাত সাহিত্যে কবি ফররুখ আহমদের কবিতার এ বিস্তৃত পাঠ আমাদেরকে বরাবের মতো আপ্লুত করলেও কবি যেন তারপরও অতুষ্ট, অসন্তুষ্ট, অতৃপ্ত। সিরাতের জন্য জীবনকে উৎসর্গ করে যতক্ষণ না তিনি বলতে পারতেন–'কুল্লুনা ফিদাকা ইয়া রাসুলাল্লাহ', ততক্ষণই হয়তো চলত কবিতায় নবিপ্রেমের বয়ান। ব্যপ্ত হতো সিরাতসাহিত্যের নির্মল আঙিনা। সৈয়দ আলী আহসান কবি ফররুখ আহমদের সিরাতসাহিত্যে তুমুল আগ্রহের কথা জানিয়ে লিখেছিলেন–'কলকাতায় থাকতে ফররুখ মহানবির (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম) জীবনী নিয়ে দীর্ঘ কবিতা লেখার কথা আমাকে বলেছিলো। মনে আছে সে যে পরিকল্পনা করেছিলো তা অনেকটা এমন– মহানবির জন্ম যখন হলো, একই সময়ে তখন ইরানের অগ্নিপূজকদের শাশ্বত অগ্নি নির্বাপিত হয়ে গেলো আর জামসিদের পানপাত্র ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেলো। উল্লাস জেগেছিল ফেরেশতাকুলের মাঝে। কেননা আবির্ভাব হচ্ছে এক মহান পুরুষের। এরকম নানা বিষয়কে উপজীব্য করে বর্ণাঢ্য নবিজীবনের একটি দীর্ঘ বর্ণনা ফররুখ দিতে চেয়েছিল। কিন্তু সে সুযোগ তার ভাগ্যাকাশে উদিত হয়নি।'

সে কাজ তাঁর হাতে না হলেও যে কাজ হয়ে গেছে, এ অবিস্মরণীয় অবদান ভুলে যাবার মতো? অবশ্যই না। সিরাত সাহিত্যে অতুলনীয় দৃষ্টান্ত রেখে যাওয়া এ মহান কবি নিজ আদর্শের ওপর পরিপূর্ণ জমে ছিলেন আমৃত্যু। আদর্শ প্রচারের প্রয়াস যেমন তাঁর কাব্যকলা ব্যহত করতে পারেনি ঠিক তেমন তাঁর কবিতার চর্চা সঠিক ও সুন্দর আদর্শে সামান্য কালিমাও লিপ্ত করতে পারেনি। সিরাতে সিরাতে কীভাবে চলে কবিতার গতি প্রকৃতি এবং কবিতা যে হতে পারে নবিপ্রেমের অনন্য মাধ্যম, সে তা'রিফ আমাদেরকে শিক্ষা দিয়ে গেছেন যে মানুষটি, তিনি ইসলাম ও মুসলমানের কবি, কবি ফররুখ আহমদ।

লেখক : শিক্ষার্থী, মাদরাসাতুল কাউসার আল ইসলামিয়া, ঢাকা



ফররুখের নজরুল-ভাবনা

রাকিবুল হাসান

কাজী নজরুল ইসলামের যখন সাহিত্য-জীবনের শেষ, ফররুখ আহমদের তখন শুরু। নজরুলের আবির্ভাব প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অস্থিরতা, খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের সময়। বিপরীতে ফররুখের আবির্ভাব দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের তাণ্ডব, পাকিস্তান আন্দোলন, দুর্ভিক্ষের নিদারুণ হাহাকারের সময়। ফলত দুজনের দৃষ্টিভঙ্গিতে আমরা একটা পার্থক্য দেখতে পাই। নজরুল সম্বন্ধে ফররুখের মনোভাব কতটা মিষ্টি কিংবা কতটা তিক্ত, সমালোচকগণ বারবার সে বিষয়ে আলোচনা করেছেন। কেউ ফররুখের মানস বিচার করে কথা বলেছেন, কেউ মানস বিচার না করেই কথা বলেছেন। এই লেখায় একটু খোলাসা করার চেষ্টা করবো নজরুলকে নিয়ে কীভাবে ভাবতেন ফররুখ।

ফররুখ-নজরুল তুলনা

তুলনা এবং প্রতিতুলনা আমাদের জাতীয় সমস্যা। এই সমস্যার শিকার ফররুখ আহমদ। কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গে ফররুখ আহমদকে কেউ তুলনা করেন, কেউ তুলনার ধার ধারেন না। যাঁরা তুলনার নিক্তিতে মাপতে চান, তাঁদের কেউ বলেন, ফররুখ নজরুলের উত্তরাধিকারী। কেউ বলেন, ফররুখ কবিতায় নজরুল ইসলামকে ছাড়িয়ে গেছেন। আর কারও কারও কাছে তুলনার কোনো সুযোগ নেই। দুজন দুই মেরুর বাসিন্দা। আসলেই কি তাই? ফররুখের ওপর নজরুলের কোনো প্রভাব নাই? নজরুলকে কি উপেক্ষা করতে পেরেছেন ফররুখ?

এক নিবন্ধে কবি আবদুল কাদির লিখেছিলেন, 'ফররুখ আহমদের ওপর যদি কোনো আধুনিক কবির প্রভাব থাকে, তিনি নজরুল ইসলাম। যদিও দুজনের মধ্যে পার্থক্য বিস্তর এবং সে পার্থক্য মৌলিক। উভয় কবিই মুসলমানের পুনরুজ্জীবন কামনা করেন আর উভয়েই রোমান্টিক। নজরুল গণতান্ত্রিক কবি, আর ফররুখ ধর্মবাদী।'

ফররুখ পাকিস্তান আন্দোলনের কঠিন সমর্থক ছিলেন। লিখেছিলেন 'কানমে বিড়ি মুহমে পান/লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান।' এইজন্যই বোধহয় আবদুল কাদির তাঁকে ধর্মবাদী বলেছেন। কিন্তু আমাদের দেখার বিষয় হলো ফররুখের লেখায় নজরুলের প্রভাব। কাদিরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু মুহম্মদ এনামুল হকও বলেছেন, 'নজরুলই ফররুখের গুরু, ইংরেজিতে 'মাস্টার'।'

ফররুখের কবিতায় আরবি, ফার্সি এবং উর্দুর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু ফররুখ উর্দু পারলেও, আরবি-ফার্সি জানতেন না। এজন্যই ইকবালের কবিতা তিনি ইংরেজি মাধ্যম থেকে অনুবাদ করেছেন। কিন্তু নজরুল আরবি-ফার্সি জানতেন। মূল থেকে অনুবাদ করেছেন হাফিজ, ওমর খৈয়াম, আমপারা। ফররুখ যতটুকু আরবি-ফার্সি ব্যবহার করতেন, তা পড়ে পড়ে একটু-আধটু শিখেছেন। নজরুল ইসলামের কবিতা থেকেও।

মোহাম্মদ মাহফুজুল্লাহ লিখেছেন, 'তাঁর কবিতায় আরবি-ফার্সি শব্দের ব্যাপক ব্যবহার দেখে অনেকের ধারণা ফররুখ আহমদ বুঝি আরবি-ফার্সি খুব ভালো করে জানতেন। কিন্তু আমি ফররুখের নিজের মুখে শুনেছি, তিনি এসব আহরণ করেছেন প্রধানত পুঁথি থেকে, প্যারীচাঁদ মিত্রের আলালের ঘরের দুলাল, নজরুল ইসলামের কবিতা, প্রমথ চৌধুরীর গদ্য এবং অন্যান্য রচনাবলী পাঠ করে।' (মাহফুজুল্লাহ ১৯৭৮ : ১৮২)

এর থেকে প্রতীয়মান হয়, ফররুখের জাগরণী কবি-সত্তার বেড়ে ওঠায় নজরুলের একটা প্রভাব আছে। সেটা আমরা অস্বীকার করি কিংবা স্বয়ং ফররুখ।

ফররুখের নজরুল ভাবনা

১৯৫৯ সালে আবদুল কাদির সম্পাদিত 'নজরুল পরিচিতি' গ্রন্থে ফররুখ আহমদের 'নজরুল সাহিত্যের পটভূমি' শিরোনামে একটা নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই নিবন্ধে ফররুখ নজরুলকে দেখেছেন আশা-জাগানিয়া এবং ঐতিহ্যের পরিচয়দানকারী হিসেবে। তিনি লিখেছেন, 'খিলাফত আন্দোলনকালে কাজী নজরুল ইসলামের আবির্ভাব একাধিক কারণে স্মরণীয়। আত্মবিস্মৃত জাতি বহুদিন পর শুনল তার আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা। নতুন করে পেলো তার ঐতিহ্যের পরিচয়।'

কিন্তু এই অশান্ত সময়ে, দৃশ্যপটের দ্রুতলয়ের পরিবর্তনে নজরুলের মানস খানিকটা যে উথাল-পাতাল হয়ে উঠেছিলো, তা-ও স্বীকার করেছেন ফররুখ। বলেছেন, 'বঙ্গভঙ্গ, খেলাফত, অসহযোগ ও সন্ত্রাসবাদের পটভূমিতে যে কবি-মানস ঘটিত হয়েছিল, তার অশান্ত মনের প্রতিচ্ছবি দেখেছি আমরা তাঁর রচনায়। বাংলা সাহিত্যের একটা বিশেষ অধ্যায়ে রয়ে গেছে তাঁর দ্বন্দ্বমুখর মনের ছাপ।'

ফররুখ আহমদও নজরুলকে জাগরণের প্রতীক মনে করতেন। এবং তিনি যে জনগণের আশাকে জাগিয়ে তুলতে পেরেছিলেন, তা-ও স্বীকার করছেন।

মূলধারার বাইরে গিয়ে নজরুলকে অস্বীকার করে বসেননি এবং তিনি নজরুলকে ছাড়িয়ে গেছেন, এ কথাও কখনো বলেননি। তবে নজরুলের দুইটা দুর্বলতার কথা তিনি তুলে ধরেছেন 'নজরুল প্রসঙ্গ' নিবন্ধে।

প্রথম দুর্বলতা হলো—নজরুলের অদম্য ভাবাবেগ। এই দুর্বলতা শুধু ফররুখ নয়, কাজী আবদুল ওদুদ, বুদ্ধদেব বসু কিংবা সৈয়দ আলী আহসানও উল্লেখ করেছেন। ফররুখ লিখেছেন, 'অদম্য ভাবাবেগের কারণে তাঁর অধিকাংশ কবিতাই নিখুঁতভাবে জমাট বাঁধতে পারেনি। শব্দ চয়নের দিক দিয়েও তাঁর দুর্বলতা আছে যথেষ্ট।'

দ্বিতীয় দুর্বলতা হলো, 'অগভীর জীবনবোধ এবং দার্শনিক দৃষ্টিশক্তির অভাব তাঁর সবচাইতে বড় ত্রুটি। শুধু এই একটি কারণেই তিনি সর্বকালের কবি হতে পারেননি। নজরুল নিজেও তা বুঝতেন এবং সেকথা স্বীকার করে গেছেন।'

শুরুতেই বলেছিলাম, নজরুল-ফররুখ দুই সময়ের দুই পরিবেশে বেড়ে ওঠার কারণে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গিতেও পার্থক্য গড়ে উঠেছে। নজরুলের দ্বিতীয় দুর্বলতার কথা বলতে গিয়ে যদিও ফররুখ কোনো উদাহরণ টানেননি, উদাহরণ টানলে দেখা যেত নজরুলের দার্শনিক কোন দৃষ্টিভঙ্গির কোন অভাবটির কথা বলেছেন। এটা ফররুখের নিজস্ব পর্যবেক্ষণ। একজন কবি আরেকজন কবিকে এতটুকু পর্যবেক্ষণ করতেই পারেন। তাই বলে এটাকে উন্নাসিকতা কিংবা উপেক্ষা বলা যায় না। ইকবালের প্রতি দারুণ আসক্ত ছিলেন ফররুখ, দারুণ প্রভাবিতও। শুধু এইজন্য ফররুখকে নজরুল-বিদ্বেষী বানিয়ে দেয়া মোটেও ঠিক নয়।



তাঁর পায়ের অম্লান ছাপে ছাপে আমার শ্রদ্ধার ফুল

সালমান সাদ

স্মৃতির আকাশ থেকে সময়ের মেঘ ও মেদ ছাড়িয়ে সরিয়ে ব্যক্ত করছি এই আখ্যানের রোদ। অনেক আগের বৃষ্টিবাদলার দিনে পড়েছি 'জীবনের শীলান্যাস'। সৈয়দ আলী আহসানের আত্মজীবনী, এই বইটা আমাদের বিশুদ্ধ ও শিল্পিত বাংলাভাষার একটা দলিল। এইখান থেকেই কুয়াশার ধুলো ঝেড়ে শুরু করা যাক।

আমরা দৃশ্যপটে দেখব একজন তরুণ, যার গায়ে খদ্দরের পাঞ্জাবি, কনুই-অব্দি গোটানো। তাঁর চোখের দৃষ্টি সারাক্ষণ যেন সাত সাগরের ওপারের কিছু চন্দ্রগ্রস্থ মানুষের মতো অবলোকন করছে। পুরনো দিনের ঢাকা শহরে, একটা বাসে সে চড়ে বসেছে, কলেজে যায়। হঠাৎ কী খেয়ালে সে পকেট থেকে বার করে তরবারির মতো একটা রুপালি কলম। বাসের টিকিটের সস্তা কাগজের উলটা পিঠে লিখতে শুরু করে মন্ত্র। তার কপালে বিন্দু বিন্দু ফুটতে থাকে সিন্দাবাদের ঘাম।

কলেজে সে ব্যাকব্যাঞ্চার। নির্লিপ্ত। নির্জীব। অন্যদের মতো সিলেবাসের পৃষ্ঠা নিয়ে তার তুমুল হৈহুল্লোড় নেই। চট করে দাঁড়িয়ে শিক্ষকদের প্রশ্নের পাণ্ডিত্যপূর্ণ উত্তর দেয়ার প্রবণতা, পরীক্ষায় ভালো ফলাফলের আহ্লাদ, তার নেই।

ক্লাসে স্যার কিছু একটা লিখতে দিয়েছে সবাইকে। কিন্তু পেছনে বসা ফররুখ তো আগ থেকেই লিখছিলেন কিছু একটা, মগ্নচৈতন্যে। শিক্ষক পায়চারি করতে করতে, অন্যেরা কী লিখছে যাচাই করতে করতে, তাঁর বেঞ্চে এসে দাঁড়ালেন, দাঁড়িয়ে পড়লেন, দাঁড়িয়েই রইলেন। ফররুখের বিকার নেই। স্যার একদৃষ্টিতে দেখছেন, নাকি পড়ছেন, তাঁর পঙক্তিতে পঙক্তিতে সাজানো লেখা। পুরো ক্লাস এই ঘটমানতার দিকে কৌতুকপ্রদভাবে চেয়ে আছে।

প্রভাষক হঠাৎ প্রচণ্ড ধমকে উঠলেন। ছেলেটার কলার ধরে টানতে টানতে নিয়ে অফিস রুমে হেডস্যারের সামনে ফেললেন। বললেন, 'স্যার, আজকে আমার

ইংরেজি ক্লাসে বাংলার উইলিয়াম শেকসপিয়ারকে আবিষ্কার করলাম!'

পৃথিবীতে আদর্শবাদী লোকেরা তাদের চিন্তার চর্চার জায়গা খুঁজে। স্বাপ্নিক ফররুখ জড়িয়ে পড়লেন সমাজতান্ত্রিক রাজনীতিতে, কমিউনিজম। তখন আকাল, ঘোর আকাল। বাংলাদেশকে গ্রাস করে নিয়েছে নিদারুণ দুর্ভিক্ষ। শহরাভিমুখ হচ্ছে গ্রামকে গ্রাম মানুষ, লাখে লাখ। জোৎস্নার মতো সাদা এক মুঠো ভাতের আশা।

ফররুখ তো কবি, রক্তে কবি, জাতে কবি, তাঁর মনস্তত্ত্বে তখন বিভীষিকা, অস্থির এক রাজত্ব। ঘরে থাকতে পারেন না, ছুটে বের হয়ে পড়েন, পথেঘাটে পীড়িত মানুষের দুর্দশা দেখে কিছুই করতে না পারার হতাশায় আবার বিছানায় এসে আছড়ে পড়েন। খেতে বসে, আধখাওয়া ভাত রেখেই কী ভেবে হঠাৎ উঠে পড়েন। হাত ধুয়ে কোথাও চলে যেতে যেতে বলেন, 'ভাবি, দুয়ারে কেউ কড়া নাড়লে আমার ভাতগুলো তারে দিয়া দিয়ো।'

সমাজতন্ত্র তাঁকে একসময় হতাশ করে, পরাজিত করে। কেন হতাশ করে কীভাবে পরাজিত করে, সেসব তিনি বলে গেছেন তাঁর লেখায়, রচনায়, কবিতায়।

সোভিয়েত রাশিয়ারই এক অঞ্চলে জন্মানো মনীষী ঢাকা আলিয়ার মওলানা আবদুর রহমান কাশগরী, তাঁর তখনকার চেতনার তমসাচ্ছন্ন আকাশে অজস্র তারার মতো ঝিকমিকিয়ে ওঠেন। ফররুখ আহমদ দেখেন 'নারঙ্গির বনে কাঁপছে সবুজ পাতা'। পাতারা তাঁকে ডাকছে। পথের একটা বাঁকে এসে তাঁর পথ ঘুরে যায়, যাত্রা শুরু হয় নতুন আলোকে, সুলুকের সন্ধানে।

আর সকল চিন্তা ও ভাবনার মতো রাজনীতি-চিন্তাও ব্যক্তির একান্ত নিজস্ব ব্যাপার। অথচ হেরার রাজতোরণের দিকে তাঁর এই শাশ্বত সুন্দর অভিযাত্রাটাই পাপ হয়ে উঠলো ওদের স্থূল চেতনার মানদণ্ডে। তাঁর অদম্য শক্তিমান কবিসত্ত্বাকে তারা অস্বীকার করে, তারা ভুলে যাবার ভান করে। তাতে কী, এই যে অন্ধকারের মতো বিস্তারিত মিথ্যাচর্চার মাঠে আমরা তো মশাল জ্বেলে ফেলছি... আমরা বলছি।

বাংলাদেশের চল্লিশের কাব্যদশকের সবচেয়ে প্রভাবশালী দুই কবির একজন ফররুখ আহমেদ। বাংলাদেশের কাব্য ইতিহাসে চল্লিশের দশক যে বেশ ঘোলাটে, এর কারণ ফররুখকে বাদ দিতে চেয়ে ইতিহাস লিখতে যাওয়া।

১৯৭৪ সালের ৮ নভেম্বর হংকংয়ের এক পত্রিকায় প্রখ্যাত সাংবাদিক মার্টিন ডেভিডসন লেখেন : 'দুসপ্তাহ আগে বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান কবি ফররুখ আহমদ মৃত্যুবরণ করেছেন। তাঁর মৃত্যুর কারণ অনাহার।' নিদারুণ অর্থকষ্টে তিনি দিন গুজরান করেন। রেডিও'র সামান্য চাকরিটি থেকে তাঁকে অন্যায়ভাবে বরখাস্ত করার পর সরকারি বাসাটি ছেড়ে যেতে তাঁকে চাপ দেয়া হয়। কিন্তু ঢাকায় এ আদর্শবাদী কবির না ছিল বাসস্থান, না কোনো স্থায়ী ঠাঁই। শুভাকাঙখীদের তদবিরের ফলে বাসা ছাড়তে হয়নি, কিন্ত বাকি জীবন অভাবকে তাড়না করে কেটেছে সেখানে। শুধু আদর্শিক বিনাশকামীরা ব্যতীত মানুষ হিসেবে এই কবির কোনো শত্রু ছিল না, সদা অমায়িক, হাস্য মুখ, জমজম কূপের পানির মতো স্বচ্ছ অনাবিল ব্যক্তিত্ব।

ছোটবেলা থেকেই আমার বইপাঠের তুখোড় নেশা। ঈদের সালামি পেয়ে বই কিনতাম। একদিন একটা বই পাই, নাম হাতেম তায়ী। লেখক ফররুখ আহমদ। ছন্দে ছন্দে কী সুন্দর কাহিনিবর্ণনা, আবার ছবি। ঘোরগ্রস্ত সেই পাঠে হাতেম তায়ী চরিত্রটি মগজে রহস্য-রোমাঞ্চের উদ্দাম লীলাক্ষেত্র তৈরি করেছিল। নিজের ধনরত্ন কীভাবে সে নিজেরই প্রাণসংহারী ডাকাত দলে বণ্টন করে চলে যায় বিষণ্ন গোধূলীর পথ ধরে। এইখনে মনে পড়ে যায় ফররুখের কথা। বাংলাভাষার এই কুমিরভরা খালে কালো শেয়ালদের মধ্যেও নিজের কাব্যসুষমা আর আদর্শিক উপমার অজস্র ধন-রতন বিলিয়ে দিয়ে চলে গেলেন মহাপ্রস্থানের পথে।

তাঁর পায়ের অম্লান ছাপে ছাপে আমার শ্রদ্ধার ফুল।

লেখক : নবীন গল্পকার



ফররুখের শিশুতোষ

আমজাদ ইউনুস

বাংলা সাহিত্যের ধ্রুবতারা কবি ফররুখ আহমদ। অফুরন্ত প্রেরণার প্রদীপ্ত বাতিঘর। বড়দের পাশাপাশি ছোটদের জন্য বিপুলভাবে লিখেছেন। শিশুতোষ কাব্য রচনায়ও তাঁর নৈপুণ্য লক্ষণীয়। শিশু-কিশোরদের আত্মভোলা জগৎ নির্মল উপলব্ধি ও প্রাঞ্জল হাস্যময়তায় কবি জীবন্ত করে তোলেন। তাঁর কবিতায় শব্দেরা শিশিরভেজা চোখের মতো ঝলমল করে। তাঁর রসটইটম্বুর কলম থোকায় থোকায় শব্দ-মিঠাই বিলিয়েছে কিশোর-উঠোনে। শিশু-কিশোর সাহিত্য রচনায় কবি ফররুখ আহমদের অবদান কলেবরের দিক থেকে যেমন বিপুল, গুণগত মানের দিক থেকেও তেমনি উৎকৃষ্ট ও অসাধারণ। শিশুসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ, সুকুমার রায় ও নজরুলের পাশাপাশি ফররুখের অবদানও চিরস্মরণীয় হয়ে আছে।

কবি ফররুখের ছড়া-কবিতায় রয়েছে শতমূলী লতা, কাঁটাগোলাপ, সেঁউতির ঝোপ, ঢাউস সাইজের ঘুঘু, পরিযায়ী হাঁস, চেনা-অচেনা পাখি, হিজলের বিশাল বন, দিগন্ত বিস্তৃত সবুজ গালিচার মতো বিছানো দূর্বা-শ্যামল মাঠ, বিলের রুপালি জলরাশি, গ্রামবাংলার গুল্মময় পুষ্পিত বিলের প্রান্ত-ঘেঁষা নুয়ে পড়া তালগাছ, শেষপ্রান্তে মেঘালয় পর্বতের নীলাভ তরঙ্গমালা, প্রকৃতির মিষ্টি মধুর জল-রঙ, রং-তামাশা এবং শিশুমনের বিচিত্র কৌতূহল-উদ্রেককর কথা। শিশু সাহিত্যে এসব ছড়া-কবিতার সৃষ্টিতে এর জুড়ি মেলা ভার। তাঁর কবিতায় যে বৈশিষ্ট্য তাঁকে অমর করে রেখেছে, তা হচ্ছে অনুরণিত শব্দময় উপমা এবং মেঘটুম্বুর ছন্দ-ধ্বনি। দীপ্তিময় শব্দ ও আত্মগত রুহানি নুর। শিশুদের কবিতায় তিনি ছাপ রেখেছেন শিশুতোষ হৃদয়ের সহজ-সরল কল্পনা-রাজ্যে কথার ঝলমলে মণি-মাণিক্যের।

কবি ফররুখ আহমদ তাঁর ছড়া নির্মাণে অন্ত্যমিল রেখেছেন শক্তিশালী ছন্দজ্ঞানে। তাঁর ছড়ায় ছিল না পাংশু বর্ণের এলোমেলো ও আলুথালু ভাবচিন্তা।

শব্দ যেমন কমনীয় ও অতুলনীয় তেমনি দৃঢ়। তাঁর নিজ পবিত্রগুণের ঋজুতা ও দৃঢ়তার ছাপ রয়েছে ছড়া ও কবিতার ছত্রে ছত্রে। সবচেয়ে বড় বিষয়, তাঁর ছড়া-কবিতায় ছিল বিশ্বাসের দীপ্ত দ্যুতির ঝলকানি।

কবির প্রথম শিশু-কিশোর কাব্যগ্রন্থ 'পাখির বাসা'। প্রথম প্রকাশিত হয় ১০৬৫ সালে বাংলা একাডেমী থেকে। এটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে পাঠকদের কাছে বিপুলভাবে সমাদৃত হয় এবং এজন্য কবি ১৯৬৬ সনে ইউনেস্কো পুরস্কার লাভ করেন।

বইটি উৎসর্গ করেন শিশু-কিশোরদের নামে। উৎসর্গিত সেই পঙক্তিটি হলো–

'নতুন মানুষ এল যারা
খোদার দুনিয়াতে,
ছোট্ট আমার 'পাখির বাসা'
দিলাম তাদের হাতে।'

এতে স্থান পেয়েছে ঘুঘু, বক, পেঁচা, গাঙশালিক, বাবুই, টিয়ে, ফিঙে, কাঠঠোকরা, বুলবুলি, মোরগ, হাঁস, কবুতর, চড়ুই, সাতভায়রা, দোয়েল, কোকিল, শালিক,

ময়না, চিল, কাক, শাহবাজ, আবাবিল পাখি, মাছরাঙা, পানকৌড়ি, কাগাবেগা, পেঙ্গুইন, টুনটুনি ও কুটুম পাখিসহ আরও অন্যান্য পাখির বর্ণনা। একেক পাখির বাসা একেক ধরনের। খড়-তৃণগুচ্ছ দিয়ে কেউ বাসা বানায় লতাপাতার ঝোঁপে, কেউ বড় গাছের মগডালে বা গাছের কোটরে। পাখিদের বৈচিত্র এ বাসস্থানকে কবি ছন্দের তুলিতে চিত্রিত করেন এভাবে–

'আয় গো তোরা ঝিমিয়ে পড়া
দিনটাতে,
পাখির বাসা খুঁজতে যাব
এক সাথে।
কোন্ বাসাটা ঝিঙে মাচায়
ফিঙে থাকে কোন্ বাসাটায়
কোন্ বাসাতে দোয়েল ফেরে
সাঁঝ রাতে।
ঝিলের ধারে ঝোঁপের মাঝে
কোন্ বাসাটা লুকিয়ে আছে
কোন্ বাসাটায় বাবুই পাখির
মন মাতে
নদীর ধারে নিরালাতে
গাঙ শালিকের বাস যেটাতে
রাত্তিরে সে থাকে, এখন
নেই যাতে।'

বর্ণ দিয়ে শব্দ, শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি করে মানুষ মনের ভাব প্রকাশ করে। বর্ণমালা শিখতে হয় মায়ের মুখ থেকে। বইয়ের পাতা থেকে। সেই বর্ণমালা যদি কেউ ছন্দে ছন্দে শেখান বা পড়ান তখন কেমন লাগবে? অবশ্যই শিশুদের জন্য তা হবে সুখপাঠ্য। কবি ফররুখ আহমদ তাঁর দ্বিতীয় ছড়াগ্রন্থ 'হরফের ছড়ায়' ছন্দে ছন্দে চমচম-রসমলাইয়ের মতো বাংলা বর্ণমালা শিশু-কিশোরদের মুখে তুলে দেন। 'হরফের ছড়া' একটি পরিকল্পিত ও সুলিখিত ছড়াগ্রন্থ। কবির কল্পনাপ্রবণ কবিমন শিশুর সহজগ্রাহ্যতা সম্পর্কেও যথোচিত সচেতন ছিলেন। বর্ণ দিয়ে শব্দ তৈরি এবং শব্দ দিয়ে কথামালার বিন্যাসে তিনি অসাধারণ কুশলী ছান্দসিক কবি হিসাবে নিজের নৈপুণ্য প্রকাশ করেছেন। শিশুরা ছন্দের তালে তালে অবলীলায় পাঠে মনোযোগী হয়ে আনন্দে ও চিত্তের বৈভবে ঋদ্ধ হয়ে ওঠে। পাঠের সাথে সাথে তার মন নৃত্যচপল, ছন্দনূপুর হয়ে ওঠে। আনন্দ-বৈভবে সে পরিচিত হয় বর্ণমালার সাথে।

বইটিতে কবি ফররুখ আহমদ শিশুকে বর্ণ-পরিচয় দানের সাথে সাথে প্রতিটি বর্ণ দিয়ে তৈরি বিভিন্ন দৃশ্যপট তুলে ধরেছেন। শিশুর একান্ত পরিচিত দৃশ্যপট এঁকেছেন ছন্দের তুলিতে। শিশুর পরিচিত পরিবেশে যেসব ফল-ফুল-পাখি, জীবজন্তু, গাছ-পালা ইত্যাদি সবকিছুর সাথেও ক্রমান্বয়ে কবি শিশুকে জুড়ে দেন অচেনা এক জগতের সাথে। এভাবে বর্ণের সাথে পরিচিত হওয়ার সাথে সাথে শিশুটি তার পরিবেশেকে অনায়াসে উপলব্ধি করতে পারে। দু'একটি উদাহরণ তুলে ধরা যাক–

'অ য়ে অতসী-তিসির মাঠ,
অশথ গাছের সামনে হাট,
অলিগলি শহর চাই,
অলিগলি শহর পাই।।
আ য়ে আনারস, আম বাগান,
আসমানী রঙ ফুলটা আন,
আসমানী রঙ মন টানে;
আ যেতে চায় আসমানে।।'

সবাই ফুল ভালোবাসে। পৃথিবীতে ফুল ভালোবাসে না এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া মুশকিল। ফুলের কদর সবখানেই। সবাই চায় ফুলের মিষ্টি সৌরভে নিজেকে সুরভিত করতে, ফুলের স্নিগ্ধ অনিন্দ্য সাজে নিজেকে সাজাতে, ফুলের রঙিন রঙে নিজেকে রাঙাতে। তাই আমরা বাসার ছাদে, ঘরের ব্যালকনিতে মিষ্টি মিষ্টি ফুলের টব রাখি।

ফুল নিয়ে কোনো কবি কবিতা লিখেননি, ফুল দিয়ে উপমা দেননি, এমনটা বিরল। সব কবিই কমবেশি ফুল নিয়ে কবিতা লিখেছেন। ফুলের সুষমা গায়ে মেখেছেন। উপমায় ফুলের ব্যবহার করেছেন। পৃথিবীর ইতিহাসে এ পর্যন্ত ফুল নিয়ে কবিরা কত শত-সহস্র কবিতা লিখেছেন, তার ইয়ত্তা নেই। বাংলাভাষার জনপ্রিয় কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন–

'জোটে যদি মোটে একটি পয়সা
খাদ্য কিনিয়ো ক্ষুধার লাগি'
দুটি যদি জোটে অর্ধেকে তার
ফুল কিনে নিয়ো, হে অনুরাগী!'

কাজী নজরুল লিখেছেন–

'কে নিবি ফুল কে নিবি ফুল
টগর যূথী বেলা মালতী
চাঁপা গোলাব বকুল।
নার্গিস ইরানী গুল।'

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন–

'আমার সকল কাঁটা ধন্য করে ফুটবে ফুল ফুটবে
আমার সকল ব্যথা রঙিন হয়ে গোলাপ হয়ে উঠবে।'

পল্লীকবি জসীমউদ্দীন 'হলুদ বরণী' কবিতা লিখেছেন। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'ফুল ফুটুক আর না ফুটুক আজ বসন্ত' কবিতাংশটুকু আজ সবার মুখে মুখে। উভয় বাংলার শ্রেষ্ঠ কবি ও কথাকোবিদ আল মাহমুদ ফুল নিয়ে অনেক কবিতা লিখেছেন। যেমন–

'দীঘির কথায় উঠল হেসে ফুলপাখিরা সব
কাব্য হবে কাব্য হবে জুড়লো কলরব
কী আর করি পকেট থেকে খুলে ছড়ার বই
পাখির কাছে ফুলের কাছে মনের কথা কই।'

ফুলের প্রতি কবি ফররুখ আহমদের টান ও ভালোবাসা ছিলো আরো গভীর। তিনি ফুলকে নিয়ে আস্ত একটা কাব্যগ্রন্থ লিখে ফেললেন। গ্রন্থটির নাম 'ফুলের জলসা'। এবং অবশ্যই শিশুদের জন্য। বইটি শিশু-কিশোরদের জন্য অনবদ্য রচনা। এতে কদম, কেয়া, শাপলা, গন্ধরাজ, শালুক, শিউলি, ঝুমকো-জবা, পদ্মফুল, গাঁদাফুল, জুঁই চাপা, অর্কিড ফুল, ডালিয়া, গুলমোহর, গোলাব, ক্রিসানথিমাম, রক্তকরবী, রঙ্গন, চম্পা, কাটালীচাঁপা, সূর্যমুখী, সন্ধ্যামণি, রাতের ফুল, রজনীগন্ধা, হাসনাহেনা, দোপাটি ও ম্যাগনোলিয়া ফুলসহ আরও নানা ধরনের ফুলের কথা সহজ-সরল ছন্দবদ্ধ ভাষায় প্রকাশ করেছেন কবি। কোন সময়ে কোন ফুল ফোটে এবং কোন মাসে কোন ফুল ঝরে সেসব বিষয়ও শৈল্পিক ও নান্দনিক ভাষায় অনবদ্যভাবে তুলে ধরেছেন। বন হলো রূপবতী রমণী। ঝুমকো জবা যেন তার দুল। ওলোট-পালোট হাওয়ায় হাওয়ায় সেই দুলের দুলুনি দেখে কবির মনও দুদোল দোলায় দুলে ওঠে।কবি লিখেন–

'ঝুমকো জবা বনের দুল
উঠলো ফুটে বনের ফুল
সবুজ পাতা ঘুমটা খুলে
ঝুমকো জবা হাওয়ায় দোলে
সেই দুলুনির তালে তালে
মন উড়ে যায় ডালে ডালে।'

শৈশবে থুরথুরে বুড়ো দাদুর কোলে মাথা ঠেকিয়ে কত কেচ্ছা-কাহিনি ও গপ্প-গুজব শুনি আমরা। কোনোটা বাস্তবিক আবার কোনটা কাল্পনিক। এসব গল্প শুনে-শুনে আমরা স্বপ্নের ভেলায় চড়ে ভেসে ভেসে পাড়ি জমাই সাত সাগর তেরো নদীর তীরে।

কবি শৈশবে মা-বাবা হারিয়ে বড় হন দাদুর কাছে। তিনি দাদুকে খুব ভালোবাসতেন। দাদুর কোলে হাসতেন। দাদুর কোলে কাঁদতেন। দাদুর কোলে মাথা ঠেকিয়ে গল্প শুনতেন। তারপর বড় হয়ে দাদুর সেইসব গল্পগুলে কে পুঁজি করে রচনা করেন কাহিনিকাব্য।

ফররুখের অন্যতম অবদান বাংলা ভাষায় শিশুদের জন্য কাহিনিকাব্য রচনা। 'কিসসা কাহিনী', 'দাদুর কিসসা', 'সাঁঝ সকালের কিসসা' নামের গ্রন্থগুলিতে তিনি লিখেছেন বিশ্ব সাহিত্যের জনপ্রিয় চরিত্র আলাদিন, সিন্দাবাদ, হাতেম তায়ী, আলিবাবার কাহিনিকে ছন্দমিলিয়ে শিশুদের জন্য আকর্ষণীয় করে। কাব্য ছন্দে সুপাঠ্য এই কাহিনিগুলি সহজেই শিশুরা পড়তে এবং রস আস্বাদন করতে সক্ষম। নৈতিক শিক্ষার জন্যও এই কাহিনিকাব্যগুলি উপযোগী।

কবি তাঁর দাদুকে নিয়ে লিখেন–

'অবাক হলাম দাদুর হাতে
দেখে চুষি কাঠি
ঘোরেন তিনি মারবেল আর নিয়ে দুধের বাটি।
সবাই বলে শেষ বয়সে
আবদারটা চড়া
দাদু বলে আধা বুড়োরা কেন পড়ে ছড়া।'

হিসেব কষলে দেখা যায়, সব মিলিয়ে কবির কিশোর কাব্যের সংখ্যা মোট ২১টি। এ ছাড়া, কবি স্কুল-পাঠ্য হিসেবে চারটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। এতগুলো শিশু-কিশোর গ্রন্থের রচয়িতা হলেও তাঁর জীবনকালে মাত্র ৪টি শিশু-কিশোর গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। বাকিগুলো পাণ্ডুলিপি আকারে পাওয়া যায়।

লেখক : শিক্ষার্থী, পটিয়া মাদরাসা, চট্টগ্রাম



ফররুখ আহমদ
অবহেলিত জীবন যেখানে অপ্রতিরোধ্য

রবিউল ইসলাম

রুদ্ধদ্বার একটি অন্ধকার কক্ষে বসে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছেন একজন কবি। তাঁর চাকরিটা চলে গেছে। পয়সার অভাবে মেয়েটাও মরে গেল একেবারে বিনাচিকিৎসায়। ফ্যাসিবাদের রক্তহিম করা এ দিনগুলোতে হয়তো এ কবি ভাবছেন দিন ফুরোবার কথা আর প্রশ্ন করছেন নিজেকে–'মৃত্যু কি তাঁকে পাবে নাকি তিনি মৃত্যুকে? একটি জাতিসত্ত্বাকে সম্পূর্ণ নতুনভাবে জেগে ওঠার ইশতেহার দিয়ে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের হর্তাকর্তা একজন কবির কি এ মুহূর্তে উচিত তাঁর অতীতকে ভুলে গিয়ে কবিতার লক্ষকোটি হরফ, যেগুলোর আবেদন এ জাতির কাছে অতুলনীয়–সব একেবারে চোখের সামনে জ্বালিয়ে ছাই করে দেবেন? ভেবে পান না এ কবি। কবি জানেন, ভাবনার পালা শেষে কোনো না কোনো একদিন ফুরাবে দিনকাল। সাময়িক রূপসজ্জার মোহে অন্যায়ের সঙ্গে আপোস অথবা নিজের আদর্শকে এর সাথে মিশিয়ে নিজস্ব সত্ত্বাকে কালিমালিপ্ত করা অন্তত একজন কবির সঙ্গে যায় না। দুঃখই হোক যাপিত জীবনে কবির একমাত্র প্রতিদান।

হ্যাঁ, এমনই উপেক্ষিত, অবহেলিত এবং রাষ্ট্রযন্ত্রের কাছে নিতান্ত বিষফোঁড়া হয়ে জীবনকে বরণ করে নেয়া এ দুঃখী কবির নামই ফররুখ আহমদ। বাঙালি জাতির জন্য নিবেদিতপ্রাণ একজন স্বভাবকবি হয়ে থাকলেও বাস্তবিক জীবনে বাঙালি ও বাঙালির ক্ষমতায়নের যাতাকলে পিষ্ট এ জাতিসত্ত্বা তাকে পীড়া ছাড়া আর কিছুই দেয়নি। কিন্তু কেন? কী তাঁর অপরাধ? কেন একজন কবিকে পয়সার অভাবে রোজ সন্ধ্যায় উপোস মুখে বসে থাকতে হয়েছিল একাকী, নির্জন বিলাসে? যে সময়টাতে সমস্ত বাংলা-সাহিত্যে যার মতো একজন শক্তিশালী স্রষ্টা খুঁজে পাওয়া ভার, সে সময়টাতে কেন এমন একজন স্রষ্টা অনাহারে থেকে তিলে তিলে মরতে বাধ্য হয়েছেন? তাঁর ঘর থেকে বের হবার পথ নেই। সৎভাবে খেটে খেয়ে একটু রুটিরুজির ব্যবস্থার সব দুয়ার বন্ধ তাঁর জন্য। তিনি ঘরে বসে মরে যান, মরে যান এমন করে–কেউ না জানুক তিনি চলে গেছেন, এই তো রাষ্ট্রের কোশেশ। একজন প্রধানতম কবির এহেন দুর্যোগের একমাত্র কারণ কি তাঁর কবিতা? হ্যাঁ, কবিতাই তাঁকে এরকম বঞ্চনার দিকে ঠেলে দিয়েছিল। অভিযোগ করা হয়েছিল একদা পাকিস্তানের সপক্ষে তিনি কবিতা লিখেছেন। মুক্তিযুদ্ধের এ পবিত্র লড়াইয়ে একসময়ের পাকিস্তানপন্থী কবির ব্যাপারে কোনো ছাড় নেই–এমনই অবস্থান সে সময়কার ফ্যাসিবাদী কর্তৃপক্ষের।

এখন কথা হলো, মুক্তিযুদ্ধের সশস্ত্র সংগ্রামের পূর্ববর্তী সময়ে পাকিস্তানের স্বপক্ষে কবিতা লেখা কি কোনো অপরাধ ছিল? আমরা যতটুকু জানি সেসময়কার পাকিস্তান নিয়ে আজকের বাংলাদেশে লেখেননি এমন কোনো কবি-সাহিত্যিক নেই বললেই চলে। অন্য অনেককে বাদ দিয়েও ছফার বক্তব্য অনুযায়ী যদি বলি, কবি সুফিয়া কামালের পাকিস্তান এবং জিন্নাহর ওপর নানা সময়ে লেখা কবিতাগুলো জড়ো করে প্রকাশ করলে 'সঞ্চয়িতা'র মতো একখানা গ্রন্থ দাঁড়াবে বলেই আমাদের ধারণা। অথচ ভাগ্যের কী পরিহাস, কবি সুফিয়া কামাল বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি হয়ে মস্কো-ভারত ইত্যাদি দেশ সফর করে বেড়াতে শুরু করেছেন আর ফররুখ আহমদ রুদ্ধদ্বার কক্ষে বসে অপমানের লাঞ্ছনায় মৃত্যুর দিন গুণছেন।

কী অদ্ভুত সমীকরণ। পাকিস্তানের পক্ষপাতিত্বের মতো হাস্যকর অভিযোগ একজন কবির ব্যাপারে যখন দায়ের করা হয়, সাহসের সাথে আমরা তখন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকেও অভিযোগের বেড়াজালে আটকে দিতে পারি। ৭ ই মার্চের পূর্ব পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু পাশাপাশি জয়-বাংলা এবং জয়-পাকিস্তান শব্দ দু'টো উচ্চারণ করে বক্তৃতা করতেন, এ কথা কি কারো অজানা? তাহলে আন্দোলনের পূর্ববর্তী সময়কে টেনে পাকিস্তানের স্বপক্ষের লোক বলে হীন অভিযোগ করে একজন কবিকে বিদ্ধ করা কতটা যৌক্তিক ছিল? দখলদার পাকিস্তানি সৈন্যদের দ্বারা বাধ্য হয়ে পাকিস্তানের স্বপক্ষে বক্তব্য রেখেছেন এমন মানুষের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। কবি শামসুর রহমানও তো পাকিস্তানি সৈন্যদের তত্ত্বাবধানে সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক 'দৈনিক পাকিস্তানে'র সম্পাদকীয় রচনা করে আচ্ছা বাহবা অর্জন করেছিলেন। কিন্তু ভাত নেই কেবল ফররুখের বর্তনে।

বাকশালি ফ্যাসিস্ট আমলে কবি ফররুখের ব্যাপারে মোটাদাগে আরও যে অভিযোগ করা হয়েছিল, তিনি আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহার করে বাংলাভাষার স্বাতন্ত্র্য নষ্ট করেছেন। কিন্তু কবি ফররুখ আহমদ নিজেই তো বলেছেন, তিনি শব্দ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন, কবিতার ক্ষেত্রে তা নিশ্চয়ই দোষণীয় নয়। বিশেষত বাংলাদশে এমন একটা সময় ছিল, কবি-সাহিত্যিকেরা উর্দু-ফারসি শব্দ দিয়ে রচনা করাকেই বরং সম্মানের কারণ মনে করতেন। অথচ তাঁদের অনেকেই এখন বাংলাদেশ সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন থাকলেও কবি ফররুখ আহমদ রয়ে গেছেন দোষীর কাতারে। দোষী হিসেবে সাব্যস্ত করতে গিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে এও বলা হয়, তিনি রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে চল্লিশ জন স্বাক্ষরদানকারীদের একজন। চল্লিশজনের বাকি ঊনচল্লিশটি স্বাক্ষর পাতা থেকে মুছে গিয়ে সবাই হয়ে গেছেন শিল্প-সমঝদারদের হর্তাকর্তা। অথচ পাকিস্তানের সশ্রদ্ধ সমর্থক হিসেবে চাকুরি হারাবেন, না-খেতে পেয়ে মারা যাবেন কেবল ফররুখ আহমদ।

কবি ফররুখকে লাঞ্চনার দ্বারস্থ হবার এইসব ঘটনা-উপঘটনার কারণ বাহ্যতভাবে আমরা যেরকমই দেখি না কেন, এর একমাত্র কারণ বাকশালি ফ্যাসিস্ট আমল এবং সেক্যুলার উৎসব। তাঁর প্রধান অপরাধ তিনি ইসলামি রেনেসাঁর একজন মানবতাবাদী কবি। তিনি অন্যায়ের সঙ্গে আপোস করতে দ্বিধা করেন। কৃত্রিম সম্মানের ফাঁদে আটকে যাবার ভয়ে 'প্রাইড অব পারফরমেন্স' দেয়ার কথা উঠলে তিনি নির্দ্বিধায় অস্বীকার করতে জানেন। বলে দেন, ক্ষমতাদর্পীর হাত থেকে একজন কবির নেয়ার কিছুই নেই। প্রতিবাদ তো তাঁর কবিতার অন্যতম অনুষঙ্গ। সেইসাথে বিরুদ্ধপক্ষ জানে তাঁর কবিতার আধুনিকতার কথা। তাই যতোই আধুনিক হোক সে কবিতার গতি-প্রকৃতি তাঁকে সংকীর্ণ ও গৌণ প্রমাণ করবার জন্য বলে দিতে হবে এটা নিছক 'ইসলামি সাহিত্য'। কিন্তু সবচাইতে আশার কথা যা–দুঃখী এ কবি তো ইহকালীন কোনো প্রতিদানের মুখাপেক্ষী ছিলেন না কখনই। যার ফলে বাহ্যত তিনি বঞ্চিত থেকে গেলেও তাঁর আদর্শ ও বিশ্বাস অনুযায়ী বলে দেয়া যায়–অনন্য সৌন্দর্যে ভরা সম্মানজনক প্রতিদানে তিনি ভূষিত হয়ে আছেন ওপারে।

লেখক : ছাত্র, মাদরাসাতুল কাউসার আল ইসলামিয়া, ঢাকা



ফুল-পাখিদের কবি

মির্জা মুহাম্মদ নূরুন্নবী নূর

সিন্দাবাদের কবি। সাত সাগরের মাঝি। দুঃসাহসিক যাত্রী। ছড়ার পাখি। ছোটদের প্রিয় কবি। আদর্শের কবি। তোমরা জান কে তিনি? আমি বিশ্বাস করি তোমরা তাঁকে চেনো। ভালো করেই জানো তাঁকে। হ্যাঁ, তোমাদের প্রিয় কবি ফররুখ আহমদের কথাই বলছি। ইসলামি রেনেসাঁর কবি তিনি।

ছোটদের খুব ভালোবাসতেন তিনি। অনেক আদর করতেন। সোহাগ দিতেন মন উজাড় করে। ভালোবাসার পরশ বুলিয়ে কাছে টানতেন সবাইকে। বিশেষ করে ছোটদের। ব্যবহারে যেমন ছিলেন আকর্ষণীয় লেখাতেও ছিলেন তেমন প্রিয়। তোমাদের নিয়ে তাঁর লেখা শিশুতোষ ছড়া থেকে তুলে ধরছি কিছুটা।

কবি ছোটদের কলমি লতার সাথে তুলনা করেছেন। শিশুদের মাঝে সবুজের হাতছানি দেখেছেন। দেখেছেন কোকিল-ফিঙের নাচানাচি। তাই কোকিল ফিঙের বন্ধু করেছেন সোনামণিদের। তোমাদের। সবুজ বনের কলমি লতা যেন তোমরাই। কবির ভাষায়–

‘ক য়ের কাছে কলমি লতা
কলমি লতা কয় না কথা,
কোকিল ফিঙে দূর থেকে
কলমি ফুলের রঙ দেখে।’

ফুল-পাখিদের সাথি তোমরা। তোমাদের প্রাণ দিয়ে ভালোবাসেন কবি। তোমরা খেলতে ভালোবাসো। চানা আর বুট তোমাদের প্রিয় খাবার। কবি তা বোঝেন। তাই তোমাদের সাথে করে বুট খেতে চান মুটমুট করে। কুটকুট করে। তোমাদের সাথে খেলতে চান মাঠে। সবুজের জমিনে। কবির ভাষায়–

‘গ য়ের খেলা গোল্লাছুট,
জিতলে চানা, হারলে বুট,
তোমরা খাবে কুটুর কুট,
আমরা খাব মুটুর মুট।’

ঘোড়ায় চড়তে সবারই ভালোলাগে। কবির নিজেরও। ঘোড়ার সাথে পাল্লা দিয়ে মজা লুটে নাও অনেকেই। ঘোড় দৌড়ে প্রতিযোগিতাও করো কেউ কেউ। ঘোড়ার সাথে তোমাদের সখ্যতার কমতি নেই। কবি সে কথাও ভুলে যাননি। তাই তো তোমাদের নিয়ে লেখা। কবির ভাষায়–

‘ঘ য়ের ঘোড়া এল যেই
খোঁড়া হ’ল সকলেই,
কালো ধলো দুই ঘোড়া
দু’য়ে মিলে এক জোড়া।’

ছড়া দিয়ে গণনাও পড়া শেখালেন কবি। কত্তো আদর কবির! কত্তো ভালোবাসা, তাই না!

কাজী নজরুল ইসলামের ‘ঝিঙে ফুল’ ছড়াটি অনেকেই পড়েছ হয়তো। ঝিঙে ফুলের

সাথে তোমাদের আড়ি থাকার কথা। কবি ফররুখ আহমদেরও ছিল। তোমাদের সাথে খেলতে গিয়ে কবিও আদুরে হয়ে গেছেন। তোমরা জানো ঝিঙে ফুলে ফিঙেরা নেচে বেড়ায়। কবি তাই তোমাদের সাথে ফিঙের নাচানাচি দেখতে চান। খেলতে চান। কবির ভাষায়–

'ঝ য়ের পাশে ঝিঙে,
ঝিঙে লতায় ফিঙে
ঝিঙে লতা জড়িয়ে গেল
কালো গরুর শিঙে।।'

কী মজা, তাই না! হ্যাঁ, খুব মজার কবি ছিলেন তিনি। মজা করে খুব আনন্দ পেতেন কবি।

কাক আর টিয়ার লড়াই খুব ভালোলাগে কবির। তাই ওদের ঝগড়া দেখে বেশ মজা পান তিনি। তোমাদেরকেও সেই ঝগড়ায় শামিল হয়ে আনন্দ নিতে বলেন। তাঁর ভাষায়–

'ট য়ের পাশে টাটটু,
খেলছে ওরা লাটটু,
টয়ের কাছে টিয়ার ঝাঁক
অবাক হয়ে দেখছে কাক।।'

কাক আর টিয়ার ঝাঁকে কবি সখ্যতার ভাব খুঁজে পান। ভালোবাসার মেলবন্ধন দেখাতে চান তোমাদেরকে। আজ আমাদের মাঝে পারস্পরিক সখ্যতা নাই। নাই ভালোবাসার মেলবন্ধন। কবি কিন্তু কাক আর টিয়ার সখ্যতার মধ্য দিয়ে আমাদেরকেও তা শেখাতে চেয়েছেন।

তারাভরা রাত দেখেছ তোমরা? হ্যাঁ, দেখেছ নিশ্চয়ই। কবি তারাভরা রাতে পলক-হারা হয়ে যান। তন্ময় হয়ে ভাবেন রাতের তারাদের। এক সময় কবি তারাদের গুণতে চেষ্টা করেন। কিন্তু পেরে ওঠেন না। তাই তারাদের সাথে মিতালি করতে চান। তারাদের ভাবতে ভাবতে কবির রাত সারা হয়ে যায়। কবির ভাষায়–

'ত য়ের কাছে তারা
তাকায় পলক হারা
সকল তারা গুণতে গিয়ে
রাত হয়ে যায় সারা।।'

কবি রাতের সহচর। আবার ফুলের সাথেও মিতালি গড়েন। খুকুর খোঁপায় বাঁধেন দোপাটি। দোয়েলের সাথেও খেয়ালে মেতে ওঠেন তিনি। তোমাদেরকেও সাথে রাখতে চান। ভুলতে চান না তোমাদের। কবির ভাষায়–

'দ য়ের কাছে দেয়ালে
দোয়েল নামে খেয়ালে,
ফুল ফুটেছে দোপাটি,
বাঁধছে খুকু খোঁপাটি।।'

এখন নবান্নের সময়। মাঠে মাঠে সোনালি ধানের ছড়াছড়ি। কৃষকদের আনন্দের ছুটোছুটি। রাত জেগে কিষাণ বধূর ধান সিদ্ধের মাতামাতি। গ্রামের ধুলো-বালির রাজ্যপাট দেখতে মন চায় কবিরও। তোমরাও গ্রামে যেতে চাও নিশ্চয়ই! হ্যাঁ, কবি তোমাদের গ্রামের ধানের ক্ষেতে বেড়াতে নিতে চান। ধুলোবালির রাজ্যপাটে ঘুরতে চান। চল না, কবিকে সাথে নিয়ে একটু ঘুরে আসি। কবির আকুতি–

'ধ য়ের কাছে ধান খেতে
ওঠে আমার মন মেতে,
ধকে নিয়ে ধু ধু মাঠ
ধূলা-বালির রাজ্যপাট।।'

কবি ধুলা-বালির গাঁয়ের লোকজনের সাথে মিশে গিয়েছেন আপনার করে। হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসা দিয়ে। আমরাও কবির মতো করে গ্রামের সহজ সরল লোকজনকে আপন করে নেবো হৃদয় দিয়ে।

কবি ফুল-পাখিদের রাজ্যে তোমাদের যেতে বলেন। তাদের সাথে মিতালি করতে বলেন। কবি নিজেও ফুল-পাখিদের ভালোবাসেন। ওদের রাজ্যে সময় কাটান। কবির ভাবনায়–

'ফ য়ের কাছে ফলসা,
ফলসা গাছে জলসা,
জলসা হবে আজ যে
ফিঙে পাখির রাজ্যে।।'

ছোট্ট সোনামণিরা, আমরা কিন্তু তোমাদেরকে ভালো মানুষ হিসেবে দেখতে চাই। তাই আদর্শ ও চরিত্রবান হয়ে গড়ে উঠতে হবে তোমাদেরকে। আনন্দ-রাজ্যে সুখের নহর বইয়ে দিতে হবে তোমাদেরকেই। তাই এসো, আমরা সবাই ভালো মানুষ হই। সুজলা-সুফলা এ দেশটাকে মায়ের মতো ভালোবাসি। দেশপ্রেমে উজ্জীবিত হয়ে সোনার বাংলাদেশ গড়ি। তোমাদের অনাগত সুন্দর জীবনের প্রত্যাশায় রইলাম।



ফররুখ আহমদ : মুসলিম জাগরণের কবি

হাফিজুল হক ফাইয়ায

বিংশ শতাব্দীর শক্তিমান কবি ফররুখ আহমদের কবিতা তৎকালীন বাংলার অধঃপতিত মুসলিম সমাজকে পুনর্জাগরণের প্রেরণা জোগায়। দুর্ভিক্ষ-পীড়িত মানুষের হাহাকার, আর্তনাদ, অনাহার, কষ্টের করুণ পরিণতি, সমকালের সংকট এবং সাম্প্রদায়িকতার হিংস্রতা দেখে তিনি আঘাত পান। সমাজব্যবস্থার এ সকল অসঙ্গতি তাঁকে সাহিত্য সাধনায় অনুপ্রেরণা জোগায়।
বাংলা সাহিত্যের আধুনিকতম, শক্তিমান ও সৃজনশীল কবি হওয়া সত্ত্বেও তিনি কখনো আত্মপরিচয় ভোলেননি। কখনো আত্মবিমুখ হননি। তাঁর কবিতায় বাঙালি মুসলিম পরিচয়টি নানাভাবে তিনি নিয়ে এসেছেন।
অবশ্যি ছাত্রাবস্থায় তিনি ভারতবর্ষের কমরেড এম. এন রায়ের র‍্যাডিক্যাল মানবতাবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে বামপন্থী রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু জন্মসূত্রে ইসলামি আদর্শ ও ঐতিহ্যের অধিকারী কবি একসময় বামপন্থা থেকে ফিরে ধর্মীয় চিন্তায় নিমগ্ন হয়ে পড়েন। তাঁর কবিতায় ইসলামি সমাজব্যবস্থা মূর্ত হয়ে ওঠে।
কবি ফররুখ আহমদ ইংরেজ-বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনে গনজাগরণ মূলক কবিতা লিখে জনপ্রিয়তা পান। তিনি ছিলেন মুসলিম পুনর্জাগরণে বিশ্বাসী। ইসলামি আদর্শ ও আরব-ইরানের ঐতিহ্য তাঁর কবিতায় ব্যাঙময় হয়ে ওঠে। আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা কবিতায় আরবি-ফারসি শব্দের যে স্বার্থক প্রয়োগ শুরু করেন, মুসলিম রেনেসাঁর কবি ফররুখ আহমদ তা আরও বেগবান করেন।
কবি ফররুখ আহমদ ছিলেন একজন ভাষা-সৈনিক। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনে তিনি সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন নিয়ে তাঁর 'মধুর চেয়েও মধুর যে ভাই আমার দেশের ভাষা' গানটি বেশ জনপ্রিয় হয়। পাকিস্তান আন্দোলন চলাকালীন ভাষা বিতর্কের সময় থেকেই তিনি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে জোরদার ছিলেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরপর তিনি মাসিক সওগাত (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ১৯৪৭) সংখ্যায় 'পাকিস্তান : রাষ্ট্রভাষা ও সাহিত্য' নিবন্ধে লিখেন : 'গণতান্ত্রিক বিচারে যেখানে সমস্ত পাকিস্তানের

রাষ্ট্রভাষা বাংলা হওয়া উচিত, সেখানে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষাকে পর্যন্ত যারা অন্য একটি প্রাদেশিক ভাষায় রূপান্তরিত করতে চান তাঁদের উদ্দেশ্য অসৎ। পূর্ব পাকিস্তানের সকল অধিবাসীদের সাথে আমিও এই প্রকার অসাধু প্রতারকদের বিরুদ্ধে আমার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।' বায়ান্নর রক্তাক্ত ঘটনার পর রেডিওতে কর্মরত শিল্পী আলতাফ মাহমুদ, আব্দুল আহাদ, আব্দুল হালিম চৌধুরীদেরকে নিয়ে তিনি ধর্ম ঘটে যোগ দেন। তিনি তদানীন্তন পাকিস্তানি শাসকদের ব্যাঙ্গ করে 'রাজ-রাজড়া' নামে একটি নাটক লেখেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নাটকটি মঞ্চায়িত হয়। প্রখ্যাত নাট্যকার মুনীর চৌধুরী এতে অভিনয় করেন।

কবি ফররুখ আহমদ সৃষ্ট সাহিত্যসম্ভার বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। দর্শনগতভাবে তিনি ছিলেন মানবতাবাদী কবি।

নীতি-আদর্শের প্রশ্নে ছিলেন আপোসহীন।

'কে আসে কে আসে সাড়া পড়ে যায়/ কে আসে কে আসে নতুন সাড়া/ জাগে সুষুপ্ত মৃত জনপদ জাগে শতাব্দী ঘুমের পাড়া', কিংবা 'রাত পোহাবার কত দেরি পাঞ্জেরি?/এখনো তোমার আসমান ভরা মেঘে?/ সেতারা হেলাল এখনো ওঠেনি জেগে?/ তুমি মাস্তুলে আমি দাঁড় টানি ভুলে;/ অসীম কুয়াশা জাগে শূন্যতা হেরি' এমন অসংখ্য কালজয়ী কাব্য-পঙক্তির রচয়িতা কবি ফররুখ আহমদ।

১৯৪৩ সালে বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষ নিয়ে অনেকগুলো কবিতা রচনা করেন তিনি। তাঁর ১৯টি কবিতায় তখন বাংলার চিত্র ফুটে ওঠে। ১৯৪৩ সালে কিশোর কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য 'আকাল' নামে একটি সংকলন প্রকাশ করেন। তাতে কবি ফররুখ আহমদের বিখ্যাত 'লাশ' কবিতাটি স্থান পায়। দুর্ভিক্ষ নিয়ে অদ্যবধি বাংলা সাহিত্যে 'লাশ'-এর মতো কবিতা আর কেউ লিখতে পারেননি। 'লাশ' কবিতায় ব্যথিত কবির উচ্চারণ ছিল এমন–

'যেখানে পথের পাশে মুখ গুঁজে প'ড়ে আছে জমিনের 'পর;
সন্ধ্যার জনতা জানি কোনদিন রাখে না সে মৃতের খবর।'

'সাত সাগরের মাঝি' কাব্যগ্রন্থ তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। এটি কবির প্রথম প্রকাশিত কাব্য গ্রন্থ। প্রকাশক ছিলেন কবি বেনজীর আহমদ। প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন। মুসলিম ঐতিহ্যের পুনর্জ্জীবন কামনা করে রোমান্টিকতার আবহে কবি জাতিকে জেগে ওঠার আহ্বান করেছেন এ গ্রন্থে। অন্যরা যখন জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্যে এগিয়ে যাচ্ছে কবি তখন পিছিয়ে পড়া তাঁর নিজ জাতিকে জেগে ওঠার ডাক দেন। কবির আহ্বান–

'কত যে আঁধার পর্দা পারায়ে ভোর হল জানি না তা
নারঙ্গী বনে কাঁপছে সবুজ পাতা।
দুয়ারে তোমার সাত সাগরের জোয়ার এনেছে ফেনা
তবু জাগলে না? তবু তুমি জাগলে না?
সাত সাগরের মাঝি চেয়ে দেখো দুয়ারে ডাকে জাহাজ
অচল ছবি সে, তসবীর যেন দাঁড়ায়ে রয়েছে আজ।'

'সাত সাগরের মাঝি' বিস্ময়কর এক কাব্যগ্রন্থ। প্রকাশের এতো বছর পরও এ গ্রন্থ সমানভাবে জাগ্রত ও প্রাণবন্ত। পাঞ্জেরী কবিতাটি আজও জাগরণন্মোখ মুসলিম তরুণদের প্রেরণা জোগায়। কবির কী উদাত্ত জিজ্ঞাসা–

'রাত পোহাবার কত দেরী পাঞ্জেরী?
এখনো তোমার আসমান ভরা মেঘে?
সেতারা হেলাল এখনো ওঠেনি জেগে?
তুমি মাস্তুলে আমি দাঁড় টানি ভুলে;
অসীম কুয়াশা জাগে শূন্যতা ঘেরী।'

কবি ফররুখ আহমদকে চরম দারিদ্র্যের সাথে জীবন যাপন করতে হয়েছে। কিন্তু অর্থের প্রতি, ক্ষমতার প্রতি তাঁর কোনো মোহ ছিল না। দারিদ্রতাকে তিনি সাদরে গ্রহণ করেছিলেন। ভোগ-বিলাসিতা তিনি ঘৃণা করতেন। নিজের কবিতার মতোই ছিল কবির দৈনন্দিন জীবন।

'তোরা চাসনে কিছু কারো কাছে খোদার মদদ ছাড়া
তোরা পরের উপর ভরসা ছেড়ে নিজের পায়ে দাঁড়া।'



দুঃস্বপ্নের রাত

ফাহিম আবরার

সন্ধে ঘনিয়ে এসেছে। পুব আকাশের নক্ষত্ররা এখনো জেগে উঠেনি। পঞ্চমীর চাঁদের আলো ত্যারছাভাবে গায়ে এসে পড়ছে। আনিস হাইকোর্ট মোড় পার হয়ে ফুটপাত ধরে হাঁটা দিল। ল্যাম্পপোস্টের আবছা হলুদ আলোয় দু'পাশের প্রকাণ্ড গাছগুলো ভূতুরে দেখাচ্ছে। মাঝেমাঝে শুকনো পাতা মাড়ানোর খসখস শব্দ হচ্ছে। রাস্তার ওপারে বখাটে কিছু ছেলে বেয়াড়া সুরে গান ধরেছে। আনিসের অবশ্য শুনতে খারাপ লাগছে না। একটু শীত শীত লাগছে। আনিসের গায়ে আকাশি রঙের ফিনফিনে একটা পাঞ্জাবি।

হাঁটতে হাঁটতে এক সময় বিশাল ফুটপাত অর্ধেক হয়ে আসে। ফুটপাতের বাকি অংশটা জুড়ে কিছু মানুষের বসবাস। মানুষই বটে। তবে এদের কোনো ঠিকানা নেই। নেই কোনো পরিচয়। রঙিন ত্রিপল দিয়ে বানানো ছোট্ট ঝুপড়িটা এদের স্বপ্নের ঘর, স্বপ্নের পৃথিবী। ধুলোমাখা মলিন চট আর ছেঁড়া কাঁথা এদের স্বপ্নের বিছানা। এই ঘরে বসে এক মা তার সন্তানদের নিয়ে স্বপ্নের রাজ্যে ঘুরে বেড়ান। তাদের এই স্বপ্ন কখনো ভঙ্গ হয় না। স্বপ্ন দেখার অধিকার নিয়েই তারা বেঁচে থাকে।

আনিস প্রতিদিন এই ফুটপাতে আসে। নিষ্ঠুর জীবনের প্রতি ত্যক্ত মানুষগুলোর খোঁজখবর নেয়। মাসের শুরুতে কিছু পয়সা পকেটে জমা পড়লে এদের সাথে ভাগাভাগি করে। দারিদ্রের তীব্র কষাঘাতে মৃতপ্রায় মানুষগুলোর শুষ্ক মুখে সজীব হাসি ফোটাবার চেষ্টা করে। সেই চেষ্টা সফল হয় না খুব একটা। হেঁটে যাওয়ার সময় কিছু লোক বড় বড় চোখে আনিসকে দেখে। আনিস থোড়াই কেয়ার করে।

স্তব্ধ রজনী। নক্ষত্রের শুভ্রতায় সমস্ত আকাশটা মাখামাখি। পেঁজা মেঘের আড়ালে অস্পষ্ট হয় চাঁদের উজ্জ্বল আলো। রাস্তার ডান পাশে একটা মসজিদ চোখে পড়ে। টুপিটা মাথায় চাপিয়ে মসজিদে ঢুকে যায় আনিস।

এশার জামাত শেষ হয়েছে ঘণ্টাখানেক। পুরো মসজিদে সাকুল্যে একজন নামাজ পড়ছে মাথায় রুমাল বেঁধে। এক কোণ থেকে কোরআন তেলাওয়াতের

মৃদু স্বর ভেসে আসছে।
আজ তেলাওয়াতে কোনোভাবেই মন বসাতে পারছে না আনিস। প্রবল অস্বস্তি হচ্ছে। অস্বস্তির কারণ একটা প্যাকেট। একটা লাল প্যাকেট। বেশ বড়সড়। বাঁ দিকের একটা পিলারের আড়ালে পড়ে আছে ওটা। আনিস যেখানে বসে আছে ঠিক ওখান থেকেই দেখা যাচ্ছে প্যাকেটটা। চিন্তায় পড়ে গেল আনিস। কী করবে বুঝে উঠতে পারছে না। দুরু দুরু বুকে প্যাকেটটা হাতে নিল সে। আঁতিপাঁতি করে খুঁজেও মুয়াজ্জিন বা খাদেম কাউকে পাওয়া গেল না। ভাল বিপদেই পড়া গেল বোধহয়। শেষতক সিদ্ধান্ত নিল আনিস, প্যাকেটটা সাথে করেই নিয়ে যাবে। অসাধু লোকের তো আর অভাব নেই এ দেশে। সকালে ইমাম সাহেবের হাত তুলে দিলেই কেসসা খতম।
রাতে চারটে খেয়ে শুয়ে পড়ল আনিস। কিন্তু ঘুম আসছে না মোটেও। প্রচণ্ড কৌতূহল হচ্ছে। অন্যায় এই কৌতূহল কোনোভাবেই হজম করতে পারল না সে। প্যাকেটটা খুলে ফেলল সে। সুন্দর দুটি চেক আর কিছু কাগজপত্র বেরিয়ে এল। চেক দুটি হাতে নিয়ে টাকার অঙ্কের দিকে চোখ বুলাতেই আঁতকে উঠল আনিস। হৃৎপিণ্ড এমনভাবে লাফাতে লাগল যেন, যে কোনো মূল্যে বেরিয়ে আসতে চাইছে। দুটো চেকে ত্রিশ লাখ করে মোট ষাট লাখ টাকা!
হতবিহ্বল ভাবটা দ্রুত কাটিয়ে উঠে আনিস। পরিকল্পনা স্থির করে। ফুটপাতে পড়ে থাকা বুভুক্ষু মানুষগুলোর করুণ চেহারা ভেসে উঠে চোখের সামনে। পাঞ্জাবী গায়ে চড়ায়। ডান হাতে শক্ত থাবায় প্যাকেটটা নিয়ে ছুটতে থাকে।
দুই লেনের রাস্তাটা পার হলেই পৌঁছে যাবে ওদের বস্তিটায়। ক্ষুধার তাড়নায় চিরমলিন কতগুলো মুখ দেখতে পায় আনিস। এরা জানে না, আজ এদের ভাগ্যাকাশে শুকতারার উদয় হচ্ছে। অদ্ভুত এক পুলক অনুভব করে আনিস। রাস্তা পার হবার জন্য পা বাড়ায়। হঠাৎ যেন অদৃশ্য এক দেয়ালের সাথে প্রচণ্ড ধাক্কা খায়। হাত-পা কাঁপতে থাকে থর থর করে। আর এক চুলও এগুনোর শক্তি নেই তার। চিন্তার জগতে বোধোদয় ঘটে। উল্টো দিকে দৌড়াতে থাকে আনিস।
রাত বেশই হয়নি। সবে এগারটা। মসজিদে খাদেম-টাদেম কাউকে পাওয়া যাওয়ার কথা। খাদেমকে পাওয়া গেল। স্বস্তি বোধ করল আনিস। সব শুনে চিৎকার করে উঠল খাদেম ‘হ একটু আগেই তো খুইজা গেল একটা লোক। আপনে খাড়ান আমি ডাইকা আনি।’ হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে আসল খাদেম। হতাশার ভঙ্গিতে ঠোঁট উল্টাল, ‘দাড়ান, আমারে নাম্বার দিয়া গেসে, একটা ফোন লাগাই।’ ফোনে পাওয়া গেল লোকটাকে। হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলো।’
‘কই, পাইসেন?’
‘হ, এই যে লন।’ প্যাকেটটা হাতে তুলে দিল খাদেম। আধটেকো মাথার মধ্যবয়সী লোকটার হর্ষোৎফুল্ল চেহারাটা বেশ উপভোগ করল আনিস। তীক্ষ্ম চোখে লোকটার কাণ্ড দেখতে লাগল। খুশি হয়ে লোকটা যা দিবে আনিসকে সেটার অঙ্কটাও কম হবে বলে মনে হয় না। খুব বেশি বোকা বলেই হয়তো নিজের কথা ভাবে না আনিস। মাঝে মাঝে বোকা মানুষেরা পৃথিবীর জন্য প্রয়োজনীয় হয়ে উঠে। জিনিসগুলো বুঝে নেয়া শেষ হল লোকটার। সহজ একটা হাসির রেখা আশা করছিল আনিস। সেটা পাওয়া গেল না। চোখ তুলে আনিসের দিকে তাকাল সে, ‘অ আপনিই তাহলে সেই লোক? আমি তো আগেই সন্দেহ করেছিলাম। ভালোই হলো, পুলিশের কাছে যাচ্ছিলাম। টাকাটা যেহেতু পাওয়া গেল, ভাবছি ঝামেলা বাড়াব না। ভালো হয়ে যান।’ হন হন করে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল লোকটা।
উদভ্রান্তের মত হাঁটছে আনিস। মনে হলো কোনো কারণে পৃথিবীটা দুলছে। দু’চোখে অন্ধকার দেখছে। হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে। সামনের বিজন চত্বরটা বিশাল ফাঁকা মাঠের মত দেখাচ্ছে।
বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি শুরু হয়েছে। শেষ শ্রাবণের ঝুম বৃষ্টি ধুয়ে দিচ্ছে ছোট্ট শহরের যাবতীয় পঙ্কিলতা।

বাইতুল উলুম, গেণ্ডারিয়া

(কাশ্মীরের গল্প)

কারফিউ

তামীম আদনান

'মা...!'
রিয়ানার চিৎকার শুনে দৌড়ে ওর কাছে গেল আফসানা। ভয়ে কাঁপছে ও। চোখদুটো বন্ধ। জোর করেই আটকে রেখেছে চোখের পাতাগুলো।
'কী হয়েছে মা? এই তো আমি এসেছি, চোখ মেলে দেখো।' মেয়েকে জড়িয়ে ধরে বলল আফসানা। রিয়ানাও মাকে শক্ত করে চেপে ধরেছে।
'মা, দেখো!'–চোখ বন্ধ করেই বলছে রিয়ানা, এখনো ভয়ে কণ্ঠ কাঁপছে তার–'মোমবাতির আগুনটা কেমন আমার দিকে ধেয়ে আসছে!'
'কিচ্ছু না মা! চোখ মেলে দেখো কিচ্ছু হয়নি। এই তো সব ঠিক আছে।' মেয়েকে সাহস দিল আফসানা। বুঝতে পেরেছে জ্বরের তীব্রতায় আবোল-তাবোল দেখছে রিয়ানা। 'এই যে, মা আছি তোমার সাথে, কোনো ভয় নেই। আমার দিকে তাকাও, রিয়ানা, লক্ষ্মী মা আমার।'
আফসানার কথায় কাজ হলো। চোখ মেলে তাকাল সে।
'অনেক ভয় করছে, মা।' ক্ষীণ আওয়াজে বলল রিয়ানা।
'কোনো ভয় নেই,'–মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে বলছে আফসানা–'আমি আছি তো তোমার সাথে।'
'হুমম্' আস্তে করে আবার চোখ বুজল রিয়ানা। মেয়ের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আফসানা। গভীর এক দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো তার বুক চিড়ে। তিন দিনের জ্বরে কেমন শুকিয়ে গেছে মেয়েটা। চোখের উজ্জ্বলতাও ম্লান হয়ে গেছে। ফরিঙের মতো চঞ্চল মেয়েটা নিস্তেজ হয়ে পড়ে আছে বিছানায়। এই তো সেদিনই ফজরের নামাজ পড়ে আফসানা দেখে রিয়ানা বাসায় নেই। কই গেল, কই গেল করে সারা বাসা তারপর মহল্লায় খুঁজল, অথচ তার কোনো পাত্তা নেই। অবশেষে যখন খোঁজাখুঁজি বাদ দিয়ে রাগে ফুঁসছিল সে, তখনই 'মা! মা!' বলে ডাকতে ডাকতে এলো রিয়ানা। জামার আস্তিন ভরা বিভিন্ন ফুল এনে বলছে, 'মা, চলো তোমায় বউ সাজিয়ে দিই।'
রিয়ানার কানে ফুল, মাথায় ফুল, চুলে ফুল, ঠিক যেন ফুলপরী। ওকে দেখেই রাগ পড়ে গিয়েছিল আফসানার। তার বউ সাজানোর কথা শুনে হাসি আটকাতে পারেনি সে। 'একটা দিব ধরে' হাত উঠিয়ে আহ্লাদী কণ্ঠে এই কথা বলতেই আস্তিনের সমস্ত ফুল ওর মাথার উপর ছুড়ে দিল রিয়ানা, আর হাসতে হাসতে বলল, 'দেখো, তোমার উপর ফুলের বৃষ্টি ঝরালাম।'
জানালা দিয়ে আসা ভোরের আলোয় মা-মেয়ের এই ফুল নিয়ে খেলা-হাসির দৃশ্য, সেদিন স্বর্গীয় হয়ে উঠেছিল। রিয়ানাকে আফসানার স্বর্গ থেকে নেমে আসা ফুলপরীই মনে হয়। তার স্বর্গীয় ফুলপরী আজ জ্বরে বিছানায় পড়ে আছে, ভাবতেই মনটা কেমন করে উঠল আফসানার। রিয়ানার কপালে একটা চুমু এঁকে দিল সে। চারদিকে রাতের নিস্তব্ধতা। জানালা দিয়ে আসা বাতাসে মোমবাতির

আলোটা এদিক-ওদিক দুলছে। মায়ের আদরের স্পর্শ পেয়ে তার হাত চেপে ধরল রিয়ানা।
'মা, দাদা কি সত্যিই আকাশের তারা হয়ে গেছে?' ক্ষীণ আওয়াজে জিজ্ঞেস করল সে।
'হুমম...।' আফসানা জানে, দাদাকে প্রচণ্ড ভালোবাসে রিয়ানা। দাদাও বেঁচে থাকতে খুব ভালোবাসতেন ওকে। যখন তিনি মারা গেছেন তখন মৃত্যুর এই চরম সত্য ব্যাপারটা রিয়ানা তেমন বুঝত না। এখন হয়তো মোটামুটি বোঝে। বয়সের চাইতে একটু বেশিই পরিণত হচ্ছে সে।
'মা, আমি যদি মারা যাই, তাহলে কি দাদার মতো আকাশের তারা হব?'
মেয়ের প্রশ্নে অবাক হয়ে গেল আফসানা। মুখটা হা হয়ে আছে তার। মনের মাঝে অজানা আতঙ্ক ভর করেছে আফসানার। বুকের মাঝে চেপে ধরল সে মেয়েকে। জানালা দিয়ে তাকিয়ে থাকল অন্ধকারে ঘাপটি মেরে থাকা দূর উপত্যকার দিকে। মেয়ের প্রশ্নের কোনো উত্তর বের হলো না আফসানার মুখ থেকে। অন্ধকার রাতটা আজ বেশিই অন্ধকার মনে হচ্ছে।

কদিন ধরে পুরো রাজ্যে কারফিউ চলছে। ঢালাওভাবে শুরু হয়েছে ধরপাকড়। বড় বড় নেতারা হয়েছে নজরবন্দি। আবার কেউ কেউ চলে গেছে কারাগারে। একেবারে পূর্ণ স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখা কাশ্মীরিদের স্বায়ত্তশাসনও উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। এতোদিন কাজেকর্মে পরাধীন ছিল, সেটা এখন খাতা-কলমেও হয়ে গেছে। সারা রাজ্যে থমথমে পরিবেশ বিরাজ করছে। পুরুষরা বাড়ির বাইরে বের হতে পারছে না। যতটা আন্দোলন হচ্ছে নারীরাই করছে। স্কুল-কলেজ সব বন্ধ। যোগাযোগের প্রায় সব ব্যবস্থাই বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। আজ ভোর থেকে বিদ্যুৎ-সংযোগও বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে রাজ্যের বেশিরভাগ স্থানে। এর মধ্যে আবার মেয়েটা তিনদিন ধরে জ্বরে ভুগছে। ভালো একজন ডাক্তার দেখানো প্রয়োজন, কিন্তু সেটা সম্ভব হচ্ছে না। তাই খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছে রিয়াজ শরীফ। ঘরের বারান্দার চেয়ারে বসে চুরুটের ধোঁয়া ছাড়ছে আর ভাবছে, কী করবে।
রিয়ানা একমাত্র মেয়ে তার। ভালোবাসার পুরো জায়গাটা জুড়ে সে। অথচ মেয়েটার জন্য তেমন কিছুই করতে পারছে না। একদিকে নিজেকে অসহায় আর অপরদিকে খুব অপরাধী মনে হচ্ছে। একটু আগে পাশের বাড়ির বন্ধু ডাক্তার ইকবাল এসে রিয়ানাকে দেখে গেছে। বলেছে হাসপাতালে নিয়ে যেতে পারলে ভালো হয়। যে কোনো মুহূর্তে খারাপ কিছু ঘটে যেতে পারে।
সকাল হলেই রিয়ানাকে হাসপাতালে ভর্তি করার ব্যবস্থা করবে বলে মনে মনে ঠিক করেছে রিয়াজ।
চারদিক নীরব অন্ধকারাচ্ছন্ন। আধুনিক জমানায় বিদ্যুৎ ছাড়া পৃথিবী কতটা অন্ধকার হতে পারে তা প্রবলভাবে বোঝা যাচ্ছে রাতের কাশ্মীর দেখে। আল্লাহই জানেন, এবার কী খারাপ মতলব এঁটেছে ভারত সরকার। হয়তো সেনাবাহিনী দিয়ে প্রত্যেক ঘরে ঘরে হামলা চালাবে। অনেক বাড়িতে অবশ্য তেমনটা করেছেও। বুকের ভেতরটা ছ্যাঁৎ করে উঠল রিয়াজের। এখন যদি তাদের ঘরে হামলা করে সেনাবাহিনী তাহলে কী হবে! চোখের সামনে ভেসে উঠল আফসানার সুন্দর মুখ। মনের অজান্তেই শক্ত মুষ্টিবদ্ধ হলো হাত। যদি বউয়ের গায়ে কোনো আঁচড় লাগে ছেড়ে কথা বলবে না সে। তাতে প্রাণ যায় যদি যাক। জীবন থাকতে স্ত্রীর বেইজ্জতি হতে দেবে না।
'এই, শুনছ!'–ঘরের ভেতর থেকে চিৎকার করল আফসানা–'রিয়ানা কেমন যেন করছে।' শেষের অংশটায় কান্না মিশ্রিত ছিল কণ্ঠে।
দৌড়ে ঘরের ভেতর গেল রিয়াজ। সত্যিই কেমন যেন করছে রিয়ানা। সারা শরীর কাঁপছে। দাঁতে দাঁত লেগে গেছে।
'রিয়ানা! রিয়ানা!' রিয়ানার বাহু ধরে দুবার ঝাঁকি দিল রিয়াজ। তারপর স্ত্রীকে বলল, 'তুমি ওকে নিয়ে বাড়ির গেটে এসো! আমি অটো নিয়ে আসছি। ওকে হাসপাতাল নিতে হবে।'
রিয়াজ একরকম দৌড়ে বের হলো বাড়ি থেকে। হাত ঘড়িটা হাতেই ছিল। একবার সময়টা দেখল। রাত ১২টা বেজে ৪৯ মিনিট। আশেপাশে কোনো অটো দেখতে পাচ্ছে না। দৌড়ে সামনের মোড়ে গেল, নাহ কোনো অটো নেই। রাস্তায় শুধু সেনাবাহিনী টহল দিচ্ছে। একটা কুকুরও নেই, অটো থাকবে কোত্থেকে। পেছন ফিরে আবারও দৌড় দিল রিয়াজ। উদ্দেশ্য বিপরীত দিকের রাস্তার মোড়। কিন্তু বেশি দূর যেতে পারল না। সেনাবাহিনীর এক সদস্য ডাক দিল তাকে। কী করবে সে বুঝতে পারল না। ডাকে সাড়া দিতে গেলে দেরি হয়ে যাবে, আর সাড়া না দিলে ফায়ারও হতে পারে। ভাবতে ভাবতেই সেনা সদস্য কাছে এসে পড়ল।

'চল! এতো রাতে রাস্তায় দৌড়ানোর মতলব কী তোর?'–কলার চেপে ধরেছে সৈন্য–'জানিস না কারফিউ চলছে! হামলা করতে এসেছিস! আজাদি চাস! আয় দেখাচ্ছি আজাদি!' রিয়াজকে টেনে নিয়ে গেল মোড়ের একটু সামনে। একটি মিলিটারি ভ্যান দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। সাথে দাঁড়ানো আছে দু-চারজন সেনা।

'স্যার, আমার মেয়ের খুব জ্বর, হাসপাতালে নিতে হবে, অটো খুঁজছিলাম।'–এক নাগাড়ে বলে যাচ্ছে রিয়াজ—'আমায় ছেড়ে দিন স্যার, আমার মেয়ে খুব অসুস্থ।'

সেনা সদস্যটি তাকে ভ্যানের কাছে নিয়ে আসতে আসতে বলল, 'তোর মেয়ের বয়স কত রে?' কুৎসিত একটা হাসি দিয়ে জিজ্ঞেস করল সেনা সদস্য। রাগে গায়ের লোম দাঁড়িয়ে গেল রিয়াজের, তবুও স্বাভাবিকভাবে বলল, 'নয় বছর স্যার।'

'প্লিজ স্যার! আমায় ছেড়ে দিন, আমার মেয়েটা মারা যাবে।' হাত জোড় করে বলল রিয়াজ।

'ইসস আরেকটু বড় হলে তো তোর মেয়েকে আমরাই হাসপাতালে নিয়ে যেতাম।' ভ্যানের সাথে হেলান দেওয়া এক সেনা কথাটা বলেই খিক খিক করে হাসল।

'জ্বরে মানুষ মওে না, তোর মেয়েও মরবে না।' ওকে ধরে আনা সেনা বলল।

'স্যার! স্যার! ছেড়ে দিন স্যার, আমার মেয়েটার তিনদিন ধরে জ্বর! ডাক্তার বলেছে হাসপাতালে না নিলে খারাপ কিছু হয়ে যেতে পারে।' এবার সেনার পা ধরে বলল রিয়াজ।

'তোর বউ কই? তোর বউ নিয়ে যাবে হাসপাতালে! তুই চল থানায়।' পাশে থাকা আরেক সেনা বলল।

কী করবে রিয়াজ খুঁজে পেলো না। ধাক্কা দিল সেনা সদস্যকে, 'আমি বলছি না আমার মেয়ে অসুস্থ, আমি কী অপরাধ করেছি যে, আমায় থানায় যেতে হবে!' এবার রেগে গেছে রিয়াজ।

'থানায় না গেলে এখানেই মরবি! চল! ওঠ ভ্যানে।' পালটা ধাক্কা দিল ওকে ধরে আনা সেনা।

'মারা আর ধরা ছাড়া তোদের আর কোনো কাজ আছে নাকি! শালা! এই জন্যই তো তোদের বোম দিয়ে মারাই ভালো।' চেঁচিয়ে বলল রিয়াজ। আর সাথে সাথে পেছনে দাঁড়ানো সেনা লাঠি দিয়ে পায়ের মধ্যে বাড়ি দিল রিয়াজের। ব্যাথায় বসে পড়ল সে।

'শালা! আমাদের দেশে থেকে আমাদের উপর বড় বড় কথা তাই না, দাঁড়া!' বলেই ওকে ধরে আনা সেনা সদস্য মারতে শুরু করল রিয়াজকে। 'তুই তো মরবি, তোর বউ-বাচ্চাও মরবে।' হাতের সাথে মুখও চলছে সমান তালে সবার।

পিটিয়ে আধমরা করে রিয়াজকে গাড়িতে তুলল সেনাসদস্যরা। একটু উপরের র‍্যাঙ্কে থাকা সেনা অন্য একজনকে অর্ডার করল, খোঁজ নাও ওর বাসা কই? ওর বউ-বাচ্চাকে ধরে নিয়ে আসো।'

'জি স্যার!' বলেই দুজন পা চালাল যেদিক থেকে রিয়াজকে ধরেছে সেদিকে।

চারিদিকে ঘন অন্ধকার। কোথায় কিছুই সহজে চোখে পড়ছে না। রিয়ানাকে কোলে নিয়ে গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছে আফসানা। অপেক্ষা করছে স্বামীর। এদিকে রিয়ানার কোনো সাড়া শব্দ নেই। গরম তাপ থেকে শরীর কেন জানি আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। অনবরত কাঁদছে আফসানা। আর একটু পর পর রিয়ানাকে ঝাঁকি দিয়ে ডাকছে 'রিয়ানা! রিয়ানা!' বলে। প্রথম গোঙানির মতো আওয়াজ করলেও এখন কিছুই বলছে না। কী করবে ভাবতে পারছে না আফসানা। এমন সময় হঠাৎ এগিয়ে আসতে দেখল দুজন লোককে। বুকে যেন সামান্য আশার সঞ্চার হলো। বাড়ির পাশেই একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করে উঠল। হয়ত সতর্ক করছে কাউকে। সেদিকে খেয়াল নেই আফসানার। সে তাকিয়ে আছে দুজনার আসার পথে। দুজন সেনা আসছে তার বাড়ির দিকে। কী করবে আফসানা বুঝতে পারছে না। নাহ, মেয়েকে বাঁচাতে হবে। দৌড়ে গেল সেনাদের কাছে। পেছন থেকে ঘেউ ঘেউ করে উঠল কুকুরটা।

'আমার বাচ্চাটার খুব জ্বও, একটু হাসপাতাল নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করুন প্লিজ। ওর বাবা অটো আনতে যেয়ে হয়তো পাচ্ছে না। কারফিউ চলছে তাই হয়তো কোনো অটো নেই। আপনারা একটু সাহায্য করুন না।' কাতর গলায় সেনাদের বলল আফসানা।

দুজন সেনা পরস্পর চেহারার দিকে চাওয়া চাওয়ি করল। তারপর বলল, 'চলো!'

পেছনের কুকুরটা করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওদের গমনপথের দিকে। হয়তো ভাবছে, সত্যিই কি ওদের এই রাস্তা শেষ হবে হাসপাতালে যেয়ে?

লেখক : ছাত্র, জামেয়া হুসাইনিয়া ইসলামিয়া আরজাবাদ, মিরপুর ১, ঢাকা

সোনালি দিনের গল্প : স্বর্ণযুগের বর্ণিল দৃশ্যায়ন

মুনশী নাঈম

ইতিহাসের গল্প লেখা আর নিজের কল্পনায় সাজানো গল্প লেখা–দুটোকে এক পাল্লায় মাপা যায় না। আকর্ষণীয় করে তুলতে নিজের বানানো গল্পে ইচ্ছেমতো চরিত্র ঢুকিয়ে দেয়া যায়, ইতিহাসের গল্পে এই চতুর কর্মটা একটু কঠিন, একটু সংবেদনশীল। ইতিহাসের গল্পে সামান্য এদিক-সেদিক হলে মানুষ সেটাকে গল্প বলে না, বলে বিকৃত ইতিহাস।

'সোনালি দিনের গল্প' নিরেট ইতিহাসের গল্প, বিকৃত ইতিহাসে ফেলার কোনো সুযোগ নেই গল্পগুলোকে। যে যুগ আমাদের দর্পের, যে যুগের মানুষ আমাদের শক্তি ও সাহসের, সেই উমাইয়া ও আব্বাসি খেলাফত যুগের গল্পগুলো নান্দনিক কুশলতায় কাগজের পাতায় তুলে এনেছেন হামমাদ রাগিব। এ কালের ভাষায় সেকালের দৃশ্যায়ন পড়তে গিয়ে কোনো জটিলতায় পড়তে হয় না–এমনই ঝরঝরে, তকতকে। 'ধর তক্তা মার পেরেক'-জাতীয় নয়, বরং সূত্র ঘেটে পরম যত্নে সেলাই করা নকশি কাঁথার মতোই সতর্ক বুনন টের পাওয়া যায় গল্পের প্লট ও ভাষ্যে।

সাতটি দারুণ গল্পে সাজানো হয়েছে সোনার তশতরি 'সোনালি যুগের গল্প'। প্রথম গল্প 'দামেশকের মুসাফির'। সমরকন্দ থেকে গল্পটি হেঁটে যায় দামেশকে। যেতে যেতে দৃশ্যায়িত হয় ইসলামি খেলাফতের সোনালি সময়ের নানাকীর্তি। সমরকন্দের পুরোহিতদের পক্ষ থেকে জনৈক মুসাফির অদ্ভুত এক অভিযোগ নিয়ে উপস্থিত হয় উমর ইবনে আবদুল আজিজের দরবারে। কিন্তু ন্যায়বিচারের যে দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেন উমর ইবনে আবদুল আজিজ ও তাঁর প্রশাসন, শুধু মুসাফির নয়, বিস্মিত হয়ে সমরকন্দের পুরোহিতরাও ইসলাম গ্রহণ করে ফেলেন সঙ্গে সঙ্গে।

দ্বিতীয় গল্প 'আমানতদারিতার পুরস্কার'। গল্পটি প্রতিটি পাঠককে দাঁড় করাবে বিচারের কাঠগড়ায়। আমানতদারির গল্পটি পড়ে পাঠক নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করে উঠবেন, এমন সঙ্গিন পরিস্থিতিতে আমি কী করতাম?

তৃতীয় গল্প 'স্পেন বিজয়ের বীরত্ব গাথা'র মূল ঘটনা পড়েছেন অনেকেই। কিন্তু এখানে পড়বেন একটু অন্যভাবে, আরেকটু তেজস্বী করে। দৃশ্যের বর্ণনা খানিকটা এমন–তারিক বিন যিয়াদের বক্তব্য মনে হবে সামনে দাঁড়িয়ে শুনছেন। চতুর্থ গল্প 'ছদ্মবেশী খলিফা'য় পাওয়া যায় ওমর রা.-এর মতো অচেনা নতুন এক ছদ্মবেশ। পঞ্চম গল্প 'কায়েদি'তে গল্পকার হামমাদ রাগিব আপনাকে চমকে দেয়ার পুরোপুরি আয়োজন করে রেখেছেন। খলিফা মামুনুর রশিদের কয়েদখানায় তৈরি হয়েছিল এই গল্প। ষষ্ঠ গল্প 'ওয়া মু'তাসিমা', নির্যাতিতা এক নারীর আর্তনাদে বাজপাখির মতো ছুটে যাওয়া খলিফা মু'তাসিম বিল্লাহর গল্পটি আমাদের পরিচিত, কিন্তু পাঠক এখানে গল্পটিকে আরেকটু বিস্তারিত, সুনির্দিষ্ট তথ্যনির্ভর এবং ঝরঝরে ও সতেজ বর্ণনায় পড়ে তৃপ্ত হবেন। সপ্তম এবং সর্বশেষ গল্প 'শহিদ-জননী'। জিহাদের ময়দানের আবেগঘন ধারাবর্ণনা এমন করুণ হয়ে ধরা দেবে, চোখের জল আটকে রাখা মুশকিল। জীবন থেকে বিদায় নিতে যাওয়া ছেলে জিহাদের ময়দান থেকে মায়ের কাছে পাঠাচ্ছে শেষ বার্তা, এরচেয়ে বেদনার আর কী হতে পারে!

বায়োস্কোপের জানালায় তাকালে রঙ-বেরঙের দৃশ্য দেখা যায়। এই বইটিও ধরতে পারেন একটি বায়োস্কোপ। এর পাতায় পাতায় আপনার চোখে ফুটে উঠবে সোনালি যুগের বর্ণিল সব গল্প। অবিকল বায়োস্কোপের মতো। ইতিহাসের নতুন এ বায়োস্কোপে আপনাকে স্বাগতম।

বই পরিচিতি



লেখক: হামমাদ রাগিব
মূল্য: ১০০ টাকা
প্রকাশক: নবপ্রকাশ
দূরালাপন: ০১৯৭৪৮৮৮৪৪১



নবধ্বনি

নভেম্বর ২০১৯ । বর্ষ ১২ । সংখ্যা ১০

মওলানা ভাসানী

আমি কিংবদন্তির কথা বলছি

নভেম্বর ২০১৯ । বর্ষ ১২ । সংখ্যা ১০

মূল্য ৫ টাকা মাত্র

নবধ্বনি । দোকান নং ২৭ । ২য় তলা । ইসলামী টাওয়ার ১১/১ বাংলাবাজার । ঢাকা
সার্কুলেশন : ০১৩১৮ ৬৩৪৪১২ । সম্পাদনা : ০১৭৪৫ ১৩৯২১৫

Email: nobodhoni@gmail.com   web: noboprokash.com/nobodhoni

স্বাগত কলাম

কখনো ক্ষুদ্র চিন্তা করবেন না। নিজেকেও নিয়েও না, অন্যকোনো বিষয় নিয়েও নয়। যখনই চিন্তা করবেন, অবশ্যই বৃহত কিছু চিন্তা করবেন।

উদাহরণ দেই। একটা বই লিখবেন। আপনার বইয়ের পাঠক কারা? ধরলাম আপনি মাদরাসার ছাত্র বা মাদরাসা থেকে পাশ করা একজন মওলানা-লেখক। এই দৃষ্টিকোণ থেকে আপনি চিন্তা করছেন যে আপনার বইয়ের পাঠক হবে মাদরাসার ছাত্র-শিক্ষকগণ এবং মহিলা মাদরাসার জেনানাগোষ্ঠী। আপনাকে সতর্ক করে দিয়ে বলছি, এই চিন্তা আজ থেকে আর কখনোই করবেন না।

আপনি যখন একটা প্রবন্ধ, গল্প, কলাম বা একটা জলজ্যান্ত বই লিখবেন তখন আপনাকে প্রথমেই চিন্তা করতে হবে–আপনার বইয়ের উদ্দিষ্ট পাঠক হলো দেড়শ কোটি মুসলিম। কথাটা আমি পুনরোল্লেখ করছি–আপনার উদ্দিষ্ট পাঠক হলো দেড়শ কোটি মুসলিম। হতে পারে আপনার বইটি বাংলাভাষায় বা উর্দু-আরবিতে লেখা, কিন্তু আপনি যখন বইটি লিখতে যাবেন তখন অবশ্যই আপনাকে দেড়শ কোটি মুসলিমের কথা মাথায় রেখে বইটি লিখতে হবে।

আপনি একজন লেখক, আপনি ইসলাম বা মুসলিম সম্পর্কিত কোনো বিষয় নিয়ে বই লিখছেন, তাহলে সেটা কেন ক্ষুদ্র একটা জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষায়িত হবে? একজন মুসলিম হিসেবে দেড়শ কোটি মুসলিমের কাছে আপনি সমানভাবে দায়বদ্ধ। আপনি একজন 'নায়েবে নবী'। মানে বুঝেন এই শব্দের? আমাদের নবীজির যে কাজ ছিল আপনারও ঠিক একই কাজ। নবীজি কখনোই এটা বলেননি যে এই হাদিসটা কেবলমাত্র মদিনাবাসীর জন্য, কিংবা এই বিধানটা কেবলমাত্র খাজরাজ গোত্রের জন্য বিশেষায়িত। তিনি সমগ্র মুসলিম উম্মাহর জন্য এক চিন্তা করেছেন। ক্ষুদ্র মনোবৃত্তি রাসুল কখনোই প্রশ্রয় দেননি।

আপনি কওমি মাদরাসায় পড়ছেন বা পড়েছেন, মানে হলো, আপনি দেড়শ কোটি মুসলিমের জন্য নিজেকে নায়েবে নবী হিসেবে তৈরি করেছেন। শুধুমাত্র কওমিপাশ লোকদের জন্য আপনি নায়েবে নবী হননি। যদি এমনটাই চিন্তা করে থাকেন তাহলে বুঝতে হবে, আপনার পড়াশোনার মাঝে গাফলতি আছে কিংবা আপনি কুরআন-হাদিসের মর্মার্থ মোটেও অনুধাবন করতে পারেননি। এত ক্ষুদ্র চিন্তা নিয়ে আল্লাহ কুরআন অবতীর্ণ করেননি এবং রাসুলকে এমন ক্ষুদ্র কাজের জন্য পৃথিবীতে প্রেরণ করেননি।

আর যদি আপনার বইটি ইসলাম বা মুসলিম সম্পর্কিত না হয়, তাহলে আপনার বইয়ের উদ্দিষ্ট পাঠক হবে এই পৃথিবীর সাত শ কোটি মানুষ। একবার ভাবুন, যখন আপনি সাত শ কোটি মানুষের জন্য একটি বই লিখবেন তখন সেই বইয়ের ভাষা, চিন্তা, সৌকর্য কতটা উন্নত হবে! কিন্তু যদি আপনি ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য একটি বই লিখতে যান তখন আপনার মনে হবে, কোনোরকম ঘষামাজা দিয়ে একটা বই হলেই হলো!

মনে রাখবেন, লেখকসত্তা আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনার কাছে একটা আমানত। আপনি যদি ক্ষুদ্র চিন্তা দিয়ে সেই আমানতের অপব্যবহার করেন তাহলে আপনাকে নরকে পুড়তে শত সহস্র বছর।



আকাশের নক্ষত্রের মতো যে জীবন

সালাহউদ্দীন জাহাঙ্গীর

আজ থেকে ১,৩৯৫ বছর ৭ মাস ২০ দিন আগে বদর প্রান্তরে সংঘটিত হয়েছিল ইসলামের প্রথম ধর্মযুদ্ধ। সে যুদ্ধের একটি ঘটনা শোনাই আপনাদের।

যুদ্ধের সময় সাহাবি জুবায়ের ইবনে আওয়াম রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন রাসুল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের নিরাপত্তার অতন্দ্র প্রহরী। বেহেশতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশ সৌভাগ্যবানের একজন তিনি। সম্পর্কে রাসুলের ফুফাতো ভাই, ইসলাম গ্রহণ করেছেন নবুওয়াতের একেবারে শুরুর দিকে। রাসুলের সঙ্গে তার সম্পর্ক এতটাই দৃঢ় যে রাসুল প্রায়ই বলতেন, জুবায়ের আমার ছায়াসঙ্গী। বদর যুদ্ধে রাসুলকে রক্ষা করতে সীসাঢালা প্রাচীরের মতো শত্রুর বিরুদ্ধে লড়ছিলেন তিনি।

কুরাইশবাহিনীর উবায়দা ইবনে সাঈদ ময়দানে এসেছে আপাদমস্তক বর্মাচ্ছাদিত হয়ে। পুরো শরীর লোহার বর্ম দিয়ে ঢাকা, এমনকি মাথার শিরস্ত্রানে ঢেকে রেখেছে নাক-মুখ সব। শুধু তার চোখ দুটো দেখা যাচ্ছে দূর থেকে। তরবারী বা বর্শার আঘাতে কেউ তাকে কিছুই করতে পারছিল না।

উবায়দা জুবায়েরকে দেখে হুংকার ছেড়ে বলল, ‘আমি আবু জাতুল কুরশ! যদি সাহস থাকে তাহলে আমার মোকাবেলা করতে আসো।’

উবায়দার হুংকার শুনে জুবায়ের নিজেকে দমিয়ে রাখতে পারলেন না।

নিজের বর্শা তুলে লক্ষ্যস্থির করলেন উবায়দার ঠিক চোখ বরাবর। নিশানায় ভুল হলো না। জুবায়েরের ছোড়া বর্শা সরাসরি গিয়ে আঘাত করল উবায়দার চোখে। এত জোরে তিনি বর্শা চালিয়েছিলেন যে বর্শার ফলা চোখ ভেদ করে মাথার অপর পাশ দিয়ে বের হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে পড়ে তড়পাতে তড়পাতে মৃত্যু হয় উবায়দার।

তার লাশের উপর বসে অতি কষ্টে বর্শাটি বের আনেন জুবায়ের। বর্শা এত গভীরভাবে বিদ্ধ হয়েছিল, টেনে বের করার সময় সেটির ফলা বাঁকা হয়ে যায়। স্বয়ং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বর্শাটি জুবায়েরের কাছ থেকে চেয়ে নিজের কাছে রেখে দেন।

ঘটনা এখানেই শেষ করলাম। এবার ঘটনার দিকে আরেকবার লক্ষ করুন। দেখুন, ঘটনার বর্ণনা কত নিখুঁতভাবে বর্ণিত হয়েছে–কুরাই-শযোদ্ধা উবায়দার বর্ম ও শিরস্ত্রানের বর্ণনা, জুবায়েরের বর্শার নিশানা, বর্শায় গাঁথা উবায়দার চোখ, তার মৃত্যু এবং আঘাতের ফলে বর্শার ফলা বাঁকা হয়ে যাওয়া। প্রতিটি বর্ণনা হাদিস এবং সিরাতগ্রন্থে নিপুণভাবে বর্ণিত হয়েছে।

শুধু এ ঘটনাই নয়, ইসলামের প্রতিটি যুদ্ধে কার অস্ত্রের আঘাতে কে আহত বা নিহত হয়েছে, শরীরের কোন স্থানে আঘাত করা হয়েছে, আঘাতের গভীরতা ও পরিমাপ কতটুকু ছিল–এসব কিছু আমরা হাদিস বা সিরাত পড়তে গেলে বিস্তারিতভাবে পড়তে পারি। কীভাবে এটা সম্ভব হলো?

শিক্ষা। সেই তখন থেকে ইসলামে শিক্ষার গুরুত্ব এতটাই ছিল যে, প্রত্যেকটা যুদ্ধের ঘটনা সাহাবিরা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে স্মরণ রাখতেন এবং পরবর্তী প্রজন্মের কাছে তা বর্ণনা করতেন। সাহাবিদের স্মৃতিশক্তির তারিফ না করে উপায় নেই। বিশেষত যেসব সাহাবি হাদিস বর্ণনা করেছেন, যেমন আবু হুরায়রা, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, ইবনে উমর, ইবনে মাসউদ, আবু সাঈদ খুদরি, আয়েশা, আনাস ইবনে মালিক, জাবের ইবনে আবদুল্লাহ, আমর ইবনে আস রাদিয়াল্লাহু আনহুম এবং অন্যান্য সাহাবিগণ নবুওয়াতের বিশেষ বিশেষ সকল ঘটনা তারা নিজ অন্তকরণে গচ্ছিত রাখতেন। যেসব ঘটনার সাক্ষী তারা ছিলেন না, সেসব ঘটনা তারা সেইসব সাহাবিদের কাছ থেকে শুনে মুখস্ত করে নিতেন যারা সেসব ঘটনার চাক্ষুস সাক্ষী ছিলেন। এমনকি তারা অনেক ঘটনা স্বয়ং রাসুলের কাছ থেকে জেনে নিতেন।

এর বড় উদাহরণ ছিলেন সর্বাধিক হাদিস বর্ণনাকারী সাহাবি আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু। তিনি ইসলাম গ্রহণ করে মদিনায় আসেন সপ্তম হিজরিতে। কিন্তু তিনি যেসব হাদিস বর্ণনা করেছেন সেগুলোর অনেক ঘটনা তার ইসলাম গ্রহণের আগে সংঘটিত হয়েছে। যেমন বদর যুদ্ধের কথাই ধরা যাক। এ যুদ্ধ সংক্রান্ত অনেক হাদিস তিনি বর্ণনা করেছেন। কীভাবে? হয়তো রাসুলের কাছে শুনেছেন নয়তো অন্য সাহাবিদের কাছে শুনেছেন। কী কারণে আবু হুরায়রাসহ অন্য সাহাবিরা এগুলো মুখস্ত করতে গেলেন? কারণ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং তাদের এসব বিষয় জানা এবং শিক্ষা করার কথা বারবার তাগিদ দিয়েছেন। শুধু ঘটনা নয়, ইসলামের প্রতিটি বিধান তারা পরবর্তী প্রজন্মের কাছে নির্ভুলভাবে পৌঁছে দিয়েছেন। রাসুলের প্রণোদনায় এই ধারাবর্ণনা উম্মতের জন্য এক অনন্য মাইলফলক হয়ে রয়েছে।

আরও আশ্চর্যজনক বিষয় লক্ষ করুন। আমাদের মুক্তিযুদ্ধ এবং মুক্তিযোদ্ধাদের ইতিহাস আজ পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গভাবে প্রকাশ করা যায়নি। কত বছর আগের ঘটনা এটা? মাত্র পঞ্চাশ বছর আগের ঘটনা। অথচ এখনও আসল ও নকল মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে হররোজ আমাদের পেরেশান হতে হয়। কে মুক্তিযোদ্ধা আর কে নয়–সেটা আজ পর্যন্ত নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি।

কিন্তু বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা মুসলিম মুজাহিদদের সংখ্যা বলুন তো কত? ৩১৩ জন। এ তথ্য অধিকাংশ মুসলিমই জানে। প্রায় চৌদ্দ শ বছর আগে সংঘটিত একটা যুদ্ধে কতজন যোদ্ধা অংশগ্রহণ করেছিল, তাদের নাম, তাদের গোত্রের নাম, তাদের বয়স, সেই যুদ্ধে আরোহণ করা উট ও ঘোড়ার সংখ্যা, যুদ্ধে উভয় দলের নিহতের সংখ্যা, কুরাইশবাহিনীর বন্দী হওয়া যোদ্ধাদের

নাম ও গোত্রের নাম–এমন সকল কিছু ইসলামের ইতিহাসে লেখা রয়েছে।

রাসুল নিজে নিরক্ষর ছিলেন, লিখতে পড়তে জানতেন না। কিন্তু সাহাবিদের শিক্ষার জন্য তিনি যেন আধুনিক যুগের মায়েদের মতো ছিলেন, যারা বাচ্চাদের পড়ানোর জন্য হাতে সবসময় একটা বই নিয়ে ঘুরে বেড়ান। রাসুলের অবস্থাও ঠিক এমন ছিল। যেখানে সামান্য লেখাপড়ার সুযোগ হতো সেখানেই তিনি সাহাবিদের জন্য শিক্ষার দ্বার খুলে দিতেন। বদরের যুদ্ধের পরবর্তী দৃশ্যের দিকে লক্ষ করুন। এ যুদ্ধে কুরাইশদের ৭০ জন যোদ্ধা বন্দী হয়। সকলের সঙ্গে পরামর্শ করে রাসুল সিদ্ধান্ত নেন, এ বন্দীদের মুক্তিপণের বিনিময়ে ছেড়ে দেয়া হবে। এক হাজার দিরহাম থেকে চার হাজার দিরহাম পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয় বন্দীদের মুক্তিপণের হার। যারা অবস্থাসম্পন্ন ছিল তাদের জন্য চার হাজার, আর যারা খানিকটা কম সম্পন্ন ছিল তাদের জন্য তিন, দুই বা এক হাজারে মুক্তির শর্ত নির্ধারণ করা হয়।

কিন্তু যেসব কুরাইশ বন্দী একেবারেই কপর্দকশূন্য গরিব ছিল, তাদের ব্যাপারে কী করা হবে? তারা তো অর্থ দিতে পারবে না। রাসুল শিক্ষার এই সুযোগও হাতছাড়া করলেন না। তিনি জানালেন, যারা মুক্তিপণের অর্থ দিতে পারবে না, তারা প্রত্যেকজন মদিনার দশজন করে বাচ্চাকে আরবি পড়া ও লেখা শেখাবে। যখন এসব বাচ্চা পড়তে ও লিখতে শিখে যাবে তখন তাদের মুক্তি দেয়া হবে।

রাসুল কেন শিক্ষার প্রতি এত গুরুত্ব দিয়েছিলেন? বস্তুত তিনি ভবিষ্যত মদিনাকে একটি শিক্ষিত ও সংগঠিত কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। মুসলিমদের তিনি এমন একটি জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন যারা আজকের ইতিহাস যেমন লিখতে পারবে, তেমনি লিখতে পারবে ভবিষ্যত পৃথিবীর ইতিহাসও।

রাসুল মদিনায় আগমনের পরই লক্ষ করেছিলেন, মদিনার ইহুদিরা ধন-সম্পদের প্রাচুর্যে বসবাস করছে। মদিনার নেতৃত্ব আউস-খাজরাজ গোত্রের হাতে থাকলেও সকল সিদ্ধান্তের জন্য ইহুদিদের ধর্না ধরে বসে থাকতে হতো। কারণ আউস-খাজরাজের লোকেরা তাদের কাছে দেনার দায়ে আবদ্ধ ছিল। সবচে বড় কথা, ইহুদিদের সকলেই ছিল শিক্ষিত। ঐশীগ্রন্থ তাওরাতের নির্দেশনায় তাদের সবাই শিক্ষাগ্রহণ করতো এবং মদিনায় তাদের একটি স্বতন্ত্র বিদ্যায়তনও ছিল। যেখানে ইহুদি পণ্ডিতরা শিক্ষা দিত তাদের সম্প্রদায়ের বাচ্চাদের। জ্ঞানে ও ধনে ইহুদিরা সবসময় বড়াই করতো মদিনাবাসীর ওপর। নেতৃত্বের মসনদ আউস-খাজরাজের দখলে থাকলেও শিক্ষা ও জ্ঞানের কারণে তারা তাদের গোনায় ধরতো না। এ বিষয়টি রাসুলের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে।

শিক্ষার জন্য রাসুলের এমন বেচাইনির আরেকটি উদাহরণ দেই। মদিনার জায়িদ ইবনে সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসুলের ব্যক্তিগত সহকারী ছিলেন। অথচ জায়িদের বয়স তখন বারো-তেরো বছর। ভাবা যায়! এই বয়সী একটা ছেলে কীভাবে রাসুলের সহকারী হলেন? ঘটনা হলো, মেধাবী জায়িদ রাসুল মদিনায় আসার আগেই মক্কা থেকে আগত ধর্মীয় শিক্ষক মুসআব ইবনে উমায়েরের কাছে কুরআনের অনেকখানি হেফজ করে নিয়েছিলেন। রাসুল যখন মদিনায় আগমন করেন তখন তাকে ডাকা হয় রাসুলের সামনে। তিনি যখন তার হেফজ করা কুরআন রাসুলকে শোনান তখন রাসুল আশ্চর্য হয়ে যান এবং তাকে সত্বর লেখাপড়া শেখানোর ব্যবস্থা করেন। অল্পদিনেই জায়িদ আরবি লিখতে ও পড়তে শিখে যান। এরপর রাসুলের কাছে যেসব চিঠি আসতো, জায়িদ সেগুলো রাসুলকে পড়ে শোনাতেন, আবার কাউকে চিঠি লিখতে হলেও জায়িদ লিখে দিতেন।

কিছুদিন পর আরবের বাইরের বিভিন্ন দেশ থেকে রাসুলের কাছে চিঠি আসা শুরু হয়। এসব চিঠি সাধারণত হিব্রু বা ল্যাটিন (ইবরানি ও সুরিয়ানি) ভাষায় লেখা হতো। মদিনার মুসলিমদের মধ্যে কেউ এ ভাষা লিখতে পড়তে জানতো না। অগত্যা রাসুলকে মদিনার ইহুদিদের শরণাপন্ন হতে হয়। তারা এসে রাসুলের চিঠি পড়ে দিতো এবং সেগুলোর উত্তর লিখে দিতো। কারণ মদিনার ইহুদি পণ্ডিতরাই কেবল এ দুটো ভাষার দখল রাখতো।

কিন্তু রাসুল মদিনার ইহুদিদের মোটেও বিশ্বাস করতেন না। একে তো তারা ছিল ধূর্ত প্রকৃতির, দ্বিতীয়ত মুসলিমদের সঙ্গে তাদের একটা আদর্শিক যুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছিল রাসুল মদিনায় আগমনের পরপরই। যে কোনোভাবে তারা মুসলিমদের হেয় ও পরাজিত করার ইচ্ছা পোষণ করতো। এ কারণে আগত চিঠির মধ্যে কী লেখা আছে আর তারা কী পড়ছে, সে বিষয়ে রাসুলের সন্দেহ রয়েই যেতো। আবার চিঠি পাঠানোর সময় রাসুল যা বলছেন তারা তা ঠিকমতো অনুলিপি করছে কি-না, সেটাও সন্দেহাতীত নয়।

এ সমস্যা নিরসনে রাসুল একদিন জায়িদকে ডেকে বললেন, তুমি হিব্রু ভাষাটা শিখে ফেলো। বিদ্যোৎসাহী জায়িদ ইহুদি পণ্ডিতদের পাঠশালায় গিয়ে মাত্র পনেরো দিনে হিব্রু ভাষা লিখতে ও পড়তে শিখে ফেলেন। এর কিছুদিন পর রাসুলের নির্দেশে জায়িদ ল্যাটিন ভাষায়ও ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। এরপর এ দু'ভাষায় চিঠি এলে তা পড়তে আর ইহুদি পণ্ডিতদের কাছে যেতে হতো না, জায়িদ নিজেই চিঠি পড়ে রাসুলকে শোনাতেন এবং উত্তর লিখে দিতেন।

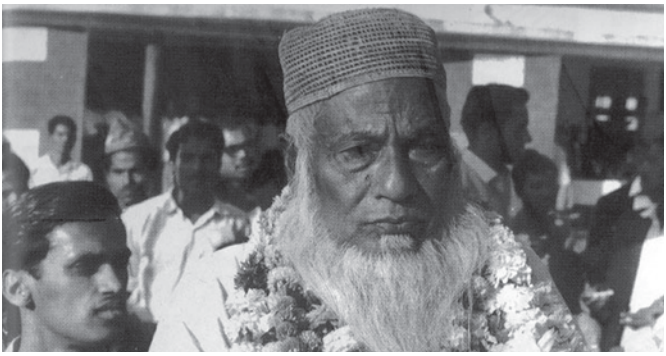
বর্তমান মুসলিমদের অধঃপতনের সবচে দুঃখজনক কারণ–শিক্ষায় অবহেলা। আমরা সামান্য পড়ছি ঠিক, কিন্তু সেটাকে কর্মে পরিণত করছি না। আমরা ধর্ম সম্পর্কে জানছি ঠিক, কিন্তু সেটা বাস্তবায়নের সদিচ্ছা আমাদের নেই। বাস্তবভিত্তিক পড়াশোনার প্রতি আমাদের আগ্রহ নেই বললেই চলে। আমাদের পাঠাগারগুলো খলি পড়ে থাকে, আমাদের ছাত্রাবাসগুলোতে উদ্ভাবনী কোনো শিক্ষা উপকরণ নেই, নতুন চিন্তা ও নতুন দিকদর্শনের ব্যাপারে আমাদের ভাবার সময় নেই, পৃথিবীকে কীভাবে নেতৃত্ব দিতে হবে তার কোনো প্রস্তুতি নেই। অথচ আমরা বক্তৃতা দেয়ার সময় বিশ্বজয়ের ভাষণ ছাড়ি। না, আল্লাহর রাসুল এবং তার সাহাবিরা কখনো বড় গলায় ভাষণ দিয়ে বাগাড়ম্বর করতেন না। রাসুলের সিরাত এবং সাহাবিদের জীবনী আমাদের সবচে বড় সম্পদ। পৃথিবী যত আধুনিক হোক, উন্নতির যত শিখরে উঠুক সভ্যতা; রাসুলের সিরাত এবং সাহাবিদের জীবনী চিরকাল মুসলিমদের দিশা দিয়ে যাবে। এই দুই সম্পদকে সঠিকভাবে পাঠ করতে হবে, জীবন থেকে শিক্ষা নিতে হবে এবং এই পাঠ সর্বস্তরে পৌঁছে দিতে হবে। বর্তমান মুসলিম জাগরণের জন্য এছাড়া আমাদের আর কোনো দাওয়াই নেই।

আল্লাহর রাসুল বলে গেছেন–'আমার সাহাবিরা আকাশের নক্ষত্রের মতো, যে তাদের অনুসরণ করবে, সঠিক পথের দিশা পাবে কেবল তারাই।'

ভাসানী-জীবনের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত

১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দে সিরাজগঞ্জের ধনপাড়া গ্রামের কৃষক পরিবারে জন্ম মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর। পিতা শরাফত আলী। মাত্র ছয় বছর বয়েসে মওলানা ভাসানী পিতাকে হারান। ১১ বছর বয়সে মা এবং দুই ভাইকে হারিয়ে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েন। চাচার প্রতিপালনে কিছুদিন থাকার পর একদিন অভিমান করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান। সিরাজগঞ্জে তখন ইরাকের ধর্মপ্রচারক এক আলেমের আগমন ঘটেছে। নাম তাঁর নাসিরুদ্দিন বোগদাদি। কিশোর আবদুল হামিদ দুবছরের মতো সময় নাসিরুদ্দিন বোগদাদির সান্নিধ্য গ্রহণ করে ইসলামের মৌলিক জ্ঞান অর্জন করেন। ১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দে নাসিরুদ্দিন বোগদাদির নির্দেশে জয়পুরহাটজেলার পাঁচবিবি উপজেলার জমিদার শামসুদ্দিন আহমদ চৌধুরীর বাড়িতে গমন করে জমিদারের পরিচালিত স্থানীয় একটি মাদরাসায় শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। তিন-চার বছর এখানে শিক্ষকতার পর ১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দে নাসিরুদ্দিন বোগদাদির সঙ্গে আসাম গমন করেন। সেখানে আসামের বাঙালি মুসলিমদের অধিকার আদায়ে আন্দোলন সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। পাশাপাশি আপন পির নাসিরুদ্দিন বোগদাদির কাছ থেকে গ্রহণ করছিলেন ধর্মীয় শিক্ষার উচ্চতর পাঠ। ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দে নাসিরুদ্দিন বোগদাদির নির্দেশে দেওবন্দ গমন করেন এবং দুই বছর সেখানে অবস্থান করে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ধর্মীয় শিক্ষা সমাপ্ত করেন। তারপর আবার ফিরে আসেন আসামে।
১৯১৭ খিষ্টাব্দে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ময়মনসিংহ সফরে গেলে তাঁর ভাষণ শুনে ভাসানী অনুপ্রাণিত হন। ১৯১৯ সালে কংগ্রেসে যোগদান করে অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে দশ মাস কারাদণ্ড ভোগ করেন। ১৯২৩ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন স্বরাজ পার্টি গঠন করলে ভাসানী সেই দল সংগঠিত করার ব্যাপারে ভূমিকা পালন করেন। ১৯২৫ সালে তিনি জয়পুরহাটের পাঁচবিবি উপজেলার জমিদার শামসুদ্দিন মুহাম্মদ চৌধুরী, যাঁর বাড়িতে কৈশোরে বেশ কয়েক বছর থেকেছিলেন, তাঁর মেয়ে আলেমা খাতুনকে বিয়ে করেন।
১৯২৬ সালে সহধর্মিণীকে নিয়ে পুনরায় আসাম গমন করেন এবং আসামে প্রথম কৃষক-প্রজা আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটান।
১৯২৯-এ আসামের ধুবড়ী জেলার ব্রহ্মপুত্র নদের ভাসানচরে প্রথম কৃষক সম্মেলনের আয়োজন করেন। ভাসানচরের কৃষকদের অধিকার আদায় ও জীবনমানের উন্নতি সাধনে অক্লান্ত পরিশ্রম করার কারণে ভাসানচরের মওলানা হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে দেশজুড়ে। পরে ভাসানচরের দিকে নিসবত করে তিনি হয়ে ওঠেন ভাসানীর মওলানা। এরপর থেকে তাঁর নামের শেষে ভাসানী শব্দ যুক্ত হয়।
১৯৩০-১৯৬৯ সাল পর্যন্ত প্রায় সবকটি আন্দোলনে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর ভূমিকা ছিল অনন্য।
১৯৪৫-৪৬ সালে আসাম জুড়ে বাঙালিদের বিরুদ্ধে 'বাঙ্গাল খেদাও' আন্দোলন শুরু হলে ব্যাপক দাঙ্গা দেখা দেয়। এ সময় বাঙালিদের রক্ষার জন্য ভাসানী বারপেটা, গৌহাটিসহ আসামের বিভিন্ন জায়গা ঘুরে বেড়ান।
পাকিস্তান আন্দোলনে অংশ নিয়ে ১৯৪৭ সালে আসামে গ্রেপ্তার হন। ১৯৪৮-এ মুক্তি পান। এরপর তিনি টাঙ্গাইলের সন্তোষে ফিরে আসেন। ১৯৪৯ সালের মধ্যভাগে পূর্ববঙ্গে খাদ্যাভাব দেখা দেয়। ১১ অক্টোবর আরমানীটোলা ময়দানে আওয়ামী মুসলিম লীগের একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। ওই সভায় খাদ্য সমস্যা সমাধানে ব্যর্থতার জন্য পূর্ববঙ্গ মন্ত্রিসভার পদত্যাগ দাবী করা হয় এবং ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মওলানা ভাসানী ভুখা মিছিলে নেতৃত্ব দেন। ভুখা মিছিলে নেতৃত্ব দেয়ার জন্য ১৯৪৯-এর ১৪ অক্টোবর গ্রেপ্তার হয়ে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে অন্তরীণ

হন।
বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ১৯৫২-এর ৩০ জানুয়ারি ঢাকা জেলার বার লাইব্রেরি হলে তাঁর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ গঠিত হয়। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে সহযোগিতার কারণে গ্রেপ্তার হয়ে ১৬ মাস কারানির্যাতনের শিকার হন। অবশ্য জনমতের চাপে ১৯৫৩ সালের ২১ এপ্রিল তাঁকে জেল থেকে মুক্তি দেয়া হয়।
১৯৭০ সালের ৪ ডিসেম্বর ঢাকার পল্টন ময়দানে এক জনসভায় 'স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান' দাবি উত্থাপন করেন মওলানা ভাসানী।
১৯৭১-এর মার্চ মাসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অসহযোগ আন্দোলনের প্রতি সমর্থন প্রদান করেন, তার আগে একই বছরের ১৮ জানুয়ারি পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত জনসভায় স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদানের জন্য শেখ মুজিবের প্রতি আহ্বান জানান।
স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ভারত গমন করেন এবং মুজিবনগর সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য হন। তার আগে ২৫ মার্চ রাতে টাঙ্গাইলের সন্তোষে নিজ বাড়িতে অবস্থান করছিলেন। হামলা শুরু হলে পাকিস্তানি বাহিনীর দৃষ্টি এড়িয়ে তিনি টাঙ্গাইল ছেড়ে তাঁর পিতৃভূমি সিরাজগঞ্জে চলে যান। পাক বাহিনী তাঁর সন্তোষের বাড়িটি পুড়িয়ে দেয়। তিনি ন্যাপ নেতা সাইফুল ইসলামকে সঙ্গে নিয়ে সিরাজগঞ্জ থেকে নৌকাযোগে ভারত সীমানা অভিমুখে রওনা হন।
অবশেষে ভারতের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মইনুল হক চৌধুরীর সাহায্যে মওলানা ভাসানী ও সাইফুল ইসলাম ১৫/১৬ এপ্রিল পূর্ববঙ্গ অতিক্রম করে আসামের ফুলবাড়ি নামক স্থানে উপস্থিত হন। পরে তাঁদের হলদীগঞ্জ বিএসএফ ক্যাম্পে আশ্রয় দেয়া হয়।
এরপর মওলানা ভাসানী ও সাইফুল ইসলামকে বিমানে করে কলকাতায় পাঠিয়ে দেয়া হয় এবং পার্ক স্ট্রিটের কোহিনুর প্যালেসের ৫ তলার একটি ফ্ল্যাট তাদের অবস্থানের জন্য দেয়া হয়। ১৯৭১ সালের ২৩ এপ্রিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার পরে মওলানা ভাসানী একটি বিবৃতি প্রদান করেন যা ভারতীয় বাংলা ও ইংরেজি দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এ ছাড়া মাওলানা ভাসানী চীনের নেতা মাও সেতুং, চৌ এন লাই এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের কাছে তার বার্তা পাঠিয়ে তাদের অবহিত করেন যে পূর্ববঙ্গে পাকিস্তান সেনাবাহিনী ব্যাপকহারে গণহত্যা চালাচ্ছে। সেজন্য তিনি প্রেসিডেন্ট নিক্সকে অনুরোধ করেন, তিনি যেন পাকিস্তানকে অস্ত্র সরবরাহ না করেন। পাশাপাশি মওলানা ভাসানী প্রেসিডেন্ট নিক্সকে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবার আহ্বান জানান।
১৯৭১ সালের ২৫ এপ্রিল মওলানা ভাসানী সোভিয়েত রাশিয়ার প্রেসিডেন্টের কাছে পাকিস্তান বাংলাদেশের জনগণের ওপর যে বর্বরোচিত অত্যাচার চালাচ্ছে তার বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন। ৩১ মে এক বিবৃতিতে বলেন, বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ দখলদার বাহিনীর সঙ্গে জীবনমরণ সংগ্রামে লিপ্ত। তারা মাতৃভূমি রক্ষার জন্য বদ্ধপরিকর। তারা এই সংগ্রামে জয়লাভ করবেই। ৭ জুন মওলানা ভাসানী এক বিবৃতিতে বলেন, বাংলাদেশের সব অঞ্চল আজ দশ লাখ বাঙালির রক্তে স্নাত এবং এই রক্তস্নানের মধ্য দিয়েই বাংলার স্বাধীনতা আসবে।
মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে মওলানা ভাসানী কলকাতা ছাড়াও দেরাদুন, দিল্লি ও অন্যান্য স্থানে অবস্থান করেন। পরবর্তীকালে অনেকে অভিযোগ করেন যে ভারতে থাকাকালীন তিনি নজরবন্দি অবস্থায় ছিলেন।
১৯৭২ সালের ২২ জানুয়ারি ভারত থেকে তিনি নতুন বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। স্বাধীন বাংলাদেশেও তিনি কৃষক শ্রমিক ও এ দেশের খেটে খাওয়া মানুষের জীবনমানের উন্নতির জন্য রাজনীতি করে গেছেন। ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দের মে মাসে অসুস্থ শরীর নিয়ে ফারাক্কা অভিমুখে লাখো কৃষক-শ্রমিককে সাথে নিয়ে ঐতিহাসিক লংমার্চ করে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন।
ফারাক্কা অভিমুখে লংমার্চের কয়েক মাসের মাথায় ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দের নভেম্বরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে কিংবদন্তি ও নির্লোভ এ রাজনীতিবিদ ইন্তেকাল করেন। তাঁকে টাংগাইল জেলার সদর উপজেলার উত্তর-পশ্চিমে সন্তোষ নামক স্থানে পীর শাহজামান দীঘির পাশে সমাধিস্থ করা হয়।
১৭ নভেম্বর মওলানা ভাসানীর ৪৩ তম মৃত্যুবার্ষিকী। মৃত্যুবার্ষিকীতে মজলুম এই জননেতা'র প্রতি সশ্রদ্ধ সালাম।



গল্পের ক্যানভাসে মওলানা ভাসানীর জীবন

শামীম আহমাদ

ছয় বছরের শিশু আবদুল হামিদ, হেসেখেলে বেড়ায়। হঠাৎ বাবা মারা গেলেন। বাবার শোক কাটিয়ে উঠতে না-উঠতেই কয়েক বছরের মাথায় একসাথে তার মা এবং দুই ভাই মারা গেল। এতিম বালক আবদুল হামিদ চাচা ইবরাহিমের আশ্রয় গ্রহণ করেন। তার কাছেই থাকেন এবং কাজ-কর্ম করেন। এ সময় একদিন তার চাচা বাড়িতে বিরাট এক ভোজসভার আয়োজন করলেন। ধনী-গরিব সবাইকেই দাওয়াত দিলেন। কিন্তু প্রথা অনুযায়ী গরিবদের খেতে দেয়া হলো কলাপাতায় আর ধনীদের সুন্দর সুন্দর থালায়। কিশোর আবদুল হামিদ নিজেও তার এক গরিব বন্ধুকে দাওয়াত করেছিল। কিন্তু খাওয়ার সময় বন্ধুকে সে গরিবদের জায়গায় না বসিয়ে ধনীদের কাতারে বসাল। এতে কিছু কিছু ধনী অপমানিত বোধ করল। আয়োজন শেষে সবাই চলে গেলে চাচা ইবরাহিম আবদুল হামিদকে অনেক বকা-ঝকা করলেন।
কিশোর আবদুল হামিদের ভীষণ মন খারাপ হলো। চাচার এই বৈষম্যপূর্ণ আচরণে প্রতিবাদে ক্ষোভে ফেটে পড়তে ইচ্ছে হলো তার। কিন্তু আশ্রয়দাতা মুরব্বি চাচাকে তিনি কী-ই বা বলতে পারেন! শেষে বুক-ভরা অভিমান নিয়ে সবার অগোচরে বাড়ি থেকে বেড়িয়ে পড়লেন অজানার উদ্দেশ্যে। ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে শাহজাদপুরে তার দূর-সম্পর্কের এক ভগ্নিপতির বাড়ি এসে আশ্রয় নিলেন। মকতবে ভর্তি হলেন। কিছুদিন পর পীর নাসিরউদ্দিন শাহ বাগদাদির সাথে তার সাক্ষাৎ ঘটে। কিশোর আবদুল হামিদের পছন্দ হয় এই নির্লোভ পরিশ্রমী পীর সাহেবকে। পীর সাহেবেরও এই সদা চঞ্চল এতিম কিশোরের প্রতি মায়া পড়ে যায়। মকতবে ভর্তি করে দেন। এরপর ১৮৯৭ সালে পীর সাহেব তাকে নিয়ে দীন প্রচারের কাজে আসামে চলে আসেন। এখানেই বালক আবদুল হামিদ দীর্ঘদিন স্বয়ং পীর সাহেবের নিকট থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে থাকেন এবং জনগণের সাহায্য-সহযোগিতা করতে থাকেন। কিন্তু শিক্ষিত অভিজ্ঞ পীর সাহেব আবদুল হামিদের শিক্ষাকে এখানেই সীমাবদ্ধ রাখতে চাইলেন না। তিনি তার দীনি শিক্ষার পরিপূর্ণতার উদ্দেশ্যে ১৯০৭ সালে বিখ্যাত ইসলামী বিদ্যাপীঠ দেওবন্দ মাদরাসায় পাঠিয়ে দিলেন।

এভাবেই দারুল উলুম দেওবন্দে শুরু হয় যুবক আবদুল হামিদের উচ্চতর শিক্ষাজীবন। সান্নিধ্য পান আল্লামা আজাদ সোবহানির এবং ব্রিটিশ খেদাও আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তিত্ব আল্লামা হোসাইন আহমাদ মাদানির। তাঁদের শিক্ষা ও সান্নিধ্যে যুবক আবদুল হামিদের জীবনের মোড় ঘুরে যায়...

দুই

১৯২০ সাল। আন্দোলনে যোগদান করার অপরাধে জীবনে প্রথমবারের মতো কারাভোগ করেন ভাসানী। তখন তিনি বসবাস করছেন আসামের গোয়ালপাড়া জেলার ঘাগমারী অঞ্চলে। ১৯২৮-২৯ সালে এই ভয়াবহ জায়গাটিতেই তিনি মাত্র ১ টাকা ১৪ আনা ব্যয়ে একখানা কুঁড়েঘর তৈরি করে অসহায় বাঙালিদের সাথে বসবাস শুরু করেন। জমিদারকন্যাকে উঠালেন একেবারে নিখুঁত কুঠুরে। জনদরদী ভাসানী রাতদিন মানুষের সেবা-কল্যাণে জীবন পাত করতে থাকেন, কিন্তু সমস্যা হতে থাকে তাঁর স্ত্রী আলেমা বেগমের। এই বিদেশ-বিভূইয়ে শ্বাপদ জঙ্গলে বসবাস করা তাঁর জন্য ভীষণ কষ্টকর হয়ে ওঠে। তিনি তাঁর পিতৃভূমি বাংলায় ফিরে আসার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠলেন। মওলানা প্রশান্তচিত্তে স্ত্রীকে দেশে পাঠানোর ব্যবস্থা নিতে শুরু করলেন। স্ত্রী ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি যাবেন না?'
ভাসানী বললেন, 'না, আমি এখনই যাবো না। আমার নিরন্ন, নিরস্ত্র বাঙালি চাষীদের একটা সুরাহা যতদিন না হবে, ততদিন আমি আর বাংলায় ফিরে যাব না।'
সত্যিই মওলানা ভাসানী দেশ স্বাধীনের আগে আর আসাম থেকে ফিরে আসেননি। তিনি আবাস গাড়েন ধুবড়ী শহরের অদূরে ভাসানচর নামের একটি নতুন চর এলাকায়। প্রতিষ্ঠা করেন মসজিদ মাদরাসা স্কুল ও কলেজ। লক্ষ লক্ষ ভক্তের পীর হিসেবেও তিনি প্রচুর খ্যাতি লাভ করেন। ধীরে ধীরে তিনি 'ভাসানচরের মওলানা' হিসেবে পরিচিত হয়ে ওঠেন। পরে শুধু 'ভাসানী' নামেই মশহুর হন।

তিন

অধ্যক্ষ ইবরহিম খাঁ লিখেছেন–
টাংগাইল শহরের চর অঞ্চল। বন্যার তাণ্ডবে কেবল ভাটা ধরেছে, এমন সময় একদিন আমার করটিয়ার বাসার ঘাটে আসাম প্রত্যাগত এক ভদ্রলোকের নৌকা ভিড়ল। নাম তাঁর আবদুল হামিদ খান। তাঁর নৌকায় মণ পঞ্চাশেক ধান। বললেন, বাড়ি আমার আগে বাংলাদেশেই ছিল, তারপর যাই আসামে। বন্যার কথা শুনে বিপদের জন্য কিছু ধান নিয়ে এলাম। তার খানিকটা বিতরণ করেছি, বাকিটা আপনার সাথে পরামর্শ করে বিতরণ করব ভেবে নিয়ে এলাম।'
মওলানা সাহেব টাঙ্গাইল শহরের চর অঞ্চলে কাজ শুরু করলেন। এরপর তিনি আরো কয়েকবার ধান আনলেন। কাপড় সংগ্রহ করলেন। টাকা জোটালেন। খুব জোরেশোরে তাঁর কাজ চলল। দেশের সাদা-দিল মানুষ, তারা তাঁর কথায়, তাঁর দরদে, তাঁর সেবায় মুগ্ধ হয়ে গেল। কিছুদিন পর তাদের মধ্যে বলাবলি শুরু হলো–
'লোকটা কে রে ভাই, কোথা থেকে উড়ে এল আমাদের সাহায্যের জন্যে?'
'জানিস না? উনি যে ভাসানচরের মওলানা! দেখিস নাই তাসবিহ? মস্ত ফকির!'
'তাই তো রে ভাই! তবে এসব ধান-কাপড়-টাকা উনাকে জিনে বোধহয় জোগায়।'
'আমি তো তাই মনে করি। ওর পানি পড়ার যে বেশুমার বরকত। সে তো অনেকেই পরখ করে দেখেছে।'
এরপর তার কাছে জমতে লাগল মানুষের ভিড়। কেউ চায় একটুখানি ফুঁ, কেউ চায় পানি পড়া, কেউ চায় কালজিরা পড়া, কেউ চায় তাঁর হাতে চুমো খেয়ে ধন্য হতে। একদিন তিনি রাতে এক বাড়িতে ছিলেন। ভোরে চলে গেলেন। পানি পড়ার জন্য লোক এসে জমল। বাড়ির একজন তামাশা করে বলল, 'তিনি এক গেলাস পানি পড়ে এই ইন্দারায় ঢেলে দিয়ে গেছেন। এখন ওই ইন্দারার পানি নিলেই চলবে।'
লোকজন হুমড়ি খেয়ে পড়ল ইন্দারার উপর। পানি নেয়া শুরু হলো। ইন্দারার পানি শুকিয়ে গেল। লোকে আধ কাদা পানিই তুলতে

লাগল। অবশেষে বাড়িওয়ালা তাদের কাছে হাতজোড় করে বললেন, 'দোহাই আল্লাহর, আমার ইন্দারাটা রক্ষা করো। এর উপর আর পানি তুললে ইন্দারা পড়ে যাবে।'

চার

মওলানা ভাসানী আসাম থেকে নদীপথে সিরাজগঞ্জ হয়ে টাঙ্গাইলের চাড়াবাড়ি এসে পৌঁছলেন। তার উদ্দেশ্য পীর শাহজামান রহ.এর মাজার জিয়ারত করা। চাড়াবাড়ি থেকে কাগমারী পর্যন্ত কাঁচা পথ, কিন্তু কোনো যানবাহনের ব্যবস্থা নেই। রাস্তার শেষের দিকে অতি প্রতাপশালী হিন্দু জমিদার বাড়ি। মুসলমানবিদ্বেষী এই জমিদার মুসলমানদের সঙ্গে নির্মম আচরণ করত। তাদেরকে অতি নীচু ও ম্লেচ্ছ জাতিরূপে ভাবত। জমিদারদের কড়া নির্দেশ ছিল–জমিদার বাড়ির এলাকায় কোনো মুসলমান জুতা পায়ে বা ছাতা মাথায় অথবা ঘোড়ায় চড়ে চলাচল করতে পারবে না।

কিন্তু এদিকে মওলানা ভাসানী চাড়াবাড়ি হয়ে ঘোড়ায় চড়ে শাহজামানের মাজারের দিকে রওয়ানা দিয়েছেন। তিনি ছাতা মাথায় ঘোড়ার পিঠে বসে আছেন, আর ভক্তরা ঘোড়া পরিচালনা করে নিয়ে যাচ্ছে। ধীরে ধীরে তারা জমিদার বাড়ির সামনে চলে এল। ভাসানী আগের মতোই চলতে লাগলেন।

ঘটনাক্রমে স্বয়ং জমিদার মহাশয় এ দৃশ্যটি তাঁর প্রাসাদের ছাদ থেকে দেখে ফেললেন। জমিদার গর্জে উঠলেন। তাঁর লাঠিয়াল প্রধানকে ডেকে বললেন, 'যবনের ছায়া ঠেকেছে আমার সীমানায় আর তুই নাকি ব্যাটা বসে বসে ঝিমুচ্ছিস?'

'জি, মহারাজ...'

'দেখ রাস্তার দিকে তাকিয়ে...'

'তাই তো মহারাজ। এত শুধু যবন নয় মহারাজ, যবনতম–পায়ে জুতা, মাথায় ছাতা ও টুপি; তার উপর আবার ঘোড়ায় চড়ে–এ যে তিন-চারটে যবনের অপরাধ একাই করছে।'

বলেই রে রে রে করে দৌড়ে এসে মওলানা ভাসানীর পথ রোধ করে দাঁড়াল লাঠিয়াল। কিন্তু ভাসানীর চোখের দিকে তাকিয়ে তার কী যে হলো–একেবারে মিইয়ে পড়ল। অনুনয়ের সুরে বলল, 'হুজুর, আমাদের জীবন রক্ষার জন্যই দয়া করে জুতা খুলে, ছাতা নামিয়ে, ঘোড়া ছেড়ে জমিদার বাড়ির সীমানাটুকু হেঁটে যান।'

সর্দারের মিনতির প্রতি মওলানা ভাসানীর দয়া হলো। তাছাড়া যাত্রাপথে কোনো ঝামেলায় তিনি জড়াতে চাইলেন না। তাই একটু ঘুরে অন্য পথে কাগমারী রওয়ানা দিলেন। কিন্তু যাওয়ার সময় মন্তব্য করে গেলেন, 'জমিদার, আমি যবন (তোমাদের ভাষায়) আজ ঘুরে গেলাম। দ্বিতীয়বার যেদিন আমি আসব, তোমাদের ঐ প্রাসাদের বেদীমূলে আমার ভক্তবৃন্দ নিয়ে গরু জবাই করে রাব্বুল আলামিনের নামে শিরনি করে খাওয়াব আর তোমাদের প্রাসাদের চূড়ায় বেগুন গাছ বুনে সেই বেগুনের ভর্তা দিয়ে আমার প্রিয়জনদের নিয়ে আমি ভাত খাব। জেনে রেখো, সেদিন খুব বেশি দূরে নয়।'

'৪৭-এর পর মওলানা ভাসানী তাঁর কথার প্রতিফলন ঘটিয়েছিলেন। দীর্ঘ মামলা-মোকাদ্দামার পর জমিদার থেকে তাদের এই অবৈধভাবে দখল করা জমিদারি ও প্রাসাদ দখলে আনেন। প্রথম দিনই ঊনিশটি গরু জবাই করে শিরনি করেন এবং এক মাসের মধ্যেই নিজ হাতে উৎপাদিত বেগুনের ভর্তা দিয়ে ভাতও খান। পরে এ জায়গাতেই স্থাপন করা হয় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়। জায়গাটি মূলত সম্রাট আওরঙ্গজেব পীর শাহজামানের দরবারের জন্য ওয়াকফ করে দিয়েছিলেন। ব্রিটিশরা এসে অবৈধভাবে হিন্দু জমিদারের হাতে জায়গাটি তুলে দেয়।

পাঁচ

১৯৪৭ সালের আগস্টে পুরো ভারত যখন স্বাধীনতার আমেজে প্রমত্ত, আজীবন স্বাধীনতা সংগ্রামী মওলানা ভাসানী তখনো জালেমের কারাগারে বন্দী।

কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে স্বাধীন পূর্বপাকিস্তানে চলে এলেন। কিন্তু জনগণের সাথে তিনিও স্বাধীন দেশে নিজেদের চাওয়া-পাওয়ার হিসাব মেলাতে গিয়ে ভীষণভাবে চমকে উঠলেন। বুঝলেন বর্তমানের প্রতিষ্ঠিত শাসকগোষ্ঠী দিয়ে কিছুই হবে না। এ

কারণে তিনি এবং অন্য নেতৃবৃন্দ মিলে পুরান ঢাকার টিকাটুলির কে এম দাস লেনের রোজ গার্ডেনের এক কর্মী সম্মেলনে পাকিস্তানের প্রথম বিরোধী রাজনৈতিক দল 'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ' গঠন করেন। তিনি দলের সভাপতি নির্বাচিত হন। সাধারণ সম্পাদক শামসুল হক। সহ-সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান। তবে শেখ মুজিব তখন ফরিদপুরের জেলখানায় বন্দী থাকায় এ সভায় উপস্থিত থাকতে পারেননি।

১৯৪৯ সালের মধ্যভাগে পূর্ববঙ্গে খাদ্যাভাব দেখা দেয়। ১১ অক্টোবর আরমানিটোলা ময়দানে আওয়ামী মুসলিম লীগের একটি জনসভার আয়োজন করা হয়। কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে অবশেষে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। এ সময় সভাপতির আসন থেকে উঠে এসে মওলানা ভাসানী মাইকের সামনে দাঁড়ালেন। বললেন, 'ভাইয়ো, সরকার আমাদের সভা পণ্ড করতে চায়। এ অবস্থায় আমরা সভা করব না। আপনারা শান্ত হয়ে যার যার জায়গায় দাঁড়ান। আমরা আল্লাহতায়ালার দরবারে আমাদের ফরিয়াদ জানিয়ে মোনাজাতের মাধ্যমে আমাদের সভা শেষ করব।'

এই কথা বলেই মওলানা 'আল্লাহুম্মা আমিন' বলে মোনাজাত শুরু করে দিলেন। সভার সকল শ্রোতাও হাত তুলে 'আল্লাহুম্মা আমিন' বলে দাঁড়িয়ে গেল। যদিও মোনাজাতে হাত উত্তোলনকারীদের মধ্যে অনেক হিন্দু এবং নাস্তিক কমিউনিস্টও ছিল।

মওলানা আরবিতে দুয়েকটি দোয়া পাঠ করলেন। এরপরই বাংলাতে বলতে শুরু করলেন–'হে দীন দুনিয়ার মালিক পরওয়ারদেগার, জালেমের অত্যাচার থেকে তুমি মজলুমকে রক্ষা করো। সরকার বড় অত্যাচারী, প্রজা বড় মাজলুম...'

এরপর পুরো মোনাজাতে আর পরকালের কোনো কথা বললেন না। কবরের আজাব মাফের কথাও তুললেন না। তিনি বলতে থাকলেন–সরকারের অন্যায়-অবিচার ও জুলুমের কথা। এর থেকে মুক্তির উপায় হিসেবে অব্যাহত সংগ্রামের কথা। আর একটু পর পরই মোনাজাতকারী শ্রোতাগণ 'আল্লাহুম্মা আমিন' বলে মাঠ কাঁপিয়ে তুলতে থাকল...। এক ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে চলল এই ঐতিহাসিক মোনাজাত। জনসভায় মওলানা সাহেব তাঁর রাজনৈতিক বক্তৃতায় যা বলতে চেয়েছিলেন, এই মোনাজাতের মাধ্যমেই তিনি তাঁর সব বলে গেলেন। সরকারের উপস্থিত গোয়েন্দা বিভাগ ও পুলিশের বিশেষ শাখার লোকেরাও মোনাজাতে দু হাত উপরে তুলে 'আমিন আমিন' করছে।

না করে উপায় কী! ইসলামের দাবী নিয়ে সদ্যমাত্র দেশ স্বাধীন হয়েছে। মোনাজাত ছেড়ে জনগণের আক্রোশের শিকার হবে নাকি। এভাবে হাত উপরে থাকায় গোয়েন্দা পুলিশরা জনসভায় ভাসানীর 'বক্তৃতা'র কোনো নোটও নিতে পারে না।

কিন্তু সভা শেষ করেই মওলানা ভাসানী ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে ভুখা মিছিল বের করলেন। এবং মিছিলের নেতৃত্ব দেওয়ার অপরাধে তাঁকে ১৪ অক্টোবর গ্রেফতার করে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দী করে রাখা হয়।

স্বাধীন দেশে পরাধীনের মতো বন্দী হলেন মওলানা ভাসানী।

ছয়

১৯৫৪ সাল। হক-ভাসানী-সোহরাওয়ার্দীর যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনের সময় অত্যাসন্ন। মওলানা ভাসানী পাবনা টাউন হলের একটি সম্মেলনে বক্তব্য দিচ্ছেন। সরকার পক্ষের বিভিন্ন অত্যাচারের কথা বললেছন। এ সময় তাঁর বক্তৃতার মাঝখানেই দারোগা সাহেব হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে কি যেন বলার চেষ্টা করলেন–আর অমনি বজ্র কণ্ঠে ঘোষিত হলো– 'খামোশ! শয়তানের বাচ্চা শয়তান!!'

সহসা যেন বোমা ফাটল। মানুষের গলা দিয়ে যে এমন আওয়াজ হতে পারে তা কল্পনাও করা যায় না। মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে গেল পুরো সভাস্থল। হাজার হাজার মানুষ–কারো মুখে কোনো কথা নেই। কোথাও কোনো শব্দ নেই। সবাই নির্জীব নিঃশব্দ হয়ে গেছে।

দারোগা বাবুর পা কাঁপতে শুরু করেছে। ভাসানী সাহেব তাকে লক্ষ করে বলতে লাগলেন, 'পাঞ্জাবি ইংরেজের পা চাটার দল। চাবুক মেরে তোদের পাছার ছাল তুলে নেওয়া হবে। সাপের পাঁচ পা দেখেছিস, ঘুঘু

দেখেছিস, ফাঁদ দেখিসনি। তোরা আমাদের সোনার ছেলেদেরকে ঢাকার রাজপথে পশু-পাখির মতো গুলি করে হত্যা করেছিস।... তোদের মনে রাখা উচিত—এই কিষাণ, মজুর মুটেরাই হচ্ছে তোদের মালিক। তাদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলা ট্যাক্সে তোদের ছেলেমেয়ে-পরিবারের পেটে ভাত যায়। খুনী নুরুল আমিন তোদের বাবা নয়। তোদের আসল বাপ-মা হচ্ছে এই খেটে খাওয়া মানুষেরা, যারা না খেয়ে তোদের মুখে অন্ন তুলে দেয়। হুঁশিয়ার, এখনো সময় আছে। মানুষের বন্ধু হয়ে যা, মানুষের সেবক হ। এখনো হুঁশ হয় না? যখন এই না-খাওয়া মানুষেরা এক জোট হয়ে গায়ের চামড়া তুলে নেবে, তখন আল্লাহর নাম নেয়ারও সময় পাবি না বলে দিচ্ছি। চাকর হয়ে জন্মেছিস, চাকর হয়েই থাক। মালিক হওয়ার চেষ্টা করিস না। ভালো হবে না।'

মওলানা ভাসানী এ কি বাণী শুনালেন—দারোগা-পুলিশ আমাদের সাহায্য করার জন্য, হুকুম করার জন্য নয়। তারা আমাদেরই চাকরি করে। শান্তিপ্রিয়দের শান্তি নিশ্চিত করাই তাদের একমাত্র দায়িত্ব। কাউকে পেটাবার জন্য বা গুলি করার জন্য তাদেরকে রাখা হয়নি! কী আশ্চর্য—কী আনকোরা কথা! এ দিনের পর পুলিশ সম্পর্কে এলাকার লোকের ধারণাই পাল্টে গেল। পুলিশকেও তবে চাবুক মারা যায়!

সাত

১৯৭২-৭৩-এর ঘটনা।

মিল্ক ভিটা টাংগাইলে প্রথম দুধের ব্যবসা শুরু করে। বিভিন্ন বাজার এবং কিছু পয়েন্ট থেকে দুধ সংগ্রহ করা হতো। দুধের চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় গ্রামের গেরস্থরা ভালো মূল্য পাচ্ছিল। এতে স্থানীয় ঘোষেরা পড়েছিল বেকায়দায়। তারা আর অল্প মূল্যে দুধ সংগ্রহ করতে পারছিল না। তাই মিল্ক ভিটার দুধ কেনা বন্ধ করা যায় কী করে তা নিয়ে তারা ফন্দি-ফিকির করছিল। ঘোষেদের মধ্যে দু চার জন বুদ্ধিমান ছিল। তারা একটি বুদ্ধি খাটায়। টাকা-পয়সা খরচ করে ২-৩ শ মহিলাকে তারা শিখিয়ে বুঝিয়ে নিল। তারা এসে মওলানা ভাসানীর বাড়ির সামনে কান্নাকাটি শুরু করতে লাগল। একদিন-দুইদিন বিষয়টার উপর মওলানা তেমন গুরুত্ব দেন নাই। তৃতীয় দিন তিনি জানতে চাইলেন, 'কী হইছে তোমাদের? ছোট ছোট বাচ্চা কোলে মায়েরা ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে হুজুরকে জানালো, মিল্ক ভিটাঅলারা সব দুধ ঢাকায় নিয়ে যায়। তারা বাচ্চাদের মুখেও কোনো দুধ দিতে পারে না। শত কণ্ঠে মাতৃ কলরব শুনে হুজুরের কোমল প্রাণ কেঁদে উঠল। তিনি হুংকার ছাড়লেন, এত বড় সাহস! শিশুর গ্রাস কেড়ে নেয় মিল্ক ভিটা। মিল্ক ভিটা জ্বালিয়ে দঠর, পুড়িয়ে দাও। ওদের লোকজন যেখানে পাওয়া যাবে টুকরো টুকরো করে ফেলো।'

মিল্ক ভিটার লোকদের কানে খবর পৌঁছাতে সময় লাগল না। বাচ্চা কোলে কয়েকশ মহিলা সন্তোষ থেকে ফেরার পথে শহর দিয়ে শ্লোগান দিয়ে গেল। হুজুর বলেছে— যেখানে মিল্ক ভিটা পাবে, সেখানেই তাদের টুকরো টুকরো করো। ব্যস, আর কিছু করতে হলো না। মিল্ক ভিটার লোকজন গিয়ে ইঁদুরের গর্তে লুকাল। কে আর জীবন হারাতে চায়। মিল্কভিটার গাড়ি নেই, পয়েন্টে পয়েন্টে ক্রয় কেন্দ্র নেই। গৃহস্থেরা দুধ বেচতে গিয়ে ফিরে এলো। কেউ আবার অপেক্ষা করতে করতে দুধ নষ্ট হয়ে যাওয়ায় বিলে নদীতে ফেলে দিয়ে এলো। আর ঘোষেরা তো ওঁত পেতেই ছিল। কেউ কেউ সাধা জিনিসের আধা দাম, নামমাত্র দামে ঘোষেদের কাছে বিক্রি করল। এভাবে চলল মাসখানেক। আট-দশ আনা সের দুধ তিন-চার আনায় নেমে এল। মিল্কভিটা দুধ নেয়ায় গ্রামে-গ্রামে কৃষকদের যেমন একটা অর্থনৈতিক লাভ এসেছিল ২-৩ মাসে তা আবার মন্থর হয়ে এলো।

বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী বলেন, 'অবস্থা যখন এই পর্যায়ে তখন আওয়ামী লীগের এক সময়ের মন্ত্রী পাবনার জনাব আবু সাঈদ মিল্কভিটার ডাইরেক্টর নাকি চেয়ারম্যান, তিনি মিল্কভিটার কয়েকজন কর্মকর্তাসহ একদিন আমার বাবর রোডের বাসায় এসে হাজির। তাদের কাথা শুনে দু-চার দিন পর আসবেন বলে বিদায় করেছিলাম। সন্তোষে গিয়ে দুধ সম্পর্কে কথা তুলতেই হুজুর তেলে বেগুনে

জ্বলে উঠলেন। বললেন, "কোথাকার কোন মিল্কভিটা, ধাপ্পাবাজের দল! সাম্রাজ্যবাদের এজেন্ট। সব দুধ ঢাকায় নিয়ে যায়। শিশু বাচ্চারা পর্যন্ত দুধ পায় না। ওদের জ্যান্ত কবর দেওয়া উচিত।"

'হুজুরের কথা শুনে বুঝলাম ব্যাপারটা কী। ঢাকায় ফিরে এলাম। এর ৪-৫দিন পর মিল্কভিটার কর্মকর্তারা আবার এলেন আমার কাছে। দুধের দাম না পেয়ে সাধারণ মানুষ বেশি অসুবিধায় পড়েছিল। ঘোষেরা যে কারসাজি করে মিল্কভিটাকে তাড়িয়েছে ততদিনে তা প্রায় সবাই জেনে গিয়েছিল। কিন্তু হুজুরকে তা বোঝানো যায় কীভাবে? অনেক দিন হুজুরের সাথে চলাফেরা করায় তাঁর মানবিক বিষয়গুলো আমার জানা ছিল। তিনি সবসময় নিঃস্ব হতদরিদ্র লোকের পক্ষে ছিলেন। তাই মিল্কভিটাদের বুদ্ধি দিলাম তোমরাও ঘোষেদের মতো কৌশল খাটাও। কয়েকদিন পর তারা তাই করল। হাজারখানেক গ্রামীণ নারী-পুরুষ-বাচ্চা নিয়ে ভাসানীর বাড়ির সামনে ভিড় জমাল। মেয়েদের কোলে ছোট ছোট বাচ্চা। তারা কান্নাকাটি বলল, ঘোষেরা দুধের দাম দেয় না। আমরা চাল-ডাল কিনতে পারি না। না খেয়ে মরার দশা। মিল্কভিটা দুধ না কিনলে আমরা না খেয়ে মরব।'

হুজুরও বুঝলেন– সত্যিই তো, গৃহস্থরা দাম না পেলে বউ-পোলাপান নিয়ে চলবে কি করে! তিনি আগের নির্দেশ প্রত্যাহার করে নিলেন এবং পরদিন থেকে আবার মিল্কভিটার দুধ কেনা শুরু হয়ে গেল।

আট

১৯৭৬ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি খুলনায় এক সভায় বক্তৃতা প্রদানকালে মওলানা ভাসানী অসুস্থ হয়ে পড়েন। পিজি হাসপাতালে ভর্তি করা হলো। এর মাঝে আবার নতুন করে ফারাক্কার বিষয়টি সামনে আসে। বিভিন্ন ছাত্রদলের নেতা-কর্মী তাঁর নিকট এসে আবেদন জানান– কিছু একটা করতে হবে। নইলে আমাদের দেশ মরুভূমি হয়ে যাবে। বড় সংকট দেখা দেবে। ফলে তিনি ফারাক্কা বাঁধের বিরুদ্ধে লং মার্চের ঘোষণা দিলেন। ১৯৭৬ সালের ১৬ মে রাজশাহী মাদরাসা ময়দান থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে লক্ষ লক্ষ মানুষের এ মহা লং মার্চের যাত্রা ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, এ মিছিল বৃহৎশক্তির বিরুদ্ধে মজলুমের সংগ্রামের প্রতীক। গোটা বিশ্বের বুক থেকে জালেমের শোষণ-পীড়নের সমাপ্তি না ঘটা পর্যন্ত এ সংগ্রাম চলবে।

ভাসানী তখনো ভীষণ অসুস্থ। ডায়াবেটিস দ্রুত ১৭/১৮ ওঠা-নামা করছে। ব্রংকাইটিস বেড়ে গেছে। খুবই কষ্ট পাচ্ছেন। যাঁরা পাশ থেকে তাঁর কষ্টের পরিণাম দেখেছেন, তাঁরাই শুধু কিছুটা অনুমান করতে পারবেন– কীভাবে তিনি তার শরীরের উপর নিজের ইচ্ছাশক্তির জোর খাটিয়ে চলছিলেন। প্রতি আধা ঘণ্টা পর পর কাপড় বদলাতে হচ্ছে। বৃষ্টি শুরু হয়। তবুও মিছিল চলতে থাকে। লক্ষ লক্ষ মানুষ। বৃষ্টির কারণে কেউ মিছিল থেকে সরে যায়নি। প্রেমতলী এসে রাত্রিযাপন করা হয়। পরদিন সকালে আবার যাত্রা শুরু। আরও ৩৪ মাইল পথ। ১৭ মে বিকাল ৪টায় কানসার্ট গিয়ে মিছিল শেষ হয়। মওলানা ভাসানী মিছিলের সমাপ্তি ঘোষণা করে বলেন, 'বাংলাদেশের ন্যায্য হিস্যার দাবি মেনে না নিলে তিনি আগামী মাসের মধ্যে স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী গঠন করে আগামী ১৬ আগস্ট থেকে ভারতীয় পণ্য বর্জন আন্দোলন শুরু করবেন। তিনি মিছিলে আগতদের শপথ বাক্য পাঠ করান, গঙ্গার পানির ন্যায্য হিস্যা না পাওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা, এবং দেশ গড়ার কাজে আত্মোৎসর্গ করা।'

ফারাক্কার বিরুদ্ধে মহা লং-মার্চ-এর সময় মওলানা ভাসানীর শারীরিক অবস্থা নিয়ে আহমদ ছফা লিখেছেন, 'পেশাবের বেগ তিনি ধরে রাখতে পারছেন না, বেদনায় তাঁর সমস্ত মুখ ফ্যাকাশে হয়ে উঠছে। বাংলাদেশে সর্বনাশ ঘটছে এটা তাঁর চেয়ে কেউই আর এতো স্পষ্ট করে বোঝেনি। ফলে জীবনের শেষ সেকেন্ডগুলো তিনি হিশাব করে খরচ করছিলেন।'

লেখক ছফা ভাসানীকে বলেছেন– জলদেবতা।

আর ভারত সম্পর্কে তাঁর বিশেষণ– জলজল্লাদ।



বাঙালির গদ্য ও পদ্যে মওলানা ভাসানীর জীবনপাঠ

মুজিব হাসান

মওলানা ভাসানী। বাঙালির ইতিহাসের এক অবিস্মরণীয় নাম। বরং তাঁর নামই এক ইতিহাস। কিন্তু তাঁকে আমরা অনেকেই জানি একজন বামপন্থী রাজনীতিবিদ বা চীনাপন্থী কম্যুনিস্ট হিসেবে। শুরুতেই এ ব্যাপারটা একটু পরিস্কার করে নেওয়া যাক।

এক বাঙালির গদ্যপাঠে আমরা পেয়ে যাব এ সংশয়ের সাফ সাফ জবাব। তাঁর নাম বেদুঈন সামাদ। বাংলাদেশের একজন বরেণ্য কথাশিল্পী ও ঔপন্যাসিক। তাঁর মনেও উদিত হয়েছিল এমন সংশয়। তিনি সেটা দূর করেছেন একান্ত নিকট থেকে মওলানার জীবন পাঠ করে। কীভাবে? শুনুন তাঁর জবানিতে–

'মওলানা ভাসানীর নিঃস্বার্থ রাজনৈতিক জীবন, অনাবিল মানবপ্রীতি এবং নিখাদ দেশপ্রেম তাঁকে সর্বস্তরের মানুষের আপনজনে পরিণত করেছিল। ইতিপূর্বে অনেকের মতো আমারও ধারণা ছিল, তিনি একজন চীনাপন্থী কম্যুনিস্ট। কিন্তু বক্তৃতার মাঝে কথায় কথায় ইসলামের শিক্ষার দৃষ্টান্ত দেওয়ায় আমার সে ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়েছিল সেদিন। অবশ্য তাঁকে কম্যুনিস্ট সাম্যবাদে বিশ্বাসী বলে বহুল প্রচার করেছিল পুঁজিপতিরা।

'তদানীন্তন পাকিস্তানের শাসকগণ মওলানা ভাসানীকে অর্থ, পদমর্যাদা প্রভৃতি সবকিছুর প্রলোভন দেখিয়েও তাঁর মতবাদ হতে তাঁকে ইঞ্চি পরিমাণও টলাতে পারেননি। বারবার কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েও তিনি রয়েছিলেন হিমালয়ের ন্যায় অটল। তাই শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে তাঁরা তাঁকে কম্যুনিস্ট বলে প্রচার করেছেন জনগণের কাছে। তাঁরা জানতেন কম্যুনিস্ট সম্বন্ধে ভীতি আছে জনগণের মনে। কিন্তু বাংলাদেশের জনগণ চিনতেন তাঁদের প্রাণপ্রিয় নেতা মওলানা ভাসানীকে। তাই তাঁরা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন তদানীন্তন পাকিস্তানের গণধিকৃত নেতাদের সে প্রচার, সে বিবৃতি।'

মওলানা ভাসানী নিজেও দৃপ্ত কণ্ঠে বলেছেন–'আমি চীনের নাস্তিক্যবাদ ছাড়া আর সবকিছুকে সমর্থন করি।' আর সবকিছু কী? সাম্রাজ্যবাদ? উঁহু, পড়ুন একবারের ঘটনা–

জনৈক সাংবাদিক এসেছেন মওলানা ভাসানীর সাক্ষাৎকার নিতে। জিজ্ঞেস করলেন, মিস্টার মওলানা, আপনি কি সারাজীবন সাম্রাজ্যবাদের সাথে সংগ্রাম করে যাবেন? জবাবে মওলানা ভাসানী বললেন, 'কবরে মুনকার-নাকির ফেরেশতা এসে যদি জিজ্ঞাসা করে সেখানেও তাদেরকে বলব–সাম্রাজ্যবাদ মানি না! মানি না! মানি না!'

ভাষাসৈনিক অধ্যাপক আবদুল গফুরের গদ্যপাঠে ব্যাপারটা অনেকটাই খোলাসা হবে। আসুন পাঠ করে নিই, আর দূর করি মনের সংশয়। একটি চমৎকার উদাহরণসহ পরিষ্কার বাংলায় তিনি লিখেছেন–'আসলে মওলানা ভাসানী ছিলেন স্থানকালের সমস্ত ক্ষুদ্রতা ও সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে মানবতার মুক্তিকামী এমন এক বিশাল ব্যক্তিত্ব, যাঁর কল্যাণদৃষ্টি থেকে ক্ষুদ্র-বৃহৎ কেউই বঞ্চিত থাকত না। তিনি মূলতই ছিলেন মানবতার এক মহান মুক্তি সৈনিক এবং তাঁর কর্মজীবনের সমস্ত আপাতবৈপরীত্য ও বাহ্যিক পরস্পরবিরোধিতার আড়ালে তাঁর এ মূল পরিচয়টা খুঁজে পেতে যেকোনো নিরপেক্ষ সত্য সন্ধানীর বেগ পাবার কথা নয়। তবুও যে আমরা অনেকে ভাসানীকে ভুল বুঝি, তার কারণ আমাদের দৃষ্টির সীমাবদ্ধতা ও অগভীরতা। বলতে গেলে আমরা অনেকেই সাত অন্ধের হাতি দেখার মতো ভাসানীর খণ্ড পরিচয়কেই পূর্ণ পরিচয় ধরে নিয়ে আমাদের নিজেদের ব্যর্থতার কারণে ভাসানীর 'পরস্পরবিরোধী রূপ' নিয়ে এক অর্থহীন বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছি।'

মওলানা ভাসানী তবে কেমন ছিলেন? প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁর কাছে তিনি মূর্ত হয়ে ওঠেন এভাবে–'ভাসানীর মওলানা সাহেবের কাজকর্ম দেখে মনে হয়েছে লোকটি বাংলার কালবৈশাখী। প্রচণ্ড তাঁর শক্তি ততোধিক তাঁর বেগ। যেদিকে চলেন তাঁর দাপটে আধমরা ডাল ভাঙে, জরাজীর্ণ গাছ উপড়ে যায়, বাসি পাতা খসে হাওয়ায় ওড়ে, বুতো ঘর ভূমিস্যাৎ হয়। তারপর কালবৈশাখী কোথাও চলে যায়। নতুন ঘর তোলার দায়িত্ব অন্য লোকের, নতুন চারা লাগানোর ভার অন্য মালীর, নতুন পাতা পল্লব জাগিয়ে তোলার দায়িত্ব নব বসন্তের।'

এটাই ছিল মওলানা ভাসানির স্বরূপ। তিনি ছিলেন কালবৈশাখী উপমাধারী। এর মূলে কী ছিল? এককথায় মাটির মায়া এবং মাটির মতো মানুষগুলোর প্রতি ভালোবাসা। এ ভালোবাসার জোরেই তিনি হয়েছিলেন বাঙালির মজলুম জননেতা। কারণ চাষাবন্ধু মওলানা ভাসানী নিজেও ছিলেন একজন চাষা। লালনীতি, নীলনীতির রাজনীতির চেয়ে নিজেকে চাষার পরিচয়ে জাহির করতে মওলানা স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতেন। অধ্যক্ষ মুহাম্মদ হোসেনের স্মৃতিকথায় শুনুন এর গল্প–'হুজুর মওলানা ভাসানী হজে যাবেন। হজে যাবার পাসপোর্ট করতে হবে। ফরম আনা হলো, হুজুরের নামধাম, পিতার নাম লেখা হলো। পেশা রাজনীতি বলে উল্লেখ করা হলো। হুজুর ক্ষেপে গেলেন। বললেন, রাজনীতি কি পেশা হয়? লেখ চাষা!'

চাষ যাঁর পেশা তিনি তো কালবৈশাখী হবেনই। বরং তিনি হবেন আরো যুৎসই উপমার অধিকারী। সেটা ঝলমলিয়ে উঠেছে গোলাম সারওয়ারের পঙক্তিপুঞ্জে–

'ভাসানি মানে ক্ষেপে ওঠা কোনো চাষাড়ে যুবক–
তাঁর চোখে শুধু অবিনাশী ক্রোধের লবণ
সে যেন এক খেটে খাওয়া কৃষকের শান দেওয়া
ঝলসানো অস্ত্র'

হ্যাঁ, ঝলসানো অস্ত্রই বটে। আর যাদের হাতের পরশে তিনি ঝলসে উঠেছিলেন, তারা এ বাংলার চাষাভুষা জনগোষ্ঠী। নিপীড়িত কৃষক সমাজ। তিনি ছিলেন তাদের সুখদুখের ভাগীদার। আত্মার আত্মীয়। হৃদয়ের পরমজন। তাই অন্তর দিয়ে অনুভব করেছেন তাদের দুঃখ। সহমর্মিতা জানিয়ে বলেছেন–'ভারতের কৃষকের দুঃখ, ইরানের কৃষকের দুঃখ, বার্মার কৃষকের দুঃখ, নেপালের কৃষকের দুঃখ, ভুটানের কৃষকের দুঃখ, কাবুলের কৃষকের দুঃখ, বাংলাদেশের কৃষকের দুঃখ–এক দুঃখ।'

তাদের পক্ষপাত নিয়ে সাহসিকতার সঙ্গে আওয়াজ তুলেছেন– 'বাংলার কৃষক তোমরা প্রস্তুত হও! দুনিয়ার নিপীড়িত মানুষ, দুনিয়ার মজলুম মানুষ, দুনিয়ার নির্যাতিত মানুষ, শোষিত মানুষকে তোমরা মুক্ত করো–আমরা মুক্ত করবই করব!'

মূলত বাংলার মাটি আর মাটির মতো সরল, উর্বর, তেজস্বী কৃষক সমাজই ছিল তাঁর রাজনীতির কারণ। তাদের অধিকার আদায়ে তিনি লড়েছেন আজীবন। কৃষি আর কৃষকের উন্নতি ছিল তাঁর আন্দোলনের লক্ষ্য। এ সম্পর্কে মওলানা নিজেই বলেছেন–'দেশের

উন্নতি বলতে আমি বিশ্বাস করি, আমি বুঝি কৃষকের উন্নতি, কৃষির উন্নতি। কারণ কৃষকই জাতির মেরুদণ্ড। এজন্যই আমি কৃষকের দাবি নিয়ে আন্দোলন করে থাকি।'

বিশ্বাসের এ বচন মওলানা কোথা থেকে ধারণ করলেন তাঁর হৃদয়ে? সেও ওই চাষাভুষা জনগোষ্ঠী আর নিপীড়িত কৃষক সমাজ থেকেই। রূপকথার রাজপুত্রের এদিকটা উন্মোচন করেছেন শরিফুল ইসলাম আল মাজি–'কৃষকের সন্তান মওলানা। শহরের তথাকথিত চাকচিক্য তাঁকে লালায়িত করেনি। ৯৮ ভাগ সাধারণ সরলপ্রাণ মানুষ ছিল তাঁর সঙ্গী। ঋণ সালিশ বোর্ড থেকে শুরু করে এদেশে যতগুলো সংস্কারমূলক আইন পাশ হয়েছে, প্রতিটির পেছনে মওলানা ভাসানীর দান অনস্বীকার্য। কৃষকের নয়নমণি মওলানা ভাসানী পুরো জীবন কাটিয়েছেন গাঁয়ের সরলপ্রাণ কৃষকের মাঝে। আর তাই তিনি কৃষকের সমস্যা উপলব্ধি করতে পারতেন সঠিকভাবে। অলৌকিক কম্পিউটারের মতো বলে যেতেন কখন চালের দাম কত, আলুর দাম কত, সারের দাম কত। বলে যেতেন ঝড়ে বা খরায় কৃষকের কতটা ক্ষতি হয়েছে। বলে যেতেন কৃষকের ঘরে হাহাকারের কথা।'

বাংলার নিপীড়িত কৃষক সমাজ, যারা প্রাণপণ পরিশ্রম করে সারা বছর সকলের ভাতের যোগান দেয়, তাদের ঘরে থাকে ভাতের অভাব। তাদের দিন কাটে হাভাতে। ভাতের বাইরে আর কোনো চাহিদাকে তারা মনে ঠাঁই দেয় না। অথচ তার মনে আকুলিবিকুলি করে কত আকাঙ্ক্ষা! নিরীহ কৃষকের এ সুপ্ত আকাঙ্ক্ষার কথা মওলানা বুঝতে পারতেন। অধ্যক্ষ মুহাম্মদ হোসেনের স্মৃতিকথায় শুনুন এর গল্প–'মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়ানো এক গরিব মুরিদের বাড়িতে এলেন মওলানা ভাসানী। রোগী তখন মৃত্যু-যন্ত্রণায় কাতর। এক গ্লাস পানিতে ফুঁ দিয়ে রোগীর সম্মুখে গ্লাসটি তুলে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কী খাবা?" "রসগোল্লা, হুজুর!" ভাসানীর হুজুর দুটি রসগোল্লা আনলেন। একটি রসগোল্লা অর্ধেক খাওয়ার পর রোগী আর অর্ধেক খেতে পারেনি। এর কিছুক্ষণ পর সে মারা যায়। 'একদিন হুজুরের মুখে বাংলার দরিদ্র কৃষকের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে শুনলাম এ কাহিনি। কাহিনি শেষ হতে হুজুরের চোখ থেকে গড়িয়ে পড়ল দুফোঁটা পানি। হুজুর আবেগজড়ানো কণ্ঠে বললেন, "জানি বাংলার ঘরে ঘরে এমনই বহু বহু দরিদ্র কৃষক রয়েছে, জীবনে একটা রসগোল্লা খেয়ে মরতে পারেনি।"'

মওলানা ভাসানী ছিলেন সাদাসিধে জীবন যাপনে অভ্যস্ত। খদ্দরের সফেদ পাঞ্জাবি, তাঁতের লুঙ্গি, তালের আঁশের টুপি, কাশফুল দাড়ি–এই ছিল তাঁর প্রাত্যহিক রূপ। কিন্তু উদাত্ত কণ্ঠস্বর, নিরাপোষ অহংকার এবং কাউকে তোয়াক্কা না করে হক কথা বলা–এসব অনন্য গুণে তিনি ছিলেন সমৃদ্ধ। মওলানার এ অভিন্ন রূপ ও অনন্য গুণের মাহাত্ম্য ঝংকৃত হয়েছে নেছারউদ্দিন আহমদের ছড়ার ছন্দে–

'কোন সে নেতার ছেঁড়া জামা
বেতের টুপি মস্তকে,
ন্যায়ের পথে করতে লড়াই
কে বাড়াতেন হস্তকে?
তিনি হলেন সবার সেরা
নাম হল তাঁর ভাসানী,
ভয় পেতেন না জালিম রাজার
রক্তচক্ষু শাসানি।'

মওলানার মাথায় শোভিত ওই বেতের টুপির মাহাত্ম্য কী ছিল? দেশের আর সব আলেম-উলামা, পীর-মাশায়েখ যখন কোমল সুতোর গোল বা লম্বা টুপি মাথায় ধারণ করতেন, তখন তিনি কেন আম নেজামের বাইরে গিয়ে তালের আঁশের শক্ত বেতের টুপি মাথায় পরতেন? কী রহস্য ছিল এর? জানতে হলে পড়ুন কবি ও লেখক আবদুস সাত্তারের স্মৃতিকথন–'একবার তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, হুজুর, আপনার ওই বেতের টুপির মাজেজা কি? তিনি শেখ সাদির 'উসতাদ জেহরে মেহরে পেদার–পিতার স্নেহের চেয়ে শিক্ষকের মার ঢের ভালো' এই বয়াতটি উচ্চারণ করে বললেন, শিক্ষক ছাত্রদের শায়েস্তা করেন বেত মেরে। সমাজকেও শায়েস্তা করার জন্য বেতের প্রয়োজন।'

আসলে মওলানা ভাসানী ছিলেন সমাজের

শিক্ষক। আর সমাজের এ মহান শিক্ষকের কাছে কবিতার খাতা নিয়ে ছুটে যেতেন আধুনিক বাংলা কবিতার সেরা কবি আল মাহমুদ। তিন আমলের প্রাচীন শতবর্ষী বিটপির কাছে ছুটে যেতেন হাল আমলের আধুনিক কবিতার ভ্রমর। তিনি তাঁকে শোনাতেন কবিতার সংগীত। তাঁর সামনে উপুড় করে ঢালতেন নিজের সমস্ত সঞ্চয়। পড়ুন না কবির ভাষায়–

'মওলানার টুপিওয়ালা উঁচু মাথাটি যেন
এক হারিয়ে যাওয়া পর্বতের স্মৃতি।
আমি এই পর্বতের পাশে মাঝেমধ্যে যেতাম
স্নিগ্ধ, যেন নিজের মধ্যে সমাহিত এক
বাতাসের ফুঁৎকার
বলতেন, কবিতা দিয়ে কী হবে? আগে চাই
স্বাধীনতা
তারপর ভাত-কাপড়।
স্বাধীনতা আর ভাত-কাপড়ের পর আপনার
আর কী চাই মওলানা?'

মওলানা তখন তাঁর নিপুণা ঘরনির রান্না করা গলদা চিংড়ির মালাইকারি দিয়ে পাতভরা ভাত প্রাচীন অজগরের মতো নিঃশব্দ লোকমায় খেয়ে নিতেন। তারপর দাঁত ও দাড়ি খেলাল করতে করতে কবিকে বলতেন তাঁর খাতা খুলে আবোলতাবোল যা খুশি পড়তে। কবি খাতাটি খোলার আগেই মওলানা ঘুমিয়ে পড়তেন। হয়তো-বা কবিতা শোনার জন্য নিজের মধ্যে মুরাকাবার হালত তৈরি করতেন। কবি তখন ঘুমন্ত পর্বতের পাদদেশে একের পর এক ওড়াতে থাকতেন তাঁর কবিতার ফড়িং।

সমঝদার এ সমাজ-শিক্ষকের একটা চমৎকার কাহিনি পেয়েছি তাঁর ছায়াপালিত ছাত্র শেখ মুজিবকে নিয়ে। এ জেড এম শামসুল আলমের বর্ণনায় শুনুন সেই কাহিনি–'দেশ স্বাধীন হওয়ার পর শেখ মুজিবুর রহমান মওলানা ভাসানীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে সন্তোষ যান। তাঁর খেদমত করার সুযোগ দিতে শেখ মুজিব মওলানার প্রতি আবেদন জানান। মওলানা বললেন, তুমি আমার আর কী খেদমত করবা? আমার খেদমতের দরকার নাই। কলেজটি চালাতে আমার অসুবিধা হতেছে। তুমি এটাকে নিয়ে যাও।

'শেখ মুজিব জানালেন, কলেজটি সরকারি করতে তিনি রাজি আছেন, তবে এক শর্তে। শর্তটা হলো, কলেজটির নামকরণ করতে হবে 'মওলানা ভাসানী কলেজ' নামে। মওলানা জানতে চাইলেন, মুহাম্মদ আলি নামটা কী দোষ করেছে? শেখ মুজিব বললেন, এ নামটা পশ্চিমা। মওলানা বললেন, মুজিব, আমি তোমার শর্ত মানতে রাজি আছি, তবে আমারও একটা শর্ত আছে। দেখা যায় পশ্চিমা হলেই দোষের হয় তোমার মতে। আমার নবিও যে ছিলেন পশ্চিমা। তুমি যদি আমাকে একজন পূরবা নবি এনে দিতে পারো, আমি তোমার শর্তে রাজি আছি। মওলানার এ জবাব শুনে শেখ মুজিব লা-জবাব। অগত্যা মওলানা মুহাম্মদ আলি নামেই এই কলেজটির সরকারিকরণ করা হয়।'

মওলানা ভাসানীর এ নিরাপোষ অহংকারকে কবিতার শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়েছেন মুকুল চৌধুরী–

'আমি এক তর্জনির শাসানো ভঙ্গি দেখেছি
বুকের ডানার মতো শুভ্র-সফেদ ওই অবয়ব
লালবাগ কেল্লাকেও গাম্ভীর্যে হার মানিয়েছিল।'

খালেক বিন জয়েনউদ্দিন দৃপ্ত কণ্ঠে উচ্চারণ করেছেন তাঁর অকুতোভয়তার গাঁথা–

'মওলানা ভাসানী
মানে নাই শোষকের
জেল-জুলুম শাসানি।'

মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানীকে নিয়ে আবদুল গাফফার চৌধুরী গেয়েছেন কোটি বাঙালির প্রাণের গান–

'শহরে বন্দরে গ্রামে ঘরে
হৃদয় নগরে
মুখের ভাষায় শুনি, বুকের সাড়ায় শুনি,
চোখের তারায় দেখি নাম
মওলানা ভাসানির নাম।
পাঁচ কোটি মানুষের প্রাণের কালাম–
কণ্ঠে শুনি তাঁর। হতবাক সবিস্ময়ে দেখি
জীবনে জীবনে এ কী
মিলিত প্রাণের গতি; কলকণ্ঠে আকাশ মুখর
বজ্র আর ঝড়ে শুনি স্বচ্ছ স্বর
মুখের ভাষায় শুনি নাম
মওলানা ভাসানির নাম।'

বাঙালির ইতিহাস মওলানা ভাসানী, অবিনশ্বর হোক তাঁর পাঠ।



মহামিছিলের মহানায়ক

জহিরুল হক

চাঁপাইনবাবগঞ্জে মে মাসের সতেরো তারিখ সকাল। টিপটিপ বৃষ্টি ঝরছে। আকাশ যত কালো তার চেয়ে আঁধার বেশি। আম্রকানন আর লিচুবাগানে ঘন অন্ধকারের পর্দা টেনে বৃষ্টি ঝরছে মন্থর ধারায়। বৃষ্টি থামার আপাত কোনো লক্ষণ নেই। আকাশভরা মেঘ। আকাশে মেঘ। আম বন, লিচু বনের নিচে সরু রাস্তায় মানুষের ঢল। চাঁপাইনবাবগঞ্জে রাত কাটানোর পর লাখো জনতার মিছিল ছুটে চলেছে সীমান্তের দিকে। বৃষ্টিমুখর চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে বজ্রানির্ঘোষ শ্লোগান মুখে নিয়ে মিছিল পার হয়ে যাচ্ছে মহানন্দা। ফারাক্কা মহামিছিল চলছে কানসাট সীমান্তে। মহানন্দা পার হয়ে সামনে আরও ১৬ মাইল পথ।

মহামিছিলের মহানায়ক মওলানা ভাসানী তখনও সীমান্তের পথে যাত্রা শুরু করেননি। কিছুক্ষণ পর তাঁর মিছিল অনুগমন করার কথা। মিছিল এগিয়ে যাচ্ছে। আর মওলানা ভাসানী তখন কথা বলছিলেন কয়েকজন সাংবাদিকের সাথে চাঁপাইনবাবগঞ্জের মনি উকিলের বৈঠকখানায় বসে। তিনি স্মৃতিচারণ করছিলেন বিগত দিনের রাজনীতির। স্বপ্ন দেখছিলেন ভবিষ্যৎ সমাজ-ব্যবস্থার। সীমান্তমুখী মিছিলের আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল থেকে থেকে। শ্লোগানের আবহে সেই বৃষ্টিমুখর সকালে শতাব্দী প্রবীণ জননেতা বলছিলেন ব্রিটিশ-ভারতে সিরাজগঞ্জ কৃষক সম্মেলনের কথা। একটা পয়সা চাঁদা তোলা হয়নি। কৃষকরা সামর্থ্য অনুযায়ী নিয়ে এসেছিল চাল ডাল তরিতরকারি নুন-তেল-লাকড়ি। একমুঠো চাল চুরি করার কথা কেউ ভাবেনি। এক বেলায় ১৮'শ' মণ চাল-ডালের খিচুড়ি পাক হয়েছিল। তারপরও উদ্বৃত্ত ছিল ৯শো' মণ চাল। লাকড়ি তেল-নুনের হিসাব বাদই থাক। নিজের কাছে নিজেই প্রশ্ন করলেন–'কাকে বিশ্বাস করব? পয়সা দেখলে কারও মাথা ঠিক থাকে না। কোনো প্রোগ্রাম নিলেই বের হয় চাঁদা তুলতে। কে ক'টাকা চাঁদা তুলে তার হিসেব চাইলে বলে রশিদ বই হারিয়ে গেছে। এদের বিশ্বাস কোরো না তোমরা। যারা হাজার হাজার বিঘা জমির মালিক, যাদের বাড়ির কয়েক মাইল সীমানায় অন্যের জমি নেই, তারাই সব কৃষক-নেতা। এরা কৃষকের সমস্যা, কৃষকের দুঃখ বোঝে না। তোমরা যাও একটা গ্রাম বেছে কৃষকদের সঙ্গে আলাপ করে সার্ভে করো। দেখবে, কৃষকদের মেরুদণ্ড নেই।'

মওলানা ভাসানী বক্তা। সাংবাদিকরা নীরব শ্রোতা। কথা বলতে বলতে অসুস্থ বৃদ্ধ জননেতার কণ্ঠ আবেগে জড়িয়ে গেল। বললেন, 'আজ আমি বুড়ো হয়ে গিয়েছি। আমি গরিব কৃষকদের জন্যে কী করে যেতে পারব জানি না। তবে এখন মনে হয় এদের সাথে আমি বিশ্বাসঘাতকতা করেছি। এদের বিশ্বাস অর্জন করেছিলাম। তার মূল্য আমি দিতে পারিনি। এই গরিব মানুষদের ভোট এনে আমি বারবার গদিতে বসিয়েছি কতগুলো

বেঈমানকে, যারা ওয়াদা করে ওয়াদা রাখেনি, যারা কৃষকদের কথা ভুলে নিজেরা সম্পদের পাহাড় তৈরি করেছে। আজ আর কিছু বলতে পারি বা না পারি, একটা কথা কৃষকদের বলে যাব–এইসব নেতাকে তোমরা বিশ্বাস করো না, নিজেরা ঐক্যবদ্ধ হও।'

মওলানা বলে চললেন, 'সব গ্রামে এই স্বাস্থ্য নিয়ে ঘুরতে না পারি, অন্তত আমার ১২ লক্ষ মুরিদকে এ কথা বলে যাব।' সাংবাদিকদের তিনি জানিয়ে দিলেন, তিনি মুরিদদের দীক্ষা দেন। ছাপানো ফরমে লেখা থাকে–আমি আজীবন সাম্রাজ্যবাদ-সামন্তবাদ-পুঁজিবাদবিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে কৃষকরাজ কায়েমের জন্যে সর্বশক্তি নিয়োগ করব। আমি রোজা-নামাজ-হজ-জাকাত নিয়মিত আদায় করব।' ডুপ্লিকেট কপির মওলানা ভাসানী সাক্ষরিত কপিটি থাকে মুরিদের কাছে। আর মুরিদদের সাক্ষরিত কপিটি থাকে মওলানা সাহেবের কাছে। ধর্মপ্রাণ দরিদ্র কৃষকদের মনে দুর্বার রাজনৈতিক চেতনা সৃষ্টির এই কৌশল একান্তই মওলানা ভাসানীর নিজের। সর্বহারা রাজনীতির তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ নিয়ে যাঁরা কৃষকদের কাছে যেতে চেষ্টা করেন, এই কৌশলের কাছে তাঁরা পরাস্ত হতে বাধ্য। মওলানা ভাসানী আশাবাদী। কৃষকদের মধ্য থেকেই কৃষক নেতা বেরিয়ে আসবেন। তিনি বললেন–'দিন সামনে রয়েছে, খুব দূরে নয়। দেখবে, এখন যারা নেতা তারা কেউ নেই। কৃষকরা এগিয়ে এলে এরা তখন পালাবে।'

১৬ মে (১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দ) ফারাক্কা মহামিছিল দ্বিপ্রাহরিক বিরতির জন্যে রাজশাহী শহর থেকে ১৩ মাইল দূরে প্রেমতলীতে থেমেছে। এর আগে মুষলধারে বৃষ্টি হয়েছে। বৃষ্টিতে ভিজে মিছিল এসেছে প্রেমতলীতে। তখন আর বৃষ্টি নেই। রোদে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে মিছিলকারীদের মুখ। একটা পিকআপ ভ্যানের ওপর মাইক্রোফোন বাঁধা। পিকআপ ভ্যানের পা-দানিতে একটা পা রেখে মাউথপিস হাতে নিয়ে বক্তৃতা করছিলেন মওলানা ভাসানী–'আজ এই ঐতিহাসিক লংমার্চের মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয়েছে দরিদ্র মানুষের ঐক্য। এই ঐক্য অটুট রেখে তোমরা এগিয়ে গেলে ধনী আর গরিবকে শোষণ করতে পারবে না। কৃষকরাজ তোমরা ইনশাআল্লাহ কায়েম করতে পারবে।'

অনন্য রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির অধিকারী মওলানা ভাসানী ভবিষ্যতের কী কী ছবি দেখেছেন তা তিনি ছাড়া কেউ জানেন না। ফারাক্কা মহামিছিল করে রাজশাহী থেকে কানসাট সীমান্ত পর্যন্ত ৫০ মাইল পথে তিনি কী ইতিহাস সৃষ্টি করলেন, তার মূল্যায়ন ভবিষ্যতেই হবে। এ মুহূর্তে শুধু এটুকুই বলা যায়–এ মিছিলের মাধ্যমে এই বৃদ্ধ জননেতার ওপর জনগণের আস্থা আবার নতুন করে প্রমাণিত হলো। একমাস আগে ঢাকার ইসলামিক ফাউন্ডেশন হলে এক ক্ষুদ্র সমাবেশে তিনি ঘোষণা করলেন ফারাক্কা মিছিলের কথা। তারপর যেন সব দায়িত্ব চলে গেল যাঁরা মিছিল করবেন তাঁদের ওপর। এলাকাভিত্তিক কোনো সাংগঠনিক সভা-সমাবেশ হলো না। কেবলমাত্র সাংগঠনিক কমিটির সদস্যদের মিছিলের আগের দিন পর্যন্ত রাজশাহীতে দেখা গেল না। শুধু মওলানা ভাসানী বসে রইলেন রাজশাহীতে। কখনও পান চিবোতে চিবোতে, কখনও-বা লিচু খেতে খেতে কথা বললেন দর্শনার্থীদের সঙ্গে। কী বিরাট কর্মসূচি। ৫০ মাইল পথ যাত্রার সাফল্য-অসাফল্যের ঝুঁকি। অথচ বৃদ্ধ নেতার চোখে-মুখে উদ্বেগের লেশমাত্র নেই। অবিচল আস্থা নিয়ে তিনি বসে আছেন নির্বিকার। মিছিল হয়ে গেল। এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত একজন কৃষক, একজন শ্রমিক থেকে একজন সীমান্ত প্রহরী পর্যন্ত রচিত হলো এক অবিচ্ছিন্ন ঐক্যের সেতু।

মনাকষা সীমান্তের চৌকি ফাঁড়ি। দেড় মাইল দূরে ভারতীয় ভূখণ্ডে সবদেলপুর। ভারতীয় বাহিনী সবদেলপুর থেকে এগিয়ে এসে সীমান্ত খুঁটির প্রায় ওপরে ছাউনী ফেলেছে। বাবলা গাছের ফাঁকে ফাঁকে দেখা যায় কনভয়ের সারি আর আমাদের চৌকা ফাঁড়িতে বসে আছেন মাত্র এক প্লাটুন বিডিআর-এর জওয়ান। তাঁদের একজনকে জিজ্ঞেস করলাম, বিপক্ষের বিরাট শক্তির সামনে তাঁরা দাঁড়াতে পারবেন কিনা। উত্তরে তিনি বললেন, 'কেন পারব না? পেছনে আপনারা একলাখ আছেন।'

সীমান্ত-প্রহরীর মনে এক কঠিন আত্মবিশ্বাস এনে দিয়েছেন মওলানা ভাসানী। যে বিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে এক বৃদ্ধ নেতা ডাক দিয়েছেন ফারাক্কা মহামিছিলের, যে মিছিলে যোগ দিয়েছে দেশের লাখো জনতা।

(লেখাটি হাসান আবদুল আজিজ সম্পাদিত ও ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রকাশিত 'মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী' স্মারকগ্রন্থ থেকে চয়িত)



মওলানা ভাসানীর হুকুমাতে রব্বানিয়া প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন

মুনশী নাঈম

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীকে সমাজতান্ত্রিক নেতারা বলতেন 'রেড মাওলানা' বা 'প্রফেট অব ভায়োলেন্স'। সমাজতান্ত্রিক নেতাদের সঙ্গে সম্পর্ক থাকার পরও কেন তাঁরা তাঁকে এইসব অভিধায় অভিহিত করতেন, এর উত্তরটা পাওয়া যাবে মাও সেতুং-এর সঙ্গে মওলানা ভাসানীর একান্ত আলাপে।

একান্ত আলাপে মওলানা ভাসানী মাও সেতুংকে বলেছিলেন, 'আমি আপনার সমাজতন্ত্র গ্রহণ করতে পারতাম, যদি এতে আল্লাহ থাকতেন।' মাও সেতুং হেসে বলেছিলেন, 'মওলানা, আপনারা কোরআনে যা পড়েন, আমরা বাস্তবে তা কাজে লাগিয়ে সমাজতন্ত্র গড়ে তুলেছি।'

মাওলানা ভাসানী ছিলেন বঞ্চিত ও অবহেলিত মানুষের প্রতি অকৃত্রিম এক দরদী নেতা। আর এই শ্রেণীর মানুষের মুক্তির জন্য সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন সমকালীন পৃথিবীতে ব্যাপক আলোড়ন তুলেছিল। অন্যদিকে ইসলামপ্রিয়দের ছিল না কোনো উল্লেখযোগ্য সংগঠন। ইংরেজ শক্তির প্রতি নানা ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটালেও সমাজের নিপীড়িত মানুষের পক্ষে এদের দ্বারা দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলার সুযোগ ছিল না। তাই মাওলানা ভাসানী নিপীড়িত মানুষের পক্ষে আন্দোলন বেগবান করতে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের মানুষের সাথে মিশতেন। প্রয়োজনের কারণে মিশতেন ঠিক, কিন্তু ওই যে মাও সেতুংকে বলেছিলেন 'সমাজতন্ত্রে আল্লাহ নেই', এই দর্শনটুকুই তাঁকে আলাদা করে রাখত সবসময়।

মওলানা ভাসানী ছিলেন একজন ত্রিকালদর্শী মওলানা। ইংরেজ আমলে আসামে আরম্ভ তাঁর কর্মতৎপরতা। পাকিস্তান আমলে অন্যায়ের বিরুদ্ধে তিনি এক বলিষ্ঠ চেতনা। বাংলাদেশেও তাঁর অনমনীয় কণ্ঠে ছিল বঞ্চিত মানুষের অধিকার আদায়ের বজ্র উচ্চারণ। ইসলামি আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হলে বঞ্চিত মানুষ তাদের অধিকার সমানভাবে পাবে–এই বিশ্বাস লালন করতেন মওলানা ভাসানী। এজন্যই তিনি হুকুমাতে রব্বানিয়া প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখতেন। শেষ জীবনে তিনি যখন তাঁর রাজনৈতিক সংগঠন ন্যাপের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলেন, তখন ঘোষণা করেছিলেন, 'এবার আমি এদেশের

কৃষক-শ্রমিক, সর্বহারা-মেহনতি মানুষকে নিয়ে এমন এক বিপ্লব করব, যা বিশ্বের কেউ কোথাও দেখেনি। আমি হুকুমাতে রব্বানি কায়েম করব। যেখানে প্রতিষ্ঠিত হবে এক শোষণহীন খোদায়ি সমাজব্যবস্থা।'

১৯৪৬ সালে আসামে মওলানা ভাসানী এবং মাওলানা আজাদ সুবহানি এক বৈঠকে মিলিত হন। মাওলানা আজাদ সুবহানি হুকুমাতে রব্বানিয়া প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করার প্রস্তাব পেশ করেন। এই প্রস্তাবে সম্মতি পেশ করে মওলানা ভাসানী বলেন, আমার সকল সংগ্রাম হুকুমাতে রব্বানিয়া প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পরিচালিত হবে।

সন্তোষে তাঁর কৃষক সমিতির অফিসের সামনের সাইনবোর্ডে লেখা ছিল–'হুকুমাতে রব্বানিয়া, আল্লাহর রাজত্ব কায়েম কর।'

১৯৪৬ সালে যে প্রত্যয় ব্যক্ত করেছিলেন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, এর প্রায় দুই যুগেরও বেশি সময় পরে এসে ১৯৭৪ সালে তিনি বলেন, সব কথা ও কাজের একটা মওসুম আছে। যদি তা মওসুম মাফিক মানুষের নিকট পেশ না করা হয়, তবে অতীব কল্যাণকর বিষয়ও অর্থহীন ও পুরুষত্বহীন হয়ে পড়ে। ইমাম গাজালি বলেছেন, যদি কোথাও আজান দিয়ে মানুষকে নামাজের দিকে না আনা যায়, তবে ঢোল বাজিয়ে আনো। বাংলাদেশের মানুষ বহুত ঘুমিয়েছে। এতদিন ঢোলের বাড়িতে ঘুম ভাঙত, এখন আজানের ধ্বনিতে ঘুম ভাঙার অভ্যাস হয়েছে।

জনদরদী তো অনেকই ছিলেন। কিন্তু মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী কেন এতটা উজ্জ্বল এবং প্রত্যুজ্জ্বল হয়ে উঠলেন? মূলত কিছু মানুষ অন্যায় দেখলেই ব্যথিত হন। তাঁদের মধ্যে যাঁরা এই অন্যায়ের প্রতিবাদে এগিয়ে আসেন না, তাঁদের সংখ্যা অনেক বেশি। এগিয়ে আসার সংখ্যা অনেক কম। অন্যায়ের প্রতিবাদে এগিয়ে আসার এই স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে যখন ধর্মীয় আবেগ ও দায়িত্ব-চেতনা যুক্ত হয়, তখন সেটির প্রবাহ সহস্র গুণে বৃদ্ধি পেয়ে অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে। মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী এই চেতনার বলেই অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছিলেন। তালপাতার টুপি পড়ে, পাজামা-পাঞ্জাবি গায়ে চড়িয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন বিশ্ব। আর্ত মানবতার পক্ষে উচ্চকিত করেছিলেন কণ্ঠস্বর। এক মওলানা হয়ে উঠেছিলেন বঞ্চিতদের অধিকার পাবার হাতিয়ার।

খোদাপরস্ত মানুষ মাওলানা ভাসানী। তাঁর রাজনৈতিক জীবনেও ছিল ইবাদত-বন্দেগির নিয়মিত রুটিন। বাংলাদেশ ও আসামে ছিল তাঁর হাজার হাজার মুরিদান। তবুও দীনবেশে, চটিজোড়া পায়ে পরে কাটিয়ে দিয়েছেন জীবন। কোরআন-সুন্নাহর ভিত্তিতেই তিনি হুকুমাতে রব্বানির স্বপ্ন দেখেছিলেন। স্বপ্নের কথা বলতে গিয়ে বলেছিলেন, আমাদেরকে অবশ্যই শোষণহীন ভ্রাতৃত্বময় সাম্যবাদী সমাজ কায়েম করতে হবে। যাতে আল্লাহর প্রত্যেক বান্দা নিশ্চিন্ত মনে ইবাদত-বন্দেগি করতে সক্ষম হয়। এটাই হবে সকলের প্রচেষ্টা।

মওলানা ভাসানী তাঁর স্বপ্নের বাস্তবায়ন করে যেতে পারেননি। কিন্তু একটা আবহাওয়া ছড়িয়ে দিতে পেরেছিলেন–ধর্মকে বাদ দিয়ে কোনো সামাজিক পরিবর্তন সম্ভব নয়। শোষণহীন সমাজ গড়তে হলে ধর্মের চেতনা ও ব্যবহার লাগবেই।

মওলানা ভাসানী
সংগ্রাম-সাধনায় মুখরিত জীবন

কাজী একরাম

রাজনীতিকে যিনি কখনও রমরমা রোজগারের পেশা বানাননি, জনকল্যাণ আর মানবসেবার মহান ব্রত নিয়েই যিনি রাজনীতিতে নেমেছিলেন, মজলুম-মজদুর আর অসহায়-গরিব মানুষের আপনজন হয়ে যিনি কাজ করেছেন আজীবন, যখন যেখানে মজলুম মানুষের আহাজারি শুনেছেন কোনোরকম সাতপাঁচ না ভেবেই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ছুটে গেছেন আর্ত-আহত মানুষগুলির প্রয়োজনে; এককথায় যে মানুষের জীবনটাই ছিল অসহ্য দুঃখ-দুর্দশায় কাতর এবং অসামান্য সংগ্রাম-সাধনায় মুখর, তিনি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী।

স্বদেশ ও স্বজাতির কাছে মাওলানা ভাসানী কী ছিলেন এবং কেমন ছিলেন, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আমরা বরং জানার চেষ্টা করব, বাইরের পৃথিবীর ভাসানীকে। আমরা জানতে পারি, মওলানা ভাসানী একবার 'বিশ্বশান্তি সম্মেলনে' যোগ দিতে গিয়েছিলেন স্টোকহোমে। ১৯৫৪ সালের ২৮ মে থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত তিনি ইউরোপে অবস্থান করেন। তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ খোন্দকার মুহাম্মদ ইলিয়াস। তিনি তাঁর 'ভাসানী যখন ইউরোপে' গ্রন্থে ইউরোপ সফরের নানান বিষয় তুলে ধরেন। তিনি লেখেন–'ইউরোপের সংবাদপত্রে তুমুল বিতর্ক মওলানা ভাসানীকে নিয়ে। কেউ বললেন : মিস্টার মওলানা একজন অনলবর্ষী নেতা। তাঁর বক্তৃতায় আগুনের হল্কা বের হয়। আর কেউ বললেন, পূর্ব আকাশের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। সংগ্রামী জনতার আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক। পুঁজিপতিরা বললেন, মি. মওলানা কম্যুনিস্ট সাম্যবাদে বিশ্বাসী। আর বুদ্ধিজীবীরা বললেন, 'তিনি ইসলামি সাম্যবাদের এক নতুন প্রেরণা। এক নয়া বার্তাবাহক।'

লন্ডন থেকে স্টোকহোম আর স্কটল্যান্ড থেকে রোম। সর্বত্রে সবাই ঘিরে ধরলেন তাদের প্রাণপ্রিয় নেতা মিস্টার মওলানাকে। তাঁকে একনজর দেখতে চান আর জানতে চান। চোখেমুখে জ্বলন্ত বিশ্বাস নিয়ে মওলানা ভাসানী ঘোষণা করলেন–'এজিদ নমরুদের জালেম বংশধরদের বিরুদ্ধে সারা দুনিয়ায় মজলুমদের বেঁচে থাকবার যে সংগ্রাম চলছে পাকিস্তানের জনগণ সে সংগ্রামে শরিক। আমরা সকল দেশের সকল মানুষের বন্ধুত্বকামী। যুদ্ধ আর ধ্বংস আমাদের কাম্য নয়–আমরা চাই শান্তি আর সৃষ্টি। এই হচ্ছে আমার ইসলামের মূল শিক্ষা। এই হচ্ছে পাকিস্তানবাসীর জীবনদর্শনের প্রাণকথা।'

পাকিস্তানের কোনো জননেতা এমন দৃঢ় আওয়াজ এর আগে কখনো তোলেননি। দুনিয়ার মানুষ শোনেনি কখনো।

তাই বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে ধীরেধীরে এগিয়ে এলেন বর্তমান পৃথিবীর সেরা মনীষীরা মাওলানাকে জানতে। এলেন সাহিত্যিক-সম্পাদক, সাংবাদিক-বুদ্ধিজীবী, এবং দার্শনিক-রাজনীতিবিদ। এসে বললেন–'পাকিস্তানের মাটির মানুষের নেতাকে আগে দেখবার সৌভাগ্য হয়নি। প্রথম দেখলাম।' (প্রাগুক্ত)

এইসব মূল্যায়ন ও অভিব্যক্তি থেকে মূলত ভাসানীর রাজনৈতিক-তৎপরতার

সার্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা এবং তাঁর রাজনৈতিক আদর্শবাদিতার একটা স্বতন্ত্রধর্মী পরিচয়ই ফুটে ওঠে। তিনি যে কেবল তাঁর 'স্বদেশের সাধারণ' মানুষের কাছেই নয়, তার রাজনৈতিক আবেদন ও অর্জন যে বিশ্বজনীন–সেটা স্বীকার করেছেন সমকালীন পৃথিবীর সেরা সব মনীষীও।

এখানে যে প্রশ্নটা স্বভাবতই উঠে আসে তা হলো, তাঁর মতো একজন অসহায় সাধারণ মানুষের এমনতর জগৎজোড়া খ্যাতি ও অবস্থান কেমন করে অর্জিত হলো? কোন শক্তি আর চেতনার বলে তিনি হয়ে উঠেছেন সাধারণ্যে অসাধারণ? কী করে সম্ভব হয়েছে তাঁর পক্ষে শক্তিশালী এক শাসকগোষ্ঠীর আমূল উৎখাত-আন্দোলন?

হ্যাঁ, সেই রহস্যের সন্ধানে নেমেছিলেন সমকালীন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অনেক বিশ্লেষক। কিন্তু তাঁরা তাঁদের বস্তুবাদী দর্শন আর থিওরিতে তাঁকে ঠিক ধরতে পারেননি। না পেরে অনেকেই অনেক কথা বলেন। অনেকের সাথে তাঁকে তুলনা করেন। কিন্তু লক্ষ্য করে দেখলেন, না, ওরা আর ভাসানী তথাপি ভিন্নতর! শেষমেশ কারো সাথে যখন তাঁর রাজনৈতিক আদর্শ আর জীবনদর্শনের মিল খুঁজে পাওয়া গেল না, তখন অগত্যা বিলাতের এক কম্যুনিস্ট নেতা তাঁকে সরাসরি জিজ্ঞাস করে বসলেন, 'আপনি তাহলে কী চান? মানে আপনার রাজনীতির লক্ষ্য-উদ্দেশ্য কী? কী আপনার জীবনাদর্শ?'

ভাসানী জবাব দিলেন,

'সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা!'

তারপর সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়ে সেই নেতাকে উদ্দেশ্য কওে তিনি বললেন, 'আমার চিন্তা ও জীবনাদর্শের সঙ্গে আপনাদের মানে কম্যুনিস্টদের যদি মিলে যায়, তবে দুঃখিত বা আনন্দিত হবার কিছু নেই। আপনারাও যদি সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার শত্রুদের সঙ্গে হাত মেলান, তবে আমার হাতে আপনাদেরও রেহাই নেই। কারও নেই। আর আমার আদর্শের সহিত অন্য কারো আদর্শ যদি মিলে যায় এবং আমার সংগ্রামে কেউ যদি শরিক হতে চান গভীর আনন্দে আমি তাঁকে আলিঙ্গন করে নেব।'

খোন্দকার ('ভাসানী যখন ইউরোপে' গ্রন্থের লেখক) এখানে এসে ভাসানীর সেই সাহসী উচ্চারণের উপর মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, 'অধুনা পৃথিবীর রাষ্ট্রদর্শনের যারা পথনির্দেশক তাদের বেলাভূমি ইউরোপের বুকে বসে পূর্ব বাংলার মওলানা ভাসানী তাঁর রাজনৈতিক মতামত ব্যক্ত করলেন। কোথাও স্বীকার করতে তিনি দ্বিধাবোধ করেননি যে, তাঁর দেশ শিল্প-বিজ্ঞানে অনগ্রসর। সঙ্গে সঙ্গে গর্ববোধ করেছেন নিজের মাতৃভূমির সম্পদ প্রাচুর্যের!' (প্রাগুক্ত)

পাঠক, এটুকু থেকেই আমরা বুঝে নিতে পারি, মওলানার রাজনৈতিক বিজয়ের পেছনকার শক্তি ও চেতনার মূল রহস্যটা। সেটা তাঁর একনিষ্ঠ দেশপ্রেম। সেটা তাঁর রাজনৈতিক আদর্শবাদিতা। সেটা তাঁর স্বাধীনতাবিরোধী অপশক্তির সাথে বৈরিতা ও আপোষহীনতা। সেটা তাঁর নৈতিক সততা আর চারিত্রিক দৃঢ়তা। সেটা তাঁর গণমানুষের প্রতি অগাধ আস্থা ও ভালোবাসা। সেটা তাঁর বৈষম্যহীন এক স্বাধীন সাম্যবাদী ইসলামি সমাজের প্রয়াসচেতনা। যেখানে মজুর শ্রমিক পাবে তার উপযুক্ত সম্মান ও সমাদর। যেখানে আশরাফ-আতরাফ বলে থাকবে না কোনো ব্যবধান। যেখানে মানুষে মানুষে থাকবে না কোনো ভেদাভেদ।

সত্যি বলতে কি, বর্তমানকার আদর্শহীন নোংরা রাজনীতি আর ভূয়া দেশপ্রেমের আড়ালে স্বাধীনতাকে বেচে দেওয়ার এমন এক নাজুক সময়ে মওলানা ভাসানীর মতো একজন খাঁটি দেশ ও স্বাধীনতাপ্রেমী এবং আপোষহীন জননেতাকে স্বরণ না করে পারি না। শুধু স্মরণ কেন, এ দেশের প্রতিটি জনগণ মনেপ্রাণে, শয়নে-জাগরণে আশা করে তাঁর মতো আরেকজন মওলানা ভাসানীর আগমনের; যাঁর আবির্ভাবের আলোকে আবারও উদ্ভাসিত হবে পরাধীন এই পোশাকি স্বাধীনতার তমসাচ্ছন্ন আকাশ। যাঁর পরশে আবারও নিজেদেও অধিকার আদায়ে সোচ্চার হবে পরাজিত মজলুম জনতা।

লেখক : ছাত্র, মারকাজুল ফিকরি ওয়াল বুহুসিল ইসলামিয়্যাহ, ঢাকা



(ছোটোগল্প)

যখন সন্ধ্যা নেমে আসে

আহমাদ সাব্বির

সকালবেলার লাল আলো গুড়ো গুড়ো হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। আর ছোট্ট শহরটির নির্জন পথে এখনও অন্ধকার এখানে ওখানে লেগে রয়েছে। পাতলা একটা চাদর গায়ে জড়িয়ে ছাদে উঠে আসে রোকেয়া। ছাদের পৃথিবীটুকু এতো সুন্দর, এতো নতুন যে মাঝে মাঝে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না। অলস চোখে তাকিয়ে রইলো অনেক দূরে। আর কী আশ্চর্য, ছাদ ছুঁয়ে যাওয়া ভোরের বাতাসে এমন এক অদ্ভূত স্নিগ্ধতা আছে যা চুপি চুপি এসে মনের ভেতরে হঠাৎ সবকিছু এলোমেলো করে দিয়ে যায়। কিসের জন্য যেন উন্মুখ হয়ে ওঠে বুকের গহীন অরণ্য।

ভোরের আলো পড়ে চোখ জ্বলে উঠলো একটু। রাতে অন্যদিনের মতো ভালো ঘুম হয়নি রোকেয়ার। বিছানায় গড়িয়েছে কিছুক্ষণ; উঠে হাতে-মুখে পানি ছিটিয়ে শুতে গেছে। কাগজ-কলম নিয়ে এমনি অনর্থক বসে থেকে কাটিয়েছে সময়। শেষ রাতের দিকে চোখ বুজে এসেছিল কিছুটা। অতটুকুই ঘুম হয়েছে আজ রোকেয়ার।

গতকাল দুপুরে বড়আপার কাছ থেকে ছুটি নিয়ে রোকেয়া গিয়েছিল রহমতপুরে, হুমায়রার সাথে দেখা করতে। ছুটি চাইতে খানিক ইতস্তত বোধ করছিল। গত সপ্তাহে একবার ছুটি নিতে হয়েছিল। বাবার মাড়ির যন্ত্রণাটা বেড়ে গিয়েছিল; তাকে নিয়ে যেতে হয়েছিল দাঁতের ডাক্তারের কাছে। বড়আপার কাছে ছুটি চাইতে ভালো লাগে না রোকেয়ার। ছুটি চাইলে কেমন কটমট করে তাকান। মুখের উপরে বলে ফেলেন : এতো ছুটি লাগে তাহলে বাসায়ই থেকে যাও না কেন? খুবই খারাপ লাগে রোকেয়ার। তারপরও ছুটি চাইতে বড়আপার কাছে গিয়েছিল। সন্ধ্যা পর্যন্ত থাকবে। মাগরিবের আজানের আগেই ফিরে আসবে বলে

ছুটি নেয় রোকেয়া। বড়আপা কটমট করে তাকালেও শেষমেষ ছুটি দেন।
হেদায়া জামাত পর্যন্ত এক মাদরাসাতে পড়েছে রোকেয়া আর হুমায়রা। সারাক্ষণ পাশাপাশি থাকত দু'জন। একসাথে ভাগ করে আমের ভর্তা খাওয়া থেকে ক্লাসে পাশাপাশি বসে কী কথা বলতে বলতে শরমে মুখ লাল হয়ে যাওয়া অবধি ওরা দু'জন দু'জনার ছায়ার সাথি ছিল। হেদায়া জামাতে থাকতেই হুমায়রার বাবা বদলি হয়ে ঢাকা চলে যান। হুমায়রাকে ঢাকার মাদরাসাতে ভর্তি করে দেন। তারপর পাঁচটি বছর হয়ে গেছে; ওর সাথে আর দেখা হয়নি। মাঝে মাঝে এক ঝলক হাওয়ার মতো মনে পড়েছে ওর কথা। ভেবেছে, কী করছে এখন হুমায়রা? কেমন হয়েছে দেখতে? এখনও পড়ছে, না বিয়ে হয়ে গেছে ওর? অনেকবার হুমায়রাকে নিজের সাথে মিলিয়ে দেখেছে রোকেয়া। তারও তো এতোদিনে নিজের সংসার হওয়ার কথা ছিল–সাজানো গোছানো ছোট্ট ঘর আর চৌকো বারান্দা জুড়ে এক চিলতে রোদের হাসি।
না, রোকেয়া ভাবতো, জোর করেই ভাবতো হুমায়রার বিয়ে হয়ে গেছে। আর সেই কথা ভেবে ওর মনটা আপনা থেকেই বড্ড উদাস হয়ে আসতো। সকলেই তো আর রোকেয়ার মতো কপাল নিয়ে আসেনি। নিজের ওপর ওর ভারী অভিমান হতো।
রহমতপুর এসে হুমায়রার দেয়া হোল্ডিং নাম্বার খুঁজতে থাকে রোকেয়া। দেখে–দোতলার রেলিং থেকে একটা মেয়ে 'রোকেয়া' বলে ডাকছে। কালো কাপড়ের ভেতর থেকেও হুমায়রার চেহারা ও ঠিক চিনে নেয়।
সিঁড়ি ভেঙে দোতালায় উঠে যায় রোকেয়া। ভারী কাঠের দরজায় দুটি কি একটি মৃদু টোকা দিতেই খুলে যায়। দরজা খুলে সামনে দাঁড়ায় হুমায়রা নিজেই।
প্রথমটায় কোনো কথাই কেউ বলতে পারেনি। শুধু দু'জনে দু'জনার দিকে তাকিয়ে ছিল গভীর চোখে। পাঁচ বছরে কত বদলে গেছে হুমায়রা। সেই গভীর অন্ধকারের মতো কালো ঢেউ-খেলানো চুলের রাশ। সারাটা শরীর কেমন স্থির, স্নিগ্ধ। আর মুখখানা দেখতে আরও সুন্দর হয়েছে।
শোবার ঘরে ঢুকতে ঢুকতে রোকেয়া বলছিল–'কতদিন পর আবার তোর সাথে দেখা। অনেক বদলে গেছিস কিন্তু তুই।'
হুমায়রা চোখ বড় বড় করে বলে–'তাই নাকি!'
'হুঁ।'
হুমায়রার কথা বলার ভঙ্গি কত সুন্দর!
'উনি কইরে?'
'বাইরে গেছেন কাজে।'
'তোকে একলা ফেলে?'
ইঙ্গিতটুকু বুঝতে পেরে হুমায়রা হাসে। ওর হাসিও কত সুন্দর।
'কতদিন হলো তোদের বিয়ের?'
'এই তো এক বছর হলো প্রায়।'
তারপর হুমায়রা স্মার্টফোনের আলো জ্বালিয়ে একটি ফর্সা মুখের ছবি তুলে ধরে চোখের সামনে।
'এই তিনি?'
'হু।'
'আলেম?'
'না, তাবলীগ করেন।'
'তাহলে তো চাকুরে!'
'হুম। ব্যাংকে।'
'ব্যাংকে?'
প্রশ্নটা করে একটু লজ্জায় পড়ে যায় রোকেয়া। বুঝতে পারে–এড়িয়ে যেতে চাইছে হুমায়রা। সহজ হতে তাই অন্য প্রসঙ্গ তুলে আনে।
'বাহ, দুল জোড়া তো চমৎকার! বেশ মানিয়েছে তোকে।'
'হুম। ও দিয়েছে।'
রোকেয়ার হঠাৎ মনে পড়ে–'তোর একজোড়া দুল হারিয়ে গিয়েছিল, মনে আছে!'
'হুম। তবে আমার কী মনে হয় জানিস, ফাতেমাই ওটা সরিয়েছিল।'
'হতে পারে।'
আরও কত কথা হয় দুজনের। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই। হুমায়রা হঠাৎ খেয়াল করে। বলে–'বোস না!'
'দাঁড়া, তোর ঘর আগে দেখে নিই ভালো করে। কি সুন্দর সাজিয়েছিস সব! ছবির মতো। তা কতদিন থাকবি?'
'এই তো এলাম। কদিন থাকি তার কি আর ঠিক আছে! বদলীর চাকরি। যে কোনো সময় হুকুম আসতে পারে।'
'বদলি হয়ে আবার সেই শহরেই এলি!'
'হুম। আমি নিজেও অবাক হয়েছি, তবে দারুণ লাগছে।'
রোকেয়া সেদিকে কান দেয় না। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে সারাটা ঘর। পূবদিকে একটা বড় চওড়া মতো জানালা। প্রথম সূর্যের আলো ঢুকে ঘর ভরিয়ে তোলে হয়তো। আর উত্তরের দেয়ালে দুটি। সেদিকটায় ছোট্ট একটুখানি বাগানও আছে; দোতলা থেকেও বেশ অনায়াসে চোখে

পড়ে। একটা কাঠের পালঙ্ক দুই জানালার দেয়াল ঘেঁষে পেতে রাখা। হালকা ছাপার গোলাবি চাদর মেঝে অবধি ঝুলিয়ে পরিষ্কার করে বিছানো। বড় বড় ফুলে বালিশ দুটি সুন্দর মানিয়েছে। আর সারাটা ঘর এতো সুন্দর করে, এতো কম আসবাবে সাজানো যে দেখলে মন ভরে যায়। হৃদয় জুড়িয়ে যায়। ঘর থেকে চোখ ফিরিয়ে হুমায়রার দিকে তাকায় রোকেয়া। এমন একটা ঘর সম্পূর্ণটা ওর! রানির মতো মনে হয় ওকে। একটা দীর্ঘশ্বাস লুকিয়ে ফেলে রোকেয়া। বলে–'তুই কিন্তু আগের চেয়ে দেখতে অনেক সুন্দর হয়েছিস!'
'যাহ, মিথ্যা বলছিস!'
'সত্যি বলছি।'
'আয়, বোস।'
এবারে পালঙ্কে পা ঝুলিয়ে বসে ওরা।
অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে দুজনেই। কথা বলে ওঠে রোকেয়া–'তোরা দুজনেই আছিস?'
'না, ওর ছোটবোন এসেছে। এখানে থেকেই পড়বে।
'দেখছি না যে!'
'ওর সাথে বেরিয়েছে।'
'কোন ক্লাসে?'
'ফোর।'
'স্কুলে?'
'হুম।'
রোকেয়ার কেন যেন ভালো লাগছিল এমনই ছোটখাটো সব কথা জানতে। ভালো লাগছিল হুমায়রার আলতো করে দেওয়া উত্তরগুলো। কেমন তৃপ্তিকর স্বর। তাই যা না জিজ্ঞেস করলেও চলতো, যা না জানলেও হতো, যা এমনিই জানা হয়ে যায় এমন প্রশ্নও করতে থাকে রোকেয়া। আর কথার ফাঁকে ফাঁকে কেবল একটি কথাই ভাবে–মাদরাাসায় যে মেয়ে কিতাবের ইবারত পড়তে গিয়ে হিমশিম খেতো, তার খাতা না দেখে লিখলে পাস নম্বর ওঠাতে পারতো না, পরীক্ষার দুই মিনিট আগে পর্যন্ত সাবান ঘষে চেহারা সাফ করা যার প্রধান কাজ ছিল সেই হুমায়রা কত বদলে গেছে! নিজের সংসার সামলাচ্ছে! বিশ্বাস হতে চায় না।
এবার হুমায়রা বলে ওঠে–'এই দেখ, কেবল আমার কথাই বলছি! তোর কথা কিছুই জানা হলো না! তোর উনি কী করে?'
বুকের ভেতর ছ্যাঁৎ করে ওঠে রোকেয়ার। মুখে বলে–'ধুর!'
'কেন, বিয়ে করিস নি!'
'নাহ।'
'তবে কী করছিস?'
রোকেয়া নিজের ব্যাপারে সব বলে। তবে সংক্ষেপে রেখেঢেকে যতটুকু বলা যায় ঠিক ততটুকুই। তারপর হঠাৎই কথার মোড় ঘুরিয়ে বলে–'আজ আসি রে!'
'এখনই? চা খেয়ে যাবি না! হতেই পারে না!'
'না রে! সন্ধ্যার আগে না পৌঁছলে বড়আপা বকবেন। একটা ক্লাসও নিতে হয় মাগরিবের পর।'
'বাব্বাহ, তুই তো রীতিমতো মাস্টারনি হয়ে গেছিস!'
রোকেয়া সেদিকে কান দেয় না। ছুটতে চায়; পাওে না। কী জাদু জানে যেন হুমায়রা। রোকেয়াকে বসতেই হয়।
চায়ে চুমুক দিয়ে হুমায়রা বলে–'তুই তো মাদরাসাতে আছিস। একটা আপা জোগাড় করে দে না! বাড়িতে এসে একটু কোরআন শরীফ পড়িয়ে যাবে।'
'কার জন্য? তোর ছোট ননদের জন্য?'
'হ্যাঁ। দে না।'
'কেন, তুই তো পারিস!'
'না ও, বসে থাকতে আমার ভালো লাগে না।'
'দেখি!'
'দেখিস। ভালো হাতখরচ দেবে ওর ভাইয়া।'
এই কথাটাতে লজ্জা পেয়ে যায় রোকেয়া। হুমায়রার পাশে আরও কিছু সময় বসে থাকতে ইচ্ছে করছিল ওর। কিন্তু বেলা পড়ে আসছে। উঁচু প্রাচীরের পেছনে সূর্য হেলে পড়েচে। উঠে দাঁড়িয়ে চারদিকে আরেকবার চোখ বুলিয়ে রোকেয়া বলে–'আসি রে!'
'আবার আসবি কিন্তু! উনি এলে তোর কথা বলবো। ভারী খুশি হবেন।'
'আচ্ছা, তুই যাস। মাকে বলেছি তোর কথা।'
'সে কী, খালাম্মার মনে আছে আমার কথা এখনো!'
'হুম, আছে। থাকবে না কেন!'
'আসবি কিন্তু!'
দরজা পর্যন্ত ওকে এগিয়ে দিয়ে হুমায়রা দাঁড়িয়ে রইলো যতক্ষণ না রোকেয়া পথের ওপারে মিলিয়ে গেল। আর রোকেয়া হেঁটে যেতে যেতে হুমায়রার কথাই ভাবছিল–যে মেয়ে কিতাবের ইবারত পড়তে গিয়ে হিমশিম খেতো, তার সহযোগিতা ছাড়া ওপরের ক্লাসে উঠতে পারতো না সে আজ আস্ত একটা সংসার সামলাচ্ছে! এসব ভাবতে ভাবতে ঠিক সন্ধ্যার কিছু আগে রোকেয়া তার পৃথিবীতে ফিরে আসে।



(অণুগল্পগুচ্ছ)

বৃহস্পতিবার ও অন্যান্য

যুবাইর ইসহাক

তৃতীয় বার দেখার অপেক্ষা

মহিলার সঙ্গে প্রথম দেখা আমাদের ছেলেবেলায়। থৈ থৈ করে সারা গ্রাম ঘুরে বেড়িয়ে আর বিশাল নীল আকাশে ঘুড়ি উড়িয়ে দিন কাটাই। বিকেলে বসি গ্রামের পশ্চিমে কয়েকটা টিনচালা দিয়ে গড়ে ওঠা শ্যাওলাপাড়া বাজারে।

এরকম এক সন্ধ্যায় বাজারের রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন তিনি। পেছন পেছন অপুর বাবা ও আরো কিছু লোক। গ্রামের লোকেরা তখন বলাবলি করত–অপুর বাবা গানের মেয়েদের পেছনে টাকা ওড়ান। পরে জেনেছিলাম, এই মহিলাও অসম্ভব গান গায়।

মহিলাকে দ্বিতীয় বার দেখলাম অপুদের বাড়িতে। আমরা তখন শৈশব ঝেড়ে তারুণ্যে। এক দুপুরে বোরকাপরা হাড্ডিসার এক মহিলা অপুদের ঘরে ঢুকল। তখনও পেছনে অপুর বাবা। আমি আর অপু তাঁর রুমে কী যেন করছি। মহিলাটি দরজার কাছে এসে মমতাভরে ডাক দিলো, 'অপু!'

চমকে ওঠে অপু। সে চিনতে পারে না এই মহিলা কে। আমি একবার মহিলা আরেকবার অপুকে দেখি। বিভ্রান্ত হই। মহিলাটা নিজ থেকে পরিচয় প্রকাশ করে–ওই যে বাউল শিল্পী। তোমার আন্টি।' কিন্তু আমাদের চোখ থেকে বিস্ময় কাটে না। মহিলার শরীর ও গলার এই পতন কীভাবে সম্ভব! নিজ থেকে মহিলা এর কারণ বর্ণনা করেন। তাঁর শরীরে ক্যান্সার বেঁধেছে। সামনে সাতাশ তারিখ অপারেশন। এসেছেন দোয়া চাইতে ও দেখা করে যেতে। হয়তো শেষ দেখা। আমি উৎসুক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনার ক্যান্সার কোথায়?' মহিলা ছোট করে জবাব দেন, 'গলায়।'

সাতাশ তারিখ পার হয়ে আরো অনেক বছর গত হয়–মহিলাটির সাথে

আর কখনো দেখা হয় না। তাঁকে আমি তৃতীয় বার দেখার জন্য অনেকদিন ধরে অপেক্ষা করেছি।

গন্ধ

খট করে দরজা খোলার শব্দ হলো। বাইরে থেকে এমন কৌশলে কেবল মামুন জানে দরজা খুলতে। আমি পাশ ফিরে তাকাই না। আগের মতো আধা ঘুমে আধা জাগ্রত চোখে শুয়ে থাকি। গতরাতে একফোঁটাও ঘুম হয়নি। সারারাত বাড়ির কথা মনে পড়েছে খুব করে। এই শহর ছেড়ে পালানোর ইচ্ছায় ভেতর হয়েছে অস্থির। ঘুরেফিরে মাথায় ঘুরপাক খেয়েছে, সাপ মরার মতো এভাবে পথেঘাটে মারা গেলে মা-বাবা কীভাবে নেবেন। আর এখন এই ভোরে ঘুম লাগবে লাগবে করেও লাগছে না।
'ঘরে খাওয়ার মতো কিছু আছে?' মামুনের গলা শুনতে পেলাম। বললাম, 'গতরাতের ডালভাত। ডিম আছে কিচেনে। ভেজে খেতে পারিস।'
ঘর জুড়ে মামুনের পায়ের শব্দ হয়। বাথরুমের দরজা বন্ধের শব্দ শোনা যায়। হয়তো তার পুরনো নিয়মমতো গোসল করবে এখন।
মামুন আমার তিনবছরের রুমমেট। লেখাপড়া করি এক ডিপার্টমেন্টে। শুনেছি বাইরে কীসব রাজনীতি করে। আমার সাথে অবশ্য এসব নিয়ে আলাপ হয় না। আমাদের আড্ডার জায়গা অন্য বিষয়।
পনেরো দিন আগে মেস থেকে কল করে কে যেন ডেকে নিয়ে গেল তাকে। যাওয়ার আগে বললাম, 'এখন অনেক রাত। বের হইস না।' বলল, 'না গেলে হবে না। বড় ভাই ডাকছে। যাবো আর আসবো।' মামুন আর আসেনি। এমনকি কোনো সন্ধানও মেলেনি। গত পরশু খবরের কাগজে দেখলাম ক্যাম্পাসে মামুনের লাশ পাওয়া গেছে। পুরো ক্যাম্পাস উত্তাল। ভয়ে তাকে শেষ দেখায়ও যেতে পারিনি। বাথরুমে পানির খলখল শব্দ হচ্ছে। শ্যাম্পুর গন্ধ নাকে লাগছে। আমি তখন তন্দ্রার ভেতর মামুনের অস্তিত্ব টের পাই। তার গায়ের গন্ধে আমার বুক ভরে ওঠে।

বৃহস্পতিবার

তখন তার শৈশব। ঠোঁটের উপর গোঁফের রেখা প্রকাশ হয়নি। চেহারায় মায়া ভরা। থাকে বাড়ি থেকে দূরে। ইটপাথরের শহরে। হোস্টেলে, লেখাপড়ার সুবাদে। প্রতি বৃহস্পতিবার এলে মা তাকে কল দিতেন। 'বাবা, আজ বাড়িতে আসবে তো।' সে জবাব দিতো–'জি মা, আসবো।' অথবা বলতো, 'এ সপ্তাহে ছুটি পাওয়া যাবে না। সামনের বৃহস্পতিতে আসবো মা।'
এখন সে এক সন্তানের জনক। চাকরি করে। শহরে থাকে। বাড়িতে তার স্ত্রী-সন্তান। সপ্তাহ শেষে বৃহস্পতিবার এলে স্ত্রী কল দেয়, 'এ সপ্তাহে আসছেন তো?' সে মাঝেমাঝে রসিকতা করে, 'কেন আসব?' কখনো বলে, 'ডিউটি আছে। কাজের চাপ বেশি। আসা যাবে না।' অথবা মুখে হাসি টেনে জবাব দেয়, 'হ্যাঁ, আসছি।'
একটা বৃহস্পতিবার। অপেক্ষার দিন। শৈশবে মায়ের। যৌবনে স্ত্রীর। অথবা একজন নারীর। তার আপন কারও জন্য।

অভাব

মাসশেষে টাকা বাঁচানোর জন্য দৌড়ে লোকাল বাসে উঠে দেখি পাশে আমার এক পুরনো বন্ধু দাঁড়িয়ে। অনেকদিন পর তার সাক্ষাৎ পেয়ে আনন্দিত হবার বদলে বিরক্ত হই আমি। তবুও কিছুটা অবাক হয়ে দায় সারা গোছে জিজ্ঞেস করি, 'তুই এখানে!' সে উত্তর দেয়, 'পকেটে টাকা নাই। ভাড়া মেরে দিতে উঠেছি।'
শেষে যখন হেল্পার ভাড়া চায়, আমি নিঃশব্দে উভয়ের ভাড়া পরিশোধ করি।

ভবিষ্যৎ

সারারাতের অস্থির যন্ত্রণার ইতি টেনে সুবহে সাদিকের সময় ফকিরগলিতে পিতৃপরিচয়হীন ফুটফুটে একটি শিশুর জন্ম হয়। শিশুটি সুস্থ-স্বাভাবিক দেখে তার মা খুব দুঃখিত। কারণ তিনি তাঁর সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত।

দুরন্ত কৈশোরের নির্মল উচ্ছ্বাস
মাহমুদুল হাসান

মেঘাচ্ছন্ন নিশ্চল পূর্বাহ্ন। আকাশে বিশৃঙ্খল সাদা-কালো মেঘ। মেঘমালার বিশাল পরিধি ভেদ করে উত্তর দিকে দৃশ্যমান হয়েছে এক টুকরো নীল আকাশ। আমি বসে আছি আমাদেও গোলাপ-গুল্মের পাশে। আকাশের বিস্তীর্ণ নীলাচলের নীলিমা আমাকে বিমোহিত করে দিচ্ছে। স্মৃতির পাতার ভাঁজপত্র একে একে খুলে যাচ্ছে। আমার কৈশোরের প্রথম প্রহরের একটা বড় অংশ কেটেছে তেজগাঁ-াও-গুলশান লিংক রোডে ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থাকা জামিয়াতুল উলুমিল ইসলামিয়াতে। নাবিস্কো ফ্যাক্টরির ঘ্রাণ নিয়েই তেজগাঁওয়ে আমার প্রথম পদচারণা।
নীল রংয়ের ভর্তি ফরমে কাঁপা কাঁপা হাতে সাক্ষর করার সময়ও আমি জানতাম না ভবিষ্যৎ-এভারেস্টের কতটুকু উচ্চতায় পৌঁছুবার লক্ষ্যে আমি এখানে পাড়ি জমিয়েছি। শুধু জানতাম, আমাকে অনেক বড় হতে হবে। কাব্যের পঙক্তি-খঁচিত নিনাকাব্যের বিশালতা আর লিংক রোডের প্রতিটি বালুকনার ক্ষুদ্রতা আমাকে বড় হওয়ার রঙিন স্বপ্ন দেখাতো।
জামিয়ার চৌহদ্দিতে প্রথম দিন পা রাখার পর প্রথম কয়েকটা দিন মনখারাপের দেশে ভেসে বেড়িয়েছিলাম। সেখানকার ভেলায় চড়ে নয়নের ঝর্ণাধারা বর্ষিত করে দিতাম অবিরাম। তবে সময়ের গতির সাথে পাল্লা দিয়ে আমাদের সবার মাঝেই গড়ে উঠলো মমতা ও ভালোবাসার স্নিগ্ধ পরশ।
শিক্ষকদের সংস্পর্শে এসে বুঝতে পারি এখানে একটি আন্দোলন চলছে। মানুষ গড়ার নীরব আন্দোলন। পঙ্কিলতায় আচ্ছন্ন মানবতাকে কলুষমুক্ত করার দুর্বার আন্দোলন।
খুব ভালো লাগতো হাতিরঝিলে, আমাদের বিনোদনের প্রাণকেন্দ্রে বেড়াতে যেতে। প্রভাতের প্রথম প্রহরে ছুটে যেতাম হাতিরঝিলে।
রূপসী বাংলার ভৌগোলিক বৈচিত্রের কল্যাণে কত খাল-বিল জীবনে দেখেছি! কিন্তু হাতিরঝিলের পানিই আমাকে বেশি টানে। কারণ ওখানকার প্রতিটি জলকনার সাথে আমার ছিল উচ্ছ্বাসমাখা প্রণয়। ঝিলের পাড়ে জ্বলজ্বল করতো শত নয়নতারার রূপবতী চাহনি। নয়নতারা আমার কৈশোরের প্রথম প্রহরের ভালোবাসা, ওর শুভ্রতা আমার কিশোর-মন ছুঁয়ে দিতো। ফুলটির প্রতিটি পাপড়িতে, কেশরে ও সবুজ পাতায় আমি খুঁজে পেতাম পরিবার ছেড়ে আসা দুঃখমালা রোধের একরাশ স্বপ্নমাখা সান্ত্বনা। নাম না-জানা হলুদ ফুলেরা আমাকে অনুপ্রেরণা দিতো পুষ্পস্তবক ভরে। তখন আমার দুঃখরা হারিয়ে যেতো অজানা গন্তব্যের অতল গহ্বরে। মাঝে মাঝে পড়াশোনার ব্যস্ততায় প্রভাতফেরি করা হতো না। তখন জুনায়েদ এনে দিতো একগুচ্ছ মিষ্টি গন্ধের ফুল। সম্ভবত ওর সাথেও কোনো প্রণয় ছিল ফুলগুলোর।
মাদরাসায় ফেরার পথে আব্দুল জব্বারের টি-স্টল আমাদের গতি রোধ করে দিতো। সেই টি-স্টলের ক্ষুদ্র অবয়বে মোড়ানো অসামান্য উচ্ছ্বাস ছিল তুলনাহীন।
বিকেলের অবসরেও মাঝে মাঝে ছুটে যেতাম হাতিরঝিলের প্রকৃতির প্রেম-উন্মাদনায়। অধিকাংশ সময় আমাকে সঙ্গ দিতো নাজমুল। আট-দশ বছর বয়সী একটা ছেলে চা বিক্রি করতো। ওর কাছেই শুনেছিলাম ওর দুঃখভরা আত্মকথা। প্রতিদিন স্কুল থেকে ফিরে ফ্লাস্কভর্তি চা এনে হাতিরঝিলে ফেরি করে বেড়ানো ওর দরিদ্র জীবনের নিত্যদিনের সঙ্গী। ওর দুঃখে ঢাকা পড়ে যেতো চা খাওয়ার অনুভূতি।
আর রাতের হাতিরঝিলে খেলা করতো অসংখ্য লাল-নীল দীপাবলি। মনে হতো মস্ত আকাশের এক ঝাঁক ধ্রুবতারা বউ সেজে নেমে এসেছে হাতিরঝিলে।
অনেক দিন কেটে গিয়েছে। স্মৃতির নীলাকাশে সেসব অনন্য দিনগুলো আজও রঙিন পাখির মতো উড়ে বেড়ায়। স্মৃতি ধারণকারী সেসব পাখির অবিরাম ছুটে চলার কোনও গন্তব্য নেই!

লেখক : ছাত্র, জামিয়াতুল উলুমিল ইসলামিয়া ঢাকা

শেষ বিকেলের কথা

ওবাইদুল ইসলাম

শূন্য নদীর পাড়। গুড়িগুড়ি বৃষ্টি। শীতল মৃদু দমকা হাওয়ায় শীত শীত অনুভূত হয়। বৃষ্টির পানিতে চশমার কাঁচ অস্বচ্ছ হয়ে যায়। বারবার জামার আস্তিনে মুছে কানের ওপর গুঁজে দিই চশমার ফ্রেম। বিরক্তি চলে আসলেও ভালোবাসার টান। এই ভালোবাসাকে বিচ্ছেদের দুঃখ দেওয়া যায় না। দুঃখ দিলে একটা জগত অসুন্দর হয়ে আসবে।

থৈ থৈ নদীর পানি। ট্রলার এসে ঢেউ সৃষ্টি করে। ধীরে ধীরে তটে আসে। নীড়ে ফেরা পাখির মতন। শীতলপাটির মতন বিছানো রাশি রাশি জল এঁকেবেঁকে তীরে ফিরে মৃদু ধাক্কা দেয়। ঢেউয়ের এ ধাক্কার শব্দ হৃদয়ে পৌঁছে ঘোর সৃষ্টি করে। ভাবনার ঘোর।

মাঝিরা নৌকা নিয়ে পানিতে জাল ফেলে। জাল ফেলার নিপুণতা আমাকে মুগ্ধ করে। ভাবি, ওহে মাঝি, নদীর বুকের হৃদয়টা আমাকে এনে দাও। স্বচ্ছ-নির্মল হৃদয়টা আমার করে দাও। নিঃসঙ্গতা, হাহাকার, একাকিত্বগুলো ঘুচে যাক। ব্যথা-বেদনাবহ জীবনে আর কত বাস করবো!

মেঘাচ্ছন্ন আকাশ। দূরে নেতিয়ে যাওয়া কাশফুল। মৃদু কুয়াশা। পাখিদের আনাগোনা কম। তবুও একদল পাখি উড়ছে। একটা পাখি একা। একা একা পথ গুণে বোধহয় উড়ছে। হৃদয় বলে, ওটা তুই। ওটাই তোর অস্তিত্ব। দেখ একাকী জীবন দিব্যি চালিয়ে নিচ্ছে। জীবন তো একাই। কিন্তু সময়ের পরিসরে আমরা কারো হই। কারো জন্যে বাঁচতে চাই। কারো না হতে পারলে সুন্দর জগতটা ছিন্নভিন্ন করে দিই।

পঁচে যাওয়া ফুলের মতন হয়ে যাই। ফুল যেমন প্রথম জীবনে সুরভি ছড়ায়, সবার প্রিয়দের তালিকায় নিজের স্থান রাখে, তারপর পঁচে গেলে কেউ নাকে নেয় না। ফেলে দেয়। পঁচে যাওয়া ফুলের মতন বাঁচতে বাঁচতে নিজের জীবন হারিয়ে ফেলি। সুন্দর একটা জীবনকে নষ্ট করে দিই কারো হবার জন্য। কারো জীবনে সৌরভ ছড়াবার জন্য। কেউ হতে পারে, কেউ না। জীবন এমনই। বাঁচতে হলে একাকী জীবনে অভ্যস্ত হতে পারলে জীবন সুখের। জীবনে কেউ কারো নয়। সবাই নিজের। গুড়িগুড়ি বৃষ্টি থেমে যায়। দিনের পর্দা ঠেলে ভিড় করে সন্ধ্যার আবরণ। সন্ধ্যা নামার পূর্বেই সন্ধ্যা নেমে যায় মেঘলা আকাশের টানে। সারাদিন জীবনের গায়ে সুতাকাটা মানুষগুলো ক্লান্ত শরীরে ফিরছে ঘরে। সন্ধ্যার গায়ে মাথা রেখে শান্তির অপার ডাকে সাড়া দেবে। কিংবা সংসার নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠবে। সুখ-দুঃখের যাতনায় পানসে জীবন বয়ে বেড়িয়ে চলতে থাকবে অবিরাম।

জীবনে সুখ, দুঃখ, কষ্ট, যাতনা না থাকলে জীবন সুন্দর না। কষ্টের পর, সুখ। সুখের পর দুঃখ আসবেই। কারও আগে কারও পরে। জীবন এসব ছাড়া পানসে। জগত এসব ছাড়া অসুন্দর।

সিরাজদিখান, মুন্সিগঞ্জ

বরেণ্য শৈশবের হাতছানি

মুনশী নাঈম

বই পরিচিতি



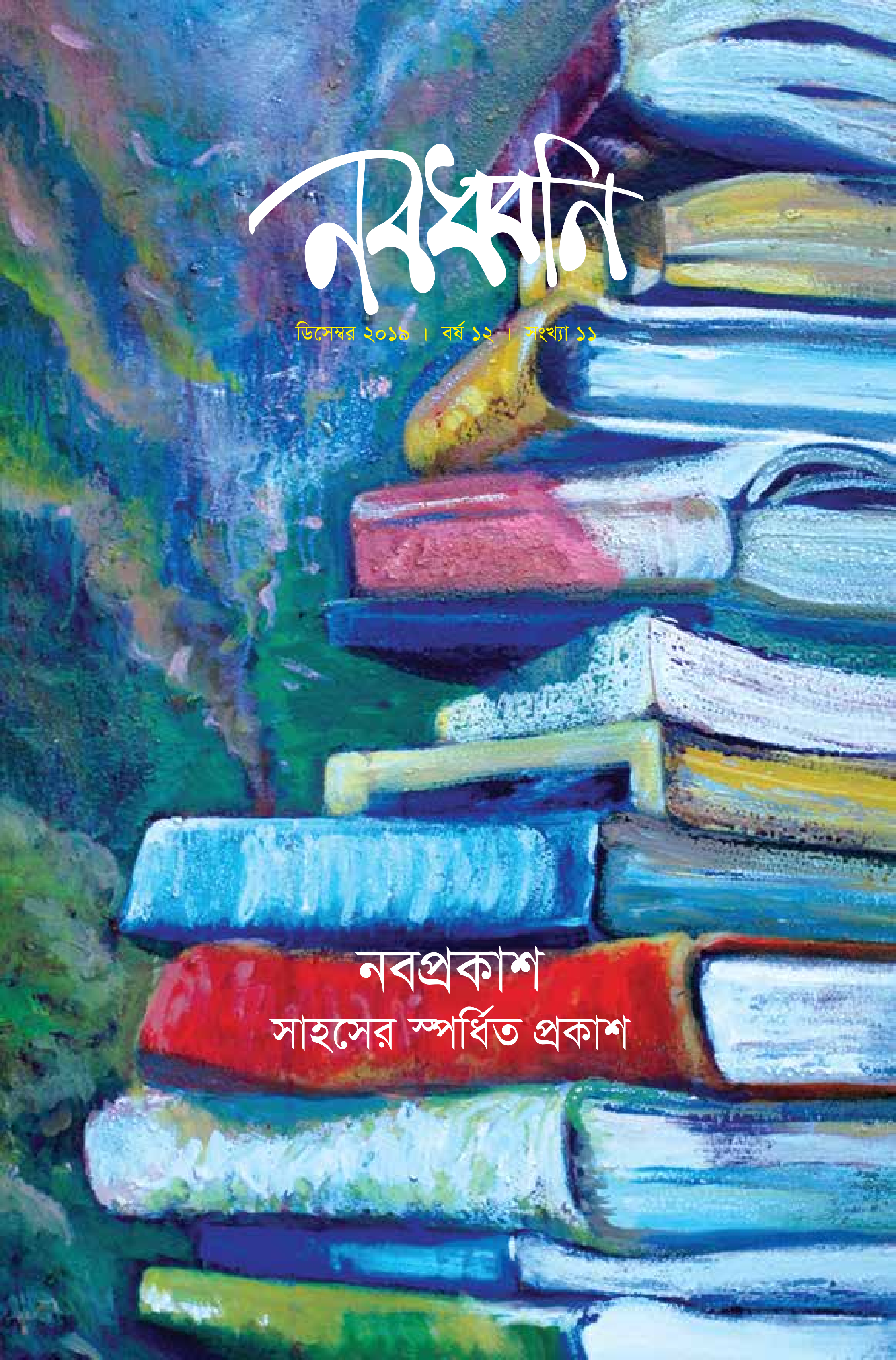
লেখক: ড. মুহাম্মদ মুনশি কিন্দিল
অনুবাদ: ফারুক আজম
মূল্য: ৯৬ টাকা
প্রকাশক: নবপ্রকাশ
দূরালাপন: ০১৯৭৪৮৮৮৪৪১

কীর্তিমানদের ছেলেবেলা বইটিকে গত হওয়া মনীষীদের ছেলেবেলার জীবনী হিসেবে আখ্যায়িত করার জো নেই। কেননা লেখক এখানে কীর্তিমানদের শৈশবের জীবনকে তুলে এনেছেন ঠিকই, তবে তা জীবন নয়–জীবনের গল্প। জীবনী নয়–জীবনের খণ্ডিত অংশের গল্পায়ন। অসাধারণ ভাষা-গাঁথুনিতে লেখক মুহাম্মদ মুনশি কিনদিল কীর্তিমানদের টুকরো টুকরো গল্প দিয়ে সাজিয়েছেন তাঁর বইটি।

পাঠক গল্পগুলো পাঠ করে যারপরনাই অবাক হবেন। কেননা আমরা এতদিন যেসব কীর্তিমানের নাম শুনে এসেছি, শ্রদ্ধার সঙ্গে যাদের স্মরণ করেছি, লেখক সাগরের বুকে মুক্তো তালাশের মতো তাদের জীবনের সুন্দর একটা মুহূর্ত তুলে এনেছেন। যে মুহূর্ত তাকে পরবর্তী জীবনে বিশ্বজয়ের স্বপ্ন দেখিয়েছিল।

ইবনে জাহেজ, ইবনে হাইসাম, আল বিরুনি, ইবনে হাইয়্যান, আল হামাভি–এমন মহান পুরুষদের শৈশবের গল্প যতটা চিত্তাকর্ষক, তার চেয়েও দরকারি হলো শৈশবে তাদের বেড়ে উঠার শিক্ষা সম্পর্কে অবগত হওয়া। লেখক তাঁর বইয়ে গল্প বলতে গিয়ে ঠিক সে কাজটিই করেছেন। অনুবাদক ফারুক আজম নবীন হলেও তাঁর হাতযশ সমীহ করার মতো। জ্ঞানান্বেষায় তিনি প্রতিনিয়ত ছুটছেন নিজের অভীষ্ট লক্ষ্যপানে। আমরা তার ধারাবাহিক সাফল্য কামনা করি।

সবার পাঠোদ্দীপনা কামনা করছি।



নবধ্বনি

ডিসেম্বর ২০১৯ । বর্ষ ১২ । সংখ্যা ১১

নবপ্রকাশ
সাহসের স্পর্ধিত প্রকাশ

ডিসেম্বর ২০১৯ । বর্ষ ১২ । সংখ্যা ১১

মূল্য ১০ টাকা মাত্র

নবধ্বনি । দোকান নং ২৭ । ২য় তলা । ইসলামী টাওয়ার ১১/১ বাংলাবাজার । ঢাকা
সার্কুলেশন : ০১৩১৮ ৬৩৪৪১২ । সম্পাদনা : ০১৭৪৫ ১৩৯২১৫

Email: nobodhoni@gmail.com web: noboprokash.com/nobodhoni



বই হয়ে উঠুক জীবন গড়ার পাথেয়

তামীম রায়হান

নবপ্রকাশ নিয়ে নবধ্বনির চলতিসংখ্যা প্রকাশিত হচ্ছে দেখে ভালো লাগছে। এর মাধ্যমে মূলত আমরা নবপ্রকাশের কার্যক্রম সম্পর্কে ব্যাপকভাবে পাঠকদের জানাতে চাই। আশা করছি এই সংখ্যা পড়ে দেশজুড়ে নবধ্বনির পাঠকেরা নবপ্রকাশ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা পেতে পারেন।

পাঁচ বছর মোটেও বেশি সময় নয়, খুব কমও নয়। ফলে বলা চলে, নবপ্রকাশ এখনো হাঁটি হাঁটি পা পা পর্যায়ে। এই সময়ে নবপ্রকাশের জন্য অগণিত পাঠকের ভালোবাসা যেমন উৎসাহব্যঞ্জক হিসেবে ভূমিকা রেখেছে, তেমনিভাবে প্রকৃত শুভাকাঙ্ক্ষীদের উপদেশসুলভ সমালোচনাগুলো দিকনির্দেশক হয়ে এই পথচলায় আলো জ্বেলে রেখেছে। ফলে সব শ্রেণি ও পেশার সুহৃদ ও সমালোচকদের প্রতি নবপ্রকাশের কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই।

পাঁচ বছর পূর্তির শুভক্ষণে নবপ্রকাশের যেটুকু সাফল্য, এর মূলে পুরো অবদানের দুজন সমান অংশীদার আসাদ খান ও সালাহউদ্দীন জাহাঙ্গীর। বাড়তি বিনয় কিংবা অতিভক্তি করে এই কথা বলা নয়,

বরং এটিই বাস্তবতা এবং আমার মনের কথা। সালাহউদ্দীন জাহাঙ্গীর সামলে যাচ্ছেন নবপ্রকাশের অন্দরমহলের যাবতীয় কর্মযজ্ঞ, আর সযত্নে তা পাঠকদের সামনে পরিবেশন করে যাচ্ছে আসাদ।

নবপ্রকাশে সালাহউদ্দীন জাহাঙ্গীর এবং আসাদ খানের সহযোগী হয়ে আছেন হাম্মাদ রাগিব, নাজমুস সাকিব এবং ইসহাক খান। ইসহাকের কথা আলাদা করে বলতে হয়, কারণ নবপ্রকাশ এবং নবপ্রকাশের বইপত্র সম্পর্কে পাঠকদের মতামত সরাসরি জানার জন্য জানালা হিসেবে ইসহাকের ভূমিকা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

নবপ্রকাশের মাধ্যমে আমরা কী করতে চাই বা কী করব, সেরকম ছকে বাঁধা কোনো শপথ আমাদের নেই। শুধু একটি বিষয়ে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, যা কিছু করবো, সবার চেয়ে ভিন্নতা রেখে করবো। বইয়ের বাজারে আমরা দাগ রেখে যাবো। এই ভিন্নতা যেন বিষয়বৈচিত্রে এবং বইয়ের গুণগতমানে অব্যাহতভাবে ফুটে উঠে, সেটা নিশ্চিত করার পথ ও পন্থা নিয়ে আমরা কাজ করে যাচ্ছি।

নবপ্রকাশ নিয়ে সুখকর ও বিব্রতকর নানারকম অভিজ্ঞতা হয়েছে। ইসলামি অঙ্গনে বেশ পরিচিত দুজন লেখকের কথা এ প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে। এই দুজনেরই একটি করে বই নবপ্রকাশ থেকে প্রকাশিত হয়েছে। আমরা চেয়েছিলাম, এ দুজনের আরও বেশকিছু বই নবপ্রকাশ থেকে প্রকাশিত হোক। কিন্তু একটি করে বই লিখে তারা হারিয়ে গেলেন। এঁদের একজন এখনো ফেসবুকে নানা বিষয়ে স্ট্যাটাস প্রসব করে প্রচুর সময় ব্যয় করে চলেছেন, কিন্তু বই আর লিখছেন না। হয়তো নগদ লাইক-কমেন্ট পেতে তিনি বেশি ভালোবাসেন, ফেসবুকের বাইরে অধ্যবসায় এবং ধৈর্য ধরে বই লেখা বা অনুবাদে তিনি আত্মিক শান্তি ও তৃপ্তি আর খুঁজে পান না।

আরেকজন দেশময় ওয়াজ করেন, অনলাইনে তিনিও নানা বিষয়ে মত প্রকাশে বেশ সক্রিয়। কিন্তু লেখালেখির চমৎকার প্রতিভার কোনো সদ্ব্যবহার তিনি করছেন না। আমি প্রায়ই এ দুজনের অনলাইন কর্মকান্ডে তাদের মেধা ও প্রতিভার অপব্যয় দেখে হতবাক হই।

ইসলামি অঙ্গনের এ দুজন ধর্মপরায়ণ পুরুষ লেখকের চেয়ে সাধারণ একজন নারীর কাছ থেকে আমরা বেশি পেশাদারিত্ব এবং আন্তরিকতাপূর্ণ আচরণ পেয়ে আসছি। কথাটা বলার কারণ হলো, পেশাদারিত্ব এবং বই লেখালেখি বা অনুবাদকর্ম কেবলমাত্র প্রতিভানির্ভর নয়, বরং হৃদয়ের শেকড়ে যদি এই মহৎ কাজের প্রতি নিষ্ঠা বা মমতা না থাকে, তবে হুজুগে লেখক-অনুবাদক হওয়া হয়তো সম্ভব, কিন্তু তাতে জাত লেখক হয়ে পাঠকের হৃদয়ে স্থায়ী হওয়া যায় না।

লেখক ও অনুবাদকদের ব্যাপারে এমন নানারকম অভিজ্ঞতা

লেখক ও অনুবাদকদের ব্যাপারে এমন নানারকম অভিজ্ঞতা নবপ্রকাশের ঝুলিতে জমে আছে। এসব অভিজ্ঞতা থেকে অন্তত এটুকু শিক্ষা আমি পেয়েছি, পরিচিত লেখকদের পেছনে সময় ও শ্রম নষ্ট না করে আগ্রহী নবীনদেরকে সুযোগ দেওয়াটা অতি উত্তম এবং উপকারী। কারণ, দিন শেষে বিষয়ের গুণে বই টিকে থাকে, লেখকের পরিচিতি ও খ্যাতি বইয়ের প্রচারে সাময়িক সুবিধা যোগ করে মাত্র।



নবপ্রকাশের ঝুলিতে জমে আছে। এসব অভিজ্ঞতা থেকে অন্তত এটুকু শিক্ষা আমি পেয়েছি, পরিচিত লেখকদের পেছনে সময় ও শ্রম নষ্ট না করে আগ্রহী নবীনদেরকে সুযোগ দেওয়াটা অতি উত্তম এবং উপকারী। কারণ, দিন শেষে বিষয়ের গুণে বই টিকে থাকে, লেখকের পরিচিতি ও খ্যাতি বইয়ের প্রচারে সাময়িক সুবিধা যোগ করে মাত্র।
নবপ্রকাশের প্রেক্ষাপটে এবার নিজের ব্যাপারে কিছু গল্প করা যাক।
কিশোর বয়সে আমি বুকভরা আগ্রহ নিয়ে এক দুপুরে হাজির হয়েছিলাম একজন মাওলানার বাসায়। বাংলাবাজারে তাঁর তখন একটি প্রকাশনী বেশ ব্যবসা করছে। আমি তাঁর কাছে মিনতি করেছিলাম, একজন প্রখ্যাত ভারতীয় লেখকের বই আমি অনুবাদ করতে চাই যদি তিনি সম্মতি দেন। তিনি সেদিন সম্মতি দেননি, ন্যূনতম উৎসাহও নয়। আজ ভাবি, সেদিন যদি তিনি আমাকে দিয়ে অনুবাদ শুরু করাতেন, তবে অনুবাদের ওই বৃত্ত থেকে আর হয়তো বের হওয়া হতো না, এমনকি ওই প্রকাশনীর অনুবাদক হয়েই হয়তো কেটে যেত পুরোটা সময়।
এর কিছুকাল পরের কথা। আমার প্রথম মৌলিক বই প্রকাশিত হয় বাংলাবাজারস্থ একটি প্রকাশনী থেকে। বই প্রকাশের খুশিতে বেশ উৎসাহে আমি সেই প্রকাশনীর জন্য নতুন কাজ করতে শুরু করলাম। কিন্তু দেখা গেল, কাজের পারিশ্রমিক নিয়ে এই প্রকাশক বেশ হেলাখেলা শুরু করেছেন। আমি ব্যথিত হলাম এবং কাজ বন্ধ করে দিলাম। এখন ভাবি, যদি তিনি ঠিকমতো পারিশ্রমিক দিয়ে যেতেন, তবে হয়তো এই প্রকাশনীর লেখক হয়ে থাকতে হতো, অন্য কিছু করার ভাবনা আর হতো না। উপরোক্ত দুটি অভিজ্ঞতার সঙ্গে নিজেরা মিলে স্বাধীনভাবে নবপ্রকাশ গড়ে তোলার ইচ্ছা ও সাহসের যোগসূত্র রয়েছে। উপরোক্ত এই দু প্রকাশনীর দুজন কর্ণধার নেতিবাচকভাবে হলেও আমাকে নবপ্রকাশ করতে পথ দেখিয়েছেন, সুতরাং আজ তারা কিছুটা ধন্যবাদের হকদার হতে পারেন।
শেষকথায় শুধু এটুকু বলে যেতে চাই, নবপ্রকাশের সাধ্য এখনো সীমিত, কিন্তু আমাদের স্বপ্ন ও সাহস অসীম। আমরা কেবল বাংলাবাজার বা বাংলাদেশ সামনে রেখে বই নির্বাচন করি না, বরং আমাদের দৃষ্টির সীমানায় থাকে পুরো পৃথিবী। এই বৈশ্বিক দৃষ্টি ও বিবেচনা নবপ্রকাশের বই বাছাই ও প্রকাশে সবচেয়ে গভীর প্রভাব বিস্তার করে থাকে। পাশাপাশি শুরু থেকে আজ অবধি আমরা পাঠকদের প্রতি পুরোপুরি আস্থা রেখে আসছি। কারণ আমরা জানি, জ্ঞান ও তথ্যপ্রবাহের এই আধুনিক সময়ে পাঠকদের চোখ-কান খোলা। কাজেই নিন্দুকদের সমালোচনা বা প্রতিযোগী ব্যবসায়ীদের অন্ধবিদ্বেষ নবপ্রকাশের যাত্রাপথে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করতে পারবে না।
আমরা চাই একদল সচেতন বই পাঠক, যাদের চিন্তা-চেতনা ও কর্মে উপকৃত হবে সমাজ, দেশ ও পুরো পৃথিবী। নবপ্রকাশের বই কেবল পড়ার জন্য নয়, বরং তা জীবন গড়ার পাথেয় হয়ে উঠুক পাঠকদের কাছে, এটাই আমাদের প্রত্যাশা।



নবপ্রকাশ-এর সঙ্গে উড়াল দিতে স্বাগতম

সালাহউদ্দীন জাহাঙ্গীর

বছর চারেক আগে, যখন নবধ্বনি নিবুনিবু প্রায় এবং ঠিক সেই মুহূর্তে নবপ্রকাশ আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করেছিল, তখন লিখেছিলাম– "নবপ্রকাশ-এর যাত্রা শুরু মাসিক নবধ্বনির ফসিল থেকে। ফসিল ঠিক বলা যাবে না, কারণ নবধ্বনির সমাপ্তি আমরা কখনো ঘোষণা করিনি। কখনো করবোও না হয়তো। নবধ্বনি জাগরুক থাকবে, সময়ে অসময়ে। তবে নবপ্রকাশের জন্ম নবধ্বনির কুশীলবদের হাত ধরেই। স্পেসিফিকলি বললে, তামীম ভাইয়ের একক প্রচেষ্টায়। আমরা বরাবরের মতোই এসব বিষয়ে তার মুক্তাদি।

খুব ছোট্ট করে হয়েছিল শুরুটা। তামীম ভাইয়ের দুটো বই দিয়ে। এখনও ছোটই, বলবার মতো তেমন কোনো আহামরি কর্মকাণ্ড ঘটাতে পারিনি। তবে শুরু থেকে আমরা একটা ব্যাপারে বেশ নাকউঁচু ভাব বজায় রেখেছি–নবপ্রকাশ কোনো মাসয়ালা-মাসায়েল, ওয়াজ-হেকায়েত, ড়গড়গে-সস্তা বা বাজার কাটতি বই ছাপবে না। তা সেটা যতই ব্যবসায়িক হোক।

নবপ্রকাশ সাধারণভাবে তিন ক্যাটাগরির বই প্রকাশে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ—ইতিহাস, গল্প, উপন্যাস; নিদেনপক্ষে ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের জীবনী। এর বাইরে নবপ্রকাশ কোনো ধরনের বই প্রকাশ করবে না। আশা করি আমরা আমাদের প্রতিজ্ঞায় অটল থাকতে পারব। এক্ষেত্রে পাঠকের ভালোবাসা এবং আন্তরিক সহযোগিতাই আমাদের লক্ষ্য পূরণের সবচে দৃঢ় জিয়নকাঠি।

স্বপ্ন দেখলে অনেকভাবেই দেখা যায়, যদি স্বপ্নটা সঠিকভাবে দেখা হয়, স্বপ্ন পূরণে নিজের ভেতর যদি সত্যিকারের বেকারারি সৃষ্টি হয়।

সেবা প্রকাশনীকে দেখুন—তারা ওয়েস্টার্ন ঘরানার বই ছাপিয়ে বিখ্যাত হয়েছে। আমরা চিন্তা করলাম—আমরা ইস্টার্ন আর মিডলইস্টার্ন মানে প্রাচ্য ও মধ্যপ্রাচ্যের বই ছাপবো। প্রাচ্য আর মধ্যপ্রাচ্যেও অ্যাডভেঞ্চার বা থ্রিলের কমতি নেই। বিদেশি সাহিত্য সবচে বেশি ছাপিয়েছে ওরা, কিন্তু সবই পশ্চিমের। তো প্রাচ্যে কি গত এক হাজার বছরে কোনো ফিকশন লেখা হয়নি? আলবৎ হয়েছে। এবং সেগুলোর সাহিত্যমান ও পাঠকপ্রিয়তা কোনো অংশেই পশ্চিমের চেয়ে কম নয়। দুঃখের বিষয় হলো, আমাদেরকে প্রাচ্যের সেই হাজার বছরের ফিকশন সাহিত্যের সঙ্গে কেউ সেভাবে পরিচয় করিয়ে দেয়নি। ফলে, বাজার দখল করে আছে বুনো পশ্চিম। ব্রিটিশ উপনিবেশ চলে গেছে, কিন্তু পাঠ ও চিন্তাগত গোলামি আমরা সেই ব্রিটিশদেরই করি।

আমি বহুদিন ধরে কুরুচিপূর্ণ আধুনিক সাহিত্য এবং ইসলামের নামে কুরুচিপূর্ণ বই বা প্রকাশনার বিরুদ্ধে কথা বলে আসছি। আরও অনেকেই এ ব্যাপারে খেদ ঝেরেছেন নানা সময়ে। কিন্তু সমস্যা তাতে কোনো প্রকার কমেছে বলে মনে হয় না। না হওয়ারই কথা।

‘সত্য সমাগত হলে মিথ্যা বিদূরিত হবে’—কিন্তু আমরা শুধু মিথ্যাকে দূরীভুত করার ওয়াজ করেছি, নিজেরা কখনো সত্যকে সামনে নিয়ে আসার সাহস করিনি। নিজেরা কলম হাতে ময়দানে নামিনি। বইয়ের বিরুদ্ধে বই দাঁড় করাতে পারিনি। এটা আমাদের ব্যর্থতা, আমাদের দায়। নবপ্রকাশ অনেকাংশে এ দায়শোধেরই বহিঃপ্রকাশ।

সম্বল ক্ষুদ্র, ব্যক্তি দুর্বল, পথ দুর্লঙ্ঘ—
স্বপ্ন আকাশসম, দৃঢ়তা পাহাড়ের মতো,
ভালোবাসা সীমাহীন—
সহায় আল্লাহ!”

দুই

ফেসবুক বলছে, ছবিটি ২০১৩ সালের ৬ সেপ্টেম্বরের। এদিন তামীম রায়হানের প্রথম বই ‘ইতিহাসের হাসি-কান্না’র মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠান হয় ঢাকার লালবাগে নবপ্রকাশ নামে ছোট একটা দোকানে। লালবাগ বলতে লালবাগ কেল্লার মোড় থেকে আরেকটু পশ্চিমে, মোহাম্মদিয়া মসজিদের উত্তর পাশে। সেখানে নবপ্রকাশ নামে একটা দোকান ভাড়া করা হয়েছিল, মনোহরি দোকান। সে দোকানে বইপত্র, খাতা, কাগজ-কলম, চক-পেন্সিলসহ নানা মনোহরি সামগ্রী বিক্রি হতো। দোকানটা ভাড়া নিয়েছিলেন সম্ভবত তামীম ভাই। আসাদ, সিফাত এবং জামিল সেখানে দোকানদার হিসেবে ব্যবসা জমানোর ধান্ধা করছিল। কিন্তু বছরখানেক গেলেও ধান্ধাটা ঠিকমতো জমল না। অগত্যা তামীম ভাই আসাদের পরামর্শে বাংলাবাজারে বইপাড়ায় একটি পুস্তকের দোকান নিলেন।

ইসলামী টাওয়ারে ততদিনে ইসলামি পুস্তকব্যবসা বেশ জমজমাট। এই টাওয়ারের প্রথম তলায় কাতারপ্রবাসী শ্রদ্ধেয় ইউসুফ নূর-এর দুটি দোকান আছে। তার একটিতে এসে উঠল নবপ্রকাশ। প্রাথমিক এরাদা—কায়দামতো দু-চারটে বই প্রকাশ করা হবে, আর এধার ওধারের বই এনে বিক্রি করা হবে। সঙ্গে আসাদের কম্পোজ, মেকআপ, ডিজাইনের কাজ চলবে। আসাদেরও দু পয়সা হলো, ফাঁকতালে একটা প্রকাশনী যদি দাঁড়ায়। তামীম ভাই তখন কাতারে। সেখান থেকে তিনি ব্যবসায়িক নানা পরামর্শ উড়িয়ে পাঠাতেন। মাঝে ছুটিছাটায় এসে তিনি এসবের খবরদারি করতেন।

তবে এই দোকান নেয়ার মাঝে তামীম ভাইয়ের অন্য একটা উদ্দেশ্যও ছিল। এটা উদ্দেশ্য না বলে তার একটা চমৎকার গুণই বলব আমি। তামীম ভাই কখনো তার বন্ধুদের ভোলেন না। তিনি যার কাছে সামান্যতম ঋণী, কখনো তিনি তার সেই ঋণকে অস্বীকার করেন না। তিনি যাদের সঙ্গে বড় হয়েছেন, যাদের সঙ্গে বন্ধুত্বের ডোরে বাঁধা পড়েছেন, কখনো সেই বাঁধনকে ছিন্ন হতে দেন না। আমাদের সেই বন্ধনটা ছিল নবধ্বনি। আমাদের সবারই নিজ নিজ কর্মব্যবস্ততার কারণে সবাই এদিক সেদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে গিয়েছিলাম। এ কারণে নবধ্বনি প্রকাশ মাঝখানে বেশ অনিয়মিত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তামীম ভাই যখন দেশে আসতেন তখন তিনি নিজ গরজে, নিজ খরচে তার পুরোনো বন্ধুদের একসঙ্গে করে আড্ডা দিতেন। নবপ্রকাশ ছিল নবধ্বনির সেই বন্ধনকে দৃঢ় করার আরেকটি প্রয়াস।

আমি তখন 'সাপ্তাহিক লিখনী'পর্ব শেষ করে পল্টনে একটি গ্রাফিক্স হাউজে বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে ধান্ধা জমানোর মহান চেষ্টায় ব্রত। ২০১৫ সাল শেষ করে ২০১৬-এর শুরু হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। কিন্তু ডিজাইনের সঙ্গে আমার খুব একটা জমছিল না। এর মধ্যে তামীম ভাই নবপ্রকাশ-এর জন্য লিখতে বললেন–'বই লিখেন, টাকা কামান।' আমার নিমরাজি হওয়ার তেমন কোনো সঙ্গত কারণ ছিল না। তার অনুরোধে দুটো বই নবপ্রকাশ থেকে প্রকাশ হয়ে গেল।

এমনিতে তামীম ভাইয়ের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ চলছিল। আমার হালপুরস্তি, কী করছি না করছি এসব নিত্য বাতচিত হতো। একদিন কী সব কারণে যেন মনমেজাজ খারাপ করে ঢাকা থেকে বাড়ি চলে এসেছি। ঢাকায় আর মন টিকছিল না। বাড়ি এসে কয়েকদিন বেশ গুম হয়ে বসে রইলাম। আমার উড়নচণ্ডি ভাব দেখে বাড়ি থেকে তাগাদা দিল, চাকরি-বাকরি কিছু একটা করো। ওদিকে এক নিকটাত্মীয় সরকারি চাকরির অফার দিয়ে রেখেছে বাড়িতে। আমি হ্যাঁ বললেই কাগুজে কার্যক্রম শুরু হবে। কিন্তু কবে যেন একটা সস্তামতো প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, লেখালেখি ছাড়া এই জীবনে আর কিছুই করব না। কাজেই সরকারি বা বেসরকারি চাকরির চাকরগিরির মধ্যে আমার তেমন কোনো আগ্রহ ছিল না।

তামীম ভাই এক সকালে কাতার থেকে ফোন করলেন। খিঁচড়ে যাওয়া মেজাজ নিয়ে যাবতীয় রাগ-ক্ষোভ উগড়ে দিলাম তার কাছে। সব শুনে তিনি বললেন, 'এক কাজ করেন, সবকিছু ছেড়েছুড়ে আপনি নবপ্রকাশের হাল ধরেন। আমরা একটা দস্তুরমতো প্রকাশনা দাঁড় করাই। আপনার আমার রুচি অনুযায়ী বই প্রকাশ করব। আপনি লিখবেন, আমি লিখব, আমাদের পরিচিত লেখক-অনুবাদক যারা আছেন তারা লিখবে। কারো ধার ধরার প্রয়োজন নেই। নবধ্বনি তরুণদের যেভাবে সামনে এগিয়ে দিয়েছে, নবপ্রকাশও তেমনি তরুণ লেখক-অনুবাদকদের বই প্রকাশ করবে। আপনি বইয়ের পাণ্ডুলিপি তৈরি করেন, টাকা-পয়সার ব্যাপারে চিন্তা করতে হবে না। মাসিক মাসোহারা থাকবে, আপনার বই রচনা বাবদ সম্মানী তো থাকবেই।'

সেই শুরু। কখনো ভাবিনি প্রকাশনা সংক্রান্ত কোনো কাজে জড়াব, ওসব আমাকে দিয়ে হয় না। আজীবন লেখক হতে চেয়েছি। এখন অবশ্য দুটোই সামলাচ্ছি। সামলাচ্ছি বললে ভুল হবে, তামীম ভাইয়ের ঠ্যালা-ধাক্কায় সামলে যাচ্ছে।

তিন

যাক সে কথা। এই ছিল নবপ্রকাশের আঁতুড়ঘরের কেচ্ছা। এবার নবপ্রকাশের নিজস্ব কিছু সাফাই গাওয়ার পালা। কেন আমরা নবপ্রকাশ নিয়ে স্বপ্ন দেখেছিলাম, তার একটা ফিরিস্তি লেখার শুরুতে আপনারা পড়েছেন নিশ্চয়। এখন অন্যকিছু বলি। নবপ্রকাশ সচরাচর ইসলামি প্রকাশনাশিল্প থেকে কিছুটা আলাদা চিন্তা ও চেতনা নিয়ে গড়ে ওঠা প্রতিষ্ঠান। একরৈখিক বা সীমাবদ্ধ চিন্তা শুধু নয়, আমরা আমাদের পাঠকদের পরিচিত করতে চেষ্টা করছি সারা বিশ্বের ইসলাম ও মুসলিম সাহিত্যের সঙ্গে। বিশ্ব কীভাবে ইসলাম ও মুসলিমদের দেখছে,

মধ্যপ্রাচ্য, দূরপ্রাচ্য, এমনকি পাশ্চাত্যে কীভাবে ইসলাম সমাদৃত হচ্ছে–আমরা সেই সব লিখিত দলিল আমাদের পাঠকের সামনে পেশ করতে বদ্ধপরিকর। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এ চিন্তা অনেকটা দুঃসাহসী, সমালোচনা আর বিরোধিতার ভয় অনেক, তবু আমরা থেমে থাকিনি। থাকবও না আশা করি।

এর কারণটা বলি। নবপ্রকাশ ক্ষুদ্র কোনো জনগোষ্ঠীর কথা মাথায় রেখে বই প্রকাশ করে না। আমাদের প্রতিটি বই সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কথা ভেবে প্রকাশ করা হয়। শুধু মসজিদ-মাদরাসা বা ইসলামি ঘরানার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় আমাদের উদ্দিষ্ট পাঠকশ্রেণি। আমরা প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, আমাদের বইটি মাদরাসার একজন তলবে এলেম যেমন পাঠ করে উপকৃত হবে, তেমনি এ বই যেন সচিবালয়ের একজন সচিব পড়েও বিমোহিত হন। কেননা, ইসলামের কথা শোনার অধিকার সকলেরই সমান এবং তাদেরকে এসব কথা শোনানোর দায়িত্বও আমাদের। মান্ধাতা আমলের ভাষা ও ভাষারীতি, সম্পাদনা ও বানানশুদ্ধি ছাড়া লেখা, ম্যাড়মেড়ে কাগজ ও বাঁধাইয়ের একটি বই নিশ্চয় একজন উচ্চশিক্ষিত মানুষকে প্রভাবিত করবে না। এমন একটি বই পড়তে গেলে তার বিরক্তির উদ্রেক হবে, এটাই স্বাভাবিক। এ কারণে আমাদের বইয়ের ভাষা আধুনিক এবং প্রাঞ্জল, বানানরীতি আধুনিক এবং প্রমিত, বইয়ের গুণগত মান সর্বোচ্চ পর্যায়ের রাখতে আমাদের চেষ্টার ত্রুটি নেই। আশা করি আমাদের পাঠক আমাদের মানের ব্যাপারে কখনো দ্বিমত পোষণ করবে না।

নবপ্রকাশ সম্পূর্ণ পেশাদারী মনোভাব নিয়ে প্রকাশনাশিল্পে যাত্রা করেছিল। এ কারণে আমাদের প্রকাশিত সেই প্রথম বই থেকে আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি বই নির্বাচন, বইয়ের বিষয়বস্তু, ভাষা, সম্পাদনা, কাগজ ও ছাপার মান, আন্তর্জাতিক মানের বাঁধাই দিয়ে প্রতিটি বইকে মাইলফলক করতে। প্রকাশনী যখন শুরু হয় তখনই উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল, বইয়ের মধ্যে যেন সামান্যতম বানান ভুল না থাকে। মানুষজন যাতে ‘ইসলামি বই বানান ভুলে ভরা’–এমনতর নাক সিঁটকাতে না পারে। চিন্তা করা হলো, আমাদের বানানরীতিতে যেহেতু বাংলা একাডেমিকে অনুসরণ করা হবে, এ কারণে বানানশুদ্ধির ব্যাপারে বাংলাদেশের সবচে নিখুঁত যারা তাদের থেকে প্রুফ দেখানো হবে। সেই চিন্তা থেকে দৈনিক প্রথম আলোর প্রুফ রিডারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলো, এবং এখন পর্যন্ত নবপ্রকাশ-এর সকল বই প্রথম আলোর প্রুফ রিডার দিয়ে বানানশুদ্ধি করা হয়। এ ছাড়া প্রতিটি বই নিদেনপক্ষে দুজন সম্পাদককে দিয়ে সম্পাদনা করানো হয়। বানানশুদ্ধি আর সম্পাদনা এক জিনিস নয়। বানানশুদ্ধি কেবলমাত্র বানানের শুদ্ধ-অশুদ্ধতা দেখা হয়, কিন্তু সম্পাদনার ক্ষেত্রে দেখা হয় ভাষা, সাহিত্য, শব্দের ব্যবহার, অনুবাদের ভুল-ভাল ইত্যাদি।

এ তো গেল বইয়ের মান নিয়ে কথা, লেখক-অনুবাদকদের মান কীভাবে রক্ষা হয় সে ব্যাপারেও নবপ্রকাশ সবসময় ওয়াকিবহাল। যেহেতু নবপ্রকাশ সংশ্লিষ্ট আমি এবং তামীম ভাই দুজনই যৎকিঞ্চিত লেখক বলে নিজেদের দাবি করি, এ কারণে লেখকদের সম্মান ও অধিকার সুরক্ষায় আমরা কখনো আপোস করি না। এ দাবি করতে দ্বিধা নেই, বাজারের অন্য যেকোনো প্রকাশনীর চেয়ে নবপ্রকাশের লেখক সম্মানী বেশি বৈ কম নয়।

আগামী বছরের শুরু থেকে নবপ্রকাশ তার প্রত্যেকজন লেখক-অনুবাদকের সঙ্গে লিখিত চুক্তি করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সরকারি প্রকাশনা আইন মেনে এ দ্বিপাক্ষিক চুক্তি সম্পাদিত হবে। এবং আরও আনন্দের সংবাদ হলো, নবপ্রকাশ আগামী বছর থেকে প্রত্যেক লেখক-অনুবাদককে নির্দিষ্ট হারে নিয়মিত রয়্যালিটি প্রদান করবে।

বাংলাদেশের প্রকাশনাশিল্পে অতি অল্প কিছু প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান তাদের অল্প কয়েকজন লেখক-অনুবাদককে রয়্যালিটি প্রদান করে থাকে। নবপ্রকাশ তার আয়তন ও বয়সে ক্ষুদ্র হলেও আন্তর্জাতিক নিয়মানুসারে লেখকদের এই সম্মান প্রদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কারণ আমরা পেশাদারিত্বে বিশ্বাস করি। যে পর্যন্ত

ভালো প্রকাশক তৈরি না হবে, ততদিন ভালো লেখক তৈরি হওয়াও দুঃসাধ্য। একজন লেখকের সুবিধা-অসুবিধা এবং তার চাওয়া-পাওয়ার ফিরিস্তি আমরা যতটা সম্ভব বুঝতে চেষ্টা করি। এটা কেবল প্রকাশকের দৃষ্টি থেকে দেখা নয়, একজন নবীন লেখক দিগ্বিজয়ের স্বপ্ন নিয়ে তৈরি হলে এ জাতিরই উত্তরণ ঘটবে। কিন্তু অঙ্কুরেই যদি একজন লেখক অর্থের দোটানায় কলমের আশ্রয় থেকে ভিন্ন আশ্রয়ে চলে যায় তাহলে সত্যিকারের লেখক কোনোদিনই তৈরি হবে না।

কেবল দ্বীনের তরক্কির জন্য লেখালেখি বা আল্লাহর কাছে প্রতিদান পাওয়ার আশায় লেখালেখি–এভাবে কখনো সাহিত্য হয় না। মাদরাসা-মসজিদে চাকরি করে যদি মাসিক মাসোহারা নেয়া হয়, তাহলে লেখালেখি কেন আল্লাহর প্রতিদানের আশায় 'মাগনা' হবে? বরং একজন লেখককে আরও অধিক সম্মানী দিয়ে বই লেখানো উচিত। নতুন লেখকদের বই অধিক দামে কিনে পড়া উচিত। যেহেতু বাংলাদেশে ইসলামি সাহিত্য এখনও সেভাবে তৈরি হয়নি, সেহেতু যারা ভালো লিখেন তাদের উৎসাহ দেয়ার জন্য এবং তাদের লেখালেখিকে এগিয়ে নেয়ার জন্য আর্থিকভাবে সাহায্য দ্বীনের স্বার্থেই অতীব জরুরি।

চার

এবার নবপ্রকাশ-এর সমালোচকদের নিয়ে দু-চার কথা না বললেই নয়। নবপ্রকাশ নিয়ে সবচে চালু যে কথা বাজারে ছড়িয়ে আছে তা হলো, নবপ্রকাশ 'মডারেট' প্রকাশনী। এখন এই মডারেটের সংজ্ঞা কী? সত্যিকারার্থে এই মডারেটের নির্দিষ্ট কোনো সংজ্ঞা নেই। আপনার কাছে এর সংজ্ঞা এক, আমার কাছে আরেক রকম, আরেকজনের কাছে আরেক রকম হতে বাধ্য। একজন নবপ্রকাশ-এর বইগুলোকে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বিপ্লব ভাবছেন, আবার আরেকজন ভাবছেন বিষফোঁড়া। সুতরাং একরৈখিক বা সীমাবদ্ধ চিন্তা নিয়ে কেউ যদি নবপ্রকাশকে নানা ভাষায় দোষ দেন, তাহলে সেটা সমালোচকদের চিন্তার দৈন্য ছাড়া কিছু নয়। হয়তো আপনি এখনও নবপ্রকাশ-এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বুঝতে পারেননি, নয়তো আপনি পার্থিব কোনো স্বার্থসিদ্ধির জন্য নবপ্রকাশ-এর সমালোচনা করছেন। আমরা প্রথমটিকেই বেছে নিয়েছি। হয়তো যারা আমাদের সমালোচনা করেন তারা এখনও আমাদের প্রকাশনীর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে সম্যকভাবে অবগত নন। একজন বিতর্কিত লেখকের বই প্রকাশ হলেই সেই বই বা লেখক ইহুদি-খ্রিষ্টানদের ষড়যন্ত্রকারী হয়ে যান না। আপনি শুধু আল্লাহওয়ালা বুজুর্গদের বই পড়বেন কিন্তু পাশ্চাত্যে আপনাকে নিয়ে, ইসলাম নিয়ে, ইসলামি সাহিত্য নিয়ে কী বলা হচ্ছে, কীভাবে বলা হচ্ছে–সেসব জানবেন না; তাহলে আপনি যুদ্ধে জিতবেন কীভাবে? আরেকটি কথা না বললেই নয়। একজন সমালোচক হিসেবে আপনি যে ভাষায় নবপ্রকাশকে আক্রমণ করছেন, যুদ্ধ করতে এসে নবপ্রকাশ তারই সহযোদ্ধাদের কাছ থেকে এমন খঞ্জরের আঘাত কামনা করেনি কখনো। ইসলাম বিষয়ে আপনার চিন্তাধারার সঙ্গে নবপ্রকাশ কর্তৃপক্ষের চিন্তার দ্বৈততা থাকতে পারে, দুই পক্ষের বইপ্রকাশের মানদণ্ডও আলাদা হতে পারে। তো, এই সামান্য চিন্তার দ্বৈততাকে পুঁজি করে ইসলামের বৃহৎ স্বার্থে কাজ করা একটি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানকে প্রশ্নের সম্মুখীন করা কতটা যৌক্তিক–সে প্রশ্ন সমালোচকদের ভেবে দেখা প্রয়োজন বলে মনে করি।

নবপ্রকাশ কোনো ভূঁইফোড় প্রকাশনী নয়, নবপ্রকাশ লেখক-অনুবাদকদের টাকা মেরে দেয়া কোনো প্রকাশনীও নয়। নবপ্রকাশ ঊষার দিগন্তে এক উড়ন্ত উল্লম্ফন। তার লাফের সঙ্গে যদি তাল মেলাতে পারেন, তবে সেটা এ জাতির জন্যই মঙ্গলজনক। কিন্তু যদি আপনি উড়তে অনিচ্ছুক হন, তবে নিচ থেকে তার পা ধরে টানাটানি করবেন না, প্লিজ। পাঁচ বছরে নবপ্রকাশ হামাগুড়ি দেয়া শিখেছে। এবার সে দীক্ষা নিয়েছে উড়ার মন্ত্রণা। নবপ্রকাশ-এর সঙ্গে দিগ্বিজয়ের আকাশে উড়াল দিতে আপনাকে স্বাগতম, হে পাঠক!



নবপ্রকাশ : গৌরবময় পথচলার পাঁচ বছর

নাজমুস সাকিব

যেভাবে শুরু

নবপ্রকাশের যাত্রা শুরু হয়েছিল খুব নীরবে, ২০১৫ সালের শুরুর দিকে। প্রথমদিকে রাজধানীর লালবাগের একটি লাইব্রেরিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠেছিল স্বপ্নময় এই প্রতিষ্ঠান। তার কিছুদিন পর বইয়ের রাজ্য বাংলাবাজার ইসলামি টাওয়ারের প্রথম তলায় কোণার দিকে ছোট্ট একটি দোকানে ঠাঁই হয় তার।

প্রথমদিকে গুটি কয়েক বই নিয়ে যাত্রা শুরু। তার মধ্যে নবপ্রকাশের প্রতিষ্ঠার সাথে জড়িতদের লেখা বইয়ের সংখ্যা বেশি। তখন হয়তো বাংলাবাজারের অনেকেই জানতেন না নবপ্রকাশ নামে একটি নতুন প্রতিষ্ঠান যাত্রা শুরু করেছে এই মার্কেটে। কেউ ভাবেনি সবার অগোচরে গড়ে ওঠা এই প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান অল্পদিনেই জয় করে নেবে পাঠকদের মন।

২০১৬ সালের শেষদিকে, আমি তখন প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনার চাপে জর্জরিত। শেকলের হুড়কোর মতো একের পর এক পরীক্ষা আমাকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখছে। পড়ার বইয়ের বাইরে অন্য কোনো বই হাতে

নেবারই ফুরসত নেই তখন, লেখা তো দূরের কথা।
অক্টোবর মাসের শেষদিকে বহু প্রতীক্ষিত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তিপরীক্ষা শেষ হলো। কিছুটা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। কিন্তু তার এক সপ্তাহ পরই আবার মাদরাসার প্রথম সাময়িক পরীক্ষা। ব্যস্ততা যেন 'শেষ হইয়াও হইল না শেষ'। আমাকে আবারও মুখ গুঁজতে হলো বইয়ের পাতায়।
পরীক্ষা শেষ হবার পর সেদিন সন্ধ্যায় শুরু করলাম জীবনের নতুন এক দিগন্তে পথচলা। হোসাইন মুহাম্মদ আবদুল কাদির নামের একজন ফিলিস্তিনি লেখকের জেল-জীবনের স্মৃতির একটি বই দিয়ে শুরু করলাম অনুবাদ। এর আগে তেমন কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না। মাদরাসায় পড়া আরবি সাহিত্যের বইয়ের অনুবাদ আর মাঝে মাঝে পত্রিকায় প্রকাশিত দু-একটি গল্প–এই ছিল আমার পথচলার পাথেয়। পড়াশোনার পাশাপাশি অল্প অল্প করে অনুবাদ চলছিল। এর মাঝে পরীক্ষার জন্য বিরতি ইত্যাদি মিলিয়ে প্রায় ছয় মাসের বেশি লেগে গেল ১৬০ পৃষ্ঠা একটি বই অনুবাদ করতে। সম্পাদনা, প্রুফ রিডিং ইত্যাদি পেরিয়ে সেই বই বাজারে এলো ২০১৭ সালের নভেম্বরে। পুরো একটি বছর। 'গুয়ান্তানামোর ডায়েরি' নামে প্রকাশিত হয় আমার প্রথম অনুবাদগ্রন্থ।
ততদিনে আরেকটি বইয়ের অনুবাদ প্রায় শেষের পথে। পরের বছর ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশ হওয়া আমার অনূদিত উপন্যাস 'সুপ্রভাত ফিলিস্তিন' বেশ সাড়া ফেলেছিল পাঠকদের মধ্যে। অনুবাদক হিসেবে এটা ছিল আমার জন্য বড় অনুপ্রেরণা।
তারপর আর থেমে থাকিনি। জুরজি জায়দান ও আহমাদ আমিনের লেখা দুটি বই প্রকাশের পর আরও একটি বই পাঠকদের জন্য অপেক্ষা করছে। আশা করি এমন বই বাংলাভাষায় প্রথম এবং এটাও পাঠকদের মন জয় করবে।
এখন যুক্ত হয়েছেন বেশ কজন লেখক ও অনুবাদক। শুরু থেকেই নবপ্রকাশ বাংলাভাষী পাঠকদের কাছে নতুন এবং অভিনব বিষয় ও লেখকদের বই একের পর এক প্রকাশ করে চলেছে।
নবপ্রকাশের পাঁচবছর পূর্তি হচ্ছে আর কিছুদিন পর। নবপ্রকাশকে নিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে নবধ্বনির ডিসেম্বর সংখ্যা। নবপ্রকাশ থেকেই এখন প্রতিমাসে প্রকাশিত হয় পাঁচটাকা নামমাত্র মূল্যের এই পত্রিকা। নবধ্বনির জন্ম যদিও নবপ্রকাশের অনেক আগে তবু নবধ্বনির অভিভাবক এখন নবপ্রকাশই।
নবপ্রকাশ নিয়ে এই সংখ্যায় কিছু গল্প হয়ে যাক। নবপ্রকাশ সম্পর্কে অনেক কিছু জানার সঙ্গে সঙ্গে আশা করি পাঠকদের অনেক প্রশ্নের উত্তরও পাওয়া যাবে এর মধ্য দিয়ে।

> নানা লেখকের নানা বিষয়ের বই প্রকাশে সচেষ্ট নবপ্রকাশ। সমুদ্রে ডুব দিয়ে মণি-মুক্তা খুঁজে আনার মতো করে নবপ্রকাশ বই বাছাই করে থাকে। উদাহরণ হিসেবে একটা বইয়ের কথা বলা যেতে পারে–'মক্কা শহরে ছদ্মবেশী এক খ্রিষ্টানের দিনলিপি'। অনন্য একটি বই। এমন বইয়ের খোঁজ বাংলাভাষায় পাওয়া দুষ্কর। মাত্র শত পৃষ্ঠার এই ভ্রমণকাহিনি আমাদের সামনে তুলে ধরে অজানা কিছু ইতিহাস।

বই বাছাইয়ে ভিন্নতা

নবপ্রকাশ দ্রুত পাঠকপ্রিয়তা পেয়েছে তার একটি বড় কারণ ভিন্ন ধরনের বই।

বাংলাবাজার ঘুরে দেখলে যে কারও মনে হবে ইসলামি বইয়ের বাজার অনেক সমৃদ্ধ। অনেক অনেক প্রকাশনী। প্রচুর বইয়ের সমাহার। কিন্তু একটু ভালো করে লক্ষ করলে বোঝা যাবে এর দৈন্যদশা। একই বইয়ের নাম পরিবর্তন করে প্রকাশ করা, একই বইয়ের একাধিক অনুবাদ, হুবহু একই বিষয়ের একাধিক বই, সামান্য কজন লেখকের অনুবাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা ইত্যাদিতে আক্রান্ত আমাদের বইয়ের বাজার। এই দৈন্যতা কাটিয়ে উঠতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ নবপ্রকাশ।

নানা লেখকের নানা বিষয়ের বই প্রকাশে সচেষ্ট নবপ্রকাশ। সমুদ্রে ডুব দিয়ে মণি-মুক্তা খুঁজে আনার মতো করে নবপ্রকাশ বই বাছাই করে থাকে। উদাহরণ হিসেবে একটা বইয়ের কথা বলা যেতে পারে—'মক্কা শহরে ছদ্মবেশী এক খ্রিষ্টানের দিনলিপি'। অনন্য একটি বই। এমন বইয়ের খোঁজ বাংলাভাষায় পাওয়া দুষ্কর। মাত্র শত পৃষ্ঠার এই ভ্রমণকাহিনি আমাদের সামনে তুলে ধরে অজানা কিছু ইতিহাস। সে সময়ের মক্কা এবং সেখানকার অধিবাসীরা কেমন ছিল—এর প্রত্যক্ষ বর্ণনা পাওয়া যায় বইটিতে। আধুনিক যুগের নিকট-অতীতে হজযাত্রা কতটা দুঃসহ ছিল তাও জানতে পারি আমরা এই বই থেকে।

বই বাছাইয়ের ক্ষেত্রে মূলত নির্ভর করা হয় ইন্টারনেটের ওপর। তবে শুধু ইন্টারনেটই যথেষ্ট নয়; বইটির বিষয়, পাঠকপ্রিয়তা, প্রাসঙ্গিকতা ইত্যাদি বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় অনুবাদের।

প্রয়োজন কাজের মানুষ

বই বাছাইয়ের প্রক্রিয়ার কথা তো বলা হলো। তারপর প্রয়োজন হয় লেখক বা অনুবাদকের। এখানে এসে হোঁচট খেতে হয়। এত লেখক ও অনুবাদকের ভিড়েও কাজের লোক পাওয়া বড় কঠিন হয়ে পড়ে। লেখালেখির জগতে পেশাদারিত্বের বড় অভাব। অনেক অনুবাদককে নানা কারণে বই দেয়া যায় না। দেখা যায়, তিনি নির্দিষ্ট কোনো গোষ্ঠী বা মতবাদের সাথে জড়িত। কিংবা পাঠকদের কাছে নিজের ভাবমূর্তি বজায় রাখতে সক্ষম নন। কিংবা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তিনি সারাদিন বিতর্ক-নিন্দা ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। এসব কর্মকাণ্ড আমাদের নিরুৎসাহিত করে তাঁকে দিয়ে কাজ করাতে।

অনুবাদকের চেয়েও বেশি অভাব লেখকের। বাংলাদেশের বেশিরভাগ লেখক নিজের পছন্দমতো লিখে প্রকাশকদের কাছে আসেন। কিন্তু প্রকাশক বা পাঠকের চাহিদাকে সামনে রেখে নির্দিষ্ট কোনো বিষয়ে লেখার মতো লেখকের বড় অভাব।

লেখক ও অনুবাদকের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় যে সমস্যা তা আন্তরিকতার অভাব। অনেক অনুবাদক খুব আগ্রহ দেখিয়ে বই নেন। কিন্তু কিছুদিন পর আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। দিনের পর দিন যোগাযোগ করেও তার কাজের আর খোঁজ মেলে না।

তবু নবপ্রকাশ আশাবাদী। ইতিমধ্যে বেশ কজন লেখক-অনুবাদক কাজ শুরু করেছেন নবপ্রকাশের সাথে। ধীরে ধীরে একটি সুন্দর প্রকাশনা ব্যবস্থাপনা গড়ে উঠবে এই প্রত্যাশা আমাদের।

কেন অনুবাদে আগ্রহ

অনেকেই এই প্রশ্নটা করে থাকেন। অনুবাদকে কেউ কেউ দুর্বলতা মনে করে থাকেন। কিন্তু এ কথা মনে রাখতে হবে, অনেক সময় নতুন দশটা বই লেখার চেয়ে একটা বই অনুবাদ করা অনেক কঠিন হয়ে যায়।

অনুবাদে নবপ্রকাশের আগ্রহের বেশ কিছু কারণ আছে। প্রথমত অনুবাদ সাহিত্যের আলাদা একটি শাখা। অনুবাদের মাধ্যমে ভিন্ন দুটি ভাষার লেখক ও পাঠকের মধ্যে সংযোগ ঘটে। অনুবাদের মাধ্যমে জ্ঞানের আমদানি হয়। তারচেয়ে বড় কথা, যে-কোনো সভ্যতার শুরু হয়েছিল অনুবাদ দিয়েই। আব্বাসি যুগে খলিফারা বই সংগ্রহ করে স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে দিতেন অনুবাদের জন্য। মনসুর ও হারুনুর রশিদের আমলে অনুবাদ শুরু হয়েছিল বলেই পরে একদিন বাগদাদে বাইতুল হিকমাহ গড়ে উঠেছিল।

বাংলাভাষায় ইসলামি ঘরানার বই এখনো তার



শৈশব অতিক্রম করতে পারেনি। তাই অনুবাদ একান্ত প্রয়োজন। অনুবাদের মাধ্যমে চিন্তা ও জ্ঞানের বিকাশ ঘটবে। এভাবে গড়ে উঠবে সুযোগ্য লেখক। এসব গুরুত্ব অনুধাবন করে অনুবাদে গুরুত্ব দেয় নবপ্রকাশ।

নিন্দায় কী আসে যায়

বাংলাদেশে ইসলামি বইয়ের বাজার যদিও এখন তার শৈশব অতিক্রম করতে পারেনি তবু ইতিমধ্যে নানা ব্যাধিতে আক্রান্ত এই বাজার। পরস্পরের প্রতিযোগিতামূলক সম্পর্ক এখানে বেশিরভাগ সময় রূপ নেয় রেষারেষিতে। তার সাথে আছে নানা দল ও মতের প্রভাব। বিভিন্ন মতের অনুসারীদের ঘিরে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন প্রকাশনী। সহযোগিতামূলক মনোভাবের বিপরীতে হিংসাত্মক আচরণ লক্ষ করা যায় মাঝে মাঝে। এসব কদাকার বিষয় কেবল প্রকাশকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, ফেসবুকের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে পাঠকদের মাঝেও।

তবু স্বীকার করতে হবে এর মধ্যে বেশ কিছু উন্নত মানের প্রকাশনী গড়ে উঠেছে। মানসম্মত বইয়ের পাশাপাশি তারা প্রতিযোগিতামূলক সুন্দর একটি বইয়ের বাজার তৈরি করতে আগ্রহী। কিন্তু নিন্দুকেরা বসে নেই।

কারণে-অকারণে তাঁরা সুযোগ পেলেই বিভিন্ন প্রকাশনী, লেখক কিংবা অনুবাদকের বিরুদ্ধে অপপ্রচার শুরু করেন। কখনো দেখা গেছে প্রকাশক তাঁর বই ছাপাতে রাজি হননি বলে লেখক ফেসবুকে আঁটঘাট বেঁধে নেমেছেন তাঁর বিরুদ্ধে।

নবপ্রকাশের মতো নতুন একটি প্রকাশনাও রেহাই পায়নি নিন্দুকের ছোবল থেকে।

অমুসলিম লেখকের বই প্রকাশের কারণে ইসলাম বিকৃতিসহ নানা অভিযোগ এসেছে নবপ্রকাশের বিরুদ্ধে। নবপ্রকাশ ইহুদি-খ্রিষ্টানদের দালাল—এমন কথা বলতেও দ্বিধা করেননি কেউ কেউ।

কখনো নবপ্রকাশের বই প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে পুরো বই ঘেঁটে ভুল বের করে তা নিয়ে হই-চই ফেলে দিয়েছেন অনেকে। তবে আখেরে লাভ হয় নবপ্রকাশেরই। 'নেগেটিভ মার্কেটিং' বলে একটা বিষয় আছে। এভাবে বইয়ের প্রচার হয়ে যায় অনেক দ্রুত।

একটু খোঁজ নিলে দেখা যায়, এসব অপপ্রচার ছড়ানোর পেছনে মূল কারণটা ব্যবসায়িক। প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে এমন পথ বেছে নিয়েছেন অনেকে।

আশার কথা হলো, এসব নিন্দা গায়ে মাখে না নবপ্রকাশ। বরং সমালোচনা ও নিন্দাকে সাফল্যের অংশ মনে করা হয়। যে যা বলার বলুক, দিনশেষে সম্মানিত পাঠকরাই মূল্যায়ন করবেন নবপ্রকাশের।

লেখক : অনুবাদক ও সম্পাদক, নবপ্রকাশ; সহকারী সম্পাদক, মাসিক নবধ্বনি



নবপ্রকাশের সঙ্গে আমার পথচলার গল্প

হামমাদ রাগিব

নবপ্রকাশের পাঁচ বছর পূর্ণ হয়েছে, নবপ্রকাশের সঙ্গে আমার পথচলার তিন বছর। তবে প্রতিষ্ঠানের যাত্রালগ্ন থেকেই এর চিন্তা এবং স্বপ্নের সঙ্গে পরিচয়। তারও পাঁচবছর আগে নবপ্রকাশের 'বীজ' নবধ্বনির সঙ্গে সখ্যতা। সেই সুবাদে তামীম রায়হান এবং সালাহউদ্দীন জাহাঙ্গীর সম্পর্কে জানাশোনা। রাজধানী শহর থেকে প্রায় দু আড়াই শ' কিলোমিটার দূরের প্রত্যন্ত কোনো অঞ্চল থেকে রাজধানীর কোনো পত্রিকা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়া–সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম না থাকলে বেশ কঠিন ব্যাপার ছিল।
২০১২ সালের শেষ দিকে একদিন ফেসবুকের একটি গ্রুপে তামীম রায়হান নামের আইডি দেখে বেশ কৌতূহলী হয়ে উঠেছিলাম। ইনিই নবধ্বনির সম্পাদক কি না নিশ্চিত হতে টাইমলাইনে গেলাম। নবধ্বনি নিয়মিত সংগ্রহ করতাম ২০০৯-এর শেষ দিক থেকে সম্ভবত। কিন্তু ফেসবুকে এভাবে হঠাৎ করে নবধ্বনি-সম্পাদকের দেখা পেয়ে যাব, ভাবিনি। বলা বাহুল্য, ফেসবুক তখন পর্যন্ত এতো বেশি ব্যাপকতা লাভ করেনি, উপরন্তু আমি সেসময় সবে ফেসবুক আইডি খুলেছি। টাইমলাইনে গিয়ে নবধ্বনির সম্পাদক নিশ্চিত হয়ে সেদিনই ইনবক্সে নক

করলাম। তারপর থেকে তামীম ভাই আমার জীবনে ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছেন। তাঁর উৎসাহ ও পরামর্শে বছর দুয়েকের মাথায় আমার ঢাকা আসা।
হিফজখানায় পড়ার সময় একবার ইজতেমায় এসেছিলাম আমার হিফজের হুজুরের সঙ্গে, এ ছাড়া আর কখনো সিলেট-মৌলভীবাজারের বাইরে আসা হয়নি। এক রমজানের পর, তামীম ভাই তখন ছুটিতে দেশে এসেছেন। পড়াশোনার জন্য ঢাকা আসব কি আসব না ইতস্তত করছিলাম, এলেও পরিচিত কেউ নেই, কোন মাদরাসায় কীভাবে ভর্তি হবো না হবো, কিছুই জানি না। তামীম ভাই বললেন, 'ঢাকার বাসে উঠে তুমি সোজা চলে আসো সায়দাবাদ। সায়দাবাদ নেমে আমাকে ফোন কোরো।'
তামীম ভাইয়ের ওপর ভরসা করে রমজানের ছয়/সাতদিন পর এক সকালে মৌলভীবাজার থেকে বাসে চড়ে বসলাম। সায়দাবাদ নেমে তামীম ভাইকে ফোন করতেই তিনি বাসার ঠিকানা বলে দিলেন। রিকশায় করে গেলাম তাঁর বাসায়। দুপুরের খাওয়া-দাওয়া সেরে বের হলেন আমাকে নিয়ে। রিকশায় ঢাকার পথঘাট দেখালেন। পুরো বিকেল এবং সন্ধ্যা ঘুরলাম তাঁর সঙ্গে। ফাঁকে নিজের জরুরি কিছু কাজ সেরে নিলেন তিনি। রাতে একসঙ্গে ফিরে গেলাম তাঁর বাসায়।
পরদিন ভর্তি করিয়ে দিলেন ফরিদাবাদ। ভর্তির বিড়ম্বনার সঙ্গে আমার নতুন পরিচয়। সিলেটে এই বিড়ম্বনা পোহাতে হয়নি কোথাও। ফরম সংগ্রহে সিরিয়াল, ভর্তি পরীক্ষায় সিরিয়াল, ফরম জমা দিতে সিরিয়াল—তারপরও ভাগ্য ভালো, তামীম ভাইয়ের পরিচয় থাকায় কিছু কাজ সহজে হয়েছে।
ভর্তির ঝামেলা শেষ করতে করতে প্রায় বিকেল হয়ে গিয়েছিল। তামীম ভাই নিয়ে এলেন লালবাগে। লালবাগের ছোট্ট একটি দোকানে নবপ্রকাশের যাত্রা সবে শুরু হয়েছে। পুরো বিকেল এই দোকানেই কাটালাম। দোকানে নবধ্বনির বেশ অনেকগুলো সংখ্যা ছিল, যেগুলো আমি সংগ্রহ করতে পারিনি। সংখ্যাগুলো উল্টে-পাল্টে দেখছিলাম। তখনও পর্যন্ত কল্পনাও করিনি, দু বছরের মাথায় প্রিয় এই পত্রিকাটি গোছানোর দায়িত্ব আমিই পাবো।

দুই

ফরিদাবাদ ভর্তি হয়েছিলাম জালালাইন জামাতে। মাদরাসায় সে বছর ফোন ব্যবহার করতাম না ওভাবে। ফলে তামীম ভাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। তবে নবধ্বনি নিয়মিতই পড়া হতো। আমি এখন যে দায়িত্বে আছি, সেখানে তখন ছিলেন মীর হেলাল। বেশ চমৎকার করেই সাজাতেন সেই সময়কার সংখ্যাগুলো। নবধ্বনি ছাড়াও তখন নবপ্রকাশ থেকে তামীম ভাইয়ের 'শাহজাদা' ও 'তবুও আমরা মুসলমান' বেরিয়েছে।
মেশকাতের বছর নবধ্বনির আর কোনো খোঁজ পেলাম না। তামীম ভাইকেও ওভাবে কিছু জিজ্ঞেস করি না। একদিন জানতে পারলাম নবধ্বনি আর বেরোচ্ছে না। শুনে কষ্ট লাগল। তবে নবধ্বনি বন্ধ হলেও নবপ্রকাশ তখন পূর্ণ উদ্যমে কাজ শুরু করেছে। নবধ্বনি থেকে বাছাই করে বেশ কয়েকটি গল্পের সমন্বয়ে একটা সংকলন প্রকাশিত হয়েছে নবপ্রকাশ থেকে। সালাহউদ্দীন জাহাঙ্গীর ভাইয়ের 'ইতিহাসের জানালা' এবং 'বদরের বীর'ও বেরিয়েছে।
ততদিনে মেশকাত শেষ করে আমি দাওরায়ে হাদিসে পড়ি। নবপ্রকাশ লালবাগ ছেড়ে বাংলাবাজার এসেছে বছর দেড়েক হয়ে গেছে, কিন্তু কখনো যাইনি। যাইনি কারণ, পরিচিত কেউ ছিলেন না। তামীম ভাই ছাড়া নবপ্রকাশের কারও সাথে ওভাবে পরিচয় ছিল না তখন অবধি।
জাহাঙ্গীর ভাইয়ের সাথে ইনবক্সে টুকটাক আলাপ হলেও, আমার ধারণা ছিল, হয়তো ভালোভাবে চিনবেন না। দাওরার বছর তাঁর 'বদরের বীর' বেরোনোর পর কী মনে করে একদিন গেলাম নবপ্রকাশে। ঘটনাচক্রে বিক্রয়কেন্দ্রে সেদিন তিনিও ছিলেন। সরাসরি যদিও এই প্রথম দেখা, কিন্তু ফেসবুকের কল্যাণে তাঁর চেহারা চিনতে অসুবিধা হলো না। বই কিনে অটোগ্রাফের জন্য তাঁর মনযোগ আকর্ষণ করলে নাম জানতে চাইলেন। নাম বলতেই স্বভাবজাত হাসিটা

প্রশস্ত করে বাহুতে মৃদু একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, 'চুপচাপ বই নিয়ে চলে যাচ্ছেন পরিচয় না দিয়েই? আপনাকে পাথর মেরে সঙ্গেসার করা উচিত।'

তারপর বেশ খানিকক্ষণ কথা হলো তাঁর সঙ্গে। আন্তরিক আলাপ। বই কী কী পড়ছি, কী লিখছি ইত্যাদি জানতে চাইলেন। উত্তর তাঁর মনঃপুত হলো না। বললেন–'নাহ, হামমাদ সাব, আপনার দ্বারা কিচ্ছু হইব না।' আমার প্রতি 'কিচ্ছু হইব না'র আক্ষেপ সেই যে শুরু হয়েছিল তাঁর, আজও অব্যাহত আছে।

নবপ্রকাশ থেকে ফিরে সে রাতেই তামীম ভাইকে ম্যাসেঞ্জারে নক করলাম। করলাম, নবপ্রকাশ থেকে ঘুরে এসেছি যে, কেবল এটুকু বলার জন্য। এটুকু বলতে গিয়ে আলাপ একটু দীর্ঘায়িত হয়ে গেল। হঠাৎ তামীম ভাই বললেন, আমার সম্পাদনা-সংক্রান্ত কোনো অভিজ্ঞতা আছে কি না। বলা বাহুল্য, সম্পাদনার কাজ সেই নাহবেমির জামাতে থাকতেই শুরু করেছিলাম। সিলেটের গহরপুর জামিয়ার আন-নুর ছাত্রকাফেলার সাহিত্য বিভাগের দায়িত্বে থাকার সুবাদে কাফেলার দেয়ালিকা এবং বার্ষিক ম্যাগাজিনে কাজ করার সুযোগ হয়েছিল। এ ছাড়াও শখের বশে আরও দুই-তিনটা সাময়িকী বের করেছিলাম বন্ধুদের নিয়ে। এ ছাড়া আমাদের এলাকার প্রয়াত একজন বুজুর্গের স্মারকগ্রন্থের কাজও করছিলাম তখন। তামীম ভাইকে জানালাম এসব।

তামীম ভাই বললেন, 'নবধ্বনি বন্ধ হয়ে আছে বেশ কিছু দিন ধরে, জানোই তো। আমি ব্যস্ত, জাহাঙ্গীর ভাইও ব্যস্ত, পত্রিকাকে গোছিয়ে ছাপার উপযোগী করার মতো ওভাবে কাউকে পাচ্ছি না। তুমি পারবা?'

দুই ফর্মার একটা পত্রিকা গোছানোর মতো অভিজ্ঞতা আমার আছে, কিন্তু নবধ্বনির মতো বহুল প্রচারিত ও পরিচিত পত্রিকার দায়িত্ব আমি কীভাবে নিই, ভয় পাচ্ছিলাম মনে মনে। কিন্তু তামীম ভাইকে সেটা বুঝতে দিলাম না। কারণ, নবধ্বনির জন্য সেই কৈশোর থেকে যে ভালোবাসা গেঁথে আছে আমার ভেতর, এবং যে উচ্চতায় নবধ্বনির অবস্থান, এর সঙ্গে যুক্ত হতে পারা আমার জন্য সৌভাগ্যের বিষয়।

তামীম ভাইকে আমি সোৎসাহে জানালাম, 'অবশ্যই পারব।'

এবার আমার চেনা-জানা তামীম ভাইকে অন্য এক রূপে পেলাম। এর সঙ্গে মোটেও পরিচিত ছিলাম না। এতক্ষণ ইনবক্সে কথা হচ্ছিল, তামীম ভাই বিস্তারিত আলাপের জন্য এবার ফোন দিলেন। বললেন, 'তোমার সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক এতদিন ছিল, এখনও সেটা থাকবে। কিন্তু নবধ্বনিতে যদি তুমি জয়েন করো, তাহলে কাজের সময় পূর্ণ পেশাদারিত্ব রক্ষা করতে হবে। কাজ বাবদ তোমার জন্য অল্পকিছু সম্মানীও নির্ধারিত থাকবে। তোমাকে আদর করি ঠিক, কাজের ক্ষেত্রে কিন্তু কোনো ছাড় দেবো না। কাজের ক্ষেত্রে পূর্ণ পেশাদারিত্ব রক্ষা করতে হবে। প্রতি মাসের ২০ তারিখের মধ্যে পরবর্তী মাসের নবধ্বনির জন্য লেখা সংগ্রহ, বাছাই এবং প্রাথমিক সম্পাদনা শেষে আমাকে মেইল করতে হবে। একদিন সময় দিলাম, পেশাদারিত্ব রক্ষা করতে পারবে কি না, ভেবে আগামীকাল আমাকে জানিয়ো।'

আমি হেসে বললাম, 'পেশাদারিত্ব কীভাবে রক্ষা করতে হয়, সেটা তো শেখার জিনিস, অভ্যাসেরও। আমি যদি কাজেই জয়েন না করি, আর

কেউ যদি আমাকে না শেখায়, তাহলে শিখব কীভাবে?'

তামীম ভাই এবার তাঁর স্বভাবজাত রাগী গলায় বললেন, 'পেশাদারিত্বকে তোমরা খুব হালকাভাবে দেখো, এই হলো তোমাদের সমস্যা। পেশাদারী মনোভাব নেই, এই জন্যই অনেকের লেনদেনে যত অস্বচ্ছতা। আমাদের সৃজনশীল প্রতিষ্ঠানগুলো টেকে না কেবল এই পেশাদারী মনোভাবের অভাবে।'

পেশাদারিত্বের শক্ত তাগিদের পাশাপাশি তামীম ভাই সেদিন নরম আরেকটি কথা বলেছিন। বলেছিলেন, 'হামমাদ, নবপ্রকাশ আমাদের ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান, ওখান থেকে আমি লাভের আশা করি। কিন্তু নবধ্বনি সম্পূর্ণ এর বিপরীত। এটা আমার নিরেট একটি ভালোবাসা'র জিনিস। নবধ্বনি বাবদ যে খরচটা হবে, সেটা আমার প্রতি মাসের উপার্জনের একটা অংশ থেকে ব্যয় হবে। তাই কেবল পেশাদারি মনোবৃত্তিই যথেষ্ট নয়, আমি আশা করব পত্রিকাটাকে তুমি ভালোবাসা দিয়ে সাজাবে। পত্রিকাটা মনে করো তোমার, এর সাজানো-গোছানো এবং উন্নতি-অগ্রগতির ব্যাপারে তুমি স্বাধীনভাবে কাজ করবে। পত্রিকাটা দেখতে ছোট, কিন্তু এর ক্ষমতা অনেক। আমার কাতার আসা এবং এখানে পড়াশোনার পেছনে মূলত এই পত্রিকাই ভূমিকা রেখেছে। তুমিও চাইলে এই পত্রিকা দিয়ে অনেক দূর এগোতে পারো।'

তিন

তামীম ভাইয়ের সঙ্গে যেদিন আলাপ হয়, সেদিন খুব সম্ভব ২০১৬ সালের নভেম্বরের শুরুর দিক ছিল। তামীম ভাই বলেছিলেন, এ মাস থেকেই কাজ শুরু করতে। ডিসেম্বরে পত্রিকা বেরোবে। আমি ২০ তারিখের মধ্যে লেখা সংগ্রহ করে ফাইল জমা দিলাম। তামীম ভাই ফাইল দেখে সন্তুষ্টই হলেন। তবে বললেন, যেহেতু আমরা নতুনভাবে আসছি, নতুন বছর থেকেই শুরু করি। ডিসেম্বরে পত্রিকা আর না করি।

২০১৭-এর জানুয়ারি থেকে নতুন আঙ্গিকে আবার শুরু হলো নবধ্বনির যাত্রা। নতুন রূপের এ যাত্রায় তামীম ভাইয়ের সঙ্গে পরামর্শ কওে আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম, প্রতি মাসে যেকোনো একটা প্রতিপাদ্য বিষয়কে সামনে রেখে পত্রিকা করা হবে। প্রতিপাদ্য বিষয়কে অবলম্বন করে হবে প্রচ্ছদ। সে মুতাবিক জানুয়ারি সংখ্যার প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল সদ্য প্রয়াত পাকিস্তানি সংগীত শিল্পী জুনায়েদ জামশেদ রহমতুল্লাহি আলায়হিকে ঘিরে। বেশ কিছু চমৎকার লেখা জোগাড় করতে পেরেছিলাম। সংখ্যাটিও হয়ে উঠেছিল দুর্দান্ত। পত্রিকা প্রকাশ হয়ে বাজারে আসার দুদিনের মাথায় সবগুলো সংখ্যা নিঃশেষ! আমি তো খুশিতে বাগবাগ।

আলহামদুলিল্লাহ, পরবর্তী প্রায় সবকয়টি সংখ্যাই এভাবে যাচ্ছে। প্রকাশের সপ্তাহ খানেকের মাথায় পর্যাপ্ত পরিমাণের পত্রিকা আর থাকে না আমাদের হাতে।

নবধ্বনিতে কাজের সুবাদে কার্যত আমি নবপ্রকাশের অংশ হয়ে গিয়েছিলাম শুরু থেকেই। কিন্তু শুরুর দিকে দাওরার পড়াশোনা থাকবার কারণে বই-সম্পাদনায় জড়ানো হয়নি। এদিকে জাহাঙ্গীর ভাইয়ের সঙ্গেও দু-একমাসের মধ্যে একটা আন্তরিকতা তৈরি হয়ে গিয়েছিল। দাওরার পরীক্ষার পর কী করব ভেবে আমি যখন সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছিলাম, এমনকি ঢাকা ছেড়ে গ্রামে যাওয়ার প্রায় এরাদা করে ফেলেছিলাম, জাহাঙ্গীর ভাই তখন নানাভাবে উৎসাহ ও পরামর্শ দিয়ে আমাকে ঢাকা রেখেছিলেন। বলতে গেলে অনেকটা বাধ্যই করেছেন ঢাকা থাকতে। এ ক্ষেত্রে তামীম ভাই অবশ্য এখতিয়ার দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, তুমি যেখানেই থাকো, সেখান থেকেই নবধ্বনির কাজ করতে পারবা। যদি শিক্ষকতা করতে চাও, বা গ্রামে কিছু করতে চাও, যেতে পারো। আবার ঢাকায় থেকে নবপ্রকাশের বই-সম্পাদনা, অনুবাদ, নিজের মৌলিক বইয়ের কাজও করতে পারো। নবপ্রকাশ এ ক্ষেত্রে তোমাকে পেশাদারিত্বের সঙ্গে গ্রহণ করবে।

কিন্তু জাহাঙ্গীর ভাইয়ের এককথা ছিল, ঢাকা ছাড়া যাবে না। অবশেষে ঢাকায়ই থিতু হই। নবধ্বনি, নবপ্রকাশের বই সম্পাদনা এবং তামীম ভাইয়ের সম্পাদিত মধ্যপ্রাচ্যভিত্তিক একটি অনলাইন পোর্টালের কাজ নিয়েই ব্যস্ত

থাকি বেশ কিছুদিন। সাথে এহসান সিরাজ ভাইয়ের জীবন্তিকায়ও সময় দিই। পরবর্তী সময়ে ফাতেহে যোগদান এবং তার আগের কিছু ব্যস্ততার কারণে অনলাইন পোর্টাল এবং জীবন্তিকার কাজ ছেড়ে দিলেও নবপ্রকাশ ও নবধ্বনির সঙ্গে জড়িয়ে আছি এখন পর্যন্ত। এর মধ্যে ২০১৮ থেকে আমার সঙ্গে কন্টেন্ট বাছাই ও নানামাত্রিক পরামর্শের জন্য নতুন সহকারী সম্পাদক হিসেবে যোগ দিলেন নবপ্রকাশের সম্পাদক ও অনুবাদক নাজমুস সাকিব। নাজমুস সাকিবের যোগদানে যেন নতুন গতি এলো নবধ্বনির কাজে। এলো কন্টেন্ট বাছাইয়েও বৈচিত্র ও ভিন্নতা।

চার

নবপ্রকাশের সঙ্গে আমার পথচলার তিনবছর হলেও অফিসিয়ালি সম্পাদনার কাজে জড়িয়েছি দু বছর হলো। এই দুই বছরে আমার মৌলিক দুটি বই এসেছে নবপ্রকাশ থেকে। সম্পাদনা করেছি আরও বেশ কয়েকটি বই। সম্মান এবং সম্মানীর ব্যাপারে যদি বলি, একজন পূর্ণ পেশাদার লেখক-সম্পাদকের মূল্যায়নই পেয়ে আসছি।

আমার প্রথম বই 'গল্প বলি ফিলিস্তিনের' প্রকাশ হবার পর প্রায় বছর খানেক চলে গেছে। তামীম ভাই এরমধ্যে বেশ কয়েকবার বলেছেন নতুন বইয়ের কাজ ধরতে। আমি ধরছি ধরব করে সময় ক্ষেপণ করেছি। কুরবানি ঈদের একমাস আগে একদিন বললেন, 'বাসায় তো প্রতিবছর বাপের টাকায় করা কুরবানির গোশত খাও, এ বছর নিজের টাকায় কুরবানি দাও। আমি তথ্য-উপাত্ত দিচ্ছি, কুরবানি ঈদের আগে যদি একটা গল্পের পাণ্ডুলিপি জমা দিতে পারো, তবে মোটা দেখে একটা খাসি কুরবানির টাকা পাবা।'

আমি খাসি কুরবানির টাকার প্রলোভনে যতটা না, তারচেয়ে বেশি তামীম ভাইয়ের আন্তরিক উৎসাহে বইয়ের কাজ ধরি। কারণ এটা ভালো করেই জানি, আমি এমন আহামরি কিছু লিখি না, যার জন্য আমাকে আলাদা অফার দিয়ে বই লেখাতে হবে। দেশে মানসম্মত অসংখ্য লেখক এমন আছেন, যাঁরা অগ্রীম নয় পাণ্ডুলিপি জমা দেওয়ার পর সম্মানী পেলেও বই দিতে প্রস্তুত। এখানে মূল বিষয় হচ্ছে আন্তরিকতা। কিন্তু এই আন্তরিকতাকে আমি মূল্যায়ন করতে পারিনি। কিছুটা আলসেমি আর কিছুটা অফিসিয়াল কাজের চাপের কারণে কুরবানি ঈদের আগে পাণ্ডুলিপি পুরোপুরি তৈরি করতে ব্যর্থ হই। তামীম ভাই এবার সত্যি সত্যি হয়তো রাগ করেছেন। বরাবরের চেয়ে এবার একটু ভিন্নভাবেই প্রতিক্রিয়া জানালেন–'কোনো বারই তো আমার বেঁধে দেওয়া সময়ের ভেতরে কাজ দাও না, এ কাজটা ভেবেছিলাম সময়ের ভেতরে দেবে, কিন্তু তোমার অপেশাদারিত্বটা আর গেল না।'

রাগ করুন আর যাই করুন, কাজ না দিলেও খাসি কুরবানির টাকা ঈদের আগে ঠিকই আমার অ্যাকাউন্টে এসে জমা হয়েছিল। অবশেষে পাণ্ডুলিপিটি নবপ্রকাশের প্রধান সম্পাদক মহোদয় সমীপে পৌঁছেছিল কুরবানি ঈদেরও আরও এক মাস পরে। যেটা এখন 'সোনালি দিনের গল্প' নামে পাঠকদের হাতে হাতে পৌঁছুচ্ছে।

এই তিন বছরে নবপ্রকাশ ও নবধ্বনিতে কাজের সুবাদে তামীম ভাই যে জিনিসটা আমাকে এবং আমাদেরকে সবচেয়ে বেশি শিখিয়ে যাচ্ছেন, সেটা হচ্ছে পেশাদারিত্ব। বছরখানেক ধরে নবপ্রকাশ ও নবধ্বনির বাইরেও আমি বেশ কিছু কাজ করি, এসব কাজের ক্ষেত্রে পূর্ণ পেশাদার হিসেবেই আমাকে পাওয়া যায়, যাঁদের সঙ্গে কাজ করেছি এবং করছি তাঁরা নিশ্চয় এটা স্বীকার করবেন। পেশাদারিত্বের জায়গা থেকে কারও কারও সঙ্গে ক্ষেত্রবিশেষে রূঢ় আচরণও করেছি, করি। কিন্তু যাঁর কাছ থেকে এই পেশাদারিত্বের প্রেরণা নিচ্ছি, শিখছি, তাঁর কাছে দিনশেষে অপেশাদারই থেকে যাই। নবধ্বনিতে কাজ শুরুর পর সেই যে প্রথম মাসে ২০ তারিখের ভেতর ফাইল জমা দিয়েছিলাম, তারপর মনে পড়ে না, আর কোনো মাসে ২০ তারিখের মধ্যে ফাইল জমা দিয়েছি।

নবধ্বনি ও নবপ্রকাশের সঙ্গে এই হলো আমার পথচলার গল্প।

লেখক : সহকারী সম্পাদক, নবধ্বনি ও সম্পাদক, নবপ্রকাশ



নবপ্রকাশ এবং আমি

ইশতিয়াক আহমাদ

নবধ্বনির সহকারী সম্পাদক হামমাদ রাগিব ভাই মারফত জানতে পারলাম নবপ্রকাশের পাঁচ বছর পূর্তি উপলক্ষে ডিসেম্বরে নবধ্বনির বিশেষ সংখ্যা বের হবে। নবপ্রকাশ থেকে যেহেতু ইতিমধ্যেই আমার অনূদিত দুটো বই বেরিয়েছে, বিশেষ সংখ্যায় অনুবাদক হিসেবে আমার কিছু অনুভূতি শেয়ার করা দরকার। কিন্তু বিপদে পড়লাম লিখতে বসে। আমি তো আদতে ওরকম কোনো লেখক নই, সাজিয়ে-গুছিয়ে নবধ্বনি বা নবপ্রকাশ নিয়ে কিছু লেখা আমার জন্য সহজ না। তারপরও কলমের ওপর জোর খাটালাম...

এক.

মাদরাসা থেকে ফিরে দুপুরের খাবার খেয়ে একটু বিশ্রাম নিচ্ছিলাম। অপরিচিত নাম্বার থেকে ফোনকল।

'আসসালামু আলাইকুম।'

'ওয়ালাইকুমুস সালাম।'

'কে?'

'আমি সান্তাহার থানা থেকে এসআই জাহাঙ্গীর। আপনার নামে আমাদের কাছে কমপ্লেইন আছে। থানায় এসে দেখা করুন।'

নবপ্রকাশের আরেকটা জিনিস আমার খুব ভালো লাগে। তাঁদের পেশাদারিত্ব। বই নির্বাচন, লেখা/অনুবাদ, সম্পাদনা, প্রচ্ছদ, ছাপা এবং পাঠকের কাছে পৌঁছানোর প্রতিটি পর্যায়ে দারুণ পেশাদারিত্ব নিয়ে কাজ করে প্রতিষ্ঠানটি। নবপ্রকাশের সাথে কাজ করার পর এতটুকু আমার জানা হয়ে গেছে। নবপ্রকাশকে নিয়ে আলোচনা-সমালোচনাও কম নয়। কাজ করতে গেলে এসব সহ্য করতে হবে। জানা কথা। এই ব্যাপারটিও নবপ্রকাশ সামলাচ্ছে পেশাদারিত্বের সাথে।

আমি ভড়কে গেলাম। রীতিমতো ভয়ও পেলাম। ভয়মিশ্রিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলাম, 'আমার নামে কে অভিযোগ করল!'
'সেটা জানার জন্য আপনাকে থানায় এসে দেখা করতে হবে। ফোনে বলা সম্ভব না। তাড়াতাড়ি আসেন।' এস আই জাহাঙ্গীর সাহেব ঢাকাইয়া টানে বললেন।
'কখন আসতে হবে?'
'আগামীকালের মধ্যেই। নয়তো মামলা হবে।'
হঠাৎ খেয়াল হলো, সান্তাহার তো আদৌ কোনো থানা না! সান্তাহার ঐতিহ্যবাহী রেলওয়ে জংশন। সবাই চেনে। কিন্তু থানা না। থানা হলো আদমদিঘি। সাহস করে বললাম, 'সান্তাহারে তো কোনো থানা নাই। থানা তো আদমদিঘি!'
'সান্তাহার থানা না এইটা আপনারে কে বলল! দেখা না করলে বিপদে পড়বেন কইলাম।'
পাশ থেকে কে যেন হেসে উঠল। বুঝলাম, আমাকে বোকা বানানো হচ্ছে। মনে পড়ল, কলমদানি সম্পাদক মুফতী সালাহুদ্দীন মাসউদ ভাই বলেছিলেন, সাজা ভাই বগুড়া আসবেন। বুঝে গেলাম এই এসআই জাহাঙ্গীর সাহেব আসলে কে!
'এসআই জাহাঙ্গীর তো ভাই আপনার নাম না। আপনার নাম এস ইউ জাহাঙ্গীর।'
সাজা ভাই হাসলেন। বললেন, 'এতো ভয় পেলে দুনিয়ায় চলবেন ক্যাম্নে মিয়া! বগুড়ায় আসছি। আপনারা কেউ নাই। হোটেলে উঠেছি। আসেন। বাতচিত হোক।'
খুশি হলাম। প্রীত হলাম।
সাজা ভাই, সালাহউদ্দীন জাহাঙ্গীর ভাই সেলিব্রেটি মানুষ। আমার মতো কাউকে ফোন করেছেন এটা আমার জন্য বিরাট সারপ্রাইজ। মাগরিব নামাজের পরে জামিল মাদরাসায় দেখা হলো। মুসাফাহা হলো। আন্তরিকভাবে কথা বললেন, অবাক হলাম। অবাক হওয়ার কারণ আছে। লোকমুখে শুনেছি তিনি কিঞ্চিত অহম নিয়ে চলেন। কাউকে তেমন পাত্তা দেন না।
সালাহউদ্দীন জাহাঙ্গীর ভাইয়ের সাথে আরও একজন আছেন। তিনি তামীম রায়হান ভাই। তামীম ভাইয়ের সাথে সেদিন প্রথম দেখা।

এর আগে ম্যাসেঞ্জারে দু-একবার কথা হয়েছে। তাঁর লেখা নিয়ে আমার ভালোলাগার কথা জানিয়েছিলাম।
কথাবার্তার এক পর্যায়ে তামীম ভাই জানলেন আমি টুকটাক অনুবাদ করি। লিখি না। অনুবাদ করি। হঠাৎ করেই বলে বসলেন, 'আরবি থেকে অনুবাদ করতে পারেন?'
বললাম, 'আরবি থেকে এখনো অনুবাদ করা হয়নি।'
'আমি আপনাকে কিছু নমুনা দেবো। আপনি আমাকে অনুবাদ করে পাঠাবেন। যদি ভালো হয় আপনাকে নবপ্রকাশের কিছু কাজ দেবো।'
প্রথম দেখাতেই এমন প্রস্তাব আমার জন্য অকল্পনীয়। হকচকিয়ে যাওয়া না কী বলে! সেটা হয়ে গেলাম। বললাম, 'চেষ্টা করব।'
তামীম ভাই বললেন, 'চেষ্টা করব কথাটা ভদ্রতা। আমাদের সাথে কাজ করতে হলে আপনাকে প্রফেশনাল হতে হবে। স্পষ্ট করে হ্যাঁ অথবা না বলতে হবে।'
সাজা ভাই বললেন, 'আরে ভাই, আপনি তো বেচারাকে ভয় পাইয়ে দিলেন।'
তামীম ভাই বললেন, 'যদি পেশাদারিত্ব নিয়ে কাজ করতে চান তাহলে আমার মেইলটা নিয়ে রাখেন। আমাকে জানাবেন।'
আমি লিখে নিলাম।
তামীম ভাই বগুড়ার কাজ শেষ করে ঢাকা চলে গেলেন। সেখান থেকে কাতার। কাতারে যাওয়ার পরে একদিন মেইল করলাম।
'কাজটা আমি করতে চাই।'
তামীম ভাই একটা বই দিয়ে বললেন, 'এটার ভূমিকা-অংশটুকু অনুবাদ করে আমাকে দেখান। আজ রাতের মধ্যেই।'
আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করে অনুবাদ করে দিলাম। তিনি বললেন, 'ভালো হয়েছে। কাজ শুরু করুন। তবে খেয়াল রাখবেন কাজটা করতে হবে পূর্ণ পেশাদারিত্বের সাথে। দিনক্ষণ আপনি নিজেই নির্দিষ্ট করে দিন। সেই দিনের মধ্যেই কাজটা আপনাকে শেষ করে দিতে হবে।'
রাজি হলাম। কাজ শুরু করলাম। এভাবেই শুরু হলো।

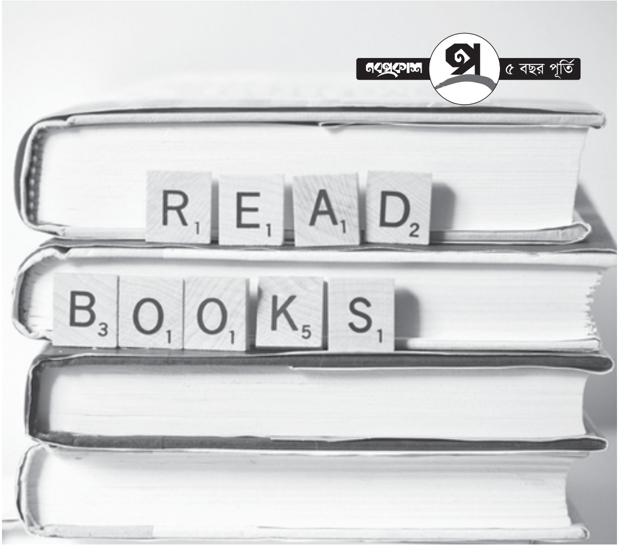
দুই.

নবপ্রকাশের বই নির্বাচন, সেসব অনুবাদ করা এবং পাঠকের সামনে পেশ করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি যে জিনিসটা আমার ভালো লাগে, সেটা হলো, তাঁরা নির্দিষ্ট কোনো শ্রেণীর পাঠককে টার্গেট করেন না। সবশ্রেণীর পাঠকের ভালো লাগবে এমন বই তাঁরা প্রকাশ করেন। যেমন সুলতান কাহিনি, প্রিয়তমা, সুপ্রভাত ফিলিস্তিন, গুয়ান্তানামোর ডায়েরি, ইতিহাসের জানালা। প্রতিটি বই-ই কিন্তু নানা শ্রেণীর পাঠককে ছুঁয়ে গেছে। পাঠকের সংগ্রহশালাকে আরও সমৃদ্ধ করেছে। এর মধ্যে 'প্রিয়তমা' তো রকমারির বেস্টসেলার বইয়ের তালিকাতেও রয়েছে। নবধ্বনির ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। তাঁরা প্রতিটি সংখ্যা বের করছেন সার্বজনীন পাঠকের উদ্দেশ্যে। যেটার খুব অভাব। অনেকদিনের গড়ে ওঠা একটা বৃত্ত তাঁরা ভাঙতে চেয়েছেন, সফলও হয়েছেন হয়তো। তাঁদের এই সাহসী পদক্ষেপকে সাধুবাদ জানাতেই হয়।
নবপ্রকাশের আরেকটা জিনিস আমার খুব ভালো লাগে। তাঁদের পেশাদারিত্ব। বই নির্বাচন, লেখা/অনুবাদ, সম্পাদনা, প্রচ্ছদ, ছাপা এবং পাঠকের কাছে পৌঁছানোর প্রতিটি পর্যায়ে দারুণ পেশাদারিত্ব নিয়ে কাজ করে প্রতিষ্ঠানটি। নবপ্রকাশের সাথে কাজ করার পর এতটুকু আমার জানা হয়ে গেছে।
নবপ্রকাশকে নিয়ে আলোচনা-সমালোচনাও কম নয়। কাজ করতে গেলে এসব সহ্য করতে হবে। জানা কথা। এই ব্যাপারটিও নবপ্রকাশ সামলাচ্ছে পেশাদারিত্বের সাথে।

তিন.

দেখতে দেখতে নবপ্রকাশের পাঁচ বছর পেরিয়ে গেল। পাঁচ বছর একটা প্রকাশনীর সফলতা বা ব্যর্থতার হিসেব করার জন্য যথেষ্ট নয় হয়তো, তবে এই পাঁচ বছরে নবপ্রকাশের যে সফলতা চোখে পড়ার মতো, তা হলো, নতুন পাঠক তৈরি করা। এবং পাঠক ধরে রাখা। এটা কম কথা না।
নবপ্রকাশ ও নবধ্বনির পাঠক ও অনুরক্ত হিসেবে সবসময়ই খোদাতায়ালার কাছে কল্যাণের প্রার্থনা করি।

লেখক : অনুবাদক, নবপ্রকাশ



নবপ্রকাশ : দেয়ালে সেঁটে থাকা নয়া ফিকিরের ইশতেহার

যিয়াদ বিন সাঈদ

হিফজখানার ডিমবাতি জ্বালানো শব্দহীন রাতে একটি ছেলের হাতে খচমচ করে উল্টে যাচ্ছে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা। নীরবতার বরফ গলে গলে এ রাতটি হয়ে উঠছে তাঁর কাছে শব্দের ভেতর ঘুমিয়ে পড়া শীতের সন্ধ্যা অথবা শীতের রাতে মাহফিল শেষে বাবা আসবার প্রতীক্ষিত যাপন। ছেলেটির মনে ভয়–কেউ যদি দেখে ফেলে। সেই সাথে শেষরাতের সবক ইয়াদ না হবার পীড়া বারেবারেই তাকে বইয়ের পৃষ্ঠা থেকে সরিয়ে দিতে চাইছে। তার মনে বেজে উঠছে গত দিনের সবক না পারার অপরাধে শাস্তির বেসামাল হিক্কার। কিন্তু সে অনড়; স্থিরসংকল্পের কাছে নিবদ্ধ তার প্রাণজ আত্মা। নফসানিয়্যাতের ধারালো ফলার মুখে সে নিরস্ত্র 'মেঘনাদবধ কাব্য'।
হাতের পুস্তকটি আজই তার কাছে এসেছে। নবধ্বনি এর নাম। সে অত বুঝে না এসব ধ্বনি-প্রতিধ্বনির খেলা। জানে না কী এর মাহাত্ম্যকথা। কিন্তু আজকের এ রাতে তাঁর মনে নবধ্বনির এ পৃষ্ঠাগুলো সরব, উচ্চনিনাদী এবং কোলাহলপূর্ণ। কারণ আজকের এ সংখ্যাটি মুফতী ফজলুল হক আমিনী রহ.-কে নিয়ে। একজন পিতার মতো রাহবার হারিয়ে এতিম সন্তানদের শোকে ভাসা বুকে সান্ত্বনার স্নিগ্ধ প্রলেপ মনে হচ্ছে আজকের এ নবধ্বনি। যেখানে খুঁজে পাওয়া যাবে একটু আরাম; সান্ত্বনাবাক্য এবং প্রেরণার চক্রবর্তী ঘূর্ণন-শক্তি।

হ্যাঁ, কথা এমনই। ২০১৩'র প্রয়োজনের সময়গুলোতে মুফতী ফজলুল হক আমিনী রহঃ.-কে হারানোর সংবাদ বুকে নিয়ে রোজ রাতে ছেলেটি যখন কাঁদে, নবধ্বনির পৃষ্ঠাগুলো আওড়ানোর সীমাবদ্ধ জীবনে ছেলেটির হিফজখানার জীবন হয়ে ওঠে তার কাছে বড় ভয়ানক। সে ছোট্ট ছেলেটির বড় মুখ দিয়ে আজকের আমি স্বীকার করতে চাই–নবধ্বনি আমার মন-মস্তিস্কে চেতনা প্রজ্জ্বলনের প্রধান রূপকার। নবধ্বনির লালনীল প্রচ্ছদের সাথে মোলাকাত আমার সে-সময় থেকেই। আমিনী সাহেবের ছবির ভেতর দিয়ে; লক্ষ মানুষের চূর্ণ হৃদয়ের মাঝখান দিয়ে চলে যাচ্ছে একটি পালকি। নীরব নিস্তরঙ্গ হয়ে আছে পালকির ভেতর শুয়ে থাকা দ্রোহের মিনার। বস্তুত আমার সে-সময়কার নিঃসঙ্গ জীবনে চিন্তার পথ খুঁজে পেতে যখন হণ্যে হয়ে ঘুরছি আমি, পাতায় পাতায় সোনা-ঝরানো নবধ্বনি তখন আমার কিছুকালের শ্রেষ্ঠ বন্ধুর চরিত্রে পাশে বসে ছিল। আজকের এ বিকেলে নির্ভার নিরুদ্বিগ্ন মুখে সে হরফগুলোর কাছে আমি ঋণ স্বীকার করতে পারি। কৃতজ্ঞচিত্তে পাঠ করতে পারি শুকরিয়ার বাণী।

তারপর আরও নানা ঘটনা-উপঘটনা। নবধ্বনির সাথে সম্পৃক্তির বিস্তৃতি সময়ে সময়ে বাড়ছে আমার।

বাংলা ভাষার মতো এতো বেশি সংখ্যায় ক্রমান্বয়ে লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশের উদাহরণ, অন্যান্য ভাষায় খুব বেশি সম্ভবত নেই। বাংলায় বহু ছোটপত্রিকা জন্মায়, তাদের আয়ু হয় নেহাতই অল্প। আবার অনেক লিটল ম্যাগাজিন ক্ষীণকায় হিসেবে শুরু করে কলেবর বৃদ্ধি ঘটায়, হয়ে ওঠে তালেবর। স্রোত বহমান থাকে। সে স্রোতের ইতিহাস-ভূগোল সময়ের সঙ্গে মিলিয়েও যায়, পরবর্তীরা জানতেও পারে না। কিন্তু নবধ্বনি ততদিনেই সবার চাইতে ভিন্ন হয়ে প্রকাশ করতে পেরেছিল নিজেকে। শুরুর সময়ে পত্রিকার পদক্ষেপ ছোট হতে পারে, কিন্তু তাদের পায়ের ছাপ হয়ে গেছে সুগভীর। স্বকীয়তা বজায় রেখে, স্বাতন্ত্র্য, অসাধারণত্ব নিজ গতিতে বইয়ে বইয়ে পার করে ফেলেছে দীর্ঘ একটি যুগ।

> পাঁচ বছর যাপনে নবপ্রকাশের ছবিগুলো আমার সামনে আসলে আরও অনেক কিছু বলা যাবে। পাঠককে মূল্যায়ন করতে যেভাবে তৎপর নবপ্রকাশ, লেখককে সাধুবাদ জানাতে একটুও পিছপা নন তারা। কেবল নবধ্বনিতে দু কলম লিখে যে রাতে আমি রুফটপে বাফেটের স্বাদ গ্রহণের সৌভাগ্য অর্জন করছি, আমার মনে সেসময় বর্তমান সময়ের প্রকাশকদের কার্যকলাপের ভুরিভুরি দৃষ্টান্ত ভেসে উঠছিল।

তো যা বলছিলাম, একসময় দেখা গেল 'উন্মেষ'-সহ আমাদের হাতে হাতে ঘুরতে থাকা ম্যাগাজিনগুলোতে শোভা পাচ্ছে আরও একটি সংযোজনের বিজ্ঞাপন। নবপ্রকাশ। নবধ্বনি ও নবপ্রকাশ যেন একটি আরেকটির পরিপূরক। নবধ্বনির সাফল্যের সাক্ষর আমাদের মনে নবপ্রকাশকে ভিন্নভাবে দেখার জায়গা করে দিয়েছিল। কিন্তু বেখেয়ালি আমি সে-সময়কার সূচনায় সত্যিকার কোনো আকাঙ্ক্ষার বীজ বপন না করলেও কিছুদিন পর আমার মনে হয়েছিল এর কর্মক্ষেত্র সীমাবদ্ধ না। আশার ভাঙন দেখা গেল না সত্যি সত্যিই। চোখে পড়ল মুফতী ফজলুল হক আমিনীর জীবন ও সংগ্রাম। নানা প্রতিবন্ধকতার পরও সংগ্রহ করে ফেললাম। মূলত হুলস্থুল সময়ের পিঠে চড়ে এ পাঠ আমার মনে স্বর্গের

উপস্থিতিবোধ সৃষ্টি করতে পেরেছিল। এরই মধ্য দিয়ে শুরু হলো আমার জীবনে নবপ্রকাশের নবকালীন পাঠপর্ব।
এরপর সময় গড়ালো। চিন্তার পরিধিও ব্যপ্ত হতে থাকল। কিতাবখানার উঠোনে বসে মুতাহায়্যির মনের রসদ খুঁজতে খুঁজতে ক্লান্তিও চলে আসলো যেন। রাতের বেলার ম্যাসেঞ্জারে ঝড় উঠবার গতিতে নীরবে কেটে যেতে থাকল একেকটি রাত। এ উঠোনের মাঝে চন্দ্রপুকুরের যে শান-বাঁধানো ঘাটটি আছে, সেখানে বসে সাজা ভাইয়ের চাঁদনী রাতের জিকির শোনায় অভ্যস্ত হয়ে উঠলাম ইতিমধ্যেই। নবপ্রকাশ মেলে দিলো ডানা। নৌকোতে নদী না ভেঙে উড়ে যেতে চাইলাম নদীর ঠিক ওপারে।
দোহার মখমলে সড়ক থেকে একজন ধরে বসে থাকলেন রশি; শক্ত হস্তে। যোগসূত্র ঘটাবার প্রয়াসে এগিয়ে যাবেন তিনি, এ তার বুকভরা আশা।
কেটে গেল পাঁচটি বছর। নবপ্রকাশ এসে দাঁড়ালো শৈশবের ঠিক মধ্যিখানে।
উত্থান-পতনের দীর্ঘ মোকদ্দমা সামনে রেখে প্রসব করতে লাগল তাঁর সমস্ত অর্জন। অনুবাদ সাহিত্যের গতিপথ অনুসরণ করে সমৃদ্ধ হতে থাকল বাংলা সাহিত্য।
কিন্তু নবপ্রকাশের পাঁচটি বছরের এ চলন-বলনে কত 'কিল ও কউলে'র সমষ্টি আমাদের চোখে। সমালোচনা বলি আর প্রশংসার বাক্যে ভাসাই, সবই যুৎসই। চলমান সময়ের সাথে যোগসাজশ রেখে নবপ্রকাশ তার কর্মতৎপরতা চালিয়ে গেছে। তারুণ্যের আবেগের প্রতি যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে এমনসব অনুবাদে হাত দিয়েছে, যেন উতলা হৃদয়ে বোশেখের ঝড়। সেই সাথে যুক্ত ছিল নিছক ধর্মান্ধতার ফাঁস-দুড় থেকে মুক্ত কলাম। একরৈখিকভাবে বয়ান করে যায়নি তার ভাষাবর্ণনা। এর উপকারিতার প্রকাশ ঘটেছে তখনই, যখন শ্রেণী-প্রকারের ঊর্ধ্বে থেকে সব মহলের মানুষের কাছে পৌঁছে গেছে নবপ্রকাশের পুস্তকাদি। সেক্যুলার উৎসব অনুষ্ঠানের মধ্যেও দেখা গেছে কারও কারও চোখ গভীর দৃষ্টিতে পড়ে আছে gaddafi's Harem: The Story of a Young Woman and the Abuses of Power in Libia-এর মত গ্রন্থের অনুবাদে। কখনো Sharon and My Mother-in-Law-এর প্রতীক্ষিত বাংলা অনুবাদগ্রন্থকেও পড়ে থাকতে দেখা গেছে তাদের টেবিলে। নবপ্রকাশ এটা পেরেছে। হয়তো ইসলামি মূল্যবোধের প্রশ্নে অনেকেই এটাকে অতি উদারতার মাপকাঠিতে ফেলে সমালোচনার ঝড় তুলতে চাইবেন। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমি নবপ্রকাশের এই কার্যক্রমকে জবাবদিহির আওতায় না ফেলে বরং উৎসাহের কথা বলব। বলব ইসলামি সাহওয়াহর স্বপ্নটা বুকে রেখে হীলা ধরে এই মিশে যাওয়ার কথা; হোক সেটা খানিকটা সেক্যুলার টাইপ কিংবা নিছক ধর্মান্ধতার বিপরীতে আরেকটি পন্থায়।
পাঁচ বছর যাপনে নবপ্রকাশের ছবিগুলো আমার সামনে আসলে আরও অনেক কিছু বলা যাবে। পাঠককে মূল্যায়ন করতে যেভাবে তৎপর নবপ্রকাশ, লেখককে সাধুবাদ জানাতে একটুও পিছপা নন তারা। কেবল নবধ্বনিতে দু কলম লিখে যে রাতে আমি রুফটপে বাফেটের স্বাদ গ্রহণের সৌভাগ্য অর্জন করছি, আমার মনে সেসময় বর্তমান সময়ের প্রকাশকদের কার্যকলাপের ভুরিভুরি দৃষ্টান্ত ভেসে উঠছিল। লেখক ও ক্রিটিক মনযূরুল হকের কথানুযায়ী যদি বলি সময়ের অবস্থা, তাহলে ভুল করব না বোধহয়। তিনি লিখেছেন, 'বইয়ের লেখক যেন মসজিদের ছাপোষা ইমাম–প্রকাশক সে মসজিদের দোর্দণ্ড সভাপতি।'
এমনই এক হেলার শিকার যখন মেধা-শ্রম সব ঢেলে দিয়ে লেখার যোগ্যতা অর্জন করা লেখক শ্রেণী, নবপ্রকাশ তখন সবার ঊর্ধ্বে। সম্মানের যোগ্য মানুষকে সম্মানের আসনে আসীন করতে তার দ্বিধা নেই। নেই কোনো সংকীর্ণতা। প্রকাশনা শিল্পের এ জগতে নবপ্রকাশ যেভাবে গত পাঁচটি বছর আলো হাতে এগিয়ে গেছে, তার আগামীটাও হোক এর থেকে আরও আরও উজ্জ্বল। সাগর সেঁচা মুক্তোর মতো কুঁড়িয়ে এনে নবপ্রকাশের রাহনুমায়িতে অনূদিত হোক দুর্লভ সব পুস্তক। মজাদার ও ভিন্ন স্বাদের আভিজাত্যে উপকারী সব গ্রন্থ।

লেখক : শিক্ষার্থী, মাদরাসাতুল কাউসার আল-ইসলামিয়া, ঢাকা



সাংস্কৃতিক বিপ্লব একদিনে হয় না

মুহাম্মাদ ওয়াহিদুর রহমান

আমার স্মৃতিপটে খুব জ্বলজ্বল করে মুফতী আমিনী রহমতুল্লাহি আলায়হির বিদায় নেয়ার দিনটি, ১২-১২-১২ ইংরেজি বুধবার। কী শীতল ও উষ্ণ ছিল প্রভাতগুলো! কী বেদনা ও দগদগে ছিল প্রহরগুলো! বিভিন্নজন বিভিন্ন জায়গায় তাঁকে ঘিরে স্মৃতিচারণ করছেন। মূল্যায়ন করছেন। সাক্ষাৎকার দিচ্ছেন। তাঁর জীবনচরিত ও আন্দোলন-সংগ্রাম প্রসঙ্গে সুদীর্ঘ আলোচনা করছেন। তাঁর আতুলনীয় আচার-উচ্চরণ নিয়ে কেউ কেউ বিস্তারিত বলছেনও। ঠিক তখনই মুফতী আমিনী রহমাতুল্লাহি আলায়হিকে নিয়ে ছোট্ট একটি সাময়িকী দৃষ্টিগোচর হলো, নবধ্বনি। আমার কাছে নামটিও তখন একেবারে নব নব লাগছিল। আর এতো কৌশলী নাম, বাহ! খুলে দেখি আমাদের সালাহউদ্দীন জাহাঙ্গীর ভাই। তামীম রায়হান ভাইকে চিনি না। পরে নবধ্বনিতে তাঁর বিশেষ সাক্ষাৎকার ও 'সুলতান কাহিনি' পড়ে তাঁকে জানার চেষ্টা করি।

সেই সময়ে নবধ্বনির ভেতরে আশ্চর্য একটি শ্লোগান ছিল। হুবহু বাক্য-কাঠামো আমার মনে নেই, তবে অনেকটা এমন–

নবধ্বনি পড়ে কেউ আলেম হয়ো না,
নবধ্বনি পড়ে কেউ আবেদ হয়ো না,

নবধ্বনি পড়ে কেউ লেখক হয়ো না,
নবধ্বনি পড়ে কেউ সাহিত্যিক হয়ো না,
নবধ্বনি পড়ে পারলে একজন মানুষ হয়ো!
এই অসম্ভব সুন্দর তীর্যক শ্লোগানটি পড়ে নড়েচড়ে বসেছিলাম। বাব্বা, কী বলে নবধ্বনি!
সাময়িকীটি কলেবরে ক্ষীণ হলেও আমার কিশোর মনে নিদারুণ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। বোঝাই যাচ্ছিল মুফতী আমিনী রহমতুল্লাহি আলায়হির বিচ্ছেদ-বেদনায় বিবেকের ক্রমাগত কষাঘাত ও আবেগের সীমাহীন মর্মজ্বালায় দ্রুত উপস্থাপন করেছে। সাময়িকীর মান-মাত্রা সাধ্যমতো সুন্দর করার প্রয়াস ছিল। আমি সেই সংখ্যাটি দেখার সাথে সাথেই সংগ্রহ করে নিয়েছিলাম। কিন্তু পরে কীভাবে যেন সে আমাকে ছেড়ে কোথাও চলে গিয়েছিল। দীর্ঘ অনুসন্ধান করেও তাকে হৃদয়ের মখমল চাদরে মুড়িয়ে রাখতে পারিনি। আনন্দ-বেদনা এবং আলো-আঁধারির এ উষ্ণতার মধ্য দিয়ে মাসিক নবধ্বনির সাথে আমার পরিচয় গড়ে ওঠে।

দুই.

সালাহউদ্দীন জাহাঙ্গীর ভাইকে পড়তাম আমরা মনযূর সাহেবের রহমত থেকে।
সাহিত্য-প্রভাতের সেই উন্মেষকালে হৃদয়ের মণিকোঠায় তাঁর লেখাগুলো সাহিত্যচর্চার প্রতি একপ্রকার ভালোবাসার আবহ সৃষ্টি করত। নজরুলের 'রি রি ব্যথা' কিংবা রবীন্দ্রনাথের 'হঠাৎ বিরতি প্রদানে জগতের কোন জায়গায় যেনো একটু ছেদ পড়িয়াছে, কোথাও যেন একটু ছন্দপতন ঘটিয়াছে' মতো ভাবনাবোধক ও শব্দ-অনুপ্রাস-জাতীয় সাহিত্যচেতনা হৃদয়ের একান্ত আড়ালে সৃষ্টি হতো। ভাবনার সেই উপ্ত আগুন দিয়ে নিজ রচনার কত জায়গায় প্রদীপ ধরিয়েছি আরও কতজনের রচনার সলতেতে অনল ধার দিয়েছি তার কি ইয়ত্তা রাখা যায়!

তিন.

এরপর এক আলো-ঝলমল রাঙা প্রভাতে আসলো সাপ্তাহিক লিখনী। আমাদের আবদ্ধ স্বপ্নগুলো আরেকটু সাহসী হয়ে উঠল। কথার সাথে কলমের শক্তিগুলোও যেন একটু দুর্বিনীত হতে থাকল। সেখানে দেখি, শাহ ইফতেখার তারিক আছেন। গাজী আতাউর রহমান আছেন। আছেন জাগ্রত কবি মুহিব খান। তরুণদের মাঝে সালাহউদ্দীন জাহাঙ্গীর ভাই, মহিম মাহফুজ ভাই ও রোকন রাইয়ানসহ আরও অনেকে আছেন।
পাঠ্যক্রমের বিরতিতে লিখনী পড়তাম আর পর্যবেক্ষণ করতাম জগতের গতি ও সময়ের নক্ষত্র। এর কিছুদিন আগে সালাহউদ্দীন ভাইয়ের সম্ভাব্য বিশ খণ্ডে সমাপ্য 'গল্পের ফুলদানি' সিরিজের চারটি প্রকাশ হয়েছিল 'মাহফিল' থেকে। আশরাফ ভাই ও নিজাম ভাই একটি দিয়েছিলেন হাদিয়া। আর বাকিগুলো কোনো এক জম্পেশ সন্ধ্যায় কিনে ফেলেছিলাম।
সেই সিরিজের গল্পগুলো পড়ে পোস্টমর্টেম করে ভেতরের কলকব্জা খুলে পরখ করেছিলাম। এখন হয়তো কোনো এক অশান্ত বায়ুর অসংলগ্ন আঁচড়ে সেই সিরিজের পরবর্তী খণ্ডগুলো নিশ্চুপ হয়ে আছে। কোনো একদিন হয়তো 'এখানে আমার পিতারা ঘুমায়'-এর মতো ধূমকেতুর গতিতে আমাদের কালের যাত্রার নতুন মাত্রা যোগ করবে।

চার.

সময় তার গতির অনুসরণ করবে। এই স্বাভাবিক। একদিন চকচকে একটি বিজ্ঞাপন পেলাম, নবপ্রকাশ নামের নতুন এক প্রকাশনার। ঠিক সে সময়ে কার অনুভূতির খেরো খাতায় কী উদয় হয়েছে জানি না, তবে আমার খুবই আনন্দ লেগেছিল যে, আমাদের অঙ্গনে একটি মানসম্মত প্রকাশনার উদয়ন প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে। সেই যে আদম আলায়হিস সালামের জামানার প্রচ্ছদ আর নুহ আলায়হিস সালামের প্লাবনে ডুবে সেঁদসেঁদে কাগজে আমাদের লেখালেখি চলত তা দিয়ে কি আর যুদ্ধ জেতা যায়! বড়জোর প্রয়োজন মিটতে পারে। তবে আমি বলি না, সেগুলো দ্বারা কোনো উপকার সাধিত হয়নি। এও বলবার মতো মূর্খতা করি না যে, সেগুলো ফালতু ছিল। নিশ্চয় সে-সময়ের প্রযুক্তির সম্ভাব্য প্রকাশ ঘটিয়েই সেগুলোর প্রকাশ হয়েছে। কিন্তু সময়ের বাস্তবতা কারও জন্য একটুও বিরতি দেয় না যে! কারও জন্য ন্যূন্যতম অবকাশও

রাখে না। সময় এখন নানা বস্তুর গতির মাত্রা শেষ করে শব্দ ও আলোর গতি টপকে যাচ্ছে। বলি না, জগত-সংসারের সবকিছুর বিবর্তনের দায়িত্ব আমরা নিয়েছি। কিন্তু আপন বলয়ের ভাব ও ভালোবাসা, বক্তব্য ও সাধনা বিশ্বজগতের জন্য সামগ্রিকভাবে নিজেদের জন্য স্থায়ীভাবে উপস্থাপনের নতুনতর কৌশল রপ্ত করা তো হালের দাবি। দুনিয়াতে যদি আমরা সত্য হয়ে থাকি তাহলে মিথ্যার ধ্বজাধারীদের নগ্ন আস্ফালনের বিপরীতে সত্য উড্ডয়নের জন্য একটু অভিনব কৌশল তো গ্রহণ করতে পারি। বলা বহুল্য, সেটি নিশ্চয় শরিয়তের নির্ধারিত মানদণ্ড বজায় রেখে। মানদণ্ডের মর্যাদা বিসর্জন দেয়ার কথা কখনো বলিনি। কৌশলের আশ্রয়ে অপহৃত হবার কথা বলছি না। উপলক্ষের পেছনে পড়ে লক্ষ্য হারাবার বয়ান দিচ্ছি না।

যাহোক, আমাদের মুদ্রণ ও প্রকাশনা-জগতে শিল্প ও নন্দনতত্ত্বের ভারসাম্যতা আসবে, এ নিশ্চয় সুখের সংবাদ। প্রথমা কিংবা অন্যপ্রকাশের মতো হার্ডহিটার প্লেয়ারের সামনে অন্তত একটু পুষ্ট সৈনিকের দরকার। আমাদের নবি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে যতভাবেই বিশ্লেষণ করি না কেন, বিস্ময়ে বিমোহিত হয়ে যাই! পুলকে আশ্চর্যান্বিত হয়ে পড়ি। অবশ্যই মহান রব সত্য ইরশাদ করেছেন, ‘নিশ্চয় তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসুলের মাঝে রয়েছে উত্তম আদর্শ।’ [সুরা আহজাব : ২১] রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রতিটি কাজে ও পদক্ষেপে কী পরিমাণ রুচি ও বৈশিষ্ট্য প্রত্যক্ষ করি। তাঁর এমন কোনো কাজ ও আচরণ নেই যাতে রুচি, সৌন্দর্য, আদর্শের প্রকাশ নেই। ঠিক এ বিশ্লেষণ সামনে রেখে বলি, বই-পুস্তক হলো জ্ঞানের বাহন। মননের আহার্য। নীরবে ব্যক্তি-সত্ত্বা গঠনের অসম্ভব মন্ত্র। অতএব এর প্রকাশে ও প্রচারে একনিষ্ঠতা তৈরিতে যদি যত্ন আর রুচির পরিমার্জন না থাকে তাহলে সেটি আমাদের নিম্ন মানসিকতা ও নীচাশয় চরিত্রের প্রকাশক। পাশ্চাত্যের ধোঁয়াশায় চোখ ধাঁধিয়ে কেন আমরা নিজেদের অনুপম আদর্শ ভুলে যাব? ন্যায়ের পথে উচ্চাভিলাষ আর উন্নত মানসিকতা আমাদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য। আমাদের সাবলীল চরিত্র।

পাঁচ.

প্রতি সংখ্যায় বিশেষ কিছু নিয়ে সকলের ক্রয়ক্ষমতা সাধ্য করে নবধ্বনি যে নতুন মাত্রা যোগ করেছে তা

> প্রতি সংখ্যায় বিশেষ কিছু নিয়ে সকলের ক্রয়ক্ষমতা সাধ্য করে নবধ্বনি যে নতুন মাত্রা যোগ করেছে তা বিরল। কালি ও কলমের ইতিহাসে এ বিজয় অনন্য। কামনা করি, যেন নবধ্বনি কল্যাণ সাহিত্য ও সুস্থ সংস্কৃতিচর্চার বিকাশ ঘটায়। অপসাহিত্য ও অসুস্থ সংস্কৃতি সমাজে লোপ পেয়ে যায়। একজন পাঠক হিসেবে এই আশা করাটি হয়তো ঔদ্ধত্য হবে না যে, আমাদের অতি উন্নত শরিয়তের তুলাদণ্ড সমুখে রেখে ধীরে ধীরে মননশীল সাহিত্যের একটি নির্ভরযোগ্য আশ্রয় হয়ে যাবে নবধ্বনি। আমরা বিশ্বাস করি বিশুদ্ধ ইসলামচর্চার উৎস থেকে উন্নত ও কল্যাণ সাহিত্যের মাল-মসলা সংগ্রহ করা যায়।

বিরল। কালি ও কলমের ইতিহাসে এ বিজয় অনন্য। কামনা করি, যেন নবধ্বনি কল্যাণ সাহিত্য ও সুস্থ সংস্কৃতিচর্চার বিকাশ ঘটায়। অপসাহিত্য ও অসুস্থ সংস্কৃতি সমাজে লোপ পেয়ে যায়। একজন পাঠক হিসেবে এই আশা করাটি হয়তো ঔদ্ধত্য হবে না যে, আমাদের অতি উন্নত শরিয়তের তুলাদণ্ড সমুখে রেখে ধীরে ধীরে মননশীল সাহিত্যের একটি নির্ভরযোগ্য আশ্রয় হয়ে যাবে নবধ্বনি। আমরা বিশ্বাস করি বিশুদ্ধ ইসলামচর্চার উৎস থেকে উন্নত ও কল্যাণ সাহিত্যের মাল-মসলা সংগ্রহ করা যায়।

ছয়.

একে একে নবপ্রকাশের দৃষ্টিনন্দন বইগুলো যখন পাঠকের হৃদয় কাড়ছিল তখন আমিও সুযোগ করে সংগ্রহ করেছিলাম, 'প্রিয়তমা', 'হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল', 'গল্পগুলো ফিলিস্তিনের', 'সুপ্রভাত ফিলিস্তিন', 'রামাল্লা থেকে বলছি', 'দ্য ক্রসিং'। প্রতিটি বইই আপন জায়গায় প্রশংসার দাবিদার। তবে আবদারের সুরে বলতে চাই, আমাদের শাশ্বত বিষয়গুলো যেন তরল শিরোনামে উপস্থাপিত না হয়। এতে বিষয়টির মান-মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়। নিজস্থানে কাজটির বর্ণনাতীত মাহাত্ম্য থাকলেও শিরোনামের অন্তরালে তাতে যেন তরলতা চলে না আসে। আমরা সরলতাকে ভালোবাসি, কিন্তু তরলতাকে পছন্দ করি না। আশা করি দুটির পার্থক্য স্পষ্ট।

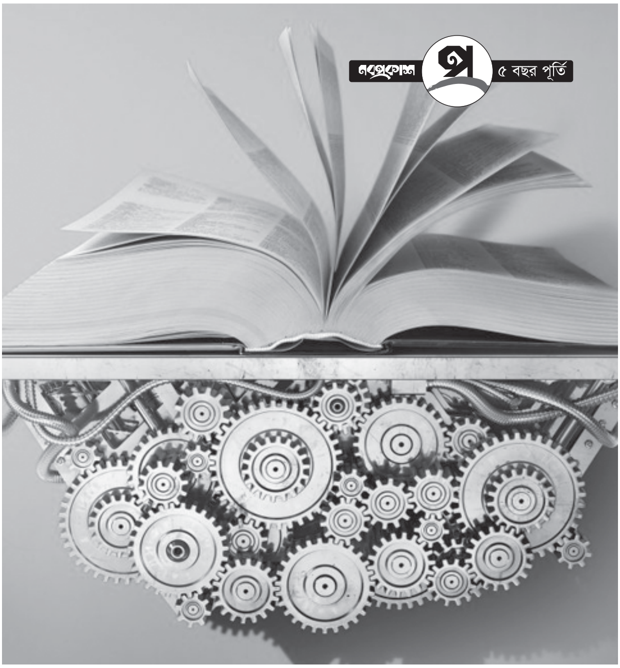
গত রমজানে একদল দরবেশ হজরতদের সুহবত-সান্নিধ্যে জল-জোছনায় ভেসে ভেসে-২ চাঁদপুর যাওয়ার প্রাক্কালে সালাহউদ্দীন জাহাঙ্গীর ভাইকে বললাম, 'আপনার হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল বইটি এতো ভালো লেগেছে যে, আমি নিজেই লেখককে এককপি উপহার দিতে চাই!' তিনি মজা করে বললেন, 'দেন! টাকা দেন! বাংলাবাজার গিয়ে নবপ্রকাশ থেকে কিনে নিজেকে নিজে উপহার দিয়ে দেবো!' কিন্তু এখনো যে বইটি কেন কিনে তাঁকে দিতে পারলাম না, তা ভেবে বেদনায় মুষড়িয়ে থাকি। আবার কোনো এক জোছনারাতে লেখকের সাথে সাক্ষাৎ হলে হাদিয়াটি পৌঁছানো যাবে। বইটি পরিচয়-সংকটে ভুগে এমন সকল তরুণের অবশ্য পাঠ্য। আমার এক পরিচিত বন্ধুকে উপহার দিয়েছিলাম। সে পাঠ করে যারপরনাই আনন্দিত হয়েছিল।

সাত.

ইতিহাস বিষয়ে নবপ্রকাশের ভীষণ আগ্রহ আছে তা বলা লাগে না। তাদের প্রকাশিত বইগুলো দেখলেই বিষয়টি অনুধাবন করা যায়। তবে মনে রাখার মতো একটি কথা হলো, ইতিহাসের পাতা থেকে সত্য তুলে আনতে হয়, মিথ্যা নয়। বাস্তবতার অনুসন্ধান করতে হয়, কল্পনার নয়। সাহিত্যের প্রয়োজনে ভিন্ন কোনো গোত্রের রচনা পাঠকের দোরগোড়ায় হাজির করতে হলে পাদটীকায় কিংবা বিশেষ দ্রষ্টব্যে অথবা লেখক-পরিচিতি-পর্বে তাঁর ভ্রান্তিগুলি তুলে ধরতে হয়। আমাদের সালাত, সিয়াম, সাহিত্য, ইবাদত, মুআমালাত, মুআশারাত, লেখালেখি, সাংবাদিকতা, ইতিহাসচর্চা ইত্যাদি জীবনঘনিষ্ঠ সবকিছু একমাত্র জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য। তাই এমন কিছুই চাই না যা আমাদের পরকাল বরবাদ করে দেয়।

ইতিহাসবিমুখতার এই খরার যুগে নবপ্রকাশ যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তা অতীব সাধুবাদ পাবার যোগ্য। কামনা করি, পাঠক আমাদের সেই গৌরবময় ইতিহাস-ঐতিহ্যের সুবৃহৎ সরোবরে প্রাণভরে অবগাহন করুক। আমাদের হারানো চৈতন্য ও বোধোদয় ফিরে আসুক। কারণ, সাংস্কৃতিক বিপ্লব একদিনে আসে না। জাতীয় চরিত্র ও মৃত্তিকার স্বভাব একদিনে বদলে যায় না। অতএব জাতিসত্তার বিনির্মাণে এমনসব গঠনমূলক বইই প্রকাশিত হোক যাতে চিন্তার খোরাক, আত্মার খোরাক, চরিত্রের খোরাক, চৈতন্যের খোরাক ইত্যাদি সব মিলে থাকে। নিছক কল্পবিলাসী সাহিত্য ও শব্দ-বারুদ কিংবা বাক্য-বিস্ফোরণ-জাতীয় রচনা স্তূপে কী লাভ হবে?

লেখক : শিক্ষার্থী, উচ্চতর আরবি ভাষা ও সাহিত্য, মাহাদুশ শায়েখ ফুআদ লিদ্দিরাসিল ইসলামিয়া, কদমতলি, ঢাকা



নবপ্রকাশ : সচেতন পাঠকের গন্তব্য

আজিজ মুনতাসির

আমাদের জীবনের অন্যতম একটি অনুষঙ্গ পড়া। ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় আমাদের পড়তে হয়। বিদ্যালয় থেকে শুরু হওয়া পড়া কারও কারও ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকে অফিসের ফাইলপত্র এবং দৈনিক পত্রিকা পড়ার মধ্যে। ভাগ্যবান কেউ কেউ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষালাভের পরও বই পড়েন। প্রমথ চৌধুরীর মতে এই পড়াই মানুষকে আসল শিক্ষিত করে তোলে। তাই পাশ করা আর শিক্ষিত হওয়া কখনো এক না।

বই পড়ে শিক্ষিত হওয়ার এই পথ অনেক বেশি বিস্তৃত। মহাসাগরের চেয়ে বেশি তার ব্যাপ্তি। সেই মহাসাগরে পাঠককে একটা খড়কুটোর সাথে তুলনা করা যায়। বই পাঠককে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায় নানা পথে। নিজের অজান্তে একটা মত গড়ে ওঠে পাঠকের ভেতর।

বই পাঠক এবং লেখকের মধ্যে এক অদৃশ্য বন্ধন সৃষ্টি করে। তাঁদের মাঝে সেতু হিসেবে কাজ করে তৃতীয় একজন। তিনি প্রকাশক। ছাপার বইয়ের প্রচলন শুরু হবার পর থেকে প্রকাশকই বই পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন পাঠকের কাছে। তাই জ্ঞানচর্চায় প্রকাশকের অবদান অস্বীকার করা যায় না।

মুসলমানদের সোনালি যুগ বলে আমরা যে সময়কে নিয়ে গর্ব করি সে সময়ে খলিফারা ভূমিকা পালন করেছিলেন প্রকাশকের। তখন

ছাপাখানা তৈরি হয়নি। হাতে লিখে কপি করা হতো পাণ্ডুলিপি। আব্বাসি খলিফারা লেখক বা অনুবাদকদের পারিশ্রমিক দিতেন। তাঁদের বদান্যতায়ই সেসময়ে বাগদাদে গড়ে উঠেছিল জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিশাল সম্ভার।

তাই, যদি বলি, প্রকাশকের ভূমিকা লেখকের চেয়ে কম নয় তাহলে অত্যুক্তি হবে না। কারণ প্রকাশক লেখককে প্রতিষ্ঠিত করেন। পাঠকের কাছে লেখকের চিন্তাকে মলাটবদ্ধ করে পৌঁছে দেন। প্রকাশক শুধুই ব্যবসায়ী নন, জ্ঞানের বিস্তারে তিনিও সমান ভূমিকা পালন করেন।

লেখকের মতো প্রকাশকেরও আদর্শ থাকতে পারে। যদিও আমাদের বাজারে আদর্শ-বিবর্জিত লেখক, প্রকাশক এবং পাঠকের সংখ্যাই বেশি। তবু আদর্শবানদের সংখ্যা নেহায়েত কম নয়।

লেখক, পাঠক এবং প্রকাশক–এই তিন মাত্রার সম্পর্কে কে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন তা আসলে আপেক্ষিক বিষয়। কখনো লেখক স্বাধীনভাবে লেখেন, সাহসী প্রকাশক তা প্রকাশ করে ছড়িয়ে দেন মানুষের মাঝে। কখনো লেখক পাঠকের তাবেদার হন। পাঠকরা যা খোঁজে তাই লেখেন। লোভী প্রকাশক তা ছাপেন। তাতে প্রচুর অর্থাগম হয়। কিন্তু প্রকৃত লাভ কিছুই হয় না।

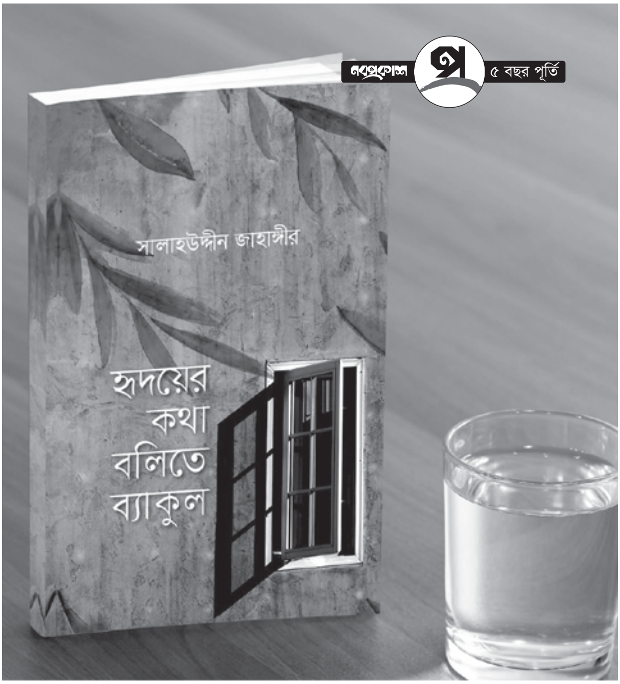
বইকে অনেকে বিনোদনের মাধ্যম মনে করেন। কিছু বই বিনোদন দিলেও তা নিছক বিনোদন নয়। তার মধ্য দিয়েও একটা সাংস্কৃতিক বিকাশ ঘটে।

প্রকাশকের পর পাঠক কতটা গুরুত্বপূর্ণ সে কথা বলি। একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে আমরা বলতে পারি, পাঠকই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। কারণ পাঠক না পড়লে লেখকের লেখা বেকার থেকে যায়। প্রকাশকও বই ছাপাতে পারেন না। সবমিলিয়ে বলা যায়, বইয়ের পৃথিবীতে লেখক, প্রকাশক এবং পাঠক–কেউই গুরুত্বহীন নন।

পৃথিবীতে নানা রকম পাঠক আছেন। কিছু পাঠক এমন, লেখকরা যা বলেন তা নির্দ্বিধায় তাঁরা মেনে নেন। কিছু পাঠক আছেন, নিজের জ্ঞান ও চিন্তা-ভাবনার বাইরে গিয়ে তাঁরা ভাবতে অভ্যস্ত নন। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁদের নিজেদের মধ্যে একটা মত তৈরি হয়। বইয়ের মধ্যে তাঁরা সে মতের সমর্থন খোঁজার চেষ্টা করেন। খুঁজে না পেলে আশাহত হন।

কিন্তু সত্য কথা হলো সাহিত্য আবেগ দিয়ে চললেও জ্ঞান-বিজ্ঞানে আবেগের কোনো স্থান নেই। জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হয় প্রাপ্ত তথ্য এবং যুক্তি-তথ্যের মাধ্যমে। তাই কোনো কিছু আবেগের বিরুদ্ধে গেলেও তা মেনে নেওয়ার মতো সাহস এবং মানসিকতা থাকা একজন সচেতন ও সাহসী পাঠকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। প্রাপ্ত তথ্য ও যুক্তি-তথ্যে যদি গড়মিল এবং সমস্যা থাকে, সে ব্যাপারে আবেগের ঊর্ধ্বে উঠে যৌক্তিক সমালোচনা করা তাঁর কাজ। একজন সচেতন ও বিজ্ঞ পাঠক কখনো কখনো লেখকের চেয়েও প্রজ্ঞাবান এবং জ্ঞানী হতে পারেন। পাঠক অনেক অনুসন্ধিৎসু হতে পারেন। তাঁর চিন্তা ও জ্ঞানের পরিধি ছাড়িয়ে যেতে পারে স্বয়ং লেখককেও। লেখকের নানা বই নিয়ে তিনি জ্ঞানগর্ব সমালোচনা করতে জানেন। কিন্তু এমন পাঠকের সংখ্যা নিতান্তই অল্প। বইয়ের ব্যাপ্তি ও পাঠের মান বাড়াতে এমন সচেতন পাঠকের বিকল্প নেই। যতদূর জানি, পথচলার শুরু থেকেই নবপ্রকাশের লক্ষ্য–এমন সচেতন পাঠক তৈরি করা।

দেখতে দেখতে নবপ্রকাশের প্রায় পাঁচ বছর পেরিয়ে গেল। নবপ্রকাশ ইতিমধ্যে সচেতন পাঠকদের গন্তব্যে পরিণত হয়েছে। পাঁচবছর পূর্তি উপলক্ষে নবপ্রকাশের জন্য রইল অনিঃশেষ শুভকামনা।



হৃদয়ের কথা শুনিতে ব্যাকুল

সালমান সাদ

বইয়ের নাম 'হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল'। নবপ্রকাশের বই। প্রচ্ছদে বাঁশবনের শ্যামল ছায়া। পাতারা। একটা জানালা আধখোলা, বিকেলের নরোম রোদের ঘ্রাণ পৌঁছে যাচ্ছে বাতায়নপথ। হয়তো-বা জানালাটির ওপাশেই লেখকের শিথান, একটা কলম খসখস কালি খসিয়ে যাচ্ছে হৃদয়ের অমল ধবল জোৎস্নার প্রান্তরে।

হঠাৎই পদ্মাপাড়ে আমার হারানো গ্রামে ফিরবার একটা মওকা এসছিল দিনদুয়েকের জন্য, ব্যাকপ্যাকে গিয়ে চুপচাপ সিঁধোলো বইটি। সফরে, এইরকম দুই-একটা বই থাকেই সঙ্গে। এই বইটি সেবারের ধ্যানযাত্রায় অংশ নেয়ার কারণ, কিছু কিছু বই থাকে, যেগুলোর বিষয়বস্তুতে এমন সুর ও স্বর প্রবহমান যে, তা অনুরূপ অন্তস্থ করতে হলে পাঠের জন্যেও একপ্রকার বিশেষ পরিপার্শ্ব ও অবস্থা/অবস্থান দরকার পড়ে পাঠকের জন্য; লেখকের জন্য তো বটেই।

সেখানে কোথায় ব্যস্ততা! শুধু বিঘ্নতাবিহীন অফুরন্ত নিঝুম নিস্তরঙ্গতা, সেখানে শুধু বাতাসের ফিসফিস আর বিলের ঝিমঝিম, আকাশে থির নক্ষত্ররাজির মতো অগণন নিরিবিলি কথামালা কেবল।

বইটি সে বিচার থেকে পুরোপুরি যোগ্য।

যেকোনো রচনার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে লেখক বা কথকের যে বলবার ভঙ্গিটি বা বক্তা হিসেবে বয়ানের যে অবস্থানটি, তা গুরুত্বপূর্ণ। এই বইটায় একজন সালাহউদ্দীন জাহাঙ্গীর, জীবন ও তারুণ্যের নাগরিক কোলাহল ও মিছিল থেকে ফিরে বটের শীতল উঠানে বসে উৎসাহী এক অনুজের মনের একান্তে খুলে দিচ্ছেন ভূত অভিজ্ঞতার ভাঁজ, ব্যাকুল অগ্রজের কাতর বর্ণনার অক্ষর–বুনন ছাপিয়ে দুধের মতো বলক দিয়ে উঠছে স্নেহ প্রেম কোমলতা শুভাকাঙ্ক্ষার সৌরভ।
এই বইটাতে অনেক কথা বলা আছে। এর মধ্যে সমস্ত বাক্যের সারবাক্য হিসেবে বলা যায়, হৃদয়ের ঐশ্বর্যের প্রতি উদাত্ত আহ্বান।
জীবন জগত পৃথিবী–এই যে মানুষের জন্য বিপুল বিস্ময়ের পসরা সাজিয়ে বসে আছে, তার দিকে মুগ্ধভাবে তাকাতে শেখা। কত তারা ঝলমল করে আকাশের জলসায়, অনন্ত বয়ে চলার মধ্যে নদীর খলবল কথকতা, এই যে ধানক্ষেতের ভেতর বিকেলের বাতাস কী সুরভি নিয়ে আসে, অবিরাম বৃষ্টির মধ্যে বুনোহাঁসের ঝাঁক উড়ে যাচ্ছে এক হাওড় থেকে অন্য হাওড়ে–পৃথিবীর এতসব বিস্ময়কর সৌন্দর্য এত প্রাণ এত সুরছন্দ বেকার পড়ে আছে, শুধু এসব দেখার জন্যেও কাউকে না কাউকে তো চাই। লেখক বলছেন, অফুরন্ত বিমুগ্ধতার সঞ্চয়ের কথা, মহৎ থেকে তুচ্ছ সকল সৌন্দর্যে বিস্ময়ের উপাদানগুলো বাঁচিয়ে রেখে অস্থির সময়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলা।

> অবশ্য বইতে লেখকের বুদ্ধিবৃত্তিক চমৎকারিত্বের চেয়ে হৃদয়বৃত্তিক প্রয়াসটা উদ্দিষ্ট ও স্পষ্ট। আর চিন্তার স্তর যেহেতু অধিকাংশেরই এক না, এবং টার্গেটেড অডিয়েন্স এমন–যাঁরা জীবনের খালে নতুন জোয়ার-ডাকা বয়সী, ভাবতে চাইবো যে চিন্তার বেশি বিস্তার না করাটা লেখকের সচেতন প্রয়াস।

নাগরিক মানুষ যতদূরই এগোক, খোসার পর খোসা ছাড়িয়ে তার খুব ভেতরে সুপ্ত আদিম যে মানুষের ভিত্তি, ক্ষীরের মতো গাঢ় মাটির সে কোমল তো তাকে অহর্নিশ ডাকবেই।
মনের খরজমিতে সুখদ বৃষ্টি নামালেও, আলোচ্য বইতে লেখকের চিন্তক হিসেবে যে অবস্থানটি, তা আমাকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। লেখকের নিজের বেশকিছু অভিমত মাঝেমধ্যে এমন জোরালো ভঙ্গিতে প্রকাশ হয়েছে যে তাকে অভিমত নয় বরং সিদ্ধান্ত প্রদান বা একমাত্র সমাধান হিসেবে ঘোষণা মনে হয়েছে।
কিছু আলাপ আমার বোধহয়, এরকম মোটাদাগে ব্যাপারটাকে খালাস করে না দিয়ে চিন্তার আরও সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ, আরও গভীর দৃকপাত ও আলোচনার দাবিদার ছিল।
যেমন ধরা যাক, বইয়ের একেবারে শেষের প্যারায় বলা হচ্ছে, হাজার পাতা লিখো, এক লাইনও যাতে ইসলামের বিপক্ষে না যায়। এখানে কথা হলো, বিপক্ষে যাওয়াটা আসলে কী? কোথায় বিপক্ষ? বিপক্ষতা ব্যাপারটা কি এতই বিস্তৃত ও চঞ্চলমতি যে হাজার পাতা লিখলেও বিপক্ষতা ব্যাপারটা বারবার সামনে এসে পড়বে আর একে বারবার মুকাবিলা করতে হবে? ব্যাপারটা হলো বিষয়বস্তুর। একজন যদি বিভিন্ন ধর্ম, সমাজ বা এ সংক্রান্ত বিষয়ক প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখতে বসে,

তার ক্ষেত্রে তথ্যপ্রদান ও প্রমাণে এই পক্ষ আর বিপক্ষতা আসাটা স্বাভাবিক। কারণ এখানে মুখোমুখি ময়দানে দুই বা ততোধিক মত বিরাজমান।

কিন্তু একজনের বিষয়ই যদি অন্যধারায় হয়, তার বিষয় কবিতা বা কথাসাহিত্য, যেখানে কোনো চিন্তা বা স্পষ্ট উদ্দেশ্যই মূর্ত থাকে না, থাকে অন্য একটা বিস্তৃত আকাশ, খোলা মাঠ, হয় অন্যরঙের সব আলাপ বয়ান, থাকে নন্দনতত্ত্ব, থাকে জীবন, সেখানে পক্ষ বিপক্ষতা ব্যাপারটাই তো এক্সিট কওে না। বলবেন জীবন থেকে কি ধর্ম আলাদা? তা নয়, জীবন যাপনের বর্ণনার সঙ্গে যে ধর্মের অনুষঙ্গ আসে, তা তো ওতপ্রোত, একটাই পক্ষ, বিপক্ষ কিছু নেই। যেমন 'আজানের সুরে সুরে জনপদে সন্ধ্যা নামিয়াছে / মন্দিরে পূজোর ঘণ্টা জানান দিতেছে যে সন্ধ্যা নামিতেছে'–এইসব বর্ণনা ধর্মের পক্ষতা বা বিপক্ষতা নেতিবাচক কিছু নির্দেশ করছে না, কাহিনির পরিবেশভেদে বর্ণনার জনপদে তো হেরফের হয়ই।

এত আলাপে এটাই বোঝানো যে, লেখকের বলা ওই হাজার পৃষ্ঠা লেখো কিন্তু ইসলামের বিপক্ষে এক বাক্যও যাতে না যায়, এখানে হাজার পৃষ্ঠায় অনেক রকম বিষয়বসস্তুরই সন্নিবেশ থাকতে পারে, কিন্ত ধর্মের পক্ষতা-বিপক্ষতা ব্যাপারটা কিছুমাত্র বিষয়ের সাথে যেতে পারে। সুতরাং সমষ্টির সমান্তরালে একটা ফরদকে এভাবে বড় করে দেখানো ও বইয়ের চূড়ান্ত বক্তব্য হিসেবে ধারণ করাটা বেশ স্থূল মনে হয়। এটা নতুন পাঠকের মনে কেমন সংকীর্ণ বাঁকের দিকে নির্দেশ করে।

কলেবরবৃদ্ধির ভয় না থাকলে এরকম বারংবার খটকার জায়গাগুলো সবিস্তারে আলাপ করা যেত, তা যেহেতু হচ্ছে না, আরেকটা ছোট উদাহরণ দেয়া যেতে পারে।

অর্থ উপার্জনের নেশায় সুন্দর জীবনের সর্বস্ব বিসর্জন–এই ব্যাপারটাকে তিরবিদ্ধ করতে লেখক টাকাপয়সা বস্তুটাকেই কেমন অচ্ছুৎ-অপ্রয়োজনীয় দুর্ভাগ্যজনক হিসেবে প্রতীয়মান করতে চেয়েছেন। একজন মাঝির গল্প লেখক বলছেন উদাহরণস্বরূপ, যে কিনা সকালে কিছুক্ষণ কাজ করে সারাদিন জীবন উপভোগ করে এবং সে জীবনে সুখের জন্য আরও টাকাপয়সা কামানোর সুযোগটা নিতে চায় না। ব্যাপারটাই আসলে অবাস্তব। একজন জেলের জীবন কখনও সকালে একটু মাছ ধরে শেষ না, তারা দিনের পর দিন ঘন্টার পর ঘন্টা নদীতে সমুদ্রে নোনাজলে রোদে ভাসে, ঢেউয়ের সঙ্গে ঝড়ের সঙ্গে ভাগ্যের সঙ্গে নিত্যনৈমিত্তিক যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। এতকিছুর পরও তাদের ন্যূন্যতম প্রয়োজন ও মানবাধিকারগুলোও ভালোভাবে পূরণ হয় না এই বর্তমান যুগের পুঁজিবাদী বৈশ্বিক অর্থনৈতিক করুণ বাস্তবতায়। লেখক যেই জেলের কথা বলছেন তা সম্ভব হয়তো ছিল আদিম যুগে, কিন্তু এইযুগে এসে সে গল্প শোনানোটা কেমন যেন মাদরাসার হুজুরদের সাহাবিদের ত্যাগের গল্প শুনিয়ে ছাত্রদেরকে–আরে দাঁত কামড়ে পড়ে থাকো, রিজিক পায়ের সামনে এসে পড়ে থাকবে–র মতো কথা। অর্থই সুখ নয় এটা যেমন জোরের সঙ্গে বলা হয়েছে, তার সঙ্গে সঙ্গে অর্থ যে আবার সুখের একটা অনুষঙ্গও, এই কথাটাও সমান জোরের সঙ্গে বলাটাই শ্রেয় বলে মনে করি।

অবশ্য বইতে লেখকের বুদ্ধিবৃত্তিক চমৎকারিত্বের চেয়ে হৃদয়বৃত্তিক প্রয়াসটা উদ্দিষ্ট ও স্পষ্ট। আর চিন্তার স্তর যেহেতু অধিকাংশেরই এক না, এবং টার্গেটেড অডিয়েন্স এমন–যাঁরা জীবনের খালে নতুন জোয়ার-ডাকা বয়সী, ভাবতে চাইবো যে চিন্তার বেশি বিস্তার না করাটা লেখকের সচেতন প্রয়াস।

বলার অপেক্ষা রাখে না, বইটি ভীষণ জরুরি মনে হয়েছে আমার কাছে–আমাদের জন্যেই। জীবনের যাপিত এক নাজুক সময়–বয়ঃসন্ধি, কৈশোর, তারুণ্য, অভিজ্ঞাতহীন নতুন গড়ে ওঠা মনন ও বোধে জগতের নানান সংকট-বিপন্নতা যখন জাঁকিয়ে নামে, নানান মিথ্যা হাতছানি ডাকতে থাকে অন্ধকার গলির মুখে, ফাঁপা ও সারশূন্য জৌলুস যখন গন্তব্যপথকে করে দেয় দোদুল্যমান, নিথুয়া পাথারে একাকী মনের পোড়া ও দহন-দুষ্কালের দিবানিশিতে এই বইটি যেন মাথায় বোলানো স্নেহের হাত, ভরসার স্পর্শ, সাহসের শ্লোগান, মিথ্যা-বেসাতির পর্দা উদোম করা আলো, উদ্যমের বারুদভরা ঘুমন্ত বিস্ফোরক।



নবপ্রকাশের সঙ্গে সাফল্যের পাঁচটি বছর

মুহাম্মদ ইসহাক খান

নবপ্রকাশের সঙ্গে আমার পথচলার শুরু ২০১৫ সালে, নবপ্রকাশের আনুষ্ঠানিক যাত্রালগ্নেই। তখন লাইব্রেরি আর প্রকাশনার বিষয়টি ঠিক বুঝতাম না। যে দোকানে বই বিক্রি করে সেটাকে লাইব্রেরি বলা হয় জানতাম, কিন্তু প্রকাশনী বা প্রকাশনার বিষয়টার সঙ্গে আদৌ পরিচিত ছিলাম না। পরে জানতে পারলাম, প্রকাশনা হচ্ছে এমন প্রতিষ্ঠান যারা বই উৎপাদন করে বাজারে অন্যসকল লাইব্রেরিয়ানের কাছে পাইকারি বিক্রি করে। এতটুকু ধারণা নিয়ে নবপ্রকাশের সাথে আমার কাজের সূচনা।
নবপ্রকাশে যোগ দিতে প্রথম যখন বাংলাবাজার আসি সেটা ছিল আমার জীবনে প্রথম বাংলাবাজার আসা। এসএসসি পরীক্ষার পর চিল্লার জামাত শেষ করে কাকরাইলে অবস্থান করছিলাম। সাথে থাকা বাটন মোবাইলটা অন করে কল করে জানতে পারলাম আমার জন্য চাকরির অফার এসেছে। আলহামদুলিল্লাহ! যদিও এটা আমার জীবনের তৃতীয় চাকরি, তারপরও সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছিলাম। আব্বুর চাকরির সুবাদে জন্মের পর থেকে চট্টগ্রামে বসবাস আমার। একপাশে কর্ণফুলি নদী অন্য পাশে সমুদ্র, এর মাঝে চট্টগ্রামের শেষ প্রান্ত–পতেঙ্গা। আম্মু-আব্বু, বন্ধু, পরিচিত রাস্তা-শহর–সবকিছু স্ব স্ব স্থানেই বহাল তবিয়তে, আমিই কেবল ঘরহারা হবো? চট্টগ্রামের মায়া ত্যাগ করে, বন্ধুদের সঙ্গে হাসি-আড্ডা-ঘোরাঘুরি ছেড়ে অচেনা এই শহরে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারব কি না, ভাবছিলাম। সবেমাত্র চিল্লা থেকে এসেছি, তাই ভালো কিছু পাওয়ার আশায় অনেক কিছু ত্যাগ করার একটি

চিন্তা মনে গেঁথে গিয়েছে। তাই সিদ্ধান্ত নিতে দেরি হলো না।
নবপ্রকাশে যোগ দিতে বাংলাবাজার যেদিন প্রথম এলাম, মানুষজনকে জিজ্ঞেস করে করে ইসলামী টাওয়ার খুঁজে বের করলাম। মার্কেটের প্রথম তলায় একেবারে শেষের দিকে গিয়ে পেলাম নবপ্রকাশ। দোকান নম্বর ২০। দেখেই বুঝা যাচ্ছে একেবারে নতুন প্রতিষ্ঠান। নতুন ডেকোরেশন। পুরো ডেকোরেশন জুড়ে কেবল দুটি বই সাজানো। 'তবুও আমরা মুসলমান' আর 'শাহজাদা'। একটি তাকে 'তবুও আমরা মুসলমান' অন্য তাকে 'শাহজাদা'। এভাবে পুরো দোকানটা সাজানো। দুইটি বইয়েই একজন লেখকের নাম শোভা পাচ্ছিল। তামীম রায়হান। নামটি পরিচিত মনে হচ্ছে, কোথায় যেন পড়েছি তাঁর লেখা, মনে করতে পারলাম না। খানিকপর জানতে পারলাম নবপ্রকাশের মূল কর্ণধার তিনিই। মূলত লেখক, লেখালেখির সুবাদে নেমেছেন প্রকাশনা ব্যবসায়।
এখনও অনেকে আমাকে এই প্রশ্নটি প্রায়ই করেন–নবপ্রকাশের মালিক কে? প্রশ্নের উত্তর তাঁরা পেয়েছেন আশা করি। নবপ্রকাশে পাঠক-ক্রেতা যাঁকে স্বমহিমায় বসে থাকতে দেখেন, তিনি আসাদুল্লাহ খান। তাঁর সঙ্গে তামীম রায়হানের ছোটবেলার হিফজখানা থেকে বন্ধুত্ব। সেই বন্ধুত্ব কর্মজীবনে এসেও অটুট আছে। ২০০৭ সালে মাসিক নবধ্বনি প্রকাশ করার মধ্যদিয়ে দুই বন্ধু প্রকাশনাশিল্পে জড়ানোর স্বপ্ন দেখেছিলেন। নবপ্রকাশ সেই স্বপ্নেরই বাস্তবায়ন। তামীম রায়হান দেশের বাইরে কর্মরত, তাই নবপ্রকাশের ব্যবস্থাপনাগত কাজ আঞ্জাম দেন আসাদুল্লাহ খান।

নবপ্রকাশে পাঁচটি বছর

চোখ বন্ধ করলে মনে হয়, এই তো সেদিন মাত্র নবপ্রকাশের যাত্রা শুরু হলো। অথচ কেটে গেছে পাঁচটি বছর। কথায় আছে না, ভালো সময়গুলো অতিবাহিত হতে টের পাওয়া যায় না। আমার সাথে হয়তো এমনটা হয়েছে। অনেকে যখন আমাকে জিজ্ঞেস করে যে, ভাই, বাংলাবাজার কোথায় আছেন? কোন প্রকাশনীতে? যখন বলি নবপ্রকাশে আছি, তখন তাদের মুখের হাসি দেখে মনে হয় আমি অনেক ভালো অবস্থানে আছি। এর কারণ, নবপ্রকাশের চিন্তা-ভাবনা অন্য সকল প্রকাশনী থেকে অনেকটা ভিন্ন। আমি নবপ্রকাশে আসার পর নতুন নতুন অনেক প্রকাশনীর যাত্রা দেখেছি, এর মধ্যে এমন অনেক প্রকাশনী আছে যাদের প্রকাশনার যাত্রা মাত্র একবছর, কিন্তু বইয়ের সংখ্যা ১৫ থেকে ২০টি ছাড়িয়ে গেছে। সেই হিসেবে নবপ্রকাশের বইয়ের সংখ্যা ৭০ থেকে ৮০ ছাড়িয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু নবপ্রকাশের বর্তমান বইয়ের সংখ্যা সাকুল্যে ৩৫টি। আমাদের প্রকাশনার অগ্রগতির কমতির কারণে যে বইয়ের সংখ্যা এতো কম, বিষয় কিন্তু এমন না। বরং নবপ্রকাশের চিন্তাগত স্বাতন্ত্র্য এখানে মূল কারণ। নবপ্রকাশ বাজারে বর্তমানে আছে–এমন কোনো বই প্রকাশ করতে আগ্রহী নয়। আবার কোনো বই প্রকাশ করলে সেটা বাজারে দেদারসে চলবে–এমন কোনো টার্গেটও নবপ্রকাশের নেই। বিজ্ঞ লেখকদের ধরে বই নিতে পারলে বইটির সাথে সাথে নবপ্রকাশেরও সুনাম অর্জন হবে–এমনও কোনো লক্ষ্য নেই। আবার ইতিহাস, গল্প, উপন্যাস–এই তিন ক্যাটাগরির বাইরের বই প্রকাশেও তেমন কোনো আগ্রহ নেই। ফলে নবপ্রকাশের বইয়ের সংখ্যা প্রতিষ্ঠানের বয়সের বিচারে এতো বেশি না। তবে ভালো লাগে, নবপ্রকাশ নতুন এবং তরুণ লেখক-অনুবাদকদের বেশি গুরুত্ব দেয়। আবার তরুণ পাঠকদের কথা চিন্তা করে বই প্রকাশ করে। প্রকাশ কারার মতো ভালো বই পেলে সেটা প্রকাশ করে, যদিও তার পাঠকসংখ্যা তত বেশি না হয়।
পাঁচ বছরের বই বিক্রির অভিজ্ঞতা থেকে বললে, তরুণদের কাছে নবপ্রকাশ অন্যরকম এক আবেগের মতো। প্রায়সময় আমি যখন বই বিক্রি নিয়ে পাঠকের সাথে কথা বলি তখন নবপ্রকাশ নিয়ে তাদের ভালোলাগার প্রকাশ এবং পরামর্শ আমাকে অনেক বেশি আনন্দিত করে। তাদেরও অনেক আগ্রহ–নবপ্রকাশ ব্যতিক্রমী প্রকাশনা এবং ভিন্ন এই ধারণা নিয়ে বহুদূর যাবে। নবপ্রকাশের বইয়ের প্রচ্ছদ বেশি প্রশংসা আসে পাঠকের তরফ থেকে। ভালো

লাগে নবপ্রকাশের নিয়মিত কিছু পাঠক দেখে যাঁরা সবসময় নতুন বই প্রকাশের অপেক্ষায় থাকেন। এঁরা বই প্রকাশের খবর পেলে সাথে সাথে বাংলাবাজার হাজির হন। বাংলাবাজার আসতে না পারলে যে কোনো অনলাইন শপ থেকে বই সংগ্রহ করে নেন।

নবপ্রকাশের সকল লেখক-অনুবাদক, সেই সঙ্গে পাঠকদের উল্লেখযোগ্য একটা অংশের সঙ্গে আমার হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি হয়েছে এই পাঁচ বছরে। আমার জানামতে, পাঠকদের কাছে নবপ্রকাশের লেখকদের মধ্যে সকলের প্রিয় লেখক হচ্ছেন সালাহউদ্দীন জাহাঙ্গীর। আমার নিজের কাছে লেখক হিসেবে এবং ব্যক্তিগত প্রিয় মানুষ হিসেবেও তিনি অনেক পছন্দের। তাঁর একটা গুণ হচ্ছে, যেকোনো মানুষকে দেখে নিজ আগ্রহে কথা বলেন এবং সমচিন্তার হলে তাঁকে কিছু না কিছু পরামর্শ দেন। বর্তমানে তাঁর বইয়ের সংখ্যা ১৫টি। এর মধ্যে নবপ্রকাশের আছে ছয়টি। তাঁর সবচেয়ে বেশি বিক্রিত বই 'প্রিয়তমা'। এটা বর্তমানে নবপ্রকাশের বেস্টসেলার বই। রকমারি ডটকম-এর বেস্টসেলার বইয়ের মধ্যেও এটি একটি। আমাদের বিক্রিত বইয়ের মধ্যে এটিই সবচেয়ে বেশি বিক্রি হয়। মজার বিষয় হলো, অনেকে নামে তাঁকে না চিনলেও প্রিয়তমার লেখক বললে খুব সহজে চিনে ফেলে। সেই হিসেবে তাঁর অন্য একটি পরিচয় হচ্ছে 'প্রিয়তমার লেখক'। সালাউদ্দীন জাহাঙ্গীর ভাই নবধ্বনির নির্বাহী সম্পাদক, নবপ্রকাশের অন্যতম লেখক এবং প্রধান সম্পাদক।

তাঁর পরে নবপ্রকাশের নিয়মিত লেখকদের তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে আছেন নাজমুস সাকিব ভাই। তিনি নবধ্বনির সহকারী সম্পাদকও। নবপ্রকাশ থেকে এখন পর্যন্ত তাঁর চারটি বই প্রকাশিত হয়েছে। এরমধ্যে দুটি বই বেস্টসেলার; 'গুয়ান্তানামোর ডায়েরি' এবং 'সুপ্রভাত ফিলিস্তিন'।

নবপ্রকাশের চেয়ারম্যান ও নবধ্বনির সম্পাদক তামীম রায়হান ভাইয়ের বর্তমানে চারটি বই আছে বাজারে। এর মধ্যে 'ইতিহাসের হাসি-কান্না' ছাড়া বাকি তিনটি নবপ্রকাশ থেকে প্রকাশিত। 'তবুও আমরা মুসলমান', 'শাহজাদা' এবং 'সুলতান কাহিনি'। 'সুলতান কাহিনি' নবপ্রকাশের বেস্টসেলার বই। পছন্দের মানুষের মধ্যে রয়েছেন নবপ্রকাশের লেখক এবং নবধ্বনির সহকারী সম্পাদক হামমাদ রাগিব ভাই। নবপ্রকাশ থেকে তাঁর দুটি বই প্রকাশিত হয়েছে। 'গল্প বলি ফিলিস্তিনের' এবং 'সোনালি দিনের গল্প'। নবপ্রকাশের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আসাদুল্লাহ ভাইয়ের কথা আর কী বলব! আমি নিজেই তাঁর পরিবারের একজন।

ভালো লাগার বিষয় হলো, নবপ্রকাশ-পরিবারের প্রত্যেকের সাথে প্রত্যেকের সম্পর্কটা সবসময়ই ভাই-বন্ধু সুলভ। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট ব্যক্তি আমি। তাই সবার কাছ থেকে আমি অনেক বেশি ভালোবাসা ও জীবন পথের বেশুমার পাথেয় পেয়ে কৃতজ্ঞ।

বইয়ের জগৎটা অন্যসকল জগৎ থেকে অনেক বেশি সম্মানজনক। তাই এই পরিবেশের সাথে নিজেকে রাখতে পেরে নিজেকে অনেক বেশি ধন্য মনে করি। নবপ্রকাশের বই বিক্রি করতে করতে এই পাঁচ বছরে অনেক গল্প জমা হয়েছে আমার ভেতর। একজন বইবিক্রেতার জবানি হিসেবে এইসব গল্প নিয়ে একটি বই লেখার এরাদা করেছি। বইয়ের নামও ঠিক করে রেখেছি–'একজন বই বিক্রেতা'।

নবপ্রকাশ নিয়ে এখন আমার স্বপ্ন হচ্ছে–অন্তত প্রতিটি বিভাগে নবপ্রকাশের একটি করে শাখা থাকবে এবং প্রতিবছর বাংলা একাডেমি আয়োজিত একুশে বইমেলায় নবপ্রকাশ সগৌরবে নিজের সৃজনশীলতার জানান দেবে। পাঁচ বছরের অল্প সময়ে নবপ্রকাশের অভাবনীয় সাফল্যকে সামনে রেখে আমি বিশ্বাস করি, ইনশাআল্লাহ সেই দিন আর বেশি দূরে নয়। পাঠকের সহযোগিতা এবং ভালোবাসায় নবপ্রকাশ এগিয়ে যাবে আরও বহুদূর।

পথচলার পাঁচ বছর পূর্তিতে নবপ্রকাশের একজন বইবিক্রেতা হিসেবে সকল পাঠক, লেখক, শুভানুধ্যায়ী এবং প্রকাশনা-সংশ্লিষ্ট সতীর্থদের জানাই আন্তরিক মুবারকবাদ এবং অভিনন্দন।

লেখক : বিক্রয় ব্যবস্থাপক, নবপ্রকাশ ও সার্কুলেশন ব্যবস্থাপক, মাসিক নবধ্বনি



নবপ্রকাশের বই এবং আমার বাবা

মাহমুদ আল হাসান

বইজগতের মানুষ হলে পরিবারের অন্য সবার দুশ্চিন্তার অন্ত থাকে না। সারাক্ষণ মাথা-ব্যথা থাকে সবার—এই বুঝি ছেলেটা উচ্ছন্নে গেল, অকর্মন্য ও দায়িত্বজ্ঞানশূন্য হয়ে মহাবিপদসংকেত নিয়ে আবির্ভূত হলো।
কী করবে এই বই-টই পড়ে? না পারবে ঘরের কাজ করতে না পারবে বাইরের। সংসার করবে ক্যামনে? বৌ-বাচ্চারে খাওয়াবেই-বা কী? দুশ্চিন্তার কালোমেঘ যেন ভেঙে পড়ে সবার মাথায়।
এই তো সেদিন, একটামাত্র একটা বই কিনেছি। তা হাতে করে বাড়িতে ঢুকতেই মা দেখে চেঁচিয়ে উঠলেন—'আবার বই কিনছস! সারা ঘর বই দিয়া ভইরালা।' এমনিতে মায়েরা সর্বংসহা হন, কিন্তু ছেলেমেয়েদেরকে বই কিনতে ও বইপাঠের নির্জন নিমগ্নতা দেখলেই কোত্থেকে যে এমন কঠোরতা নিয়ে হাজির হন, আল্লাহ মালুম।
এটা শুধু একজনের বিরক্ত মনোভাবের প্রকাশ, বাকি আরো যারা আছেন তাঁরাও কি কম যান! আব্বা তো তিরস্কারের সুরে কতবার বললেন—'হেয় বলে সায়িত্যিক অনব, লেকক অইব! বাপের হোটেলে খাও তো, টের ফাও না। সামনের মাসেত্তে টেহা কম ফাবি, বুঝলি?' মাসের পর মাস চলে যায়, নাস্তা না করে, ভালোমন্দ না খেয়ে টাকা জমিয়ে একটা দুটা বই কিনি, তাও কত কথা শুনতে হয়। আরো যে কত বই কিনতে না-পারার ব্যথা বুকে রয়ে যায়, কে

অনুভব করবে এই ব্যথার জ্বলন?
বই তো বই। যে বই পড়ে, তার জন্য এটা যত্ন ও ভালোবাসার বিষয়। যে পড়ে না, তার কি আর অত যত্ন-টত্ন ও আলমারিতে সাজিয়ে-গোছিয়ে রাখার ব্যাপার-স্যাপার আছে? তার কাছে এই বই মানে ফেরিওয়ালার ভ্যানে কয়েক পয়সায় বিক্রির সামান। আপাতত কয়দিনের চা আর পানসুপারির খরচ চলে যাবে নির্দ্বিধায়। নইলে সেদিন কেন আমার প্রাণপ্রিয় বাপজান পুরাতন প্রায় পঞ্চাশখানা বই ও বিভিন্ন ম্যাগাজিন বিক্রি করে দেবেন!
আমি ছিলাম বাইরে। খবর পেয়ে তড়িগড়ি এসে দেখি আব্বা একশো টাকার কয়েকটা ও দশবিশ টাকার সামান্য কটি নোট গুণছেন। সাথে সিকি পয়সাও আছে কয়টা, এ যুগে যা অচলপ্রায়। আর এদিকে তেল চিটচিটে কালো মাথার ফেরিওয়ালা লোকটা বইগুলোকে তার ভ্যানে আছড়ে ফেলছে। সে যেন বইগুলোকে নয় আমাকেই আছড়ে আছড়ে হাড়গোড় ভেঙে দিচ্ছে। আমার সর্বনাশ হয়ে গেল। চশমার উপর দিয়ে আব্বা আমাকে দেখে বলেন–‘এইগুলা তো ফুরান অইয়া গ্যাছে, ফাতা ছিরা গ্যাছেগা, টিশ খইয়া গ্যাছেগা, বালাগুলি আনি নাই, গরে রইছে দ্যাহোগা।’
আমি শুধু বাপজানের কাণ্ড-কারখানা দেখতে থাকি। আমার ভেতরটা নিদারুণ ব্যথায় মোচড় দিয়ে উঠতে থাকে। এই বইগুলো বিগত ১০ বছরে দফায় দফায় কেনা। মাত্র একদিনের একটা মুহূর্তেই নাই হয়ে গেল!
২০১৮-এর জুলাই মাসে নবধ্বনি পত্রিকায় ‘প্রিয় শিক্ষক’ প্রতিযোগিতার বিজয়ী পাঁচজনের মধ্যে আমার লেখাও স্থান পেয়েছিল। উসতাজে মুহতারাম শায়েখ শহীদুল্লাহ ফজলুল বারী রহ.-কে নিয়ে লিখেছিলাম। পরম যত্নে এই লেখাটা লেখার পর যখন পত্রিকায় ছাপা হলো এবং পুরস্কার হিসেবে অনেকগুলো বই ও পত্রিকার কপি পেলাম, প্রথমেই আমার খিটখিটে আব্বাকে দেখালাম–‘এই দেখেন, এই লেখাটার জন্যই পুরস্কারগুলো পেয়েছি।’ আব্বা বইগুলোতে হাত বুলিয়ে দেখলেন, তেমন কিছুই বললেন না। অজু করে এশার নামাজে চলে গেলেন। আমিও বইগুলো গোছিয়ে রেখে নামাজের জন্য পা বাড়ালাম।
নামাজ থেকে ফিরে আব্বা বললেন–‘তোর লেহাডা দে দেহি, কি লেকছত ওট্টু ফরি।’ আমি খুশিতে আত্মহারা হয়ে আব্বার সামনে লেখাটা বাড়িয়ে দিলাম। পুরো লেখা মনোযোগ দিয়ে পড়ে মন্তব্য করলেন–‘বালা লেকছত, তয় এমন কিছু লেকবি না যে বাইত ফুলিশ আয়ে, বুঝলি?’ আমি হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়ালাম আর বললাম–‘আমরা বাড়িতে পুলিশ আসবে এমন লেখা লেখি না, আমরা দীন-ধর্ম ও কুরআন-হাদিসের কথা লেখি।’
আমার আব্বা প্রচুর পত্রিকা পড়েন। একজন তুখোড় সংবাদপাঠক বললেও ভুল হবে না। মাঝেমধ্যে মজার গল্পগ্রন্থ হলে তাও পড়েন আয়েশ করে। অনেক সময় মাকেও পড়ে শোনান। যেখানে হাসির কথা সেখানে পড়ার মধ্যেই হাসতে থাকেন আর পড়তে থাকেন। মাও তাই। আব্বার সাথে তাল মিলিয়ে হাসেন।

বইটা শেষ করেছেন বোধহয়। চোখেমুখে বিমর্ষ ভাব দেখে বুঝলাম বইয়ের পাতায় পাতায় ছড়ানো নিদারুণ ব্যথায় তিনিও এখন ব্যথিত। হোসাইন আবদুল কাদিরকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে পাঁচ মিনিটের কথা বলে। আব্বা বললেন–‘কই ফাছ মিনিট আর কই ছাব্বিশ মাস, এমুন আরো কত বালা মানুষ জেলখানাত ফইরা রইছে, বিনা দোষে, কোনো অফরাদ নাই, তাও। মিছা মামলায় ডুহায় দিছে। সবতে জদি এম্নে কইরা লেকতারতো আর সারা দুইন্নার মানু ফরতারতো।’

পরদিন সকালে হঠাৎ করেই আব্বার চ্যাঁচানি শুনতে পেলাম। দৌড়ে ওই ঘরে গিয়ে দেখি তাঁর হাতে হোসাইন আবদুল কাদিরের জবানবন্দি–'গুয়ান্তানামোর ডায়েরি।'
আমি বললাম–'এতো চিল্লাপাল্লার কী আছে?'
আব্বা আমাকে চোখ বড় বড় করে ধমকের সুরে বললেন–'এই বই আজ্জাত্তে যে আর বাইত না দেহি, এই বই গাঙ্গ ফালাবি। এম্নোই দেশকাল বালা না, তরা থাহছ দূরে দূরে, মাদরাসাত, আমরা কত চিন্তা করি। আবার এই জাতের বই, ফুলিশ না বাইত আইয়া উটবো, মাদরাসাতও কি এই সমস্ত বই ফরছ?'
আমি বললাম–'আরে না, মাদরাসায় আউট বই পড়ার সময় কই। আর এ বইয়ে কোনো সমস্যাই নাই। এঁা কেবল একটা আত্মজৈবনিক গ্রন্থ। লেখক কিছুদিন সন্দেহের আসামি হয়ে কারাগারে বন্দী ছিলেন, তার এই বন্দীজীবনের নানান নির্যাতন ও কষ্ট-দুর্ভোগের কথাগুলোই বইয়ে লিখেছেন। এতে জঙ্গি-টঙ্গীর কিচ্ছু নেই। আপনে শুধু শুধু চিল্লায়েন না। আগে পুরা বই পড়েন, তারপর যা কওয়ার কইয়েন।'
দেখলাম তিনি আবার বইয়ে মনোযোগ দিয়েছেন।
বইটা শেষ করেছেন বোধহয়। চোখেমুখে বিমর্ষ ভাব দেখে বুঝলাম বইয়ের পাতায় পাতায় ছড়ানো নিদারুণ ব্যথায় তিনিও এখন ব্যথিত। হোসাইন আবদুল কাদিরকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে পাঁচ মিনিটের কথা বলে। আব্বা বললেন–'কই ফাছ মিনিট আর কই ছাব্বিশ মাস, এমুন আরো কত বালা মানুষ জেলখানাত ফইরা রইছে, বিনা দোষে, কোনো অফরাদ নাই, তাও। মিছা মামলায় ডুহায় দিছে। সবতে জদি এম্নে কইরা লেকতারতো আর সারা দুইন্নার মানু ফরতারতো।'
তারপর আমি আব্বাকে নবধ্বনির দশ বছর পূর্তিসংখ্যা বের করে বি-বাড়িয়ার হাফেজ মাওলানা মুবারকের প্রায় ছয়বছর গুয়ান্তানামো কারাগারে বন্দী থাকা ও নির্যাতনের কাহিনি পড়তে দিলাম। দেখলাম আব্বা বেশ আগ্রহের সাথেই পড়তে শুরু করলেন। একসময় এ সংখ্যাও পড়ে শেষ করে ফেললেন।
আমার হাতে তখন নবধ্বনি গল্পসংকলন বইটি। মাত্রই অর্ধেক পড়েছি। আব্বা জিজ্ঞেস করলেন–'তোর আতো এইডার নাম কি?' আমি বললাম–'নবধ্বনি গল্প সংকলন।' গল্পের কথা শুনেই তিনি তৎক্ষণাৎ বইটি চাইলেন। আমিও পড়া আগে না বাড়িয়ে বইটি আব্বার হাতে দিয়ে দিলাম। আব্বার আগ্রহকে এখানে সমীহ করলাম আমি এই আশায়, হয়তো তিনি সামনে আমার আর কোনো বই বেচে দেবেন না। নতুন কোনো বই কিনলেও যাচ্ছে তা বকবেন না।
এক দুপুরে দেখি আব্বা নাক ডেকে ডেকে ঘুমোচ্ছেন। লাগাতার এই নাক ডাকার শব্দ আমার কাছে কেমন যেন কোনো এক জঙ্গলে একলানির্জন দুপুরে ভূতুড়ে আওয়াজের মতো লাগছে। সমুদ্রের ভয়াল গর্জন ও উত্তাল তরঙ্গমালার শব্দ যেমন, ঠিক তেমন। আমি কল্পরাজ্যে আব্বাকে দেখতে পেলাম একজন দক্ষ নৌ-সনাপতি ও সাহসী ক্যাপ্টেনরূপে। যিনি সাগর-মহাসাগর পাড়ি দিয়ে বিভিন্ন রাজ্য পরিভ্রমণে বের হয়েছেন। সঙ্গে আমিও আছি এবং দুর্দান্ত সব সৃষ্টিরহস্য ও অজানা সব নিগূঢ় তত্ত্ব উদ্ঘাটন করে চলেছি। সমুদ্রের অথৈ জলরাশি ও পাহাড়সম ঢেউয়ের ভেতর দিয়েই আমার কল্পনার জাহাজ এগিয়ে চলছে। কখনো স্বস্তি, কখনো স্ফূর্তি আবার কখনো বিপদাশংকার সমুপস্থিতি। বিভিন্ন দেশের রাজরাজড়াদের অভ্যর্থনা, আপ্যায়ন এবং নানান দেশের নৌ-সেনাদের সাক্ষাৎদর্শন ও ভুবনবিখ্যাত শাহিমহলের বিপুল আতিথেয়তার দুর্লভ অভিজ্ঞতাসঞ্জাত অনুভব-অনুভূতির এক দারুণ আখ্যান। এভাবেই কল্পনার রাজ্যে আকণ্ঠ নিমজ্জিত ছিলাম। হঠাৎ করেই আমার ভাবনায় ছেদ পড়ল আব্বার নড়ে ওঠার ফলে। তাঁর মুখের ওপর উপুড় করে রাখা খোলা বইটির কারণে বোধহয় নিঃশ্বাস ফেলতে কষ্ট হচ্ছে। বইটি আমি আলতো করে তুলে নিলাম আব্বার মুখ থেকে। দৃশ্যত তিনি এখন আমার ঘুমন্ত শান্ত-স্থির বাবা। আগের মতো রূঢ় ও খিটখিটে স্বভাবের নন। তবে কি তিনিও একসময় নিজেকে পনেরো শতকের দ্য অ্যাডমিরাল সাইয়িদি আলি রইস ভাবতে ভাবতে অজান্তেই ঘুমের রাজ্যে হারিয়ে গেছেন?

গাজীপুর, ঢাকা



নবপরিবার : প্রিয় বই এবং প্রিয় পত্রিকার ঠিকানা

অরিশা জান্নাত

প্রিয় বই অথবা পত্রিকার কথা বলতে গেলে আপনাআপনিই চলে আসে নবপ্রকাশের কথা। নবপ্রকাশের বেশকিছু বই খুব তৃপ্তির সঙ্গে পড়া হয়েছে। সেই সঙ্গে প্রতি মাসে পড়া হয় নবধ্বনিও। সুতরাং এ ব্যাপারে অল্পকিছু না বললে অকৃতজ্ঞতা হবে।
নবধ্বনির কথা যদি বলি, এতো অল্পদামে এতো সুন্দর একটা পত্রিকা পাওয়া যায় পত্রিকাটির সাথে পরিচয় না হলে বোধহয় জানা হতো না। সবচেয়ে ভালো লাগে এর বিষয়ভিত্তিক আয়োজনগুলো। একেক মাসে একেকজন বরিত ব্যক্তিকে নিয়ে কিংবা গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয়ে লেখা, একেক সময় একেক বিষয় বা ব্যক্তিকে জানতে পারা, ব্যাপারটা সত্যিই অনেক ভালোলাগার। এইটাকে আমার কেন যেন টক-ঝাল-মিষ্টি আচারের মতো মনে হয়। মনে হয়, ছোট্ট একটা প্যাকেটে কয়েক প্রকার স্বাদ। যেটা শেষ হওয়ার পর হাত চাটতে চাটতে চলতে থাকে পরেরবার কবে পাওয়া যাবে সেই ভাবনা।
নবধ্বনির সাথে আমার প্রথম পরিচয় সুমাইয়ার হাত ধরে। গোল গোল চশমা-পরা বোকাসোকা চেহারার দুষ্টু মেয়েটা খুব অল্প সময়ে প্রিয় বন্ধুদের জায়গাটা দখল করে নিয়েছিল। নিজে কখনও বই পড়ত

নবপ্রকাশ নিয়ে বলতে গেলে প্রথমেই সালাহউদ্দীন জাহাঙ্গীরের অসম্ভব সুন্দর 'প্রিয়তমা' বইটির কথা বলতে হয়। লেখকের প্রায় সাত-আটটা বই পড়ার সুযোগ হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। 'বদরের বীর', 'সেই হীরা', 'প্রিয় প্রেয়সী নারী', 'হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল', 'দ্যা অ্যাডমিরাল'—মোটামুটি সবগুলোই ভালো লেগেছে। তবে তাঁর 'প্রিয়তমা' বইটা অন্যরকম। একটানে হাজার বছরের অতীতকে কলমের আঁচড়ে বর্তমানে তুলে আনা হয়েছে বইটিতে। পড়তে পড়তে বর্তমান থেকে হারিয়ে গিয়েছিলাম চৌদ্দশ বছর অতীতের ধূসর মরুতে।

না, কিন্তু আমার পড়ার কাজে মনপ্রাণ দিয়ে সাহায্য করত। মাদরাসায় 'আউট বই' নিষিদ্ধ। এজন্য লুকিয়ে পড়ার সময় ও স্বেচ্ছায় পাহারাদার বনে যেত। নাওয়া-খাওয়া ভুলে বইয়ের মধ্যে ডুবে গেলে সুমুই খাইয়ে দিত। পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে গেলে যত্ন করে তুলে রাখত বইপত্র। এর-ওর কাছ থেকে ধার করা বইপত্র জোগাড় করে দিত। আর প্রতিবার বাড়ি থেকে ফেরার সময় ভালোমন্দ খাবার-দাবারের পাশাপাশি কোথা থেকে যেন একগাদা পুরনো পত্রিকা নিয়ে আসত। আদর্শ নারী, নকীব, কিশোরকণ্ঠ, মঈনুল ইসলাম, আল-আবরারসহ আরও অনেক কিছু। ওসবের ভিড়েই একদিন খুঁজে পেয়েছিলাম নবধ্বনিকে। ওটা সম্ভবত মুফতী আমিনী রহ. সংখ্যা ছিল। প্রচ্ছদের রঙ ছিল কালো। পৃষ্ঠাগুলোও কেমন ঘোলাটে। কিন্তু লেখাগুলো যেন প্রজাপতি রঙে রাঙানো। প্রথম দেখাতেই ভালো লেগে গেল। এক বসায় পড়ে ফেললাম পুরোটা। কিন্তু তারপরের সংখ্যাগুলো অনেক খুঁজেও আর পেলাম না। কদিন পর সুমু জানালো পত্রিকাটা নাকি বন্ধ হয়ে গেছে। একসময় ওর বাবা রাখতেন কিন্তু এখন আর পাওয়া যায় না।

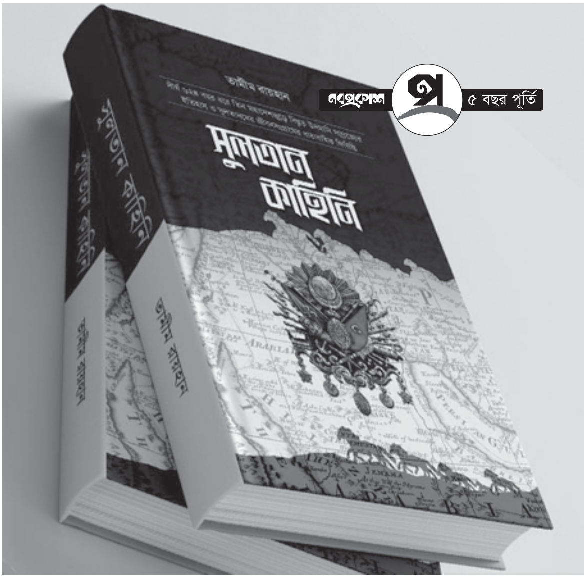
কয়েকবছর পর হঠাৎই খবর পেলাম নবধ্বনি আবার পাওয়া যাচ্ছে। আব্বুকে বলে অর্ডার করলাম। তারপর থেকে প্রায় তিন বছর হলো নবধ্বনির নিয়মিত পাঠিকা আমি।

সময় বদলে গেছে। সাথে সাথে বদলেছে নিজের অবস্থানও। গত বছর ছাত্রী থেকে শিক্ষিকা হিসেবে প্রমোশন হয়েছে। এখন আর লুকিয়ে কোনো কিছু পড়তে হয় না আলহামদুলিল্লাহ। বরং নিজে পড়ার পাশাপাশি ছাত্রীদেরও উৎসাহিত করা হয়। মাস শেষে মেয়েরা ঘ্যান ঘ্যান করে, 'আপা, নবধ্বনি আসবে কবে?' আমি মুচকি হাসি। এই হাসিটা প্রশ্রয়ের, আনন্দের এবং কিছুটা গর্বেরও।

তবে একটা কথা না বলে পারছি না। নবধ্বনির প্রচ্ছদসহ প্রায় প্রত্যেকটা পৃষ্ঠায় প্রাণীর ছবি দেয়া থাকে। হয়তো এ ব্যাপারে পত্রিকাওয়ালাদের নিজস্ব ব্যাখাও আছে। কিন্তু বিষয়টা নিয়ে বারবার বিব্রত হতে হয়েছে। অনেকে ব্যঙ্গ করে বলেন, 'হুজুরদের পত্রিকায় প্রাণীর ছবি কেন? এইটাই হলো ডিজিটাল জামানা।' তাছাড়া মাদরাসা-কর্তৃপক্ষেরও এমনটাই অভিযোগ। অনেকসময় পত্রিকা হাতে পেয়ে সবগুলো ছবি কেটে তারপর ছাত্রীদের হাতে দিতে হয়েছে। বিষয়টা আমার নিজের কাছেও দৃষ্টিকটূ মনে হয়। এতো সুন্দর একটা পত্রিকা অথচ এই বিষয়টা নিয়ে কথা শুনতে হয়। অনেকে তো ছবি দেখেই বলে দেন 'ফালতু পত্রিকা'। ভেতরের পাতা উল্টিয়ে দেখারও প্রয়োজনবোধ করেন না। পত্রিকার ব্যবস্থাপকরা যদি এ বিষয়টা খেয়াল করতেন

তাহলে আমার মতো অনেকের উপকার হতো। নবধ্বনির জন্য শুভকামনা রইল। নতুন দিনের পদধ্বনি নিয়ে নবধ্বনি হয়ে উঠুক হাজারও তরুণ-তরুণীর হৃদয়ধ্বনি।
নবপ্রকাশ নিয়ে বলতে গেলে প্রথমেই সালাহউদ্দীন জাহাঙ্গীরের অসম্ভব সুন্দর 'প্রিয়তমা' বইটির কথা বলতে হয়। লেখকের প্রায় সাত-আটটা বই পড়ার সুযোগ হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। 'বদরের বীর', 'সেই হীরা', 'প্রিয় প্রেয়সী নারী', 'হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল', 'দ্যা অ্যাডমিরাল'—মোটামুটি সবগুলোই ভালো লেগেছে। তবে তাঁর 'প্রিয়তমা' বইটা অন্যরকম। একটানে হাজার বছরের অতীতকে কলমের আঁচড়ে বর্তমানে তুলে আনা হয়েছে বইটিতে। পড়তে পড়তে বর্তমান থেকে হারিয়ে গিয়েছিলাম চৌদ্দশ বছর অতীতের ধূসর মরুতে। মনে হচ্ছিল এই তো হাত বাড়ালেই ধরা যাবে, ছোঁয়া যাবে আমার প্রিয় নবিজীকে। সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম। উম্মুল মুমিনিনদের সাথে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের দাম্পত্য জীবনের প্রেমময় ছবি এমনভাবে ভেসে উঠছিল, মনে হচ্ছিল যেন রাসুলের উঠোনে আমার ঘরের জানালা খোলা হয়েছে। আর আমি সেখানে বসে প্রতিবেশীর মতো দেখতে পাচ্ছি রাসুলের আলো ঝলমল জীবনছবি। পুরো বইটা জুড়ে আম্মাজানদের প্রতি রাসুলের প্রেম, প্রণয়, স্নেহ-প্রীতি আর ভালোবাসা অভিনব বর্ণনায় উঠে এসেছে।
নবপ্রকাশের চমৎকার আরেকটি বই 'গল্প বলি ফিলিস্তিনের'। ৮০ পৃষ্ঠা কলেবরের ছোট্ট বই, কিন্তু হৃদয়কাড়া। লেখক হামমাদ রাগিব। হামমাদ ভাইয়ার গল্পের সাথে পরিচয় সেই কৈশোরে। প্রিয় পত্রিকা মাসিক কলমদানিতে ছোটগল্প লিখতেন। যাপিত জীবনের গল্পগুলো বলে যেতেন সহজ সরল সুন্দর ভাষায়। এখানে ফিলিস্তিনের সকরুণ গল্পগুলোও তিনি বলেছেন হৃদয়কাড়া ভঙ্গিমায়। ইসরায়েল শব্দটা ছোটবেলা থেকেই অহরহ শুনে এসেছি রেডিও, টেলিভিশন আর পেপার-পত্রিকায়। ফিলিস্তিন, বায়তুল মুকাদ্দাস, মাসজিদে আকসা—শব্দগুলোও অপরিচিত নয়। কিন্তু এককালের ফিলিস্তিনই যে আজকের জবরদখল করা ইসরায়েল, এটা অনেকটা সময় পর্যন্ত জানা ছিল না আমার। আর যতটুকু জানতাম তাতেও যে প্রশ্নগুলো মনে উদয় হতো, সেসবের যথাযথ উত্তর খুঁজে পেতাম না সেভাবে। এই না-জানা গল্পগুলোই জানানো হয়েছে 'গল্পবলি ফিলিস্তিনের' বইটিতে। ফিলিস্তিনের অতীত ও বর্তমানকে একচুমুকে ঢুকিয়ে নেওয়া যায় করোটিতে। ভিন্ন ভিন্ন শিরোনামে গল্পের ছলে পুরো ফিলিস্তিন উঠে এসেছে বইটির পাতায় পাতায়।
বায়তুল মুকাদ্দাসে দ্বিতীয় খলীফা হজরত উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিজয় নিশান ওড়ানো থেকে নিয়ে আল-কুদসের শেষ শাসক ইফতেখারুদ্দৌলার পরাজয়, আরব জাতীয়তাবাদের আশায় ফিলিস্তিনে তুর্কি খেলাফতের মূলোৎপাটন, ব্রিটিশ প্রশাসনের সহযোগিতায় ফিলিস্তিনে ইহুদিদের পুনর্বাসন, ইহুদিদের আলাদা আবাসভূমির স্বপ্ন বাস্তবায়নে পশ্চিমা শক্তির ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র, আল-কুদসে ইহুদিদের জবরদখল, ইহুদি কর্তৃক নির্যাতিত মুসলমানদের শোচনীয় অবস্থা আর তাঁদের মরণজয়ী বীরদের গৌরবময় বিরত্বগাঁথা—সবকিছু লেখা হয়েছে গল্পের আদলে, সাবলীল ভাষায়।
এ ছাড়া নবপ্রকাশের চমৎকার আরও বেশ কয়টি বই পড়েছি, দু-একটা ছাড়া সবগুলোই মৌলিক। প্রতিটা বই-ই বিষয়বস্তু ও লেখার মানের বিচারে আমার কাছে ভালো লেগেছে। তবে সম্প্রতি নবপ্রকাশের দুয়েকটা অনুবাদ বই নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা চোখে পড়েছে। আমাদের মতো যারা নিজেরা ভালোমন্দ অতোটা যাছাই করার যোগ্যতা রাখে না, ব্যাপারটা তাদের জন্য বেশ চিন্তার। নবপরিবারের কাছে অনুরোধ বিষয়টাতে সতর্ক দৃষ্টি দেয়ার।
নবপ্রকাশ আরও আরও সুন্দর এবং মানসম্মত বই উপহার দিক আমাদের, প্রতি মাসে ঝকঝকে প্রচ্ছদের ছোট্ট নবধ্বনিও হাজির হোক নিত্যনতুন বিষয় নিয়ে, বিরতিহীন, এটাই কামনা। নবপরিবারের প্রতি রইল অনেক অনেক শুভেচ্ছা।

কামারগাড়ি, সদর, বগুড়া



সুলতানি মুসাফির

তামীম আদনান

নবপ্রকাশের পাঠক-আদৃত বই ‘সুলতান কাহিনি’। বইটি যখনই আমি হাতে নিয়েছি, চলে গিয়েছি সুলতানি আমলে। উসমানি সাম্রাজ্যে। চোখের সামনে ভেসে উঠেছে ইস্তাম্বুলের পাথুরে পথঘাট। তোপকাপি প্রাসাদ। হারেমের অভ্যন্তর। মনে হয়েছে, এই তো দেখতে পাচ্ছি সুলতানের কানের কাছে নিচু স্বরে পরামর্শ দিচ্ছেন সদরে আজম। দূত মারফত ফতওয়া প্রেরণ করছেন শাইখুল ইসলাম। সুলতানের সামনে বসে আছে ভীত দরবারের সন্ত্রস্ত সভাসদ।

বইটি পড়ার সময় আমি হয়ে উঠি সুলতানি আমলের সেই মুসাফির, যার সামনে ঘটতে থাকে একের পর এক সুলতানের পরিবর্তন। সালতানাতের সিংহাসন দখলে ভাইয়ের হাতে হয় ভাই খুন! ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে পিতার আদেশে হয় পুত্রের হত্যা।

আমি বিস্ময়-ভরা দৃষ্টিতে দেখি, নিজ সাম্রাজ্যের বিচারের কাঠগড়ায় অপরাধী হয়ে দাঁড়িয়েছেন সুলতান। ভরা দরবারে সভাসদদের সামনে মাথা উঁচু করে সুলতানের প্রতিবাদ করছেন শাইখুল ইসলাম। ইহুদির সামান্য কুঁড়েঘরের জায়গা মসজিদের জন্য ক্রয় করতে বিনয়ের সাথে মূল্যের চেয়ে কয়েকগুণ বেশি অর্থ প্রস্তাব করছেন স্বয়ং সুলতান।

আমি দেখি, অবাক হই। মুসলিম শাসকের মহানুভবতা দেখে গর্বিত

হই। আবার নৈতিক অবক্ষয়ের চিত্র দেখে হই মর্মাহত।

একসময় দুই মলাট বন্ধ করে ফেলি। তখন ফিরে আসি আবার এই আমলে। বুঝতে পারি, আমি শুধু সেই আমলের মুসাফির। আমার সুলতানি আমলের মুসাফিরি জিন্দেগির সময়সীমা ততক্ষণ, যতক্ষণ দুই মলাট খুলে কালো অক্ষরে ডুবে থাকবে মন। মাত্র আড়াইশ পৃষ্ঠায় দীর্ঘ ৬২৪ বছরের ইতিহাস এতোটা জীবন্ত হতে পারে তা আমি কখনোই জানতে পারতাম না এই গ্রন্থটি না পড়লে।

ছোটবেলা থেকেই শুনে আসছি, মুসলিম বিশ্বের সর্বশেষ ধারাবাহিক শাসনব্যবস্থা হলো উসমানি খেলাফত। এই কারণে উসমানি সাম্রাজ্যকে জানার আগ্রহ ছিল অনেক বেশি। কিন্তু মাত্র নয় দশক আগে সমাপ্ত হওয়া এই সালতানাতের ইতিহাসগ্রন্থ বাংলাভাষায় নেই বললেই চলে। তাই ছাতি-ফাটা পিপাসা থাকা সত্ত্বেও শুকনো মুখেই অতিবাহিত হচ্ছিল দিনরাত। অবশেষে নবপ্রকাশ হাতে এনে দিলো ৬২৪ বছর ধরে তিন মহাদেশ জুড়ে বিস্তৃত উসমানি সাম্রাজ্যের ইতিহাস ও সুলতানদের জীবন-সংগ্রামের ধারাবাহিক ফিরিস্তি 'সুলতান কাহিনি'। বইটিতে আলোচনা করা হয়েছে উসমানি সাম্রাজ্যের পরিধি ও ব্যাপ্তি নিয়ে। প্রকাশ পেয়েছে সেকালের সামাজিক ও নাগরিক জীবনের নানারকম ছবি। তুলে ধরা হয়েছে সুলতানদের ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় জীবনের বৈচিত্রময় বিভিন্ন ঘটনা। এ ছাড়াও বর্ণনা করা হয়েছে উসমানি সাম্রাজ্যের সুদীর্ঘ ইতিহাস থেকে চুম্বক-অংশ সমূহ। যা এই বই পাঠের স্বাদকে করেছে অতুলনীয়।

লেখক তামীম রায়হান সহজ সাবলীল ভাষায় এবং আকর্ষণীয় বর্ণনায় এমনসব তথ্য ও ঘটনা বইটিতে লিপিবদ্ধ করেছেন, যেগুলো আমার মুখে কখনো হাসি ফুটিয়েছে, আবার কখনো বুক চিড়ে বের করেছে দীর্ঘশ্বাস। বইটি পড়ে আমার কাছে স্পষ্ট হয়েছে উসমানি সাম্রাজ্যের চরম উত্থানের গল্প এবং ক্ষমতা ও শক্তির শীর্ষচূড়া থেকে পতনের কারণ।

লেখক রাজ্য দখল ও যুদ্ধবিগ্রহের রক্তাক্ত ইতিহাস এড়িয়ে সুলতানদের জীবন ও কর্ম এবং তাঁদের বৈচিত্রময় চরিত্র সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও ঘটনা পাঠককে জানাতে চেষ্টা করেছেন।

আমার মনে হয়েছে লেখকের প্রচেষ্টা অনেকটাই সফল হয়েছে। বইটি পড়ে আমি ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় উসমানি সাম্রাজ্য সম্পর্কে একটি নির্মোহ চিত্র পেয়েছি। যা আমার পাঠক-হৃদয়ের পিপাসা মেটালেও অনুসন্ধানী মনের তৃষ্ণাকে বাড়িয়ে দিয়েছে।

বাংলাভাষী ইতিহাস পাঠকদের জন্য 'সুলতান কাহিনি' এক অসামান্য উপহার। গ্রন্থটি প্রকাশ করায় অসংখ্য কৃতজ্ঞতা জানাই নবপ্রকাশ পরিবারকে।

নবপ্রকাশের পঞ্চম বর্ষপূর্তিতে জানাই অনেক অনেক শুভেচ্ছা ও শুভ কামনা। এই পাঁচ বছরে অনেকটাই ভালোবেসে ফেলেছি নবপ্রকাশকে। সেই ভালোবাসার দাবি থেকেই আবদার জানাব, তাঁরা যেন 'সুলতান কাহিনি'র মতো বই আরও উপহার দেন আমাদের। এই আবদারটা বিশেষ করে আমার পক্ষ থেকে। কারণ আমি চাই, আবার কোনো না কোনো সালতানাতের সুলতানি মুসাফির হতে।

লেখক : শিক্ষার্থী, জামিয়া হোসাইনিয়া ইসলামিয়া আরজাবাদ, মিরপুর ১, দারুস সালাম, ঢাকা

নবপ্রকাশ এবং আমার অভাবনীয় প্রাপ্তির দুটো মুহূর্ত

মুহাম্মদ আমীনুল ইসলাম

নবপ্রকাশের এক আবেগী পাঠক আমি। সুযোগ পেলেই ছুটে যাই বাংলাবাজারের ইসলামী টাওয়ারে। ইসহাক ভাইকে জিজ্ঞেস করি, নতুন বইয়ের ব্যাপারে। বই কবে আসছে? আমার ঘন ঘন এমন যাতায়াত এবং বইপত্রের খোঁজ-খবর নেওয়ার কারণে নবপ্রকাশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের কাছেই পরিচিত এবং স্নেহধন্য হয়ে গেছি এতো দিনে।

শুরুর কথা বলি। আদীব হুজুরের 'তুরস্কে তুর্কিস্তানের সন্ধানে' বইটি পড়ে উসমানি খেলাফতের ইতিহাস জানার আগ্রহ আমার ভেতর দুর্বার হয়ে উঠেছিল। একদিন নবধ্বনির বিজ্ঞাপন-পাতায় দেখি তামীম রায়হান লিখিত একটি বই আসছে খুব শিগগির নবপ্রকাশ থেকে, 'সুলতান কাহিনি', যেটা নাকি উসমানি খেলাফতের উপর লিখিত। সেই থেকে অপেক্ষা করতে লাগলাম বইটির। নবপ্রকাশে গিয়ে বারবার খোঁজ নিতে লাগলাম, কবে আসছে বইটি?

কিন্তু অপেক্ষার প্রহর আর ফুরোয় না। নবধ্বনিতে প্রতি মাসেই বিজ্ঞাপন আসে, শিগগির আসছে 'সুলতান কাহিনি', কিন্তু শিগগির আর হয় না। এভাবে বেশ কয়েক মাস যাবার পর অবশেষে বইটি প্রকাশ হয়। বই প্রকাশের খবর শুনে আমি দ্রুত গেলাম নবপ্রকাশে। ইসহাক ভাই, মুচকি হেসে বললেন, 'তোমার বইটি এসেছে। সেই সঙ্গে সারপ্রাইজও আছে। বইটির প্রতি তোমার আগ্রহের কথা তামীম রায়হান ভাই জানতে পেরে তোমার জন্য অটোগ্রাফসহ একটা 'সুলতান কাহিনি' রেখে গেছেন। তিনি এখন এয়ারপোর্টে, কাতারের উদ্দেশে যাত্রা করেছেন।'

ইসহাক ভাইয়ের কথা শুনে আমি আবেগাপ্লুত হয়ে পড়লাম। বইটা বুকে জড়িয়ে চোখের জল আটকে রাখতে পারলাম না। কোথাকার কোন এক কিশোর, জীবনে কখনো দেখেননি, নামও জানেন না হয়তো ভালোমতো, কিন্তু তারপরও তার জন্য এমন ভালোবাসা লেখকের!

চোখ থেকে টপটপ কণ্ডে অশ্রু পড়ছিল, এ অশ্রু আনন্দের। পরম প্রাপ্তির।

তারপর থেকে নবপ্রকাশ আমার অস্তিত্বে মিশে আছে। কিছুদিন পর 'প্রিয়তমা' বেরোলো। এখানেও ঘটল প্রায় একই রকম ঘটনা। বই বেরোনোর আগে নবধ্বনিতে কয়েক মাস ধরে বিজ্ঞাপন আসছিল–প্রিয়তমা আসছে। কিন্তু আসে তো আর না। আমার অপেক্ষাও ফুরোয় না। অবশেষে এলো প্রিয় বইটি। অভ্যাস মাফিক একদিন নবপ্রকাশে গেলাম। সালাহউদ্দীন জাহাঙ্গীর ভাই বসা ছিলেন শো-রুমে। আমি চিনতে পারিনি। ইসহাক ভাই বললেন, 'ইনিই তোমার প্রিয় লেখক সালাহউদ্দীন জাহাঙ্গীর।' আর জাহাঙ্গীর ভাইকে বললেন, ও হচ্ছে আমীন, যার কথা আপনাকে বলেছিলাম।' জাহাঙ্গীর ভাই তখন বেশ অনেকক্ষণ আমার সঙ্গে কথা বললেন। তারপর প্রিয়তমা বইটি আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন, 'নাও আমীন! এটা তুমি পড়বা। তোমাকে হাদিয়া। জীবনে বড় লেখক হওয়ার স্বপ্ন দেখবা। ভালো থেকো...!'

আমি জীবনে দ্বিতীয় বারের মতো পরম ও অভাবিত প্রাপ্তিতে বিগলিত হলাম। সামান্য এক কিশোর পাঠকের জন্য নবপ্রকাশের লেখকদের এই ভালোবাসা আমার জীবনে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

নবপ্রকাশ আমার ভালোবাসার অপর নাম। পাঁচ বছর পূর্তিতে নবপ্রকাশের জন্য অনেক অনেক শুভ কামনা।

লেখক : শিক্ষার্থী, জামিয়া আবু বকর সিদ্দীক রা. উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা

রঙিন মখমল দিন এবং নবপ্রকাশ নিয়ে আমার অনুভূতির অভিপ্রকাশ

কাজী একরাম

খুঁটিনাটি বিষয়ের এমন খুঁটে খুঁটে বর্ণনা দিতে সকলেই পারে না, কেউ কেউ পারে। এমন সরল ভাষায় আর ছান্দসিক তারানায় সবাই বলতে পাওে না, কেউ কেউ পারে। জীবনের শৈশবকে এমন 'শৈশবীয় মায়ায়' সবাই আঁকতে পাওে না, কেউ কেউ পারে। জীবনের কৈশোরকে এমন ভাব-বৈচিত্রের ভেলায় সবাই ভাসাতে পারে না, কেউ কেউ পারে।

শিশুমনের বিমূর্ত অনুভূতি, ইঙ্গিত-আকুতি আর রস-বিলাসকে শব্দের সুদৃশ্য মালায় এমন নিপুণ করে সবাই গাঁথতে পারে না, কেউ কেউ পারে। কৈশোর-আবেগের অবুঝ অভিমান, অনর্থ অভিযান এবং সুখ-স্বপ্ন ও চঞ্চলতার এমন হৃদয়ছোঁয়া বয়ান কলমের ডগায় সবাই আনতে পাওে না, কেউ কেউ পারে।

বর্ণে-বর্ণে শিক্ষা, শব্দে-শব্দে দীক্ষা সকলে দিতে পারে না, কেউ কেউ পারে। গল্পে-গল্পে বৈঠকি চালে সত্য, সুন্দর, স্বপ্ন, সাহস, নির্মাণ ও শুদ্ধির প্রেরণা হৃদয়পুরে সকলে জাগাতে পারে না, কেউ কেউ পারে। শিল্পিত সাহিত্যের শিশির-ভেজা নরম জমিনে 'চেতনার সোনালি বীজ' সকলে ছড়িয়ে দিতে পাওে না, কেউ কেউ পারে।

হ্যাঁ, আমি আমার সেই প্রিয় মানুষ, চেতনাদীপ্ত সৃষ্টিশীল লেখক মাওলানা শরীফ মুহাম্মদ-এর কথাই বলছি। বলছি তাঁর সাম্প্রতিক সময়ের অনুপম সৃষ্টিকর্ম শৈশবের আত্মজীবনীমূলক বই 'রঙিন মখমল দিন'-এর কথা।

সত্যি বলতে, এ বইটির প্রতিটি রঙিন পাতা আর প্রতিটি মখমল কথা যে কেমন এবং কী তা কি আর কয়েক কথায় বলে দেওয়া যায়? তবুও বইটি নিয়ে আমি আমার অনভিজ্ঞ মনের কিছু অনুভব ও ভাবনার কথা বলছি। বলার চেষ্টা করছি।

বইটির খোঁজে লাইব্রেরিতে যাওয়ার পর যখন বইটি হাতে নিই, আর পাতা উল্টিয়ে মাত্র কয়েকটি শিরোনাম পড়ি, তাতেই অন্যরকম এক বিস্ময়বোধ আর ভালোলাগা থেকে মন তখন বলে উঠেছিল–কী না আশ্চর্য মুনশিয়ানা 'রাব্বুল কলম' এ লেখকের কলমে আমানত রেখেছেন!

হ্যাঁ, এ লেখক এমনই! আল্লাহ তাঁর হাতে রেখেছেন আশ্চর্য এক সৃষ্টিশক্তি। তাঁকে দান করেছেন অসামান্য এক শিল্পপ্রতিভা। আমি এ যাবৎ লেখকের অনেক বই পড়েছি। 'বিষয়ের সঙ্গে ভাষার সাজুয্য এবং ভাবনার সঙ্গে বর্ণনার মাধুর্য' আমি তাঁর লেখায় লক্ষ্য করেছি। বলা চলে এটি তাঁর 'লিখন শিল্পের' অন্যতম এক বৈশিষ্ট্য। ইনশাআল্লাহ, বক্ষমান বইটিও সে বৈশিষ্ট্যকে প্রমাণ করবে পাঠকের কাছে।

বইটি প্রকাশিত হয়েছে নবপ্রকাশ থেকে। যা নবধ্বনিরই প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। নবপ্রকাশের কাজগুলো সবসময় নান্দনিকতা ও আভিজাত্যের দিক থেকে কমবেশ অগ্রসর। বিশেষত ইতিহাস-ঐতিহ্যের উপর রচিত গল্প-উপন্যাসের বৈচিত্রধর্মী বইয়ের এক অনবদ্য ঠিকানা। তবে তাদের যে কাজটি আমার বেশ মনে ধরেছে এবং 'দরকারি ও সময়োপযোগী' বলে মনে হয়েছে, তা হলো তাদের বিদেশি ভাষা ও সাহিত্যের বিভিন্ন বিখ্যাত গ্রন্থের অনুবাদ-আয়োজন। এতে করে পাঠকের বিশ্বসাহিত্য ও বিশ্বসংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় গড়ে উঠছে। বস্তুত, সাহিত্যচর্চা করেন এমন প্রত্যেক পাঠকের জন্যই এটা নেহাৎ জরুরি বিষয়। এতে করে তিনি বুঝতে পারবেন, আধুনিক বিশ্বসাহিত্যের গতিধারা কোন দিকে বহমান। কোন পথ ধরে আগুয়ান। উপরন্তু তিনি সে-অনুসারে আপন সাহিত্যের মান নির্ণয় করে নিতে পারবেন এবং স্বীয় সাহিত্যভাণ্ডারকে আরও সমৃদ্ধ করে নিতে পারবেন।

বলছিলাম 'রঙিন মখমল দিন' বইটির কথা। যা লেখকের দিক থেকে অদ্বিতীয়, বিষয়বস্তুর দিক থেকে অপূর্ব, কভার প্রচ্ছদ, মুদ্রণ, বাইন্ডিংয়ের দিক থেকে নান্দনিক এবং নিখুঁত। মূল্যের দিক থেকে সুলভ। এককথায় একটি অনন্য বই। রুচি এবং পছন্দসই। যা কেনার মতো। যা পাঠ করার মতো...।

লেখক : শিক্ষার্থী, মারকাজুল ফিকরি ওয়াল বুহুসিল ইসলামিয়াহ, ঢাকা

‘মক্কা শহরে ছদ্মবেশী এক খ্রিষ্টানের দিনলিপি’ নবপ্রকাশের অনবদ্য একটি বই

মাহফুজুর রহমান আকন্দ

‘মক্কা শহরে ছদ্মবেশী এক খ্রিষ্টানের দিনলিপি’। বইটির মূল নাম সড়হ াড়ুধমব ধ ষধ সবপয়ঁব। অনুবাদ করেছেন ইশতিয়াক আহমাদ। বইয়ের মূল লেখক জুলেস জার্ভিস কোর্তেলোমো একজন বিখ্যাত ফরাসি আলোকচিত্রী। একদিন তাঁর মনে জেগে ওঠে মুসলমানদের তীর্থ ভূমি মক্কা ভ্রমণের বাসনা। সাথে যোগ হয়, পবিত্র কাবা গৃহ, যাকে ঘিরে মুসলমানদের বেঁচে থাকা, যার জন্য হাজারও জীবন উৎসর্গিত সেই গৃহকে ফ্রেমে বন্দী করার সাধ। তখনও কোনো আলোকচিত্রী তা ফ্রেমে আবদ্ধ করতে পারেনি। ‘সেই ভাগ্যবান আলোকচিত্রী তাকেই হতে হবে’–এই বাসনা নিয়ে শুরু হলো ভ্রমণের প্রস্তুতি।
কিন্তু যাবেন কীভাবে, তিনি যে অমুসলিম! কীভাবে ঢুকবেন মক্কা শহরে? সেখানে যে অমুসলিমদের প্রবেশ নিষিদ্ধ!
ছদ্মবেশ ধরতে হবে. মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি। সেই সঙ্গে মুসলমানদের রীতি-রেওয়াজ নকলের চেষ্টা করতে লাগলেন। চলে গেল অনেকদিন। একসময় তিনি সেই রীতি-রেওয়াজ আয়ত্ত করতে সক্ষম হলেন। তারপর এক কাফেলার সাথে রওনা হয়ে গেলেন। ছদ্মবেশী মুসলিম তিনি। পথে বহু বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হলেন। পাঠক সত্যিই শিউরে উঠবেন আঠারো শতকের সেই সমুদ্রভ্রমণের কাহিনি পড়ে। কখনো ভয় কখনো উৎকণ্ঠা, কখনো আশা কখনো-বা হতাশা। তবে লেখক যে সত্যিকারার্থেই বিচক্ষণ ও সৎ মানুষ ছিলেন সেটা গোপন থাকবে পাঠকের কাছে। অসম্পূর্ণতা বা ত্রুটি যারই হোক, বলেছেন অকপটে। বাদ দেননি নিজ মাতৃভূমির প্রসঙ্গও। বলেছেন মুসলমানদের বিশ্ব বাজারে পিছিয়ে থাকার কারণ।
লেখকের জন্য সবচেয়ে কঠিন ছিল তাঁর ‘স্বপ্ন’ পূরণ করা। কারণ মক্কায় তখন ক্যামেরা অনুমোদিত ছিল না। একজন ভিনদেশি অমুসলিমের পক্ষে সেই নিয়ম অমান্য করা কতটা কঠিন ও ভয়ংকর তা বলার অপেক্ষা রাখে না। লেখকের সেই স্বপ্ন পূরণের দুর্দান্ত কাহিনি সত্যিই উপভোগ্য ছিল।
সর্বোপরি পাঠক আঠারো শতকের আরব ইতিহাস ও তৎকালীন আরব সমাজ ও পরিবেশের সাথে পরিচিত হবেন। বইটি পাঠ্য তালিকায় থাকতে পারে।
সবশেষে অনুবাদকের প্রশংসা না করলে অবিচার হয়ে যাবে। পুরো বইয়ে দু-এক জায়গা ছাড়া মনে হয়নি যে অনুবাদ পড়ছি। অনুবাদকের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করি। নবপ্রকাশকে ধন্যবাদ, চমৎকার এই বইটি উপহার দেওয়ার জন্য।

লেখক : জামিয়াতুল মাআরিফ আলইসলামিয়া, ৮৮/৯ উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা

লাভ ইন হিজাব : আসল ভালোবাসার গল্প

আবু তাশফি

ভালোবাসতে কে না চায়। জন্ম থেকে মৃত্যু–জীবনের প্রতিটি ক্ষণ প্রতিটি পদক্ষেপে আমরা উন্মুখ হয়ে থাকি ভালোবাসার জন্য। এ এক অনন্য অনুভূতির নাম। হাজারও অনুভূতির মাঝ থেকে হৃদয় চিনে নেয় ভালোবাসাকে, তাকে সযতনে লালন করে। ভালোবাসা উজ্জীবিত করে আমাদের চেতনা, তার আলোতে পরিচালিত হয় আমাদের জীবন।

নানা আঙ্গিকে ভালোবাসা আসে আমাদের জীবনে। মা-বাবার ভালোবাসায় শুরু হয় একটি শিশুর জীবন। বড় হওয়ার সাথে সাথে নানা রঙের ভালোবাসা আসে তার কাছে।

জীবনে সব ভালোবাসারই গুরুত্ব আছে। কিন্তু শুধু বিশেষ একটি ভালোবাসার জন্য ব্যস্ত আমরা সবাই। তার কারণও আছে। এই ভালোবাসা সবচেয়ে অনিরাপদ। তাকে খুঁজতে হয়, অর্জন করে নিতে হয়। তাকে রক্ষা করতে হয়। যেকোনো সময় হারানোর ভয় থাকে। তাই আমরা এই ভালোবাসা নিয়েই বেশি কথা বলি।

বিয়ে মানুষের জীবনের এক অমোঘ বিধান। বলা যায় পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন সম্পর্ক। প্রথম মানুষ আদম ও হাওয়া আবদ্ধ হয়েছিলেন এই সম্পর্কে। আজ পর্যন্ত তা আমাদের জীবনের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায়।

কিন্তু আমরা কি বুঝতে পারি সবসময় এর গুরুত্ব? আমাদের চাকরি, বাড়ি কেনা কিংবা অন্যান্য বিষয়ের মতো বিয়েকে আমরা কি অতটা গুরুত্ব দিই? আশ্চর্যজনকভাবে আমরা অনেকটা উদাসীন, অনেকটা সম্মোহিতের মতো সেরে ফেলি এই কাজটি।

বিয়ের প্রথম ধাপ উপযুক্ত সঙ্গী খুঁজে বের করা। বিয়ের ফলাফলও অনেকটা নির্ভর করে এর ওপর। সঙ্গী খুঁজে বের করাটা তাই একটা চ্যালেঞ্জের মতো। এই ধাপে সফল হলে বাকি জীবনে সফল হওয়ার আশা থাকে।

আমাদের এই বাংলাদেশ থেকে সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে যে দেশ, সেখানকার একজন তরুণী কীভাবে খুঁজে পেয়েছিলেন তাঁর জীবনের কাঙ্ক্ষিত মানুষটিকে, সে গল্প নিয়েই নবপ্রকাশের নতুন বই 'লাভ ইন হিজাব'।

না, এটা কোনো রোমান্টিক উপন্যাস নয়। হঠাৎ দেখা হওয়া কারও সাথে জমে ওঠা ভালোবাসার গল্পও নয়। এই গল্প বহু চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে ভালোবাসার মানুষকে খুঁজে পাওয়ার। এ গল্প সমাজে গড়ে ওঠা নানা প্রথার সাথে সংগ্রামের। এই গল্প নিজের ঈমান ও মূল্যবোধকে সামনে রেখে ভালোবাসাকে খুঁজে পাওয়ার, এই গল্প একজন অপরাজিতার।

শেলিনা জাহরা জান মুহাম্মদ, ভারতীয় বংশোদ্ভূত এই মুসলিম নারী নিজেকে পরিচয় দেন একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে। এই বইটি লেখার আগে খুব বেশি মানুষ চিনত না তাঁকে। সাহস নিয়ে তিনি লিখেছেন তাঁর প্রিয়মানুষকে আবিষ্কারের গল্প। তাঁর মতে, হিজাবে ঢাকা মুসলিম মেয়েদেরও বলার মতো অনেক গল্প আছে।

এই বইয়ে উঠে এসেছে তাঁর জীবনের নানা গল্প। ছোটবেলা থেকে বেড়ে ওঠা, অমুসলিম দেশে একজন প্রকৃত মুসলিম হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলা, পাত্র খুঁজতে গিয়ে অর্জিত নানা অভিজ্ঞতা এবং শেষ পর্যন্ত সফল হওয়া–সবকিছুর পুংখনাপুঙ্খ বিবরণ দিয়েছেন তিনি এই বইয়ে।

পাঠকের জন্য অনেক কিছু জানার আছে এতে। আছে চিন্তার উপাদান। অমুসলিম দেশে বসবাসকারী একজন মুসলিম তরুণীর চিন্তা-ভাবনা অবাক হতে বাধ্য করবে বাংলাভাষী পাঠকদের। বিয়ে নিয়ে তাদের চিন্তা ভাবনাকেও বদলে দিতে পারে এই বই।

বইটি অনুবাদ করেছেন নবপ্রকাশের পাঠক নন্দিত অনুবাদক নাজমুস সাকিব।

পাঠককের শুভ কামনা

ফিলিস্তিন নিয়ে আমার আগ্রহ অনেক দিনের। কিন্তু এ বিষয়ে স্বতন্ত্র কোনো বই পড়ার সুযোগ হয়নি। পত্রপত্রিকা বা টেলিভিশনে যা দেখি, এতটুকু পর্যন্তই জানা। কী কারণে একদিন রকমারিতে ফিলিস্তিন সংক্রান্ত বই খুঁজতে লাগলাম। অনেকগুলোই পেলাম। নবপ্রকাশের 'ইন দ্য হ্যান্ড অব তালেবান' এবং 'গুয়ান্তানামোর ডায়েরি' পড়া হয়েছিল আগেই। ভাষার মান ছাড়াও নবপ্রকাশের বইয়ের প্রচ্ছদ বাঁধাই সেটআপ বেশ ভালো মনে হয়েছিল আমার কাছে। ফিলিস্তিন সংক্রান্ত বই খুঁজতে গিয়ে তাদের তিনটি বই চোখে পড়ল এ বিষয়ে। 'সুপ্রভাত ফিলিস্তিন', 'রামাল্লা থেকে বলছি' এবং 'গল্প বলি ফিলিস্তিনের'। তিনটা বইয়েরই শুরু অংশ পড়ে ভালো লাগল। অর্ডার করে ফেললাম রকমারিতে।

তিনটি বইই চমৎকার। 'সুপ্রভাত ফিলিস্তিন' পড়ে একদম স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম। উপন্যাসের মোড়কে ফিলিস্তিনের ৭০ বছরের যন্ত্রণাদগ্ধ ইতিহাস উঠে এসেছে বইয়ের ভেতর। 'রামাল্লা থেকে বলছি' আত্মজীবনীমূলক। ফিলিস্তিনের এক নারীর দৈনন্দিন জীবনযাপনের বর্ণনার মধ্য দিয়ে উঠে এসেছে ফিলিস্তিনিদের বর্তমান জীবনযাত্রার করুণ চিত্র। আর 'গল্প বলি ফিলিস্তিনের' বইটি বিষয়বস্তুর তুলনায় খুবই ছোট্ট একটি বই। কিন্তু লেখক হামমাদ রাগিবের প্রশংসা করতে হয় এখানে। অল্প কথার ভেতর ফিলিস্তিনে ইসলামের আগমন থেকে নিয়ে ইহুদিদের দখলদারি ও ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত দীর্ঘ একটা সময়ের সঙ্গে পাঠককে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন অত্যন্ত দক্ষতার সাথে। সেই সাথে ফিলিস্তিনের কয়েকজন বীর এবং কিশোর সংগ্রামীর আত্মদানের গল্পও তুলে এনেছেন চমৎকারভাবে। এক বৈঠকে পুরো বইটি পড়ে ফেলা যায়, এবং এক বৈঠকেই ফিলিস্তিনের অতীত ও বর্তমানকে হৃদয়ে গেঁথে নেওয়া যায় সুন্দরভাবে।

নবপ্রকাশের মোট পাঁচটি বই আমার পড়া হয়েছে। পাঁচটি বইই অসাধারণ লেগেছে। ফেসবুকে নবপ্রকাশের পেজ থেকে জানতে পারলাম, প্রতিষ্ঠানটির পাঁচ বছর পূর্তি হচ্ছে। পাঁচ বছর পূর্তিতে নবপ্রকাশ পরিবারকে অভিনন্দন। আশা থাকবে, আগামীতে আরও সুন্দর সুন্দর বই প্রতিষ্ঠানটি আমাদের উপহার দেবে।

–আশিকে এলাহী

চৌমুহনী, নোয়াখালী

অপ্রিয় হলেও সত্য যে বাংলা ভাষায় ইসলামি সাহিত্যের সবটুকুই সাহিত্য রসে সিক্ত নয়। বিশেষ করে ইতিহাস ও জীবনী সাহিত্যের ক্ষেত্রে কথাটা শতভাগ প্রযোজ্য। বলতে দ্বিধা নেই যে ইসলামি ইতিহাস ও জীবনী-সাহিত্য পড়লে অনেক ক্ষেত্রে মনে হয় যেন কোনো ধারা-বিবরণী পাঠ করছি।

একধরনের হীনমন্যতায় তখন মন ছেয়ে যায়। সময়ের পরিক্রমায় অবশ্য এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটছে। মেধাবী তরুণ আলেমরা এখন সাহিত্য সাধনায় আত্মনিয়োগ করছেন। ফলে ইসলামি প্রকাশনা-শিল্পে একটা ভিন্ন মাত্রা যোগ হচ্ছে। এই পরিবর্তনশীল সময়ে প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান নবপ্রকাশ তাদের প্রতিটি প্রকাশনায় একটা প্রশংসার সাক্ষর রাখছে।

প্রিয় লেখক সালাহউদ্দীন জাহাঙ্গীরের লেখা

নবপ্রকাশ থেকে প্রকাশিত 'প্রিয়তমা' বইটি আমি বার কয়েক পড়েছি। আরও পড়ার তামান্না রয়েছে। উম্মাহাতুল মুমিনিনের পবিত্র জীবনের উপর লেখা এমন নাতিদীর্ঘ ও সুখপাঠ্য কোনো বইয়ের সাথে এই প্রথম আমার পরিচয়। বইটির বর্ণনা-শৈলী হৃদয়ছোঁয়া এবং স্বতন্ত্র। বইটির গুণী লেখক এবং এর বিচক্ষণ প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান নবপ্রকাশকে অসংখ্য ধন্যবাদ।
আর কিছুদিন পর প্রতিষ্ঠানটির পাঁচ বছর পূর্তি হবে শুনলাম। এ উপলক্ষে প্রতিষ্ঠানটির জন্য রইল শুভকামনা।

–আবু জাফর মোঃ সালেহ
কুমিল্লা, কোটবাড়ি

বর্তমান বই-বাজারে নিত্যনতুন বই আসছে, বিক্রি হচ্ছে। কিন্তু গল্প, উপন্যাস, কবিতা, ছড়ার বইয়ের ভিড়ে ধর্মীয় বই খুব একটা পাওয়া যায় না। বিক্রি হবে কিনা সেই চিন্তা এবং নানান সীমাবদ্ধতা থাকার কারণে হয়তো অনেক প্রকাশনী সেই চ্যালেঞ্জটা নিতে চায় না। নবপ্রকাশ সেই চ্যালেঞ্জটা নিয়েছে। তাদের বেশ কিছু ইসলামি বই আমি সংগ্রহ করেছি। পড়েছি। অন্তত আমি এটা নির্দ্বিধায় বলতে পারি, ইসলামি বইয়ের চাহিদাটা তারা ভালোমতো পূরণ করতে পারবে। তাদের এই উদ্যোগ মানুষের অন্তরে ভালোই দাগ কাটবে বলে আমার বিশ্বাস। মানুষ উপকৃত হবে নিঃসন্দেহে। নবপ্রকাশের যে কয়টি বই আমার সংগ্রহে আছে, তার মধ্যে 'খলিফা হত্যাকাণ্ড' অন্যতম। অনেক ভালো একটা বই। আমি মনে করি, ধর্মীয় বইপ্রেমীদের মনের খোরাক জোগাতে এ ধরনের বই অবশ্যই ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। নবপ্রকাশের এই পথচলায় একজন পাঠক হিসেবে আমিও নিজেকে তাদের সহযাত্রী মনে করি। নবপ্রকাশের পাঁচ বছর পূর্তিতে তাদের জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। শুভ কামনা সবসময়ই।

–এম ইয়াসিন আরাফাত
লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম
arafath-2012@live.com

মাসিক নবধ্বনির প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান নবপ্রকাশ সফলতার পাঁচ বছর পার করছে। একটি গঠনমূলক গ্রন্থনা ও প্রকাশনা সংস্থার জন্য সফলতার সঙ্গে পাঁচ বছর পার করা অনেক বড় ব্যাপার। কারণ, লিখনী শক্তির ক্রমবৃদ্ধি ও আবহমানকালের প্রতিযোগিতায় নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করা একটা চ্যালেঞ্জের ব্যাপার। নানা প্রতিকূলতার মাঝেও নবপ্রকাশ সেই চ্যালেঞ্জে, আমি মনে করি, জয়ী হতে পেরেছে।
নবপ্রকাশের বেশ কয়েকটি বই আমার পড়ার সৌভাগ্য হয়েছে। বিশেষ করে মাওলানা সালাহউদ্দীন জাহাঙ্গীরের 'প্রিয়তমা' ও 'হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল' উল্লেখযোগ্য। আমি তাঁর এই দুইটি

বই কয়েকবার পড়েছি। এতো সুন্দর লিখনী, একবার পড়ে দ্বিতীয়বার পড়ার পড়েছি, তারপরও তৃষ্ণা মেটেনি। খুবই সুন্দও বই, প্রেরণা পেয়েছি দুইটি বই থেকেই। পেয়েছি আশার আলো, বিশ্বাসের পরম রত্ন। বলতে গেলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সম্মানিতা সহধর্মিণীদের সম্পর্কে অনেক অজানা বিষয় জানতে পেরেছি।

নবপ্রকাশের বই প্রকাশের রুচি ও স্বাতন্ত্র্য আমাকে মুগ্ধ করে। নবপ্রকাশের সবগুলো বইই অনেক অনেক প্রশংসা পাবার দাবি রাখে। নবপ্রকাশের পঞ্চম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে নবপ্রকাশ পবিরারের সকলের সুস্বাস্থ্য, নেক হায়াত, পরিপাটি জীবন ও সর্বাঙ্গীন সফলতা কামনা করি।

−ম. কাজী এনাম

বিএসএস অনার্স (অর্থনীতি), ডাবল এমএ (হাদিস)
সিনিয়র শিক্ষক, জামিয়া কুরআনিয়া সৈয়দা সৈয়দুন্নেছা ও কারিগরি শিক্ষালয়, কাজীপাড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

বাংলাদেশের সৃজনশীল প্রকাশনীগুলোর মধ্যে নবপ্রকাশকে অন্যতম বলা যায়। আমি ব্যক্তিগতভাবে একসাথে নবপ্রকাশের যতগুলো বই পড়েছি, অন্য কোনো প্রকাশনীর বই এতোটা পড়িনি। এর কয়েকটা কারণ। প্রথমত প্রিয় লেখক সালাহউদ্দীন জাহাঙ্গীর ও হামমাদ রাগিব ভাইসহ অপরাপর যতজন লেখক আমার প্রিয় লেখকের তালিকায়, তাঁদের অধিকাংশের বই-ই নবপ্রকাশ থেকে প্রকাশ হয়েছে। তাছাড়া প্রিয় পত্রিকা নবধ্বনির সংশ্লিষ্টতা তো আছেই। যে বইগুলো পড়ে ভালো লেগেছে, তন্মধ্যে সালাহউদ্দীন জাহাঙ্গীর ভাইয়ের 'প্রিয়তমা', 'প্রিয় প্রেয়সী নারী', 'ইতিহাসের জানালা', 'হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল', 'বদরের বীর' প্রভৃতি অন্যতম। সংগ্রহ করেছি কিন্তু এখনও পড়া হয়নি−এমন বইয়ের তালিকাও দীর্ঘ। এর মধ্যে কয়কটি হলো, ইশতিয়াক আহমাদ অনূদিত 'খলিফা হত্যাকাণ্ড', ফারুক আজম অনূদিত 'কীর্তিমানদের ছেলেবেলা' এবং হামমাদ রাগিব ভাইয়ের 'সোনালি দিনের গল্প'।

তবে পঠিত এবং পঠিতব্য সব বইয়ের মধ্যে আমি সালাহউদ্দীন ভাইয়ের 'প্রিয়তমা'য় যে স্বাদ পেয়েছি, তা অন্তত আমার পক্ষে ব্যক্ত করা সম্ভব না। প্রিয়তমার ভাষাগত সৌকর্য, ইতিহাসকে গল্পের মোড়কে উপস্থাপন এবং একই সাথে উম্মাহাতুল মুমিনিনদের আদ্যোপান্ত জীবনবৃত্তান্ত সবই বর্ণনাতীত। শুধু এই বইয়ের জন্য হলেও নবপ্রকাশকে আমি কালজয়ী গ্রন্থের ঠিকানা হিসেবে মূল্যায়ন করতে চাই।

প্রিয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের পাঁচ বছর পূর্তি হবার সংবাদ অনলাইন মারফত জানতে পারলাম। পাঁচ বছর পূর্তিতে নবপ্রকাশ-সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য শুভ কামনা রইল।

-রফিকুল ইসলাম

পং মসূয়া, কটিয়াদী, কিশোরগঞ্জ

নবপ্রকাশ-এর বই

প্রিয়তমা

লেখক : সালাহউদ্দীন জাহাঙ্গীর



ধরন : গল্পভাষ্য
বাঁধাই : হার্ডকভার
পৃষ্ঠা : ৩৫২
মুদ্রিত মূল্য : ৳ ৫২০

আয়েশার (রা.) সঙ্গে রাসুল মুহাম্মদের (সা.) দাম্পত্যজীবন কি অসুখী ছিল? একজন কেবলই কিশোরী, আরেকজন পঞ্চাশোর্ধ্ব প্রবল ব্যক্তিত্ববান মানুষ; কেমন ছিল অসম বয়সী এ দুজনের প্রেমময় সংসারের ছায়াছবি? ঝগড়া হতো? খুনসুটি? মান-অভিমানে কান্না হতো?
খাদিজা (রা.) কেন প্রৌঢ়ত্বের দ্বারপ্রান্তে এসে হাত বাড়িয়ে আগলে নিলেন যুবক মুহাম্মদের হাত? মুহাম্মদ (সা.) যেদিন নবি হলেন, ভয়ে কাঁপছিলেন তিনি; খাদিজা কেন তাঁকে বুকে জড়িয়ে বলেছিলেন, 'আপনার কোনো ভয় নেই?'
রাসুল মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর ১১ জন স্ত্রীর দাম্পত্যজীবনের অসংখ্য গল্পভাষ্য নিয়ে রচিত ইতিহাস-অনুসন্ধানী লেখক সালাহউদ্দীন জাহাঙ্গীর-এর উপাখ্যানগ্রন্থ 'প্রিয়তমা'। একদিকে নিরেট নির্মোহ ইতিহাসের বর্ণিল আয়োজন, আরেক দিকে উম্মুল মুমিনিনদের জীবনের অনালোচিত অধ্যায়ের অভিনব আবিস্কার। অনবদ্য ভাষাশৈলী ও প্রাঞ্জল গদ্যে রাসুলের দাম্পত্যজীবনের পূর্ণ ছায়াছবি উঠে এসেছে এ গ্রন্থে।
প্রিয়তমা রাসুলপত্নীদের জীবনীগ্রন্থ নয়; বরং তাঁদের জীবনের সুরম্য গল্পভাষ্য। জীবনের গল্পগুলো জীবনীর মতো নয়, বাঙময় হয়েছে গল্পের আদলে। জীবনের গল্প বলতে গিয়ে ওঠে এসেছে তাঁদের সঙ্গে রাসুলের দাম্পত্য ভালোবাসা, সাংসারিক প্রেম, পারস্পরিক সৌহার্দ্য, জীবনযুদ্ধে লড়ে যাওয়ার সঞ্জিবনী, নারী অধিকার, নারীশিক্ষাসহ আরও অনেক অজানা কাহিনিকাব্য।
আমাদের লৌকিক সমাজের প্রায় প্রতিটি পরিবারে আজকাল শোনা যায় স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য কলহ, মানসিক টানাপোড়েন, পরস্পরের বিশ্বাসহীনতা, সংসার ভাঙার করুণ সুর। দাম্পত্য কলহের বিষবাষ্প যেন ধীরে ধীরে গ্রাস করে নিচ্ছে আমাদের চারপাশের সমাজ। কিন্তু আমরা নিজেদের কি কখনো রাসুল ও তাঁর স্ত্রীদের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছি? কখনো কি তাঁদের সংসারের আদলে আমাদের সাংসারিক সমস্যাগুলো মোকাবেলা করার চেষ্টা করেছি? হয়তো কখনো করা হয়নি। অথচ তাঁদের জীবনে রয়েছে প্রেম আর ভালোবাসায় পূর্ণ এক সংসারের ছায়াছবি। তাঁদের দাম্পত্যজীবনের অসংখ্য অনুপম শিক্ষা সমগ্র পৃথিবীর জন্য শিক্ষণীয়। অনাগত সকল সভ্যতার জন্য তাঁদের সাংসারিক প্রেম নক্ষত্রের মতো জাজ্বল্যমান। যে গ্রহণ করবে, তার জীবন আলোকিত হবে।

ইন দ্য হ্যান্ড অব তালেবান

মূল: ইভন রিডলি
অনুবাদ: আবরার হামীম



ধরন : আত্মজীবনী
বাঁধাই : হার্ডকভার
পৃষ্ঠা : ২৪০
মুদ্রিত মূল্য : ৳ ৪০০

মনে আছে, তালেবানের হাতে বন্দী সেই খৃস্টান নারী সাংবাদিকের কথা? ২০০১ সালে আমেরিকার সন্ত্রাসবাদী যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর আফগানিস্তানে তালেবানের সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে অপহৃত হয়েছিলেন এ নারী সাংবাদিক এবং পরবর্তীতে মুক্তি পেয়ে গ্রহণ ইসলাম করেছিলেন ইসলাম। শুধু তাই নয়, ইসলাম গ্রহণের পর তিনি হয়ে উঠেন ইসলামের একজন অকুতোভয় দায়ি। মনে আছে সেই সাহসী নারীর কথা? পুরো পশ্চিমাবিশ্বকে যিনি কাঁপিয়ে দিয়েছিলেন তার আত্মজীবনী বয়ান করে।

তার নাম ইভন রিডলি। পশ্চিমাবিশ্বে যিনি এক বিস্ময়ের নাম!

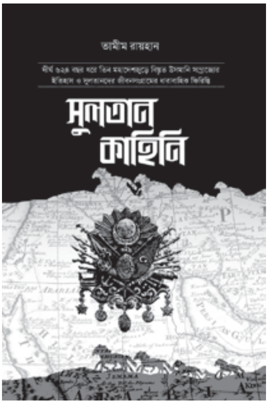
'ইন দ্য হ্যান্ড অব তালেবান' তারই লেখা আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ। যেখানে তিনি টুইন টাওয়ার হামলা থেকে শুরু করে সংবাদ সংগ্রহের জন্য তার আফগান যাত্রা, ওয়ার অন টেরর, তালেবানের হাতে বন্দী হওয়া, মুক্তি, স্বদেশ প্রত্যাবর্তন এবং ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার চমকপ্রদ কাহিনি বর্ণনা করেছেন নিঃশঙ্কোচে। ইউরোপ ও আমেরিকায় ইসলাম নিয়ে যে ভীতি ও শঙ্কা দিন দিন ঘৃণার জন্ম দিচ্ছে, কীভাবে পশ্চিমারা ইসলাম ও মুসলিমদের দোষী সাব্যস্ত করে পৃথিবীর সামনে উপস্থাপন করছে, নির্দোষ মানুষকে কীভাবে সন্ত্রী, জঙ্গি, মানবতার শত্রু বলে চিহ্নিত করছে– তার এক নির্মোহ বয়ান এ গ্রন্থ।

তরুণ অনুবাদক আবরার হামীম অত্যন্ত পেশাদার ও দরদি কলমে তুলে এনেছেন ইভন রিডলির আত্মজীবনীর আনুপুঙ্খিক বয়ান। ভাষান্তর বর্ণনার ক্ষেত্রে তার মুন্সিয়ানা চোখে পড়ার মতো। সাবলীল গতিতে এ আত্মজীবনী পাঠ করে বুঝার উপায় নেই এটি তার প্রথম অনূদিত গ্রন্থ।

বিশ্বব্যাপী আলোড়ন তোলা বহু ভাষায় অনূদিত এ বেস্টসেলার বইটি বাংলাদেশের পাঠকদের জন্য নিয়ে এসেছে নবপ্রকাশ।

সুলতানকাহিনি

লেখক: তামীম রায়হান



ধরন : ইতিহাস
বাঁধাই : হার্ডকভার
পৃষ্ঠা : ২৯৬
মুদ্রিত মূল্য : ৳ ৩২০

সুদীর্ঘ ৬২৪ বছরের টগবগে ইতিহাস। মুসলিম ইতিহাসের এক অবিচ্ছেদ্য নিশান হয়ে উড়তে থাকা উসমানি খেলাফতের এক সুনিপুণ আর নির্মোহ ব্যবচ্ছেদ। উসমানি সুলতানদের জীবন, যুদ্ধ, ধর্মীয়ানুভূতি, রাজ্যশাসন, ব্যক্তিগত আচারসহ সর্বদিক তুলে আনা এক অনন্য গ্রন্থ– সুলতানকাহিনি।

ইতিহাসের অনিসন্ধিৎসু ঘোড়সওয়ার লেখক-সাংবাদিক তামীম রায়হান বছরব্যাপী ইতিহাসপাঠ, তথ্যবিচার আর নির্মোহ মূল্যায়নের পর অনবদ্য বর্ণনায় পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন উসমানি খেলাফতের হাজারো অজানা অধ্যায়। যা বাংলাভাষী পাঠকের অগোচরেই রয়ে গিয়েছিল এতোদিন। 'সুলতানকাহিনি' সেই অনুদ্ঘাটিত সত্যকে নিয়ে এসেছে কাগজের কারাগারে।

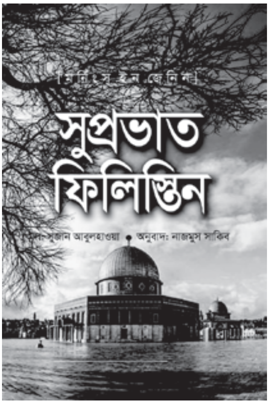
মুসলিম ইতিহাস তো বটেই, গোটা পৃথিবীর ইতিহাসে বংশানুক্রমিক শাসনব্যবস্থার সর্বশেষ ধারাবাহিকটি ছিল উসমানি সাম্রাজ্য। সুদীর্ঘ ৬২৪ বছর ধরে তিন মহাদেশজুড়ে বিস্তৃত এই সাম্রাজ্যের পতনের মধ্য দিয়ে শেষ হয় খেলাফতি শাসন বা মুসলিম সালতানাতের অধ্যায়।

উসমানিধারা সমাপ্তির পর এখনও ১০০ বছর পেরোয়নি, অথচ এ সম্পর্কে বাংলাভাষী পাঠক তো বটেই, সমকালীন বিশ্বের অনেক বোদ্ধাও খুব বেশি অবগত নন। কারণ, উসামনি ইতিহাস সম্পর্কে লেখালেখি তুর্কি ভাষায় প্রচুর হলেও ইংরেজি ও আরবিতে সেই তুলনায় অপ্রতুল। বরং এ দু' ভাষায় যা কিছু লেখালেখি হয়েছে এবং হচ্ছে, এগুলোর বেশিরভাগই একপেশে এবং পক্ষপাতদুষ্ট। কেউ বা স্তুতি আর স্তববাক্যে খেলাফত আর খলিফাদের নিশান উড়িয়েছেন আবেগী কলমে, আমার বিপক্ষবাদীরা কটাক্ষ ও হীনতার আঁচড়ে উপড়ে দিয়েছেন তাদের সুদীর্ঘ শতাব্দীর আটপৌড়ে ইতিহাসকে।

মর্নিংস ইন জেনিন

সুপ্রভাত ফিলিস্তিন

মূলঃ সুজান আবুলহাওয়া
অনুবাদকঃ নাজমুস সাকিব

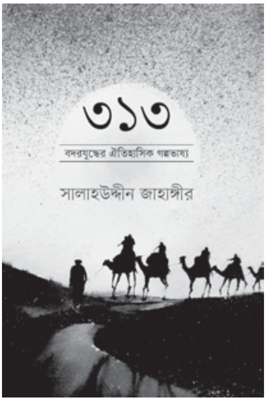


ধরন : উপন্যাস
বাঁধাই : হার্ডকভার
পৃষ্ঠা : ৩৫২
মুদ্রিত মূল্য : ৳ ৫০০

ফিলিস্তিনি বংশোদ্ভূত আমেরিকান লেখিকা সুজান আবুলহাওয়ার লেখা মর্নিংস ইন জেনিন বইটি যুদ্ধ ও ভালোবাসার গল্প। মৃত্যুপুরীর মধ্যে বেঁচে থাকার গল্প। যুগ যুগ ধরে নিপীড়িত ফিলিস্তিনিদের গল্প। গণমাধ্যম ও পৃথিবীর মানুষের চোখের আড়ালে থাকা এক অকথ্য গল্প।
লেখিকা তাঁর উপন্যাসে অনেক লম্বা সময় ধরে চলা ঘটনাপ্রবাহের কথা বলেছেন। ১৯৪৮ সাল থেকে নিয়ে শুরু করে বই রচনার সময় (২০০২) পর্যন্ত–দীর্ঘ সময়ের চারটি প্রজন্মের মানুষের জীবনের চিত্র তিনি তুলে ধরেছেন। উপন্যাসে তিনি দেখিয়েছেন, এই দীর্ঘ সময়ে জন্ম নেওয়া প্রতিটি ফিলিস্তিনি যেকোনোভাবে ইসরায়েলের নিপীড়নের শিকার। সাথে সাথে তিনি দেখিয়েছেন, ফিলিস্তিনের এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্ম কীভাবে তাদের দেশকে ভালোবাসতে শেখে। দেখিয়েছেন, ইসরায়েলের দখলদারির প্রায় ৫০ বছর পর জন্ম নেওয়া শিশুরা কীভাবে সংগ্রাম করে যায় তাদের মাতৃভূমির জন্য। উপন্যাসের মনসুর, জামিল, জামাল বা সারা তার উদাহরণ।
এই উপন্যাসে যেসব চরিত্রের বর্ণনা রয়েছে, লেখক বলেছেন–সেগুলো কাল্পনিক, তবে ঘটনাপ্রবাহ সব বাস্তব। আবুল হিজা পরিবারের সদস্যদের নিয়ে লেখক যেভাবে গল্প সাজিয়েছেন, ১৯৪৮ সালে বাস্তুহারা লাখ লাখ ফিলিস্তিনির গল্প এর চেয়ে ভিন্ন কিছু ছিল না। তাই উপন্যাসটি পড়তে গিয়ে মনে হবে বাস্তব কোনো ফিলিস্তিনি পরিবারের গল্প এটি।
আজ ৭০ বছর পরও ফিলিস্তিন সেই আগের মতো। ইসরায়েল দিন দিন তার সীমানা বড় করছে। ফিলিস্তিনিরাও প্রায় শূন্য হাতে তাদের সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে।
ফিলিস্তিন আমাদের ভালোবাসা। আমাদের প্রথম কেবলা আকসার দেশ। স্রষ্টার বিশেষ দানে ধন্য ভূমি। ফিলিস্তিন বুকের গভীরে লুকানো ক্ষত। সেই ক্ষতকে নতুন করে অনুভব করাবে এই বই। জাগিয়ে দেবে বুকের ভেতর লুকিয়ে থাকা ভালোবাসাকে।
এ পর্যন্ত প্রায় ২৬টি ভাষায় অনূদিত হয়েছে বইটি।

৩১৩ : বদরযুদ্ধের ঐতিহাসিক গল্পভাষ্য

লেখক : সালাহউদ্দীন জাহাঙ্গীর



ধরন : গল্পভাষ্য
বাঁধাই : হার্ডকভার
পৃষ্ঠা : ২৪০
মুদ্রিত মূল্য : ৳ ৩৪০

বদরযুদ্ধে মক্কার কুরাইশনেতা আবু জাহেলকে হত্যাকারী দুজন সাহাবির ব্যাপারে নিশ্চয় শুনেছেন আপনি। কখনো কি প্রশ্ন জেগেছে–আবু জাহেলকে হত্যা করেন যারা তারা সত্যি নিতান্ত দুজন বালক ছিলেন মাত্র?

যে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম একাধারে ১৩ বছর বিনীতকণ্ঠে মানুষের দ্বারে দ্বারে ইসলামের বাণী নিয়ে গেছেন, শত অত্যাচার, অপমান আর গলাধাক্কা সত্ত্বেও যিনি সামান্য প্রতিবাদ করেননি; মদিনায় আগমনের এক বছর যেতে না যেতেই কেন তিনি হাতে তুলে নিলেন ধারালো তরবারী? বদরযুদ্ধ কি অবশ্যম্ভাবী ছিল?

মাত্র ৩১৩ জন মুসলিমের এক মামুলি সেনাদল, অন্যদিকে রণসজ্জায় সজ্জিত এক হাজার কুরাইশের উদ্ধত বাহিনী। ইতিহাসের গতিপথ বদলে দেয়া এ যুদ্ধজয় আরবের বুকে ইসলামের ভিত এত মজবুতভাবে প্রোথিত করেছিল, মাত্র ২০ বছর পর বিজয়ী সেনাদলের উত্তরসূরীরা পদানত করেছিল রোম-পারস্যের বিরাট বিরাট সাম্রাজ্য।

বদরযুদ্ধ নিয়ে অসংখ্য রূপকথা, মিথ, গল্প, উপাখ্যান তৈরি হয়েছে পৃথিবীর নানা জনপদে, বিভিন্ন ভাষায়। সবকিছু ছাপিয়ে হাদিস ও সিরাতের সূত্রনির্ভর ধারাবর্ণনায় রচিত হয়েছে ‘৩১৩ : বদরযুদ্ধের ঐতিহাসিক গল্পভাষ্য’ বইটি। প্রাঞ্জল ভাষা, সাহসী গদ্য আর গল্পভাষ্যের টান টান উত্তেজনা নিয়ে সিরাতপাঠের নতুন সংযোজনা এ বই।

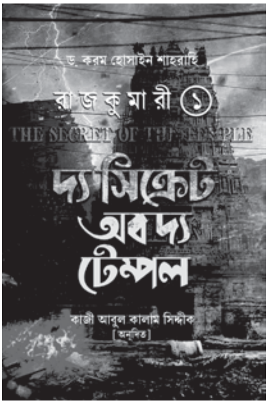
সালাহউদ্দীন জাহাঙ্গীর-এর সাহসী কলমের আঁচড়ে তৈরি হয়েছে সিরাতের নতুন আরেক অধ্যায়। একবার পড়তে শুরু করলে যুদ্ধদিনের উপাখ্যান শেষ না করে উপায় নেই।

রাজকুমারী ১ — দ্য সিক্রেট অব দ্য টেম্পল

রাজকুমারী ২ — ব্লাড অব দ্য প্রিন্সেস

মূল : ড. করম হোসাইন শাহরাহি

অনুবাদক : কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক





ধরন : উপন্যাস
বাঁধাই : হার্ডকভার
পৃষ্ঠা : ১২০
মুদ্রিত মূল্য : ৳ ৩০০

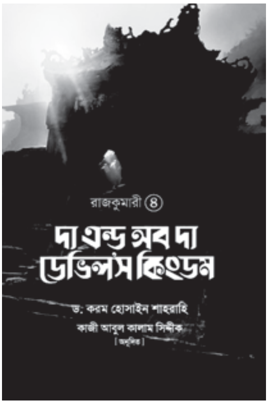
ইতিহাস যুদ্ধ জীবন ধর্ম প্রেম ও হাসি-কান্নার কড়ি গেঁথে নির্মিত এ গ্রন্থ। সময়ের ধূলি আস্তরে চাপা পড়া নিকট অতীতের এক অনবদ্য উপাখ্যান। এ গ্রন্থ এমন এক ইতিহাস তুলে এনেছে যার তালাশ ছিলো না বহুদিন ইতিহাসের পাতায়। ষোড়শ শতকের অবিভক্ত ভারতবর্ষের আসামের রাজা কৃষ্ণকুমার ও বাংলার সুলতান আলি কুলি খানের মাঝে সংঘটিত রোমহর্ষক যুদ্ধের বিস্ময়কর উত্থান-পতনের দাস্তানঋদ্ধ এ গ্রন্থ। বাংলার সুলতানের বীরত্ব ও শৌর্যের কীর্তিগাথা যেমন মোড়ক খুলেছে সাহসী কলমে, তেমনি মুখোশ উন্মোচিত হয়েছে অত্যাচারী রাজা কৃষ্ণকুমারের আদর্শলালিত হিংস্রদের, যারা এই বাংলার বুক থেকে মুছে দিতে চেয়েছিলো ইসলাম ও মুসলমানদের পরিচয়।
বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সে সময়গুলো সত্যের ও তথ্যের নিপুণ মিশেলে এতে জীবন্ত করে তুলেছেন সত্যানুসন্ধানী লেখক ড. করম হোসাইন শাহরাহি। ঐতিহাসিক উপন্যাস-সাহিত্যে একটি অভিনব দিগন্তের উদ্ভাস এ উপন্যাস। তৎকালীন ভারতবর্ষের হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা, দুই সম্প্রদায়ের সামাজিক রীতিনীতি ও রুচির পার্থক্য, মারদাঙ্গা যুদ্ধের রোমহর্ষক দৃশ্যপট, মুখোশের অন্তরালে থাকা কপট ধর্মব্যবসায়ী, সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন, রক্তপাত, লালসা, জিঘাংসা, প্রেম, পাশবিকতা ও অনেক কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনিচিত্রের সাথে পরিচিত হবেন নিমগ্ন পাঠক।
মোট পাঁচ খণ্ডের বিশাল আকারের উপন্যাসের প্রথম খণ্ড এটি। উপন্যাসটি বাংলায় অনুবাদ করে বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাস অঙ্গনকে ঋদ্ধ ও সমৃদ্ধ করেছেন লব্ধপ্রতিষ্ঠিত লেখক-অনুবাদ কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক। তার অনুবাদে পাঠক পাবেন মূলের স্বাদ, অনবদ্য গদ্যের গতিময়তা, শব্দ ও মর্মের প্রাণোচ্ছল কলমুখরতা এবং ইতিহাসের পথ ধরে হেঁটে যাবেন একটি অনুন্মোচিত বাংলাদেশের মানচিত্রে।
আপনাকে স্বাগতম সাজানো এ উদ্যানে!

রাজকুমারী ৩
দ্য লাস্ট ক্যাসল অব দ্য কিং

রাজকুমারী ৪
দ্য এন্ড অব দ্য ডেভিল'স কিংডম

মূল : ড. করম হোসাইন শাহরাহি
অনুবাদক : কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক





ধরন : উপন্যাস
বাঁধাই : হার্ডকভার
পৃষ্ঠা : ১২০
মুদ্রিত মূল্য : ৳ ৩০০

বাংলাদেশের অনুদ্ঘাটিত ইতিহাসের চমকপ্রদ এক উপাখ্যান এ গ্রন্থ– ব্লাড অব দ্য প্রিন্সেস। এ উপাখ্যান পাখনা মেলেছে সে সময়ে, যখন মুলকে বাংলার দখলদারিত্ব ছিলো দিল্লির মুঘল সালতানাতের হাতে। ইতিহাস যুদ্ধ জীবন ধর্ম প্রেম ও হাসি-কান্নার কড়ি গেঁথে নির্মিত এ গ্রন্থ। সময়ের ধূলি আস্তরে চাপা পড়া নিকট অতীতের এক অনবদ্য উপাখ্যান। এ গ্রন্থ এমন এক ইতিহাস তুলে এনেছে যার তালাশ ছিলো না বহুদিন ইতিহাসের পাতায়। ষোড়শ শতকের অবিভক্ত ভারতবর্ষের আসামের রাজা কৃষ্ণকুমার ও বাংলার সুলতান আলি কুলি খানের মাঝে সংঘটিত রোমহর্ষক যুদ্ধের বিস্ময়কর উত্থান-পতনের দাস্তানঋদ্ধ এ গ্রন্থ। বাংলার সুলতানের বীরত্ব ও শৌর্যের কীর্তিগাথা যেমন মোড়ক খুলেছে সাহসী কলমে, তেমনি মুখোশ উন্মোচিত হয়েছে অত্যাচারী রাজা কৃষ্ণকুমারের আদর্শলালিত হিংস্রদের, যারা এই বাংলার বুক থেকে মুছে দিতে চেয়েছিলো ইসলাম ও মুসলমানদের পরিচয়।

বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সে সময়গুলো সত্যের ও তথ্যের নিপুণ মিশেলে এতে জীবন্ত করে তুলেছেন সত্যানুসন্ধানী লেখক ড. করম হোসাইন শাহরাহি।

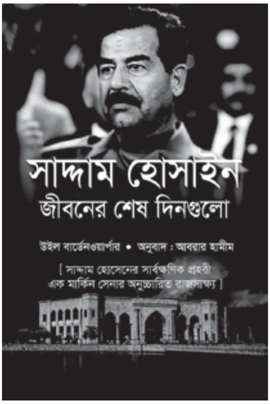
মোট পাঁচ খণ্ডের বিশাল আকারের উপন্যাসের প্রথম দ্বিতীয় খণ্ড এটি। প্রথম খণ্ড– 'দ্য সিক্রেট অব দ্য টেম্পল'ও প্রকাশের পরই সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়। উপন্যাসটি বাংলায় অনুবাদ করেছেন কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক। তার অনুবাদে পাঠক পাবেন অনকোরা স্বাদ, অনবদ্য গদ্যের গতিময়তা, শব্দ ও মর্মের প্রাণোচ্ছল কলমুখরতা এবং ইতিহাসের পথ ধরে হেঁটে যাবেন একটি অনুন্মোচিত বাংলাদেশের মানচিত্রে।

সাদ্দাম হোসাইন

জীবনের শেষ দিনগুলো

মূল : উইল বার্ডেনওয়ার্পার

অনুবাদক : মোয়াজ আবরার

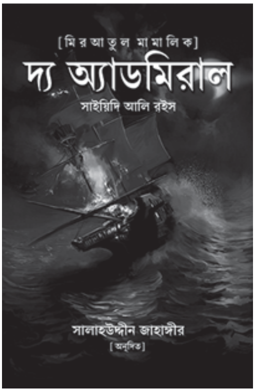


ধরন : আত্মজীবনী
বাঁধাই : হার্ডকভার
পৃষ্ঠা : ২৪০
মুদ্রিত মূল্য : ৳ ৩৪৫

সাদ্দাম হোসাইন।
ইরাকের সাবেক এই প্রেসিডেন্ট তাঁর মৃত্যুর এক দশকের বেশি সময় পরও বিশ্বময় আলোচিত এবং সমালোচিত হয়ে আছেন। দীর্ঘমেয়াদে ইরাক শাসনকালে শাসক হিসেবে তাঁর কার্যক্রমের নিন্দা এবং প্রশংসা, দুটোই হয়েছে বেশ। কিন্তু একজন মানুষ হিসেব কেমন ছিলেন তিনি? নবপ্রকাশ-এর প্রকাশিত এ বইয়ে মিলবে সেই উত্তর। বইটির আগাগোড়া পাঠে পাঠক সাদ্দাম হোসাইনের এমন এক রূপ ও চরিত্র সম্পর্কে জানতে পারবেন, যা আজ অবধি সবার আড়ালে রয়ে গেছে।
এই বইয়ের লেখক একজন মার্কিন সেনা, তিনি নিজের চোখে সাদ্দাম হোসাইনকে দেখেছেন খুব কাছ থেকে। বন্দী হওয়ার পর থেকে ফাঁসির কাষ্ঠে সমর্পণ পর্যন্ত ধীরে ধীরে তাঁর নিজের এবং সহকর্মীদের কাছে কীভাবে শ্রদ্ধা ও সম্মানের মানুষ হয়ে উঠেছিলেন বন্দী সাদ্দাম হোসাইন, সেই বর্ণনা পুরো বইয়ে পাঠককে মোহগ্রস্ত করে রাখবে। সন্দেহ নেই, হৃদয়বান পাঠক এই বই পাঠে সাদ্দাম হোসাইনের মানবিক রূপ দেখে বিগলিত হবেন।
জীবনের শেষ দিনগুলোতে বন্দী থাকাকালে সাদ্দামের দৈনন্দিন জীবনযাপন, তাঁর পছন্দ-অপছন্দ, প্রহরীদের সঙ্গে আচার-আচরণ; আর কীভাবে এই প্রহরীরা হয়ে উঠল তাঁর আপনজন, এমনকি এঁদের সবাই সবসময় কেন ইরাকের সাবেক এই শাসকের প্রতিটা বিষয়ে এত গুরুত্ব দিতেন, তাঁর সঙ্গ পেয়ে সবাই কীভাবে উৎফুল্ল হতেন, আর কেনই-বা সাদ্দামের বিদায়বেলায় এই প্রহরীদের চোখে জ্বলজ্বল করছিল অশ্রু–এসব নিয়ে বইটি লিখেছেন সাদ্দামের মৃত্যুতে শোকাতুর এই প্রহরীসেনা।
সাদ্দাম হোসাইন আজ বেঁচে নেই। কিন্তু শক্তিমান শাসক হিসেবে তিনি অমর হয়ে আছেন ইরাক ও পৃথিবীর কোটি মানুষের হৃদয়ে হৃদয়ে। ইরাকবাসী আজ হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন, সাদ্দাম হোসাইনকে হারিয়ে তারা মূলত ইরাক হারিয়েছেন। তাঁর আত্মার জন্য আমাদের প্রার্থনা রইল।

মিরআতুল মামালিক
দ্য অ্যাডমিরাল

মূল: সাইয়্যিদি আলি রইস
অনুবাদক: সালাহউদ্দীন জাহাঙ্গীর



ধরন : ভ্রমণকাহিনি
বাঁধাই : হার্ডকভার
পৃষ্ঠা : ১২৮
মুদ্রিত মূল্য : ৳ ১২০

ষোড়শ শতকের অটোমান সাম্রাজ্যের একজন নৌসেনাপতির রোমাঞ্চকর ভ্রমণকাহিনি 'দ্য অ্যাডমিরাল'। তুর্কি উসমানি খেলাফতের নৌসেনাপ্রধান সাইয়্যিদি আলি রইসের লেখা অ্যাডভেঞ্চারপূর্ণ গ্রন্থটি সঙ্গত কারণেই লাভ করেছে চিরায়ত ইতিহাসের মর্যাদা। এতে বিবৃত হয়েছে পর্তুগিজ জলদস্যুদের সাথে সংঘটিত অ্যাডমিরালের রোমহর্ষক সমুদ্রযুদ্ধ, জলদস্যুদের তাড়া করতে গিয়ে কূলহারা আরব সাগরের বুকে হারিয়ে যাওয়া, তরঙ্গবিক্ষুব্ধ ভারত মহাসাগরের ভাগ্যরোহিত ভয়াল দিনগুলো, সমুদ্রঝড়ের কবলে পড়ে মৃত্যুর মুখ থেকে বেঁচে আসা, ভারতবর্ষসহ বিস্তীর্ণ মধ্য ও পশ্চিম এশিয়ার তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি, ধর্মীয় ও সামাজিক চিত্রাবলি, অতি নিকট থেকে দেখা মুঘল সাম্রাজ্যের ঐতিহাসিক বিবরণসহ আরও নানাপদী পাঠ্যস্বাদ।
ইরান তুরান খোরাসান কাবুল দিল্লি সিন্ধু গুজরাট বসরা মসুল তিকরিত বাগদাদ বোখারা সমরকন্দসহ এশিয়া মাইনরের বিস্তীর্ণ এলাকা ভ্রমণ করেন তিনি। বাংলা ভ্রমণসাহিত্যে বইটি বিশেষ গুরুত্ব রাখার কারণ হলো, লেখক চট্টগ্রাম উপকূলও ভ্রমণ করেছেন পনেরো শতকের উত্তাল সে সময়টিতে। দিল্লির শাহি প্রাসাদে রাজকীয় অতিথি হিসেবে অবস্থানকালে সম্রাট হুমায়ুনের পরলোকগমন, তার পুত্র আকবরের দিল্লির মসনদে আরোহণ ও সিংহাসন রক্ষার অনেক শাহি কূটচাল অতি নিকট থেকে প্রত্যক্ষ করায় গ্রন্থটি হয়ে উঠেছে চিরায়ত ইতিহাসের জীবন্ত ও অমর দলিল।
তুর্কি নৌসেনাপ্রধান সাইয়্যিদি আলি রইস তার ভ্রমণবৃত্তান্তটি রচনা করেছেন তুর্কি ভাষায়। ঐতিহাসিকভাবে সমাদৃত গ্রন্থটি আরবি ইংরেজি স্প্যানিশ রাশান পর্তুগিজসহ পনেরোটির অধিক ভাষায় অনূদিত হয়েছে। তাছাড়া নৌপথের গুরুত্বপূর্ণ রেফারেন্স হিসেবে বইটি পৃথিবীর অনেক নৌবাহিনীতে বিশেষভাবে পাঠ্য।
দিগ্বিজয়ী ভ্রমণবৃত্তান্তটি বাংলায় ভাষান্তর করেছেন কবি ও সুলেখক সালাহউদ্দীন জাহাঙ্গীর। উপন্যাসের আদলে অনূদিত ভ্রমণকাহিনির অনবদ্য গদ্যে পাঠকের মনে হবে, ইতিহাসের উত্তাল সমুদ্রে অ্যাডমিরালের নৌবহরের সঙ্গে এগিয়ে চলেছেন তিনি নিজেও। দুর্দান্ত ও ভয়ার্ত সব অ্যাডভেঞ্চার যেন চোখের সামনে ঘটে চলেছে।

মুফতী ফজলুল হক আমিনী রহ.
জীবন ও কর্ম

লেখক : দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ



ধরন : জীবনী
বাঁধাই : হার্ডকভার
পৃষ্ঠা : ২৭০
মুদ্রিত মূল্য : ৳ ৩০০

মুফতী ফজলুল হক আমিনী রহ.। তিনি ছিলেন প্রত্যয়দীপ্ত এক কণ্ঠস্বর। ইসলামের পক্ষে যেকোনো বিপবে তিনি গর্জে ওঠতেন সিংহের মতো। ইসলাম ও দেশ-মাতৃকার বিপক্ষে যখনই কোনো ষড়যন্ত্র হয়েছে, তিনি সবার আগে রাজপথে নেমে এসেছেন। আন্দোলন, সংগ্রাম আর জেল-জুলুম সহ্য করে তিনি হয়ে ওঠেছিলেন বাংলাদেশে ইসলামের কিংবদন্তীতুল্য ধর্মীয় নেতা।

তিনি ছিলেন বিশাল মহীরুহের মতো। বাংলাদেশের ইসলামপ্রিয় জনতার কাছে তিনি ছিলেন সার্বজনীন এক অভিভাবকের মতো। ইসলার রক্ষার যে কোনো আন্দোলন-সংগ্রামে তার তেজস্বী লড়াকু পদক্ষেপ বাংলার মানুষকে স্মরণ করিয়ে দিতো সেই সুদূর অতীতের সোনালি মানুষদের কথা।

রাজনীতি, শিক্ষা বিস্তার, হাদিস শিক্ষাদান এবং পথহারা মানুষের হেদায়েতের জন্য বাংলার প্রতিটি প্রান্তে ছুটে বেড়িয়েছেন প্রতিনিয়ত। বাংলাদেশের শাসকগোষ্ঠী যখনই ইসলামবিরোধী কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, তখন সবার আগে যার উচ্চকণ্ঠ শোনা গেছে– তিনি মুফতী আমিনী। তার ভয়ে সদা শঙ্কিত থাকতো শাসকের মসনদ। এক আল্লাহ ছাড়া পরোয়া করার মতো তার সামনে কেউ ছিলো না। তিনি ছিলেন আল্লাহর নির্ভীক সৈনিক।

বাংলার এই অপরাজেয় কিংবদন্তিকে নিয়ে নবপ্রকাশ প্রকাশ করেছে 'মুফতী ফজলুল হক আমিনী রহ. : জীবন ও সংগ্রাম' নামের একটি প্রামাণ্যগ্রন্থ। মুফতী ফজলুল হক আমিনী রহ.-কে নিয়ে প্রকাশিত একমাত্র পরিপূর্ণ গ্রন্থ।

মুফতী আমিনী রহ.-এর জীবন, সংগ্রাম ও কর্ম নিয়ে লিখেছেন তার ছেলে, স্বজন, বরেণ্য উলামা, নিকটজন, সহকর্মী, সহযোদ্ধা, ছাত্র, শুভাকাঙ্ক্ষী, সাংবাদিক, কলামিস্টসহ দেশের প্রখ্যাতজন। তুলে ধরেছেন সবার সামনে অন্য এক মুফতী আমিনীকে। তাঁর জীবন ও কর্ম মানুষের কাছে ধরা দিয়েছে অন্য এক উচ্চতায়।

মুফতী আমিনীর জীবনের অসংখ্য ইতিহাস অধ্যয়নে আপনাকে স্বাগতম।

রঙিন মখমল দিন

লেখক : শরীফ মুহাম্মদ

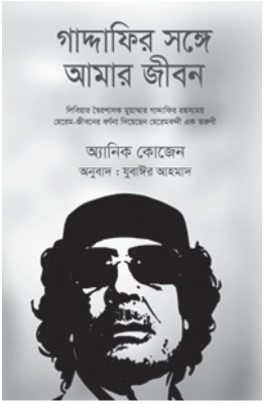


ধরন : আত্মজীবনী
বাঁধাই : হার্ডকভার
পৃষ্ঠা : ১৪৪
মুদ্রিত মূল্য : ৳ ২৩০

শিশুবেলার জীবন বড় সুখের জীবন। মিষ্টি রঙের জীবন। ৪৬ বছরে এসে সেই শৈশবের মুখ দেখার চেষ্টা বড় অনুভূতিময়। সুখেও সুখ, দুঃখেও সুখ। যেন সুখ আর রঙের মখমল দিন। টুকরো টুকরো চোখে দেখা সুখ। সুখের টুকরো টুকরো গল্প। ছন্নছাড়া আত্মজীবনের ভোর। কিছু গল্পের ছবি। অনেক গল্পেই হয়তো অনুসরণের কিছু নেই। আছে কিছু দেখার ও সতর্কতার ব্যাপার। আছে কিছু মজার ও শেখার ব্যাপার। শিশুমন আর শিশুভাষা। আদরে আদরে আঁকার চেষ্টা।
ছোট ছোট বাক্যে ফেলে আসা দিনগুলেল। শিশুবেলার সুখের দুনিয়ার চিত্রায়ন। শরীফ মুহাম্মদের জন্ম শহর ময়মনসিংহের গলগন্ডা। কাজিবাড়ি। ঐতিহ্যবাহী কাজী বাড়ি আলেম-উলামা ও দীনদার মানুষের জনপদ। শৈশবে মকতবে বালিকার সঙ্গে খুনসুটি বা কোনো লাইলির প্রেমে মুগ্ধ হওয়া এবং আলিফ বা তা ছা।
বইটিতে শৈশবের প্রেমময় দিনগুলো ওঠে এসেছে। খলিফা বাড়ির পেছনে আন্দার বনে ক্রিকেট, মুন্সিবাড়ির পাশে রেললাইনে রেলের শাঁ শাঁ আওয়াজ, কাশরের গুন্ডামি ডিপটিবাড়ির শাকিল, বালিয়ায় মুহাম্মদের সঙ্গে ছুটে চলা, খাগডহর থেকে কিশোরগঞ্জ, ঢাকার কামরাঙ্গীর চর... আরও স্মৃতিমাখা জায়গার ধারাবর্ণনা, অনন্য বয়ান। পাঠক মুগ্ধমনে এগিয়ে যেতে পারবে মনের ছবি থেকে বালিয়ার পথে। বালিয়ায় সেই শৈশবে সাহিত্যের নেশায় ফরিদউদ্দীন মাসঊদকে দেখতে যাবার গল্প। বইয়ে শিউলির ঘ্রাণে ঘ্রাণে বাতাশার বাদামি ঠোঙ্গা। ঘুমন্ত শহরে হেসে ওঠে যবে জিন্দেগানি। মুগ্ধতার নতুন ঘোরে পাঠক সফর করবে শৈশবের আত্মজীবনের এই কাহিনিকাব্যে। এ যেন কিছুটা আত্মজীবন, অনেকটা শৈশব।

গাদ্দাফির সঙ্গে আমার জীবন

মূল : অ্যানিক কোজেন
অনুবাদ : যুবাঈর আহমাদ



ধরন : আত্মজীবনী
বাঁধাই : হার্ডকভার
পৃষ্ঠা : ২৭২
মুদ্রিত মূল্য : ৳ ৫০০

শুরুটা হয়েছিল সুরাইয়াকে দিয়ে। একটি মেয়ে–কাজলকালো যার চোখ, রোদেপোড়া চকচকে মুখ কিন্তু আকর্ণবিস্তৃত চওড়া হাসি। সুরাইয়া–বিদ্যুৎচমকের মতো মুহূর্তেই যার মনভোলানো হাসি সশব্দ কান্নায় পরিণত হয়; বিপুল উদ্দীপনা বদলে যায় চরম নৈরাশ্যে; অনুপম অনুরাগ পরিণত হয় ভয়াবহ প্রতিশোধস্পৃহায়।

সুরাইয়া–যার আছে একটি অজ্ঞাত অতীত, এক সাগর দুঃখ আর হার না মানা বিক্ষুব্ধ মনন। সুরাইয়া–যার গল্পটা শুরু হয়েছিল মনোরম এক প্রাণবন্ত পরিবেশ থেকে। আর শেষ হয় নরপিশাচ দানবের পাঞ্জায় আবদ্ধ হওয়ার মাধ্যমে।

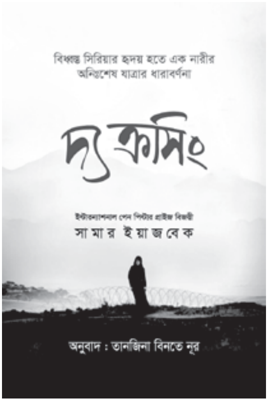
সুরাইয়ার সেই দানবের নাম মুয়াম্মার গাদ্দাফি। আফ্রিকার লৌহমানব নামে যিনি পরিচিত ছিলেন সারাবিশ্বে। যিনি বরিত হতেন লিবিয়ার নারীমুক্তির প্রবাদপুরুষ হিসেবে। অথচ তারই গোপন হেরেমে রক্ষিতা হিসেবে বন্দী ছিল সুরাইয়ার মতো শত শত নিষ্পাপ মেয়ে।

প্রথমবার এ কথা শুনে হয়তো পাঠকমাত্রই অবিশ্বাসে আঁতকে উঠবেন। কিন্তু হেরেমবন্দী সুরাইয়ার হাত ধরে যখন আপনি প্রবেশ করবেন গাদ্দাফির হেরেমখানায়, এক কোমলপ্রাণ কিশোরীর ধর্ষিত হবার বর্ণনা শুনে আপনার চোখ জলে ভেসে যাবে।

হে পাঠক! সুরাইয়ার হাত ধরে নরকে স্বাগতম।

দ্য ক্রসিং

মূলঃ সামার ইয়াজবেক
অনুবাদকঃ তানজিনা বিনতে নূর



ধরন : আত্মজীবনী
বাঁধাই : হার্ডকভার
পৃষ্ঠা : ২৭০
মুদ্রিত মূল্য : ৳ ৫০০

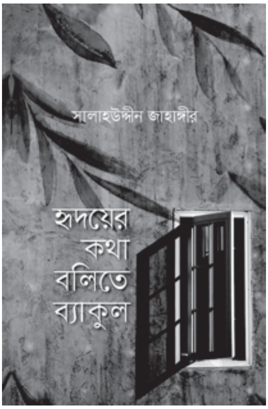
সামার ইয়াজবেক-এর দ্য ক্রসিং বইটি বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে ভয়াবহতম ট্র্যাজেডির অন্যতম সিরিয়া যুদ্ধের প্রত্যক্ষ বিববরণ–মর্মস্পর্শী, করুণ। সামারের অত্যন্ত সাবলীল ও হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা আমাদের মৃতপ্রায় মানবিক অনুভূতিগুলোকে জাগিয়ে তুলবে বলে আমার ধারণা। সরাসরি যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থান করে যুদ্ধের দৃশ্যগুলোর বর্ণনা কলমের আঁচড়ে তুলে নিয়ে আসা কোনো সহজ ব্যাপার নয়। একটা ব্যাপার অনুধাবনযোগ্য, সিরিয়ার যুদ্ধটা শুরুতে ছিল কেবলই মুক্তিকামী সিরীয়দের স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র লড়াই। কিন্তু যুদ্ধের পারদ যখন ঊর্ধ্বে উঠতে থাকে তখন এ লড়াইয়ের মঞ্চ প্রতিদিন পাল্টাতে থাকে। নাম না জানা অসংখ্য কুশীলব তৎপর হয়ে ওঠে সিরিয়ার মানচিত্রকে নিজেদের স্বার্থে কাজে লাগানোর জন্য। অনেক বিদেশি শক্তি তো বটেই, স্বার্থের টানে সিরিয়ায় যুদ্ধরত মুক্তিকামী দলগুলোও শতধা বিভক্ত হয়ে পড়ে। এই বিভক্তির ফলেই সেখানে জন্ম নেয় উগ্রবাদী বিভিন্ন উপদল, যা পরবর্তীতে সারা বিশ্বের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

এ বই লেখকের নিজ মাতৃভূমিকে স্পর্শ করার একান্ত ব্যক্তিগত আবেগে রচিত। যুদ্ধবিধ্বস্ত, রক্তস্নাত, বেঁচে থাকার সুতীব্র লড়াইয়ের যে ধারাবর্ণনা তিনি দিয়েছেন–সবই নিজের চোখে দেখা করুণ সত্য।

দ্য ক্রসিং বর্তমান সিরিয়ার সেই জলজ্যান্ত ছবি আমাদের সামনে তুলে ধরেছে, যে সিরিয়াকে আমরা এতদিন স্থিরচিত্র কিংবা কিছু ভিডিওক্লিপ আকারে দেখে এসেছি। বোমায় ধ্বংস হয়ে যাওয়া শহরের পর শহর, যুদ্ধবিমান থেকে নেমে আসা অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুদানব, উদ্বাস্তু মানুষের গ্লানিময় জীবন–সবকিছু লেখক তুলে এনেছেন পরম মমতায়। একই সঙ্গে সেখানে যুদ্ধরত এবং বিবদমান প্রত্যেকটি সশস্ত্র দল সম্পর্কে তাঁর প্রত্যক্ষ বর্ণনা পাঠককে নতুন করে ঋদ্ধ করবে।

হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল

লেখক : সালাহউদ্দীন জাহাঙ্গীর

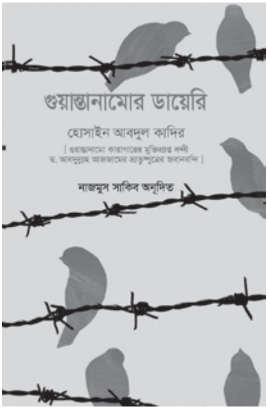


ধরন : অনুপ্রেরণা
বাঁধাই : হার্ডকভার
পৃষ্ঠা : ৯৬
মুদ্রিত মূল্য : ৳ ১৪০

আশ্চর্য সুন্দর এই জীবন। প্রতিটি আনন্দ-হাসি, বেদনা-দুঃখও সুন্দর। মাঝেমাঝে অবাক চোখে তাকিয়ে বৃষ্টিফোঁটা দেখি–কী অদ্ভুত ছন্দে নেমে আসছে মাটির ধরণীতে! বৃক্ষশোভা, জলকল্লোল, পাখির গান, বন্ধুর হাসি, বিরাট আকাশ, ধানের গন্ধ, প্রিয়তমের আলিঙ্গন, ব্যস্ত নগর আর–মানুষ! এতো সুন্দর সৃষ্টি মানুষ, সৃষ্টিকর্তা নিজেই তাঁর এ সৃষ্টি নিয়ে গর্ব করেন। তিনিও সম্ভবত আদমসন্তানের আশ্চর্য কীর্তি-সৌন্দর্য দেখে আহ্লাদিত হন। আর আমি অধম তো একেকটা মানুষ দেখি আর তাদের প্রেমে পড়ি।
কী সুন্দর তারা কথা বলে, অভিমান করে, হিংসা করে, সৃষ্টি করে নতুন নতুন, তারা শিল্পিত পদক্ষেপে হেঁটে বেড়ায়, যুদ্ধ করে, প্রিয়জনের ভালোবাসায় কাঁদে...কী অবাক এক সৃষ্টিকর্ম!
একটা মানুষ শিশু–সে খলবলিয়ে হাসে; তার নিষ্পাপ চোখের ভাষার মধ্যে যে পবিত্র পাঠশালা, আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরির সমস্ত প্যাপিরাসের কাহিনিপাঠেও মিলবে না তার খোঁজ। আহা! কি ব্যাকুল ভালোবাসায় সে চিৎকার করে কাঁদে। পৃথিবীর বিস্ময়ে এখনো নিজেকে মানিয়ে নিতে পারেনি ছোট ছোট মায়াবী চোখ দুটো। তার কান্না কেমন নিষ্পাপ, লৌকিকতাহীন।
আকাশ কি নিদারুণ নীলাভ! বৃক্ষ কি সবুজ! মাটিতে কেমন উদ্বেল ঘ্রাণ! রাত হয় এই জন্ম নেয়া পৃথিবীতে। কি বিস্ময় নিয়ে সে ডাকে–আয় আয়, থোকা থোকা এই জোনাক-জ্যোৎস্নায়!
জলবিভূতি নিয়ে নদী বয়; সাগরের কী ক্ষুধিত উচ্ছ্বাস!
ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখে কেঁদে উঠি, হেসে ফেলি অদ্ভুতুড়ে বালখিল্য খাব-দর্শনে। সকালে পরিচিতমুখ দেখে উজ্জ্বল চোখভরে বলি–বন্ধু, কী খবর বল, কতোদিন দেখা হয়নি!
একটা মেয়ে বালিকা হয়, আশ্চর্য তার ঐশ্বর্য। বিপুলা বিভা নিয়ে সে তার চারপাশ আন্দোলিত করে তোলে। তার পায়ের মুদ্রা, তার কিন্নর হাসিরোল, তার গর্বিত চাহনি–পৃথিবীর তাবৎ ময়নাতদন্ত তার সৌন্দর্যের রহস্যের কাছে শিশুতোষ।
সালাহউদ্দীন জাহাঙ্গীর রচিত জীবনমুখী এক আশ্চর্য বই!

গুয়ান্তানামোর ডায়েরি

মূলঃ হোসাইন আবদুল কাদির
অনুবাদঃ নাজমুস সাকিব



ধরন : আত্মজীবনী
বাঁধাই : হার্ডকভার
পৃষ্ঠা : ১৪৪
মুদ্রিত মূল্য : ৳ ২০০

গুয়ান্তানামোর লেখক হোসাইন আব্দুল কাদের–তাঁর পরিচিতিমূলক উপনাম আবু আব্দুল্লাহ আল-বলখি। মূলত আরবি ভাষায় তিনি বইটি লিখেছিলেন। মূল বইয়ের নাম ‘জিকরায়াত মু’তাকাল মিন জোয়ান্তানামো’। ২০০৯ সালে সৌদিআরবের রাজধানী রিয়াদের আল-আবিকান প্রকাশনী থেকে বইটি প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রকাশের পর আরববিশ্বে এটি ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়।

বইটিতে বিনা দোষে আটক হওয়ার পর থেকে মুক্তি পর্যন্ত কারাগারের চার দেয়ালের ভেতর দিনযাপনের নানা স্মৃতিকথা তুলে ধরেছেন লেখক। বর্তমানে তিনি জর্ডানে বসবাস করছেন। বইটি পড়লে পাঠকরা লেখকের গ্রেফতার এবং গ্রেফতার পরবর্তী দৃশ্যপট ও নানা ঘটনা সম্পর্কে জানার সুযোগ পাবেন।

একই সাথে জানতে পারবেন, শুধুমাত্র সন্দেহের বশবর্তী হয়ে একজন মানুষকে কীভাবে দীর্ঘ আড়াই বছর গুয়ান্তানামোর ভয়াল কারাগারে বন্দী করে রাখা হয়। শুধু এ বইয়ের লেখকই নন, আমেরিকার নেতৃত্বাধীন ‘ওয়ার অন টেরর’ শুরু হওয়ার পর এমন শত সহস্র মুসলিম ব্যক্তিকে বিনা দোষে বছরের পর বছর ধরে আটকে রাখা হয় পৃথিবীর নাম না জানা অসংখ্য কারাগারে। হয়তো আজও অনেকে বিনা দোষে পঁচে মরছে পশ্চিমাদের জিন্দানখানায়।

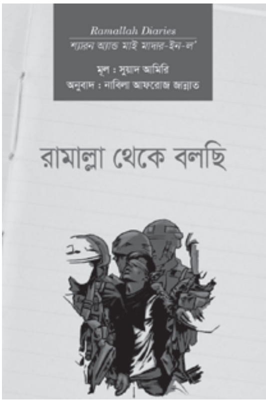
এ বই সেই সব নির্দোষ ব্যক্তিদের পক্ষে কিছুটা হলেও পৃথিবীর সামনে সত্য উচ্চারণ করবে।

লেখকের বয়ান–

এই বইয়ের অনেক কথা হয়তো অনেকের ভালো লাগবে না, অনেকে মনে করবেন– এ সবই অতিকথন মাত্র। কিন্তু আমি এসব প্রত্যক্ষ করেছি এবং এসব ঘটনা আমার সঙ্গে ঘটেছে। আরবিতে একটি প্রবাদ আছে– ‘যে শোনে সে তার মতো নয়, যে দেখেছে’।

শ্যারন অ্যান্ড মাই মাদার ইন ল
রামাল্লা থেকে বলছি

মূল: সুয়াদ আমিরি
অনুবাদক: নাবিলা আফরোজ জান্নাত

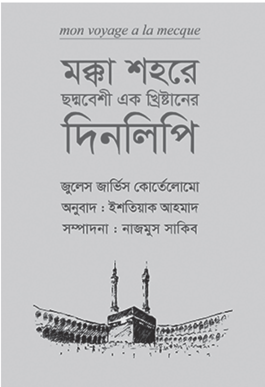


ধরন : আত্মজীবনী
বাঁধাই : হার্ডকভার
পৃষ্ঠা : ১৭৬
মুদ্রিত মূল্য : ৳ ৩০০

প্রতিটা দিন কীভাবে কাটে ফিলিস্তিনে বসবাসরত মানুষের? প্রতিদিন ধরপাকড়, বুলডোজার, রকেট হামলা, মৃত্যুর মিছিল, লাশ নিয়ে প্রতিবাদী মানুষের ঢল—এসব নিত্যঘটনার আড়ালে একটা জীবন তো তাদের আছে। যে জীবনে খাওয়া-পরার জন্য ভাবতে হয়, কাপড় পরিষ্কার থেকে শুরু করে ঘরদোর ঝাড়-মোছ করা, বিয়ে-সন্তান-ভালোবাসা; ধ্বসে পড়া দালানের নিচ থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে দাঁড়াতে হয় খাবারের দোকানের সামনে—কিছুক্ষণ পরই শুরু হয়ে যাবে কারফিউ।
ফিলিস্তিনে এই জীবনটা কেমন? ফিলিস্তিনি লেখিকা সুয়াদ আমিরি রামাল্লা শহরতলীর এক পুরোনো দালানের জানালা দিয়ে আমাদের দেখিয়েছেন ফিলিস্তিনের সেই জীবন, যা আমরা কল্পনা করতে কোশেশ করি। সংগ্রামরত ফিলিস্তিনের বিক্ষুব্ধ একটা সময়কে তিনি মলাটবদ্ধ করেছেন তাঁর ডায়েরির পাতায়। তিনি নিজে সেই সময়ের কেবল একজন সাক্ষীই নন, তিনি ইসরাইলি তাণ্ডবের বিরুদ্ধে রক্তচক্ষু মেলে তাকিয়ে থাকা এক অকুতোভয় যোদ্ধাও; পাঠকমাত্রই যার পরিচয় পাবেন বইয়ের অন্দরে।
সুয়াদ আমিরির জীবনের আনন্দ-কান্নার গল্পগুলো তিনি লিখেছেন সহজ-সরল করে। বেশ বিপজ্জনক মুহূর্তেও তিনি স্বাভাবিক, হাসিঠাট্টা করেন, সে বর্ণনাও এসেছে বইয়ে। অথচ তাতে করে ইসরাইলিদের অত্যাচার অনুভব করা কঠিন হয়ে যায়নি মোটেও।
লেখিকার বয়ান—
'(১৭ নভেম্বর ২০০১ থেকে ২৬ সেপ্টেম্বর ২০০২) সময়টায় আমি এই বইয়ের দ্বিতীয় অংশ লিখেছি, যুদ্ধদিনের দিনলিপি। সেই সময় ডায়েরি লেখা আমার জন্য থেরাপির কাজ করতো। সন্ধ্যার পর আমি বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়স্বজনকে মেইল করতে বসতাম। এই ভয়ানক সময়টাতে আমি কীভাবে বেঁচে আছি, সেটা জানতে ওরা উদ্বেগ নিয়ে অপেক্ষা করতো। শ্যারন আর আমার শাশুড়ি মিলে যেই সমস্যাগুলো তৈরি করতো, সেগুলোর মানসিক যন্ত্রণা থেকে বাঁচার জন্য লেখাটা ছিলো একটা উপায়। বিব্রতবোধ করতে করতে কাছের বন্ধুদের আমি সেসব বলা শুরু করলাম।'

মক্কা শহরে
ছদ্মবেশী এক খ্রিষ্টানের
দিনলিপি

মূল : জুলেস জার্ভিস কোর্তেলোমো
অনুবাদ : ইশতিয়াক আহমাদ



বাঁধাই : হার্ডকভার
পৃষ্ঠা : ১২৮
মুদ্রিত মূল্য : ৳ ১৬০

'মক্কা শহরে ছদ্মবেশী এক খ্রিষ্টানের দিনলিপি' বইটি নানা কারণে ইসলামি ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ। একদিক থেকে বইটি তুলে এনেছে আজ থেকে শত বছর আগের মক্কা নগরীকে, তেমনি তুলে ধরেছে সে সময়কার আরবীয় জীবনের অসংখ্য ঘটনাপ্রবাহকে। তখনকার হজযাত্রা কীভাবে হতো, কেমন কষ্টকর ছিল হাজিদের হজগমন, মসজিদে হারাম এবং মক্কা নগরী কীভাবে আপ্যায়ণ করতো আগত হাজিদের–এমন সব বিষয় আনুপুঙ্খিকভাবে বিবৃত হয়েছে এ বইয়ে।
লেখক জুলেস জার্ভিস কোর্তেলোমো ছিলেন একজন ফরাসি আলোকচিত্রী (ফটোগ্রাফার)। আলোকচিত্রশিল্প তখন কেবল আবিষ্কৃত হয়েছে পশ্চিমা পৃথিবীতে। মানুষ তখনও এ শিল্প সম্পর্কে খুব বেশি ওয়াকিফহাল ছিল না। বিশেষত আরবের মানুষ এ বিজ্ঞান সম্পর্কে ছিল একেবারেই বেখবর। এ কারণে ধর্মীয় রক্ষণশীলতার জন্য আরবে তখন ছবি তোলা রাষ্ট্রীয়ভাবে আইনত নিষিদ্ধ। কিন্তু আলোকচিত্রী কোর্তেলোমোর ইচ্ছা ছিল, তিনি প্রথম আলোকচিত্রী হিসেবে এই পুণ্যময় নগরী ও মসজিদে হারামের ছবি তুলবেন। এ কারণেই ছদ্মবেশে তার মক্কাগমন।
অবশ্য এর পেছনে অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছে তার পূর্বেকার জীবনের নানা ঘটনা। শৈশবেই তিনি মাতৃভূমি ফ্রান্স থেকে মা-বাবার সঙ্গে পাড়ি জমান আলজেরিয়ায়। শৈশব-কৈশোর এবং তারুণ্যের অনেকটা সময় তিনি বসবাস করেন সেখানে। ফলে সেখানকার মুসলিম ধর্মীয় রীতি-নীতি এবং সংস্কৃতি তাঁকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করে। এই আকর্ষণের ফলেই তিনি দুঃসাহসী অভিযাত্রার সংকল্প করেন এবং অনেক ঝড়-ঝঞ্ঝা পাড়ি দিয়ে তিনি তার সংকল্প সফল করতে সক্ষম হন। এ বই তার সে দুঃসাহসী অভিযাত্রারই আত্মবয়ান।

হামজার খুনি

মূল : নাজিব কিলানি
অনুবাদ : নাজমুল হক সাকিব



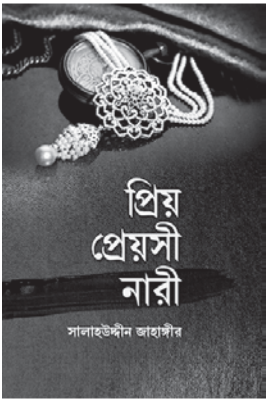
ধরন : উপন্যাস
বাঁধাই : হার্ডকভার
পৃষ্ঠা : ২২৪
মুদ্রিত মূল্য : ৳ ৩৫০

হামজার খুনি। এ উপন্যাসে নাজিব কিলানি একজন ইথিওপিয়ান ক্রীতদাসের গল্প বলেছেন। অজ্ঞতার আঁধারে ডুবে থাকা একজন ক্রীতদাসের আঁধার থেকে আলোতে আসার গল্প বলেছেন। পাঠক এ গল্পের ঢেউয়ে ঢেউয়ে আইয়ামে জাহিলিয়াতের মক্কা নগরীতে হারিয়ে যাবেন। একজন ক্রীতদাসের চোখ দিয়ে মক্কার নেতা আবু সুফিয়ান ইবনে হারব, ইকরামা ইবনে আবু জাহেল, জুবাইর ইবনে মুতইম আর হিন্দা বিনতে উতবাকে দেখতে পাবেন। আঁধার থেকে আলোর যে জোজন জোজন দূরত্ব তা অনুভব করতে পারবেন খুব স্পষ্টভাবে। আপাদমস্তক অজ্ঞতায় ডুবে থাকা একজন মানুষের চোখে আলোকে কিভাবে কালো দেখায় সেটা উপলব্ধি করতে পারবেন। দেখবেন একজন বদলে যাওয়া ওয়াহশিকে। অনুভব করতে পারবেন, ইসলামের প্রতি সেকালের অধিকারবঞ্চিত মানুষের আকুতি। ইসলামের আলোয় আশ্রয় নেয়া মানুষের ভাবাবেগ কতটা গভীর ছিল। এ গল্প পড়তে পড়তে হয়তো কখনো আপনার চোখ ভিজে উঠবে। কখনো বা আপনার ভেতর একটি দীর্ঘশ্বাস তৈরি হবে। কখনো বা আপনি কালের পর্দা ছিন্ন করে সেকালের মানুষ হয়ে ওঠবেন। সর্বোপরি নাজিব কিলানির এই গল্পে পাঠক সত্যিকার আরবি উপন্যাসের স্বাদ পাবেন।

নাজিব কিলানি সম্পর্কে নতুন করে বলার মত কিছু নেই। বাংলাভাষী পাঠকের কাছে তিনি মোটেও অপরিচিত নন। তাঁর প্রতিটি সৃষ্টির মাঝেই রয়েছে আরবীয় আভিজাত্য। রয়েছে গভীর জীবনবোধ।

প্রিয় প্রেয়সী নারী

লেখক : সালাহউদ্দীন জাহাঙ্গীর



ধরন : অনুপ্রেরণা
বাঁধাই : হার্ডকভার
পৃষ্ঠা : ১৫৫
মুদ্রিত মূল্য : ৳ ২২০

নারী ছোট পোশাক পরে বাইরে বেরুলে সেটাকেই কি আমরা নারীমুক্তি বলবো? নারী পুরুষের সঙ্গে একই টেবিলে বসে কাজ করলে সেটাকেই আমরা নারী অধিকার বলে প্রসন্ন হবো? নারীকে প্রকাণ্ড প্রসাধন মাখিয়ে দুনিয়ার সামনে উপস্থাপন করলে তবেই কি সে পুরুষের সমান অধিকারী হয়েছে বলে ধরে নেবো?

এ এক অদ্ভুত স্লোগান কাঁধে নিয়ে ঘুরছি আমরা। নারীর নারীত্বের অধিকারের কথা বলে তাকে পৃথিবীর সামনে উপস্থাপন করছি পুরুষের ভোগ্যপণ্য হিসেবে। তাকে পণ্য বানিয়ে তুলে দেয়া হচ্ছে আধুনিক দাসবাজারে। দাসবাজারের নিলামে দরদাম হচ্ছে তার রূপ, শরীর, ত্বকের কমনীয়তা। মিডিয়া, শোবিজ, মডেলিং, পণ্যবাজার, বিউটি ইন্ড্রাস্ট্রি, সোস্যাল নেটওয়ার্ক, প্রতিযোগিতাময় পৃথিবী প্রতিদিন নারীকে ঠেলে দিচ্ছে পুরুষের কামনাতাড়িত চোখের সামনে। আধুনিক পৃথিবীতে এ এক নব্য দাসপ্রথা।

বাস্তবতা কি এর থেকে ভিন্ন? 'প্রিয় প্রেয়সী নারী' গ্রন্থে সমাজ-চিন্তক লেখক সালাহউদ্দীন জাহাঙ্গীর এমন সত্য বাস্তবতাকেই তুলের ধরার চেষ্টা করেছেন বারবার। এ কারণেই এ গ্রন্থ হয়ে উঠেছে সমাজের প্রত্যেক নারীকে একজন সত্যিকারের নারী হিসেবে সজ্জিত করার প্রেয়সী প্রয়াস। ইসলামের ঐশ্বরিক নির্দেশনায় নারীকে ভূষিত করা হয়েছে তার কাঙ্ক্ষিত উচ্চাসনে। তাকে দেখানো হয়েছে সত্যিকারের নারী অধিকারের সুরম্য রাজপথ।

এ গ্রন্থ কেবল একমুখী কোনো আলোচনা নয়, বর্তমান পৃথিবী এবং আমাদের সমাজে নারীর প্রতি অবিচার ও অসম্মানের নানা দিক তুলে ধরা হয়েছে পৃথক পৃথক নিবন্ধে। নারী, তার সমাজ, তার সংসার, তার ব্যক্তিত্ব এবং পুরো পৃথিবীর নারী উৎপীড়নের বহুবিধ অজানা উপাখ্যান উন্মোচন করা হয়েছে দরদি কলমে।

সর্বোপরি এ গ্রন্থ কেবল নারীর জন্যই রচনা করা হয়নি, এ গ্রন্থ একজন পুরুষের জন্যও নারীকে নতুন করে আবিষ্কারের এক মহত্তম চাবিকাঠি। একজন পিতা, স্বামী, ভাই কিংবা বন্ধু হিসেবে প্রতিজন পুরুষের উচিত তার কন্যা, স্ত্রী, বোন, বান্ধবীর জাগতিক পৃথিবীকে ঐশী আলোয় আলোকিত করা। তেমনি পরকালীন পৃথিবীতেও তাকে উপহার দেয়া চিরকালীন জান্নাতুল ফেরদাউস। এ দায়িত্ব নারীর চেয়ে পুরুষেরই বেশি। তাই এ গ্রন্থ একজন পুরুষের জন্যও অবশ্যপাঠ্য।

খলিফা হত্যাকাণ্ড

মূলঃ ড. কামিল কিলানি ও
খালিদ আস-সায়িদ
অনুবাদঃ ইশতিয়াক আহমাদ



ধরন : ইতিহাস
বাঁধাই : হার্ডকভার
পৃষ্ঠা : ১১২
মুদ্রিত মূল্য : ৳ ১২০

মানব ইতিহাসের শুরু থেকেই ক্ষমতার পালাবদলের ইতিহাসের শুরু। ক্ষমতার লোভ, আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা মানুষকে একের পর এক অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে উদ্বুদ্ধ করেছে। আবার কখনো ব্যক্তিগত আক্রোশ, হিংসা, চারিত্রিক দুর্বলতা এবং নারীঘটিত নানা কারণেও বিভিন্ন সময় ঘটেছে হত্যাকাণ্ড।

পত্রিকার পাতায়, অন্তর্জালের দুনিয়া বা ফেসবুকের নিউজফিড স্ক্রল করলে আজও ক্ষমতা দখল, উচ্ছেদ, ক্ষমতাচ্যুতি, অভ্যুত্থান শব্দগুলো আমাদের চোখে পড়ে।

ইসলামের ইতিহাসেও এই তালিকা কম নয়। খোলাফায়ে রাশেদিন–খলিফা উমর, উসমান, আলি, হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহুম থেকে নিয়ে উমর ইবনে আব্দুল আজিজসহ উমাইয়া, আব্বাসি, ফাতেমি, সেলজুকি থেকে উসমানি; প্রায় সব খেলাফতের আমলেই এই ধারা চলমান ছিল।

খলিফা হত্যাকাণ্ড শিরোনামের এই বইটি মূলত ড. কামিল কিলানি রচিত 'মাসারিউল খোলাফা' এবং খালিদ আস-সায়িদ রচিত 'আশহারুল ইগতিয়াল ফিল ইসলাম' নামে দুটি বইয়ের নির্বাচিত অংশের অনুবাদ। এটি মৌলিক বা সংকলিত কোনো রচনা নয়। ইসলামি খেলাফতে বিভিন্ন যুগের খলিফাদের হত্যাকাণ্ড নিয়ে রচিত এ বইটিতে যে তথ্যাদি উল্লেখ করা হয়েছে তা বেশ চমকপ্রদ বিষয় হলেও স্পর্শকাতর।

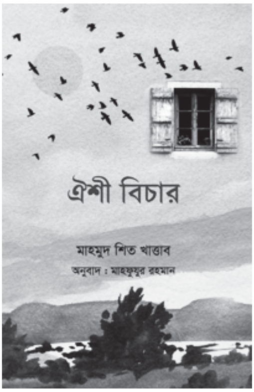
খলিফা হত্যাকাণ্ড উল্লিখিত মূল বই থেকে হুবহু অনুবাদ করা হয়নি। অনেক ক্ষেত্রেই বক্তব্য সহজ করার জন্য ভাবানুবাদের আশ্রয় নেয়া হয়েছে। সরল গদ্যে লেখার চেষ্টা করা হয়েছে।

মূল বইটিতে এমন কিছু তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে যেগুলো বেশ স্পর্শকাতর। সেসব বর্ণনা হুবহু রেখে সে সম্পর্কিত আরো কিছু তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে বিষয়টিকে সহনীয় করার জন্য।

ইতিহাস-সন্ধানী পাঠকের ভালো লাগবে আশা করি।

ঐশী বিচার

মূল: মাহমুদ শিত খাত্তাব
অনুবাদ: মাহফুযুর রহমান



ধরন	: গল্প
বাঁধাই	: হার্ডকভার
পৃষ্ঠা	: ১০২
মুদ্রিত মূল্য	: ৳ ১২০

ইরাকি লেখক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মাহমুদ শিত খাত্তাব আমাদের কাছে অপরিচিত নন। এর আগে নবপ্রকাশ থেকে 'আসমানি আদালত' নামে লেখকের আরেকটি বই অনূদিত হয়ে প্রকাশ হয়েছে। বইটি পাঠকমহলে বেশ সমাদৃত হয়। সেই ধারাবাহিকতায় তাঁর দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশ করতে পেরে আমরা আনন্দিত।

গল্পকার হিসেবে মাহমুদ খাত্তাবের বৈশিষ্ট্য হলো, তিনি বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতাকে গল্পের মোড়ক পরিয়ে পাঠকের সামনে হাজির করেন। গ্রন্থের সবগুলো গল্পই তাঁর জীবনঘনিষ্ঠ। তিনি যেসব ঘটনা শুনেছেন, যে বিষয় সম্পর্কে জেনেছেন কিংবা বাস্তব জীবনে প্রত্যক্ষ করেছেন—এমন সব ঘটনা ও বিষয়কে তিনি গল্পের আদলে নিয়ে এসে উপস্থাপন করেন বাঙময় ভাষায়।

তাঁর গল্পের অন্য আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো, তিনি শুধু বাস্তব জীবনের ঘটনা তুলেই ক্ষান্ত হন না, বরং প্রতিটি গল্পের ভেতর দিয়ে তিনি পাঠককে শিক্ষা দেন কোনো না কোনো আবশ্যিক শিক্ষণীয় পাঠ। সমাজের অনেক অনাচার, চারিত্রিক অনেক স্খলন, ব্যক্তি ও পরিবারের জন্য অহিতকর বিষয়গুলো তিনি ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেন পাঠকের চোখের সামনে। ফলে, তাঁর বলা গল্পগুলো আমাদের জন্য সবসময় পাঠ্য। তাঁর গল্পের আবেদন কখনো ফুরোবার নয়।

হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ
শেষ সিপাহির রক্ত

মূল: জুরজি যায়দান
অনুবাদ: নাজমুস সাকিব

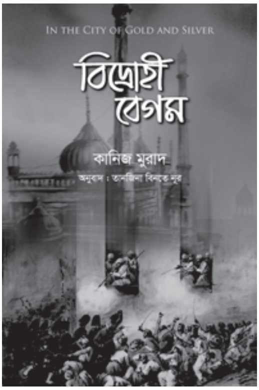


ধরন : উপন্যাস
বাঁধাই : হার্ডকভার
পৃষ্ঠা : ২২৪
মুদ্রিত মূল্য : ৳ ৩০০

পৃথিবীর ইতিহাসের স্মরণযোগ্য শাসকদের কথা বলতে গেলে অবধারিতভাবে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ আসসাকাফির নাম অনায়েসে সামনে চলে আছে। একসাথে ভালো এবং মন্দ–দুই ময়দানেই তার মতো প্রশ্নসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব দ্বিতীয় কাউকে হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে না।
তিনি ছিলেন উমাইয়া রাজবংশের বিখ্যাত শাসক। শুধু শাসকই নন, বলা যায় অন্যতম রক্ষাকর্তা। তার হাতেই উমাইয়াদের শাসন স্থিতি লাভ করে। হেজাজ ও ইরাকের 'বিদ্রোহী'দের তিনি পরাজিত করেন কঠোরহস্তে। পুরস্কার হিসেবে খলিফা আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ান তাকে হেজাজ, ইয়েমেন ও ইরাকের গভর্নর নিযুক্ত করেন।
উমাইয়াদের পক্ষে কাজ করতে গিয়ে খুব কঠোর ছিলেন হাজ্জাজ। দীর্ঘ শাসক-জীবনে প্রায় এক লক্ষের বেশি মানুষ তার হাতে নিহত হয়। এদের মধ্যে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের প্রিয় সাহাবিদের কয়েকজনও ছিলেন। অতি কঠোরতা ও মহান সাহাবিদের প্রাণ হরণ হাজ্জাজকে কলংকিত করে রেখেছে ইতিহাসে। এতে তার ভালো কাজগুলো ঢাকা পড়ে গেছে। কিন্তু তার ফিরিস্তিও অনেক লম্বা।
খোলাফায়ে রাশেদিনের শাসনের পর যে সংক্ষুব্ধ সময় ইতিহাসকে রক্তাক্ত করে তুলেছিল, এ উপন্যাস সেই সংক্ষুব্ধ সময়কে পাঠের আলোয় নিয়ে এসেছে। একদিকে খেলাফতে রাশেদার পদছাপকে আঁকড়ে ধরে কাবার দুয়ারে সিনাটান করে দাঁড়িয়েছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে জুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু, অন্যদিকে উমাইয়া সাম্রাজ্যের ক্ষমতালোভী শাসকগণ খেলাফতের কেন্দ্রবিন্দু ধুলিস্যাৎ করতে সর্বোচ্চ শক্তি প্রয়োগে ছিল বদ্ধপরিকর। রক্তের বন্যা বয়ে যেতে লাগল পবিত্র শহরের গলি গলিতে।
সেই সময়ের নিষ্পাপ এক প্রেমকাহিনির হাত ধরে পাঠক প্রবেশ করবেন খেলাফত রক্ষার সাহসী সংগ্রামে। আশা করি ইতিহাস ও উপন্যাস পাঠক–সকলেই উদ্দীপ্ত হবে এই অনবদ্য গ্রন্থপাঠে।

ইন দ্য সিটি অব গোল্ড অ্যান্ড সিলভার
বিদ্রোহী বেগম

মূলঃ কানিজ মুরাদ
অনুবাদঃ তানজিনা বিনতে নূর

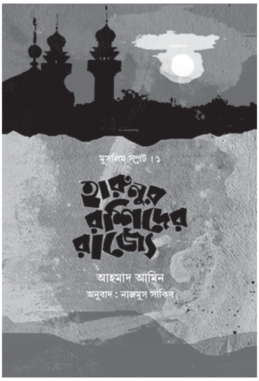


ধরন : উপন্যাস
বাঁধাই : হার্ডকভার
পৃষ্ঠা : ৪০০
মুদ্রিত মূল্য : ৳ ৬০০

পুরো ভারতবর্ষ হাতিয়ার ফেলে দিয়েছিল। বড় বড় সকল রাজা, জমিদার, তালুকদার, সেনানায়ক আর সিপাহিরা রণেভঙ্গ দিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল ময়দান ছেড়ে। এমনকি দিল্লির মোগল বাদশাহ বাহাদুর শাহ জাফরকে কেন্দ্র করে ঘনীভূত হওয়া দিল্লির বিদ্রোহও ১৮৫৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে খতম হয়ে যায়। বৃদ্ধ বাদশাহ স্বয়ং ধৃত হন ইংরেজদের হাতে এবং নির্বাসিত হন দিল্লি থেকে হাজার মাইল দূরে বার্মার নিভৃত এক পল্লিতে। পরবর্তীতে সেখানেই তাঁর জীবনাবসান হয়।
কিন্তু সবচে দীর্ঘ লড়াই লড়েছিলেন যে নারী, তিনি হজরত মহল। বিদ্রোহের এক বছরের মধ্যে লক্ষ্ণৌ হাতছাড়া হয়ে গেলে তিনি তাঁর অনুগত সিপাহিদের নিয়ে পালিয়ে যান উত্তর ভারতে। সেখান থেকেই লক্ষ্ণৌ পুনরুদ্ধারের সংগ্রাম চালিয়ে যেতে থাকেন। কিন্তু ধীরে ধীরে ইংরেজ বাহিনী কব্জা করতে থাকে উত্তর ভারতের সকল দুর্গ। তিনি আরও উত্তরে চলে যেতে থাকেন। স্বাধীনতার শেষ আলোকরশ্মিকে জীবনদান করার লক্ষ্যে পার হয়ে আসেন বরফাবৃত পাহাড়, নদী আর জঙ্গল। তবু মাথানত করেননি ইংরেজ বশ্যতার সামনে।
ভারতবর্ষের অধিকাংশ রাজা-বাদশাহ পরবর্তীতে ইংরেজদের সঙ্গে আঁতাত করে নিজেদের জীবন বাঁচিয়েছিলেন। ইংরেজদের পারিতোষিকের বিনিময়ে মাথানত করেছিলেন রানি ভিক্টোরিয়ার ক্ষমার সামনে। কিন্তু হজরত মহল একবারের জন্যও চির উন্নত শির নত করেননি। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত লড়ে গেছেন অকুতোভয়ে।
এ গ্রন্থ সেই মহিয়সী নারীর জীবন পাঠকের সামনে উন্মোচন করবে, ইতিহাস যাঁকে বড় একটা সমাদর করেনি কখনো। ইন দ্য সিটি অব গোল্ড অ্যান্ড সিলভার : বিদ্রোহী বেগম গ্রন্থটি কেবল তাঁর জীবনকেই আলোকায়ন করেনি, বরং তুলে এনেছে সিপাহি বিদ্রোহের আনুপুঙ্খিক এক ধারাবর্ণনা। বিদ্রোহের সময়কার ঘটনাপঞ্জি লেখক এত সুনিপুণ ও তথ্যবহুল করে বর্ণনা করেছেন, প্রতিটি অনুচ্ছেদকে মনে হবে স্বাধীনতা সংগ্রামের একেকটি দলিল। এ কারণে ইতিহাস-অনুসন্ধানী পাঠকের জন্য এ বই অবশ্যপাঠ্য বলে বিবেচনা করি।

হারুনুর রশিদের রাজ্যে

মূল: আহমাদ আমিন
অনুবাদ: নাজমুস সাকিব



ধরন : উপন্যাস
বাঁধাই : হার্ডকভার
পৃষ্ঠা : ১৬০
মুদ্রিত মূল্য : ৳ ২০০

কেমন হত যদি আমরা সেই বাগদাদ থেকে সত্যি সত্যি ঘুরে আসতে পারতাম? হাজার বছর আগের ধ্বংস হয়ে যাওয়া বাগদাদ যদি ফিরে পেতাম সেই রূপে?

অসম্ভব মনে হলেও তা আমাদের জন্য সম্ভব করে দিয়েছেন প্রথিতযশা মিশরীয় লেখক আহমাদ আমিন। তিনি হারুনুর রশিদ ও তাঁর রাজ্যের এক অনন্য চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন বক্ষ্যমান বইয়ের মধ্য দিয়ে। হাজারও প্রাচীন গ্রন্থের পৃষ্ঠা ঘেঁটে এসব তথ্য তিনি হাজির করেছেন আমাদের দৃষ্টির সামনে। এই বই পড়ে পাঠক অনুভব করবেন, তিনি যেন ফিরে গেছেন হাজার বছর আগের আব্বাসি খেলাফতের রাজধানী বাগদাদে। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পের রাজ্যে, যেখানে সমাসীন আছেন খলিফা হারুনুর রশিদ স্বয়ং।

কালের গর্ভে হারিয়ে যাওয়া সেই সোনালি দিনগুলো এই বইয়ের মাধ্যমে জীবন্ত হয়ে উঠবে পাঠকের সামনে। শুধু একপাশ থেকে নয়, ৩৬০ ডিগ্রি চিত্রের মতো পাঠক সেই সময়কে দেখতে পাবেন চারপাশ থেকে। কেমন ছিল সেই সময়ের মানুষের সাধারণ জীবন, কেমন ছিলেন খলিফা ও তাঁর আমির-উমারাগণ, কেমন ছিলেন সেই সময়ের জ্ঞানী ও বিদ্বানরা এবং কেমন ছিল সে সময়ের কবিতা-গান, মানুষের খাবার-দাবার ও জীবনাচরণ। নানা ঘটনাবলি ও বর্ণনার মধ্য দিয়ে এসব বিষয় বিমূর্ত হয়ে উঠবে পাঠকের সামনে। সোনালি সময়ের কিছু জীবন্ত ইতিহাস এই বইয়ের মাধ্যমে তুলে ধরা হলো বাংলাভাষী পাঠকের সামনে। বইয়ে বেশ কিছু কবিতা রয়েছে। কিছু কিছু কবিতার অংশ অতিরিক্ত মনে করে বাদ দেয়া হয়েছে। এই কবিতাগুলো সেই সময়ে রচিত এবং তখনকার চিত্র এসব কবিতায় সুস্পষ্টভাবে উঠে এসেছে।

সব মিলিয়ে পাঠক বইটি উপভোগ করবেন বলে আশা করছি।

উমর ইবনে আবদুল আজিজ

লেখক : আব্দুল্লাহ আল মাসূম



ধরন : জীবনী
বাঁধাই : হার্ডকভার
পৃষ্ঠা : ১৯৬
মুদ্রিত মূল্য : ৳ ২৬০

সময়ের প্রবল ঝঞ্ঝা উপেক্ষা করে কীভাবে প্রবল বিশ্বাসে দোদুল্যমান তরীর দাঁড় বাইতে হয়, উমাইয়া খলিফা উমর ইবনে আবদুল আজিজ ছিলেন তাঁর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। উমাইয়া রাজবংশের প্রতাপে মানুষ যখন ভুলতে বসেছিল খোলাফায়ে রাশেদার স্বর্ণকাল, তিনি এসে এক ঝটকায় আবার সকলের স্মরণে সেই স্মৃতি জাগরুক করে তোলেন। ইতিহাসে তাই তাঁর নাম লেখা আছে অমর হয়ে।
উমর ইবনে আবদুল আজিজ আমাদের চেতনার এক অত্যুজ্জ্বল মশাল। তাঁর জীবন আমাদের এ শিক্ষা দেয় যে, সৎশাসন এবং সত্যের পতাকা নির্ভয়ে ঊর্ধ্বে তুলে ধরা মুসলিমদের জন্য প্রত্যেক যুগেই এক আবশ্যিক কর্তব্য। কর্তব্য পালনের পথে শাসকের রক্তচক্ষু কিংবা সময়ের দুর্বিপাক যত তীব্রই হোক, তা উপেক্ষা করে সত্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।
এ মহান খলিফার জীবন আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় আমাদের অতীত গৌরব এবং খেলাফতের প্রাণশক্তির আবশ্যিকতা। এ কারণেই বাংলাভাষী পাঠকের জন্য তাঁর জীবনী প্রকাশে নবপ্রকাশ বরাবর আগ্রহী ছিল। আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা, তিনি আমাদের সে সৌভাগ্য দান করেছেন। লেখক আব্দুল্লাহ আল মাসূম দীর্ঘ অধ্যয়ন ও গবেষণার পর রচনা করেছেন বইটি। আমরা লেখকের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি। বইটি বাংলাভাষী পাঠকের মনে খেলাফতে রাশেদা পুনঃপ্রতিষ্ঠার স্বপ্ন পুনর্জীবিত করলে আমাদের শ্রম স্বার্থক হবে বলে মনে করি।

কীর্তিমানদের ছেলেবেলা

মূল : ড. মুহাম্মদ মুনশি কিন্দিল
অনুবাদ : ফারুক আজম



ধরন : ইতিহাসের গল্প
বাঁধাই : হার্ডকভার
পৃষ্ঠা : ১০৮
মুদ্রিত মূল্য : ৳ ১২০

কীর্তিমানদের ছেলেবেলা বইটিকে গত হওয়া মনীষীদের ছেলেবেলার জীবনী হিসেবে আখ্যায়িত করার জো নেই। কেননা লেখক এখানে কীর্তিমানদের শৈশবের জীবনকে তুলে এনেছেন ঠিকই, তবে তা জীবন নয়–জীবনের গল্প। জীবনী নয়–জীবনের খণ্ডিত অংশের গল্পায়ন। অসাধারণ ভাষা-গাঁথুনিতে লেখক মুহাম্মদ মুনশি কিনদিল কীর্তিমানদের টুকরো টুকরো গল্প দিয়ে সাজিয়েছেন তাঁর বইটি।

পাঠক গল্পগুলো পাঠ করে যারপরনাই অবাক হবেন। কেননা আমরা এতদিন যেসব কীর্তিমানের নাম শুনে এসেছি, শ্রদ্ধার সঙ্গে যাদের স্মরণ করেছি, লেখক সাগরের বুকে মুক্তো তালাশের মতো তাদের জীবনের সুন্দর একটা মুহূর্ত তুলে এনেছেন। যে মুহূর্ত তাকে পরবর্তী জীবনে বিশ্বজয়ের স্বপ্ন দেখিয়েছিল।

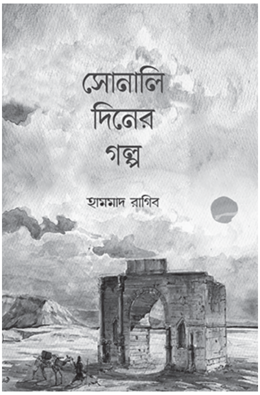
ইবনে জাহেজ, ইবনে হাইসাম, আল বিরুনি, ইবনে হাইয়্যান, আল হামাভি–এমন মহান পুরুষদের শৈশবের গল্প যতটা চিত্তাকর্ষক, তার চেয়েও দরকারি হলো শৈশবে তাদের বেড়ে উঠার শিক্ষা সম্পর্কে অবগত হওয়া। লেখক তাঁর বইয়ে গল্প বলতে গিয়ে ঠিক সে কাজটিই করেছেন।

যুগে যুগে সেই সব মানুষের বন্দনা গাওয়া হয়েছে। লেখা হয়েছে কীর্তিগাথা। কাল পেরিয়ে মহাকালের পটে লেখা হয়েছে তাদের নাম। অক্ষয় হয়েছে তাদের কীর্তি। তাদের জীবনের নানা কাহিনী বিবৃত হয়েছে মানুষের মুখে মুখে।

তেমনই কিছু দীপ্তিমান ক্ষণজন্মা মনীষীর জীবনের নানা দিক নিয়ে লেখা হয়েছে এ বই। তাদের বেড়ে উঠার গল্প বলা হয়েছে। হালকা মেজাজে। পরিশীলিত ঢংয়ে। পাঠক গল্পের আবেশে হারিয়ে যাবে। মুগ্ধতা নিয়ে পাঠ শেষ করবে। তারই ফাঁকে জানা হয়ে যাবে কিছু অসামান্য মানুষের কিংবদন্তিতুল্য জীবনকাহিনি। সেই জীবনের নানা বাঁক, নানা দিক। যার পরতে পরতে ছড়িয়ে আছে ত্যাগের ইতিহাস। আত্মদানের লোমহর্ষক বর্ণনা। প্রচেষ্টা ও উদ্যমের গল্প।

সোনালি দিনের গল্প

লেখক : হামমাদ রাগিব

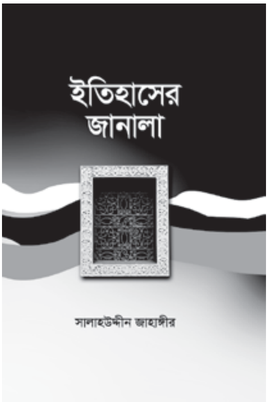


ধরন : ইতিহাসের গল্প
বাঁধাই : হার্ডকভার
পৃষ্ঠা : ৮৮
মুদ্রিত মূল্য : ৳ ১০০

আমাদের একটি গৌরবোজ্জ্বল অতীত আছে। আছে গর্ব করার মতো অসংখ্য যুগশ্রেষ্ঠ মনীষা। আমরা গর্ব করতে পারি আমাদের নির্মাণ করা সভ্যতা নিয়ে। পৃথিবীর অর্ধেক সভ্যতা নির্মিত হয়েছে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চলে আসা মুসলিম সাম্রাজ্য আর যুগ বদলে দেয়া মনীষীদের হাত ধরে। এই গৌরব আমরা হেলায় হারাতে পারি না।
কিন্তু এ কথাও আমাদের স্মরণ রাখা কর্তব্য, কেবল অতীতের সুখ-স্মৃতিচারণ কিংবা অতীতের গল্প বর্ণনা করে আমরা কখনোই আমাদের হারানো ঐতিহ্য ফিরে পাবো না। আমাদের ইতিহাস-ঐতিহ্য, আমাদের যুগবরেণ্য মনীষাব্যক্তিত্ব, সযত্নে লালিত আমাদের বিজয়ী চেতনা কোনোভাবেই যেন কেবল বইয়ের পাতার গল্প হয়ে না যায়। ঐতিহ্যের প্রতিটি গল্প যেন হয় ভবিষ্যত পৃথিবী নির্মাণের হিরন্ময় হাতিয়ার।
'সোনালি দিনের গল্প' এমনই কিছু অজেয় গল্প দিয়ে সাজানো গল্পগ্রন্থ। লেখক হামমাদ রাগিব ইতিহাসের নানা গুদাম থেকে গল্পের কাঁচামাল জোগাড় করে পাঠকের সামনে হাজির করেছেন ঐতিহ্যের এক বিনিদ্র দাওয়াই। পাঠকের অন্তকরণে যে দাওয়াই ছড়িয়ে দেবে জাগ্রত বিশ্বাসের স্ফুরণ। বইটি পাঠ করে পাঠক আমাদের অতীত ইতিহাস যেমন জানতে পারবে, তেমনি উজ্জীবিত হবে নতুন দিনের জাগৃতির।

ইতিহাসের জানালা

লেখক: সালাহউদ্দীন জাহাঙ্গীর



ধরন : ইতিহাস
বাঁধাই : হার্ডকভার
পৃষ্ঠা : ১৬৮
মুদ্রিত মূল্য : ৳ ২২০

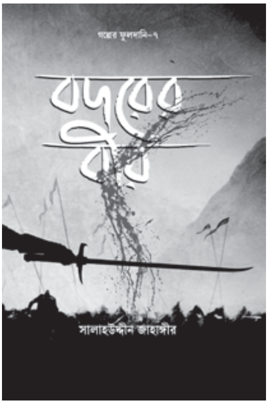
ইতিহাসের সমুদ্রতল থেকে তুলে আনা মান্না পান্না হীরা মুক্তো অমূল্য কড়ি ও নুড়ির সমাহার ইতিহাসের জানালা। মানবসভ্যতার সুদীর্ঘ অভিযাত্রার বাঁকে বাঁকে গেঁথে থাকা অনেক অনুদ্ঘাটিত রহস্যের অনুসন্ধান এতে গ্রন্থিত হয়েছে। ছোট ছোট অনেক ইতিহাসের সমন্বিত পাঠে অনন্য এক স্বাদে সমৃদ্ধ হবেন পাঠক। নিকট অতীত, সুদূর অতীত, প্রাগৈতিহাসিককাল, ইতিহাসের বিচিত্র মোড়ের ব্যক্তি, স্থান, ঘটনা, যুদ্ধ, বিজয়, বেদনা, অনেক ঘটনার অন্তরালে ঘটে যাওয়া অজানা সত্য, অতীতের হারিয়ে যাওয়া রহস্যকাহিনি, ধ্রুব বর্তমান–সব এক মলাটে একত্র হয়েছে শৈল্পিক বিন্যাসে।

ইউরোপ-আরবের যুদ্ধ ইতিহাসে লায়ন অব ডেজার্ট বলে খ্যাত ওমর আল মুখতারের গেরিলাযুদ্ধ, লায়লা খালিদের দুঃসাহসিক বিমান হাইজ্যাক, আসাম ম্যাসাকারে নিহত ৬০০০ বাঙালি, চিরস্মরণীয় রেশমি রুমাল আন্দোলন, শাহবাগের ইতিহাস, ১৯৬৭ সালের আরব ইসরাইল যুদ্ধ, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের নেপথ্যকথা, প্রাচীন মিসরের রহস্যঘেরা মমি, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, এডলফ হিটলার ও নাৎসিবাহিনী, বাগদাদে তাতার তাণ্ডবের রোমহর্ষক কাহিনি, আকাশজয়ের ইতিবৃত্ত, লর্ড ক্লাইভের করুণ মৃত্যু, মুক্তিযুদ্ধে আমেরিকা ও রিচার্ড নিক্সনের আঁতাত ও আরো অনেক ইতিহাসের চারুপাঠ এতে সমুপস্থিত।

ইতিহাসের অনেক হাসি-কান্নার ধারাবিবরণী ডানা মেলেছে ‘ইতিহাসের জানালা’ বইটিতে। বিভিন্ন সূত্র ও দলিলের আলোকে রচিত গ্রন্থটি সুখপাঠ্য ঝরঝরে ও মসৃণ। একটি গ্রন্থে বিশ্বইতিহাসের সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে এনেছেন ইতিহাসসন্ধানী লেখক সালাহউদ্দীন জাহাঙ্গীর। সাবলীল গদ্যে রচিত গ্রন্থটির পাঠে কোথাও হোঁচট খেতে হয় না, বরং নদীর স্রোতের মতো তরতর এগিয়ে নিয়ে চলে অজানা সব কৌতূহলের সন্ধানে। ইতিহাস বিচারে গ্রন্থটি রেফারেন্সের মর্যাদা অর্জন করতে সক্ষম নির্দ্বিধায়। এ কেবল এক ইতিহাস গ্রন্থ নয়, ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায়ের অভিনব সংযোজনা।

বদরের বীর

লেখক: সালাহউদ্দীন জাহাঙ্গীর



ধরন : ইতিহাসের গল্প
বাঁধাই : হার্ডকভার
পৃষ্ঠা : ১৬০
মুদ্রিত মূল্য : ৳ ২০০

ইসলামের সুদীর্ঘ ইতিহাসের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিমূর্ত গল্পগুচ্ছের অনবদ্য সংকলন বদরের বীর। অতীত ও বর্তমান একই মলাটে পেখম মেলেছে অপূর্ব বিন্যাসে, সাবলীল শব্দ-তরঙ্গে ও গল্পের অভিনবত্বে। ‘বদরের বীর’ বইয়ের প্রথম গল্পের শিরোনাম। ছোটগল্প হলেও এর অনুপম গদ্যশৈলী যোগায় জীবন্ত উপন্যাসের স্বাদ।

ইসলামি ইতিহাসের প্রথম যুদ্ধের প্রথম শহিদের গল্পের সাথে পাঠক পরিচিত হবেন সম্পূর্ণ নবঅবয়বে। ‘ইস্পাহানের সাহাবা’ গল্পে শিহরিত করবে সত্যের সন্ধানে একজন সালমান ফার্সির সুদীর্ঘ আড়াইশত বছরের রোমাঞ্চকর জীবন-বিবরণ। ইতিহাস থেকে তুলে আনা সতেরোটি গল্পই স্পর্শ করে যায় বর্তমান মুসলমান ও মানুষের যাপিত জীবন। ‘ক্রীতদাস-পুত্র’-এ বিবৃত হয়েছে ভাগ্যহারা কিশোর জায়িদের আনন্দঘেরা জীবনালেখ্য, মোঘল সাম্রাজ্যের শেষ প্রদীপ বাহাদুর শাহ জাফরের বেদনভরা দিনগুলো উঠে এসেছে ‘শেষ সম্রাট’ গল্পে। দুর্ভাগ্যচক্রে দাসত্বের শৃঙ্খলে বন্দি সুহাইব রুমির জীবনের নানা বাঁক পরিবর্তন সবাক চিত্রে ফুটে উঠেছে ‘ভিনদেশি সওদাগর’ গল্পে। ‘ইয়ামামার বাজপাখি’ বীরত্ব ও শৌর্যের শিহরণ ছড়িয়ে দেয় শরীরের শিরায় শিরায়। দুর্ধর্ষ মঙ্গোল বীর চেঙ্গিস খানের অনেক অজানা কাহিনি, মধ্যএশিয়া আফগানিস্তান ইরান ইরাক মিসর তুর্কিস্তান ইত্যাদি অঞ্চলে লক্ষ লক্ষ মুসলিম হত্যার নেপথ্যগল্প, হালাকু খাঁর দুনিয়া হালাক করা প্রমত্ত যুদ্ধ, রাজ্যহারা অস্তিত্ব বিলীয়মান মুসলমানদের ঘুরে দাঁড়ানো বিপ্লবের রহস্যকথা, মঙ্গোলবীর তৈমুর লঙের ইসলামগ্রহণ ও তার হাতে দশ লক্ষাধিক মানুষের ইসলামগ্রহণের অনালোচিত ইতিহাস গ্রন্থটির ঐতিহাসিক মূল্য বাড়িয়ে দিয়েছে বহুগুণে। উম্মাহর ইমাম ও পূর্বপুরুষের আরো অনেক ঈমানজাগানিয়া গল্প এতে বিমূর্ত হয়েছে সাবলীল রচনায়।

ইসলামি ইতিহাসের অমূল্য গল্পগুলো বাংলা সাহিত্যের পোশাকে উপস্থিত করেছেন ইতিহাস গবেষক ও লেখক কবি সালাহউদ্দীন জাহাঙ্গীর। কবিত্বপূর্ণ ভাবকল্পের মিশেলে রচিত সাবলীল গদ্যশৈলীর কারণে ইতিমধ্যেই অর্জন করেছেন তুমুল পাঠকপ্রিয়তা। অজানা ইতিহাসের সহজিয়া বয়ান তার আবেদন সৃষ্টি করেছে আরো বহুগুণ বেশি। বইটির পাঠে আপনিও মিশে যাবেন ইতিহাসের রোমাঞ্চকর শোভাযাত্রায়।

আসমানি আদালত

মূল : মাহমুদ শিত খাত্তাব
অনুবাদক : লাবীব আব্দুল্লাহ



ধরন : গল্প
বাঁধাই : হার্ডকভার
পৃষ্ঠা : ৮৮
মুদ্রিত মূল্য : ৳ ১২০

আদালাতুস সামা একটি আরবি ছোটগল্প সংকলন। মূল লেখক মাহমুদ শিত খাত্তাব। তিনি ইরাকি সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ছিলেন। আদালাতুস সামার অনুবাদই আসমানি আদালত।

লেখক মাহমুদ শিত খাত্তাব আদালাতুস সামা বইয়ে নিজের জীবনে দেখা বাস্তব কাহিনীগুলো গল্পে রূপায়ণ করেছেন সাবলীল ভাষায়। নাটকীয়তা আছে গল্পে। কৌতূহল জাগিয়ে তোলে। পরে কী হবে–গল্পপাঠ শেষ না করলে তা বলা মুশকিল। এমনই স্বাদু করে লিখেছেন তিনি প্রতিটি গল্প। লেখক-অনুবাদক লাবীব আব্দুল্লাহ মায়াময় কলমে সেগুলো ভাষান্তর করেছেন।

এগারোটি গল্প নিয়ে বইটি। প্রতিটি গল্প জীবনঘনিষ্ঠ। বাস্তবতাকে উপজীব্য করে লেখক গল্পের আঙ্গিকে লিখেছেন নিজের অভিজ্ঞতা। আমাদের চলমান জীবনে হর-হামেশা ঘটে এসব গল্প। পড়ে মনে হবে–

গল্পগুলো গল্প নয় জীবন। জীবনের গল্প। শিক্ষণীয়। দৃষ্টান্তমূলক। এ গল্পগুলো জীবন বিনির্মাণ করবে, বিধ্বস্ত নয়। গল্পগুলো ঈমান জাগানিয়া এবং শিক্ষণীয়। ইংরেজি, তুর্কি, উর্দু, ফার্সি ভাষাসহ আরও বেশ কয়েকটি ভাষায় বইটি অনূদিত হয়েছে। বাংলাভাষী পাঠকের জন্য এ বই এক অনন্য মুগ্ধতা।

গল্পগুলো সাদামাটা ভাষায় জটিল দর্শনের চিত্রায়ন।

কিছুটা রোমাঞ্চকর। তবে ছোটগল্পের সব শৈল্পিকগুণের অভাব অনুভব হবে না আশা করি। আমাদের জীবনে দেখা বা ঘটে যাওয়া গল্পের সঙ্গে মিল খুঁজে পাওয়া যাবে বাস্তবধর্মী এ গল্পগুলোতে।

আদালাতুস সামা থেকে আসমানি আদালত। গল্পগুলো নিয়ে এককথার অভিমত : প্রতিটি গল্প শিক্ষণীয়। গল্পের মধ্যে অযথা বাক্যালাপ নেই। অনর্থক শব্দের বাহুল্য নেই। প্রাঞ্জল ও গতিময় গদ্যে পাঠককে তুলে নিয়ে যাবে ইরাকের নাম না জানা কোনো শহরে।

বই: তবুও আমরা মুসলমান

লেখক: তামীম রায়হান



ধরন : প্রবন্ধ
বাঁধাই : হার্ডকভার
পৃষ্ঠা : ১৯২
মুদ্রিত মূল্য : ৳ ২৪০

পৃথিবীর মানবসভ্যতার সুশৃঙ্খল অভিযাত্রার সর্বাঙ্গসুন্দর জীবনবিধান নিশ্চয় ইসলাম। মানবজীবনের সব শাখায় ইসলামের শেখানো বিধান সর্বকালে সর্বদেশে সর্বভাষায় স্বমহিমায় ভাস্বর হয়ে বিরাজমান। ইসলামের অনুপম জীবনবিধান, ইসলাম নিয়ে বর্তমান বিশ্বের চিন্তাদৈন্য, বিদ্বেষ, সাংস্কৃতিক আগ্রাসন, অজ্ঞতা, মুসলমানদের যাপিত জীবনের নীতি ও নেতি, পরিবার সমাজ রাষ্ট্রের বিধিবিধান ইত্যাদি আলোচনার মলাটবদ্ধ রূপায়ন 'তবুও আমরা মুসলমান'।

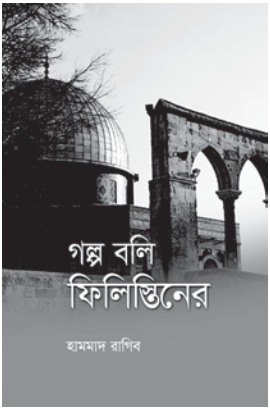
ইসলামের পরিপূর্ণ রূপ-অবয়ব, মুসলমানদের করণীয়-বর্জনীয় প্রভৃতি চিত্রিত হয়েছে কোরআন হাদিস ও যুক্তির আলোকে। পাঠকদের চিন্তার রাজ্যে খোরাক যোগাবার মতো প্রবন্ধগুচ্ছের কিছু শিরোনাম– 'কঠোরতা কিংবা শিথিলতা নয়, চাই মধ্যপন্থার অনুসরণ' 'ধর্ম ও ধার্মিকতার প্রকারভেদ' 'ইসলাম শুধু বিশ্বাসের নয়' 'বিনয় ইসলামের পরিচয়' 'আত্মহত্যা কোনো সমাধান নয়' 'শুধু রুকু সেজদার নাম নামাজ নয়' 'বিপদ যখন সৌভাগ্যের প্রতীক' 'অস্থির আত্মা ও অস্থির পৃথিবী' 'শুধু ব্যবসায়ীদের জন্য' 'দুর্নীতি সর্বগ্রাসী ব্যাধি' 'সম্পদশালী মানেই ধনী নয়' 'শ্রমিকের অধিকারে সোচ্চার ইসলাম' 'শিশুর জন্য ভালোবাসা' 'পোশাক সম্পর্কে ইসলামের নির্দেশনা' 'মাদক শুধু নেশা নয়' 'পাত্র-পাত্রী দেখাদেখি' 'সফলতার শর্ত আত্মীয়তার সম্পর্ক' 'মায়ের মুখের হাসি দয়াময়ের অমূল্য উপহার'।

এমন প্রায় তিপ্পান্নটি চিন্তার খোরাক যোগানো প্রবন্ধ নিয়ে সাজানো এ গ্রন্থ। প্রবন্ধগুলো ইতিপূর্বে বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক ও অনলাইনে প্রকাশিত হয়ে পাঠকমহলে বিপুল সাড়া জাগিয়েছে। সর্বশ্রেণীর পাঠক-উপযোগী করে সাবলীল লালিত্যপূর্ণ ভাষায় প্রবন্ধগুলো লিখেছেন সত্যানুসন্ধানী লেখক ও গবেষক তামীম রায়হান। ইতিমধ্যে তার বেশ কিছু বই বিদগ্ধমহলে সমাদৃত লাভ করেছে। এই বইটিও মুসলিম পাঠকসমাজের জন্য অবশ্যপাঠ্য অমূল্য পাথেয়।

আপনাকে স্বাগতম এ আলোর পথে।

গল্প বলি ফিলিস্তিনের

লেখক : হামমাদ রাগিব



ধরন : ইতিহাসের গল্প
বাঁধাই : হার্ডকভার
পৃষ্ঠা : ৮০
মুদ্রিত মূল্য : ৳ ১২০

আল-কুদস। ফিলিস্তিনের পবিত্র ভূমি। মুসলমানদের প্রাণের শহর। প্রথম কেবলার শহর। ইহুদি আর খ্রিষ্টানদের ভালোবাসাও প্রোথিত আছে এই শহরে। তিন ধর্মের তীর্থ শহর এই আল-কুদস। জেরুজালেম।

নবি দাউদ, নবি সুলায়মান আলায়হিমাস সালাম–পিতা-পুত্র দুই নবি শাসন করে গেছেন এ শহর। এ শহরের সঙ্গে জড়িয়ে আছে নবি ইসা আলায়হিস সালামের কত স্মৃতি! আরও অনেক নবির পুণ্যস্মৃতি!

নবি মুহাম্মদ, আমাদের প্রিয় নবি, বিশ্বনবি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের মেরাজ এই ভূমি থেকেই শুরু হয়েছিল। মেরাজ রজনীর বাহন বোরাকের পদধূলি মিশে আছে এই শহরের বালুকণায়।

ফিলিস্তিনে মুসলিমদের উত্থান-পতনের ইতিহাস গল্পে গল্পে সংক্ষেপে বলার চেষ্টা করা হয়েছে বইটিতে। সেই সঙ্গে ফিলিস্তিনি কয়েকজন বীরের আত্মদানের গল্পও সংযুক্ত হয়েছে।

১৯৪৭ সালে এক বিতর্কিত রায়ের মাধ্যমে জবরদখল করা হয় ফিলিস্তিনের পবিত্র ভূমি। আর এর মধ্য দিয়েই মুসলমানদের ভালোবাসার শহর পবিত্র আল-কুদসে ইহুদিদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। ফিলিস্তিনি মুসলমানরা হয় চূড়ান্ত বঞ্চনার শিকার। সেই বঞ্চনা আর না পাওয়ার হাহাকারে আজও ভারী হয়ে আছে ফিলিস্তিনের আকাশ। এর ভেতরে পৃথিবীর রূপ-বৈচিত্র্যে কত পরিবর্তন এসেছে, জর্ডান নদীতে কলকল রব তুলে গড়িয়েছে কত জল, কিন্তু হতভাগ্য আল-কুদস আর ফিলিস্তিনের মানুষের ভাগ্যে কোনো পরিবর্তন আসেনি। জুলুম, নির্যাতন আর পরাধীনতার গ্লানিতে আজও তারা ক্লান্ত-শ্রান্ত।

তাই বলে যে তারা থেমে আছে, এমন নয়। তাদের সংগ্রাম আর প্রতিরোধ চলমান। বঞ্চনার আগুনে পুড়তে পুড়তে তাদের কেউ কেউ হঠাৎ জ্বলে ওঠে। আর পৃথিবী অবাক হয়ে দেখে প্রতিবাদের অভিনব ভাষা এবং স্বরূপের আগুন-মূর্তি।

পাঠক এক চুমুকে পুরো ফিলিস্তিনকে সংক্ষেপে পাঠ করে নিতে পারবেন, আশা করি।

কাতারে বহতা সময়

লেখক : আব্দুল্লাহ আল মামুন



ধরন : আত্মকাহিনি
বাঁধাই : হার্ডকভার
পৃষ্ঠা : ১২০
মুদ্রিত মূল্য : ৳ ২০০

কাতারপ্রবাসী লেখক আব্দুল্লাহ আল মামুন। পেশায় প্রকৌশলী।

স্বদেশ ছেড়েছেন আশির দশকের মাঝামাঝি। সেই থেকে যাযাবরের মতো ভেসে বেড়িয়েছেন দেশ থেকে দেশান্তরে। অভিবাসী হয়ে অস্ট্রেলিয়ার সিডনি শহরে প্রায় দুই যুগ কাটানোর পর ২০০৮ সালে পা রাখেন মধ্যপ্রাচ্যের উপসাগরীয় অঞ্চলের মরুময় কাতারে। সেই থেকে অন্তর্জালের ব্লগ এবং পত্রিকায় বিচ্ছিন্নভাবে লিখে যাচ্ছিলেন কাতারের দিনলিপি, সুখ-দুঃখের প্রলেপমাখা তার অভিজ্ঞতার কথা। এই লেখাগুলোরই মলাটবদ্ধ সংকলন : 'কাতারে বহতা সময়'।

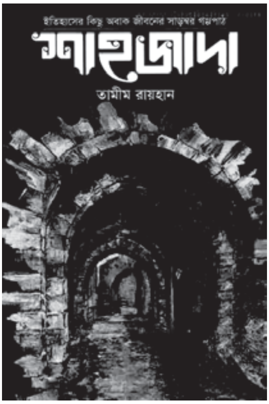
কাতারে আসার পর সংস্পর্শে এসেছেন অনেক মানুষের। যাদের সান্নিধ্য লেখকের মরুর দিনগুলোকে করেছে বর্ণিল ও অর্থবহ।

এই গ্রন্থের লেখাগুলো মূলত ২০০৮ থেকে ২০১২ সালের অভিজ্ঞতারই বয়ান। তাই সবার কথা এখানে উঠে আসেনি। বলা হয়নি অনেক অজানা রহস্য, যাপিত জীবন।

এই গ্রন্থে বর্ণিত ঘটনাগুলো লেখকের একান্ত দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা। অনেক পাঠকের চোখে হয়তো তা ভিন্ন আঙ্গিকে ধরা পড়তে পারে। তার লেখায় যদি প্রবাসীরা তাদের হাসি-কান্নার প্রতিচ্ছায়া দেখতে পান, তবেই লেখকের এই প্রচেষ্টা সার্থক।

শাহজাদা

লেখক : তামীম রায়হান



ধরন : ভ্রমণকাহিনি
বাঁধাই : হার্ডকভার
পৃষ্ঠা : ১২০
মুদ্রিত মূল্য : ৳ ১৫০

জীবন যখন আমাদের সামনে এসে দাঁড়ায় তার সকল ঐশ্বর্য নিয়ে, তখনই আমরা বুঝতে পারি জীবনের মানে কী! বেঁচে থাকার স্বার্থকতা কতো মধুর! প্রতিটি ভোর কী রকম অলৌকিক সুন্দর!

এ পৃথিবীর বুকে প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে এমন অসংখ্য অনবদ্য ঐশ্বর্যশীল কাহিনিকাব্য, আমরা হয়তো সেসবের খবরই রাখি না। ইতিহাসের আস্তিন খুলে কখনো চোখ মেলে তাকানোই হয়নি।

এমনসব কাহিনিকাব্য নিয়েই সুলেখক তামীম রায়হান-এর গল্প সংকলন– শাহজাদা। কিছু চমৎকার আরবি গল্পের সাবলীল ও ভাব অনুবাদ নিয়ে তিনি পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন ইতিহাসের সেইসব দাস্তান যা শুনলে আমাদের মননে তৈরি হয় এক অতিন্দ্রীয় সাহসী উপাখ্যান। আমাদের বিশ্বাসের বাতিঘরে প্রোজ্জ্বল হয় চেতনার বহ্নিশিখা। এ বই সে দীপ্ত শিখাকেই আবার জাগ্রত করবে প্রতিটি পাঠকের অন্তকরণে।

গল্পের অর্গলে তুলে আনা এ মায়াময় গ্রন্থপাঠে স্বাগতম।